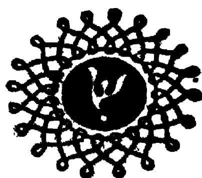
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

[দ্বিতীয় খণ্ড]

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস





নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম নবপত্র-প্রকাশ ঃ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ আশীষ কোঙার
শ্রীগুরু প্রিন্টার্স
৯এ রায় বাগান স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০০৬

DITIYA MAHAJUDDHER ITIHAS Vol. II
By Vivekananda Mukherjee

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও সাম্যবাদের চূড়ান্ত জয়ে বিশ্বাসী এবং লোকসভার প্রাক্তন খ্যাতনামা সদস্য

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা

এই খণ্ডেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্পূর্ণ ইতিহাস শেষ করা হয়েছে। এই খণ্ডে আগের খণ্ডের মতই মহাযুদ্ধের রণনীতি, রাজনীতি ও মানবিক দিকসংক্রান্ত বহু রোমাঞ্চকর, উত্তেজনাপ্রদ এবং মর্মান্তিক ঘটনাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। এই খণ্ডে এমন সমস্ত তথ্য আছে, যা আমাদের দেশে অন্তঃত বাংলা ভাষায় আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি। সমগ্র ইতিহাস অপক্ষপাতভাবে রচনার জন্য এমন সমস্ত পুস্তক বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যেগুলি আমাদের সুবিখ্যাত ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য নয়। প্রত্যেকটি ঘটনাকে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক করার জন্য পাদটীকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, মহাযুদ্ধের এই ইতিহাস রচনায় পৃথিবী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের গ্রন্থগুলিরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং ত্রিশ বছরের অধিককাল আমার কেটেছে মহাযুদ্ধের তথ্যাবলীর পিছনে। আশাকরি আমার সেই পরিশ্রম একেবারে বৃথা যায়নি।

সমগ্র ইতিহাসের পরিকল্পিত মোট দশটি পর্বের মধ্যে পাঁচটি পর্বসহ প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মানবাহিনীর বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো আরও পাঁচটি পর্বে। এই খণ্ডে স্ট্যালিনগ্রাডের পর থেকে ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জঙ্গীবাদী জাপানের চূড়ান্ত পরাজয় পর্যন্ত বহু রাজনৈতিক ও রণনৈতিক কাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে। চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিনের ফ্যাসিবিরোধী কোয়ালিশনের ও তিন বিশ্বনেতাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর ও চিয়াং কাইসেকের ভূমিকার প্রচুর তথ্য এই খণ্ডে দেওয়া হয়েছে। পোল্যাণ্ড নিয়ে বিরোধ ও অন্যান্য সমস্যা এবং মুসোলিনীর পতন, কুরস্কে জার্মানীর শেষ গ্রীষ্মাভিযান, পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি, রোম ও প্যারিসের মুক্তি এবং জার্মান সেনাপতিবৃন্দ কর্তৃক হিটলারকে হত্যার চরম চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বহু নাটকীয় ও রোমহর্ষক কাহিনী এই খণ্ডে উদ্ঘাটন করা হয়েছে।

যদিও মিত্রপক্ষের দিক থেকে যুদ্ধটা ছিল ফ্যাসিজম ও পরাধীনতার থেকে মুক্তি, তথাপি ভারতের স্বাধীনতার দাবী কিভাবে দমন ও জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং প্রতিবাদে আগস্ট বিদ্রোহ ঘটেছে, আর কিভাবেই বা পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ গেল, আর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাই বা কি ছিল—এই সমস্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচ্য খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

বলা বাহুল্য যে, ভারতের পরাধীনতার পাশ ছিন্ন করার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারতের বাইরে দুঃসাহসিক অভিযান, আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম ইত্যাদি আমাদের জাতীয় জীবনের এই গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীও বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর অধিকৃত ইউরোপের প্রতিরোধ যুদ্ধ, অবর্ণনীয় প্রতিহিংসার মুখে পার্টিজানদের বা গেরিলাদের আশ্চর্য লড়াই, টিটোর চূড়ান্ত জয় এবং ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের অংশ গ্রহণের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। বন্দীশালার অবর্ণনীয় বর্বরতা এবং যুদ্ধবন্দী ও অন্যান্য নারী-পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে পাইকারি হত্যার যে নৃশংসতা এই মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট হিংস্রতার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও ঘৃণিত অধ্যায়, সেই অমানুষিক ঘটনাবলীও যথাসম্ভব আলোচনা করা হয়েছে। অপরপক্ষে পশ্চিম ও পূর্বদিক থেকে হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের যুগপৎ অভিযান এবং দ্বীপ

থেকে দ্বীপান্তরে জাপানের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণের রোমাঞ্চকর কাহিনীও পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। জার্মানীকর্তৃক দখলীকৃত সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের মুক্তিও এই অংশে আলোচিত হয়েছে।

মহাযুদ্ধের নৃশংসতার মধ্যেও প্রথম খণ্ডের মতই মানবিক দিকগুলির উপরেও নজর রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এই ইতিহাস কেবল কতকগুলি শুকনো বা ভীতিপ্রদ ঘটনাবলীর বর্ণনা মাত্র নয়।

জার্মানী ও জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস সম্পূর্ণ হলো নবম ও দশম পর্বে। অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের মে ও আগস্ট মাসে নাৎসী জার্মানী ও জঙ্গীবাদী জাপানের চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্যে দশটি পর্বে বিভক্ত এই মহা নাটকীয় ইতিহাসের যবনিকা পড়লো। কিন্তু যবনিকা পড়ার আগে পাঠকবর্গ প্রত্যেকটি অঙ্কে এমন সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন, যেগুলি রোমহর্ষক। যেমন, নবম পর্বের গোড়াতেই রাইন নদী অতিক্রম ও বার্লিন দখল নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্কের ঢেউ উঠেছিল। কিন্তু চার্চিলের অপরিসীম আগ্রহ ও কূটবুদ্ধি সত্ত্বেও বার্লিন নগরী ইঙ্গ-মার্কিন দখলে গেল না, গেল স্ট্যালিনের লালফৌজের দখলে! চার্চিল অনেক দিন পর্যন্ত এই 'শোক' ভুলতে পারেননি, যার ফলে যুদ্ধাবসানের সঙ্গে 'গ্রেট কোয়ালিশন', ভেঙে গেল এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হলো।

মার্শাল জুকোভ, মার্শাল কোনেভ, মার্শাল রকোসোভোস্কি প্রভৃতি খ্যাতনামা সোভিয়েত সেনাপতিদের নেতৃত্বে এবং সুপ্রিম কমাণ্ডার-ইন-চিফ মার্শাল স্ট্যালিনের নির্দেশে লালফৌজের দুর্দমনীয় বার্লিন অভিযান যে-কোন-যুগে সামরিক ইতিহাসের পক্ষেই অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা। হিটলার তখন বার্লিনের ভূগর্ভে অন্তিম আশ্রয়ে এবং শেষ মুহূর্তেও তিনি পরাজয় স্বীকারে অসম্মত ছিলেন। পরাজিত জাতির বেঁচে থাকার যে অধিকার নেই, এমন মনোভাব প্রকাশ করে হিটলার তাঁর স্বদেশবাসীকে ধ্বংস ও অপমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও বিবেকের বিন্দুমাত্র দংশন অনুভব করেননি। অবশেষে নিরুপায় ও হতাশ হিটলার ভূগর্ভের সেই সুরক্ষিত আশ্রয়ে প্রণয়িনী ইভা ব্রাউনসহ আত্মহত্যা করলেন। অবশ্য তার আগেই তাঁর ফ্যাসিস্ট মিতা মুসোলিনীও তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চিসহ ইতালিয়ান গেরিলাদের (কমিউনিস্ট) হাতে ধৃত ও নিহত হয়েছিলেন। হিটলার তাঁর জীবনের অন্তিমলগ্নে তাঁর একান্ত সুহৃদের এই ভয়াবহ পরিণতির কথাও শুনে গিয়েছিলেন। ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরদের অত্যাচারের রাজত্ব যে ভয়াবহ ট্রাজিডির মধ্যে শেষ হয়েছিল, পাঠকবর্গ এই পুস্তকে সেই করুণ ও ভয়াবহ দৃশ্যেরও রেখাচিত্র পাবেন।

এরপর জাপানের পালা। যদিও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর পর ট্রুম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্টরূপে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা ও সহযোগিতা বজায় রাখতে উৎসুক ছিলেন না, তবু জাপানকে পরাজিত করার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য না-নিয়েও উপায় ছিল না। কিন্তু আমেরিকা কর্তৃক এ্যাটমিক বোমা নির্মাণ ও প্রলয়ঙ্কর পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারের পর এই মনোভাবেরও বদল হয়ে গিয়েছিল। তবু ঐতিহাসিক পটসডাম সম্মেলনে বৃটিশ, মার্কিন ও সোভিয়েত—এই তিন মহাশক্তির সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ রইল এবং জাপানের উদ্দেশ্যে চরমপত্র ঘোষিত হলো।

পারমাণবিক শক্তি ও পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার এবং পরীক্ষা সম্পর্কে

যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যে বিবরণীতে পাওয়া যাবে ঐ কালান্তক বোমার জনক সুপণ্ডিত ও শ্রীমদ্ভবতগীতা ভক্ত-বিজ্ঞানী ওপেন হাইমারের বিচিত্র কাহিনী। এই অধ্যায়টি রচনায় একজন বিশিষ্ট বাঙালী বিজ্ঞানীর (ড. ধ্রুব মার্জিত) সুলিখিত প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই জন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী।

দেশপ্রেমিক ও সাম্রাজ্যগর্বী জাপানের আত্মসমর্পণকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত উত্তেজনাপূর্ণ নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল, সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ আগে আমাদের দেশে জানা ছিল না—যেমন, স্বয়ং সম্রাটকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করার জন্য উগ্র-মস্তিষ্ক তরুণ জাপানী সৈন্যেরা এক চাঞ্চল্যকর ষড়যন্ত্র করেছিল। যে দেশে সম্রাটকে ভগবানের মত ভক্তি করা হয়ে থাকে, সেই দেশে তাঁকেই গ্রেপ্তারের ষড়যন্ত্র মারাত্মক বৈকি ?

ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বাঘা বাঘা নাৎসী রণনায়কদের প্রাণদণ্ড দানের কাহিনী যেমন ঐতিহাসিক কারণেই উল্লেখযোগ্য, তেমনি প্রণিধানযোগ্য দূর-প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং সেই প্রসঙ্গে ভারতের (বাংলার) সুপ্রসিদ্ধ আইন বিশেষজ্ঞ বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পালের ভিন্ন অভিমত জ্ঞাপনে যে রায় সেদিনের আন্তর্জাতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের প্রকাশিত বিবৃতিটি প্রামাণিক এবং তথ্যবহুল। পুস্তকের শেষের দিকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিটি পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য একটি পৃথক অধ্যায়ের (একাদশ) আকারে দেওয়া হয়েছে—যাতে মহাযুদ্ধের ভারত ও ভারতীয় বাহিনীর অংশ-গ্রহণ সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে।

এই দ্বিতীয় খণ্ডে মহাযুদ্ধের উপসংহার টানা হয়েছে এবং যুদ্ধরত পৃথিবী ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর একটা রূপরেখার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই আন্তরিক আশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে মানুষ যেন আর এই পাশবিক ও মানবিক হত্যাকাণ্ডের শিকার না হয়।

এই পুস্তক রচনায় যে সমস্ত গ্রন্থ, সাময়িক পত্র, পুস্তিকা ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সমস্ত গ্রন্থাগার, লেখক ও প্রকাশক এবং সম্পাদকদের নিকট অকপটে ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। পাদটীকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে পৃথক কোন গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হলো না।

বর্তমান বিংশ শতকের পরিবর্তিত পৃথিবী যেন এক স্বতন্ত্র-জগৎ। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পশ্চাৎপট বুঝবার পক্ষে যদি "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস" পাঠকদের কিছুমাত্র সহায়তা করে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ষষ্ঠ পর্ব

কোয়ালিশনের রাজনীতি ও রণনীতি

[জানুয়ারী ১৯৪৩—ডিসেম্বর ১৯৪৩]

স্ট্যালিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া; মুসোলিনীর পতন; ইতালীর 'বৈধ বিপ্লব'; হিটলারের প্রতিক্রিয়া ও মুসোলিনীর উদ্ধার; ইতালীর আত্মসমর্পণ : দলিল স্বাক্ষরের নাটক; স্ট্যালিনগ্রাদের পর রাশিয়া : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ; পোলিশ সমস্যা ও ক্যাটিন অরণ্যের রহস্য; কুরস্কে জার্মানীর শেষ অভিযানের ব্যর্থতা; ১৯৪৩-এর সোভিয়েত গ্রীষ্মাভিযান; কোয়ালিশনের রাজনীতি ও রণনীতি; কায়রো-তেহরান শীর্ষ সম্মেলন; যুগোস্লাভিয়া, টিটো এবং গ্রীস; মহাযুদ্ধ ও ভারতের দুর্ভোগ; আগস্ট বিদ্রোহ, পঞ্চাশের মন্বন্তর; কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও ভূমিকা। [১—১৪৭]

সপ্তম পর্ব

বিজয়ের পথে ফ্যাসিবিরোধী শক্তি

[জানুয়ারী ১৯৪৪—ডিসেম্বর ১৯৪৪]

লেলিনগ্রাদ, কিয়েভ ও সেবাস্তপোলের মুক্তি; রোমের মুক্তি ও ইতালীয় যুদ্ধের মন্থরতা; নরম্যাণ্ডিতে অবতরণ; ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন; হিটলারকে হত্যার চরম চেষ্টা; বেলোরুশিয়ার মুক্তি এবং ওয়ারশর অভ্যুত্থান, প্যারিসের মুক্তি; মস্কোতে চার্চিলের গোপন বুঝাপড়া? —জার্মান তাঁবেদারদের রণে ভঙ্গ; চীনের বিতর্কিত ভূমিকা; জাপানের বিরুদ্ধে পালটা-আক্রমণ। [১৪৮—২৫৮]

অষ্টম পর্ব

জনগণের প্রতিরোধ : বন্দীশালার বর্বরতা

[জানুয়ারী, ১৯৪৪—ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫]

নেতাজী সুভাষের মুক্তিসংগ্রাম, আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরব কাহিনী; অধিকৃত ইউরোপে পার্টিজান যুদ্ধ; জনগণের ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা; বন্দীশালার বর্বরতা, অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী; পশ্চিম থেকে জার্মানী অভিমুখে—আর্দেনেস অঞ্চলে স্ফীতিমুখের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ; মাল্টা বৈঠকের বৈশিষ্ট্য : ইঙ্গ-মার্কিন মতান্তর?—ইয়াল্টার ঐতিহাসিক সম্মেলন; শান্তির সন্ধানে জাপান। [২৫৯—৩৫০]

নবম পর্ব

নাৎসী জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

[মে, ১৯৪৫]

ইঙ্গ-মার্কিন বিতর্কে বার্লিন; পশ্চিম দিক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন কানাডীয় বাহিনীর জার্মানীর অভ্যন্তরে অভিযান; পূর্ব দিক থেকে লালফৌজের ওডের নদীতীর হতে বার্লিন অভিমুখে অভিযান; বার্লিন দখল এবং রণনীতি ও রণকৌশল নিয়ে মন্টগোমারী ও আইজেনহাওয়ারের মধ্যে মতভেদ; রুশদের আগে বার্লিন দখলের জন্য চার্চিলের সামরিক কুটনীতি; কিন্তু রুজভেল্ট ও মার্কিন পক্ষের অনিচ্ছা; কেন বার্লিন ইঙ্গ-মার্কিন দখলে গেল না; দক্ষিণ জার্মানীতে শেষ আত্মরক্ষার দুর্গ সম্পর্কে গুজব; প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যু; বার্লিন দখলের অভিযানে লালফৌজ; স্তালিনের সামরিক কুটকৌশল; মিত্র বাহিনী কর্তৃক জার্মানী উত্তরে ও দক্ষিণে দ্বিখণ্ডিত; টোরগাউতে রুশ-মার্কিন বাহিনীর মিলন; ভূগর্ভের অন্তিম আশ্রয়ে হিটলার; সেনাপতিদের ব্যর্থতায় হিটলারের ক্রোধ; যবনিকা পড়ার আগে ভূগর্ভের বাঙ্কারে নাটকের-পর-নাটক; গোয়েরিং ও হিমলার কর্তৃক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা, পরাজিত জার্মানীকে ফুরার শ্মশান করিতে চাহিয়াছিলেন; গোয়েরিং হিমলার পদচ্যুত; মুসোলিনীর চরম দণ্ড; উপপত্নীসহ পার্টিজানদের হাতে ধৃত ও নিহত, মিলান শহরে মুসোলিনী ও তাঁর উপপত্নীর মৃতদেহ নিয়ে বীভৎস দৃশ্য, বার্লিনের ভূগর্ভে উন্মত্ত তাণ্ডব; হিটলার ও ইভা ব্রাউনের আত্মহত্যা; গোয়েবেলসের সপরিবারে আত্মহত্যা, আত্মহত্যার আগে ফুরার কর্তৃক শেষ উইল সম্পাদন ও উত্তরাধিকারী মনোনয়ন, হিটলার-ইভা আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত; লালফৌজের দখলে বার্লিন; রাইখস্ট্যাগে সোভিয়েত জয়-পতাকা উত্তোলন; বার্লিনে রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু উচ্ছৃংখলতার অভিযোগ; বার্লিন যুদ্ধে জুকোভ, কোনিয়েভ প্রভৃতির কৃতিত্ব; সোভিয়েত ও পশ্চিমী মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ; স্ট্যালিনের নেতৃত্ব ও জুকোভের সৈন্যাপত্য; দলিল স্বাক্ষরের দৃশ্য; ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান; ইউনাইটেড নেশন্স-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা; স্যান ফ্রান্সিস্কোর সম্মেলন; সম্মেলনে সোভিয়েত বিরোধী কুটনৈতিক চাল। [৩৫১—৪৬৪]

দশম পর্ব

জাপানের আত্মসমর্পণ এ্যাটম্ বোমার আবির্ভাব

[মহাযুদ্ধের অবসান—আগস্ট, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫]

মিত্রশক্তিবর্গের মত-বিরোধ সম্পর্কে হপকিন্সের মস্কো যাত্রা, ১৯৪৫ সালে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংকট; রুশদের হাতে যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা ২৫ লক্ষ; ইউরোপীয় কুটনীতির পটভূমিকায় পটসডাম সম্মেলন; তিন শীর্ষ নেতার

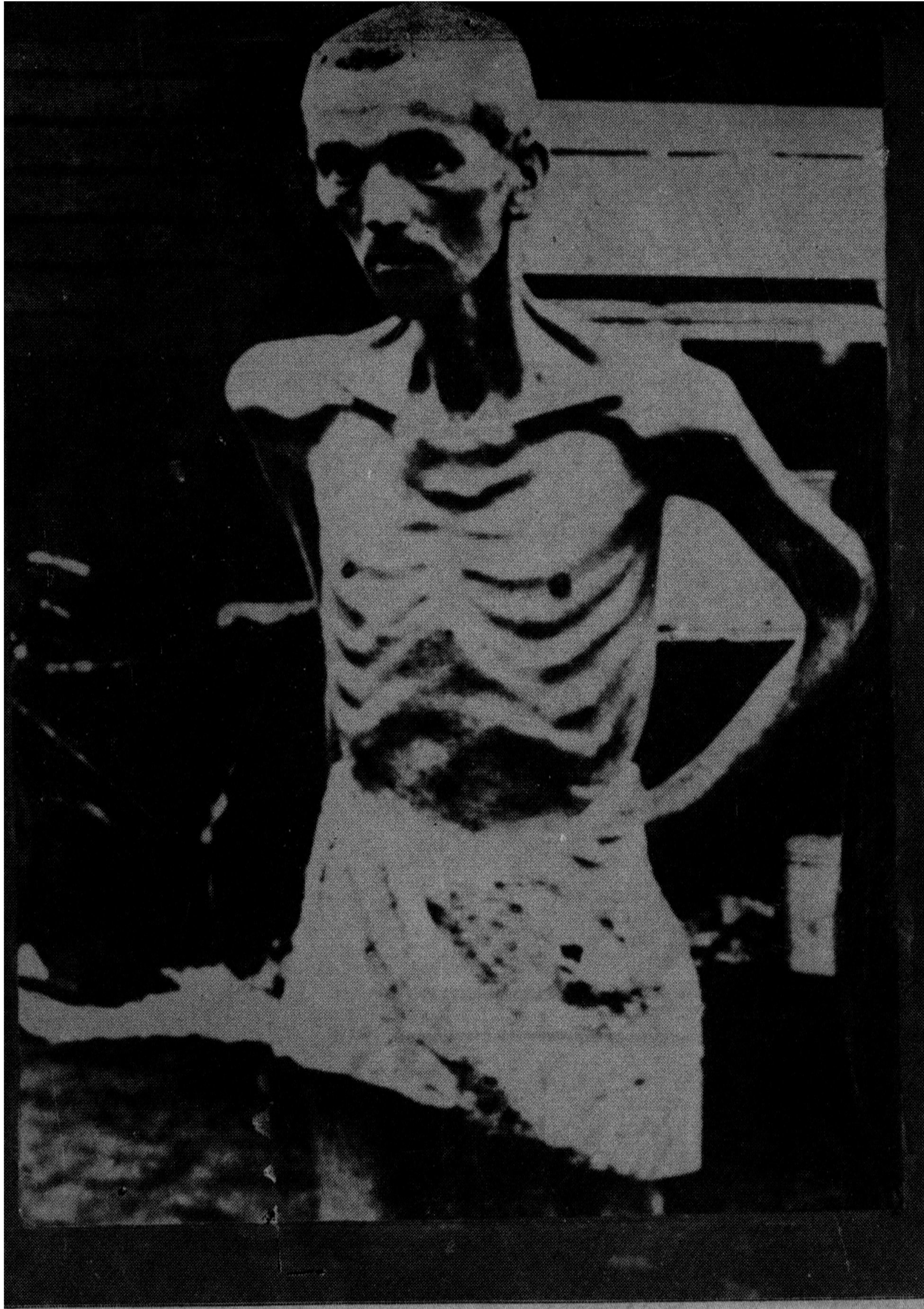
অজস্র সমস্যা নিয়ে আলোচনা—সবচেয়ে দীর্ঘ সম্মেলন ; জার্মানীতে চতুঃশক্তির দখলদারিতে আনয়ন ; জার্মানীর খণ্ডন রহস্য ও ক্ষতিপূরণের দাবী ; নূতন পোল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠা ; নাৎসীবাদ উচ্ছেদের সংকল্প ; এ্যাটম্ বোমার পটভূমিকায় পটসডাম সম্মেলন ; জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রায় রাশিয়ার সহযোগিতা আর অত্যাবশ্যক নয় ; রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারমাণবিক কূটনীতি ; স্ট্যালিনের কাছ থেকে এ্যাটম্ বোমা আবিষ্কারের খবর গোপন ; চার্চিল-ট্রুম্যানের আনন্দ ; পতনের মুখে জাপান ; দ্বীপ-থেকে-দ্বীপান্তরে দুরন্ত মার্কিন অভিযান, ওকিনাওয়া ইত্যাদি দখল ; খাস জাপানী দ্বীপে মার্কিন বিমান হানা ; অভূতপূর্ব গোপনীয়তার মধ্যে অ্যাটম্ বোমার নির্মাণ ; প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ভয়ংকর দৃশ্য ; 'আকাশে সহস্র সূর্যের উদয়'—বোমার জনক ওপেনহাইমার কর্তৃক গীতার শ্লোক আবৃত্তি ; ৬ই আগস্ট হিরোশিমায় প্রথম পারমাণবিক বোমা বর্ষণ ; দ্বিতীয় বোমা বর্ষণ নাগাশাকিতে ; এ্যাটম্ বোমার বর্বরতায় সারা পৃথিবী স্তম্ভিত ; রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ; মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী বাহিনীর বিদ্যুৎগতি পরাজয় ; রাশিয়া কর্তৃক এ্যাটম্ বোমার খবর গোড়ার দিকে গোপন ; চীন ও জাপান সম্পর্কে স্তালিনের কূটনীতি ; জাপানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিনের চরম পত্র ; চরম পত্রের জবাবে ভাষাগত বিভ্রান্তি, জাপ সম্রাটের মর্যাদার প্রশ্ন ; আত্মসমর্পণে জাপানের সম্মতি ; ক্রুদ্ধ তরুণ সেনানীদের জাপ সম্রাটকে গ্রেপ্তারের ষড়যন্ত্র ; মার্কিন যুদ্ধজাহাজে জাপানের আত্ম-সমর্পণের দলিল স্বাক্ষর ; জেনারেল ম্যাক-আর্থারের নেতৃত্ব ; জাপানে আত্মহত্যার হিড়িক ; জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদে আমেরিকায় উল্লাস দৃশ্য ; খাস জাপানে নারীদের উপর বলাৎকার ; ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ; কয়েক জন বাঘা বাঘা নেতার প্রাণদণ্ড ; দূর-প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ; জাস্টিস্ রাধাবিনোদ পালের ভিন্ন রায় ; মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারী বিবৃতি ; উপসংহার—হতাহতের তালিকা ও অন্যান্য তথ্য—পারমাণবিক অস্ত্র-বৃদ্ধির পরিণাম ভয়ংকর ; আর যুদ্ধ চাই না। [৪৬৫—৬২৬]

মহাযুদ্ধের দিনপঞ্জী—পৃঃ ৬২৭-৬৩৮

নির্দেশিকা বা ইনডেক্স—পৃঃ ৬৩৯-৬৪২



সব শেষ······মৃত প্রিয়জনের দেহের উপর আছড়ে পড়েছে তারই আপনজন



হিটলারের নির্মম কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে জীবন্ত কঙ্কাল



ফ্যাসিবাদের শিকার ঃ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এই অসহায় শিশু



n the name of the people of the
United States of America,
I present this scroll to the
City of Stalingrad
to commemorate our admiration for
its gallant defenders whose courage,
fortitude, and devotion during the siege
of September 13, 1942 to January 31, 1943
will inspire forever the hearts of all
free people. Their glorious victory
stemmed the tide of invasion and
marked the turning point in the
war of the Allied Nations against
the forces of aggression.

May 17th 1944

Washington, D.C.

স্তালিনগ্রার্ড বিজয়ের পর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের অভিনন্দন



উপরে ঃ আলোচনারত চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্তালিন
নিচে ঃ ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে আমেরিকা ও সোভিয়েত সৈন্যের মিলন



ফ্যাসিবাদ পরাজিত ঃ জনগণের আদালতে ঝুলছে মৃত মুসোলিনীর দেহ



১৯৪৫ সালের মে মাসে বার্লিনে উঠছে বিজয়ের পতাকা



যুদ্ধ শেষ ঃ এবার ঘরে ফেরা............

ষষ্ঠ পর্ব

কোয়ালিশনের রাজনীতি ও রণনীতি

প্রথম অধ্যায়

স্ট্যালিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া :

অক্ষশক্তিবর্গের মধ্যে হতাশা ও ভীতি

স্ট্যালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধে জার্মানীর শোচনীয় পরাজয়ের ফলে একদিকে মিত্রশক্তিবর্গের মনে যেমন মহাযুদ্ধে জয়লাভের আশা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, অন্যদিকে তেমনি অক্ষশক্তিবর্গের মধ্যে হতাশা, সন্দেহ এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস দেখা দিল। ১৯৪২-৪৩ সালের শীতকালীন যুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভের পর ১৯৪৩ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন অভিযানগুলিতে লালফৌজের ক্রমাগত অগ্রগতি ফ্যাসিস্ট মহলে নিদারুণ আশংকা বিস্তার করিল। কেবল স্ট্যালিনগ্রাদে ও দক্ষিণ রাশিয়ায় সোভিয়েটের গৌরব-মণ্ডিত জয়গুলি নয়, সেই সঙ্গে এল আলামিনে, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার 'টচ" অভিযানে, কিংবা ত্রিপোলি ও টিউনেসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিনের হাতে ইতালীয়-জার্মান বাহিনীর পরপর পরাজয়গুলি অক্ষশক্তিবর্গের নৈতিক শক্তিকে ক্রমাগত ভাঙনের মুখে আনিয়া ফেলিতেছিল। স্ট্যালিনগ্রাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য হিটলার ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে যে দুর্ধর্ষ চেষ্টাই করিয়া থাকুন না কেন, তাঁর কপালে আর জয়লাভের রক্তিতিলক জুটিল না—পর পর দুর্ভাগ্যের আঘাত জার্মানীতে, ইতালীতে এবং হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড ইত্যাদি তাঁবেদার দেশগুলির জনগণের উপরেও গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। এমন কি, বিভিন্ন দেশের ফ্যাসিস্ট শাসনচক্র দস্তুরমত বিচলিত বোধ করিতে লাগিল। কেননা, হিটলারী জার্মানীর যে 'অপরাজেয়' সামরিক শক্তির উপর ভরসা রাখিয়া নাৎসী দলভুক্ত তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি মহাযুদ্ধের আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, সেই সামরিক শক্তি ভল্গা নদীর তীরে প্রচণ্ড আঘাতে পযুর্দস্ত হইয়া গেল—এই দৃশ্য দেখার পর তাঁবেদারদের মনে ভরসা জাগিবে কিরূপে ? সমগ্র ফ্যাসিস্ট মহলেই সংকট দেখা দিলো এবং এই সঙ্কটের অন্যতম প্রমাণ এই যে, জার্মানী ক্রমশঃ সারা পৃথিবীতে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পর হইতে নাৎসী জার্মানী নূতন কোন মিত্র লাভ করিতে পারে নাই। একটি মাত্র সমরসঙ্গীও তার নূতন করিয়া জোটে নাই, বরং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক হইতে জার্মানী ক্রমশঃ পিছনে পড়িয়া যাইতেছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে জার্মানীর কুটনৈতিক সম্পর্কের চিত্রটা বিচার করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে জার্মানী কতটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। যেমন বলা যাইতে পারে যে, ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে (পশ্চিম রণাঙ্গনে জয়লাভের পর) জার্মানীর সঙ্গে ৪০-টিরও বেশী রাষ্ট্রের কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। আর ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে সেই সম্পর্ক হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইল মাত্র ২১ টি রাষ্ট্রের সঙ্গে।[১]

এই ২১ টি রাজ্যের মধ্যেও কতকগুলি ছিল বিজিত রাজ্য মাত্র। যেমন—ডেনমার্ক, ক্রোশিয়া, সার্ভিয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ নাৎসী জার্মানী 'বর্বর বলশেভিক'দের দমন করিতে গিয়া আন্তর্জাতিক জগতে যতটা সমর্থন, সাহায্য ও সহযোগিতা পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, সোভিয়েট-জার্মান সংগ্রাম চলাকালে দেখা গেল হিটলারী আশা তেমন পূর্ণ হওয়ার নয়। বরং স্ট্যালিনগ্রাদ ও উত্তর আফ্রিকায় পরাজয়ের পর ফ্যাসিস্ট রাজ্যগুলিতে সংকট দেখা দিতে লাগিল এবং এই সংকট সবচেয়ে বেশী দেখা দিল অক্ষশক্তিবর্গের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই মিত্রের মধ্যে—জার্মানী ও ইতালীর মধ্যে। নাৎসী প্রচারকার্যের ফলে হিটলার ও মুসোলিনী যতই হরিহরাত্মা বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকুক না কেন, কার্যতঃ উভয়ের মধ্যে মনের মিল ও বিশ্বাস তেমন গভীর ছিল না। রণাঙ্গনে জার্মানীর দুর্ভাগ্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস আরও টাল খাইতে শুরু করিল এবং ১৯৪২-৪৩-এর শীতাভিযানে লালফৌজের ক্রমাগত সাফল্যের পর ইতালী ও জার্মানীর সম্পর্কের উপর সবচেয়ে বেশী আঘাত পড়িল। আফ্রিকাতে এবং ইউরোপের পূর্ব রণাঙ্গনে ইতালীয় সৈন্যবাহিনীর বিপর্যয় এই সম্পর্ককেও আরও বিষাইয়া তুলিল। জার্মানীর নিকট ইতালীর সামরিক সাহায্য পাওয়ার দাবী আরও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশ্য স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ইতালীয় সেনানীমণ্ডলীর প্রধান মার্শাল ক্যাভালেরো রোমস্থিত জার্মান মিলিটারি মিশনের প্রধান জেনারেল রিন্টেলেনকে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বলিয়াছিলেন যে, জার্মান সৈন্যবাহিনীর হাই কমাণ্ডের উচিত ১৯৪৩ সালের জন্য এমন সামরিক পরিকল্পনা রচনা করা যাতে ইতালীয় সৈন্যবাহিনীর উপর অর্পিত সুনির্দিষ্ট সামরিক দায়িত্বগুলি তারা পালন করিবার উদ্দেশ্যে যথোচিতভাবে প্রস্তুত হইতে পারে। এই প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ইতালীয় ডিভিসনের জন্য আরও প্রচুর পরিমাণ সরবরাহ ও সামরিক অস্ত্রসজ্জা। সেই সময় ইতালীর ছিল মোট ২০টি লড়িয়ে ডিভিসন—এর মধ্যে ৯টি ছিল রাশিয়াতে এবং ১১টি আফ্রিকাতে। কিন্তু এই ডিভিসনগুলির রণসজ্জা আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী ছিল না।

১৯৪২-৪৩-এর শীতকালে সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনে ইতালীয় সৈন্যবাহিনী যে প্রচণ্ড মার খাইয়াছিল, ইতালী সেই ক্ষতি কখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। ইতালীয় সেনানীমণ্ডলীর প্রাক্তন প্রধান মার্শাল বাদোগোলিও তাঁর স্মৃতিকথায় স্বীকার করিয়াছেন যে, সোভিয়েট পালটা অভিযান যখন জার্মান, রুমানীয় ও ইতালীয় অবস্থানকে গ্রাস করিল, তখন তিন-চতুর্থাংশ ইতালীয় বাহিনী নষ্ট হইয়া গেল।[১]

কেবল যে সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষতি হইল এমন নয়, জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ সুযোগ পাইলেই ইতালীয়দিগকে অবজ্ঞা করিতেন, উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য ও গোলাগুলি ছাড়াই ইতালীয়দিগকে রণাঙ্গনের সবচেয়ে বিপদজনক অংশে পাঠাইয়া দিতেন। "শীতকালীন অভিযানে পরাজয়ের পর জার্মানরা নিজেদের পশ্চাদপসরণের পথ সুগম রাখার জন্য আমাদের সমস্ত যানবাহন ধৃত করিল এবং ইতালীয় সৈন্যদিগকে অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া গেল।"—একথা লিখিয়াছেন মার্শাল বাদোগোলিও তাঁর স্মৃতি-

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৬৭।

পুস্তকে। ফলে, ইতালীয় জনগণ দিন দিন জার্মানদের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। ইতালীয় সৈন্যদের প্রতি জার্মান কমাণ্ডের বৈষম্যমূলক ব্যবহার এবং ইতালীয় সৈন্যদের অসন্তোষ এত বাড়িয়া যাইতে লাগিল যে, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং মুসোলিনীকে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে হইল। ১৯৪৩ সালের প্রথমভাগে তিনি বার্লিনের ইতালীয় সামরিক প্রতিনিধিকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনি কাইটেলের সঙ্গে দেখা করুন এবং এই সন্ধিক্ষণে আমার নাম করিয়া সাহায্য লাভের জন্য অনুরোধ করুন—যে সাহায্যের কথা বারবার আমাদের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। তাঁকে বলুন যদি কমরেড-শিপ কথাটার এখনও কোন মানে থাকে, তবে, যেন তার ন্যূনতম প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই।"[১]

ঊর্ধ্বতন জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট এই আবেদন পাঠাইবার প্রস্তাব থেকেই অনুভূত হইবে ইতালী সামরিক দিক থেকে কিরূপ বেকায়দায় পড়িয়াছিল। অবশ্য বেকায়দায় না-পড়িয়াও তার উপায় ছিল না। কারণ পর পর কেবল পরাজয়ই তার অদৃষ্টে জুটিতেছিল। ১৯৪২ সালের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় মিত্রশক্তি-বর্গের অগ্রগতি এবং ভূমধ্যসাগরের উপর ইতালীয় কর্তৃত্বের অবসান সমগ্র ইতালী ও দক্ষিণ ইউরোপের পক্ষে যে বিপদের সংকেত বহন করিয়া আনিতেছিল, মুসোলিনী এবং তাঁর সেনাপতিদের সেইটুকু বুঝিবার মত মস্তিষ্ক ছিল। ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকায় শক্তি হারাইবার ফলে ইতালীর খাস অভ্যন্তরের জনগণের মধ্যেও পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ বাড়িয়া যাইতেছিল। জনগণ যুদ্ধের যন্ত্রণায় জীবন অতিষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে লাগিল এবং শান্তির জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। অপরদিকে ইতালীর কমিউনিস্ট ও ফ্যাসীবিরোধীগণ যাঁরা এতদিন অপরিসীম নির্যাতন ও বিপদ সত্ত্বেও আত্মগোপন করিয়া লড়াই চালাইয়া যাইতেছিলেন, তাঁরা প্রবলতর উদ্যমে প্রতিরোধ ও গেরিলা যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে। ফলে, জনগণের চিত্তে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আরও বিতৃষ্ণা জাগিতে লাগিল। তারা প্রকাশ্যে হাটে-বাজারে-দোকানে, রাস্তায়-ট্রামে-বাসে—সর্বত্র শান্তির স্বপক্ষে সোচ্চার হইয়া উঠিল এবং মুসোলিনীর মুণ্ডপাত করিতে লাগিল।

বার্লিনের ইতালীয় রাষ্ট্রদূত ডিনো আলফিয়েরি লিখিয়াছেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের ফলে ইতালীয় নেতারা যুদ্ধজয়ের আশা ত্যাগ করিলেন। ইতালী ও জার্মানীর মধ্যে সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটিল স্ট্যালিনগ্রাদে পরাজয়ের জন্য। এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইতালীর ভাগ্যেরও নিয়ামক ছিল স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ।[২]

ইতালী যে অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছিল তা থেকে তার ত্রাণ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। তথাপি মুসোলিনী-চক্র একটা ত্রাণের পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিল। তারা মনে করিল ইতালীকে যদি বাঁচিতে হয়, তবে সমগ্র নাৎসী কোয়ালিশনের শক্তিকে ভূমধ্যসাগরে সমবেত করিতে হইবে। কিন্তু নাৎসী কোয়ালিশনের সশস্ত্র শক্তির অধিকাংশই পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়োজিত। সুতরাং পূর্ব রণাঙ্গন থেকে আগে আলগা হওয়া দরকার। কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব? এজন্য ইতালীয় কূটনীতিকগণ

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৬৭।
২। পূর্বোধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৬৮।

একটা মতলব স্থির করিলেন। তাঁরা চিন্তা করিলেন প্রথমেই পূর্ব রণাঙ্গনে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একটা পৃথক সন্ধি স্বাক্ষর করিতে হইবে। তারপর সমস্ত ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে ভূমধ্যসাগরের রণাঙ্গনে সমাবেশ করিতে হইবে এবং এভাবে এ অঞ্চলে সামরিক শক্তির যে ভারসাম্য সৃষ্টি হইবে, সেই সুযোগে পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি-বর্গের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসা যাইবে। অবশ্য এই বোঝাপড়ার ভিত্তি হইবে পৃথিবীর নতুন ভাগবাঁটোয়ারা।

ইতালীর এই কূটনৈতিক পরিকল্পনা লইয়া মুসোলিনী প্রথমেই কথা বলিলেন রোমস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূত ফন্ ম্যাকেনসনের সঙ্গে ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে—যখন দেখা গেল যে, স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ ক্রমশঃ জার্মানদের প্রতিকূলে যাইতেছে। তিনি ম্যাকেনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা আপনাকে জানাইতে চাই—যতশীঘ্র সম্ভব রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের একটা পৃথক সন্ধি স্বাক্ষর করিতে হইবে, আর ফ্রান্সের সমস্যাও মিটাইয়া ফেলিতে হইবে। অন্যথা ভবিষ্যতে আমাদের যুদ্ধ চালনার পক্ষে অত্যধিক অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।"

নভেম্বরের গোড়ায় ফন্ ম্যাকেনসনের সঙ্গে এই কথা বলার পর মুসোলিনী আবার নভেম্বরের শেষে যখন স্ট্যালিনগ্রাদে লালফৌজের পালটা আক্রমণ তুঙ্গে উঠিয়াছিল, তখন তিনি খোদ গোয়েরিংয়ের সঙ্গে কথা বলিলেন এবং তাঁর সংশয়ের কথা প্রকাশ করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, একটা পৃথক সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে হইবে এবং রাশিয়াকে মধ্য এশিয়ায় ভূমিগত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, আর অক্ষশক্তিবর্গের এমন একটা আত্মরক্ষার প্রাচীর বা লাইন গড়িয়া তোলা হইবে যেখানে শত্রুপক্ষ কোনো আঁচড় কাটিতে পারিবে না।

শেষ পর্যন্ত ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্ট চিয়ানো সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক শান্তিসন্ধি স্বাক্ষরের সম্ভাবনার কথা খোদ হিটলারের সঙ্গে সরকারীভাবে উত্থাপন করিলেন। অবশ্য বিষয়টি এত গুরুতর ছিল যে, গোড়াতে দুই ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরের মধ্যেই সাক্ষাতের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া অনেক টালবাহানার পর যখন দুই শীর্ষ নেতার সাক্ষাতের আয়োজন পাকা হইল, তখন শেষ মুহূর্তে হিটলার জানাইলেন যে, তিনি মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম। কেননা, তখন সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়া শুনিল যে, স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান-বাহিনী লালফৌজের হাতে বেষ্ঠিত হইয়াছে। কথা ছিল স্যালজবুর্গের ক্লেসহাইম প্রাসাদে—যেখানে সচরাচর পারস্পরিক সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, সেখানে এবারও বৈঠক হইবে। কিন্তু স্যালজবুর্গ বাতিল হইয়া গেল, পরিবর্তে কাউন্ট চিয়ানোকে আহবান করা হইল পূর্ব প্রুশিয়াতে হিটলারের সদর দপ্তরে। বলা বাহুল্য যে, চিয়ানো বিরক্ত হইলেন এবং র‍্যাস্তেনবুর্গে হিটলারের সদর দপ্তরের দিকে যাত্রাপথে চিয়ানো তাঁর দলবলের নিকট হিটলার, রিবেনট্রপ ও অন্যান্য নাৎসীনেতাদের উদ্দেশ্যে বাছাবাছা বিশেষণ প্রয়োগ করিলেন, যেমন—'অপদার্থ' 'বেকুব' 'ক্রিমিন্যাল' ইত্যাদি।[১]

১৮ই থেকে ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪২, র‍্যাস্তেনবুর্গে হিটলার ও চিয়ানোর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিল। হিটলার যথারীতি নিজেই একা দীর্ঘ সময় ধরিয়া তাঁর বক্তব্য বলিয়া

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৬৯।

যাইতে লাগিলেন। আন্তর্জাতিক ও বিশ্ব পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করিলেন এবং অক্ষশক্তিবর্গের কার্যকলাপের একটি চিত্র দিলেন। সোভিয়েট রণাঙ্গন সম্পর্কে যদিও গর্ব করার মত কিছু ছিল না, তবুও চিয়ানোকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে হিটলার বলিলেন যে, সোভিয়েট পালটা-আক্রমণ প্রতিরোধ করা হইয়াছে, যে সমস্ত জায়গায় ব্যূহভঙ্গ হইয়াছে সেগুলি আবার জোড়া দেওয়া হইবে। তবে হ্যাঁ, ডিফিক্যালটি বা অসুবিধাও কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু তার বড় কারণ জার্মানীর মিত্রবাহিনীগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের বা কো অর্ডিনেশনের অভাব। অর্থাৎ জার্মানবাহিনীর নিজস্ব কোন ত্রুটির জন্য স্ট্যালিনগ্রাদে এই অবস্থার উদ্ভব হয় নাই, এর জন্য দায়ী জার্মানীর মিত্রবাহিনীগুলি বা ইতালীয় রুমানীয় সৈন্যদল। তবে, যে পালটা সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, তাতে স্ট্যালিনগ্রাদের দুর্বিপাক রোধ করা যাইবে।

কিন্তু হিটলারের এই আশ্বাস বাক্যে ইতালীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী চিয়ানো ভরসা পাইলেন না। তাঁর মনে এই সমস্ত বাক্য কোন রেখাপাত করিল না। তিনি মুসোলিনীর পক্ষ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের প্রস্তাব তুলিলেন এবং "ব্রেস্ট-লিটোভস্ক শান্তিসন্ধির" দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেন।[১]

হিটলারের সঙ্গে আলোচনায় কাউন্ট চিয়ানো কর্তৃক ব্রেস্ট-লিটোভস্ক শান্তিসন্ধির কথা উল্লেখ করা খুব তাৎপর্যব্যঞ্জক। কেননা, ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েট বিপ্লব সত্ত্বেও পূর্ব-ইউরোপে যুদ্ধ চলিতেছিল। এবং এই যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য মহামতি লেনিন অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে জার্মানীর সঙ্গে পৃথক শান্তিসন্ধি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, যে সন্ধি ঘোরতর বিতর্কের বিষয় হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের "সেন্ট্রাল পাওয়াস" বা মধ্য-ইউরোপীয় শক্তিবর্গ (জার্মানী, অস্ট্রো-হাঙ্গেরী, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া) কর্তৃক কার্যত উক্রাইন ও রাশিয়ার বলসেভিক গভর্নমেণ্টদ্বয়ের সঙ্গে দুইটি পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই সন্ধির ফলে রাশিয়াকে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি বরণ করিতে হইয়াছিল এবং সন্ধিটি পুরাপুরি জার্মানীর অনুকূলে ছিল। এই সন্ধির ফলে উক্রাইন ও ফিনল্যাণ্ড আলাদা স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। বাল্টিক সমুদ্র অঞ্চলের এস্থোনিয়া ও লিভোনিয়া জার্মানীকে দেওয়া হইয়াছিল, বাটুম তুরস্ককে এবং লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ড জার্মানীর দখলে চলিয়া গেল। অধিকন্তু রাশিয়া তিনশ' মিলিয়ন স্বর্ণ-রুবল (৩ কোটি পাউণ্ড) ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জার্মানীর পরাজয় ও মধ্য-ইউরোপীয় শক্তিবর্গের পতনের ফলে ব্রেস্ট-লিটোভস্ক শান্তিসন্ধিও স্বভাবতই বাতিল হইয়া গেল।

কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের সংকটের দিনে ডিসেম্বর মাসে কাউন্ট চিয়ানো কর্তৃক হিটলারের নিকট রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক শান্তিসন্ধি স্বাক্ষরের নাম করিয়া ১৯১৮ সালের সেই 'বিখ্যাত' ব্রেস্ট-লিটোভস্ক শান্তিসন্ধির উল্লেখ করা অত্যন্ত কৌতুহলের বিষয় ছিল। কেননা, এই ক্ষেত্রে দায়টা রাশিয়ার ছিল না, ছিল জার্মানীর এবং ইতালীর। অবশ্য এই ধরনের সন্ধি স্বাক্ষর করা কঠিন ছিল, এই কথা চিয়ানো বুঝিয়াছিলেন এবং এই জন্যই তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট রণাঙ্গনে অক্ষশক্তিবর্গ কর্তৃক এমন একটা অবস্থান বা পজিশন দখল করিতে হইবে, যেন তারা (অক্ষশক্তিবর্গ)

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৭০।

স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে বৃহৎ সংখ্যক সৈন্যদল অপসারণ করিতে পারেন।

চিয়ানো আরও প্রস্তাব করিলেন যে, রাশিয়ার সহিত রাজনৈতিক মীমাংসায় জাপানকে আমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং রাশিয়ার ভূমিগত বিস্তৃতি লাভের জন্য তাকে মধ্য এশিয়ার দিকে ঠেলিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু চিয়ানোর মারফৎ মুসোলিনীর এই সমস্ত উত্তম উত্তম প্রস্তাবে হিটলারের মন গলিল না। তিনি বলিলেন যে, ঘটনার এমন পরিণতিতে তিনি বিশ্বাস করেন না, রাশিয়া এই ধরনের প্রস্তাবে রাজী হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। ১৯৪০-৪১ সালে রাশিয়াকে মধ্য এশিয়ার দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার জন্য তিনি যত চেষ্টা করিয়াছিলেন সেগুলি সবই ব্যর্থ হইয়াছে। তা ছাড়া এই ধরনের মীমাংসা অক্ষশক্তিবর্গের নিজস্ব স্বার্থেরও বিরোধী। কারণ, সোভিয়েট রাশিয়াতে তারা এই পর্যন্ত যে সমস্ত ভূমি দখল করিয়াছে, সেগুলি কাঁচামাল সরবরাহের দিক থেকে অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী। কিন্তু রাশিয়ার সহিত এখন শান্তিসন্ধি স্বাক্ষর করিতে গেলে এই সমস্ত কাঁচামালের উৎস অনেকখানি হাতছাড়া হইয়া যাইবে। আর তা ছাড়া মুসোলিনীর প্রস্তাব মতো পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে বৃহৎ সংখ্যক সৈন্যবাহিনী স্থানান্তর করাও যাইবে না, অধিকন্তু অক্ষশক্তিবর্গ একটা প্রকাণ্ড নৈতিক আঘাত পাইবে। হিটলার আরও বলিলেন—'যদি পূর্বদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একটা রাজনৈতিক মীমাংসাও করা যায়, তথাপি পশ্চিমদিকে জার্মানীর পক্ষে কর্মতৎপর হওয়া কঠিন। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত রুশ সৈন্যবাহিনীর অস্তিত্ব বজায় থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জার্মানী পূর্ব-রণাঙ্গন থেকে তার সৈন্য বাহিনী অপসারণ করিতে পারে না।

হিটলার-চিয়ানো বৈঠকের উপসংহারে হিটলার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন যে, পূর্বখণ্ডের সমস্যাকে একমাত্র সামরিক দিক দিয়াই বিচার করিতে হইবে। রাশিয়ার সহিত বোঝা-পড়ার দ্বারা এই সমস্যা মীমাংসার সময় এখনও আসে নাই। এই বোঝা-পড়ার আগে যদি রুশবাহিনীকে ধ্বংস না-করা যায়, তবে এই ধরনের চুক্তির দ্বারা সামরিক পরিস্থিতির কোন মীমাংসা হইবে না। এক কথায় হিটলার তার ইতালীয় মিত্রের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

এই প্রস্তাব যে কেবল অগ্রাহ্য হইল, এমন নয়। স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে (ডিসেম্বর মাস) তখন জার্মানী বিপদে পড়িয়াছিল। সোভিয়েটবাহিনী তখন দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন ও ভরোনেজ এলাকায় ডন নদীর মধ্যভাগে ইতালীয় ও রুমানীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড প্রত্যাক্রমণ গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং ইতালীয় ও রুমানীয় সৈন্যরা বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল। অক্ষশক্তিবর্গের রণাঙ্গন ভাঙিয়া পড়িতেছিল এবং জার্মানীকে ফ্রান্স ও অন্যান্য রণাঙ্গন থেকে তাড়াহুড়া করিয়া সৈন্য আমদানী করিতে হইতেছিল। এই সমস্ত কারণে জার্মান সমর-কর্তৃপক্ষ তাদের পরাজয়ের জন্য ইতালী ও রুমানিয়াকে দোষারোপ করিতেছিলেন। হিটলারের সদর দপ্তরে অবস্থানকালে চিয়ানো তাঁর ডায়েরীতে এই সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন—'প্রকাশ্যেই আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপান হইতেছিল।'[১]

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে হিটলারের সদর দপ্তরে জার্মানী ও ইতালীর মধ্যে যে

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৭০-৭১।

সমস্ত কথাবার্তা হইয়াছিল, তাতে বোঝা গেল যে, ইতালীর পরামর্শ অনুসারে জার্মানী সোভিয়েট-জার্মান রণাঙ্গনে ক্ষান্তি দিতে রাজী ছিল না। মীমাংসায়ও সম্মত ছিল না। এমন কি, নাৎসী নেতা ইতালীয় মিত্রকে উপযুক্ত সামরিক সাহায্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। এর কারণ কি ?—এর কারণ এই যে, হিটলার ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গনকে প্রথম শ্রেণীর রণক্ষেত্ররূপে বিবেচনা করিতেন না, ওটাকে দ্বিতীয় সারির যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়াই মনে করিতেন। অধিকন্তু ইতালীর যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে হিটলারের সন্দেহ ছিল এবং ইতালী আদৌ যুদ্ধ চালাইতে পারিবে কিনা সে বিষয়েও নাৎসী নেতাদের সংশয় ছিল। এই সমস্ত সন্দেহ ও সংশয়ের বিশেষ কারণ এই ছিল যে, জার্মান সামরিক মহলে এই মর্মে খবর পৌঁছিতেছিল যে, ইতালী ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের জন্য গোপন কথাবার্তা চলিতেছে। ১৯৪২, ৭ই নভেম্বর, জার্মান সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা এ্যাডমিরাল ক্যানারিস নাৎসী-সামরিক নেতাদের নিকট খবর দিলেন যে, লিসবনে ইতালীয় রাষ্ট্রদূত ও মিলিটারী এ্যাটাশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের গোপন কথাবার্তা চলিতেছে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিয়ানোকে যথারীতি সরকারীভাবে এই সমস্ত কথাবার্তার বিষয় জানানো হইতেছে !

স্পেনে ও পর্তুগালে ইতালীয়নারা পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের বিষয়ে পশ্চিমী কূটনীতিকদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ চালাইতেছেন—এই কথা টের পাইয়া জার্মান গোয়েন্দা বিভাগ এই সমস্ত দেশের ইতালীয়দিগকে ছায়ার মতো অনুসরণ করিতে লাগিল এবং জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ অধিকৃত ফ্রান্সের সামরিক কর্তাদের উদ্দেশ্যে এই মর্মে নির্দেশ পাঠাইলেন যে, অধিকৃত ফ্রান্স থেকে স্পেনের গমনেচ্ছু কোন ইতালীয়কে যেন পররাষ্ট্রদপ্তরের অনুমতি ছাড়া ছাড়পত্র দেওয়া না হয়।

জার্মানী ও ইতালীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের আবহাওয়া ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল। এই সময়ে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কাউণ্ট চিয়ানো রোমে প্রত্যাবর্তন করিয়া মুসোলিনীর নিকট এই সাক্ষাতের ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট দিলেন। কিন্তু তিনি মুসোলিনীকে তাগাদা দিলেন যাতে হিটলারকে বুঝাইয়া শুনাইয়া রুশ-জার্মান সংগ্রামের একটা মীমাংসা ঘটানো যায়। অন্যদিকে বুখারেস্ট এবং বুদাপেস্ট হইতে ইতালীয় পররাষ্ট্র দপ্তরে এই মর্মে গোপন সংবাদ আসিতেছিল যে, রুমানীয় ও হাঙ্গেরীয় নেতাদের পক্ষ হইতেও ব্রিটিশ ও মার্কিনদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। কারণ, বুদাপেস্ট ও বুখারেস্টের শাসনকর্তৃপক্ষও যুদ্ধজয় সম্পর্কে নৈরাশ্য বোধ করিতেছেন এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসিতে চাহিতেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী চিয়ানো মুসোলিনীকে বুদাপেস্ট ও বুখারেস্টের এই পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার অনুরোধ জানাইলেন।

কিন্তু মুসোলিনীর এই সমস্ত প্রস্তাব মনঃপূত হইতেছিল না। পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানীর যুদ্ধজয় সম্পর্কে মুসোলিনীরও ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়াছিল এবং ইতালীর নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বেগ জাগিয়াছিল বটে, কিন্তু সেটা এত প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়া পরাজয় মানিতে মুসোলিনী প্রস্তুত ছিলেন না। অপর পক্ষে মুসোলিনীর মনোভাবে ও কার্যকলাপের কাউণ্ট চিয়ানোও ছিলেন ঘোরতর অসন্তুষ্ট। এমন কি, ইতালীর উচ্চতম সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশাসন মহলে মুসোলিনীর বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে যে চক্রান্ত চলিতেছিল লিবিয়াতে ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকাতে ইতালীর শোচনীয়

পরাজয়ের পর সেই চক্রান্ত আরো গভীর ও বিস্তৃত হইতে লাগিল। মুসোলিনীও অনুভব করিতেছিলেন যে, তাঁর চারদিকে একদল অসন্তুষ্ট সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা রহিয়াছেন, যাদের সঙ্গে তাঁর আর চলা সম্ভব নয়। তাঁর জামাতা স্বয়ং চিয়ানো এই অসন্তুষ্ট চক্রীদলের অন্যতম নেতা বলিয়া মুসোলিনীর সন্দেহ হইল। অতএব এই অসন্তুষ্ট চক্রীদলকে উচ্ছেদের জন্য মুসোলিনীর ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩, তাঁর গোটা মন্ত্রিসভাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

সোজা কথায় জামাতা চিয়ানো তাঁর শ্বশুর মুসোলিনী কর্তৃক পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ থেকে অপসৃত হইলেন—তাঁকে একটা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পদে ভ্যাটিকানের রাষ্ট্রদূত পদে নিয়োগ করা হইল। চিয়ানো কিন্তু তাঁর ডায়েরীতে এই নিয়োগ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুসোলিনী তাঁর মন্ত্রিসভার পরিবর্তন নিয়া খুব বিব্রত বোধ করিতেছিলেন এবং তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বদলে অন্য কয়েকটি পদে নিয়োগের প্রস্তাব করা হইলে তিনি (চিয়ানো) নিজেই ভ্যাটিকানের ইতালীয় দূতের পদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য সেই সময় রোমের রাজনৈতিক মহলে এই পরিবর্তন নিয়া যে সমস্ত জল্পনা-কল্পনা হইয়াছিল, তার একটা ছিল এই যে, এই পরিবর্তনের ফলে মুসোলিনীর বিরুদ্ধবাদীরা আরও শক্তিশালী হইবে এবং ভ্যাটিকানে বসিয়া কাউণ্ট চিয়ানো আরও বেশী ঘোঁট পাকাইবার সুযোগ পাইবে।

আফ্রিকার পরাজয়ের গ্লানি থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং সমস্ত দোষ উচ্চতম সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর চাপাইবার জন্য মুসোলিনী ইতালীয় সেনানীমণ্ডলীর প্রধান মার্শাল ক্যাভালেরোকে পদচ্যুত করিলেন এবং তাঁর স্থানে জেনারেল আমব্রোসিওকে নিয়োগ করিলেন। উচ্চতম মহলে এই সমস্ত অদল-বদলকে মুসোলিনী 'change of guard' বা 'প্রহরী বদল' আখ্যা দিলেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নিজ হাতে রাখিলেন। ইতালীয় সামরিক ও রাজনৈতিক সংকটের ছায়ায় তিনি এভাবে নিশ্চিন্ত হইতে চাহিলেন।···

কিন্তু রোমের এই প্রহরী বদলের পালা বার্লিনে কিছুটা উদ্বেগের ও অস্বস্তির সৃষ্টি করিল। কেননা, পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ যেমন হিটলারের 'আপনজন' ছিলেন, কাউণ্ট চিয়ানোও তেমনি মুসোলিনির নিকটতম সম্পর্কের লোক অর্থাৎ জামাতা ছিলেন। বরং রিবেনট্রপের তুলনায় চিয়ানোর পরিচিতি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। রিবেনট্রপ ব্যক্তিগতভাবে কোন বিশিষ্ট গুণের অধিকারী ছিলেন না, ছিলেন মদের ব্যবসায়ী। নাৎসীদলে যোগ দিয়া হিটলারের একান্ত বশংবদ ভৃত্যে পরিণত হন এবং হিটলার ক্ষমতা লাভের পর আগেকার বহু পদস্থ ব্যক্তিকে বিদায় দিয়া নাৎসী দলভুক্ত একান্ত আপন জনদের বড় বড় পদে বসাইয়া দেন—রিবেনট্রপের ভাগ্যোদয় সেই পথেই। ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে তিনি ছিলের ব্রিটেনের জার্মান রাষ্ট্রদূত, আর ১৯৩৮ সালের জানুয়ারীতে তিনি নাৎসী জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইলেন। চিয়ানোও অনুরূপভাবেই ভাগ্যের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন বটে, তবে তিনি উচ্চমধ্যবিত্ত সমৃদ্ধিশালী পরিবারের সন্তান ছিলেন। লেখাপড়ায় তিনি খুব মেধাবী ছিলেন, সাংবাদিকতায় খুব ঝোঁক ছিল এবং ফরেন সার্ভিসের পরীক্ষা দিয়া কুটনৈতিক চাকরিতে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁর ভগ্নীর মারফৎ মুসোলিনীর কন্যা এড্ডা মুসোলিনীর (যিনি কাফেতে, রেস্টুরেণ্টে ফুর্তিবাজ মহিলারূপে পরিচিতা

ছিলেন) সঙ্গে তাঁর পরিচয় হইয়াছিল ১৯২৯ সালে এবং পরের বছর তিনি মুসোলিনীর কন্যার পাণিপীড়ন করেন। আর তারপর থেকেই চিয়ানো ইতালীর রাজনৈতিক আকাশে নক্ষত্রের মতো উদিত হইলেন। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে ১৯৩৬ সালের জুন মাসে চিয়ানো ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইলেন—যে পদটি স্বয়ং তাঁর শ্বশুর অলংকৃত করিয়াছিলেন। সুতরাং মুসোলিনী-জামাতার হঠাৎ এই পদচ্যুতিতে স্বভাবতই বার্লিনে নানা জিজ্ঞাসার উদ্রেক করিল—বিশেষতঃ গোটা মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের ফলে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হইল।

অতএব ফেব্রুয়ারী মাসে জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ রোমে আসিলেন ফ্যাসিস্ট নায়কদের সঙ্গে আলোচনা জন্য এবং হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাতের পটভূমিকা রচনার জন্য। কিন্তু রোমে আসিবার আগে রিবেনট্রপকে বারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে যদি রাজনৈতিক মীমাংসার কোন প্রস্তাব ওঠে, তবে যেন বিরোধিতা করা হয়। জার্মানীর উচ্চতম মহলে বাহ্যতঃ অবশ্য আপোস মীমাংসার বিরুদ্ধ মনোভাব দেখানো হইতেছিল এবং প্রকাশ্যে হিটলারের বিরোধিতায় কেউ সাহসীও ছিলেন না। তবু বার্লিনের রাজনৈতিক ও সামরিক মহলে ভিতরে ভিতরে পৃথক সন্ধি সম্পর্কে কানাঘুষা চলিতেছিল। অন্ততঃ ইতালীয়রা সেই ধরনের রিপোর্ট রোমে বসিয়া পাইতেছিলেন। এমন কি, স্বয়ং রিবেনট্রপ যতই বিশ্বস্ত অনুচররূপে তোতাপাখির মতো হিটলারী বুলি আওড়াইয়া থাকুন না কেন, তাঁরও মনের তলায় রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের কথা উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের সময় তাঁর লিখিত স্মৃতি-পুস্তকে এই তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের শেষে যে দুঃখের দিনগুলি শুরু হইয়াছিল, তখন একদিন হিটলারের সঙ্গে আমার এমন একটা কথাবার্তা হইয়াছিল যাতে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট বোঝা গিয়াছিল। ঐদিন এবং তারপর একটি স্মারকলিপিতে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম মস্কোর সঙ্গে শান্তিসন্ধি বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু সেই স্মারকলিপিটির শোচনীয় পরিণাম ঘটে। হিটলার ওটিকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন এবং তিনি শান্তির ধারকাছ দিয়াও গেলেন না, তবুও আমি আরেকবার কথা প্রসঙ্গে হিটলারের নিকট শান্তি প্রস্তাবের বিষয়টি তুলিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন যে, আগে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত সামরিক জয়লাভ করা দরকার, তারপর শান্তির কথা ভাবা যাইতে পারে। তাঁর মতে শান্তির জন্য এভাবে টোপ ফেলা দুর্বলতার লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একজনের মারফৎ আমি স্টকহোমে মাদাম কলোনতের (Madame Kollontay) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু উপযুক্ত ক্ষমতার অভাবে আমি এই বিষয়ে আর অগ্রসর হইতে পারি নাই"।[১]

ইতালীর সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্যাস্টিয়ানিনিও বলিয়াছেন যে, রোমে রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার সময় তিনিও পৃথক সন্ধি স্বাক্ষর করা সম্পর্কে রিবেনট্রপকে বাজাইয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, রিবেনট্রপ নিজে মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং তিনি (ব্যাস্টিয়ানিনি) নিজে ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের

১। The Brutal friendship—F. W. Derakin, Penguin Book, P. 237.

সঙ্গে যোগাযোগ করিতে চেষ্টা করিবেন। রিবেনট্রপ কিন্তু তাঁর এই সমস্ত প্রস্তাব সরাসরি উড়াইয়া দেন নাই।…

ইতালীর আভ্যন্তরিক পরিবর্তনের সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়াই রিবেনট্রপ রোমে আসিয়াছিলেন সরেজমিনে তদন্তের জন্য। তবে, মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার পর রিবেনট্রপ অনুভব করিলেন যে, উদ্বেগের তেমন কারণ নাই। অক্ষশক্তিবর্গের প্রতি বিশ্বস্ততা সম্পর্কে মুসোলিনী তাঁকে নিশ্চয়তা দান করিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, নাৎসী জার্মানীর প্রতি তাঁর অনুরক্তি কিছুতেই টলিবে না। অবশ্য আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল পূর্ব রণাঙ্গন। সেই সম্পর্কে রিবেনট্রপ যথারীতি তাঁর প্রভুর কণ্ঠস্বরের পুনরাবৃত্তি করিয়া স্ট্যালিনগ্রাদের পরাজয়ের গুরুত্ব যথাসম্ভব কম করিয়া দেখাইলেন এবং বুঝাইতে চাহিলেন যে, এর ফলাফল একদিক দিয়া চূড়ান্ত হইয়াছে এই অর্থে যে, অক্ষশক্তিবর্গ এর বদলা স্বরূপ একটা চূড়ান্ত পালটা আক্রমণ ঘটাইতে যাইতেছে। সুতরাং এর পর থেকে জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'টোট্যাল্ ওয়ার' বা 'সর্বাত্মক যুদ্ধ' সংগঠন করিবে এবং তার ফলাফল দুই বা আড়াই মাসের মধ্যে টের পাওয়া যাইবে। রিবেনট্রপ আরো ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সীমাহীন প্রান্তরে আক্রমণ ছড়াইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য হিটলারের নাই—তাঁর রণক্রিয়ার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ। উক্রাইন জয় করিয়া উহাকে দখলে রাখাই হিটলারের উদ্দেশ্য ; উক্রাইনের শস্য সম্পদ ও খাদ্য যুদ্ধের প্রয়োজনে জার্মানীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। হিটলার এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই উক্রাইন জয় করিতে চান, গোটা সোভিয়েট দেশ উনি দখল করিতে চান না। কিন্তু এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সোভিয়েট রাশিয়াকে একটা চূড়ান্ত পরাজয়ের আঘাত হানা প্রয়োজন এবং এই আঘাত হানার জন্যই নাৎসী ব্লকের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের একযোগে চরম প্রচেষ্টার দরকার।

রিবেনট্রপ কেবল পূর্ব রণাঙ্গনের অবস্থা এবং জার্মানীর উদ্দেশ্য নিয়াই মুসোলিনীকে জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা করিলেন না, বলকান রাজ্যগুলির অবস্থা নিয়াও আলোচনা করিলেন। যুগোশ্লাভিয়া প্রমুখ বলকান রাজ্যগুলিতে পার্টিজান্ যোদ্ধাদের কার্যকলাপ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং জার্মানরা এই সমস্ত অঞ্চলে হিমসিম খাইতেছিল। এই গেরিলা উৎপাত দমনের জন্য ইতালীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় একত্রে যুগ্ম প্রচেষ্টার দরকার, ব্যাপক রণক্রিয়ার প্রয়োজন—অন্ততঃ রিবেনট্রপ মুসোলিনী ও ইতালীয় সহযোগিদিগকে এই কথাই বোঝাইতে চাহিলেন। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনার পর রিবেনট্রপ অনুভব করিলেন যে, বলকান রাজ্যে গেরিলা উৎপাত দমনের জন্য তেমন কোন গরজ ইতালীয় সমর কর্তৃপক্ষের নাই। তার বদলে ইতালীর আসল লক্ষ্য সমস্ত সামরিক শক্তি আফ্রিকায় সমাবেশ করা। কারণ, মুসোলিনীর মতে টিউনিশিয়া হইতেছে দক্ষিণ ইউরোপের দুর্গস্বরূপ।[১]

হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে যে সমস্ত গোপন পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছিল (১৯৪৬ সালে প্যারিসে প্রকাশিত) সেইগুলির মধ্যে ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে হিটলারের নিকট লিখিত দুইটি পত্রে মুসোলিনীর অনুরূপ মনোভাব দেখা যায়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী মুসোলিনীর নিকট এক বার্তায় হিটলার জানাইয়াছিলেন যে, পূর্ব-

১। Diplomacy of Aggression—P. 272-73.

রণাঙ্গনে রাশিয়াকে খতম করার দায়িত্ব তাঁর নিকট 'দৈব-নির্দিষ্টের মতো', এই ব্রত বা মিশন তাঁকে উদ্‌যাপন করিতেই হইবে। সুতরাং 'তাঁর মিত্রবর্গ তাঁকে সাহায্য করুন আর নাই করুন', তিনি পূর্ব-রণাঙ্গনে এই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে কৃত-সংকল্প।

এর জবাবে ৯ই মার্চের চিঠিতে মুসোলিনী হিটলারকে লিখিয়াছিলেন যে, ফুয়রার অত্যন্ত বেশী বিপদের ঝুঁকি নিতেছেন। পশ্চিম দিকে মিত্রপক্ষের কর্ম তৎপরতা ও উৎপাত দিন দিন যে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, সেইদিকে তাকাইয়া মুসোলিনী হিটলারকে পূর্ব-রণাঙ্গনে আর নতুন আক্রমণে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উৎসাহ দিতে চান না। তার বদলে তিনি (মুসোলিনী) বরং চান 'যে কোন ভাবেই হোক রাশিয়াকে নিরপেক্ষ করিতে হইবে।' মুসোলিনীর মতে টিউনিসিয়ায় অক্ষশক্তিবর্গের অবস্থান রক্ষা করা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী প্রয়োজনের মত। কেননা, যদি টিউনিসিয়া হাতছাড়া হইয়া যায়, তবে মিত্রশক্তি দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবি পূরণের জন্য নিশ্চয়ই ইতালীর বিরুদ্ধে সামরিক রণক্রিয়া শুরু করিয়া দিবে। এই জন্য ইতালীর বিমানশক্তি বৃদ্ধিরও প্রয়োজন।

২৫শে মার্চ ইতালীর ডিক্টেটর নাৎসী ডিক্টেটরকে আর একখানা পত্র দিলেন এবং সেই পত্রেও তিনি পূর্ব রণাঙ্গনের কথা উল্লেখ করিলেন। তিনি খোলাখুলি ভাবেই লিখিলেন যে, রাশিয়ার অধ্যায় এখন অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে :

"I think that the Russian chapter must now be closed : if it is possible, and I believe it is, we must end it with the signing of a separate peace, or if nothing comes of that, creating a defensive system, a formidable Eastern wall, which Russia will never be able to surmount···Taking into account the vastness which is her greatest advantage, we cannot wipe Russia off the face of earth. Her territory is so large that it cannot be either conquered or held".

এর মর্ম এই যে, মুসোলিনীর মতে হিটলারের উচিত এখন রাশিয়ার অধ্যায় চুকাইয়া ফেলা। সম্ভব হইলে (এবং মুসোলিনীর মতে এটা সম্ভব) একটি পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের দ্বারা এটা শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। আর পৃথক সন্ধি যদি নাও হয়, তবে পূর্বদিকে এক বিশাল আত্মরক্ষার প্রাচীর গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সেই প্রাচীর এত দুর্ভেদ্য হইবে যে, রুশেরা উহা কখনও অতিক্রম করিতে পারিবে না। রাশিয়ার বিশাল ভূমি হইতেছে উহার সবচেয়ে বড় সুবিধা, এত বিশাল দেশকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে কখনও মুছিয়া ফেলা সম্ভব নয়। এই বিশালায়তন দেশকে জয় করাও সম্ভব নয়, দখলে রাখাও সম্ভব নয়।[১]

এই গোপনীয় চিঠির আর এক জায়গায় মুসোলিনী এমন কথাও হিটলারকে লিখিয়াছিলেন যে, জাপানও যদি হস্তক্ষেপ করে, যদিও তার সম্ভাবনা নাই, তবুও রাশিয়াকে সংহার করা যাইবে না তার বিশাল দূরত্বের জন্য।[২]

আংকারাস্থিত (তুরস্ক) কোন কোন জার্মান ডিপ্লোমাটও মনে করিতেন যে, জার্মানীর পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ায় কোন 'সামরিক মীমাংসায়' পৌঁছানো অসম্ভব।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তকে হিটলার মুসোলিনীর গোপন পত্রের উদ্ধৃতি। পৃষ্ঠা ২৭৩।
২। The Brutal friendship, P. 279.

* * *

স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান বাহিনীর পতনের পর অক্ষশক্তিবর্গ মহলে কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল, যদিও যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সেই চিত্র এতটা পরিষ্কাররূপে জানার উপায় ছিল না, তবু এইটুকু বোঝা গিয়াছিল যে, ইতালী ও মুসোলিনীর অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয় পরাজয়ের পর ফ্যাসিস্ট-কবলিত সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে পরাজয়ের মনোভাব ছড়াইয়া পড়ে এবং হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ইত্যাদি বলকান রাজ্যগুলিও চঞ্চল হইয়া উঠে। বিশেষভাবে জার্মানী ও ইতালীর সম্পর্কের উপরেই আঘাতটা যেন সবচেয়ে বেশী প্রচণ্ড হইয়াছিল এবং মুসোলিনী পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়ার জন্য একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেননা, ভূমধ্যসাগর ও উত্তর আফ্রিকা কার্যত হাতছাড়া অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। ফলে খাস ইতালীর ভূমিখণ্ডের বিপদ আসন্ন হইয়া উঠিল। এই জন্য বার্লিনে ও রোমে জার্মান ইতালীয়ান কূটনীতিকদের আনাগোনা ও শলাপরামর্শ চলিতে লাগিল। রিবেনট্রপ, গোয়েরিং এবং ফন ম্যাকেনসন প্রভৃতি জার্মান নায়কগণ মুসোলিনীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন এবং মুসোলিনী প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনাতেই পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিলেন। রোমে এই সমস্ত আলোচনার ফলে জার্মান-ইতালীয় নেতৃবৃন্দ অনুভব করিলেন যে, একেবারে উচ্চতম পর্যায়ে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়া দরকার এবং যদি পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা কেউ হিটলারকে বোঝাইতে পারেন, তবে, তার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি হইতেছেন মুসোলিনী। মুসোলিনী ও হিটলারের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং তিনি ছাড়া আর কে এমন গুরুতর প্রস্তাব হিটলারের কাছে উত্থাপন করিতে পারেন? অতএব হিটলার-মুসোলিনী শীর্ষ বৈঠকের আয়োজন হইল।

* * *

১৯৪৩ সালের ৭ই থেকে ১০ই এপ্রিল অস্ট্রিয়ার স্যালজবুর্গে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে যে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কেননা, এই বৈঠকই ছিল ইতালীয়-জার্মান সম্পর্কের মধ্যে গভীর বিচ্ছেদের এবং মুসোলিনীর পতনের সুনির্দিষ্ট প্রাক্ ভূমিকার মতো। অক্ষশক্তিবর্গের পরাজয়ের নিশ্চিত সূচনাও এই সময় থেকে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।...

জনৈক গ্রন্থকার মন্তব্য করিয়াছেন—On the afternoon of 6 April Mussolini left Rome for Salzburg by 'the last special train of the real Duce.'......[১]

অর্থাৎ ৬ই এপ্রিল অপরাহ্নে মুসোলিনী ইতালীর 'প্রকৃত অধিনায়ক হিসাবে' তাঁর 'শেষ স্পেশাল ট্রেনে' স্যালজবুর্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ডুচের শেষ স্পেশাল ট্রেন! হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের আড়ালে ভাগ্যদেবতার যে বক্রহাসি ইতালীর জন্য অপেক্ষমান ছিল ভাগ্যক্রমে মুসোলিনীর তখন সে কথা জানা ছিল না। কিন্তু উত্তরদিকে এই যাত্রাপথে মুসোলিনীর পেটের ব্যথা লাগিয়াই ছিল—এই তীব্র পেটের ব্যথা তাঁর শুরু হইয়াছিল উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে ভাগ্যবিপর্যয়ের পর থেকে।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৮৯।

স্নায়বিক দুর্বলতা থেকেই এই রোগের উৎপত্তি বলিয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ধারণা। পরদিন দুই ডিক্টেটার যখন স্যালজবুর্গে পৌঁছিলেন তাঁদের সামরিক ও কূটনৈতিক দলবলসহ তখন যথারীতি অভ্যর্থনার ধুমধাক্কা হইল বটে, কিন্তু যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা দুই শীর্ষ নেতার চেহারা দেখিয়া চমকাইয়া গেলেন। দুই জনের চেহারাই ফ্যাকাশে ছিল, হিটলারের চোখে মুখে ছিল অবসন্নতা, তাঁর চোখ দুইটি কোটরে বসিয়া গিয়াছিল এবং মুসোলিনীর দেহে যেন কোন শক্তি অবশিষ্ট ছিল না—এই মন্তব্য করিয়াছেন স্বয়ং মুসোলিনীর ডাক্তার। এটাই কি স্যালজবুর্গের সাক্ষাতের অশুভ লক্ষণ ছিল?···

এক বছর আগে স্যালজবুর্গের যে ক্লেসহাইম প্রাসাদে ফ্যাসিস্ট নেতাদের বৈঠক হইয়াছিল, সেই প্রাসাদ কক্ষেই আবার হিটলার ও মুসোলিনী একত্র হইলেন।

হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে মুসোলিনী তাঁর সহকর্মী ও সহচরদের নিকট বড়াই করিয়া বলিলেন যে, তিনি মনে মনে যে সংকল্প করিয়াছেন, হিটলারের কাছ থেকে তা আদায় করিয়া ছাড়িবেনই। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল যে, হিটলারের মুখোমুখি হইতেই তিনি সেই মনোবল ও দৃঢ়তা হারাইয়া ফেলিলেন। অক্ষশক্তিবর্গের সম্পর্কের শেষ বছরগুলিতে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে এই অবস্থাই দেখা গিয়াছে। হিটলারের সামনে মুসোলিনীর যেন সাহস যোগাইত না। পূর্ব পূর্ব বারের মত এবারও তাই ঘটিল। অথচ মুসোলিনী তাঁর আত্মস্মৃতিতে এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লিখিয়াছেন :

"আমি হিটলারকে রাশিয়ার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলাম। এমন কি, উক্রাইনসহ তিনি রাশিয়াতে যা-কিছু দখল করিয়াছেন, সমস্ত ফিরাইয়া দিয়া মীমাংসা করার কথা বলিয়াছিলাম। আমি তাঁকে বলিয়াছিলাম যে, ১৯৪২ সালের জুন মাস থেকে আমরা উদ্যোগ (initiative) হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম এবং যে জাতি উদ্যোগ হারাইয়া ফেলে সেই জাতি যুদ্ধেও হারিয়া যায়।"

"স্যালজবুর্গে আমি তাঁকে বলিলাম আমরা আর আফ্রিকায় ফিরিয়া যাইতে পারিব না। ইতালীয় দ্বীপগুলি আক্রান্ত হইবে। একটিমাত্র শেষ আশা আছে এবং তা হইতেছে রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা এবং আপনার সমস্ত শক্তি ভূমধ্যসাগরে সমাবেশ করা। আপনি আমাকে সাহায্য দিতে পারেন না; আপনি সাহায্য দিতে অনিচ্ছুক বলিয়া পারেন না, তা নয়। আসলে রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা না-করা পর্যন্ত আপনি আমাকে সাহায্য দিতে অক্ষম।"[১]

কিন্তু স্যালজবুর্গের বৈঠকে মুসোলিনীর এই মনোভাবের কোন সমর্থন হিটলারের কাছ থেকে পাওয়া গেল না।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। যদিও মুসোলিনী এবং ইতালীর কূটনৈতিক ও সামরিক নেতাদের অধিকাংশই রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের দ্বারা পূর্ব-রণাঙ্গনের যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিতে খুব উৎসুক ছিলেন, কিন্তু রাশিয়ার দিক থেকে এ বিষয়ে কোন সাড়া-শব্দ ছিল না। স্ট্যালিন ও স্ট্যালিনের রাশিয়া শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে এবং ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গকে পরাজিত করিতে

১। Diplomacy of Aggression পুস্তকে ১৯৪৯ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত মুসোলিনীর আত্মজীবনী (১৯৪২-৪৩) থেকে উদ্ধৃত। পৃষ্ঠা ২৭৪।

দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন—কোন আপোস মীমাংসা বা পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের কোন প্রশ্নই তাঁদের পক্ষে ছিল না। আপোস মীমাংসার কোন মনোভাব বা ইঙ্গিত অন্তত রাশিয়ার কাছ থেকে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের গরজটা একান্তরূপে ফ্যাসিস্ট মহল থেকেই দেখা যাইতেছিল। এমন কি জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপও এই মনোভাবই পোষণ করিতেন যে, জার্মানীর পক্ষ থেকে কোন সন্ধিশর্ত রাশিয়ার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

হিটলার মুসোলিনীর পরামর্শ কেবল অগ্রাহ্য করিলেন না, পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন আক্রমণ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তাব করিলেন যে, ফ্যাসিস্টদের সমস্ত যুদ্ধ আয়োজন রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। এ জন্য সমস্ত ইউরোপীয় শক্তিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করা দরকার। 'রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সংহতি' সৃষ্টির পরিকল্পনায় হিটলারের মনে মনে ইংল্যান্ডের কথাও ছিল। অর্থাৎ তিনি এমন আশা পোষণ করিতেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডেরও মনে মনে অনুরূপ আকাঙ্খাই আছে।

রাশিয়ার সহিত 'রাজনৈতিক মীমাংসার' প্রস্তাবের জবাবে হিটলার মুসোলিনীকে সাফ জানাইয়া দিলেন যে, খুব নিকট ভবিষ্যতেই তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে এমন চূড়ান্ত আঘাত হানিবেন যে, রাশিয়া ধরাশায়ী হইবে! হিটলারের এই ঘোষণার পর মুসোলিনীর মুখে আর কোন বাক্য উচ্চারিত হইল না। মীমাংসার শান্তি প্রস্তাবও আর তিনি তুলিতে সাহস পাইলেন না।[১]

স্যালজবুর্গের ক্লেসহাইম প্রাসাদের বৈঠকে কেবল সামরিক বা রাশিয়ার সহিত পৃথক শান্তিসন্ধি স্বাক্ষরের কথাই ওঠে নাই, কুটনীতির দিক থেকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলের কথা উঠিয়াছিল। এই দলিলের উদ্ভব হইয়াছিল ইতালীর পররাষ্ট্রদপ্তরের মস্তিষ্ক হইতে কিংবা মূলত সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্যাস্টিয়ানিনির মাথা থেকে—(পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে কাউন্ট চিয়ানোর অপসারণের পর স্বয়ং মুসোলিনীর হাতে পররাষ্ট্র দপ্তর ছিল)। ইতালীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষজ্ঞগণ ও ব্যাস্টিয়ানিনি বিস্তর গবেষণার পর স্থির করিলেন যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিনের অতলান্তিক সনদ বা আটলান্টিক চার্টারের জবাবে ইউরোপীয়ান চার্টার বা ইউরোপীয় সনদ ঘোষণা করিতে হইবে। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে চার্চিল-রুজভেল্ট একত্রে যে অতলান্তিক সনদ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাতেই মিত্রপক্ষের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতকগুলি ভাল ভাল কথা ছিল। ইতালীয় সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্যাস্টিয়ানিনির মতে 'এই চার্টারের দ্বারা শত্রুপক্ষ পৃথিবীর চোখে ধূলা দিতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং এর পালটা জবাবে ইউরোপীয়ান চার্টার ঘোষণা করা দরকার যাতে রাজনৈতিকভাবে অক্ষশক্তিবর্গের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, জার্মানী ও ইতালী যে যুদ্ধ চালাইতেছে, তাহা বৈপ্লবিক।'

এই 'বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য' ঘোষণা করা দরকার ইউরোপীয় বিজিত জাতিগুলিকে আশ্বস্ত করার জন্য। অক্ষশক্তিবর্গের হাতে তাদের স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব যে বিপন্ন নয়, এ কথা বুঝান দরকার। ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ যে কোয়ালিশন সৃষ্টি করিয়াছে এবং সেই কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে ঘোষিত সনদের বিরুদ্ধে অক্ষশক্তিবর্গের জোটের পক্ষ

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৭৫।

থেকেও একটি পালটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার প্রয়োজন আছে—স্যালজবুর্গ বৈঠকে ইতালীয় কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ একথা বুঝাইতে চাহিলেন।

'There should be a joint pronouncement on the right of small nations and the principie of nationalities directed to the occupied territories in Western Europe, in the East, in the Balkans to the satilite allies and to Vichy France—a European Charter as opposed to an Atlantic Charter.[১]

সোজা কথায় পশ্চিম ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ ও বলকান অঞ্চলের দখলীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির এবং তাঁবেদার মিত্রপক্ষের ও ভিসি ফ্রান্সের অধিকার ও অধিজাতি-গুলির নীতি সংক্রান্ত একটি সম্মিলিত ঘোষণা কিংবা অতলান্তিক সনদের পালটা একটি ইউরোপীয় সদন ঘোষণা করিতে হইবে।

এই সময় ব্যাস্টিয়ানিনির পরামর্শে মুসোলিনীর ধারণা হইয়াছিল যে, যদি ইউরোপীয় জাতি অধিজাতি ও ক্ষুদ্রজাতিগুলির অধিকার ও নীতি সম্পর্কে একটি নতুন রাজনৈতিক পরিকল্পনার ঘোষণা দেওয়া যায়, তাহলে তিনি ইউরোপীয় অক্ষ-শক্তিবর্গ ও নিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে একত্রে সমাবেশ করিতে এবং ক্যাসারাঙ্কা থেকে চার্চিল-রুজভেল্ট যে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবি জানাইয়াছেন, তার একটা উপযুক্ত জবাব দিতে পারিবেন। এমন কি, রুশ রণাঙ্গনে জার্মানীর সহিত একত্রে প্রতিরক্ষার রণনীতি অবলম্বন করিয়া এবং ফ্রাঙ্কোর স্পেনকে নিজেদের দলে টানিয়া ভূমধ্যসাগরের রাজনৈতিক ও সামরিক ভারসাম্য সৃষ্টি করিতে পারিবেন। এর ফলে যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইবে, তার সুযোগ নিয়া যুদ্ধের আপোস মীমাংসার জন্য রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেনের সঙ্গে আলোচনা চালাইবার নতুন ভিত্তি পাওয়া যাইবে।

এই কূটনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে ইতালীয় সমর বিভাগের বড় কর্তারাও একমত হইলেন এবং তাঁরাও যুদ্ধের আপোস মীমাংসা চাহিতেছিলেন। কিন্তু ইতালীয় নেতারা উৎসাহী হইলে কি হইবে, জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ এই পরিকল্পনার উপর ঠাণ্ডা জল ছিটাইয়া দিলেন। রিবেনট্রপ বলিলেন, 'পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে আপোস মীমাংসার স্থান নাই।' জার্মানী অবশ্যই রাশিয়ার আরো জমি দখল করিতে চাহিতেছে না, কিন্তু তার সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করিতে চায়।

জনৈক ধৃত রুশ সেনাপতির প্রদত্ত সংখ্যাতত্ত্ব উল্লেখ করিয়া জার্মান মুখপাত্ররা বলিতে চাহিলেন যে, রাশিয়া এ পর্যন্ত এক কোটি তের লক্ষ লোক হারাইয়াছে। রাশিয়ার উনিশ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে সাতকোটি রহিয়াছে জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে, বাকি বারো কোটির মধ্যে এককোটি চল্লিশ লক্ষ ধ্বংস হইয়াছে। কোন দেশের সামরিক কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হইতেছে সেই দেশের জনসংখ্যার দশ শতাংশ। সুতরাং রাশিয়া এখনও বারো মিলিয়ন বা এক কোটি বিশ লক্ষ্য সৈন্য পাইতে পারে। কিন্তু এটা পাওয়া এত সোজা নয়। জার্মানীর পক্ষে এখন লক্ষ্য হইতেছে রাশিয়ার জনসংখ্যার বাকি তৃতীয়াংশ ধ্বংস করা। এটা করিতে পারিলেই পূর্ব রণাঙ্গন থেকে জার্মানী সৈন্য ও বিমানবহর সরাইয়া আনিবে পশ্চিমে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে।

১। The Brutal friendship—F.W.Deakin. P. 291.

"ইংল্যান্ড শান্তি ভিক্ষা না করিলে জার্মানী আগে থেকে কোন সন্ধি ইংল্যান্ডের কাছে চাহিবে না।"[১]

অতএব স্যালজবুর্গ বৈঠকের শীর্ষ সম্মেলনে মুসোলিনী তথা ইতালীর যুদ্ধ সংক্রান্ত আপোস মীমাংসার প্রস্তাব কিংবা ইউরোপীয় সনদ রচনার রাজনৈতিক প্রস্তাব হিটলার ও তাঁর অনুচরবর্গ বাতিল করিয়া দিলেন। শেষোক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে বলা হইল যে, এখন এই ধরনের কোন ইউরোপীয় সনদ ঘোষণা করার সময় আসে নাই, এখন ঘোষণা করা হইলে অক্ষশক্তিবর্গের প্রেস্টিজ নষ্ট হইবে। কারণ, লোকে মনে করিবে অক্ষশক্তিবর্গ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং হিটলার সোজাসুজি মুসোলিনীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। অধিকন্তু তাঁর ধারণা ছিল যে, রাশিয়া আর বেশী দিন যুদ্ধ চালাইতে পারিবে না।

এই সমস্ত আলোচনা উপলক্ষে এক সময় জাপানের (জাপানী রাষ্ট্রদূত ওসিমার) মধ্যস্থতার কথাও উঠিয়াছিল। অর্থাৎ রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে প্রয়োজন হইলে জাপান মধ্যস্থের ভূমিকা নিবে, এমন একটা প্রস্তাবেরও ইঙ্গিত করা হইয়াছিল এবং জাপানী সূত্র থেকে একথাও জানা যায় যে, মুসোলিনী স্যালজবুর্গ বৈঠকে হিটলারের নিকট সত্যসত্যই রাশিয়ার সহিত শত্রুতার অবসান ঘটাইবার জন্য প্রস্তাব দিয়াছিলেন। তবে সেই প্রস্তাব আমল পায় নাই।

স্যালজবুর্গ বৈঠকে ইতালী ও জার্মানীর মধ্যে যে সমস্ত সামরিক কথাবার্তা হইয়াছিল, সেগুলিও ফলপ্রসূ হয় নাই। ইতালী ও জার্মানীর মধ্যে একত্রে কোন যৌথ সামরিক পরিকল্পনা গড়িয়া তোলার ব্যাপারে কিংবা ইতালীয় সৈন্যবাহিনীকে আরো অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করার পক্ষে জার্মানীর কোন উৎসাহ ছিল না। এমন কি, ইতালীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ জার্মানীর নিকট জরুরী প্রয়োজন হিসাবে যে পাঁচশত বিমান চাহিয়াছিলেন, জার্মানী তাও দিতে রাজী হইল না। অজুহাতস্বরূপ জার্মানীর পক্ষ থেকে বলা হইল যে, এতগুলি প্লেন রাখার মতো বিমান-ময়দান ইতালীর নাই এবং ব্রিটিশ-পক্ষ বোমা মারিয়া এগুলি ধ্বংস করিয়া দিবে।

* * *

তিউনিসিয়ার যুদ্ধে আত্মরক্ষায় কিংবা দরকার মত পরবর্তীকালে ইতালীর স্বদেশ রক্ষায় কোন উপযুক্ত সামরিক সরবরাহ দিতে জার্মানী ইচ্ছুক ছিল না। ক্লেসহাইম প্রাসাদের বৈঠকে জার্মানীর এই মনোভাব যখন বোঝা গেল তখন কেবল একটিমাত্র বিষয়ে মুসোলিনীর প্রস্তাব কাজে লাগিয়াছিল এবং তাও ইতালীর আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্নে। মুসোলিনী হিটলারকে এই নিরাপত্তা বা সিকিরিউটি বিষয়ে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন এবং হিমলারও তাঁকে এস. এস. ডিভিসনের অনুকরণে একটি স্পেশাল মিলিশিয়া (এম. ডিভিসন) গঠনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। জরুরী অবস্থায় ফ্যাসিস্ট সরকারের এবং ব্যক্তিগতভাবে মুসোলিনীর নিরাপত্তা রক্ষায় এই বিশেষ মিলিশিয়া নিযুক্ত থাকিবে। একমাত্র এই একটি প্রশ্নেই স্যালজবুর্গ বৈঠকে সার্থক হইয়াছিল। আসলে ইতালী আদৌ টিকিয়া থাকিতে পারিবে কিনা, সেই বিষয়েই হিটলারের মনে সন্দেহ দেখা দিয়াছিল এবং এই জন্যই ইতালী বা মুসোলিনীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্নে বিশেষ ধরনের মিলিশিয়া গঠনের

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৯২-৯৫

প্রস্তাব হইয়াছিল। হিটলার যে ইতালীকে অধিকতর সামরিক সাহায্য দিতে ইচ্ছুক ছিল না, তারও অন্যতম কারণ এই যে, ইতালীর সামরিক শক্তির উপর হিটলারের বিশ্বাস ছিল না এবং ইতালীয় মন্ত্রী ও সেনাপতিবর্গের কিংবা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর উপরেও হিটলারের কোন আস্থা ছিল না।···

স্যালজবুর্গ বৈঠক শেষ হইয়া আসিল। ১০ই এপ্রিল, ১৯৪৩, সকালে যে উপসংহার বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল, তাতে অসুস্থ মুসোলিনী দুধ ও বিস্কুটযোগে প্রাতঃরাশ শেষ করার পর সামরিক পরিস্থিতি নিয়া আলোচনায় যোগ দিলেন। হিটলার মুসোলিনীকে খুশী করার জন্য বিদায় বেলার আশ্বাসবাণী শুনাইয়া গেলেন—

"ডুচে, আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আফ্রিকাকে রক্ষা করা হবে। সম্প্রতি আমি প্রথম মহাযুদ্ধের ভার্দুন দুর্গের অবরোধের বিখ্যাত ইতিহাস পড়েছি। সর্বোৎকৃষ্ট জার্মান সেনাদলের আক্রমণ ভার্দুন দুর্গরক্ষীরা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিল। সুতরাং অনুরূপভাবে আফ্রিকাতেও কেন সাফল্যের প্রতিরোধ গড়ে উঠবে না, তা আমি জানি না। ডুচে, আপনার সমর্থনে আমার সৈন্যেরা তিউনিসকে ভূমধ্যসাগরের ভার্দুন দুর্গে পরিণত করবে।"

[মুসোলিনীর প্রতি হিটলারী আশ্বাসের বোধ হয় এটাই ছিল শেষ বিদ্রূপ। কেননা, ভার্দুন হওয়া দূরের কথা ৮ই মে তিউনিস ও বিজার্টা ইঙ্গ-মার্কিনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।]

হিটলারের এই বিদায় বাণীর পরে দুই ডিকটেটর যখন ক্লেসহাইম প্রাসাদের প্রধান হলঘরের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিলেন, তখন যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা দুই ফ্যাসিস্ট নায়ককে দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। কেননা দুই জনেরই চেহারা এমন হইয়াছিল যে, একজন দর্শক মন্তব্য করিলেন—'এরা যেন দুটি ইনভ্যালিড বা পঙ্গু।' অপর একজন দর্শক সংশোধন করিয়া দিয়া বলিলেন—'না, এরা যেন দুটি মড়ার মত!'

স্ট্যালিনগ্রাদ ও আফ্রিকার যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজয়ের প্রতিক্রিয়ায় দুই ফ্যাসিস্ট ডিকটেটরের চেহারাই মড়ার মতো হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ এটা ছিল ইতিহাসেরই ইঙ্গিত।···

রোমে প্রত্যাবর্তনের পথে মুসোলিনীর পেটের ব্যথা আরো তীব্র হইল। কিন্তু ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া নতুন কোন উপসর্গ পাইলেন না। তখন মুসোলিনী মন্তব্য করিলেন—"আমার পেট ব্যথার একটা নাম আছে—কনভয়!"

[ভূমধ্যসাগরের জলপথে তখন একখানা ইতালীয় কনভয়ও পার হইতে পারিতেছিল না। ব্রিটিশ নৌ-আক্রমণে সেগুলি সব ডুবিয়া যাইতেছিল।]

স্যালজবুর্গ বৈঠকের ব্যর্থতা সম্পর্কে একমাত্র হিটলার ও মুসোলিনী ছাড়া আর কারোরই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু উভয় ডিক্টেটরই মনে করিলেন যে, বৈঠক বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। গোয়েবেলস্ তাঁর ডায়েরীতে মন্তব্য করিলেন—'ডুচে এখন পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর পক্ষে পরিত্রাণের আর কোন পথ নেই। আমাদের সঙ্গেই তাঁকে জয়লাভ করতে অথবা মরতে হবে।'[১]

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩০৬-৩০৭।

* * *

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে হিটলার-মুসোলিনীর শীর্ষ সম্মেলনে দেখা গেল ইতালী ও জার্মানীর মধ্যে গভীর ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছে। পরস্পরের উপর বিশ্বাস নাই এবং স্ট্যালিনগ্রাদ ও আফ্রিকার যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় অক্ষশক্তিবর্গের মনে ভয় ঢুকিয়াছে, জয় সম্পর্কে হতাশা দেখা দিয়াছে, জার্মানী ইতালীকে অধিকতর সামরিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত নয়। ভিতরে ভিতরে উভয়ের মনে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস বাড়িয়া গেল। যদিও বাহ্যত রোম-বার্লিন চক্র আগের মতই বজায় রহিল, কিন্তু পরস্পরের মনের মিল, মতের মিল এবং সামরিক রাজনৈতিক পরিকল্পার মিল ছিল না।

রোম-বার্লিন অক্ষশক্তির সহযোগী অন্যান্য তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিরও অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িল। পূর্ব রণাঙ্গনে তাদের যে বিপুল সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হইল, তার ধাক্কা সামলাইয়া ওঠা তাদের পক্ষে কঠিন হইল। যেমন, বলা যাইতে পারে যে, স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে রুমানিয়ার দুইটি পুরা আর্মি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ রুশ-জার্মান রণাঙ্গনে রুমানিয়ার যত সৈন্যবাহিনী ছিল তাঁর দুই-তৃতীয়াংশ কিংবা ৩ লক্ষ সৈন্য নষ্ট হইয়া গেল। হাঙ্গেরীয়ান সৈন্যবাহিনীর ১ লক্ষ ৪৬ হাজার নিহত এবং ৩০ হাজার আহত হইল। আর ফিনিশ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ম্যানারহাইম স্বীকার করিলেন যে, তাঁর এত বেশী সৈন্যক্ষয় হইয়াছে যে, তাঁর পক্ষে আর আগাইয়া যাওয়া সম্ভব নয়।[১]

অক্ষশক্তিবর্গের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ক্ষয়ক্ষতি তো অবর্ণনীয় হইল বটেই, অধিকন্তু লালফৌজের জয়লাভে ও জার্মানীর পরাজয়ের ফলে বিভিন্ন অধিকৃত দেশে প্রতিরোধ আন্দোলন, গেরিলা যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক-সামাজিক মুক্তি আন্দোলনও ক্রমশঃ জোরদার হইতে লাগিল। ইতালী, রুমানীয়া, বুলগারিয়া, হাঙ্গেরী ইত্যাদি দেশগুলিতে যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এবং নতুন সামাজিক মুক্তির দাবিতে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ ও আন্দোলন আরও সংঘবদ্ধ হইতে লাগিল। ফলে, নাৎসী নেতাদের মনে পালটা আরও উদ্বেগের সঞ্চার হইতে লাগিল। এই সমস্ত তাঁবেদার রাষ্ট্রের শাসকবর্গের সঙ্গে হিটলার ও তাঁর প্রতিনিধিগণ ১৯৪৩ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পরপর কতকগুলি আলোচনা বৈঠকের অনুষ্ঠান করিলেন এবং এই সমস্ত বৈঠকে হিটলার বুঝাইতে চাহিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে সারা ইউরোপের শক্তিতে European Citadel বা ইউরোপীয় দুর্গের মতো দাঁড় করাইতে হইবে। কেননা, বলসেভিকরা জয়লাভ করিলে সারা ইউরোপের সর্বনাশ। সুতরাং অক্ষশক্তিবর্গের সমর্থকদের উচিত আরও ধনবল, জনবল ও সামরিক বলসহ বলসেভিক বিপদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়া। কিন্তু হিটলার কর্তৃক এই তাগিদ সত্ত্বেও নাৎসী তাঁবেদার শক্তিগুলির মনে নূতন করিয়া যুদ্ধের কোন প্রেরণা আসিল না। স্ট্যালিনগ্রাদের পরাজয়ের ফলে সর্বত্র অক্ষশক্তিবর্গের মনে আশংকা ও হতাশার কালো ছায়া বিস্তার করিল।

১। Diplomacy of Aggression—P. 277.

ষষ্ঠ পর্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসোলিনীর পতন : ইতালীর 'বৈধ বিপ্লব'

৮ই মে, ১৯৪৩, মিত্রবাহিনী টিউনিস ও বিজার্টা দখল করিয়া লইলেন। বন্দী ও হতাহত নিয়া ২,০০০০০ ইতালীয় জার্মান সৈন্য এবং সেই সঙ্গে মুসোলিনীর শেষ আফ্রিকান রাজ্য নষ্ট হইয়া গেল। অথবা মুসোলিনীর ভাষাতেই বলা যাইতে পারে যে, টিউনিসিয়া ছিল 'ইউরোপের প্রথম ফ্রন্ট লাইন'। সেই লাইন ভাঙিয়া গেল এবং ইতালীর খাস ভূখণ্ড ও দ্বীপগুলি এবার মিত্রবাহিনীর প্রত্যক্ষ আক্রমণের মুখে পড়িল। ইউরোপের 'নরম তলপেটে আঘাতে'র জন্য চার্চিলের এতদিনকার যে রণনৈতিক ঝোঁক ছিল, সেটা পূরণের সুযোগ এবার দেখা দিল। ইউরোপের দক্ষিণ উপকূলে সিসিলি, সার্দিনিয়া ও কর্সিকা দ্বীপ ছিল ইতালীর পক্ষে বাইরের আত্মরক্ষার এক-একটি বিচ্ছিন্ন ঘাঁটির মতো। এবার মিত্রপক্ষ এইগুলির উপর আঘাত হানিয়া মূল ইতালীয় ভূখণ্ড আক্রমণের উদ্বোধন করিতে পারেন। কিন্তু সার্দিনিয়া ও সিসিল দ্বীপের মধ্যে কোন্‌টিকে আক্রমণের জন্য প্রথম বাছিয়া লওয়া হইবে, এই নিয়া ব্রিটিশ ও মার্কিন সামরিক মহলে মতভেদ ছিল। ব্রিটিশ পক্ষ চাহিতেছিলেন আগে ভূমধ্যসাগরের উপর পুরাপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তারপর ইতালী ও বলকান অভিযান। কিন্তু মার্কিন পক্ষ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের তুলনায় ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া পশ্চিম ইউরোপ থেকে জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত হানিবার পক্ষে ছিলেন এবং জেনারেল আইজেন-হাওয়ার চাহিতেছিলেন সিসিলির বদলে সার্দিনিয়া আগে দখল করিতে এবং সেখান থেকে ইতালী আক্রমণ করিতে। তবে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশের দাবি অনুসারেই ভূমধ্যসাগরের উপর পুরাপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও ইতালীয় দক্ষিণ প্রান্ত আক্রমণের জন্য সিসিলি অভিযানই স্থির হইয়াছিল—ক্যাসাব্লাংকা বৈঠকে চার্চিল-রুজভেল্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে।…

আফ্রিকা ও ইতালীর মধ্যে ভূমধ্যসাগরের জলপথে এবং ইতালীয় দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তদেশে সিসিলি দ্বীপের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১০ হাজার বর্গমাইল আয়তনের এবং ৬০০ মাইল দীর্ঘ উপকুল রেখার এই বৃহৎ দ্বীপটি ছিল কঠিন ও কর্কশ পাথরের দেশ এবং ত্রিভুজাকৃতির। এখানকার ১১,৮৭০ ফুট উঁচু এটনা আগ্নেয়গিরি পৃথিবী বিখ্যাত। এই দ্বীপ রক্ষার জন্য ১৩ ডিভিসন ইতালীয়-জার্মান সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এদের মধ্যে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ছিল ইতালীয় এবং ৯০ হাজার ছিল জার্মান সৈন্য। কিন্তু এই যুগ্ম বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে ছিলেন জার্মান সেনাপতি মার্শাল কেসেলরিং।

কিন্তু জল ও স্থলের একত্র সমবায়ে তখন পর্যন্ত অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে এত বড় 'উভচর' আক্রমণ আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। সেদিক দিয়া সিসিলি অভিযান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ছিল। ৯-১০ জুলাই সিসিলি দ্বীপে আক্রমণ আরম্ভ হইল। কিন্তু

তার আগে শত্রুপক্ষের বিভ্রান্তির সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সিসিলি ও সার্দিনিয়া উভয় দ্বীপেই বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। অধিকন্তু একই সঙ্গে এমনভাবে নৌ-অভিযানের মহড়া ঘটানো হইল, যাতে মনে হইতে পারে যে, গ্রীসের উপর আক্রমণ আসন্ন। সিসিলি দ্বীপের এই অভিযানে ছোট-বড়-মাঝারি—সব রকমের যুদ্ধজাহাজ ও জলপোত মিলাইয়া প্রায় তিন হাজার অর্ণবযানের দরকার হইয়াছিল। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ও অস্ত্রসজ্জিত ১,৬০,০০০ সৈন্য এই অভিযানে নিযুক্ত হইল। আর সেই সঙ্গে ১৪,০০০ মোটরযান, ৬০০ ট্যাঙ্ক, আর ১,৮০০ বড় কামান। মার্কিন ৭ম আর্মির ৬ ডিভিসন এবং ব্রিটিশ অষ্টম আর্মির ৭ ডিভিসন সৈন্য উপযুক্ত বিমানশক্তি সহ এই অভিযানে নিযুক্ত হইল। জেনারেল আইজেনহাওয়ার ছিলেন সুপ্রীম কমাণ্ডার। তাঁর ডেপুটি ছিলেন জেনারেল স্যার হ্যারল্ড আলেকজাণ্ডার। সপ্তম আর্মির অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল জর্জ এস. প্যাটন এবং অষ্টম আর্মির অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল বার্নার্ড এল. মণ্টগোমারী। অর্থাৎ সিসিলি দ্বীপে ব্রিটিশ ও মার্কিন উভয়ের সম্মিলিত অভিযান অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এত তোড়জোড় সত্ত্বেও সিসিলি অভিযান শেষ করিতে ৩৯ দিন সময় লাগিল, কিংবা ১৭ই আগস্ট, ১৯৪৩ এই অভিযান শেষ হইল। এই অভিযানের সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন হাস্কি' এবং এই যুদ্ধে অক্ষশক্তির ক্ষতি হইয়াছিল ১,৬৭,০০০ সৈন্য, আর মিত্রপক্ষের হতাহত ও নিখোঁজ নিয়া মাত্র ৩১, ১৫৮ জন। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের এতবড় উদ্যোগপূর্ণ আক্রমণ সত্ত্বেও ৬০,০০০ জার্মান সৈন্য অনায়াসে পলায়ন করিতে পারিয়াছিল। রাত্রের অন্ধকারে ২ মাইল চওড়া মেসিনা প্রণালী পার হইয়া অক্ষশক্তিবর্গের দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্যই পরিত্রাণ পাইয়াছিল এবং এই ঘটনাকে সেই সময় ডানকার্কের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছিল; জার্মানদের পক্ষে সেই সময় এইভাবে ত্রাণলাভ খুব প্রশংসনীয় ছিল। কেন না, আক্রমণকারী মিত্রপক্ষ সিসিলি দ্বীপে সব দিক দিয়াই সামরিক প্রশ্নে শ্রেষ্ঠ ছিল। ইতালীয় বাহিনীর মধ্যে যেমন যুদ্ধোদ্যম ছিল না, তেমনি সিসিলির বাসিন্দারা ছিল মিত্রপক্ষের অনুগামী। তারা আক্রমণকারীদের স্বাগত জানাইয়াছিল। এই অবস্থার মধ্যেও অধিকাংশ জার্মান সৈন্য পলায়ন করিতে পারায় মিত্রপক্ষের সৈন্যপত্যের বিরুদ্ধে ব্রিটেনে এবং আমেরিকায় সমালোচনা ধ্বনিত হইয়াছিল।

কিন্তু টিউনিসের পতন ও সিসিলিতে অবতরণের ফলে মুসোলিনীর বিপদের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। প্রকৃতপক্ষে টিউনিস ও সিসিলি দ্বীপের মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরের জলপথে যখন ক্ষুদ্র প্যান্টেলেরিয়া দ্বীপটা মিত্রপক্ষের বিমানবাহিনী এক থাবাতে কাড়িয়া লইল, তখনই মুসোলিনী বলিয়াছিলেন যে, 'তাঁর বাড়ির গেটে বিপদের ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল!' সুতরাং সিসিলিতে মিত্রপক্ষের আক্রমণ তো মুসোলিনীর বুকের কাছে বন্দুক ধরার মতো।

কিন্তু ১৯৪৩ সালের এই বিপদ মুসোলিনীর সামনে সহসা দেখা দেয় নাই। প্রকৃতপক্ষে এই বিপদের পটভূমিকার সূত্রপাত হইয়াছিল ১৯২২ সালে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সময়, যখন শান্তির চেয়ে যুদ্ধের বার্তাই বড় হইয়া উঠিল, যখন রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দুরাকাঙ্খা মুসোলিনীকে উম্মাদ করিয়া তুলিল। আসলে ১৯৪৩ সাল ছিল ফ্যাসিস্ট যুদ্ধযাত্রার নবম বছর। ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া যুদ্ধের সূত্রপাত তখন থেকে—১৯৩৫ সালের ২রা অক্টোবর ইথিওপিয়া ইতালী কর্তৃক আক্রান্ত

হইয়াছিল। পরের বছর ১৯৩৬ সালে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে ইতালীর অংশগ্রহণ এবং এভাবে বছরের-পর-বছর ইতালী যুদ্ধায়োজনের মধ্যেই জড়াইয়া পড়িল। হিটলারী জয়যাত্রার দিকে তাকাইয়া মুসোলিনী নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না, তাঁরও ধারণা হইল তিনি হিটলারের মতো দিগ্বিজয়ী হইবেন। ১৯৪০ সালের পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে যখন ব্রিটেন বিপন্ন ও ফ্রান্স কাবু হইল, তখন মুসোলিনী 'গায়ে পড়িয়া' বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধ ঘোষণার পিছনে ইতালীয় জনমতের কোন সমর্থন ছিল না, যুদ্ধে জনগণের কোন উৎসাহ ছিল না। এমন কি, সৈন্যদেরও যুদ্ধে মন ছিল না। বরং জনগণের মধ্যে যুদ্ধের বিরোধিতার ফলে প্রতিরোধকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, আর নাশকতামূলক কাজ বাড়িয়া যাইতেছিল। ইতালীতে এত ঘুষ, দুর্নীতি ও কালোবাজারী দেখা দিল যে, ইউরোপের অন্য কোন দেশের সঙ্গেই তার তুলনা ছিল না। ফলে, হিটলারী জার্মানীর নিকটও ইতালী মিত্রের বদলে ক্রমশঃ একটা বোঝা হইয়া দাঁড়াইল এবং জার্মানীকে বলকান অঞ্চলে, আফ্রিকায় ও দক্ষিণ-ফ্রান্সে নিজেদের সৈন্য পাঠাইতে হইল—ইতালীর উপর জার্মানী ভরসা রাখিতে পারিল না। জনৈক ইতালীয়ান সাংবাদিক ইতালীর অবস্থার ক্রমাবনতির উপর মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছেন :

'The economic condition of the Italian people, which had grown from bad to worse ever since Mussolini's rise to power in 1922, had reached the point of general starvation during the Fascist wars. During prolonged periods of this war the rations of Greeks and Poles were larger than those of the Italians.'[১]

অর্থাৎ ১৯২১ সালে যেদিন মুসোলিনী ক্ষমতায় আরোহণ করিলেন, তারপর থেকে ইতালীয় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ আরও খারাপ হইতে লাগিল। ফ্যাসিস্ট যুদ্ধের সময় এই অবস্থা একেবারে জনসাধারণের উপবাসের মধ্যে গিয়া পৌঁছিল। যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী দিনগুলিতে গ্রীক ও পোল জনগণের চেয়েও ইতালীয় জনসাধারণের রেশনের পরিমাণ কম ছিল।

ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন এই ধরনের ছিল তখন কিন্তু বাইরের জগতে প্রচার হইয়াছে যে, মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট রাজত্বে ইতালীর অর্থনৈতিক উন্নতি জমজমাট হইয়াছে। অবশ্য কতকগুলি বড় বড় রাস্তাঘাট এবং বড় বড় পুনর্নির্মাণ ও পুনর্গঠনের কাজ হইয়াছিল। আর যুদ্ধায়োজনের জন্য অস্ত্র নির্মাণ কারখানার কাজ বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক কারণে বহু লোকের কর্মসংস্থানও হইয়াছিল। অবশ্য হিটলারের জার্মানীতেও বাহ্যিক উন্নতি অত্যন্ত চমকপ্রদ হইয়াছিল। কিন্তু জার্মানীর সঙ্গে ইতালীর কোন দিক দিয়াই তুলনা হয় না। ব্যক্তিগত ডিক্টেটরি ইতালীতে ভিতরে ভিতরে সামাজিক পতন ডাকিয়া আনিয়াছিল। আসলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বাড়িয়াই যাইতেছিল, অথচ এদিকে যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিংবা যুদ্ধ জয় হওয়ায় কোন লক্ষণ নাই। ফলে ফ্যাসিস্ট নেতাদের মনেও হতাশা দেখা দিতে লাগিল এবং তারা মরিয়া হইয়া উঠিতে লাগিল। পার্টির মধ্যে লোভ ও দুর্নীতি ছাইয়া ফেলিল। অবশেষে বড় বড় পার্টি নেতারা 'চাচা আপন বাঁচা' নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং মুসোলিনীর উপর চাপ দিতে লাগিলেন এই যুদ্ধ থেকে ত্রাণলাভের একটা পথ

১। The Second Great War—Sir John Hammerton, Vol. VII, P. 2859.

বাহির করার জন্য। কারণ, তাদের অনেকেই ধরিয়া লইলেন যে, ইতালী ইতিমধ্যেই যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছে, কিংবা যুদ্ধে জয়লাভের আর কোন আশা নাই।[১]

চার্চিল লিখিয়াছেন যে, এতদিন ধরিয়া একচ্ছত্র দেশ শাসন ও পরিচালনের পর মুসোলিনীকে এক্ষণে একটির-পর-একটি সামরিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলাইতে হইল। এই বিষয়ে অন্য কাহাকেও দায়ী করার উপায় ছিল না। কেন না, মুসোলিনী একাই সারা দেশের উপর সর্বাত্মক প্রভুত্ব খাটাইয়াছেন। সুতরাং মুসোলিনী তাঁর দায়িত্বের বোঝা রাজা, পার্লামেণ্ট, ফ্যাসিস্ট পার্টি বা সেনানীমণ্ডলীর উপর চাপাইয়া দিবেন, এমন সুযোগ ছিল না। সুতরাং ইতালীর বড় বড় মহল থেকেও যুদ্ধে হারিয়া যাওয়ার জন্য মুসোলিনীর উপর দোষ চাপান হইল। নিঃসঙ্গ ডিক্টেটর যখন ক্ষমতার উচ্চ তুঙ্গে সমাসীন, তখন তাঁর সৈন্যেরা রাশিয়াতে, টিউনিসে ও সিসিলিতে কচুকাটা হইতেছিল—যে ঘটনাগুলি ছিল ইতালী আক্রান্ত হওয়ার পূর্বাভাসের মত।[২]

ফ্যাসিজিমকে সঞ্জীবিত রাখার জন্য ক্রমাগত যুদ্ধ জয়ের জারক রসের দরকার। কিন্তু মুসোলিনী ক্রমাগত হারিতেছিলেন। অতএব ত্রিপোলির পতনের দুই সপ্তাহ পর ১৯৪৩, ফেব্রুয়ারীতে প্রথম রাজনৈতিক সংকট দেখা দিল এবং কাউণ্ট চিয়ানোকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করা হইল। কিন্তু ততক্ষণে ইতালীর সমাজ জীবনে পচন ধরিয়া গিয়াছিল। ইতালী, সার্দিনিয়া ও সিসিলিতে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিল। সুতরাং যুদ্ধ চলিবে কি ভাবে? উত্তর ইতালীর কারখানাগুলিতে ব্যাপক ধর্মঘট দেখা দিল! ক্ষিপ্ত মুসোলিনী এই ধর্মঘটের জন্য পুলিসের বড় কর্তাকে পদচ্যুত করিলেন—কেন পুলিশের বড় কর্তা ধর্মঘটীদিগকে শায়েস্তা করিতে পারিলেন না, এই অপরাধে তাঁর অপসারণ ঘটিল। মুসোলিনী সরোষে গর্জন করিয়া বলিলেন—

'We must have a Fascist police, not policemen who are Fascist but Fascists who are policemen!'[৩]

এই যখন ইতালীর আভ্যন্তরিক অবস্থা, তখন ইতালীর সেনাপতিদের সম্পর্কে সমালোচকেরা ঠাট্টা করিয়া বলাবলি করিত—'এরা আরাম কেদারার সেনাপতি, ঘোড়ায় চড়া জেনারেল নয়!' আর জননিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তা গোপন রিপোর্ট দিলেন যে, পার্টি নেতারা এবং অধিকাংশ শিল্পপতিরা এই যুদ্ধের বিরোধী। যাঁরা মুসোলিনীকে কেন্দ্র করিয়া এতদিন বড় বড় চাকরি দখল করিয়াছিলেন এবং আরামে, আয়াসে, বিলাসে ও দুর্নীতিতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁরাও মুসোলিনীর উপর চটিয়া গেলেন। কারণ, পায়ের নিচের মাটি সরিয়া যাইতেছিল। শীর্ষস্থানীয় বিখ্যাত নেতারা এক্ষণে পর্দার আড়ালে মুসোলিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। গ্রাণ্ডি, বাদগোলিও, আমব্রোসিও, আকেরিয়ারোন প্রমুখ প্রথম সারির রাজনৈতিক সামরিক নেতারা শলাপরামর্শ করিতে লাগিলেন। এমন কি স্বয়ং রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল পর্যন্ত—যে রাজা গত বিশ বছর ধরিয়া মুসোলিনীর একটি পরামর্শও অগ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু ইতালীয় রাজপরিবারের মধ্যে যুবরানী ক্রাউন প্রিন্সেস

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, ঐ পৃষ্ঠা।
২। দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার—চার্চিল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০।
৩। The Brutal friendship—F. W. Deakiu. p. 353.

মেরিয়া-জোস্ মুসোলিনীর অত্যন্ত বিরুদ্ধবাদিনী ছিলেন। ৩৬ বছরের এই সুশ্রী বেলজিয়ান রাজকন্যা সেদিনই হিটলারের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন, যেদিন ১৯৪০ সালে জার্মানবাহিনী বেলজিয়াম আক্রমণ ও দখল করিয়া নিল। সেই হিটলারের সঙ্গে মুসোলিনীর বন্ধুত্ব! সুতরাং যুবরানী মেরিয়া-জোস্-এর নিকট এটা ছিল অসহ্য। মুসোলিনীকে অপসারণের চক্রান্তের মধ্যে তিনিও পর্দার আড়ালে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন। রাজদরবারের মন্ত্রী ডিউক অব আকোয়ারোন ছিলেন রাজকীয় মহলের চক্রীদের সেরা এবং যুবরানীর সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তবে, আকোয়ারোন মনে মনে যুবরানীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, যদিও প্রতিদানে কিছুই পাননি।[১]

এখানে আরো উল্লেখ করা দরকার যে, ক্রাউন প্রিন্স বা যুবরাজ আম্বার্টো যুবরানীর মতোই মুসোলিনীর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং মুসোলিনীর অপসারণের জন্য তিনিও নানাভাবে সচেষ্ট ছিলেন। যদিও এতদিন পর্যন্ত মুসোলিনী নিজেকে হিটলারের সমরসঙ্গী ও ইউরোপীয় যুদ্ধের অংশীদাররূপে কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন, তথাপি নিজের দেশেই মুসোলিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং সমগ্র ইতালীয় সমাজে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়াছিল কিভাবে মুসোলিনীকে তাড়ানো যায়?

জুলাই মাসে সিসিলি আক্রান্ত হওয়ার সময় অবস্থা চরমে উঠিল। এদিকে 'স্বল্পবাক, সতর্ক ও নিয়মতন্ত্রবাদী' (চার্চিলের বর্ণনা অনুসারে) ইতালীর রাজা ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই মার্শাল বাদোগোলিওর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। (১৯৪০ সালে গ্রীসের যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর মার্শাল বাদোগোলিও পদচ্যুত হইয়া-ছিলেন)। তিনি বাদোগোলিওর মধ্যেই এমন এক ব্যক্তির সন্ধান পাইলেন যাঁর উপর ইতালীয় রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্পণ করা যাইতে পারে। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা স্থির হইল, চক্রান্ত পাকা হইল এবং সিদ্ধান্ত হইল যে, ২৬শে জুলাই মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা হইবে! সেনানীমণ্ডলীর প্রধান জেনারেল আম্বোসিও রাজী হইলেন এবং কি ভাবে ও কাদের দ্বারা গ্রেপ্তার করান হইবে সেই সমস্ত বিষয় স্থির করার দায়িত্ব জেনারেল গ্রহণ করিলেন।

ওদিকে ফ্যাসিস্ট নেতাদের পক্ষ হইতে স্থির হইল যে, ২৪শে জুলাই ফ্যাসিস্ট গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকা হইবে। ১৯৩৯ সালের পর পার্টি হাইকমাণ্ডের কোন মিটিং ডাকা হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধে বিপর্যয়ের জন্য পার্টি নেতারা এবার মুসোলিনীর জবাবদিহি করিবেন। সর্বোচ্চ 'পার্টি নেতৃত্বের' এই অধিবেশনে অসন্তুষ্ট নেতারা মুসোলিনীকে চরমপত্র দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

রাজার পক্ষ থেকে যখন স্থির হইল যে, ২৬শে জুলাই মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা হইবে, তখন পার্টি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে স্থির হইল যে, ২৪শে জুলাই গ্রাণ্ড কাউন্সিলের মিটিং হইবে। যদিও এই দুইটি তারিখ পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে স্থির হইয়াছিল, তথাপি অদৃষ্ট লিখনের মতো তারিখ দুইটি যেন পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল।

বলা বাহুল্য যে, মুসোলিনীকে অকস্মাৎ গ্রেপ্তারীর পরিকল্পনার মধ্যে ভয়াবহ বিপদের এবং বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি ছিল। ২০ বছর ধরিয়া তিনি ইতালীর সর্বময়

প্রভু ছিলেন এবং সর্বত্র তাঁর পার্টির চেলা-চামুণ্ডারা শক্ত ঘাঁটিগুলিতে নিযুক্ত ছিল—ছিল পার্টি-মিলিশিয়া বা পার্টির আধা সামরিক বাহিনী, যারা গৃহযুদ্ধ বাধাইয়া দিতে পারিত। সুতরাং পরিকল্পনা অত্যন্ত গোপনে, সাবধানে ও সতর্কতার সহিত করিতে হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে এটাও স্থির হইয়াছিল যে, সমস্ত ফ্যাসিস্ট নেতাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।...



১৭ই জুলাই ১৯৪৩, মিত্রপক্ষের বিমান রোমের এবং ইতালীর অন্যান্য শহরের আকাশে দেখা দিল এবং শূন্য থেকে অজস্র ইস্তাহার নীচে ইতালীয় জনগণের উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দেওয়া হইল। এই মুদ্রিত ইস্তাহারগুলিতে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিলের একটি ঘোষণা-বাণী বা আবেদন। অবশ্য রেডিও যোগেও এই আবেদন প্রচারিত হইল। এই আবেদনের বক্তব্য ছিল এই :

'এই মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের সম্মিলিত সশস্ত্র বাহিনী জেনারেল আইজেনহাওয়ার ও তাঁর সহকারী জেনারেল আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে আপনাদের দেশের ভূভাগের অভ্যন্তরে যুদ্ধ চালাইয়া নিয়া যাইতেছেন। মুসোলিনী এবং তাঁর ফ্যাসিস্ট রাজত্বের দ্বারা আপনারা যে কলঙ্কিত নেতৃত্বের কাছে দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজিকার এই অবস্থা তারই প্রত্যক্ষ পরিণতি। যে ব্যক্তি বিভিন্ন জাতির জনগণকে ও স্বাধীনতাকে নৃশংসভাবে ধ্বংস করিয়াছে, মুসোলিনী তারই তল্পিবাহক হিসাবে এই যুদ্ধের মধ্যে আপনাদিগকে ফেলিয়া দিয়াছেন। হিটলার

আগেই যুদ্ধ জয় করিয়া ফেলিয়াছেন, একথা ধরিয়া লইয়াই মুসোলিনী আপনাদিগকে যুদ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। জলপথে ও আকাশপথে ইতালী প্রচণ্ডভাবে আঘাতের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের ফ্যাসিস্ট নেতারা আপনাদের সন্তানদিগকে —নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে বহু দূরবর্তী রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন জার্মানীকে সাহায্য করার জন্য, যে জার্মানী ইংলণ্ড, রাশিয়া ও পৃথিবী জয় করিতে চায়।'...

'ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রপুঞ্জের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীকে যে মুহূর্তে আপনারা বাধা দিতেছেন, কিংবা প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু যা আপনারা ঢালিয়া দিতেছেন, তাতে একটি মাত্র উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতেছে—নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট নেতাদের স্বকৃত অপরাধের জন্য যে অনিবার্য দণ্ড তাদের প্রাপ্য সেই দণ্ড পাইতে তাদের কিছুটা সময় দেওয়া হইতেছে। আপনাদের সমস্ত স্বার্থ এবং আপনাদের সমগ্র ঐতিহ্যের প্রতি জার্মানী ও আপনাদের দুর্নীতিগ্রস্ত মেকি নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এই দুইকে অস্বীকার করিলেই পুনর্গঠিত ইতালী আবার ইউরোপীয় জাতিসমূহের পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে পুনরায় সম্মানের আসন দখল করার আশা করিতে পারে।'

'ইতালীয় জনগণ! আপনাদের নিকট সময় উপস্থিত হইয়াছে, আপনাদের আত্মসম্মান, আপনাদের স্বার্থ এবং আপনাদের জাতীয় মর্যাদা এবং আপনাদের শান্তি ও স্বস্তির পুনঃসংস্থাপন আপনারা চান কিনা, সে কথা স্থির করিবার জন্য। আপনাদের নিকট সময় উপস্থিত হইয়াছে এই কথা বিচারের জন্য যে, ইতালীয় জনগণ হিটলার-মুসোলিনীর জন্য মরিবে, কিংবা ইতালীর জন্য ও সভ্যতার জন্য বাঁচিয়া থাকিবে?—(সংক্ষেপিত)—ইতি, রুজভেল্ট ও চার্চিল।'[১]

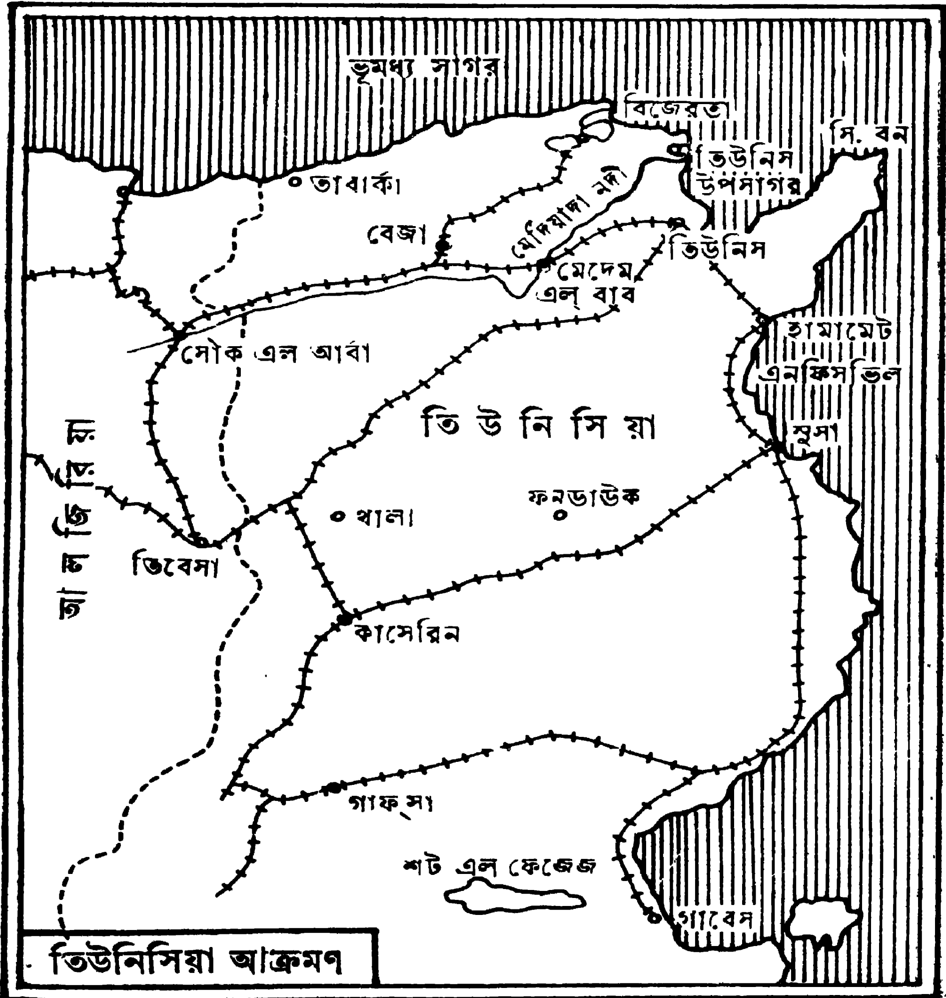
১৭ই জুলাই ইতালীয় আকাশ থেকে চার্চিল রুজভেল্টের এই ঘোষণাবাণী রোম ও অন্যান্য শহরে প্রচারিত হইল এবং ঐদিনই রাত্রে হিটলার তাঁর সদর দপ্তরে ইতালীর পরিস্থিতি সম্পর্কে আশঙ্কাজনক সংবাদ পাইলেন। কেন না, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিবর্গ কর্তৃক ইতালী আক্রান্ত হওয়ার মুখে এবং যদি ইতালী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, তাহলে জার্মান হাইকম্যাণ্ডের রণ-পরিকল্পনা সম্পর্কে নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে। কেন না, সেই অবস্থায় ইতালীর প্রতিরক্ষার জন্য জার্মানীকে আগাইয়া যাইতে হইবে। কারণ, ভূমধ্যসাগর এলাকায় হিটলারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে জার্মানীর সীমানা থেকে যতদূর সম্ভব যুদ্ধকে দূরে রাখা এবং তার জন্য ইতালীয় রাজধানী এলাকাকে প্রতিরক্ষার ঘাঁটিতে পরিণত করা এবং প্রয়োজন হইলে ইতালির সামরিক দায়িত্ব জার্মানীর নিজ হাতে গ্রহণ করা। এমন কি, তার চেয়ে বেশী কিছু করা—

'Hitler had by now realized that he might have to go further and even takeover the Italian positions with German forces, and keep—and this point was the decisive consideration—the war as far away as possible from the heart of Europe and there by from the frontiers of Germany.'[২]

অর্থাৎ ইউরোপের মর্মকেন্দ্রে এবং জার্মানীর সীমানার মধ্যে যুদ্ধের আগুন না ছড়াইয়া পড়ে, তেমন রণনীতিই হিটলার ও জার্মান হাইকম্যাণ্ড ভূমধ্যসাগরীয়

১। চার্চিল—পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪।
২। The Brutal Friendship—F. W. Deakin. P. 315.

এলাকায় অনুসরণ করিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু মুসোলিনী ও ইতালীর প্রতি হিটলারের কোন ভরসা ছিল না। সুতরাং ইতালী সম্পর্কে দুঃসংবাদ পাওয়ায় হিটলার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। মুসোলিনীর সঙ্গে জরুরী সাক্ষাতের প্রয়োজন



তিউনিসিয়া আক্রমণ

অনুভূত হইল। ইতালীর ভেনিস প্রদেশে ফেলট্রি শহরের নিকটবর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর নামকরা এক বিরাট পল্লীভবনে এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। গোড়ায় ঠিক ছিল যে, তিন দিন এই বৈঠক চলিবে। কিন্তু হিটলার একবেলাতেই বৈঠক শেষ করিয়া অপরাহ্নের দিকে চলিয়া গেলেন। সুতরাং বোঝা যাইতেছে এই বৈঠকে তেমন কিছু ফলপ্রসূ ঘটিল না।

১৯শে জুলাই যে সুবৃহৎ পুরাতন প্রাসাদে এই বৈঠকে অনুষ্ঠিত হইল, সেটি ছিল একটি বিরাট 'গোলক ধাঁধার' গৃহ এবং হিটলার লাঞ্চের আগে তিনঘণ্টা এবং লাঞ্চের পর দুই ঘণ্টা ধরিয়া মুসোলিনীকে সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে যে গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিলেন, তাও ঐ ধাঁধার মতই জটিল। এমন কি হিটলারের এই দীর্ঘ 'কথামালা' মন দিয়া শুনিবার মতো মানসিক বা দৈহিক স্বাস্থ্যও মুসোলিনীর ছিল না। তিনি ক্লান্ত ও অসুস্থ ছিলেন। অধিকন্তু ইঙ্গ-মার্কিনের বিরুদ্ধে মুসোলিনী বা ইতালীয় যুদ্ধযাত্রায় নূতন কোন কার্যকর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল না। তবে, নামে মুসোলিনীর কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়া কাজে জার্মানী কর্তৃক দক্ষিণ ইতালীয় সামরিক দায়িত্ব গ্রহণের একটা পরিকল্পিত আভাস এই বৈঠকে গোড়ার দিকে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু বৈঠকের শেষে বোঝা গেল যে, অক্ষশক্তির বজ্র বন্ধন থেকে ইতালী মুক্তি পাইবে না, ইতালীর পক্ষে পৃথক সন্ধির চেষ্টা করাও সম্ভব নয়। তবে সিসিলিকে রক্ষা করার মৌখিক ভরসা দেওয়া হইল বটে, কিন্তু সোভিয়েট রণাঙ্গনের যুদ্ধের জন্য ইতালীকে নূতন কোন সামরিক সহায়তা দেওয়া সম্ভব হইবে না। উপসংহারে হিটলার মুসোলিনীকে আর একটি ভরসা দিলেন যে, আগামী শীতকালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নতুন 'গোপন অস্ত্র' প্রয়োগ করা হইবে।

হিটলারের সঙ্গে মুসোলিনীর এটি ছিল ত্রয়োদশ বৈঠকে। দুপুরের দিকে বৈঠক যখন চলিতেছিল, তখন হঠাৎ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মুসোলিনীর সেক্রেটারী সেখানে প্রবেশ করিলেন এবং ডুচের হাতে এক টুকরা কাগজ দিলেন। সেই কাগজটি ছিল একটি সংক্ষিপ্ত সামরিক বিজ্ঞপ্তি, যাতে লেখা ছিল—

'এই মুহূর্তে শত্রু রোমের উপর প্রচন্ডভাবে বোমা বর্ষণ করিতেছে'।

মুসোলিনী মুষড়াইয়া পড়িলেন। ··

ফেলটিু বৈঠক থেকে ব্যর্থ মনোরথ মুসোলিনী যখন বিমানযোগে রোমে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাঁর বিমান প্রচণ্ড ধোঁয়ার মধ্যে পড়িল। কারণ লিটারিও রেলস্টেশনের শত শত ওয়াগন বোমাবর্ষণে দগ্ধ হইয়া প্রচণ্ডভাবে জ্বলিতেছিল এবং ধূম উদ্গীরণ করিতেছিল।···

২২শে জুলাই মুসোলিনী রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফেলটিু বৈঠকের ফলাফল তাঁকে জানাইলেন। কিন্তু মুসোলিনী রাজাকে 'নার্ভাস' এবং তাঁর মুখে ভ্রূকুটির চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। রাজা মুসোলিনীকে সোজা বলিলেন যে, এভাবে আর চলিতে পারে না, পরিস্থিতি গুরুতর। জার্মানদিগকে সোজা কথা বলিতে হইবে।

অর্থাৎ রাজা এই ব্যর্থ যুদ্ধের গুরুতর ফলাফলের ইঙ্গিত করিতেছিলেন। কিন্তু মুসোলিনী যখন রাজাকে হিটলারের 'গোপন অস্ত্রের' ভরসা দিলেন, রাজা তখন মন্তব্য করিলেন—

'The best secret weapons are those which are the best known.'

'সবচেয়ে ভাল গোপন অস্ত্র সেগুলিই যেগুলি সবচেয়ে বেশী পরিচিত'।[১]

এ কথার পর মুসোলিসী রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়া চলিয়া গেলেন।···

ইতিমধ্যে ইতালীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ জমজমাট হইয়া উঠিল। একদিকে সমাজের

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক,—পৃষ্ঠা ৪৬৯।

উচ্চ মহলে মুসোলিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করার এবং অন্যদিকে রাজকীয় মহলে দুচেকে গ্রেপ্তার করার গোপন শলাপরামর্শ পাকা হইতে লাগিল।

'এই নাটকের শেষ অংকে দেখা দিলেন সেই ব্যক্তিটি, যিনি অভিনয়ে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবীণ ফ্যাসিস্ট নেতা, প্রাক্তন ইতালীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ব্রিটেনের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ও কঠোর সংকল্পের মানুষ—যিনি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ইতালীর যুদ্ধ ঘোষণাকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু ঘটনাচক্রের নিকট নত হইয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই ডিনো গ্রাণ্ডি আসিয়া রোমে হাজির হইলেন ফ্যাসিস্ট গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের মিটিংয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। ২২শে জুলাই তিনি তাঁর পুরাতন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং অত্যন্ত স্থূলভাবে তাঁর নেতাকে বলিলেন যে, তিনি কাউন্সিলের অধিবেশনে একটা ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট গঠনের এবং রাজার হাতে সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কম্যাণ্ড পুনরায় অর্পণের জন্য একটি প্রস্তাব তুলিবেন।'[১]

২৪শে জুলাই অপরাহ্ণ পাঁচটায় ফ্যাসিস্ট গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে—দুই দিন আগে সদস্যদের মধ্যে এই মর্মে নিমন্ত্রণ পত্র বিলি হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল এবং দুইদিনে যে সময় পাওয়া গেল তার মধ্যে গ্রাণ্ডি ও তাঁর বন্ধুরা মিটিংয়ের কার্যপদ্ধতি স্থির করিয়া ফেলিলেন। অবশ্য গ্রাণ্ডির প্রস্তাব নিয়মতন্ত্র ও সংবিধান-সম্মত ছিল। কেন না, সংবিধানগতভাবে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল ছিলেন ইতালীয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ণধার এবং মুসোলিনী ছিলেন আইনতঃ প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং গ্রাণ্ডির প্রস্তাব গৃহীত হইলে রাজা মুসোলিনীকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই অপসারণ করিবার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু গভীরতর ঝুঁকি ছিল হিংসাত্মক গৃহযুদ্ধের। অতএব পুলিশ, মিলিটারী ও রাজকীয় মহল থেকে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বিত হইল। রোম নগরী পাহারা দেওয়ার জন্য ৩ ডিভিসন 'মোটরায়িত' সৈন্যের সমাবেশ ঘটিল।

ফ্যাসিস্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিল ছিল পার্টির আভ্যন্তরীণ ক্যাবিনেট কিংবা সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা। গত বিশ বছরের ইতিহাসে দেখা যায় এই সংস্থার বৈঠক খুব জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এবার ব্যতিক্রম ঘটিল। সামান্য কয়েকজন পাহারাদার ছাড়া নিতান্ত সাদাসিধাভাবে রাত্রি দশটার বদলে অপরাহ্ণ পাঁচটায় অধিবেশন ডাকা হইল। সদস্যরা কালো ফ্যাসিস্ট ইউনিফর্ম পরিয়া একে একে আসিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু কয়েকজন সদস্য ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে হাতাহাতি ও রক্তারক্তি হইতে পারে। এজন্য তাঁরা গোপনে অস্ত্র নিয়া আসিয়াছিলেন। যেমন, স্বয়ং গ্রাণ্ডি দুইটি হাতবোমা লুকাইয়া নিয়া আসিয়াছিলেন!

মুসোলিনী এক গাদা দলিলপত্র নিয়া তাঁর বক্তৃতা শুরু করিলেন এবং দুই ঘণ্টা ধরিয়া ইতালীয় পরিস্থিতি ও ইতিহাস নিয়া আলোচনা করিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থন করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বের সাফাই গাহিতে গিয়া ইতিহাসের নজির উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিলেন—

১। চার্চিল—পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫।

'War is always a party war—a war of the party which desires it; it is always one man's war—the war of the man who declared it !'

যুদ্ধটা সর্বদাই একটি পার্টির যুদ্ধ—যে পার্টি যুদ্ধ চায় তার যুদ্ধ এবং এটা সর্বদাই কোন একক মানুষের যুদ্ধ—যে মানুষ যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তার যুদ্ধ।[১]

কিন্তু গ্রাণ্ডি তাঁর বক্তৃতায় 'একক ব্যক্তির ব্যক্তিগত শাসনের' তীব্র নিন্দা ধ্বনিত করিলেন এবং বলিলেন—'ফ্যাসিজম শেষ হইয়া গিয়াছে। ইতালীর বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ফ্যাসিজম নয়, দায়ী ডিকটেটরশিপ। এই ডিকটেটরশিপই যুদ্ধে পরাজয় ডাকিয়া আনিয়াছে।'[২]

কিন্তু বক্তৃতার আগে গ্রাণ্ডি তাঁর সেই যুগান্তকারী প্রস্তাব পাঠ করিলেন, যে প্রস্তাবের পরিণতিতে মুসোলিনী এবং ইতালীয় ওলট-পালট ঘটিয়া গেল। প্রস্তাবটি এই :

'The Grand Council declares···the immediate restoration of all state functions, alloting to the King, the Grand Council, the Government, Parliament and the Corporations the tasks and responsibilities laid down by our statutory and constitutional laws.

It invites the head of the Government to request His Majesty the King—towards whom the heart of all the nation turns with faith and confiesnce—that he may be pleased, for the honour and salvation of the nation, to assume, together with the effective command of the Armed Forces on land, sea and in the air, according to Article 5 of the Statute of the Realm, that supreme initiative of decision which our institutions attribute to him and which, in all our national history, has always been the glorious heritage of our August dynasty of Savoy.'[৩]

এই প্রস্তাবিত ভাষাগত, আইনগত এবং সংবিধানগত অলংকারগুলি বাদ বাদ দিলে সোজা বাংলায় এই দাঁড়ায় যে, মুসোলিনীর হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া নিয়া রাষ্ট্রিক, প্রশাসনিক ও সামরিক সমস্ত ক্ষমতা স্বয়ং রাজার হাতে ন্যস্ত করা হইল এবং এই আশা ব্যক্ত করা হইল যে, রাজা যেন সমুদয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

মুসোলিনীর জামাতা কাউণ্ট চিয়ানো গ্রাণ্ডির উত্থাপিত এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং সদস্যর মধ্যে যে উত্তেজনার সঞ্চার হইল তাতে বোঝা গেল যে, এই সভাতে গুরুতর একটা কিছু ঘটিতে যাইতেছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বিতর্ক চলিল। তখন ফ্যাসিস্ট পার্টির সেক্রেটারী স্কোরাজ মুসোলিনির পরামর্শক্রমে বৈঠক পরদিন পর্যন্ত স্থগিত রাখার এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ডিনো গ্র্যাণ্ডি এই কৌশলের তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—'না যে ব্যাপারটা আমরা এখানে শুরু করেছি, তা এখানে আজ রাত্রেই শেষ করতে হবে।'

১। চার্চিল—ঐ পৃষ্ঠায়।

২। দি ব্রুটাল ফ্রেন্ডসিপ; পৃষ্ঠা ৪৮৬-৮৭।

৩। The Brutal Friendship—Deakin, P. 486.

তখন সামান্য বিরতির পর আবার সভার কাজ আরম্ভ হইল এবং রাত্রি দুইটার পর প্রস্তাবের উপর ভোট গৃহীত হইল। গ্রাণ্ডির প্রস্তাবের পক্ষ ১৯ জন সমর্থন জানাইলেন ৭ জন বিরোধিতা করিলেন এবং ২ জন ভোটদানে বিরত রহিলেন। অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের বিপুল সংখ্যক মেজোরিটি মুসোলিনীর ক্ষমতা হরণের পক্ষে ভোট দিলেন, যে ঘটনা ছিল অভূতপূর্ব।

পরে মুসোলিনী তাঁর স্মৃতিকথায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভোট দেওয়ার আগেই অবশ্য প্রত্যেকটি সদস্যের মনোভাব বোঝা গিয়েছিল—

'There was group of trators who has already negotiated with the crown, a group of accomplices, and a group of uninformed who probably did not realise the seriousness of the vote, but they voted just the same'.

অর্থাৎ সদস্যদের মধ্যে একদল বিশ্বাসঘাতক ছিল, যার আগেই রাজার সঙ্গে শলাপরামর্শ করিয়া রাখিয়াছিল। আর একদল ছিল চক্রান্তকারী এবং আর-একটা দল ছিল যারা এই ভোটাভুটির গুরুত্ব সম্ভাবতঃ বুঝতে পারে নাই, তবু তারা ভোট দিয়াছিল।

অধিবেশনের শেষে মুসোলিনী মন্তব্য করিলেন—সদস্যরা ফ্যাসিস্ট রাজত্বের গভীর সংকট ডাকিয়া আনিলেন।

সভা শেষ করিয়া কাউন্সিলের সভ্যগণ নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু সদস্যদের কেউ সেই রাত্রে তাঁদের বাড়িতে ঘুমান নাই। সম্ভতঃ সকলের মনেই নিরাপত্তার প্রশ্ন ছিল। মুসোলিনীর পক্ষে কাউন্সিলের যে মুষ্টিমেয় সদস্য ভোট দিয়াছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরামর্শ দিয়াছিলেন গ্রাণ্ডি প্রমুখ মুসোলিনীর বিরুদ্ধবাদীদের গ্রেপ্তারের জন্য। আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন গ্রাণ্ড কাউন্সিলের এই সভা পার্টির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার মাত্র, এর কোন সাংবিধানিক বা আইনগত দায়-দায়িত্ব নাই। সুতরাং এই প্রস্তাব প্রকাশ করারও প্রয়োজন নাই।

কিন্তু মুসোলিনী এই সমস্ত পরামর্শে তেমন কোন কান দেন নাই। কারণ, তাঁর একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রস্তাব অনুসারে রাজা কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না। কেন না, তাঁর প্রতি রাজার বিশ্বাস ছিল এবং গত বিশ বছর ধরিয়া রাজার সম্মতি ছাড়া তিনি এক পা'ও ফেলেন নাই।······

পর দিন (২৫ জুলাই রবিবার) সকালে উঠিয়া মুসোলিনী যথারীতি তাঁর কাজে-কর্মে মন দিলেন এবং বোমা বিধ্বস্ত রোমের কোন কোন অঞ্চল পরিদর্শন করিলেন। অপরাহ্নে তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের সংকল্প করিলেন।

ইতিমধ্যে যবনিকা অন্তরালে মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করার চক্রান্ত পাকা হইতেছিল। রাজদরবারের মন্ত্রী ডিউক অব আকোয়ারোন ছিলেন এই বিষয়ে অগ্রণী। সৈন্য-বাহিনীর অধ্যক্ষ এবং পুলিশ এবং মিলিটারীর মধ্যে বিশ্বাসভাজনদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তর, পুলিশ দপ্তর ও টেলিফোম ভবন নিঃশব্দে দখল করিয়া নেওয়া হইল। রাজকীয় ভবনের নিকট এমনভাবে কিছু মিলিটারী পুলিশ প্রহরী মোতায়েন রাখা হইল যেন সহসা বাইরে থেকে নজরে না পড়ে।

মুসোলিনীর মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করিল না। কিন্তু তিনি যখন রাজভবনে

পৌঁছিলেন, তখন সর্বত্র ক্যারাবিনিয়েরি বা সামরিক পুলিশ মোতায়েন দেখিতে পাইলেন।

ঠিক পাঁচটার একটু আগে রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে মুসোলিনীর গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। সাদা পোশাকে মুসোলিনীর ব্যক্তিগত ডিটেকটিভ ও দেহরক্ষী সহ আরও তিনখানা গাড়ি প্রাসাদের ফটকের বাইরে অপেক্ষমান রহিল। মার্শালের ইউনিফর্ম পরিহিত রাজা প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে সিঁড়ির উপর মুসোলিনীকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে ড্রয়িংরুমে নিয়া গেলেন। রাজা বিনা ভুমিকায় মুসোলিনীকে বলিলেন—'অবস্থা বড়ই খারাপ। ইতালী ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং আর্মির নৈতিক শক্তি একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে, সৈন্যরা আর যুদ্ধ করিতে চায় না। গ্রান্ড কাউন্সিলের ভোট সাংঘাতিক—১৯ জন গ্রান্ডির প্রস্তাবের পক্ষে এবং এদের মধ্যে আবার ৪ জন উচ্চতম রাজকীয় সম্মানে ভূষিত। এই মুহূর্তে আপনি হইতেছেন ইতালীর সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। আপনার আর এখন কোন বন্ধু নাই, আমিই আপনার একমাত্র বন্ধু রহিয়াছি। সেই বন্ধু হিসাবে আপনাকে বলিতেছি যে, আপনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কোন ভয় নাই। আপনার রক্ষার ব্যবস্থা আমি করিব। আপনার বদলে এখন মার্শাল বাদোগ্লিওকেই ক্ষমতায় আসীন করিব বলিয়া আমি স্থির করিয়াছি।'

এর পর রাজা ভাঙাভাঙা বাক্যে বলিলেন—'আমি দুঃখিত, আমি দুঃখিত। কিন্তু এছাড়া মীমাংসার কোন উপায় ছিল না।'

মুসোলিনী উত্তর দিলেন, 'আপনি খুব সাংঘাতিক গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন। এই মুহূর্তে যে সংকটের সৃষ্টি হইল এবং যে লোকটি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, তাকে যখন পদচ্যুত করা হইল, তখন লোকে ধরিয়া নিবে শান্তি আসিতেছে। সৈন্যবাহিনীর নৈতিক শক্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়িবে এবং এই সংকট চার্চিল-স্ট্যালিন জুটির পক্ষে বিশেষভাবে স্ট্যালিনের পক্ষেই জয় বলিয়া প্রতিভাত হইবে। আমি জনগণের ঘৃণা উপলব্ধি করিতে পারি। গতকল্য গ্রান্ড কাউন্সিলের মিটিংয়েই আমি সেটা টের পাইয়াছিলাম। জনগণের ঘাড়ে এত ত্যাগ স্বীকারের বোঝা চাপাইয়া দিয়া বিনা প্রতিবাদে কেউ এতদিন রাজত্ব করিতে পারে না। যাহোক, যে ব্যক্তি আমার পরে দায়িত্ব হাতে নিতেছেন, তাঁর আমি শুভ কামনা করি।' —এই বলিয়া মুসোলিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাজা তাঁকে দরজা পর্যন্ত আগাইয়া দিলেন, তাঁর সঙ্গে করমর্দন করিলেন। মুসোলিনী সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া তাঁর অপেক্ষমান গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময় হঠাৎ একজন সামরিক পুলিশের ক্যাপ্টেন মুসোলিনীকে থামাইলেন এবং বলিলেন, 'মহামান্য রাজা আমাকে আদেশ দিয়াছেন আপনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধানের জন্য।'

মুসোলিনী তখনও তাঁর গাড়ীর দিকে আগাইয়া যাইতেছিলেন, তখন ক্যাপ্টেন আবার তাঁকে বাধা দিলেন এবং নিকটেই একটি যে মোটর-অ্যামবুলেন্স দাঁড়াইয়া ছিল, সেটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—'না। আমাদের অবশ্যই ওই গাড়ীতে যেতে হবে।'

মুসোলিনী তাঁর সেক্রেটারীসহ অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীতে উঠিলেন। একজন লেফটেনেন্ট, তিনজন সশস্ত্র সামরিক পুলিশ, সাদা পোশাকের দুইজন পুলিশ-গোয়েন্দা এবং উক্ত ক্যাপ্টেন সকলেই গাড়ীতে উঠিলেন—এ্যাম্বুলেন্সের দরজায়

মেশিনগানসহ পাহারা ছিল। যখন অ্যাম্বুলেন্সের দরজা বন্ধ করা হইল, তখন গাড়ীটি 'টপ্ স্পীডে' বা চরমবেগে ছুটিয়া চলিল। মুসোলিনী তখনও কিছু সন্দেহ করেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যই এই সমস্ত কিছু করিতেছেন।

মুসোলিনীর নিজস্ব উক্তি—**'I still thought that all was being done' as the King had said, in order to protect my person,...**

দোর্দণ্ড প্রতাপ মুসোলিনী এভাবে প্রায় নিঃশব্দে ক্ষমতা থেকে অপসৃত হইলেন। যিনি আজীবন রক্তপাত করিয়াছেন, অঙ্গুলি-হেলনে শাসন করিয়াছেন, অসংখ্য লোককে গুলি করিয়া মারিয়াছেন, তাঁকে রক্ষার জন্য কিন্তু একটি গুলিও নিক্ষিপ্ত হইল না, কেউ টু-শব্দটিও করিল না!

সেই রাত্রে পর পর তিনটি রেডিও বার্তা সমগ্র ইতালীয় জনগণের উদ্দেশে প্রচার করা হইল'—(১) মুসোলিনী পদত্যাগ করিয়াছেন এবং মহামান্য রাজা তা গ্রহণ করিয়াছেন। (২) আবিসিনিয়া যুদ্ধের প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি মার্শাল বদোগ্লিও নূতন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়াছেন এবং (৩) মহামান্য রাজা নিজ হাতে সর্বোচ্চ সামরিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। যুদ্ধ যথারীতি চলিবে।

এদিকে মুসোলিনীকে পোঞ্জা দ্বীপে অন্তরীণে পাঠান হইল। নূতন প্রধানমন্ত্রী বাদোগ্লিও মুসোলিনীকে অন্তরীণে পাঠাইবার হুকুমনামা স্বাক্ষর করিলেন।

এভাবে 'বৈধ বিপ্লবের' পটভূমিকায় মুসোলিনী তাঁর ২০ বছরের একচ্ছত্র ক্ষমতা থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে (রাজার ঘড়িতে তখন ৫টা ২০ মিনিট) অপসারিত হইলেন। রাষ্ট্র ও সমাজের শীর্ষ ব্যক্তিদের শলাপরামর্শে ও চক্রান্তে মুসোলিনীকে এমনভাবে গ্রেপ্তার করিয়া নির্বাসনে পাঠানো হইল যে, জনসাধারভ গোড়ায় কিছুই টের পাইল না। কিন্তু রেডিও যোগে সেই বার্তা যখন সারা ইতালীতে প্রচারিত হইল, তখন একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার ঝড় বহিয়া গেল এবং জনসাধারণ যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

'ইতালির সমস্ত শহরে ও গ্রামে মুসোলিনীর পতনের বার্তা প্রচারিত হইতে-না-হইতেই স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলন দেখা দিল। ফ্যাসিস্ট ফেস্টুনগুলি ছিঁড়িয়া ফেলা হইল, কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলা হইল, ফ্যাসিস্টরা যে সমস্ত গণতন্ত্রবাদী নেতাদের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁরা আবার বক্তৃতা মঞ্চে দেখা দিলেন। নূতন ও পুরাতন গণতন্ত্রী সংবাদপত্রসমূহ আবার ছাপাখানা হইতে বাহির হইতে লাগিল। শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন দেখা দিল।'—জনৈক ইতালীয় সাংবাদিকের মন্তব্য।[১]

চার্চিল কিন্তু মুসোলিনীর পতনের পর তাঁর উদ্দেশে দিঞ্চিৎ প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ না-করিয়া পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

'এভাবে ইতালীতে মুসোলিনীর ২১ বছরের ডিক্টেটরগিরি শেষ হইয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে তিনি ইতালীর জনসাধারণকে সারা ইউরোপের মধ্যে এমন এক অবস্থায় উন্নীত করিয়াছিলেন, যে উন্নতি তাঁরা কখনও দেখে নাই। অন্যথা ইতালীয় জনগণ ১৯১৯ সালে বলশেভিক গ্রাসে পড়িয়া যাইত। জাতীয় জীবনে নূতন স্পন্দন

১। **The Second Great War, Hammerton, Vol, VII. P, 2853.**

আনিয়াছিলেন মুসোলিনী। উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইতালীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জনহিতকর কর্ম সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালে ডুচে তাঁর দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির দ্বারা লীগ অব নেশনকে কাবু করিতে পারিয়াছিলেন—'একজন নেতার পরিচালনায় ৫০টি জাতি।' কিন্তু তাঁর রাজত্ব ইতালীয় জনগণের নিকট অতিরিক্ত ব্যয়বহুল হইয়াছিল। তথাপি এই কথা সত্য যে তাঁর সাফল্যের সময় প্রচুর লোক তাঁকে সমর্থন করিয়াছিলেন।'...

চার্চিলের মতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই মুসোলিনীর পক্ষে 'সর্বনাশের' কারণ হইয়াছিল।[১]

সেই সর্বনাশ এতদিনে রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে তাঁর নিঃশব্দে গ্রেপ্তারির মধ্যে পূর্ণ হইল।

কিন্তু চার্চিলের প্রশংসা হইতেছে একজন সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃক আর-একজন সাম্রাজ্য-লোভীর প্রশংসা—যার মুখে ছিল কমিউনিজমের প্রতি ভীতি ও বিদ্বেষ।

১। চার্চিল—পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮।

ষষ্ঠ পর্ব

তৃতীয় অধ্যায়

হিটলারের প্রতিক্রিয়া ও মুসোলিনীর উদ্ধার

বিংশ শতকের ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে আধুনিক রোমান সীজারের ভূমিকায় যিনি এতদিন লম্ফঝম্প দিতেছিলেন এবং ভূমধ্যসাগরের জল তোলপাড় করিতেছিলেন, তিনি হঠাৎ নিঃশব্দে রঙ্গমঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই বৈপ্লবিক ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপেক্ষা করা কঠিন ছিল। সুবিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক উইলিয়াম শাইরার লিখিয়াছেন:

'একটি বন্দুকের গুলিও নিক্ষিপ্ত হইল না, এমন কি ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়া পর্যন্ত তাঁকে রক্ষা করার জন্য কোন গুলি ছুঁড়িল না। তাঁর এভাবে অপমানজনক অপসারণের জন্য—রাজার সম্মুখ থেকে সোজা একেবারে জেলে চালান দেওয়ার জন্য কেউ কিছু মনে করিলেন বলিয়াও মনে হইল না। বরং তাঁর পতনে জনসাধারণের মধ্যে উল্লাস দেখা গেল। ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠাতার মত ফ্যাসিজমও অতি সহজেই ভাঙিয়া পড়িল। মার্শাল পিয়েত্রো বাদোগ্লিও জেনারেল ও অসামরিক ব্যক্তিদের লইয়া একটি নির্দলীয় গভর্নমেণ্ট গঠন করিলেন। ফ্যাসিস্ট পার্টি বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি থেকে ফ্যাসিস্টদের অপসারণ করা হইল এবং ফ্যাসিবিরোধীদিগকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হইল।'[১]

মুসোলিনীর এই আকস্মিক অপমানজনক পতনের সংবাদ যখন হিটলারের তাঁবুতে পেঁৗছিল তখন কি ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া ঘটিল, তা সহজেই অনুমেয়। নাৎসী শিবিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। কেননা, ২০ বছরের অধিককাল যে মুসোলিনী অপ্রতিহত গতিতে ইতালীতে একচ্ছত্র রাজত্ব চালাইতেছিলেন, যদি তাঁরই এমন দশা হইতে পারে, তবে, রোমের এই নাটক কি একদিন বার্লিনেও অভিনীত হইতে পারে না?—এই দুশ্চিন্তা বিদ্যুৎ ফলকের মত হিটলারী পার্শ্বচরদের মনে খেলিয়া গেল। মুসোলিনী কি হিটলারের পক্ষেও বিপদজনক নজীর স্থাপন করিলেন না? প্রচার সচিব ডঃ গোয়েবলসের ডাক পড়িল। ২৬শে জুলাই গোয়েবলস তড়িঘড়ি ছুটিয়া আসিলেন রাস্তেনবুর্গে হিটলারের সদর দপ্তরে। প্রচার সচিবের প্রথমেই দুর্ভাবনা হইল কিভাবে জার্মান জনগণের কাছে মুসোলিনীর এত বড় পতন সংবাদ তুলিয়া ধরা যায়? তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন—(তাঁর লেখা ডায়েরী থেকে জানা যায়) জার্মান জনগণকে কি বলা হইবে? তিনি মনে মনেই স্থির করিলেন আপাততঃ জার্মান জনগণকে মাত্র এই কথা বলা হইবে যে, 'স্বাস্থ্যের খাতিরে' ডুচে পদত্যাগ করিয়াছেন!' তিনি ডায়েরীতে লিখিলেন—

'এই সমস্ত ঘটনা যদি বার্লিনে প্রচার হয়, তবে, রোমে বাদোগ্লিও ও তাঁর অনুচরেরা যে কার্য হাসিল করিয়াছেন, বার্লিনেও রাষ্ট্রদ্রোহিরা তেমন কার্য সম্পাদনের

১। The Rise and Fall of the Third Reich—P. 1185.

প্ররোচনা পাইতে পারে। সুতরাং ফুরার হিমলারকে হুকুম দিলেন তেমন কোন আসন্ন বিপদের আভাস পাওয়ামাত্র কঠোরতম পুলিশী ব্যবস্থা যেন অবলম্বন করা হয়।'

তবে হিটলার কিন্তু মনে করিলেন না যে, জার্মানীতে তেমন কোন বিপদ আসন্ন। যদিও মাত্র দিন পনের আগে তিনি মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁর মধ্যে কিছু কিছু 'ভাঙনের লক্ষণ' দেখিয়াছিলেন, তবু কিন্তু রোম থেকে পাঠানো প্রাথমিক সংবাদগুলিতেও তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হইয়াছিলেন। ২৫শে জুলাই অপরাহ্নে তিনি প্রথম ফ্যাসিস্ট গ্রান্ড কাউন্সিলের বৈঠকের সংবাদ শুনিলেন এবং আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেন, কাউন্সিলের বৈঠক কেন? এই সমস্ত বৈঠকে একমাত্র বকবকানী ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়?'

কিন্তু পরে তার নিকৃষ্টতম আশঙ্কাগুলিই সত্যে পরিণত হইল। রাত্রি সাড়ে-নয়টার সময় যখন সামরিক বৈঠক বসিয়াছিল, তখন হিটলার তাঁর বিস্মিত সেনাপতিদের নিকট ঘোষণা করিলেন, 'ডুচে পদত্যাগ করেছেন!'—'এবং আমাদের তিক্ততম শত্রু বাদোগ্লিও গভর্নমেন্টের দায়িত্ব নিয়েছেন।'...

হিটলার এই পর্যন্ত তাঁর জীবনের কঠিনতম দুর্দিনেও কিংবা উজ্জ্বলতম সাফল্যের দিনেও যেরূপ আশ্চর্য ঠাণ্ডা মাথায় স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের দুর্লভ ক্ষমতা ও সাহস দেখাইয়াছেন, আজিকার এই গভীর সংকটেও ফুরার তেমনি 'হিমশীতল সিদ্ধান্ত' গ্রহণের আশ্চর্য শক্তি দেখাইলেন।

যখন জেনারেল জড্‌ল তাঁকে বলিলেন যে, রোম থেকে আরও বিস্তৃত সংবাদের জন্য তাঁদের অপেক্ষা করা উচিত, তখন হিটলার তাঁকে থামাইয়া দিলেন—

'নিশ্চয়ই অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু তথাপি আমাদের আগে থেকেই প্ল্যান করে এগিয়ে যাওয়া উচিত। রোমের ওই বিশ্বাসঘাতকগুলি নিশ্চয় ঘোষণা করবে যে, তারা আমাদের প্রতি বিশ্বস্তই থাকবে। কিন্তু আসলে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তারা নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত থাকবে না।...যদিও ওই বাদোগ্লিও লোকটা ঘোষণা করেছে যে, যুদ্ধ চলতেই থাকবে, তবু আসলে কিন্তু কোন তফাত হবে না। তাদের এই সমস্ত কথা বলতেই হবে, কিন্তু তবু ব্যাপারটা বিশ্বাসঘাতকতাই থেকে যাবে। একটি আঘাতে দলবলসুদ্ধ সকলকে ধরে নিয়ে আসার জন্য সমস্ত আয়োজন যখন পাকা করতে থাকবো, তখন আমরাও কিন্তু তাদের সঙ্গে একই খেলা খেলব।'

হিটলারের মনে এভাবে প্রথম চিন্তা দেখা দিল যারা মুসোলিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছে, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা এবং মুসোলিনীকে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। হিটলার বলিলেন—

'Tomorrow I'll send a man down there with orders for the Commander of Third Panzergranadier Division to the effect that he must drive into Rome with special detail and and arrest the whole government, the King and the whole bunch right away. First of all, to arrest the Crown Prince and to take over the whole gang, despecially Badoglio and that entire crew. Then watch them cave in, and in two or three days there will be another Coup.'

সোজা কথায় হিটলার ইতালীর রাজা, যুবরাজ, বাদোগ্লিওর গভর্নমেন্ট ইত্যাদি সকলকে ধরিয়া আনিবার মতলব করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে রোমে একটি যান্ত্রিক

ডিভিসন পাঠাইবার সংকল্প করিলেন। এভাবে তিনি দুই-তিনদিনের মধ্যে রোমে আর-একটি আঘাত হানার আশায় রহিলেন।[১]

এই প্রসঙ্গে হিটলার তাঁর হাইকমাণ্ডের সামরিক নেতাদের সঙ্গে যে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন তার সামান্য কিছু উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। হিটলার জড্লের প্রতি নির্দেশ দিলেন—

'তাড়াতাড়ি হুকুমনামাগুলি তৈরী করুন…আঘাতহানা কামান নিয়া তাদেরকে সোজা রোমের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে বলুন। আর রাজা, গভর্নমেন্ট এবং সমস্ত দলবলকে গ্রেপ্তার করতে বলে দিন। সকলের আগে আমি ক্রাউন প্রিন্সকে চাই।'

কাইটেল—'বৃদ্ধ রাজার চেয়ে যুবরাজের গুরুত্ব অনেক বেশী'।

জনৈক বিমান সেনাপতি—'এমনভাবে সমস্ত ব্যাপারটার সংগঠন করতে হবে যেন সকলকে গ্রেপ্তার করে একটি প্লেনে উড়িয়ে নিয়ে আসা যায়।'

হিটলার—'হ্যাঁ, ঠিক, সোজা একটি প্লেনে ভর্তি করে আনতে হবে।'…

এই প্রসঙ্গে অনেক রাত্রে পোপের ভ্যাটিকানের প্রশ্ন উঠিলে হিটলার অবজ্ঞাভরে ভ্যাটিকানের প্রশ্ন উড়াইয়া দিলেন। এমনও তিনি মন্তব্য করিলেন যে ওখানকার বিদেশী দূতগুলিকে 'শূকরের মতো খেদিয়ে দেওয়া হবে, পরে না হয় ক্ষমা-প্রার্থনা করা হবে।'

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভ্যাটিকানে যে, সমস্ত বিদেশী রাষ্ট্রের দূত ছিলেন, তাঁদের কাহারো কাহারো সঙ্গে মুসোলিনীর বিরুদ্ধবাদীরা—বিশেষভাবে কাউন্ট চিয়ানো যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের আশায়, এমন সন্দেহ বার্লিনে প্রবল ছিল। হিটলারের ক্রোধের কারণও এখানে।)

হিটলার অপেক্ষা করিলেন না। সেই রাত্রেই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হুকুম দিলেন। ইতালী ও জার্মানী এবং ইতালী ও ফ্রান্সের মধ্যে যে বিখ্যাত আলপাইন গিরিবর্ত্ম-গুলি রহিয়াছে, সেগুলির অবিলম্বে নিরাপত্তা বিধানের জন্য। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দক্ষিণ জার্মানী ও ফ্রান্স থেকে ৮ ডিভিসন জার্মান সৈন্য সংগৃহীত হইল এবং আর্মি গ্রুপ 'বি' হিসাবে তাদের অধিনায়কত্ব দেওয়া হইল উৎসাহী সেনাপতি রোমেলের উপর।

এই সময় ইতালীয়রা একটি চমৎকার সুযোগ হারাইলেন। যদি তাঁরা বুদ্ধি খাটাইয়া (গোয়েবলসের ডায়েরী অনুসারে) আলপাইন পাশের বা গিরিবর্ত্মের সমস্ত টানেল্ ও ব্রীজ (সুড়ঙ্গ ও সেতু) উড়াইয়া দিতেন, তবে, ইতালীতে অবস্থিত জার্মান সৈন্যদলের সমস্ত সরবরাহের যোগাযোগ নষ্ট হইয়া যাইত এবং জার্মানরা এই অবস্থায় টিকিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু সেই সুযোগ ইতালীয়রা পাইলেন না। কারণ, বাদোগ্লিওকে প্রথমেই দেখিতে হইল যে, তিনি ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও যুদ্ধবিরতি ঘটাইতে পারেন কি না এবং জার্মান সৈন্যদের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের সমর্থন পাইতে পারেন কি না।

হিটলার কিন্তু এই সমস্ত কথা পূর্বাহ্নেই সঠিক অনুমান করিয়াছিলেন এবং ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, বাদোগ্লিও ওই কার্য করিবে। কিন্তু বাদোগ্লিওর বা মিত্রপক্ষের এত দেরী হইবে, একথা হিটলারও ভাবিতে পারেন নাই।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১১৮৬।

২৭শে জুলাই সেই রাত্রে হিটলার তাঁর সমস্ত পাত্রমিত্র ও সামরিক পুরুষদের নিয়া তাঁর সদর দপ্তরে এক উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা বৈঠকের অনুষ্ঠান করিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গোয়েরিং, গোয়েবেলস, হিমলার, রোমেল এবং নৌবাহিনীর সদ্য নিযুক্ত প্রধান অধিনায়ক অ্যাডমিরাল কার্ল ডোয়নিৎস। (গত জানুয়ারীতে অ্যাডমিরাল রায়েডার পদচ্যুত হইয়াছিলেন।) এই আলোচনা বৈঠকে রোমেলের নেতৃত্বে অধিকাংশ জেনারেল হিটলারকে পরামর্শ দিলেন সতর্ক হওয়ার জন্য, ইতালী সম্পর্কে অগ্র-পশ্চাৎ আরো ভালো করিয়া বিবেচনার জন্য। হিটলার কিন্তু চাহিতেছিলেন অবিলম্বেই রোমের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য। এইজন্য যদি পূর্বরণাঙ্গন থেকে কয়েক ডিভিসন উৎকৃষ্ট যান্ত্রিক সৈন্যও সরাইয়া আনিতে হয়, তাতেও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। অথচ সেই সময় (১৫ই জুলাই) কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনে রুশেরা তাঁদের গ্রীষ্মকালীন অভিযান শুরু করিয়াছিলেন।

যুদ্ধের মধ্যে এই প্রথম দেখা গেল যে, হিটলার তাঁর জেনারেলদের পরামর্শে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। হিটলারকে অবিলম্বেই রোম অভিযান থেকে ক্ষান্ত থাকার জন্য বারণ করা হইল এবং হিটলার তা মানিলেন। ইতিমধ্যে অবশ্য আলপাইন গিরিবর্ত্মগুলি দখল করার জন্য অতি দ্রুত সৈন্য পাঠানো হইল। জেনারল রোমেল সমগ্র ইতালীর প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। গোয়েবেলস কিন্তু মনে মনে খুশী হইলেন না। তিনি তাঁর ডায়েরীতে নোট করিলেন:

'সেনাপতিরা কিন্তু ভেবে দেখছেন না যে শত্রুপক্ষ কি করতে উদ্যত? আমরা যতক্ষণ শলাপরামর্শ করছি, রণক্রিয়ার কথা ভাবছি, ততক্ষণ কিন্তু ইংরেজরা এক সপ্তাহ অপেক্ষা করবে না।'[১]

কিন্তু গোয়েবেলস বা হিটলার বৃথাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কারণ, ইংরাজেরা বা মিত্রপক্ষ এক সপ্তাহ নয়, ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করিলেন। ততক্ষণে হিটলার তাঁর সমুদয় প্ল্যান প্রস্তুত ও কার্যকর করার ব্যবস্থা একেবারে হাতে-কলমে পাকা করিয়া ফেলিলেন।

হিটলারের এই দ্রুত চিন্তা ও সিদ্ধান্তের কাছে মিত্রপক্ষ নিতান্তই হারিয়া গেলেন কিংবা জব্দ হইলেন। কেন না, শেষ পর্যন্ত ইতালীর যুদ্ধে অতিরিক্ত দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল এবং কার্যতঃ মিত্রপক্ষ ল্যাজে-গোবরে একাকার হইয়াছিলেন।

এদিকে হিটলার মুসোলিনীকে উদ্ধার ও রোম দখলের জন্য চারটি বিকল্প পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিলেন, যথা—

(১) যদি মুসোলিনী কোন দ্বীপে বন্দী হইয়া থাকেন, তবে, জাহাজযোগে উদ্ধার অথবা যদি ভুভাগের কোন স্থানে আটক থাকিয়া থাকেন, তবে বিমানবাহিত ছত্রী সৈন্যের দ্বারা উদ্ধার। (২) অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা রোম দখল ও মুসোলিনীর সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। (৩) অথবা প্রয়োজন হইলে সমগ্র ইতালী সামরিক দখলে আনয়ন এবং (৪) ইতালীয় নৌবহর ধৃতকরণ কিংবা ধ্বংসকরণ।

মুসোলিনীর ব্যক্তিগত নেতৃত্বে একটি নূতন ইতালীর ফ্যাসিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য হিটলার অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিলেন এবং সেইজন্যই মুসোলিনীকে উদ্ধারের প্রয়োজন। তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা ও বন্ধুতা প্রমাণের জন্য এক নূতন উপলক্ষও তিনি

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১১৮৮।

পাইয়া গেলেন। ২৯শে জুলাই ছিল প্রাক্তন ডুচের ৬০তম জন্মদিন। হিটলার ঐ জন্মদিন উপলক্ষে সমস্ত জার্মান সংবাদপত্রে মুসোলিনীর প্রশস্তি প্রকাশের জন্য নির্দেশ দিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, প্রাক্তন ডুচের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইবার জন্য জার্মান দার্শনিক নীট্শের ২৪ খণ্ড গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে বাঁধাই পূর্বক মুসোলিনীকে উপহার দেওয়া হইবে এবং হিটলার স্বহস্তে সেই উৎসর্গ-পত্র রচনা করিবেন। কার্যতও তিনি তাই করিলেন। কিন্তু মুসোলিনীর প্রতি এতটা ভক্তি প্রকাশে এবং পুনরায় ফ্যাসিস্ট সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণে মুসোলিনীর যোগ্যতা সম্পর্কে হিটলারের সহচরদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিল। গোয়েরিং এবং রিবেনট্রপ হিটলারকে সমর্থন করিলেন বটে, কিন্তু ডোয়েনিৎস, রোমেল এবং জড্ল সংশয় প্রকাশ করিলেন ও মন্তব্য করিলেন যে, ফুরার অতিরিক্ত আশাবাদী। তখন হিটলার তুরুক জবাব দিলেন—

"কোন সৈন্যের মাথায় এই সমস্ত বস্তু ঢুকবে না। একমাত্র যাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি আছে, তিনিই ভবিষ্যত পরিষ্কার দেখতে পান।"[১]

* * *

সেপ্টেম্বর মাসের দুইটি ঘটনায় হিটলারকে তাঁর পরিকল্পনা প্রয়োগের সুযোগ আনিয়া দিল। প্রথমতঃ ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, মিত্রবাহিনী দক্ষিণতম ইতালীতে অবতরণ করিল এবং দ্বিতীয়তঃ ৮ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইল যে, ইতালী ও পাশ্চমী শক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে—অবশ্য এই চুক্তি আগেই গোপনে ৩রা সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

ঐ দিন হিটলার উক্রাইন থেকে বিমানযোগে সন্ধ্যাবেলা পূর্ব প্রুশিয়ায় তাঁর সদর দপ্তরে আসিলেন এবং আসিয়াই শুনিলেন যে, তাঁর প্রধানতম সমরসঙ্গী ও মিত্র ইতালী তাঁকে ত্যাগ করিয়াছে। যদিও হিটলার এটা পূর্বাহ্নেই অনুমান করিয়াছিলেন, তবুও সেদিন সেই মুহূর্তে এই খবর পাওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই ঘটনায় হিটলারের সদর দপ্তরে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া বিহ্বলতার সৃষ্টি হইল। জার্মানরা প্রথম বি-বি-সি লণ্ডন থেকে ইতালীর যুদ্ধবিরতির সংবাদ শুনিয়াছিলেন। পরে জেনারেল জড্ল ঐ সংবাদ পাকা কিনা জানিবার জন্য র‍্যাস্তেনবুর্গ থেকে রোমের নিকটবর্তী ফ্রাসক্যাটি শহরে মার্শাল কেসেলরিং-এর নিকট টেলিফোনে যোগাযোগ করিলেন। মার্শাল কেসেলরিংও স্বীকার করিলেন যে, তিনিও ওই সংবাদ পাইয়াছেন। সেই সময় কেসেলরিং-এর সদর দপ্তর মিত্রবাহিনীর বোমায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তবু সেই অবস্থায় ইতালী দখলের জন্য সামরিক পরিকল্পনার হিটলারী নির্দেশ তিনি কোন মতে পাইয়া গেলেন এবং কেসেলরিং সেই দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ ইতালীতে জার্মান সৈন্যদলের অবস্থা সেই সময় বিষম সংকটপূর্ণ ছিল। রোমের উপকণ্ঠে ছিল মাত্র ২ ডিভিসন জার্মান সৈন্য। কিন্তু তাদের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল ৫ ডিভিসন ইতালীয় সৈন্য। যদি সেই সময় মিত্রপক্ষের শক্তিশালী নৌবহর—যে নৌবহর ৮ই সেপ্টেম্বর নেপলসের অদূরে দেখা গিয়াছিল—উত্তরদিকে ঘুরিয়া গিয়া রাজধানীর নিকট অবতরণ করিত এবং প্যারাসুটি সৈন্যদলের সাহায্যে রোমের বিমান ক্ষেত্রগুলি দখল করিয়া নিত, যেটা মার্শাল কেসেলরিং আশঙ্কা করিতেছিলেন, তবে, ইতালীয় যুদ্ধের ইতিহাস যেমন ভিন্ন রকম হইত, তেমনি

১। Hitler—Alan Bullock, Pelican P. 709.

জার্মানীর চূড়ান্ত বিপর্যয় হয়ত আরো এক বছর আগেই ঘটিয়া যাইত। এমন কি পরিস্থিতি এমন ভয়ানক ছিল যে, ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাবেলা হিটলার ও তাঁর হাইকমান্ড ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, ইতালীতে অবস্থিত ৮ ডিভিসন জার্মান সৈন্য চিরদিনের জন্য খতম হইয়া গিয়াছে! দুই দিন বাদে হিটলার গোয়েবলসের নিকট বলিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ ইতালী হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, রোমের উত্তরে এ্যাপিনাইনস পর্বতমালার মধ্যে নূতন লাইন স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু মিত্রপক্ষের 'অকর্মন্যতার' জন্য হিটলার ইতালীয় সংকট থেকে আশ্চর্যজনকভাবে রেহাই পাইয়া গেলেন।

গোটা উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও সিসিলি দ্বীপ তখন মিত্রবাহিনীর দখলে। ভূমধ্যসাগরে মিত্রপক্ষের নৌবহরের একাধিপত্য এবং আকাশে বিমান বহরের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব। স্বভাবতঃই এই অবস্থায় জার্মান সেনাপতিরা আশংকা করিয়াছিলেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইতালীর পূর্ব বা পশ্চিম কোন উপকূলের যে কোন অংশে অবতরণ করিবে এবং ইতালীর জলপথ, আকাশপথ ও স্থলপথের অবাধ সুযোগ নিয়া ইতালীর অভ্যন্তরে অভিযান করিবে। সারা ইউরোপের মধ্যে একমাত্র ইতালীয় উপদ্বীপের ভৌগোলিক সংগঠন এমন ছিল যে, পূর্ব বা পশ্চিম যে কোন দীর্ঘ উপকূলে অবতরণ করা যাইতে পারে। এমন কি, রোমের উপকণ্ঠে যে ৫ ডিভিসন ইতালীয় সৈন্য ছিল, তাদের সহযোগিতায় জেনারেল আইজেনহাওয়ার রোম দখল করিয়া নিবেন, জার্মান সেনাপতিরা এমন আশংকাও করিতেছিলেন। যদি তাই ঘটিত, তবে, জার্মানদের পক্ষে কোন উপায়ও থাকিত না। কেন না, ইতালীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে অগ্রসরমান মন্টগোমারীর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যদি মার্কিন সেনাপতি জেনারেল মার্ক ক্লার্কের অভিযাত্রী বাহিনী ইতালীর উপকূলে অবতরণ করিত এবং অভ্যন্তরভাগে অপেক্ষমাণ ইতালীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যদি মিত্রপক্ষ সহযোগিতা ও যোগাযোগ স্থাপন করিত, তবে, ইতালীতে জার্মানদের তখন রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালীতে এই অভিযানের সুযোগ নষ্ট হওয়ার জন্য ব্রিটিশ এবং মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর প্রধানদ্বয় উভয়ই জেনারেল আইজেন-হাওয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ইতালীতে আগাইয়া যাওয়ার জন্য তিনি (আইজেনহাওয়ার) যথেষ্ট পরিমাণ উদ্যোগ দেখান নাই। এই অভিযোগের জবাবে আইজেনহাওয়ারের নৌসহকারী ক্যাপ্টেন বুচার এবং আইজেন-হাওয়ার নিজে তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে ('ক্রুসেড ইন ইউরোপ') বলিয়াছেন যে, সেই সময় উপকূলভাগে অবতরণের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক জলযান ছিল না। ফলে আইজেন-হাওয়ারের পক্ষে রোম পর্যন্ত অভিযান করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ রোম পর্যন্ত বহুদূরের পথের সামুদ্রিক অভিযান করার জন্য যে দূর পাল্লার জঙ্গী বিমানের দরকার ছিল, সেই দিক থেকেও অসুবিধা ছিল। কেননা, এই সমস্ত জঙ্গী বিমানকে সিসিলি দ্বীপের বিমানক্ষেত্র হইতে উড়িয়া আসিতে হইত, অর্থাৎ রোম তখন ছিল জঙ্গী বিমানের রণক্রিয়ার পাল্লার বাইরে। তৃতীয়তঃ সিসিলি দখলের পর আইজেনহাওয়ারকে ৪ ডিভিসন আমেরিকান ও ৩ ডিভিসন ব্রিটিশ, মোট ৭ ডিভিসন সৈন্য চ্যানেল অভিযানের প্রস্তুতি স্বরূপ ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইল। ফলে, আইজেন-হাওয়ারের সৈন্য শক্তিতে বিষম টান পড়িল। অধিকন্তু আইজেনহাওয়ার ইতালীয়দিগকে

রোম দখলে রাখিবার জন্য সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিমান ছত্রীবাহিনী পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখন একদিকে জার্মানদের উপস্থিতি এবং অন্যদিকে ইতালীয়দের পরাজিত মনোভাবের জন্য, আর মার্শাল বাদোগ্লিওর আপত্তির জন্য আইজেনহাওয়ারের এই পরিকল্পনা কাজে খাটানো যায় নাই। জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর (মার্কিনপক্ষীয়) তখন গোপন পরামর্শের জন্য লুকাইয়া এবং বহু বিপদের ঝুঁকি নিয়া রোমে গিয়াছিলেন মার্শাল বাদোগ্লিওর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু বাদোগ্লিও সেই সময় রোমের নিকট মার্কিন বিমান সৈন্যের অবতরণে রাজী হন নাই।[১]

সোজা কথায়, যে কোন কারণেই হোক মিত্রপক্ষ রোম অভিযান করিলেন না, তার বদলে তারা নেপলসের দক্ষিণে স্যালারনোতে অবতরণ করিলেন—৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৩। জার্মানরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাদের আরো সৌভাগ্যের উদয় হইল। ইতালীয় সৈন্যবাহিনী বিনা বাধায় জার্মানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল, একটি গুলিও তারা ছুঁড়িল না। সমস্ত ইতালীয় ডিভিসনকে জার্মানরা স্বচ্ছন্দে নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল! ইতালীয় সৈন্যদের কোন নৈতিক শক্তিও রহিল না। রাজা ও বাদোগ্লিও রাতারাতি রোম থেকে পলায়ন করিয়া দক্ষিণ ইতালীতে মিত্রপক্ষের অধিকৃত এলাকায় গিয়া আশ্রয় নিলেন। ফলে সমগ্র ইতালীর দুয়ার জার্মানদের জন্য খুলিয়া গেল—দুই-তৃতীয়াংশ ইতালী অতি সহজেই জার্মানদের দখলে আসিয়া গেল। উত্তর ইতালীর শিল্পসমৃদ্ধ নগরী ও কারখানাগুলি জার্মানদের করায়ত্ত হইল এবং এই সমস্ত কারখানা থেকে নূতন করিয়া সমরাস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা হইল। এই ঘটনার উপর উইলিয়ম শাইরার মন্তব্য করিয়াছেন—

'Almost miraculously Hitler has received a new lease on life'.

—প্রায় দৈবক্রমেই হিটলার নূতন জীবনের মেয়াদ পাইয়া গেলেন।

কিন্তু ইতালি যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়ায় এবং জার্মানীকে ছাড়িয়া যাওয়ায় হিটলার যে ক্ষেপিয়া আগুন হইলেন সে কথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। তিনি এই ঘটনাকে ইতালীর 'প্রকাণ্ড রকমের শূকরবৃত্তি' বলিয়া গালাগালি দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মুসোলিনীর পরিণাম দেখিয়া নিজের পরিণাম সম্পর্কেও শঙ্কিত হইলেন এবং জার্মানীতে যাতে এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে না পারে, তার জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতা ও ব্যবস্থা অবলম্বনের পুনরায় নির্দেশ দিলেন।

প্রচার সচিব গোয়েবেলসের অনুরোধে তিনি এই গভীর সঙ্কটে জার্মান জনগণকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে এক রেডিও বক্তৃতায় খুব ডম্ফাই করিয়া বলিলেন—'ন্যাশনাল সোসিয়ালিস্ট রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে যাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা নাই, তাঁরাই এখানে বিশ্বাসঘাতকের আশা করিতে পারেন। আমার ব্যক্তিগত "পজিসন" সম্পর্কে যাঁদের মূলগতভাবেই নিতান্ত ভ্রান্তি রহিয়াছে এবং যারা আমার রাজনৈতিক সহযোগী, আমার ফিল্ড মার্শাল, এ্যাডমিরাল ও জেনারেলদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করেন তাঁরাই জার্মানীতে ২৫শে জুলাইয়ের পুনরাবৃত্তির কথা বিশ্বাস করিতে পারেন।'

(ইতিহাসের বিদ্রূপ এই যে, পরের বছর জুলাই মাসেই হিটলারকে হত্যার জন্য এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। ১৯৪৩-এর ২৫শে জুলাই মুসোলিনী পদচ্যুত

১। উইলিয়াম শাইরার, পৃষ্ঠা ১১৯০।

হইয়াছিলেন, আর ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই হিটলারকে খুন করার জন্য জার্মান জেনারেলরা বোমা বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, যে ঘটনা মুসোলিনীর চেয়েও মারাত্মক ছিল।)

মুসোলিনীর দৃষ্টান্ত থেকে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য হিটলার যে সমস্ত জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সমস্ত জার্মান প্রিন্সদের (রাজপুত্রদের) সৈন্যবাহিনী হইতে বিতাড়ন করা। রাজপুত্র ফিলিপ (প্রিন্স ফিলিপ অব হেস্) বিশিষ্ট পদাধিকারী ছিলেন, হিটলারের নির্দেশে তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া গেস্টাপোর হাতে সমর্পণ করা হইল। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইতালীয় রাজার কন্যা। হিটলার তাঁকেও রেহাই দিলেন না। তাঁকেও গ্রেপ্তার করিয়া স্বামী-স্ত্রীকে এক সঙ্গে বন্দীনিবাসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ইতালীর রাজা রোম ছাড়িয়া পলায়নপূর্বক হিটলারের নাগালের বাইরে মিত্রপক্ষের আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই রাগে হিটলার তাঁর কন্যাকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রতিশোধ নিলেন।

* * *

হিটলারের মনে শান্তি ছিল না। বন্ধু মুসোলিনীর জন্য তাঁর বুকের ভিতরে কাঁটার মতো বিদ্ধ হইতেছিল এবং তখন থেকে প্রতিদিনের সামরিক বৈঠকে তিনি জেনারেলদের সঙ্গে মুসোলিনীর উদ্ধারের বিষয় নিয়া আলোচনা করিতেন। মুসোলিনীর উদ্ধারের সামরিক পরিকল্পনার সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশান ওক্' এবং হিটলার মনে মনে চাহিতেছিলেন মুসোলিনীকে উদ্ধারপূর্বক তাঁর নেতৃত্বে নূতন ইতালীয় ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা দেওয়া। সদর দপ্তরে সামরিক বৈঠকের আলোচনায় মুসোলিনীকে সর্বদাই 'The valuable object' বা 'মূল্যবান বস্তু' বলিয়া উল্লেখ করা হইত। যদিও জেনারেলদের অধিকাংশই, এমন কি গোয়েবলস পর্যন্ত মুসোলিনীকে আর তেমন মূল্যবান বস্তু বলিয়া গণ্য করিতেন না, তবু হিটলার কিন্তু তাঁর জন্য একান্ত দরদী ছিলেন এবং মুসোলিনীর উদ্ধারের জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশ্য এটা যে কেবল মুসোলিনীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধানের জন্যই প্রয়োজন ছিল, এমন নয়, হিটলারের সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও এর সঙ্গে জড়িত ছিল। যদি মুসোলিনীকে উদ্ধার করিয়া তাঁর নেতৃত্বে আবার ইতালীতে নূতন ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়, তবে ইতালীর প্রশাসনিক কার্য চালাইবার দায়িত্ব ও ঝামেলা থেকে জার্মানী রেহাই পাইতে পারে। অধিকন্তু দীর্ঘ যোগাযোগের ও সরবরাহের লাইন রক্ষা করার দায়িত্বও নূতন ইতালীয় সরকারের উপর বর্তাইবে। এটার বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছিল এজন্য যে, উত্তর ইতালীতে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মধ্য থেকে তখন পার্টিজান যোদ্ধাদের 'উৎপাত' খুব জোর আরম্ভ হইতেছিল।

মুসোলিনীকে কোথায় বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে জার্মানদের পক্ষ থেকে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু হইয়া গিয়াছিল। আগস্ট মাসে নৌ-বিভাগ এবং হিমলারের দপ্তর পর পর দুইটি দ্বীপের নাম করিলেন যেখানে মুসোলিনীকে আটক করিয়া রাখা সম্ভব। সেই দ্বীপ দুইটিতে হানা দেওয়ার জন্য যখন নৌ-বিভাগ ও বিমান-বিভাগ হইতে খুব তোড়জোড় করা হইল, তখন জানা গেল যে, না, মুসোলিনীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

মিত্রপক্ষের সঙ্গে ইতালীর যে যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তার মধ্যে একটা গোপন শর্ত এই ছিল যে, বন্দী মুসোলিনীকে মিত্রপক্ষের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু মার্শাল বাদোগ্লিও অজ্ঞাত কারণে এই ব্যাপারেও গড়িমসি করিতেছিলেন। তখন সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে 'মূল্যবান বস্তুটিকে' আব্রুজ্জি এ্যাপিনাইন পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গে অবস্থিত একটি হোটেলে স্থানান্তরিত করা হইল। সেখানে পৌঁছিবার একমাত্র উপায় ছিল লোহার তারে ঝুলান রেলপথের দ্বারা।

শীঘ্রই হিটলারের কানে মুসোলিনীর এই নূতনতম বন্দী নিবাসের কথা পৌঁছিল। জার্মানরা অনতিবিলম্বে সেই পর্বতের শীর্ষদেশ বিমানযোগে পর্যবেক্ষণ ও সার্ভে করিল এবং স্থির করিল গ্লাইডার বাহিত সৈন্যের দ্বারা ওখানে অবতরণ করা যাইতে পারে এবং যে কয়েকটি ক্যারাবিনিয়েরি সামরিক পুলিশ পাহারা আছে, তাদেরকে কাবু করিয়া মুসোলিনীকে উদ্ধার এবং একটি ছোট্ট বিমানে উড়াইয়া নিয়া আসা যাইতে পারে। সমগ্র পরিকল্পনাটি যেমন দুঃসাহসিক, তেমনি গোয়েন্দা অভিযানের মত অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর ছিল।

এই অতি দুঃসাহসিক কাজের জন্য একজন অতি ধুরন্ধর ও সাহসী ব্যক্তির ডাক পড়িল হিটলারের খাস দরবারে। এই ব্যক্তি একজন অস্ট্রিয়ান, নাম অটো স্করজেনি (Otto Skorzeny) খোদ হিমলারের এস. এস. বাহিনীর খুব ওস্তাদ ও সুশিক্ষিত মস্তান পর্যায়ভুক্ত। ১৩ই সেপ্টেম্বর দুঃসাহসী স্করজেনি তাঁর অভুতপূর্ব সাহসিকতার অভিযানে অবতীর্ণ হইলেন। এই অভিযানে বাহির হওয়ার আগে তিনি কার্যত একজন ইতালীয় জেনারেলকে ধরিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁর গ্লাইডারের মধ্যে জেনারেলকে পুরিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি জেনারেল ও বিমানবাহী সৈন্যসহ সেই পার্বত্য শীর্ষ হোটেলের ১০০ গজ দূরে অবতরণ করিলেন। সেখান থেকে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, মুসোলিনী হোটেলের দোতলার একটি কক্ষের জানালা দিয়া হতাশভাবে বাহিরের দিকে তাকাইতেছেন। যে সমস্ত সামরিক পুলিশ হোটেলে পাহারা দিতেছিল, তারা সশস্ত্র জার্মান সৈন্যদের দেখামাত্র পাহাড়ে জঙ্গলে পালাইয়া গেল। যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভয়ে পালাইল না, মুসোলিনী ও স্করজেনি তাদেরকে বারণ করিলেন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করার জন্য। ধুরন্ধর স্করজেনি বুদ্ধি খাটাইয়া 'ধৃত' ইতালীয় জেনারেলকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড় করাইলেন এবং তিনি ও মুসোলিনী উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন—'গুলি করো না, কাউকে গুলি করো না, কারোর রক্তপাত করো না!'

কোন গুলি নিক্ষিপ্ত হইল না। কোন রক্তপাত হইল না।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আনন্দে বিহ্বল ডুচে অপেক্ষমান ছোট্ট প্লেনটিতে ঢুকিয়া পড়িলেন। হোটেলের নীচে একটি ক্ষুদ্র ময়দানের মতো ছিল এবং তাতে ইতস্ততঃ শিলা ও পাথর ছড়ানো ছিল, প্লেনের পক্ষে এমন জায়গা থেকে উড্ডয়ন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ও বিপদজনক ছিল। কিন্তু দুঃসাহসী স্করজেনি 'মূল্যবান বস্তু'টিকে প্লেনে পুরিয়া সেই বিপদজনক স্থান থেকে আকাশে উঠিয়া গেলেন। মুসোলিনীকে নিয়া তিনি সোজা চলিয়া গেলেন রোমে এবং সেখান থেকে জার্মান সামরিক বিমানে সেইদিন সন্ধ্যাতেই মুসোলিনী ভিয়েনায় নীত হইলেন।[১]

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক।—পৃষ্ঠা ১১৯২-৯৩।

মুসোলিনীর জোর বরাত যে, তিনি হিটলারের কৃপায় হঠাৎ বন্দী দশা থেকে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু মার্শাল বাদোগ্লিওর সঙ্গে ইতালীয় যুদ্ধবিরতি চুক্তির গোপন শর্ত অনুসারে যদি মুসোলিনীকে সত্যসত্যই ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করা হইত, তবে মুসোলিনীর অদৃষ্টে অপমানের অন্ত থাকিত না। কেননা, একটা মার্কিন থিয়েটার কোম্পানী জেনারেল আইজেনহাওয়ারের দপ্তরের কাছে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, মুসোলিনীকে যদি নিউইয়র্কের রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে দেওয়া হয়, তবে ঐ কোম্পানী তার বিনিময়ে যে কোন চ্যারিটিতে ১০ হাজার পাউণ্ড দান করিবেন!

মুসোলিনী তাঁর স্মৃতি পুস্তকে মন্তব্য করিয়াছেন যে, যদি এমন প্রস্তাব কার্যকর করার চেষ্টা হইত, তবে তিনি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিতেন!

মুসোলিনীকে অবশ্য নিউইয়র্কে মার্কিন রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের সামনে হাজির হইতে হইল না। কিন্তু দুইদিন পর একেবারে খোদ হিটলারের সামনে উপস্থিত হইতে হইল র‍্যাস্তেনবুর্গের সদর দপ্তরে। কৃতজ্ঞ মুসোলিনী হিটলারকে গভীর আবেগে ও আন্তরিকতার সঙ্গে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু হিটলার যে আশায় তাঁর একান্ত সমরসঙ্গী ও মিত্র মুসোলিনীকে এত হাঙ্গামা হুজ্জোত করিয়া উদ্ধার করিলেন সেই উচ্চাশা পূর্ণ হওয়ার সুযোগ দেখা গেল না। অর্থাৎ মুসোলিনীর গৌরবসূর্য অস্তমিত, তাঁর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যও ভগ্নপ্রায়। সেই উদ্যম, সেই সাহস, সেই দুর্দৈব বিলাসিতা কিছুই নাই—৬০ বছর বয়সেই মুসোলিনী যেন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ফলে হিটলার অধিকৃত ইতালীকে মুসোলিনীকে দিয়া পরাক্রমশালী ফ্যাসিস্ট রাজত্ব পুনরায় কায়েম করার জন্য ফুরার মনে মনে যে এত আশা পোষণ করিতেছিলেন, সেই বিষয়ে তাঁকে হতাশ হইতে হইল। গোয়েবেলস তাঁর ডায়েরীতে লিখিয়াছেন:

'ইতালীর বিপর্যয় থেকে মুসোলিনী যে নৈতিক শিক্ষা পাইবেন বলিয়া হিটলার আশা করিয়াছিলেন, ভুচে তার কিছুই পান নাই। ফুরার আশা করিয়াছিলেন যে, মুসোলিনী মুক্তি পাইয়া প্রথমেই যে কার্য করিবেন, তা হইতেছে বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লওয়া। কিন্তু মুসোলিনী তেমন কোন লক্ষণই দেখাইলেন না। সেখানেই তাঁর প্রকৃত দুর্বলতা পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিল। ফুরার বা স্ট্যালিনের মতো তিনি বিপ্লবী নন। তিনি তাঁর ইতালীয় জনগণের সঙ্গে এমনভাবে আবদ্ধ যে, বিশ্ব-বিপ্লবীর বা বিশ্ব-বিদ্রোহীর বিশাল গুণের অধিকারী হওয়ার মতো ধাত তাঁর নাই।'...

হিটলার আরও বিরক্ত হইলেন যে, মুসোলিনী তাঁর কন্যা এড্ডা এবং জামাতা কাউণ্ট চিয়ানোর সঙ্গে পুনর্মিলিত হইয়াছেন। এমনকি, তিনি যেন কন্যার অভিভাবকত্বে চলিতেছেন। এই দৃশ্য হিটলার ও গোয়েবেলসের ভাল লাগিল না। কেননা, যাদের চক্রান্তে মুসোলিনীর এই বিড়ম্বনা কাউণ্ট চিয়ানো ছিল সেই চক্রীদলের একজন সর্দার। সেই ব্যক্তির গর্দান নেওয়ার বদলে তার সঙ্গে আদর আপ্যায়ন করা হইতেছে, হিটলারের নিকট এটা অসহ্য মনে হইল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কাউণ্ট চিয়ানো এবং তাঁর স্ত্রী এড্ডা ইতিমধ্যে রোম থেকে মিউনিকে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু এর পিছনে ছিল নাৎসী জার্মানীর গভীর দুরভিসন্ধি, চিয়ানো এবং এড্ডাকে কার্যত জার্মান সরকার ভুলাইয়া এবং ভয় দেখাইয়া

মিউনিকে নিয়া গিয়াছিলেন। চিয়ানোকে এই বলিয়া ভয় দেখানো হইয়াছিল যে, তাঁর সন্তানদের জীবন বিপন্ন, যদি তিনি মিউনিকে আসেন, তবে তাঁর ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাঁদেরকে স্পেনে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং সরল বিশ্বাসেই চিয়ানো মিউনিকে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছিলেন। মুসোলিনীর প্রতিষ্ঠিত নূতন ফ্যাসিস্ট রিপাবলিকান পার্টির তিনি একজন অগ্রণী নেতারূপেও গণ্য হইলেন। হিটলার এতে আরও চটিয়া গেলেন। কারণ, হিটলারের মতে চিয়ানোকে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য গুলি করিয়া মারা উচিত, আর এড্ডাকে তাঁর 'বনবিড়ালীর মতো বদমেজাজের' জন্য বেত মারা উচিত। কিন্তু তার বদলে মুসোলিনী তাঁদেরকে আদর যত্ন করিতেছিলেন!

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, হিটলারের প্ররোচনায় মুসোলিনী নূতন ইতালীয় সোস্যাল রিপাবলিক রাষ্ট্রের ঘোষণা দিলেন বটে, কিন্তু নাৎসী অধিকৃত এলাকায় ওটা ছিল নিতান্তই 'পুতুল সরকার' মাত্র।

এত দুর্দশা সত্ত্বেও মুসোলিনীর এটুকু জ্ঞান ছিল যে, হিটলারের আওতায় ও হিটলারের কৃপায় যে নূতন গভর্নমেণ্ট ও রাষ্ট্রের ঘোষণা তিনি দিলেন, সেটা নাৎসী জার্মানীর তাঁবেদার সরকার ছাড়া আর কিছুই না এবং তাঁর নিজের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব ও স্বাধীন ইচ্ছা খাটাইবার সুযোগও রহিল না। এখন থেকে সম্পূর্ণরূপে জার্মানীর ও হিটলারী দলবলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াই তাঁকে চলিতে হইবে। তাঁর পক্ষে আর রোমে ফিরিয়া যাওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ইতালীয় জনগণের কাছ থেকে তিনি আর বিন্দুমাত্র প্রীতি ও শ্রদ্ধা পাইবার অধিকারী নন।

সুতরাং বিংশ শতকের রোমক সাম্রাজ্যের দুরাভিলাষীর আর রোমনগরীতে প্রত্যাবর্তন করা হইল না। একান্ত উত্তরবর্তী ইতালীর পার্বত্য এলাকার নির্জন এক অঞ্চলে লেক গারডার কাছে অসহায় মুসোলিনী তাঁর নূতন সরকার স্থাপন করিলেন। আর তাঁর চারদিকে এস. এস. বাহিনীর সশস্ত্র সৈন্যরা ২৪ ঘণ্টা পাহারায় নিযুক্ত রহিল—মুসোলিনী কার্যতঃ হিটলারের নজরবন্দী হইয়া রহিলেন।

কিন্তু এখানে এই বেসরকারী বন্দীদশার মধ্যেও মুসোলিনীর নারীঘটিত জীবনযাত্রার কিছু কমতি ঘটিল না। যৌবনে মুসোলিনী বহু নারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং দুরন্ত দৈহিক জীবনযাপন করিয়াছেন। এখানে তাঁর সেই বিখ্যাত প্রণয়িণী বা উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চিকে আনয়ন করা হইল, যাকে নিয়া ইতালীর উচ্চ মহলে অনেক কানাঘুষা হইয়াছে, ভিতরে ভিতরে কিছু কিছু কেলেঙ্কারীও (বে-আইনী গর্ভ) ঘটিয়া গিয়াছে—যদিও মুসোলিনীর বিবাহিতা পত্নী স্বয়ং বছরের-পর-বছর (১১ বছর) এ সমস্ত কিছুই টের পান নাই।[১]

গারডা হ্রদের নির্জন সুরম্য তীরে প্রকৃতির আনন্দনিকেতনে মুসোলিনী তাঁর এই মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যেও ক্লারা পেতাচ্চির বাহুবন্ধনে আবার ধরা দিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া গোয়েবেলস পর্যন্ত 'আহত' হইলেন—যে গোয়েবেলসের জীবনেও অনেক নারীর ভিড় ছিল।

১। Duce (The Rise and Fall of Mussolini)—Richard Collier.
লণ্ডনের উইলিয়াম কলিন্স প্রকাশিত এই পুস্তকে মুসোলিনীর নারীঘটিত জীবনের বহু রোমাণ্টিক ও চাঞ্চল্যকর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। —লেখক।

কিন্তু হিটলারের কাছে মুসোলিনীর রাজনৈতিক জীবন খারিজ হইয়া গেল। কিন্তু খারিজ হইয়া গেলেও তার আগে হিটলার মুসোলিনীর কাছ থেকে জার্মানীর পক্ষ থেকে ট্রিস্ট, ইস্টিয়া ও দক্ষিণ টিবল আদায় করিয়া নিতে ভুলিলেন না। এমন কি প্রসিদ্ধ ভেনিস পর্যন্ত ভবিষ্যতে জার্মানীর অন্তর্গত হইবে, এই প্রতিশ্রুতিও আদায় করিয়া ছাড়িলেন। একদা যিনি ছিলেন ইতালীর সর্বময় প্রভু, তিনি আজ হিটলারের আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত হইলেন। এবং এই অপমান ও বেদনা চূড়ান্ত হইল তখন, যখন হিটলার মুসোলিনীকে বাধ্য করিলেন তাঁর জামাতাকে 'হত্যা' করার জন্য। ১৯৪৪ সালের ১১ই জানুয়ারী ভেরোনা জেলে এক তথাকথিত সরাসরি বিচারের পর কাউন্ট চিয়ানোকে এবং মার্শাল ডি. বোনোকে গুলি করিয়া মারা হইল বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে। অনুরূপ অভিযোগে একজন বাদে অন্যান্য ফ্যাসিস্ট নেতাদিগকেও ভেরোনা জেলে (যাঁরা গ্রান্ড কাউন্সিলের বৈঠকে মুসোলিনীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন।) প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। অবশ্য এঁদের মধ্যে ৬ জনই অনুপস্থিত ছিলেন। ইতালীর রাষ্ট্রজীবনের এক মর্মান্তিক পরিচ্ছেদের উপর এভাবে যবনিকাপাত হইল।

ভেরোনো জেলে চিয়োনোর হত্যার পর তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ ডায়েরী (চিয়ানো একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন) কি ভাবে রক্ষা পাইল, সেই ঘটনাও কম উল্লেখযোগ্য নয়: চিয়ানোর ডায়েরীর শেষ পৃষ্ঠায় তাঁর স্বহস্তে সকরুণ স্বাক্ষর রহিয়াছে ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৩, সেল নং ২৭, ভেরোনা জেল। জার্মানদের হাতে ধরা পড়ার আগেই চিয়োনো ডায়েরীর পৃষ্ঠাগুলি লুকাইয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন। যে কোন ভাবেই হোক তাঁর স্ত্রী এড্ডা এগুলি উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। পরে তিনি কৃষক রমণীর ছদ্মবেশে ডায়েরীর পৃষ্ঠাগুলি স্কার্টের তালায় লুকাইয়া রাখিলেন, এমন ভাণ করিলেন তিনি যেন গর্ভবতী এবং সেইভাবেই জার্মানীর অধিকৃত ইতালীয় সীমানা পার হইয়া সুইজারল্যান্ডে পেঁাছিয়াছিলেন এবং সেখানে এই ডায়েরীর মাইক্রোফিল্ম তোলা হইল ও আমেরিকায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।[১]

* * *

১৯৪৩ সালের শরৎকালের গোড়ারদিকে হিটলার তাঁর জীবনের এবং জার্মান রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিলেন। কেননা, ইতালীর আত্মসমর্পণের ফলে জার্মান রাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমানা শত্রুপক্ষের নিকট উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। উত্তর ইতালী থেকে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী যদি সেই সময় দক্ষিণ জার্মান সীমান্তে আক্রমণ চালাইতে পারিত, তবে জার্মানী নিঃসন্দেহে ঘোরতর বিপদে পড়িত। প্রকৃত পক্ষে জার্মান সেনাপতিরা প্রায় কয়েক সপ্তাহ এই বিপদের আশাঙ্কায় বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছিলেন। সেই অবস্থায় বলকান অঞ্চলের সীমানাও মিত্রপক্ষের নিকট খুলিয়া যাইত এবং দক্ষিণ রাশিয়ার যে সমস্ত জার্মান বাহিনী সেই সময় জীবনমৃত্যুর লড়াইতে লিপ্ত ছিল, তারাও পশ্চাদভাগের বিপদের মধ্যে পড়িত। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে হিটলার তার অসাধারণ ও দুঃসাহসিক কার্যাবলীর দ্বারা এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার পাইয়া গেলেন। অধিকন্তু বলকানে—গ্রীসে, যুগোশ্লাভিয়ার ও আলবেনিয়ায় ইতালীর 'পজিসন'গুলি

১। চিয়ানোস্ ডায়েরী—১৯৩৯-৪৩, উইলিয়াম হাইনেম্যান লিঃ, লণ্ডন, কর্তৃক প্রকাশিত। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

জার্মানীর করায়ত্ত হইল এবং সর্বত্র ইতালীয় সৈন্যেরা ভীরু মেষশবেকের মত জার্মানীর নিকট অস্ত্র সমর্পণ করিল। মুসোলিনী নিঃশব্দ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় যে বিপর্যয় দেখাদিয়াছিল, হিটলার মুসোলিনীকে উদ্ধারের দ্বারা এবং প্রতিহিংসা গ্রহণের দ্বারা তার অনেকখানি পূরণ করিয়া নিলেন—যদিও অক্ষশক্তির সম্মিলিত শক্তি বলতে কার্যতঃ কিছু আর রহিল না। তবু দক্ষিণ ইতালীতে মার্শাল কেসেলরেং-এর সৈন্য বাহিনী খারিজ হইয়া গিয়াছে বলিয়া হিটলার গোড়ায় যে আশংকা করিয়াছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইল। অধিকন্তু কেসেলরিং-এর জার্মানবাহিনী রোমের দক্ষিণ দিকে পরিখা খনন করিয়া শক্ত হইয়া বসিল এবং মিত্রবাহিনীর বা ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী-সৈন্যদলের রোমের দিকে অগ্রগতি অবরুদ্ধ হইল। এভাবে জার্মান সৈন্যদলের কৃতিত্ব ও সাহস এবং হিটলারের অপ্রত্যাশিত স্থৈর্য ও দূরদৃষ্টি, আর মিত্রপক্ষের নানা গাফলতির জন্য নাৎসী জার্মানী এক প্রকাণ্ড বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া গেল। অবশ্য ক্ষমতাচ্যুত মুসোলিনীর পুনরুদ্ধার সত্ত্বেও তাঁর গৌরবের দিন আর ফিরিয়া আসিল না। ইতিহাসের দেবতা তাঁর প্রতি আর প্রসন্ন হইলেন না।

ষষ্ঠ পর্ব

চতুর্থ অধ্যায়

ইতালীর আত্মসমর্পণ : দলিল স্বাক্ষরের নাটক

অক্ষশক্তিবর্গের মধ্যে ইতালীই যেমন সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করিয়াছিল, তেমনি তার আত্মসমর্পণ নানা বিচিত্র ঘটনায় ও নাটকীয়তায় আচ্ছন্ন ছিল। মুসোলিনীর 'নিঃশব্দ' পতনের পর ইতালীতে যে 'বৈধ বিপ্লব' ঘটিয়া গেল এবং রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল পুনরায় তাঁর পূর্ণ ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিলেন ও মার্শাল বাদোগ্লিও ইতালীয় প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন, তার অব্যবহিত পরেই ইতালী আত্মসমর্পণ করিল না কেন? বিশেষতঃ ইতালীর পক্ষে যখন আর কার্যতঃ যুদ্ধ চালনা সম্ভব ছিল না? অথচ বহু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইল। মুসোলিনী পদচ্যুত হইলেন ২৫শে জুলাই। আর ইতালীর আত্মসমর্পণের প্রাথমিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল ৩রা সেপ্টেম্বর। এত দীর্ঘ সময় লাগার রহস্য কি? একথা মনে রাখা দরকার যে, যদিও মুসোলিনীকে অপসারণের ব্যাপারে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিরা চক্রান্ত করিয়াছিলেন, তবু কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন ফ্যাসিস্ট দলের সমর্থক। কিন্তু ইতালীর ক্রমাগত পরাজয়ের এবং মুসোলিনীর ব্যক্তিগত প্রভুত্বে শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া এই সমর্থকদের মধ্যেই কয়েকটি গোষ্ঠী মুসোলিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। ঠিক অনুরূপ অবস্থায় দেশ দেখেছিল হিটলার হত্যার চক্রান্তের আড়ালে তেমনি এক গোষ্ঠীর নেতারূপে দেখা দিলেন কাউন্ট ডিনো গ্রান্ডি, কাউন্ট চিয়ানো ও অন্যান্য বিশিষ্ট পার্টি নেতারা, আর অপর একটি গ্রুপের নেতৃত্বে পদ নিলেন মার্শাল পিয়েত্রো বাদোগ্লিও, জেনারেল আম্বরোসিও এবং ডিউক অব আকোয়ারোন। এঁরা সকলেই কিন্তু মুসোলিনীর অপসারণ চাহিলেন, কিন্তু মুসোলিনী-শাসিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন পরিবর্তন চাহিলেন না। মার্শাল বাদোগ্লিও ছিলেন এমন একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি, যিনি ইতালীর সামরিক মহলের উচ্চ পদাধিকারী ছিলেন। কিন্তু ১৯৪০ সালে ইতালী কর্তৃক গ্রীস আক্রমণে ইতালীর পরাজয়ের পর মুসোলিনী মার্শাল বাদোগ্লিওকে সেনানীমণ্ডলীর প্রধান অধ্যক্ষের পদ থেকে বিতাড়িত করেন। ফলে, রাজনৈতিক মহলে বাদোগ্লিওর প্রেস্টিজ বাড়িয়া গেল! ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে পালটা মুসোলিনীর বিরুদ্ধে 'প্রতিশোধ' নেওয়ার সুযোগ পাইলেন, যখন স্বয়ং রাজা কর্তৃক মুসোলিনী অপসারিত এবং বাদোগ্লিও মন্ত্রিসভার প্রধান নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরেও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ও জার্মানীর সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ চালানোর সংকল্প বজায় রহিল। এদিকে অনেক দিন আগে থেকেই ইতালীর জনগণ যুদ্ধের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে ফ্যাসি-বিরোধী আত্মগোপনকারী দলগুলির, বিশেষভাবে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে একটা ন্যাশনাল ফ্রন্ট কমিটি গঠিত হইয়াছিল—যে ফ্রন্টের মধ্যে ছিলেন ক্যাথোলিক, লিবারেল সোসিয়েলিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। এদের সঙ্গে

আবার ভিতরে ভিতরে ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের ফ্যাসি-বিরোধী দলগুলির যোগাযোগ ছিল।[১]

এই সমস্ত দল যুদ্ধ ও ফ্যাসিজমের যেমন বিরোধী ছিলেন, তেমনি সমাজ পরিবর্তনের পক্ষেও ছিলেন। কিন্তু বাদোগ্লিও প্রমুখ যাঁরা মুসোলিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করিলেন, তাঁরা সমাজের এমন কোন পরিবর্তন চাহেন নাই, যাতে উপরের তলার অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা নষ্ট হইতে পারে। সুতরাং বাদোগ্লিও দোটানায় পড়িলেন—যুদ্ধ চালাইতেও পারিতেছিলেন না, আবার স্বেচ্ছায় যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতেও পারিতেছিলেন না। সুতরাং জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল।

জনৈক মার্কিন ঐতিহাসিক মন্তব্য করিয়াছেন যে, বাদোগ্লিও ছিলেন জটিল চরিত্রের লোক। কোন কাজ সহজে স্বচ্ছন্দগতিতে ও বলিষ্ঠভাবে করিতে পারিতেন না, কেমন এক ধরনের ঘোরপ্যাঁচের মধ্য দিয়া চলিতেন। শিয়ালের মত ধূর্ত ও সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক ছিলেন। অবশ্য তাঁর দায়িত্ব ও কাজ ভয়ানক রকমের দুরূহ ছিল, সর্বত্র জার্মান এজেন্টরা ছাইয়া ফেলিয়াছিল এবং 'দলত্যাগের' কোন লক্ষণ দেখা মাত্র ইতালীকে আঘাত করিতে তারা উদ্যত হইয়াছিল। ফলে, বাদোগ্লিও ত্রিমুখী সংকটের মধ্যে আটকা পড়িয়াছিলেন—(১) সন্দেহকামী জার্মানদের দ্বারা, (২) যুদ্ধ বিরোধী ইতালীয় জনতার দ্বারা এবং (৩) অগ্রসরমান মিত্রপক্ষের দ্বারা।[২]

কেন অবিলম্বেই বাদোগ্লিও মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন না, কিন্তু কেন তিনি মুসোলিনীর সময়ের চেয়েও বেশীমাত্রায় ইতালীকে জার্মানীর কবলিত হইতে দিলেন, এই সম্পর্কে অবশেষে তিনি নিজেই একটি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। ১৯৪৪ সালে মার্চ মাসের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে এবং এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইতালীর বাহিরে ৩৭ ডিভিসন ইতালীয় সৈন্য ছিল। মুসোলিনী সুস্থ সবলদেহী সশস্ত্র ইতালীয় যুবকদের এত বেশী পরিমাণে দেশের অভ্যন্তরে রাখিতে চাহিতেন না। তিনি ৩০ ডিভিসন সৈন্য সারা বলকানে ছড়াইয়া রাখিলেন। মাত্র ১২ ডিভিসন সৈন্য ছিল ইতালীর অভ্যন্তরে ভাগে, কিন্তু এই সমস্ত সৈন্যের না ছিল যান্ত্রিক সজ্জা, না ছিল গোলাগুলির শক্তি, না ছিল পেট্রোল। এদের পক্ষে জার্মানীকে বাধা দিয়া রাখা সম্ভবপর ছিল না। আবার উপযুক্ত শক্তির অভাবে যুদ্ধ চালানোও সম্ভব ছিল না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের সন্ধান করিতে হইল।

বাদোগ্লিওর মনে আরও অলীক আশা এই ছিল যে, ইতালীর দশা দেখিয়া জার্মানরা নিশ্চয়ই সরিয়া পড়িবে। তারা রোম ও মধ্য ইতালী ত্যাগ করিয়া উত্তরে পোনদীর উপত্যকা পর্যন্ত চলিয়া যাইবে। কেন না, দক্ষিণ-ইতালীতে আর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া সামরিক দিক হইতে কোন লাভ নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে সামরিক প্রশ্নের চেয়েও রাজনৈতিক প্রশ্ন যে অনেক বেশী গুরুতর সেটা বাদোগ্লিও না বুঝিলেও হিটলার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং হিটলারের নজর ছিল রোমের দিকে।[৩]

১। The Second Great War—Hammerton, Vol, VII. P. 2861.
২। The War—Snyder, P. 416.
৩। The Second Great War—Vol. VII. 2865.

মুসোলিনী পতনের পর ইতালীতে যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইল, সেই সুযোগে মিত্রপক্ষ ইতালী ও রোম অভিযানে আগাইয়া যাইবেন, ভূমধ্যসাগরীয় প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইজেনহাওয়ার তেমন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে অবস্থা দাঁড়াইয়া গেল বিপরীত এবং কেন আইজেনহাওয়ার তাঁর পরিকল্পনায় ব্যর্থ হইলেন, সেই কারণগুলি আগের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে আবার উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতি নিয়া বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ছিল। মার্কিনপক্ষ ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া উত্তর ফ্রান্সে অভিযানের এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণের পক্ষপাতী ছিলেন, অপর দিকে চার্চিল ও বৃটিশপক্ষ ইতালী ও বলকান অভিযানের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। এই মতবিরোধের ফলে আইজেনহাওয়ারের পক্ষে উপযুক্ত শক্তি নিয়া অতিদ্রুত রোমের দিকে আঘাত করা সম্ভব হইল না। ফলে, যে রোম নগরী দখল করার কথা ছিল ১৯৪৩ সালের শরৎকালে, সেই নগরী মিত্রপক্ষের দখলে আসিল ১৯৪৪ সালের জুন মাসে। অর্থাৎ অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গেল এবং হিটলারী জার্মানী ইতিমধ্যে সারা ইতালীতে বজ্রমুষ্টি বিস্তার করিয়া অত্যন্ত শক্ত হইয়া বসিল।

এই ইতিহাসের সঙ্গে অনিবার্যভাবে এবং অচ্ছেদ্যরূপে জড়াইয়া পড়িল ইতালীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কাহিনী। অন্ততঃ পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া উভয় পক্ষে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়া অত্যন্ত রোমাঞ্চকর এবং উত্তেজনাপূর্ণ টানাহেঁচড়া চলিল। ৩রা আগস্ট লিসবনে এবং তারপর ৯ই আগস্ট তাঞ্জিয়ার্সে ইতালীয় মুখপাত্ররা প্রথম বৃটিশ কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন এবং সন্ধি আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে রাজার ইচ্ছাতেই মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু লিসবনের বা তাঞ্জিয়ার্সের বৃটিশ প্রতিনিধিদের এমন কোন সরকারী ক্ষমতা ছিল না যে, তাঁরা ইতালীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি আলোচনা করিতে পারেন। অধিকন্তু ইতালীর নূতন সরকারের মুখপাত্রগণ যুদ্ধবিরতির কথা উত্থাপন করিলেও কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করিতে পারিলেন না এবং তাঁরা সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কূটনৈতিক প্রতিনিধিও ছিলেন না। সুতরাং বৃটিশ প্রতিনিধিদ্বয় ইতালীর মুখপাত্রদের আলোচনার প্রস্তাব বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে জানাইয়া দিলেন মাত্র।

কিন্তু ১৫ই আগস্ট ইতালীয় গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পুরাপুরি কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাসহ একজন ইতালীয় দূত মাদ্রিদে আসিলেন। এঁর নাম গিউসেপ ক্যাস্টেলানো, ইনি একজন বড় দরের জেনারেল—ফ্যাসিস্ট রাজত্বের আগেই ইনি ইতালীয় সামরিক মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। জেনারেল ক্যাস্টেলানো মাদ্রিদস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার স্যামুয়েল হোরের (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে ভারত সচিব হিসাবে ইনি ভারতবাসীদের নিকট এক সময় সুপরিচিত ছিলেন।) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন যে, রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলের আদেশে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব লইয়া দেখা করিতে আসিয়াছেন। ক্যাস্টেলানোর প্রস্তাবের কথা মার্কিন সরকারকে জানানো হইল—তখন কানাডার কুইবেকে চার্চিল-রুজভেল্ট বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতেছিল। তাঁরা জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে নির্দেশ দিলেন একজন মার্কিন এবং একজন বৃটিশ স্টাফ অফিসারকে ক্যাস্টেলানোর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পাঠাইবার জন্য। নির্দেশের সঙ্গে বলা হইল একমাত্র 'বিশুদ্ধ সামরিক বিষয়' নিয়েই

আলোচনা হইবে। কেন না, চার্চিল-রুজভেল্টের ভয় ছিল পাছে উত্তর আফ্রিকার মত 'ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে দর কষাকষির' অভিযোগ উঠে। তখন মিত্রপক্ষীয় সদরদপ্তর থেকে আইজেনহাওয়ারের সেনানীমণ্ডলীর প্রধান জেনারেল বেডেল স্মিথ এবং বৃটিশ সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান বিগেডিয়ার স্ট্রং সিভিলিয়ানের ছদ্মবেশে ও মিথ্যা নাম ভাঁড়াইয়া বিমানযোগে লিসবনে উড়িয়া গেলেন।

লিসবনে গিয়া বেডেল স্মিথ এবং ব্রিগেডিয়ার স্ট্রং ক্যাস্টেলানোর কাছে যে প্রস্তাব শুনিলেন, তাতে তাঁদের চক্ষু স্থির! তাঁরা এমন প্রস্তাবের কথা কল্পনাও করেন নাই। ইতালীয় কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রস্তাব করিলেন যে, ইতালী অক্ষশক্তিবর্গের বন্ধন থেকে বাহির হইয়া আসিবে, জার্মানীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইবে এবং উহার বদলে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন ও যোগদান করিবে। বলা বাহুল্য যে, এমন ব্যাপক ও বেপরোয়া প্রস্তাব 'নিঃশর্ত' আত্মসমর্পণে'র অনেক বেশী সীমা ছাড়াইয়া গেল এবং এই ধরনের ব্যাপক প্রস্তাব নিয়া আলোচনা করার কর্তৃত্ব তাঁদের ছিল না। সুতরাং তাঁরা আলজিয়ার্সে ফিরিয়া গেলেন উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নির্দেশের জন্য। আর জেনারেল ক্যাস্টেলানো ব্যক্তিগত বিপদের ঝুঁকি নিয়া রোমে ফিরিয়া গেলেন রাজা ও বাদোগ্লিওকে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। সেই সময় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল ও মাদ্রিদ ইত্যাদি থেকে রোমে যাতায়াত করা অত্যন্ত ঝামেলা ও বিপদের সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল।

জেনারেল স্মিথ ও জেনারেল স্ট্রং মাদ্রিদ থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছু পরেই ইতালীয় রাজ সরকারের তরফ থেকে আরও দুইজন কূটনৈতিক প্রতিনিধি আলজিয়ার্সে আসিলেন —জেনারেল জানুসি এবং তাঁর সহকারী ল্যাম্সিয়া ডি. ট্রাবিয়া। এই দুইজনে যে নূতন প্রস্তাব দিলেন তা আরও চমকপ্রদ। এঁরা প্রস্তাব করিলেন যে, রোমের নিকটবর্তী ৩টি বিমানঘাঁটিতে মিত্রপক্ষের উচিত বিমানবাহিত সৈন্য অবতরণ করানো। তাঁদের মতে রোমের উপকণ্ঠে মাত্র দেড় ডিভিসন জার্মান সৈন্য আছে এবং শহর থেকে তারা প্রায় দুই ঘণ্টার পথে আছে। যদি মিত্রপক্ষ রোমের বিমান ঘাঁটিগুলিতে অন্ততঃ এক ডিভিসন ছত্রীসৈন্যও নামাইয়া দেন, তবে, ইতালীয়রা ৬ ডিভিসন সুসজ্জিত সৈন্যের সহায়তা দিবে এই রণক্রিয়ায়। এই মোট সাত ডিভিসন সৈন্য রোম এলাকায় জার্মানদিগকে অনায়াসেই কাবু করিতে পারিবে এবং নেপলস এলাকায় যে তিন ডিভিসন জার্মান সৈন্য আছে, তাদের অবস্থানও কাহিল করিয়া তুলিতে পারিবে। যদি মিত্রপক্ষ সাহসের সঙ্গে ও দ্রুততার সঙ্গে আঘাত হানিতে পারেন; তবে, তাঁরা রোম দখল করিয়া নিতে পারিবেন এবং ইতালীয় বাহিনীর একটা মোটা অংশেরও সক্রিয় সহযোগিতা পাইবেন।[১]

সিসিলির বৃটিশ প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার হ্যারল্ড আলেকজান্ডারের সদর দপ্তরের কাছে জলপাইকুঞ্জে অবস্থিত একটি সামরিক তাঁবুতে ৩১শে আগস্ট, ১৯৪৩, মিত্রপক্ষ ও ইতালীর মধ্যে নিয়মমাফিক আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়া আলোচনা শুরু হইল। জেনারেল আলেকজান্ডার, যিনি বৃটিশ পক্ষের অন্যতম সেরা সেনাপতি, তিনি সেই সময় রোম অভিযানে ইতালীয়দের সামরিক সহযোগিতা লাভের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্য ইতালীয় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণে উৎসুক ছিলেন এবং ইতালী

১। Diplomat Among Warriors—Robert Murphy, P. 235-37.

অভিযানে যদি বৃটিশ পক্ষের আবার কোন ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে, তবে, তাঁদের মনে দূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়ার ভয় ছিল। কেন না, বৃটিশ জনগণ ও বৃটিশ সৈন্যেরা অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিতেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে তিন বছরের বেশী স্ব স্ব পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। সুতরাং তারা অধৈর্য হইয়া এমন পর্যন্ত বলাবলি করিতেছিল যে, মিত্রপক্ষের উচিত একটা আপোস সন্ধির চেষ্টা করা।[১]

ঠিক এই সময় আইজেনহাওয়ারের দপ্তরে চার্চিল ও রুজভেল্টের কাছ থেকে দুই দফা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব আসিল—এক দফা স্বল্প মেয়াদী (short term) আর এক-দফা দীর্ঘ মেয়াদী (long term)। স্বল্প মেয়াদী শর্তগুলি ছিল একান্তরূপে সামরিক এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল। আর দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মধ্যে ছিল বহু বিস্তৃতরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আর্থিক শর্তাবলী—এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে মিত্রপক্ষের হাতে ইতালীর সামগ্রিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত করার শর্ত ছিল এবং ইতালীর সমগ্র জীবন অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু মার্কিন ও বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আইজেনহাওয়ারের কাছে নির্দেশ গেল যতক্ষণ পর্যন্ত ইতালীয় প্রতিনিধিগণ 'স্বল্প মেয়াদী' নিঃশর্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর না করেন, ততক্ষণ যেন তাঁদেরকে 'দীর্ঘ মেয়াদী' চুক্তিপত্র দেখানো না হয়। কেন না, বৃটিশ ও মার্কিন কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করিলেন যে, দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিপত্রের কঠোর শর্তাবলী ইতালীয়রা একবার পাঠ করিলে হয়তো স্বল্প মেয়াদী চুক্তিপত্রটি আর স্বাক্ষর করিতে চাহিবে না। মিত্রপক্ষ আরও হুকুম দিলেন যে, দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিপত্রটি কোনক্রমেই জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা চলিবে না। কিন্তু এই ধরনের 'শঠতাপূর্ণ' বা 'চাতুর্যপূর্ণ' ব্যবহার আইজেনহাওয়ারের নিকট ভালো লাগিল না। তিনি বিরক্তির সহিত মন্তব্য করিলেন যে, যুদ্ধের দশ বছর পরেও এই গোপনীয় দলিল প্রকাশিত হইবে না।

(কিন্তু ১৯৪৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত এই দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধবিরতি চুক্তির ৪৪ দফা বৃটিশ সরকার কর্তৃক একটি হোয়াইট পেপারের আকারে মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল)—[২]

কিন্তু মিত্রপক্ষের নিকট ভাগ্যের পরিহাস এই যে, এই দুই প্রকার চুক্তির মধ্যে যে সমস্ত কঠোরতম শর্ত ছিল, সেগুলির মধ্যে কতকগুলি কোন কাজেই আসে নাই। কেন না, মিত্রপক্ষের আগেই জার্মানী দুই-তৃতীয়াংশ ইতালী দখল করিয়া নিয়াছিল। হিটলার মিত্রপক্ষের রোম আক্রমণের জন্য একদিনও অপেক্ষা করেন নাই, অধিকন্তু তিনি চটপট বন্দী মুসোলিনীকে উদ্ধার করিয়া নিয়াছিলেন এবং রোম হস্তগত করিয়াছিলেন।

ইতালীয় সৈন্যবাহিনীতে মোট ৬২ ডিভিসন সৈন্য ছিল। এর মধ্যে মাত্র ৯ ডিভিসন সৈন্য, যারা কার্সিকা ও সার্দিনিয়া দ্বীপে ছিল, তারা স্বাধীনভাবে মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। বলকানে যে ১০ ডিভিসন সৈন্য ছিল, তারা ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, যুগোশ্লাভ গেরিলাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। ফ্রান্স ও ইতালীতে ও বলকানে কেল্লার পাহারায় যে ৪ ডিভিসন ইতালীয় সৈন্য ছিল, জার্মানরা তাদেরকে নিরস্ত্র করিল ; কার্যতঃ ইতালীয় সৈন্যবাহিনী আর যুদ্ধরত থাকিল না এবং সৈন্য

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৩৭।
২। দি সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ার—অষ্টম খণ্ড, ৩৩২৭ পৃষ্ঠা।

বাহিনীর দিক থেকে মিত্রপক্ষ তেমন লাভবান হইল না। কিন্তু মিত্রপক্ষের বিশেষ লাভ হইল ইতালীয় নৌবহরের দিক থেকে। অবশ্য এই নৌবহরের মধ্যেও জার্মানরা একটি যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাটলশিপ ডুবাইয়া দিয়াছিল এবং ধৃত করিয়াছিল ১০টি ক্রুজার, ১০টি ডেস্ট্রয়ার ও অনেকগুলি সাবমেরিন। তথাপি এই নৌবহরের অধিকাংশই মার্শাল বাদোগ্লিওর আদেশ অনুসারে মিত্রপক্ষের বন্দরে গিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—১০-১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। মাল্টাতে যে সমস্ত জাহাজ পেঁছিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে ছিল ৬টি ব্যাটলশিপ, বা বড় যুদ্ধ জাহাজ, ৮টি ক্রুজার, ২৭টি ডেস্ট্রয়ার এবং ১৯টি সাবমেরিন।

এই নৌবহরের মধ্যে একটা অংশ সোভিয়েত রাশিয়ার ভাগ্যেও জুটিয়াছিল, যেমন —১টি বড় যুদ্ধজাহাজ, ১টি ক্রুজার, ৮টি ডেস্ট্রয়ার, ৪টি সাবমেরিন এবং ৪০ হাজার টন পরিমিত বাণিজ্য নৌবহরের অংশ।

ভূমধ্যসাগরের পথে মুক্ত হইয়া যাওয়ার এবং ইতালীয় নৌবহরের দিক থেকে আর কোন বিপদের কারণ না থাকায় মিত্রপক্ষের নৌবহরের পক্ষে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের পথ পর্যন্ত খুলিয়া গেল এবং জাপানের বিরুদ্ধে আসন্ন অভিযানে সুবিধা হইল।

ক্যাস্টেল্লানোসহ ইতালীয় প্রতিনিধিগণ যুদ্ধবিরতি চুক্তি আলোচনার জন্য সিসিলিতে মিত্রপক্ষের তাঁবুতে মিলিত হইলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝা গেল ইতালীয় প্রতিনিধিগণ যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরে ততটা আগ্রহী নন, যতটা তাঁরা জার্মানীর কাছ থেকে বিপদ সম্পর্কে ভীত। তাঁরা কেবলই মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন—

'Are you strong enough to protect us from the Germans ?'

—'তোমরা কি জার্মানদের কাছ থেকে আমাদের বাঁচাবার উপযুক্ত শক্তি রাখো ?'

বেচারা ইতালীয়রা যেন 'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘের' অবস্থায় পড়িয়াছিল। সুতরাং ইতালীয় প্রতিনিধিগণ জেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, যতক্ষণ না রোমের উত্তরে মিত্রপক্ষ কিছু সৈন্য নামাইতে রাজী হন, ততক্ষণ তাঁরা কোন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন না। কেন না, মিত্রপক্ষ কেবল দক্ষিণ ইতালীতে তাদের সৈন্যবাহিনী সীমাবদ্ধ রাখিলে জার্মানরা রোমের উত্তরে সমগ্র ইতালী দখল করিয়া নিবে এবং সর্বত্র ধ্বংস, বিপর্যয় ও হত্যাকাণ্ড ঘটাইবে।

ইতালীয়দের এই ধরনের মনোভাব দেখিয়া এবং মার্শাল বাদোগ্লিও জার্মানী ও মিত্রপক্ষ উভয়ের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের ফিকিরে আছেন সন্দেহ করিয়া মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিগণ শেষ পর্যন্ত ইতালীয় প্রতিনিধিদিগকে এই বলিয়া হুমকি দিলেন যে, যদি এই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্রে ইতালী স্বাক্ষর না দেয়, তবে উহার জেরস্বরূপ—

(ক) রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল সম্পর্কে কোন বিবেচনা দেখানো হইবে না।

(খ) মিত্রপক্ষ যুদ্ধের জরুরী তাগিদে সারা ইতালীতে 'এনার্কি' বা অরাজকতা উস্কাইয়া দিতে বাধ্য হইবেন এবং।

(গ) সমস্ত ইতালীয় শহরে মিত্রপক্ষীয় বিমান বোমা বর্ষণে বাধ্য হইবে।

সোজা কথায় ইতালীয় প্রতিনিধিদিগকে এই মর্মে চরমপত্র দেওয়া হইল যে, ১-২ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রির মধ্যে যদি রাজা মিত্রপক্ষের যুদ্ধবিরতির শর্ত গ্রহণ না করেন, তবে, রোম নগরী বোমার দ্বারা বিধ্বস্ত করা হইবে। এই চরমপত্র বগলদাবা করিয়া ইতালীয় প্রতিনিধিগণ ৩১শে আগস্ট অপরাহ্ণ পাঁচটায় রোম যাত্রা করিলেন এবং রাজার সঙ্গে পরামর্শের পর তাঁরা অবিলম্বে ২রা সেপ্টেম্বরের মধ্যেই সিসিলিতে ফিরিয়া আসিলেন। মিত্রপক্ষের সকলেই যখন ধরিয়া লইলেন যে, এবার চুক্তিপত্র সই হইবে, তখনও কিন্তু ইতালীয় প্রতিনিধিরা বলিলেন যে, ইতালীয় রাজ সরকার অনুমান করিতেছেন যে, ইতালীতে মিত্রপক্ষের অবতরণ আসন্ন। সেই অবতরণ না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদী বা অল্প মেয়াদী কোন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য রাজা তাঁদেরকে ক্ষমতা দেন নাই।

ইতালীয়দের এই প্রকার আচরণে স্বভাবতঃই মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিরা চটিয়া গেলেন। তখন বৃটিশ প্রধান সেনাপতি জেনারেল আলেকজান্দার আগাইয়া আসিলেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত সামরিক আদবকায়দাসহ ইতালীয় প্রতিনিনিধিদের সামনে হাজির হইয়া দস্তুরমত ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখাইলেন এবং চরমপত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়া ভয় দেখাইলেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা না হইলে মিত্রপক্ষ ইতালীকে বিধ্বস্ত করিয়া দিবে।

এবার ঔষধ ধরিল। সিসিল থেকে ইতালীয় প্রতিনিধিগণ ৩রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে বেতার যোগে রোমের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের অনুমতি পাইলেন। অল্পমেয়াদী দলিল স্বাক্ষরের পর ইতালীয় রাজ সরকারের পক্ষ থেকে জেনারেল ক্যাস্টেলানো দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তিগুলির উপর চোখ বুলাইয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন এবং চুক্তিগুলি সম্পর্কে রাজাকে বা মার্শাল বাদোগ্লিওকে পূর্বাহ্ণে কিছুই জানাইলেন না, চুক্তিগুলি এতই কঠোর ছিল। ২৯শে সেপ্টেম্বর মাল্টাতে এই চুক্তিপত্র আইজেনহাওয়ার এবং বাদোগ্লিওর মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।...

চুক্তি স্বাক্ষর হইয়া গেল বটে, কিন্তু এদিকে মিত্রপক্ষীয় বিমানবাহিনীর রোম অবতরণ আর হইল না। কেননা, শেষ মুহূর্তে রোম থেকে সংবাদ পাওয়া গেল যে, ইতালীয় সৈন্যেরা মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করিতে সাহস পাইতেছে না। কারণ, প্রচুর সংখ্যায় নূতন নূতন জার্মান সৈন্য আসিয়া রোমের বিমানবন্দরগুলি দখল করিয়া নিতেছে।...

মিত্রপক্ষও সেই সময় নানা কারণে রোম অভিযানে উৎসাহী ছিল না। বিশেষতঃ তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইতালীয়দিগকে বিশ্বাস করিত না। ফলে, যে রোম শহর মিত্রপক্ষের দখল করার কথা ছিল বড়জোর অক্টোবরের মাঝামাঝি, সেই শহর দখল করিতে লাগিয়া গেল পরের বছরের ৪ঠা জুন পর্যন্ত—দীর্ঘ ৮ মাস বিলম্ব হইল!

ইতালীর এই আত্মসমর্পণের বিচিত্র কাহিনীতে একটি তারিখ ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে—৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩। অন্ততঃ চারটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল—প্রথমতঃ মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা এই প্রথম খাস ইতালীয় ভূভাগের স্যালেরনোতে অবতরণ করিল। দ্বিতীয়তঃ মিত্রপক্ষ ও ইতালীর মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের ফল এই প্রথম প্রকাশ্যে ঘোষিত হইল।

তৃতীয়তঃ জার্মানরা রোম নগরী দখল করিয়া নিল এবং

চতুর্থতঃ রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল রোম থেকে পলাইয়া আসিলেন এবং আর কখনও রোমে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই।

খুব বিপদের ঝুঁকি নিয়া রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলকে রোম থেকে পলাইয়া আসিতে হইয়াছিল। কেননা, পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে যদিও ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে ইতালীর আত্মসমর্পণের কথা আলজিয়ার্স হইতে মিত্রপক্ষ ঘোষণা করেন, ইতালীয়রা কিন্তু ঘণ্টা-দুই গড়িমসি করিয়াছিল। ফলে, ওই দুই ঘণ্টার মধ্যে রাজা ইম্যানুয়েল ও মার্শাল বাদোগ্লিওর জার্মানদের দ্বারা বন্দী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। রাজা তখন সাত তাড়াতাড়ি তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ও জেনারেলদের নিয়া মোটরযোগে রোমের জার্মান লাইন ভেদ করিয়া আদ্রিয়াতিক উপসাগরের পেসকারাতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখান থেকে একটি ইতালীয় ক্রুজারে করিয়া বৃন্দিসী (দক্ষিণ ইতালী) বন্দরে আসিয়া মিত্রপক্ষীয় এলাকায় আশ্রয় নিলেন। একমাত্র নিজের পরিহিত ইউনিফর্ম ছাড়া রাজার সঙ্গে কোন ব্যাগেজ বা মালপত্র ছিল না। এদিকে আলজিয়ার্স রেডিওর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানরা রোমের সমস্ত কেন্দ্রবিন্দু দখল করিয়া নিল এবং ইতালীর সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল। ইতালীয়রা কোন বাধা দিল না।...

মার্কিন কূটনীতিক রবার্ট মারফি এই সমস্ত ঘটনার অনেকগুলি ব্যাপারেই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি দুইটি মজার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বৃন্দিসীতে তিনি রাজা ইমানুয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে রানীকে সঙ্গে নিয়া রাজা কিরূপ বিপদের মধ্য দিয়া রোম ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই বর্ণনা দেন এবং তারপর করুণভাব বলেন যে, তিনি এবং রানী সঙ্গে কোন জিনিসপত্রই আনিতে পারেন নাই। তখন রবার্ট মারফি রাজাকে বলেন যে, তিনি কোন সাহায্য করিতে পারেন কিনা? রাজা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলেন—'রানী কোন টাটকা ডিম যোগাড় করতে পারেননি, আপনার পক্ষে কি সম্ভব ডজন খানেক ডিম যোগাড় করা?"

মারফি লিখিয়াছেন যে, রাজা আর কিছু চাহিলেন না। "আমরাও এক ডজন ডিম উপহার দিয়া হাজার বছরের স্যাভয় রাজবংশের সঙ্গে সখ্যতা পাকা করিলাম।'[১]

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই:

১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে ইতালীর রাজ সরকার বৃন্দিসী থেকে নেপলসে স্থানান্তরিত হইল এবং ইতালীর রাজা রানীও সেখানে একটি ভিলাতে আশ্রয় নিলেন এবং সমুদ্রের জলে মাছ ধরিয়া সময় কাটাইতেন। নেপলস উপসাগরের রাজকীয় বাসগৃহের পাশেই ছিল ইংলণ্ডের বিখ্যাত লর্ড নেলসনের প্রণয়িনী লেডী হ্যামিলটনের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাসভবন। এই ভবনটি অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। রাজা ষষ্ঠ জর্জ সেই সময় নেপলস পরিদর্শনে আসিলে তাঁর জন্য ঐ ভবনটি সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই ভবনের চারদিকের জলে কোন যানবাহনের যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু একদিন সকালে একজন বৃটিশ নৌপ্রহরী দেখিতে পাইলেন যে, নোংরা জামাকাপড় পরা এক প্রৌঢ় দম্পতি নৌকা করিয়া মাছ ধরিতেছে এবং তা'ও রাজা ষষ্ঠ জর্জের বাসস্থানের একেবারে সংলগ্ন জলপথে। প্রহরী তাড়াতাড়ি তার স্পীড বোটে

১। রবার্ট মারফি—পৃষ্ঠা ২৪৬-৪৭।

করিয়া ঐ দম্পতির নৌকার কাছে আসিলে হঠাৎ সেই নৌকাতে প্রৌঢ়া মহিলাটি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চীৎকার করিয়া ইংরাজীতে বলিলেন—'This is the king and I am the queen !' 'ইনি হচ্ছেন রাজা, আর আমি হচ্ছি রানী !' এই বলিয়া রানী তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে তাঁর ভিজিটিং কার্ড বাহির করিলেন এবং বৃটিশ নৌপ্রহরীর সামনে তুলিয়া ধরিলেন।

কিন্তু ইতালীয় রাজা ও রানী যে নেপলসে আসিয়াছেন, একথা কাহাকেও প্রকাশ করা হয় নাই। সুতরাং প্রহরী এঁদের পরিচয় জানিত না। সে চীৎকার করিয়া বলিল—

'আপনারা কে, তা'তে কিছু যায় আসে না, এখানে মাছ ধরা নিষেধ। সুতরাং এখান থেকে ভাগুন !'

বলাই বাহুল্য যে, এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা বাদে ইতালীয় রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে মহামান্য রাজ দম্পতির প্রতি অসৌজন্যের অভিযোগ করিয়া মিত্রপক্ষের নিকট প্রতিবাদ-পত্র আসিল।

* * *

যদিও ইতালী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল এবং ইতালীয় সৈন্যরা জার্মানীর সহিত একত্রে পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল, তবু কিন্তু মুসোলিনীর পতন এবং ইতালীর সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তির আলোচনায় মিত্রপক্ষ অনেকদিন পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়াকে সেই আলোচনার মধ্যে অন্তরঙ্গতার সহিত গ্রহণ করেন নাই। কেবল মাত্র ১৯৪৩ জুলাই মাসের শেষে ইতালী সম্পর্কে কিছু সংবাদ সোভিয়েট সরকারকে দেওয়া হইল। ৩০শে জুলাই বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ইডেন লণ্ডনস্থিত সোভিয়েট দূতাবাসে ইতালীয় আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত একটি 'বিস্তৃত শর্তাবলীর' রূপরেখা সম্বলিত দলিল সোভিয়েট সরকারের উদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন। ৩রা আগস্ট মস্কোস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দার ক্লার্ক কার ইতালীর সহিত স্বল্পমেয়াদী চুক্তির খসড়া সোভিয়েট সরকারকে দিলেন। সোভিয়েট সরকার এগুলি পাঠ করিলেন এবং নীতিগতভাবে ঐগুলির অনুমোদন করিলেন বটে, কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের আচরণে ক্ষুব্ধ হইলেন। তখন ২২ আগস্ট স্তালিন চার্চিল ও রুজভেল্টের নিকট এক বার্তায় লিখিলেন :

To date it has been like this : the U. S. A. and Britain reach agreement between themselves while the U. S. S. R. is informed of the agreement between the two powers as a third party looking passively on. I must say that this situatlon cannot be tolerated any longer.[১]

সোজা কথায়—বৃটিশ-মার্কিন দুই শক্তি পরস্পরের সঙ্গে বুঝাপড়া করিয়া চুক্তিতে পেঁীছিতেছেন, আর তৃতীয় শক্তি সোভিয়েট রাশিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সেটা দেখিতেছেন। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে জানাইতে চাই যে, এই অবস্থা আর সহ্য করা সম্ভব নয়।

স্তালিনের কাছ থেকে এই কড়া চিঠি পাইয়া ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষের কানে জল

গেল। এই চিঠিতে স্তালিন অবশ্য পরিষ্কার করিয়াই একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখিলেন —ইতালীর মত জার্মানীর কাছ থেকে সরিয়া আসিয়া যে সমস্ত দেশ আত্মসমর্পণ করিবে, তাদের সম্পর্কে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া—এই তিন শক্তিকে নিয়া একটি সামরিক-রাজনৈতিক কমিশন নিয়োগ করিতে হইবে। এই কমিশনই সমস্ত বিলিব্যবস্থা করিবে।

এই কমিশন নিয়োগের প্রস্তাবের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সোভিয়েট রাশিয়া হিটলার-বিরোধী মহাজোট বা কোয়ালিশন সম্পর্কে আন্তরিক ছিলেন এবং তাঁরা মহাজোটের অংশীদারদের সঙ্গে পারস্পরিক পূর্ণ সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু বৃটিশ ও মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কমিশন দ্রুত গঠনের তেমন কোন কারণ দেখাইলেন না। তাঁরা বরং তাড়াতাড়ি একটা Allied Control Commission গঠন করিলেন। এ ছাড়া ইঙ্গ-মার্কিন অধিকৃত এলাকায় সরকারী কার্য পরিচালনার জন্য যে Allied Military Government of Occupied Country কিংবা সংক্ষেপে AMGOT গঠিত হইল, কার্যতঃ এই সংস্থা দুইটিই সমস্ত রাজনৈতিক ও সামরিক কাজ পরিচালনা করিতেছিল। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সোভিয়েট প্রস্তাব অনুযায়ী একটি কমিশন গঠিত হইল বটে, কিন্তু সেটা কতকটা নামকাওয়াস্তে।

* * *

ইতিমধ্যে ইতালীতে জার্মানী ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ দেখা দিতে লাগিল। অপর দিকে ইতালীর ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে মিত্রপক্ষের দিনের-পর-দিন যুদ্ধ বিরতি আলোচনাও লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে ও মস্কোতে সমালোচনার উদ্রেক করিল। এমন কি কোন কোন সমালোচক মার্শাল বাদোগ্লিওকে ইতালীর দারলাঁ (Darlan—ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের সঙ্গে যিনি বুঝাপড়ার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন) বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। রাজার বিরুদ্ধেও সমালোচনা ধ্বনিত হইতে লাগিল। 'রাজা ইম্যানুয়েল একজন সুবিধাবাদী, যতদিন পারিয়াছেন মুসোলিনীর সঙ্গে একত্রে ফ্যাসিজমের পাছ-দোহারি করিয়াছেন। কিন্তু ফ্যাসিজম এক্ষণে পরাজিত হওয়ায় রাজাও বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সুবিধাবাদী রাজার পদচ্যুতি চাই'—এই ধরনের দাবিও উঠিতে লাগিল। ফ্যাসিবিরোধী মহল থেকে রাজার বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনি উঠিল। অবশেষে ২৯শে সেপ্টেম্বর ইতালীর আত্ম-সমর্পণের দীর্ঘ মেয়াবী চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইতালীয় জনগণের পক্ষে আর একটি ঐতিহাসিক তারিখ আসন্ন হইল। ১৯৪৩, ১৩ই অক্টোবর তারিখ ইতালীয় গভর্নমেণ্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এত দিনের মিত্র এক্ষণে সরকারীভাবে প্রকাশ্য শত্রুতে পরিণত হইলেন!

ইতালীকে 'সহ-সমরসঙ্গী' বা co-belligerent রূপে সমর্থন জানাইলেন বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া। এই ত্রিশক্তির গভর্নমেণ্ট সমূহ একটি সম্মিলিত ইস্তাহারে ঘোষণা করিলেন:

'The three Governments acknowledge the Italian Government's pledge to submit to the will of the Italian people after the Germans have been driven from Italy, and it is understood that nothing can detract from the absolute and untrammelled *right of the people of*

Italy by constitutonal means to decide on the democratic form of government they will eventually have.'[১]

ইতালী থেকে জার্মানরা বিতাড়িত হওয়ার পর ইতালীয় জনগণের ইচ্ছানুযায়ী ইতালী নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইবে—এই প্রতিশ্রুতির কথা মিত্রপক্ষীয় ঘোষণায় প্রচারিত হইল। এভাবে নাৎসী জার্মানীর সবচেয়ে বড় দোসর ফ্যাসিস্ট ইতালী হিটলারী ব্লক থেকে সরিয়া পড়িল এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে সরকারীভাবে অস্ত্রধারণ করিয়া মিত্র রাষ্ট্রপুঞ্জের দলে যোগ দিন। হিটলারী কোয়ালিশন যে ভাঙ্গিয়া পড়িতে শুরু করিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ইতালীর এই যুদ্ধ ঘোষণা, যার পিছনে ছিল ইতালীয় জনগণের ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।

* * *

কিন্তু রাজতন্ত্র বা ফ্যাসিজমের অবিলম্বেই উচ্ছেদ ঘটিল না। মুসোলিনীর পতনের পর যদিও ইতালীতে ফ্যাসিজমের এবং মুসোলিনীর দীর্ঘকালের সমর্থকারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ একান্ত কাম্য ছিল, তবু সেটা অবিলম্বেই যে সম্ভব হইল না, তার অন্যতম মূল কারণ স্বয়ং চার্চিল। উইনস্টোন চার্চিল একান্তরূপে রাজতন্ত্র ভক্ত ছিলেন, সিংহাসন ও রাজার প্রতি তাঁর দরদ ছিল। মুসোলিনীর পতনের পর ২৭শে জুলাই পার্লামেণ্টের এক বক্তৃতায় চার্চিল ইতালী সম্পর্কে বৃটিশ নীতির ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—

'It would be a grave mistake for Britain and the United States so to act as to break down the whole structure and expression of the Italian State.'[২]

—চার্চিলের মতে, ইতালীয় রাষ্ট্রের গঠন ও রূপায়ণকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলার চেষ্টা করা বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক ভুল হইবে।

ইতালীয় রাষ্ট্রের গঠন ছিল ফ্যাসিজমের। সুতরাং চার্চিল মুসোলিনীর পতনের পরেও যতটা সম্ভব ইতালীর রাষ্ট্রচরিত্রকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। রুজভেল্ট অবশ্যই রাজতন্ত্র বা ফ্যাসিজমের প্রতি দরদী ছিলেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন ইতালীতে ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের পর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও শাসন প্রবর্তন করিতে। কিন্তু চার্চিল ভরসা পাইতেছিলেন না। তাঁর আশংকা ছিল যে, ইতালীয় জনগণ ফ্যাসিস্ট অত্যাচার থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হইলে সোসিয়েলিজম বা কমিউনিজমের প্রতি ঝুঁকিবে। এই পরিণতি নিবারণের জন্য তিনি একদিকে রাজতন্ত্র —যে রাজতন্ত্র ফ্যাসিজমের সহযোগিতায় এতদিন চলিতেছিল, সেই তন্ত্রকে রক্ষার জন্য এবং অন্যদিকে মার্শাল বাদোগ্লিওর মত নামডাকা প্রতিক্রিয়াশীল ও ফ্যাসিস্ট পন্থীদের বজায় রাখার জন্য উৎসুক ছিলেন। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যে, রাজতন্ত্র ও রক্ষণশীলতার উচ্ছেদ ঘটিলে সাম্যবাদ ইতালীতে কায়েম হইয়া বসিবে। তাঁর এই মনোভাব তিনি গোপন রাখেন নাই। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট এক বার্তায় তিনি বলিলেন যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে স্যাভয় রাজবংশকে বা বাদোগ্লিওকে স্বীকৃতি দিতে তিনি মোটেই ভীত নন। কারণ, যুদ্ধের উদ্দেশ্য বিশৃঙ্খলা, বলসেভিজম ও

১। The Anti-Hitler Coalition—P. 183.

২। British Foreign Policy During World War II—P. 323.

গৃহযুদ্ধের দ্বারা ব্যাহত হইবে এবং তাতে সৈন্যদলের উপর অনর্থক অতিরিক্ত বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইবে।[১]

অতএব দেখা যাইতেছে যে, চার্চিল ইতালীর সহিত আত্মসমর্পণের আলোচনায় অবিলম্বেই ফ্যাসিজম ও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের চেয়ে বরং ইতালীয় রাষ্ট্রের কাঠামো ও রাজাকে রক্ষা করারই পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি চার্চিল রাজা ইম্যানুয়েলের পরিবর্তে তাঁর পৌত্রকে সিংহাসনে বসাইবার একটি প্রস্তাব পর্যন্ত বাতিল করিয়া দিলেন। এই প্রস্তাব দিয়াছিলেন ফ্যাসিজম-বিরোধী প্রবীণ ইতালীয় রাজনৈতিক কাউণ্ট কার্লো সাফোরজা (Count Carlo Sforza) যিনি মুসোলিনীর ক্ষমতা লাভের পূর্বে ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। চার্চিল এজন্য কাউণ্ট সাফোরজাকে ইতালীতে প্রবেশ ও ইতালীর রাজনীতিতে মাথা ঘামাইতে দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং চার্চিলের কৃপায় রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল অনেক দিন পর্যন্ত সিংহাসনে টিকিয়া রহিলেন।

কিন্তু ১৯৪৩-এর শেষ ভাগ থেকে ১৯৪৪ সালের বসন্তকালের মধ্যে ফ্যাসিজম, ইতালীয় রাজনীতি ও ইতালীর রাজাকে নিয়া বিষম বিতণ্ডার সৃষ্টি হইল মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে। এমন কি, আমেরিকাতেও সমালোচনা ক্রমশই উচ্চ গ্রামে উঠিতে লাগিল। তখন ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের চতুর্থবারের নির্বাচনের রাজনৈতিক তোড়জোড় চলিয়াছে। আমেরিকার ইতালীয় নাগরিকগণ রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েলের প্রতি বিরূপ ছিলেন। পাছে এর ফলে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এজন্য রুজভেল্ট শেষ পর্যন্ত ইতালীর রাজাকে সিংহাসন থেকে অপসারণের নির্দেশ দিলেন—অবশ্য এমন কৌশলে করিতে হইবে যাতে উইনস্টোন চার্চিল চটিয়া না যান!

শেষ পর্যন্ত মার্কিন কূটনীতিকদের অনুরোধে ইতালীর রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল প্রিন্স অব্ পিডমণ্ট বা যুবরাজের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া 'অশ্রু সজল' চক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন বটে, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও তিনি একটু কূটনৈতিক প্যাঁচ দেখাইলেন। তিনি শর্ত করিলেন যে, যে দিন মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা রোমে প্রবেশ করিবে, সেদিন এই 'ক্ষমতা হস্তান্তর' কার্যকর ও ইতালীর যুবরাজ রাজকীয় ক্ষমতায় আসীন হইবেন।[২]

কিন্তু মিত্রপক্ষ রোমে প্রবেশ করিলেন বহু বিলম্বে—৪ঠা জুন, ১৯৪৪, ফ্রান্সের-নরম্যাণ্ডিতে মিত্রপক্ষের অবতরণের মাত্র ৩৬ ঘণ্টা আগে। মুসোলিনীর পতন এবং ইতালীর আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও ইতালীতে রাজতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি যে এতদিন সক্রিয় ছিল, তার অন্যতম কারণ ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতি ও সোসিয়েলিজমের প্রতি বৈরিতা—বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলের।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যুদ্ধবিধ্বস্ত ইতালীতে কমিউনিজমের অগ্রগতি অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যায় নাই। কারণ দেশব্যাপী প্রতিরোধ ও মুক্তি আন্দোলনের প্রধান সহায়ক ছিল কমিউনিস্ট পার্টি এবং সেই পার্টির সমর্থকবৃন্দ। অবশ্য ইতালীর বিচিত্র আত্মসমর্পণের রাজনীতি ছিল কমিউনিজমকে ঠেকাইয়া রাখারই অন্যতর কৌশল মাত্র।

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক' পৃষ্ঠা ৩২৪।
২। রবার্ট মার্ফি—পৃষ্ঠা ২৫২-৫৩।

* * *

অনেক টালবাহনার পর ইতালী আত্মসমর্পণ করিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের কোন অবসান হইল না। এদিক দিয়া ইতালীর দৃষ্টান্ত একটা ব্যতিক্রমের মত। কেননা, যুদ্ধরত গবর্নমেণ্ট আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ রণক্ষেত্র স্তব্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ইতালীর বেলায় তা হইল না। কারণ, জার্মানরা ইতালী দখল করিয়া বসিল—মিত্ররূপী হিটলার দুর্ধর্ষ ও নির্মম শত্রুতে পরিণত হইলেন। ফলে, ইতালীয় জনগণের চরম দুর্দশা দেখা দিল—জার্মানী এবং মিত্রপক্ষ উভয়ের হাতে তাঁরা প্রচণ্ড মার খাইলেন। এই যুদ্ধ চলিল ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু করিয়া ১৯৪৫ সালের মে মাস পর্যন্ত। অর্থাৎ জার্মানীর আত্মসমর্পণ না-করা পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ-কালের মধ্যেও ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ ইতালী থেকে জার্মান বাহিনীকে বিতাড়ন করিতে পারে নাই, যেটা একদিকে জার্মান সৈন্যদের প্রশংসনীয় আত্মরক্ষার এবং অন্যদিকে মিত্রপক্ষের রণনীতি ও রণকৌশলের অপদার্থতার প্রমাণ দিতেছে।

আত্মসমর্পণের পরেও ইতালী যেভাবে উভয় পক্ষের—জার্মানী ও মিত্রপক্ষের হাতে মার খাইয়াছে তার তুলনা নাই। ইতালীর দুর্ভাগ্যের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী বিশিষ্ট মার্কিন কূটনীতিক রবার্ট মারফি এই সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

'The fighting in Italy was more devastating than it had been in North Africa ; air raids and German demolitions were much worse. During that winter of 1943-44 the Italian people witnessed the destruction of their beautiful country in one of the crueliest military campaigns that agelong battle ground has ever suffered. The Germans and the Allies jockeyed for position with small regard for the civilan population. The military stakes were too high for either side to afford much human kindness.'[১]

অর্থাৎ মিত্রপক্ষরূপী রাম এবং শত্রুপক্ষরূপী রাবণ উভয়ের হাতেই ইতালীবাসীরা প্রচণ্ড মার খাইল। কারণ, উত্তর আফ্রিকার চেয়েও ইতালীর যুদ্ধ অনেক বেশী ধ্বংসকর হইয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালের শীতকালে ইতালীয় জনগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন তাঁদের অপূর্ব সুন্দর স্বদেশের ব্যাপক ধ্বংসলীলা। যে দেশ যুগযুগান্তর যুদ্ধক্ষেত্রের দুর্ভাগ্য বহন করিয়াছে, সেই দেশেও এমন ভয়ংকর নিষ্ঠুর যুদ্ধ এর আগে আর হয় নাই। মিত্রপক্ষ এবং জার্মানী উভয়েই সামরিক অবস্থান নিতে গিয়া বে-সরকারী জনগণের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা করে নাই। যুদ্ধের প্রয়োজন এত বেশী ছিল যে, কোন পক্ষই মানবিক দয়ামায়ার কথা বিবেচনা করার সুযোগ পায় নাই।

সোজা কথায় আত্মসমর্পণের পরেও অতি নিষ্ঠুর নির্মম যুদ্ধ চলিয়াছিল দিনের-পর-দিন এবং মাসের-পর-মাস ইতালীতে, ইতিহাসে যে দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

১। **Diplomat:Among Warriors—P. 250.**

ষষ্ঠ পর্ব

পঞ্চম অধ্যায়

স্ট্যালিনগ্রাদের পর রাশিয়া : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

স্ট্যালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধে জয়লাভ করার পর রাশিয়ার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে জার্মানীর হিংস্রতম আক্রমণের মুখে তার গিয়াছে টিকিয়া থাকার লড়াই, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদে ষষ্ঠ জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর যুদ্ধজয়ের প্রত্যয় দেখা দিল, লালফৌজ যেন নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ হইল। এমন কি, কোন কোন সময় অতিরিক্ত উৎসাহে লালফৌজের সৈন্যেরা এমন ভঙ্গিও দেখাইতে লাগিল যে, তারা একাই জার্মানীকে চূড়ান্ত আঘাতে পর্যুদস্ত করিতে পারিবে, অন্যের সঙ্গে জয়ের অংশীদারিত্বের দরকার নাই। কিন্তু স্ট্যালিন এই মনোভাবের প্রশ্রয় দেন নাই, তিনি ১৯৪৩ সালেও মনে করিতেন যে, রাশিয়া একা জার্মানীকে হারাইতে পারিবে না।[১]

কারণ, জার্মানী তখনও প্রচণ্ড সামরিক শক্তির অধিকারী ছিল এবং বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে যে হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন গঠিত হইয়াছিল, সেই কোয়ালিশনের সঙ্গে পূর্ণতর সহযোগিতা রক্ষা করা যে প্রয়োজন স্ট্যালিন তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জন্য স্ট্যালিনগ্রাদের পর মিত্র রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে ও বৈদেশিক নীতিতে রাশিয়ার মনোভাব আগের চেয়ে অনেক বেশী উদার হইল। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার, সিসিলি ও ইতালীর ঘটনাবলীকে আগেকার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়া রাশিয়ার পত্রপত্রিকায় প্রচার করা হইল। যদিও তখনও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার দাবি জোরদার ছিল, তবু এই সমস্ত দাবির মধ্যে আগের মত তিক্ততা ছিল না।···

কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদের পর রাশিয়ার অভ্যন্তরে একটি চমকপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা হইল স্বয়ং স্ট্যালিনকে কেন্দ্র করিয়া। ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে হিটলারী নাৎসী বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত রাশিয়ার নেতৃত্বপদে আসীন স্ট্যালিনকে নিয়া তেমন কোন উচ্ছ্বাস বা প্রচারকার্য ছিল না। বরং স্ট্যালিনের বজ্রকঠোর ডিক্টেটরী ও নিষ্ঠুর পার্জগুলি—বিশেষতঃ ১৯৩৭ সালের, জনচিত্তে যথেষ্ট সংশয় ও দ্বিধার সৃষ্টি করিয়াছিল। তারপর রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের মত অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর ১৯৪১ সালের জুন মাসে আকস্মিক হিটলারী আক্রমণ সোভিয়েত নরনারীর চিত্তে এক অদ্ভুত হতভম্ব ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং স্ট্যালিনের কিছু কিছু সমালোচনার উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জয়লাভের পর হাওয়া সম্পূর্ণ ঘুরিয়া গেল। স্ট্যালিন নূতন সামরিক প্রতিভার—'Stalin as a military genius'—অধিকারীরূপে সোভিয়েট রাশিয়ায় আবির্ভূত হইলেন। পত্রপত্রিকায় ও বিভিন্ন রচনায় স্ট্যালিনের সামরিক প্রতিভার গুণকীর্তন শুরু হইয়া গেল। যদিও লালফৌজের পুনর্গঠন ও সংস্কারে এবং স্ট্যালিনগ্রাদে লালফৌজের

১। আলেকজান্দার ভার্থ—পৃষ্ঠা ৫৩২।

পালটা আক্রমণের পরিকল্পনা রচনায় ও রূপায়ণে একা স্ট্যালিনের কৃতিত্ব নয়, সেই কৃতিত্বের সমান অংশীদার ছিলেন জুকোভ, ভ্যাসিলেভস্কি, ভরোনোভ ও রকোসোভস্কি —তবু ব্যক্তিগতভাবে স্ট্যালিনের সামরিক প্রশস্তি ও বন্দনাগান প্রচারিত হইতে লাগিল এবং যুদ্ধের রণনীতিকে পর্যন্ত 'স্ট্যালিনিস্ট স্ট্র্যাটিজি' বা স্ট্যালিনীয় রণনীতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল।

এই সময় দেশপ্রেমসঞ্জাত জাতীয়তাবাদের প্রভাব আরও অনুভূত হইতে লাগিল। একমাত্র 'রাশিয়া' ও 'রুশ' শব্দের উপর জোর না দিয়া 'সোভিয়েট' ও 'সোভিয়েট ইউনিয়ন' শব্দগুলির বেশী ব্যবহার হইতে লাগিল এবং যুদ্ধের সংগঠন ও সাফল্যের পিছনে একমাত্র আর্মি বা লালফৌজের কৃতিত্বের উপর জোর না দিয়া সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির উপর জোর দেওয়া হইতে লাগিল। ১৯৪৩ সালে জাতীয় সঙ্গীতের পর্যন্ত পরিবর্তন ও সংস্কার করা হইল এবং কমিনটার্ন বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল।···

স্ট্যালিনগ্রাদে জয়লাভের পর সোভিয়েট রাশিয়ার এই সমস্ত ঘটনাবলীর গুরুত্ব কম ছিল না। এমন কি, অর্থনৈতিক দিকটাও এই সময়ে সমধিক গুরুত্ব অর্জন করিল। কেন না, ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে রাশিয়ার অভুতপূর্ব বীরত্ব ও ত্যাগস্বীকার সত্ত্বেও জার্মানীরা সঙ্গে সে পারিয়া উঠে নাই। একদিকে জার্মান সৈন্যবাহিনীর লড়াইয়ের দক্ষতা এবং অন্যদিকে তার অস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা রাশিয়াকে যথেষ্ট কাবু করিয়াছিল। কয়লা, বিদ্যুৎ ও শ্রমশিল্পের উৎস এবং খাদ্য উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি মারাত্মকভাবে ঘায়েল হইয়া গেল। সাইবেরিয়ায় এবং উরলে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলি অবিশ্বাস্য দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে স্থানান্তরিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম উৎপাদন হইত। তা সত্ত্বেও শ্রমিক ও কর্মচারীরা দেশরক্ষার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়া খাটিতেন। তথাপি, প্রচুর বাধাবিঘ্ন ও বিপত্তির জন্য ১৯৪৩ সালেও কয়লা, পেট্রোল, ধাতব পদার্থ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উৎপাদনে প্রচুর ঘাটতি ছিল।

বলা বাহুল্য যে, দেশের প্রতিরক্ষায় ও যুদ্ধের প্রয়োজনে সোভিয়েট রাশিয়ার পুরুষদের তুলনায় নারীরাও পিছনে পড়িয়া রহিল না। বরং বহুক্ষেত্রে তাদের ত্যাগস্বীকার ও অতুলনীয় পরিশ্রম নৈপুণ্য ইতিহাসের নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিল। আলেকজান্দার ভার্থ রুশ নারীদের মহিমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন ঃ

'The morale of the Russian women, conscious of working for their husbands or sons or brothers in the Army, was particularly admirable. Though less spectucular than the Battle of Stalingrad, the stupendaus mass effort made by the women of Russia during the war, whether in industry or agriculture, had nothing to equal it.'

সহজ কথায়—রুশ নারীদের নৈতিকশক্তি অত্যন্ত উচ্চগ্রামের ছিল। তাঁরা জানিতেন যে, তাঁরা সৈন্যবাহিনীতে তাঁদের স্বামী, পুত্র বা ভ্রাতার জন্য কাজ করিতেছেন। যদিও স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের মত এতটা জমকালো নয়, তবু গোটা যুদ্ধের সময় রুশ নারীরা কৃষিক্ষেত্রে বা শ্রমশিল্পে উৎপাদনের জন্য যে গণ-প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন, তার কোন তুলনা নাই।[১]

১। রাশিয়া অ্যাট ওয়ার—পৃষ্টা ৫৬৩।

রুশ নারীদের এই মহিমান্বিত কাজের একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষির কাজে গরুর বদলে রুশ নারীরা নিজেরাই লাঙ্গল টানিয়াছেন। ফলে, কারখানায় শস্যক্ষেত্রে সর্বত্র তাঁরা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন।

* * *

১৯৪৩ সাল থেকে রাশিয়ার নিজস্ব উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনি পশ্চিমী শক্তিবর্গের কাছ থেকে, বিশেষভাবে মার্কিন কর্জ ও ইজারা আইন অনুসারে প্রাপ্ত সামরিক সাহায্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিল। সৈন্যবাহিনীর খাদ্যে ও যানবাহনের ব্যাপারে আমেরিকার প্রেরিত হাজার হাজার লরী, জীপ ও গাড়ি যুদ্ধরত রাশিয়ার সামরিক চলাচলের ক্ষেত্রে প্রভূত কাজে লাগিল। জরুরি প্রয়োজনের মুহূর্তে এই সাহায্য রাশিয়ার যে প্রভুত উপকারে আসিয়াছিল, তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে, এই সমস্ত মার্কিন, বৃটিশ ও কানাডীয়ান সাহাহ্য স্ট্যালিনগ্রাদের পরেই বেশী কাজে লাগিয়াছিল এবং ১৯৪৩ সালে আমেরিকান সরবরাহের পরিমাণ অভুতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাইল। বিস্তৃত হিসাব উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৪১-৪২ সালে যে মার্কিন সরবরাহের পরিমাণ ছিল মাত্র ১২ লক্ষ টন সেইখানে ১৯৪৩ সালে মার্কিন সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়াইল ৪১ লক্ষ টন—১৯৪৪ সালের প্রথম চার মাসের হিসাব ধরিলে ৬০ লক্ষ টনের বেশী। এর মধ্যে ২০ লক্ষ্য টন ছিল খাদ্য। আর ভারী ও হালকা সমরাস্ত্র ও সামরিক দ্রব্যের পরিমাণ ছিল অজস্র—যেমন ২২শে জুন, ১৯৪১ থেকে ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৪ সালের মধ্যে সরবরাহ করা হইয়াছে :

৬,৪৩০ বিমান
৩,৭৩৪ ট্যাঙ্ক
২,১০,০০০ যানবাহন
৩,০০০ বিমান-মারা কামান
২ কোটি ৩০ লক্ষ গজ আর্মি ক্লথ
২০ লক্ষ টায়ার
৪,৭৬,০০০ টন পেট্রোল
৯৯,০০০ টন অ্যালুমিনিয়ম
১,৮৪,০০০ টন তামা
৪২,০০০ টন দস্তা
৬,৫০০ টন নিকেল
১ কোটি ২০ লক্ষ টন ইস্পাত
২০,০০০ টন মেসিন টুল
১৭,০০০ মোটর সাইকেল
৯৯ কোটি ১০ লক্ষ কার্তুজ
২ কোটি ২০ লক্ষ গোলাগুলি
৮৮ হাজার টন বারুদ
১২ লক্ষ ৩০ হাজার টন অতি বিস্ফোরক পদার্থ
১২ লক্ষ কি. মি. দীর্ঘ টেলিফোনের তার এবং ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ফিল্ড টেলিফোন
৫৫ লক্ষ জোড়া আর্মি বুট জুতা
আর ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার মূল্যের সমরশিল্পের যন্ত্রসজ্জা এবং ১০টি মাইন ও তৈল শোধনাগারের তোলা জাহাজ
১২টি গানবোট ও ৮২টি ছোট পোত

বৃটেনের পক্ষ থেকে ২২শে জুন, ১৯৪১ থেকে ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৪ পর্যন্ত জাহাজযোগে পাঠানো হইয়াছিল ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টন সমরসম্ভার। এর মধ্যে রাশিয়াতে পোঁছিয়াছিল ১০ লক্ষ ৪১ হাজার টন সামরিক দ্রব্য। যার মধ্যে ছিল—

৫৮০০ বিমান
৪২৯২ ট্যাঙ্ক
১২ মাইন তোলা জাহাজ
১,০৩,০০০ টন রবার
৩৫,০০০ টন অ্যালুমিনিয়ম
৩৩ হাজার টন তামা
২৯ হাজার টন টিন
৪৮ হাজার টন সীসা
৯৩ হাজার টন পাট

এগুলি ছাড়া গোলাগুলি, বিস্ফোরক পদার্থ, মেসিন টুল এবং বহু যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও ছিল।

কানাডার কাছ থেকেও রাশিয়া ১১৮৮ ট্যাংক, ৮৪২ সাঁজোয়া গাড়ি, ১০ লক্ষ গোলাগুলি, ৩৬ হাজার টন অ্যালুমিনিয়ম এবং ২ লক্ষ ৮ হাজার টন গম ইত্যাদি পাইয়াছিল—এগুলির মোট মূল্য ছিল ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার।

যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সরবরাহের মোট পরিমাণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন সরবরাহ জাহাজযোগে পাঠানো হইয়াছিল (জেনারেল ডীনের অভিমত)।

মোট সাহায্যের পরিমাণ এক হাজার এক শত কোটি (১১ বিলিয়ন) ডলার। পশ্চিম থেকে রাশিয়ায় প্রেরিত মোট দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বিশেষভাবে ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ট্রাক, ১৫ হাজার সামরিক যানবাহন, ৩৫ হাজার মোটর সাইকেল, ২৬ লক্ষ ৭০ হাজার টন পেট্রোলজাত দ্রব্য এবং ৪৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টন খাদ্যদ্রব্য।

এই সাহায্যের তালিকা নিঃসন্দেহে সাধারণ পাঠকের নিকট অভুতপূর্ব বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু যুদ্ধটা সর্বাত্মক এবং রণদানবের ক্ষুধাও ছিল অপরিমিত। সুতরাং রাশিয়ার নিজস্ব উৎপাদিত ও ব্যবহৃত সামরিক দ্রব্য ও অস্ত্রের তুলনায় এই 'অপরিমিত' বিদেশী সাহায্যও 'সামান্য' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কারণ, ১৯৪৬ সালে স্ট্যালিনের প্রদত্ত এক বক্তৃতায় দেখা যায় যে, যুদ্ধের শেষ তিন বছরে রাশিয়ায় উৎপাদিত হইয়াছিল—

প্রায় ১ লক্ষ ট্যাংক, ১ লক্ষ ২০ হাজার বিধান, ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কামান, ১২ লক্ষ মেসিনগান, ৬০ লক্ষ টমিগান, ৯০ লক্ষ রাইফেল, ৩ লক্ষ মর্টার, ৭০ কোটি গোলা-গুলি এবং প্রায় ২ হাজার কোটি কার্তুজ ইত্যাদি।

সুতরাং স্ট্যালিনের প্রদত্ত এই হিসাব অনুসারে পশ্চিমী ভারী অস্ত্রসম্ভারের (ট্যাংক ও প্লেন) আনুপাতিক পরিমাণ ছিল শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগের মধ্যে।

এই সমস্ত সাহায্যের পরিমাণ ও কার্যকারিতা নিয়া উভয়পক্ষে বিতর্কও কম হয় নাই। তবে, ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েট সংবাদপত্রে পশ্চিমী সাহায্যের জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হইয়াছিল।[১]

কমিন্টার্ন বাতিল

১৯৪৩ সালের মে মাসে সোভিয়েট রাশিয়া আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিল, যে পদক্ষেপ হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট দুনিয়া উভয়ের পক্ষে গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক ছিল। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—তথা সারা

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫৬৭-৬৯।

ধনিক জগৎ কমিন্টার্ন বা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনকে সর্বদাই ভয়ের চক্ষে দেখিত। কেন না, থার্ড ইন্টারন্যাশনাল বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক, অর্থাৎ কমিন্টার্নের মূলগত উদ্দেশ্য ছিল দেশে দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রেরণা দেওয়া কিংবা বিপ্লবের সংগঠনে সহায়তা দেওয়া। অর্থাৎ ধনিক দেশের গভর্নমেণ্টগুলির উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করা কিংবা তেমন চেষ্টায় সহায়তা দেওয়া। এজন্য দেশে দেশে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ও কমিন্টার্ন সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পাত্র ছিল। নানা বিরূপ প্রচারকার্যের মূল উৎসও ছিল তৃতীয় আন্তর্জাতিক-কেন্দ্রিক বিপ্লবের ভীতি। বৃটিশ ও মার্কিন মহল থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি হইতেছিল কমিন্টার্ন সম্পর্কে। সুতরাং প্রধানতঃ বৃটেন ও আমেরিকার সন্দেহ সংশয় দূর এবং তাদের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য ২২শে মে, ১৯৪৩, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কার্যকরী কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এক প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা কমিন্টার্ন বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। এক ঘোষণায় বলা হইল যে, কমিন্টার্ন 'সেকেলে' বা 'out of date' হইয়া গিয়াছে, বিভিন্ন দেশের জাতীয় শ্রমিক পার্টিগুলির কার্য ও শক্তিবৃদ্ধির পথে এই সংগঠন অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। মহাযুদ্ধের জন্য এবং ফ্যাসিস্ট আক্রমণের জন্য যখন প্রয়োজন অক্ষশক্তিবর্গের গভর্নমেণ্টগুলির পতন ঘটানো, তখন হিটলার-বিরোধী মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীসমূহের উচিত সেই সমস্ত দেশের গভর্নমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় পূর্ণ সমর্থন ও সাহায্য দেওয়া। সুতরা কমিন্টার্নের কার্যকরী সমিতি জার্মান ফ্যাসিস্ট ও তাদের দালালদের ধ্বংস করার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।

এই দলিলে স্বাক্ষর দিলেন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট জগতের খ্যাতিমান নায়কেরা, যেমন—গট্‌ওয়াল্ড, ডিমিট্রোভ, ঝাদানোভ, কুসিনেন, থোরেজ, তোগলিয়াত্তি প্রভৃতি।

কমিন্টাকর্নের কর্মকর্তাদের গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে ঘোষণা করা হইল :

'The proposal to disband is based on the fact that the world conditions have greatly altered since the Comintern was founded, and that this form of international working class organisation no longer corresponds to world conditions, specially in view of the state of affairs created by the present war'.

অর্থাৎ যে বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে কমিন্টার্ন বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তা এই যে, কমিটর্নন যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তার পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অবস্থার বহুল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। এই ধরনের আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগঠন বর্তমান পৃথিবীর অবস্থায়—বিশেষভাবে বর্তমান যুদ্ধের জন্য যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তার সঙ্গে আর খাপ-খায় না।*

কমিন্টার্ন বাতিলের সংবাদকে সেই সময় স্বাগত জানাইয়া স্বনাম প্রসিদ্ধ এম. এন. রায় লিখিয়াছেন, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বাতিল করার সংবাদে সারা বিশ্বে প্রবল বিস্ময়ের সৃষ্টি হইবে। কারণ, এই সংবাদ অপ্রত্যাশিত, যদিও বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের তুল্য নয়। এই পন্থা গ্রহণের দ্বারা রুশেরা কোন স্বেচ্ছাচারিতার কাজ করেন নাই কিংবা কোন সুযোগসন্ধানী মনোভাবেরও পরিচয় দেন নাই। যদিও এর ফলে বর্তমান যুদ্ধে মিত্রপক্ষ ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল কূটনৈতিক সম্পর্ক

* দি রাশিয়ান রেভোলিউশন—এম. এন. রায়, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ১৮৪।

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কেননা, ২৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কমিন্টার্ন পৃথিবীর শাসকশ্রেণীর কাছে অত্যন্ত আতঙ্কের কারণ ছিল। আজ যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় পড়িয়া সামরিক সুবিধার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রপক্ষের সহযোগিতা চলিতেছে বটে, কিন্তু এই জরুরী অবস্থা কাটিয়া গেলেই কমিন্টার্নের দোহাই দিয়া এই মিত্রতার অবসান ঘটানো যাইতে পারে। সুতরাং কমিন্টার্ন তুলিয়া দিয়া সোভিয়েট রাশিয়া একটি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে।

এম. এন. রায় এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার বাইরে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁরা অন্ধের মত মস্কোকে অনুসরণ করিয়াছেন এবং ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির ভুল ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিজম ও কমিউনিজম পরস্পরের হাত মিলাইয়াছে এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসীর যুদ্ধ হইতেছে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ।[১]

একথা সত্য যে, ১৯৩৯-৪০ সালে (রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের কাল) কমিন্টার্নের পক্ষ থেকে 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের' চীৎকারে গগন বিদীর্ণ হইতেছিল এবং এর দ্বারা ফ্রান্সের তো ক্ষতি হইয়াছিল বটেই রাশিয়ার পক্ষেও যথেষ্ট বিভ্রান্তির কারণ দেখা গিয়াছে। এমনকি, স্বয়ং স্ট্যালিন পর্যন্ত এর ফলে কম বিরক্ত হন নাই।

'Stalin had been a bit fedup with the Comintern for sometime, especially for their screaming about the imperialist war in 1939-40.'[২]

(কমিন্টার্নের পক্ষ থেকে ডিমিট্রভই সেই সময় 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার ছিলেন।)

অতএব ১৯৪৩ সালের ২২শে মে তারিখের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে স্ট্যালিন 'রয়টারের' জনৈক প্রতিনিধির নিকট খোলাখুলি বলিলেন যে, নাৎসীরা অনবরত প্রচার করিতেছে যে, মস্কো অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে, বলশেভিক মতবাদে দীক্ষা দিবে ইত্যাদি ; কমিন্টার্ন বাতিলের দ্বারা প্রমাণ হইল যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই সমস্ত নিতান্তই কুৎসা মাত্র। এর দ্বারা রাজনৈতিক মতবাদের ও পার্টি আনুগত্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমস্ত দেশপ্রেমিক জনগণের পক্ষে প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে একত্র করার সুযোগ সৃষ্টি হইল। স্বাধীনতা প্রেমিক সমস্ত জাতির উচিত ফ্যাসিস্ট শক্তিকে সংহারের জন্য সমস্ত চেষ্টা সংহত করা।...

সাহসের সঙ্গে কমিন্টার্ন বাতিল করিয়া দিয়া স্ট্যালিন এভাবে হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের অংশীদারদের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের শেষ উপাদানগুলি দূর করিতে চাহিলেন। যদিও একথা সত্য যে, মহাযুদ্ধের শেষে ফ্যাসিবিরোধী মহাজোট টিকে নাই, তবু একথা সত্য যে, স্ট্যালিন বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১। এম. এন. রায়—পৃষ্ঠা ২২৯।
২। Alexandcr Werth—P. 609.

ষষ্ঠ পর্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

পোলিশ সমস্যা ও ক্যাটিন অরণ্যের রহস্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কূটনৈতিক ইতিহাসে পোল্যাণ্ড ও পোলিশ সমস্যা একটা প্রকাণ্ড অংশ জুড়িয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ থেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ এবং তারপর জার্মানী ও রাশিয়া কর্তৃক পোল্যাণ্ড পার্টিশান বা দ্বিখণ্ডনের পর কার্যতঃ এই পোলিশ সমস্যা সারা যুদ্ধের ব্যাপ্তিকাল জুড়িয়াছিল। হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন গঠিত হওয়া সত্ত্বেও এই কোয়ালিশনের পক্ষে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক বিরোধের ব্যাপার ছিল পোলিশ সমস্যা এবং তার মীমাংসা। লণ্ডন, ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে এই সমস্যা নিয়া দীর্ঘকাল প্রচণ্ড টানাহ্যাঁচড়া গিয়াছে।

১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ডের পতনের পর পোলিশ গভর্নমেণ্ট রোমানিয়া হইয়া প্যারিসে গিয়া আশ্রয় নিল এবং ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের পতনের পর এই গভর্নমেণ্ট লণ্ডনে স্থানান্তরিত হইল এবং বৃটিশ, মার্কিন ও সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের (১৯৪১) স্বীকৃতি পাইল। কিন্তু লণ্ডনের এই নির্বাসিত পোলিশ গভর্নমেণ্টকে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট স্বীকৃতি দিলে কি হইবে, এই গভর্নমেণ্ট সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি খড়্গহস্ত ও কমিউনিজমের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। এমন কি, হিটলারী জার্মানীর হাতে পোল্যাণ্ডের এমন মর্মান্তিক পরাজয়ের পরেও পোলিশ সরকারী নেতাদের রুশ বিদ্বেষে ভাঁটা পড়িল না। অবশ্য এই বিদ্বেষের একমাত্র কারণ কমিউনিজম ছিল না, ছিল পোলদের উগ্র জাতীয়তাবোধ এবং রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বহু দীর্ঘ শতাব্দীর সম্পর্কের ইতিহাস।

'Polish animostly towards Russia had a long history. The nationalistic Polish leaders could not forget the glories of the fifteenth and sixteenth centuries when their empire extended deep into the territory of modern Russia, embrasing the Ukrine and at one point pressing the shores of the Black Sea.'[১]

অর্থাৎ রাশিয়ার প্রতি পোলিশ শত্রুতার দীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পোলিশ সাম্রাজ্য বর্তমান রাশিয়ার বহুদূর অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমনকি উক্রাইনকে আলিঙ্গন করিয়া এই সাম্রাজ্য কোন কোন বিন্দুতে কৃষ্ণসাগরের তীর পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছিল। পোলিশ জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের এই অতীত গৌরব কখনও ভুলিতে পারেন নাই।

অতীতে পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে অনেক রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটিয়া গিয়াছে এবং পোল্যাণ্ডও বারবার খণ্ডিত হইয়াছে—১৯৩৯ সাল নিয়া চতুর্থবার খণ্ডিত হইয়াছে। ফলে, পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমানা নিয়া বহু গোলযোগের কারণ ঘটিয়াছে। প্রথম

মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তদানীন্তন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমানায় যে নূতন লাইন টানা হইল, তার ফলে অ-পোলিশ জনগণকে পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে রাখা হইল। অর্থাৎ নূতন কার্জন লাইনের অন্তর্গত সীমানার মধ্যে পড়িল উক্রাইনীয়, হোয়াইট রুশীয় এবং লিথুয়ানিও বাসিন্দারা। কিন্তু পোলিশ জাতীয়তাবাদীরা কার্জন লাইন মানিল না। ১৯২১ সালে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পোলিশ গভর্নমেণ্ট পূর্বদিকে এই সীমানা আরও অনেকটা বাড়াইয়া নিল। ১০ মিলিয়ন বা এক কোটিরও অধিক জনবসতিপূর্ণ এলাকা পোলিশ পূর্ব সীমানার অন্তর্গত করা হইল। কিন্তু এই বৃহৎ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র এক তৃতীয়াংশ ছিল পোলিশ, বাকী সকলেই সোভিয়েট রাশিয়ার প্রজা ছিল। কিন্তু কোন পোলিশ গভর্নেণ্ট এই সীমানা পরিবর্তন করিতে রাজী ছিল না। বরং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আরো পূর্বদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেন যে, শ্লাভিক জাতির মধ্যে আরো দশ লক্ষ পোল ছড়াইয়া আছে। ১৯৩৯ সালের পরাজয়ের পরেও পোলিশ গভর্নমেন্ট পোল্যাণ্ডের এই পূর্ব সীমানা সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার ন্যায্য দাবী, অর্থাৎ ১৯২০-২১ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে যে সমস্ত ভূমিখণ্ড কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল, সেগুলি ফেরৎ দিতে রাজী ছিল না। অথচ ১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ডের পরাজয়ের পর পোলিশ রাজ্য—যখন জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করা হইল, তখন রাশিয়া ১৯১৯ সালের কার্জন লাইনের চুক্তিই পুনরুজ্জীবন করিলেন। কিন্তু পোল গভর্নমেন্ট এটা মানিতে রাজী ছিলেন না। অপরপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়াও তার ভবিষ্যত জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে এই রুশ-পোলিশ পূর্ব সীমানা নিয়া কোন 'ত্যাগ স্বীকারে' প্রস্তুত ছিল না।

পোলিশ সমস্যার মূলসূত্র এই সীমানা বিরোধের মধ্যে।...

১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ড জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে পার্টিশান হওয়ার সময় কয়েক লক্ষ পোল রাশিয়ানদের হাতে বন্দী বা নির্বাসিত হইয়াছিল। এদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক পোল সৈন্য ছিল এবং পোলিশ গভর্নমেন্টের দাবী অনুসারে পোলিশ সৈন্যবাহিনীর ১৫ হাজার অফিসার রাশিয়ার হাতে বন্দী ছিল, যাদের মধ্যে ৮০০ ছিল ডাক্তার। এই মোট সংখ্যার মধ্যে একমাত্র ৪০০ জন বন্দী ছাড়া ১৯৪১ সালের শেষ পর্যন্ত আর কোন বন্দীর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই।

এই নিখোঁজ যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্য নিয়া রুশ-পোলিশ বিরোধ নূতন করিয়া পাকাইয়া উঠিল এবং এর সঙ্গে জড়াইয়া পড়িল ক্যাটিন অরণ্যের হত্যা রহস্য।

কিন্তু সেকথা আলোচনার আগে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৪১, ৩০শে জুলাই রাশিয়া ও লণ্ডনের পোলিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, সেই অনুসারে পোল সামরিক, অ-সামরিক বন্দী ও আটক ব্যক্তিদের ছাড়া পাওয়ার কথা ছিল এবং রাশিয়াতে একটি পোলিশ বাহিনী গঠিত হওয়ারও প্রস্তাব ছিল। লণ্ডন পোলিশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল সিকোরোস্কি এই সমস্ত পোলিশ সমস্যা আলোচনার জন্য মস্কোতে গেলেন ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে, তখন মস্কো যুদ্ধের চরম পর্যায় চলিতেছিল। সেই গুরুতর পরিস্থিতিতে জেনারেল সিকোরোস্কি স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আগেকার কিংবা যুদ্ধ পূর্ববর্তী পোল্যাণ্ডের সীমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবী জানাইলেন।

স্ট্যালিন এই দাবী অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। কিন্তু রাশিয়াতে একটি পোলিশ আর্মি গঠনের প্রস্তাব সমধিক গুরুত্ব অর্জন করিল। জেনারেল এ্যাণ্ডার্সের অধিনায়কত্বে এই বাহিনী গঠিত হইল বটে, কিন্তু জেনারেল এ্যাণ্ডার্স রাশিয়াতে বন্দী ছিলেন। সুতরাং রাশিয়ার প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিলেন। যে সমস্ত পোলিশ সৈন্য নিয়া এই বাহিনী গঠিত হইল, তাদেরও রাশিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা (রুশ রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিশ এন. কে. ভি. ডি.'র অধীন বন্দীশালায় অবস্থানের সময়) খুব খারাপ ছিল। অনেক বাধা বিপত্তির পর ১৯৪১ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ৭৩,৪১৫ জন সৈন্য নিয়া পোলিশ বাহিনী গঠিত হইল। কিন্তু রুশ রণাঙ্গনে সোভিয়েটের পক্ষ হইয়া এই সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল না। একটার-পর-একটা ছুতা দেখাইয়া এরা যুদ্ধ এড়াইয়া যাইতেছিল। শেষ পর্যন্ত লণ্ডনের পোলিশ গভর্নমেণ্ট এই সৈন্যবাহিনীকে সোভিয়েট রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার অনুমতি দিলেন না। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে যখন স্ট্যালিনগ্রাদের দিকে জার্মান অভিযান হিংস্রবেগে চলিতেছিল, তখন 'ডুবন্ত জাহাজ থেকে ইন্দুরগুলি যেমন পালাইয়া যায়,' তেমনি করিয়া জেনারেল এ্যাণ্ডার্সের পোলিশ সৈন্যরা রাশিয়া ছাড়িয়া সোজা মধ্য প্রাচ্যে চলিয়া গেল এবং সেখানে তারা বৃটিশ সৈনাপত্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। নিঃসন্দেহে এই সৈন্যবাহিনী সোভিয়েটের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল।[১]

লণ্ডনের পোলিশ সরকারকে বৃটিশ ও আমেরিকান গভর্নমেণ্ট আর্থিক সাহায্য দিতেছিলেন। এমন কি, কর্জ ও ইজারা আইনের সুবিধাও পোলিশরা পাইতেছিল এবং বৃটিশ-মার্কিন উভয় সরকারই রুশ-পোলিশ সীমানা বিরোধে লণ্ডন পোলদের সমর্থক ছিলেন। লন্ডন এবং ওয়াশিংটনের বক্তব্য ছিল এই যে, যুদ্ধের শেষে শান্তি সন্ধি রচনার টেবিলে পোলিশ সীমানা সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে হইবে, ততদিন পর্যন্ত এই সীমান্ত প্রশ্নের চূড়ান্ত বিচার স্থগিত থাকুক। এর ফলে পোলরা আরও আস্কারা পাইল।

ইঙ্গ-মার্কিন-পোলিশ মনোভাবের আসল অভিসন্ধি এই ছিল যে, জার্মানী ও রাশিয়া উভয়ই যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন শান্তির টেবিলে এঁরা ইচ্ছামত ডিক্টেট্ করিতে পারিবেন।

১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে জেনারেল সিকোরোস্কি আমেরিকায় গেলেন এবং সেখানে সহকারী রাষ্ট্রসচিব সাম্নার ওয়েলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে এমন একটি উদ্ভট পরিকল্পনার কথা বলিলেন, যার দ্বারা লণ্ডন পোলদের সোভিয়েত বিরোধী মানসিকতার নূতন প্রমাণ পাওয়া গেল। এই পরিকল্পনার মর্ম ছিল এই যে, 'উত্তরে পোল্যাণ্ড ও দক্ষিণে তুরস্ক পর্যন্ত একটি পূর্ব-ইউরোপীয়-ইউনিয়ন গঠন করিতে হইবে —উত্তরে ও দক্ষিণে যথাক্রমে পোল্যাণ্ড ও তুরস্ক দুই কেন্দ্রবিন্দু হইবে।'

সাম্নার ওয়েলস এই পরিকল্পনার জবাবে বলিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া স্বভাবতঃই এমন প্রস্তাবকে তাদের দেশের বিরুদ্ধে সামরিক বেষ্টন নীতি বলিয়া মনে করিবে।

সিকোরোস্কিও অবশ্য এই মতামত অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এণ্টনি ইডেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনকালে লণ্ডন পোলদের উচ্চাশা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট খুব চমকপ্রদ তথ্য দিয়াছিলেন। ইডেন বলিয়াছিলেন যে, নির্বাসিত পোল সরকারের লোকেরা নিজেদের মধ্যে এই মর্মে বলাবলি করে যে, যুদ্ধের পরে জার্মানী চূর্ণ এবং রাশিয়া এত দুর্বল হইয়া পড়িবে যে, একমাত্র পোল্যাণ্ডই পূর্ব ইউরোপে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে দেখা দিবে। সেই রাষ্ট্রের পত্তন হিসাবে গোড়াতেই পোল সরকারের কেবল পশ্চিম বাইলোরুশিয়া এবং পশ্চিম উক্রাইন পাইলেই চলিবে না, পূর্ব প্রুশিয়াও তাঁদের চাই![১]

লণ্ডন পোলিশ গভর্নমেণ্টের উচ্চাশা বা দুরাশা কতদূর পর্যন্ত উঠিয়াছিল, ইডেন-রুজভেল্টের এই কাহিনীটি তারই প্রমাণ। এর অন্যতম কারণ অবশ্য বৃটিশ ও মার্কিন সরকারের কাছ থেকে পোলদের আস্কারা প্রাপ্তি। কিন্তু ১৯৪৩ সালে স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়লাভের পর সমগ্র সামরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া গেল এবং লণ্ডনে ও ওয়াশিংটনে এমন ধারণার সৃষ্টি হইতে লাগিল যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন একাই সম্ভবতঃ তার সীমানা উদ্ধার করিতে পারিবে। এই ধারণা থেকেই ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকার উপলব্ধি করিলেন যে, রুশ-পোলিশ সীমান্ত সমস্যার একটা সুমীমাংসা হওয়া উচিত। কিন্তু এটা তারা মনে মনে উপলব্ধি করিলেও হাতে-কলমে লণ্ডনের পোলিশ গভর্নমেণ্টকে সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম সীমানার যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা মানিয়া লইতে বাধ্য করিলেন না বা তেমন চাপও সৃষ্টি করিলেন না।

এই সময় সেই ক্যাটিন অরণ্যের বজ্রপাত! এই বজ্রপাত ঘটাইলেন নাৎসী প্রচার বিশারদ ডঃ গোয়েবেলস। ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৩, গোয়েবেলস ঘোষণা করিলেন যে, স্মলেনস্কের নিকটবর্তী ক্যাটিন অরণ্যে এমন হাজার হাজার গোরস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে, যেগুলির মধ্যে পোলিশ সৈন্যবাহিনীর নিখোঁজ অফিসারদের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। একটি জার্মান তদন্ত কমিটি এই সমস্ত 'গণ-গোরস্থান' (Mass graves) সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া যে সমস্ত প্রমাণ পাইয়াছেন, তাতে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালে রুশরা এই সমস্ত পোলিশ অফিসারকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

রুশদের হাতে নিহত এই সমস্ত পোলিশ অফিসারের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।

গোয়েবেলস প্রচারিত এই সংবাদে নিদারুণ উত্তেজনার সঞ্চার হইল এবং বলাই বাহুল্য যে, এই প্রচারের আসল লক্ষ্য ছিল সোভিয়েটকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও মিত্রশক্তির মধ্যে তিক্ত বিরোধের সৃষ্টি করা।

দুইদিন পর ১৬ই এপ্রিল ক্রুদ্ধ সোভিয়েট সরকার অত্যন্ত তীব্র ভাষায় এক কড়া প্রতিবাদ প্রকাশ করিলেন। তাঁরা ঘোষণা করিলেন যে, 'মিথ্যাবাদী গোয়েবেলসের দপ্তরের এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অপবাদ রটনা'। অভিযোগে বর্ণিত ক্যাটিন অরণ্যের এলাকা স্মলেনস্কের যুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মানদের হাতে পড়িয়াছিল এবং জার্মানরাই ওই সমস্ত পোলিশ বন্দী অফিসারদের ধরিয়া নিয়াগিয়া হত্যা করিয়াছে। জার্মানরা নিজেরা পোলিশদের খুন করিয়া এক্ষণে সেই অপরাধ

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৩২৯।

রাশিয়ার ঘাড়ে চাপাইয়া দেবার চেষ্টা করিতেছে। পোল্যাণ্ডে যারা নিয়মিতভাবে লক্ষ লক্ষ পোল নাগরিককে সাবাড় করিয়াছে, সেই খুনে বৃত্তিধারী নাৎসীরাই আবার রুশদের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা রটনা করিতেছে।

ক্যাটিন অরণ্যের এই হত্যাকাণ্ড লইয়া জার্মান ও রুশ উভয় পক্ষে বহু বাদ-প্রতিবাদ, এমন কি তদন্ত কমিটিরও দোহাই দেওয়া হইল বটে, কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ড অরণ্যের নিবিড় ছায়ায় রহস্যাবৃতই রহিয়া গেল। আজও নিঃসন্দিগ্ধভাবেই প্রমাণিত হয় নাই যে, কার এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়াছিল। একথা সত্য যে, ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালের অভিযানে জার্মানরা ক্যাটিন অরণ্য ও স্মলেনস্ক অঞ্চল রুশদের হাত থেকে কাড়িয়া নিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই সময় পোলিশ বন্দীরা জার্মানদের হাতে পড়িয়াছিল। ফলে, জার্মানদের হাতে এরা প্রাণ হারায়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার পক্ষে কোন চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং দুই পক্ষেরই কিছু গোলমেলে সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। যেমন—১৯৭৩ সালে প্রকাশিত জনৈক পোলিশ অধ্যাপকের রচিত ক্যাটিন অরণ্যের হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত এক পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, যে ১৫ হাজার পোলিশ সৈন্য ১৯৩৯ সালে লালফৌজের হাতে ধরা পড়িয়াছিল এবং নিখোঁজ হইয়া গিয়াছিল, তারা পরবর্তীকালে ১৯৪১ সালে জার্মানীর হাতে পড়িয়া থাকিতে পারে—

'About 5000 of their bodies were subsequently found in German-held territory ; the hands were tied with Soviet-made roaps, but the bullets with which they had been systematically shot through the head were of German origin.'[১]

অর্থাৎ এই সমস্ত নিহত পোলিশ সৈন্যের হাত বাঁধা ছিল সোভিয়েটের তৈয়ারী দড়ি দিয়া, কিন্তু যে সমস্ত বুলেট নিয়মিতভাবে তাদের মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিয়াছে, সেইগুলি ছিল জার্মানীর তৈরী।

সুতরাং রুশ দড়ি ও জার্মান বুলেটের দ্বারা হত্যাকারীদের পরিচয় চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হইল না। তবে, জার্মানী নিযুক্ত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, গোরস্থানের উপর যে সমস্ত গাছের চারা লাগানো হইয়াছিল, বিশেষজ্ঞ মতে সেইগুলির বয়স ছিল তিন বছর। অর্থাৎ ১৯৪০ সালে এইগুলি লাগানো হইয়াছিল। এবং জার্মানদের মতে ১৯৪০ সালেই এই সমস্ত পোলিশ অফিসার রুশদের হাতে নিহত হইয়াছে।

কিন্তু এই 'মামলার' কোন চূড়ান্ত মীমাংসা ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতেও হয় নাই। যদিও রুশ পক্ষই প্রথম আদালতে বিষয়টি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তবু জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ক্যাটিন অরণ্যের হত্যা সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের ঐক্য রক্ষার খাতিরে রুজভেল্ট ও চার্চিলও বিষয়টি শেষ পর্যন্ত ধামা চাপাই দিয়াছিলেন। বর্তমান পোলিশ সরকারও এই বিষয় নিয়া মাথা ঘামাইতেছেন না।

কিন্তু ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে লণ্ডনের পোলিশ গভর্নমেণ্ট ক্যাটিন অরণ্যের

১। Death in the Forest—J. K. Jawodny. Macmillan, London. (কলিকাতা স্টেটসম্যান পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনা থেকে উদ্ধৃত।)

হত্যা রহস্যকে কেন্দ্র করিয়া কার্যতঃ সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে গোয়েবেলসের প্রপাগাণ্ডারই প্রতিধ্বনি করিলেন। তাদের আসল মতলব ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে এভাবে নৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করিয়া রুশ-পোলিশ সীমান্ত সমস্যার ব্যাপারে রাশিয়াকে নরম করা। এদিকে চার্চিলও মন্তব্য করিলেন—'ক্যাটিন অরণ্যের ঘটনাবলী ভয়ঙ্কর'। ফলে, লণ্ডনের পোলিশরা আস্কারা পাইয়া গেলেন .এবং তাঁরা আন্তর্জাতিক রেডক্রশের (জেনেভা) দ্বারা সমগ্র ঘটনার তদন্তের দাবী জানাইলেন। তখন সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন এবং লণ্ডনের পোলিশ সরকারের সঙ্গে ২৫শে এপ্রিল কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ঘোষণা করিলেন:

'While the peoples of the Soviet Union shed their blood in the bitter struggle against Nazi Germany and strain all their strength to defeat the common enemy of the Russian and Polish peoples and of all freedom-loving democratic countries, the Polish Government deals the Soviet Union a perfidious blow to please the Hitler tyranny.'[১]

সহজ কথায়—সোভিয়েট রাশিয়া যখন রুশ ও পোল জনগণের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে রক্ত ঢালিয়া দিতেছে, এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশের স্বাধীনতা-কামী জনগণের জন্য সর্বশক্তি দিয়া লড়াই করিতেছে, তখন পোলিশ সরকার হিটলারী অত্যাচারের মদত দেওয়ার জন্য সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার আঘাত হানিতেছে।

সোভিয়েট সরকারের এই কড়া নীতিতে চার্চিলের টনক নড়িয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি স্ট্যালিনের নিকট এক চিঠি দিয়া লণ্ডন পোলিশদের এই সমস্ত জঘন্য প্রচারকার্য বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু যুদ্ধ ও তার পরবর্তীকাল পর্যন্ত রাশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে গভীর বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বজায় রাখার জন্য লণ্ডন পোলদের সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তার দিকেও ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু স্ট্যালিন তাতে রাজি হইলেন না এবং স্পষ্টই বলিলেন যে, লণ্ডনের পোলিশ গভর্নমেণ্ট হিটলার-ভক্তদের দ্বারা বেষ্টিত, এদের কোন ভবিষ্যৎ নাই এবং পোল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাওয়ারও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এদের বদলে সোভিয়েট রাশিয়াতে একটি নূতন পোলিশ গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।...

লণ্ডন পোলিশ সরকারের নেতা ছিলেন জেনারেল সিকোরোস্কি। তিনি 'প্রো-হিটলার' বা নাৎসী অনুরাগী ছিলেন না, বরং অনেকটা স্থির মস্তিষ্কের ছিলেন। এই সময় ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩, সিকোরোস্কি অত্যন্ত রহস্যজনক অবস্থার মধ্যে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইলেন। সোভিয়েট মহলের অনুমান এই যে, জেনারেল সিকোরোস্কির মৃত্যু দুর্ঘটনার জন্য ঘটে নাই, এই মৃত্যু তারাই ঘটাইয়াছিল, যারা পোলিশ সমস্যায় সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি আরো কড়া নীতি অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিল।

এদিকে পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে পোলিশ দেশপ্রেমিকরা জার্মানদের বিরুদ্ধে পার্টিজান লড়াই চালাইবার জন্য সংগঠন তৈরী করিয়াছিলেন এবং তাঁরা অনুভব

১। **British Forign Policy During World War II, P. 331,**

করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা ছাড়া পোল্যাণ্ডের মুক্তি ঘটিবে না। ১৯৪৩ সালে সোভিয়েট রাশিয়াতেও দেশপ্রেমিক পোলদের একটি সংগঠন তৈরী হইল—'লীগ অব পোলিশ প্যাট্রিয়টস্' প্রতিষ্ঠিত হইবার পর রাশিয়াতে একটি পোলিশ সৈন্য ডিভিসনও সংগঠিত হইল। ফলে লণ্ডনের নির্বাসিত পোল সরকারের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইল এবং তারাও পালটা পন্থা হিসাবে পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে একটি আত্মগোপনকারী পোলিশ বাহিনী গড়িতে চাহিলেন।

পোলিশ সমস্যা এইভাবে আরো জট পাকাইতে লাগিল। এদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার জয় অব্যাহত ধারায় চলিল। কুরস্কে জার্মানীর বহু প্রত্যাশিত ও বহু বিজ্ঞাপিত গ্রীষ্মাভিযান রুশদের হাতে প্রচণ্ড মার খাইল। তখন বৃটিশ সরকার সোভিয়েট-পোলিশ সীমান্ত সমস্যা আর-একবার মীমাংসার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তাঁরা প্রস্তাব দিলেন যে, কার্জন লাইনই হইবে পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমানা এবং পোলিশরা এটা মানিয়া নিলে তাঁরা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ডানজিগ, পূর্ব প্রুশিয়া ও উত্তর সাইলেশিয়ার একটি অংশ পাইবেন। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন প্রস্তাব দিলেন যে, লণ্ডন-পোলিশ-সরকার যদি সোভিয়েট-পোলিশ সীমান্ত হিসাবে কার্জন লাইন মানিয়া লন, তবে সোভিয়েট সরকারের উচিত হইবে পোলিশ সরকারের সঙ্গে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে ও সোভিয়েট রাশিয়াতে যে সমস্ত পোলিশ সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলির সম্পর্কেও লণ্ডন-পোলিশ সরকারের সঙ্গে আপোস মীমাংসা করা।

কিন্তু এই বৃটিশ প্রস্তাবের মধ্যে যে কূটনৈতিক প্যাঁচ ছিল, তার নির্গলিত অর্থ ছিল এই যে, পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমানা হিসাবে কার্জন লাইন মানিয়া লওয়ার বদলে লণ্ডনের ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল পোলিশ সরকারকে রাশিয়ার স্বীকৃতি দিতে হইবে। এমনকি ভবিষ্যতে পোল্যাণ্ডের আসল গভর্নমেণ্ট হিসাবেও একে মানিয়া নিতে হইবে। স্বভাবতঃই নাৎসী বিরোধী ও প্রগতিশীল পোলিশ জনগণ এবং তাদের সংগঠনকে বাদ দিয়া সোভিয়েট সরকার এই ধরনের একটি প্রতিক্রিয়াশীল নির্বাসিত গভর্নমেণ্টকে স্বীকৃতি দিতে পারেন না। সুতরাং রুশ-পোলিশ সম্পর্কের তখনও কোন মীমাংসা হইল না—যেমন মীমাংসা হইল না ক্যাটিন অরণ্যের হত্যাকাণ্ডের রহস্যের।

এই প্রশ্ন পরবর্তীকালেও বৃটিশ, মার্কিন ও সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছিল।

ষষ্ঠ পর্ব

সপ্তম অধ্যায়

কুর্স্ক—জার্মানীর শেষ অভিযানের ব্যর্থতা

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মাভিযানে জার্মানী পূর্ব রণাঙ্গনে যা-কিছু দখল ও জয় করিয়াছিল, ১৯৪২-১৯৪৩-এর শীতাভিযানে তার প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। স্ট্যালিনগ্রাদে পালটা আক্রমণের পর থেকে লাল ফৌজ পশ্চিম দিকে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ৪৫৩ মাইল অগ্রসর হইয়া গেল এবং ১ লক্ষ ৮৫ হাজার বর্গ মাইল ভূমি পুনর্দখল করিল। ৩১শে মার্চ, ১৯৪৩ এই শীতাভিযান শেষ হইল এবং জার্মানরা ওরেল-বেলগোরোদ এবং উত্তর ডনেৎস নদী এলাকা পর্যন্ত হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু ওরেল ও বেলগোরোদের মাঝখানে কুরস্ক্ শহর রুশদের দখলে থাকায় রণাঙ্গনের বিচিত্র স্ফীতিমুখের সৃষ্টি করিল। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মাভিযানে এই স্ফীতিমুখ বিখ্যাত হইয়া উঠিল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'Battle of the Kursk Bulge' নামে পরিচিত এবং ইতিহাসে এই যুদ্ধ বিশেষ খ্যাত হওয়ার কারণ এই যে, হিটলারের উহাই ছিল শেষ আক্রমণাত্মক অভিযান এবং পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের শেষ চেষ্টা। সুতরাং এই শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় জার্মানীর যুদ্ধ জয়ের আর কোন আশা রহিল না। স্ট্যালিনগ্রাদের পর কুরস্ক্ জার্মানীর সামরিক জিগীষার অন্তিম সমাধি রচনা করিল।

কিন্তু হিটলারের প্রয়োজন ছিল একটা চূড়ান্ত রকমের চাঞ্চল্যকর জয়ের, স্ট্যালিনগ্রাদে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া সামলাইয়া উঠা দরকার। কেননা অক্ষশক্তিবর্গ-মহলে এবং আন্তর্জাতিক জগতে হিটলারী জার্মানীর সম্ভ্রম নষ্ট হইয়াছে, সামরিক গরিমা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং 'অজেয়' জার্মানবাহিনীর মনে হতাশার সূত্রপাত হইয়াছে। ইতিমধ্যে খারকোভ অবশ্য জার্মানী পুনরায় কাড়িয়া নিয়াছিল, কিন্তু তার দ্বারা হিটলারী গরিমার পুনর্বিন্যাস ঘটিল না। সুতরাং সৈন্যাবাহিনীর এবং অক্ষশক্তিবর্গের নৈতিক পুনর্জীবনের জন্য একটা বড় রকমের জয়ের প্রয়োজন ছিল। যদি এই জয় অর্জন সম্ভব হয়, তবে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে এই একটা পৃথক সন্ধি স্থাপনের সম্ভাবনাও দেখা যাইতে পারে। কিন্তু এর জন্য একটা উপযুক্ত রাজনৈতিক পটভূমিকা চাই, অর্থাৎ জার্মানী কেবল তার নিজের জাতীয়স্বার্থের জন্যই পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতেছে না, করিতেছে গোটা ইউরোপকে 'বলসেভিক বর্বরতার' গ্রাস থেকে রক্ষার জন্য। এজন্য ১৯৪৩ সালে গোয়েবেলসের রাজনৈতিক প্রচারকার্যের সুর বদলাইয়া গেল। জার্মানীর নিজস্ব বাসভূমি বা 'লেবেনস্রাম্'-এর বদলে 'ফেসতুং ইউরোপা বা ইউরোপীয় দুর্গের শ্লোগান প্রচারিত হইতে লাগিল।

The worse the German situation grew in Russia, less and less was heard of the Germanic New Order. By the end of the summer campaign, Lebensraum had given way to Festung Europa.[১]

১। J. F. C. Fuller—P. 275.

এই ইউরোপীয় দুর্গ রক্ষার নূতন রাজনৈতিক চিন্তার জন্যই কুরস্কে জার্মান সামরিক অভিযানের সাঙ্কেতিক নাম দেওয়া হইল 'অপারেশন সিটাডেল' বা দুর্গাভিযানের রণক্রিয়া।...

হিটলার অবশ্যই ফেব্রুয়ারী মাসেই ধুয়া তুলিলেন যে, শীতকালীন যুদ্ধে যা নষ্ট হইয়াছে, গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধে তা ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণ এত সহজ ছিল না। কেননা, হিটলারের পাঁচ থেকে সাত লক্ষ সৈন্য এবং অজস্র সমরোপকরণ নষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং জানুয়ারী মাসে জার্মানীতে 'সর্বাত্মক সমাবেশের' হুকুম জারি করিয়াও অর্ধেকের বেশী ক্ষয়ক্ষতি পূর্ণ করা গেল না। তবুও হিটলারের পক্ষে একটা জমকালো জয়ের প্রয়োজন ছিল ভগ্না তীরের পরাজয়ের গ্লানি ঢাকিবার জন্য। ওরেল এবং বেলগোরোদের মধ্যবর্তী কুরস্ক্ স্ফীতিমুখে এই জমকালো জয় অর্জনের সুযোগ আসিয়াছে বলিয়া হিটলার মনে করিলেন। কারণ, এর অবস্থান রণনীতি দিক থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। ওরেল থেকে ১০০ মাইল দক্ষিণে এবং খারকোভ থেকে ১০০ মাইল উত্তরে এর অবস্থান। ওরেল, বেলগোরোদ, খারকোভ সবই জার্মানীর দখলে ছিল। আর কুরস্ক্ ছিল সোভিয়েট দখলে। ফলে এখানে পরস্পরের লাইন এক বিচিত্র আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। ইংরাজী 'S' অক্ষরটিকে উলটা করিয়া সাজাইলে যেমন দেখায় খারকোভ থেকে ওরেল পর্যন্ত উভয়ের লাইন তেমন অভিনব দেখাইতেছিল। জার্মানরা ছিল ওরেলের পূর্বদিকে বক্ররেখায় অংশে, আর রুশরা কুরস্কের পশ্চিমদিকের বক্ররেখায়। রণনীতির দিক থেকে এজন্য উভয়ে উভয়কে ঘায়েল করার সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। প্রকৃতপক্ষে উভয়পক্ষই যেন এখানে পরস্পরের জ্ঞাতসারে সৈন্যসমাবেশ ও আক্রমণের আয়োজন করিতেছিল।

মার্শাল রকোসোভস্কি লিখিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষের কার্যাবলী এবং রুশ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট পর্যালোচনা করিয়া সোভিয়েট সেনানীমণ্ডলী সঠিকভাবেই বুঝিয়াছিলেন যে, জার্মানী যদি আদৌ কোন আক্রমণাত্মক অভিযান করে, তবে, সেই অভিযান হইবে কুরস্ক স্ফীতিমুখের বিরুদ্ধে। কারণ, জার্মান আক্রমণের পদ্ধতি এবং রণনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে কুরস্কের বিরুদ্ধে আঘাত হানাই হিটলারী বাহিনীর পক্ষে সুবিধাজনক ছিল।

'সিটাডেল' বা দুর্গ, এই সাঙ্কেতিক নামে এই অভিযান যে গুরুত্ব অর্জন করিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল ১৯৪৩, ১৫ই এপ্রিলের হিটলারী হুকুমনামায়:

'I have decided. as soon as weather permits, to carry out the first offensive of the year, Operation Citadel. This offensive is of decisive importance. It must give us the initiative for the spring and summer.'[১]

অর্থাৎ অপারেশন সিটাডেল নামে বছরের প্রথম অভিযান শুরু হইবে আবহাওয়া অনুকূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। হিটলার আশা করিতেছেন যে, এই আক্রমণ চূড়ান্ত রকমের হইবে এবং জার্মানদিগকে অবশ্যই বসন্ত ও গ্রীষ্মকালীন অভিযানের উদ্যোগ আনিয়া দিবে।

কিন্তু ১৯৪৩-এর নূতন অভিযানে কুর্স্কের বিরুদ্ধে আঘাত হানা যেমন জার্মান রণনীতির লক্ষ্য ছিল, তেমনি রুশরাও উত্তর-পশ্চিমে ওরেল ও ব্রিয়ানস্ক এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়েভ (উক্রাইন) পুনর্দখলের জন্য কুর্স্ককে স্প্রিংবোর্ড বা লম্ফ প্রদানের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিল। সুতরাং দুই পক্ষই প্রস্তুত হইতেছিল আসন্ন সংঘাতের জন্য।

মধ্য ও ভারোনেজ রণাঙ্গণের প্রধান সৈন্যবাহিনীগুলির সমাবেশ ঘটিয়াছিল কুর্স্ক স্ফীতিমুখ এলাকায়। এখানকার এই প্রচুর সংখ্যক সোভিয়েট বাহিনীকে ঘিরিয়া ধরিয়া সাবাড় করিবার জন্য জার্মানী যে চেষ্টা করিবে, রুশ সেনানীমণ্ডলী তা উপলব্ধি করিলেন। এমন কি, এখানে জয়লাভের পর জার্মানরা পুনরায় মস্কোর দিকেও আঘাত হানিতে পারে, এমন একটা দুর্ভাবনা স্ট্যালিনের পর্যন্ত ছিল। আর্মি-জেনারেল স্তেমেংকো লিখিয়াছেন যে, এই বিষয়ে ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যায় সদর দপ্তরের এক বৈঠকে বিস্তৃত আলোচনা হইল এবং স্থির হইল প্রথমে আত্মরক্ষা, পরে আক্রমণ—এই রণকৌশল এখানে অনুসরণ করা হইবে।

'Ultimately it was decided to concentrate our main forces in the Kursk area, to bleed the enemy forces here in a defensive operation, and then switch to the offensive and achieve their complete destruction.'[১]

প্রথমে আত্মরক্ষার রণকৌশলের দ্বারা শত্রুর রক্তক্ষয় করা হইবে, পরে আক্রমণাত্মক রণকৌশলের দ্বারা শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে সাবাড় করা হইবে। এই নীতি স্থির হওয়ার পর জেনারেল স্তেমেংকো লিখিয়াছেন—'জেনারেল স্টাফ্ কুর্স্কের চতুর্দিকে এত বেশী সৈন্য ও সমারোপকরণের সমাবেশ ঘটাইলেন যে, এবারের যুদ্ধে তেমন সমাবেশ আর কখনও ঘটে নাই। এজন্য রেলওয়ে টাইম টেবিলের বদল এবং রেলের পরিবহণ ক্ষমতারও বৃদ্ধি করিতে হইল।'

কিন্তু কি পরিমাণ বৃদ্ধি? আলেকজান্দার ভার্থ লিখিয়াছেন যে, তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে কুর্স্কের অস্ত্রসম্ভারের যে আমদানি করা হইল, তা অভূতপূর্ব। ৫,00000 রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি সর্বপ্রকার সমরসম্ভার কুর্স্কের প্রতিরক্ষার জন্য আনয়ন করা হইল।

কুর্স্কের স্ফীতিমুখ চওড়ায় ছিল ১00 মাইল, আর গভীরতায় ৮0 মাইল। সোভিয়েট সূত্রে প্রকাশ যে, ৭টি সোভিয়েট আর্মি এই স্ফীতিমুখ রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। এত সৈন্য এই প্রকার নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে সমাবিষ্ট হওয়াও এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। কিন্তু জার্মান আক্রমণের সম্ভাব্য লাইন বিবেচনা করিয়া সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যত ঘন করিয়া সম্ভব সৈন্য সংস্থাপন করিলেন—পদাতিক ডিভিসনগুলির শতকরা ৫৮ ভাগ, ট্যাঙ্কের শতকরা ৮৭ ভাগ এবং গোলন্দাজী শক্তির শতকরা ৭0 ভাগ সন্নিবিষ্ট হইল ৯৫ কিলোমিটার চওড়া রণাঙ্গনে। রণক্ষেত্রের বাকী ২১১ কিলোমিটার স্থানে পদাতিকদের অর্ধেকেরও কম, গোলন্দাজী শক্তির এক-তৃতীয়াংশ এবং বর্ম ও অস্ত্র শক্তির এক-পঞ্চমাংশের কম সন্নিবেশ করা হইল। হিসাব করিয়াই এই বিপদের ঝুঁকি

নেওয়া হইল। কেননা, জার্মানরা এই দিকের বদলে স্ফীতিমুখের পাদদেশের দিকে মূল আক্রমণ চালাইবে বলিয়া স্থির করা হইল।

কুরস্ক রণাঙ্গনের আত্মরক্ষার জন্য বিপুল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। মধ্যবর্তী ছোট-বড় নানা লাইন, যোগাযোগের জন্য পরীখা ইত্যাদি ছাড়াও প্রধান প্রধান ৬টি প্রতিরক্ষার লাইন তৈয়ার হইল। এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে সৈন্যেরা যে সমস্ত ট্রেঞ্চ কাটিল সেগুলির মোট দৈর্ঘ্য হইবে ৫ হাজার কিলোমিটার এবং শত্রুর আক্রমণ পথে যে সমস্ত মাইন ও বোমা পুতিয়া রাখা হইল সেগুলির মোট সংখ্যা হইবে ৪ লক্ষ! রণাঙ্গনের একটা অংশে ১১২ কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া দিয়া ঘেরা হইল। জার্মান সমর-কর্তৃপক্ষ বিপুল সংখ্যক ট্যাংকসহ আক্রমণ চালাইবে, একথা ধরিয়া লইয়াই কুরস্কের প্রতিরক্ষার মূল কথা ছিল ট্যাংক বিধ্বংসী ও ট্যাংক প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।[1]

কুরস্কের স্ফীতিমুখ থেকে অসামরিক নাগরিকদিগকে অপসারিত করা হইল না। তারা সানন্দে ও স্বেচ্ছায় প্রতিরক্ষার বিপুল ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিল, যেমন সহায়তা করিল কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা।...

কুরস্ক অভিযানে জার্মান রণনৈতিক পরিকল্পনা ছিল উত্তরে ওরেল থেকে এবং দক্ষিণে বেলগোরোদ থেকে, অর্থাৎ দুইদিক থেকে যুগপৎ সাঁড়াশি আক্রমণ চালানো। উত্তরে ফিল্ড মার্শাল ফন ক্লুজ এবং দক্ষিণে ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টাইন এই দুই দক্ষ সেনাপতি একযোগে আক্রমণ চালাইয়া কুরস্কের পূর্বদিকে টিম নামক ক্ষুদ্র শহরে আসিয়া মিলিত হইবে—এই ছিল মতলব।

এই 'দুঃসাহসিক পরিকল্পনা' সফল করার উদ্দেশ্যে ওরেলে সাতটি প্যানেৎসার বা ট্যাংক ডিভিসন, ২টি মোটরায়িত ও ৯টি পদাতিক ডিভিসন সন্নিবেশিত করা হইল। আর বেলগোরোদে সন্নিবেশ করা করা হইল ১০টি ট্যাংক ডিভিসন, ১টি মোটরায়িত এবং ৭টি পদাতিক ডিভিসন। মোট প্রায় ৫ লক্ষ সৈন্য কুরস্কের স্ফীতিমুখ আক্রমণে প্রস্তুত হইল মার্শাল ক্লুজের নেতৃত্বে।[2]

এই বিপুল সংখ্যক জার্মান সৈন্য ২ হাজার থেকে ৩ হাজার (সোভিয়েট মতে) ট্যাংক এবং ২ হাজার প্লেনসহ নূতন গ্রীষ্মাভিযানে মাতিয়া উঠিল। এত অস্ত্র, এত সৈন্য, এত ট্যাংক ও প্লেন সহ জার্মানী আক্রমণে উদ্যত হইল যে, হিটলার কুরস্ক রণাঙ্গনে যুদ্ধজয় নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বসন্তকালেই আঘাত হানিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আবহাওয়া ও আক্রমণ প্রস্তুতির নানাকারণে দেরী হইয়া গেল। এদিকে এই সময়টার মধ্যে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকে একেবারে মজবুত করিয়া ফেলিলেন।

সোভিয়েট ঐতিহাসিক ডেবোরিনের মতে ওরেল-কুরস্ক রণাঙ্গনের প্রতি ২·৭ কিলোমিটারে ১টি করিয়া জার্মান পদাতিক ডিভিসন এবং ৪০ থেকে ৫টি ট্যাংক, আর প্রতি কিলোমিটারে ৭০ থেকে ৮০টি কামান ছিল। জার্মানী তার আধুনিকতম সুবৃহৎ ট্যাংক 'টাইগার' ও 'প্যান্থার' এবং স্বয়ংক্রিয় ফার্ডিনান্ড কামান ও নূতনতম বিমান নিয়োগ করিয়া রাশিয়ানদের উপর বাজিমাত করিতে চাহিল।

১। মার্শাল রকোসোভস্কি—পৃষ্ঠা ১৮৭।
২। জে. এফ. সি. ফুলার—পৃষ্ঠা ২৭৭।

৫ই জুলাই, ১৯৪৩, ৫টা ৩০ মিনিটের সময় হিটলারের নূতন গ্রীষ্মাভিযানের উদ্বোধন হইল কুরস্ক অভিযানে। আক্রমণের প্রচণ্ডতার বর্ণনায় জনৈক ইংরেজ সামরিক ঐতিহাসিক মেজর-জেনারেল স্যার চার্লস গাইন লিখিয়াছেন:

'The attacks opened with hurricane artillery and air bombardment covering an instantly assault, supported by tanks, intended to break through the crust of the Russian positions. But the Russians were fully prepared, with defence organised in great depth and with their armour held in readiness for counter-attacks. Their developed what was undoubtedlly the greatest defensive battle of the war.'[১]

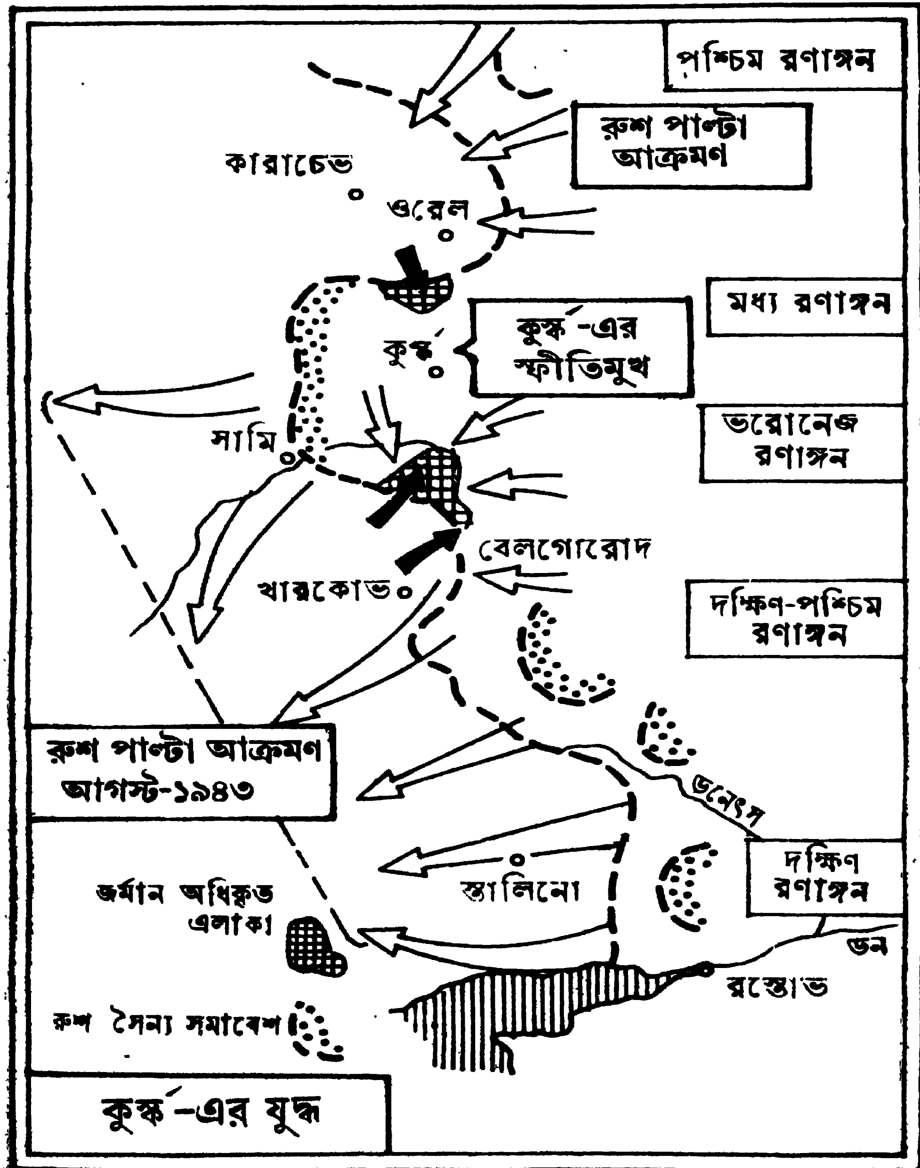
অর্থাৎ 'ঝড়ের মত কামানের প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণ এবং আকাশ থেকে বোমারুর নিদারুণ বোমাবর্ষণের আড়াল ধরিয়া পদাতিকেরা ট্যাঙ্কের সহযোগিতায় আক্রমণ চালাইল রুশ প্রতিরক্ষার বহির্প্রাচীর ভাঙিবার জন্য। কিন্তু রুশরা এজন্য পরিপূর্ণভাবেই প্রস্তুত হইয়াছিল। তারা গভীরতর ব্যূহের আত্মরক্ষার সঙ্ঘবন্ধ হইয়াছিল এবং তাদের প্রভুত অস্ত্রশক্তি লইয়া পালটা-আক্রমণের জন্য তারা প্রস্তুত হইয়াছিল। নিঃসন্দেহে এখানে আত্মরক্ষার বৃহত্তম যুদ্ধ আত্মপ্রকাশ করিল।'

'আত্মরক্ষার এই বৃহত্তম' যুদ্ধে রুশ পদাতিকেরা জার্মানদের দুর্বার ট্যাঙ্ক আক্রমণের মুখে দৃঢ় থাকিল। অনেক ক্ষেত্রে তারা গভীরতর পরিখাতলে আশ্রয় নিল এবং ট্যাঙ্কগুলিকে তাদের 'উপর দিয়া' যাইতে দিল। কিন্তু পরক্ষণেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া তারা জার্মান পদাতিকদিগকে বাধা দিল অগ্রগামী ট্যাঙ্কের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে। ট্যাঙ্ক-মারা সৈন্যেরা ট্যাঙ্কগুলিকে ঘায়েল করিতে লাগিল। রুশ গোলন্দাজরা কামানের গোলায় তাদেরকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। আর সেই অবসরে সাঁজোয়া সৈন্যেরা অগ্রসর হইয়া আসিল। এভাবে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ চালাইতে লাগিল। অর্থাৎ কুরস্ক রণাঙ্গনের সোভিয়েট সৈন্যেরা অনড় প্রতিরক্ষার কৌশল অবলম্বন করে নাই, সবল, সক্রিয় এবং গতিশীল আত্মরক্ষার নীতি অনুসরণ করিল।

এই সমরাঙ্গনে বৃহত্তম ট্যাঙ্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল এবং প্রতিদিন ট্যাঙ্ক ও বিমান ধ্বংসের চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট সোভিয়েট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল। যেমন, একদিনের যুদ্ধে ৫৮৬টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইল, যে ঘটনা দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। জার্মানীর বাছাই-করা সেরা ট্যাঙ্ক টাইগার ও প্যান্থার এই যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং সৈন্যেরাও ছিল বাছাই-করা। কেননা, হিটলারের আশা ছিল এখানে যুদ্ধ জয় করিয়া এবং সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীকে সাবাড় করিয়া জার্মানসৈন্যেরা ওরেল থেকে ২০০ মাইল উত্তর-পূর্বে মস্কোর দিকে ধাওয়া করিবে। জার্মানদের যে এমন মতলব ছিল একথা অনুমান করিয়া স্ট্যালিন পর্যন্ত কিছুটা উদ্বেগ বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু জার্মানদের সেই মতলব অংকুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। অথচ জার্মানীর প্রায় সমগ্র ট্যাঙ্কবাহিনী এই যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ৪ দিনের তুমুল লড়াইয়ের পরেও এই তীব্র যুদ্ধের কিছুমাত্র 'উন্নতি' হইল না—উত্তরে বা কুরস্ক রণাঙ্গনের মাত্র ১০ মাইলের মধ্যে এবং দক্ষিণে বেলগোরোদের দিকে মাত্র ৩০ মাইলের মত জার্মানরা

১। The Second Great War—Sir John Hammerton, Maj. Gen. Sir Charles Gwynn, Vol. VII, P. 2821.

আগাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও কুরস্ক-বেলগোরোদ রণাঙ্গনে জার্মান সাঁড়াশী আক্রমণের দুই বাহুর মধ্যে ১০০ মাইলের ব্যবধান ছিল।



১৩ই জুলাই হিটলার 'অপারেশন সিটাডেল' বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন অনিচ্ছার সঙ্গে। পরে ১৫ই জুলাই লালফৌজ ওরেল খণ্ডে পালটা-আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু

করিল—যদিও তার আগেই ১২ই জুলাই তারিখে ওরেলের দিকে হঠাৎ আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

যদিও হিটলার খুব আশা করিয়া এবং ঘটা করিয়া কুরস্ক স্ফীতিমুখের যুদ্ধ শুরু করিয়াছিলেন এবং নিজের গ্রীষ্মাভিযানের দ্বারা রুশ গ্রীষ্মাভিযানকে পণ্ড করিয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন (প্রকৃতপক্ষে উভয় পক্ষই এই প্রকার অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন) তথাপি আশ্চর্য এই যে, সামান্য কয়েক দিনের যুদ্ধেই এই রণাঙ্গণ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ৫ই জুলাই তারিখের আক্রমণ ১৩ই জুলাই বন্ধ হইয়া গেল। অপরদিকে রাশিয়ার ১৫ই জুলাই তারিখের পালটা আক্রমণ ২৪শে জুলাই শেষ হইয়া গেল। এত দ্রুত যুদ্ধ শেষ হওয়াও কুরস্ক রণাঙ্গনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২৪শে জুলাই সুপ্রীম কমাণ্ডার-ইন-চীফ মার্শাল স্ট্যালিন জেনারেল রকোসোভস্কি, জেনারেল ভাতুতিন ও জেনারেল পেপোভের উদ্দেশ্যে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, 'জার্মানীর গ্রীষ্মাভিযান চূড়ান্তভাবে খতম্' হইয়া গিয়াছে এবং ৫ই জুলাইয়ের পর সমস্ত হৃতভূমির পুনরুদ্ধার হইয়াছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল যে, ওরেল-কুরস্ক এবং বেলগোরোদ রণাঙ্গনে জার্মানী মোট ৩৭ ডিভিসন সৈন্য—১৭টি ট্যাঙ্ক ও ২টি মোটরায়িত ডিভিসনসহ নিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু রুশদের নিকট ইহা অপ্রত্যাশিত ছিল না এবং জার্মানীরা আদৌ কুরস্কের ব্যূহ ভেদ করিতে পারে নাই। গ্রীষ্মাভিযানে জার্মানদের সর্বদাই অগ্রগতি ঘটিয়া থাকে—এই ধারণারও এখানেই শেষ হইয়া গেল। ৭০ হাজার জার্মান সৈন্য নিহত এবং ট্যাংক ২৯০০, মোবাইল গান ১৯৫, ফিল্ড গান ৮৪৪, প্লেন ১৩৯২ এবং ৫ হাজারের বেশী মোটরযান নষ্ট হইয়াছে।

কুরস্ক রণাঙ্গনে জার্মানীর ট্যাঙ্ক-শক্তি একেবারে ঘায়েল হইয়া গিয়াছিল, একথা জার্মানরাই পরবর্তীকালে স্বীকার করিয়াছিল—পাথরের গায়ে লাঙলের ফলার মত জার্মান ট্যাংক প্রতিহত হইয়াছিল, একথা লিখিয়াছেন সোভিয়েট সেনাপতি স্তেমেংকো। আর রণক্ষেত্রের সীমাবদ্ধ আয়তনের বিচারে উভয়পক্ষে মোট ৬ হাজার ট্যাঙ্ক ও ৪ হাজার বিমানের নিয়োগ যেমন অভূতপূর্ব তেমনি উভয়পক্ষে সৈন্য ক্ষয়ও অভূতপূর্ব হইয়াছিল।

এই রণাঙ্গনে ব্যক্তিগতভাবে বহু রুশ সৈনিক ট্যাঙ্ক ও প্লেনের যুদ্ধে বিস্ময়কর বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

* * *

কুরস্কের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জয়োৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। কারণ, কুরস্কের এই জয় সমগ্র যুদ্ধজয় রূপেই তাঁদের নিকট প্রতিভাত হইল।

'This is also the view taken by post-war German historians. Thus, in the opinion of Walter Goerlitz, Stalingrad was the Politico-paychological turning point of the whole war in the east, but the German defeat at Khrsk and Belgorod was its military turning point.'[১]

১। **Russia At War—Alexander Werth, P. 621.**

অর্থাৎ রুশদের মত জার্মান ঐতিহাসিকেরাও অনুরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন যেমন, যুদ্ধোত্তর জার্মান ঐতিহাসিক ভালটার গোয়েরলিৎসের মতে স্ট্যালিনগ্রাদ সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধে রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক ধরণার মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু কুরস্ক-বেলগোরোদের যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় সামরিকভাবে যুদ্ধের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছিল।

সোজা কথায় কুরস্কেই জার্মানীর শেষ গ্রীষ্মাভিযান এবং সেখানকার পরাজয়ই পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয় ডাকিয়া আনিল।

কঠোর সমালোচক রণপণ্ডিত জে. এফ. সি. ফুলারও মন্তব্য করিয়াছেন :

'It is in no way an exaggeration to say that the defeat at Kursk was as disastrous to the Germans as had been their defeat at Stalingrad.'[১]

'জার্মানীর কুরস্কে পরাজয় স্ট্যালিনগ্রাদে পরাজয়ের মতই সমান বিপর্যয়কর, একথা বলিলে নিশ্চয়ই অতিরঞ্জন করা হইবে না।'

বিশিষ্ট সমর সমালোচক মেজর জেনারেল স্যার চার্লস গাইনও লিখিয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালের রুশ অভিযান শুরু হইয়াছিল কুরস্ক স্ফীতিমুখের বিশাল প্রতিরক্ষার যুদ্ধের দ্বারা এবং এখানকার যুদ্ধজয়কে 'ইতিহাসের অন্যতম চূড়ান্ত জয় বলিয়া অবশ্যই গণ্য করিতে হইবে।' কেন না, এই যুদ্ধে পরাজয়ের পক্ষে জার্মানীর আক্রমণাত্মক অভিযানের শক্তি নষ্ট হইয়া গেল এবং রাশিয়ার আক্রমণাত্মক অভিযানের আরম্ভ হইল। মার্শাল স্ট্যালিন এখানে ইচ্ছা করিয়াই জার্মান আক্রমণের অপেক্ষা করিতেছিলেন। আক্রমণের দ্বারা জার্মানীর শক্তিক্ষয় হওয়ার পর তিনি পালটা আক্রমণের দ্বারা শত্রুকে ঘায়েল করিয়া ফেলিলেন।[২]

মার্কিন সামরিক লেখক পিটার ক্যালভোসোরেসি কুরস্ক রণক্ষেত্রের পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে হিটলার ১০ লক্ষ লোক এবং ২৭২০ ট্যাংক জড়ো করিয়াছিলেন এবং যে বিমানশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন তাতে বিমানগুলি দৈনিক ৩ হাজার বার হানা দিতে পারিত। কিন্তু এই যুদ্ধ অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কুরস্কের সংগ্রামে হিটলারের ৫ লক্ষ লোক নষ্ট হইয়াছিল এবং তখনই বুঝা গিয়াছিল যে, তাঁর পক্ষে আর পূর্ণ পরাজয় এড়ানো সম্ভব নয়। জার্মানীর পক্ষে পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর গতি ছিল না। অপর পক্ষে 'স্ট্যালিনের নিখুঁত এবং দক্ষ নেতৃত্বে' রুশ সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাও জার্মানদিগকে ছাড়াইয়া গেল।[৩]

কুরস্ক স্ফীতিমুখের পরাজয় এভাবে জার্মানীর পতন ডাকিয়া আনিল।

১। The Second World War—Maj. Gen. J. F. C. Fuller, P. 278.
২। The Second Great War—Vol. VII. P. 2981.
৩। Total War—Peter Calvocoressi, Guy wint, Vol. I, P. 533-34.

ষষ্ঠ পর্ব

অষ্টম অধ্যায়

১৯৪৩-এর সোভিয়েট গ্রীষ্মাভিযান :
রুশ সীমান্ত পুনরুদ্ধারের যুদ্ধ

১৯৪৩ সালে জার্মানী ও রাশিয়ার সৈন্যশক্তির অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, (১) রণাঙ্গনে প্রথম সারির উপযোগী সৈন্যসংখ্যা উভয়ের সমান। (২) গড়পড়তা হিসাবে রুশসৈন্য লড়াইয়ের বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। (৩) রাশিয়ার প্রভুত পরিমাণে রিজার্ভ বা মজুত সৈন্য ছিল এবং তারা অতি উৎকৃষ্ট সৈন্য ছিল। (৪) জার্মানীর উপযুক্ত সংখ্যক রিজার্ভ সৈন্যের অভাব এবং তৃতীয় বা চতুর্থ স্তরের লোক দিয়া সৈন্যসংখ্যার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা। সুতরাং ১৯৪৩ সালে রাশিয়াই অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থায় জার্মানীর সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিল এবং এভাবেই সমগ্র যুদ্ধের মোড় ফিরিতে লাগিল। অপর পক্ষে আফ্রিকা ও ভুমধ্যসাগর এলাকার মিত্রপক্ষের অগ্রগতি ও অক্ষশক্তিবর্গের পরাজয় (ইতালীর সংকটজনক অবস্থা) এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিমান অভিযান, যাকে ১৯৪৩ সালের আকাশপথে দ্বিতীয় রণাঙ্গন বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে—এই সমস্ত কারণ মিলিয়া জার্মানীকে স্বভাবতঃই বিপদে ফেলিয়াছিল। তথাপি জুলাই মাসে জার্মানী যখন আক্রমণ শুরু করিল, তখন তার শক্তি আদৌ কম বলিয়া প্রতিভাত হইল না। ১৯৪৩ সালে পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানীর ২১০ ডিভিসন সৈন্য ছিল, আরও ৬ ডিভিসন প্রস্তুতির পথে ছিল। অধিকন্তু ৫০ ডিভিসন অ-জার্মান সৈন্য ছিল। অর্থাৎ ১০টি হাঙ্গেরীয়ান, ২০টি ফিনিশ এবং ১৬ বা ১৮টি রুমেনীয় ডিভিসন সহ পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানীর মোট ২৬০ ডিভিসন সৈন্য ছিল—একথা স্বয়ং স্ট্যালিন বলিয়াছিলেন তেহেরান বৈঠকে চার্চিল-রুজভেল্টকে। যদিও জার্মান সৈন্যবাহিনীর মুখপাত্র জেনারেল ডিট্মার মার্চ মাসের শেষে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, অতঃপর জার্মানী কেবল আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে, তথাপি জার্মান সামরিক মহলে এই বিষয়ে প্রবল মতভেদ ছিল এবং হিটলার আক্রমণের দিকেই ঝুঁকিয়াছিলেন, যার ফলে কুরস্ক স্ফীতিমুখের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ট্যাঙ্ক ও প্লেনের সহযোগিতায় ব্লিজক্রীগের যে দ্রুতগতি কায়দা হিটলার এতদিন অনুসরণ করিতেছিলেন, সোভিয়েট হাইকমাণ্ড সেই কায়দার বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ এত চমৎকার আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, জার্মানীর আক্রমণ তাঁদের কাছে আর নূতনত্ব বহন করিয়া আনিল না।

বরং বলা যাইতে পারে যে, ১৯৪৩ সালে জার্মানীর গ্রীষ্মাভিযান প্রায় সূতিকাগারেই মারা পড়িল। যদিও এই অভিযান বিগত বছরগুলির মত ব্যাপক ও বৃহৎ ছিল না, তথাপি দুর্ধর্ষতা ও প্রবলতা হিসাবে উহা আদৌ উপেক্ষণীয় ছিল না এবং সোভিয়েট রাশিয়া নূতন বলের দ্বারা শক্তিমান হইয়াছিল বলিয়াই জার্মানীর এই

অভিযান ব্যর্থ করিয়া দিয়া তাদেরকে পিছু হটাইতে পারিল। প্রকৃতপক্ষে জার্মানদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কুরস্ক এলাকায় রাশিয়ার আক্রমণাত্মক সমাবেশগুলি পূর্বাহ্নেই ভাঙিয়া দেওয়া এবং যন্ত্র ও বর্মের সমবায়ে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া রুশ সৈন্যদলের সংহার ও কুরস্ক পুনরায় দখল করা। যদি জার্মানরা সফল হইত, তবে, লালফৌজের পক্ষে উহা নিদারুণ আঘাত হইত। এমন কি শীতকালীন যুদ্ধে মস্কো-রস্টোভের যে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ রাশিয়ার দখলে আসিয়াছিল, উহাও আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু জার্মানীর এই চাল ব্যর্থ হইয়া গেল এবং ওরেল হইতে ডন অববাহিকা পর্যন্ত তাদের আত্মরক্ষার লাইন দৃঢ় করিবার যে পরোক্ষ চেষ্টা ছিল, তাও নষ্ট হইয়া গেল।

ওরেলখণ্ডে এক মাসের যুদ্ধে জার্মানীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির ফলে তারা ওরেল হইতে ব্রিয়ানস্কের দিকে সম্পূর্ণরূপে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল। আর বেলগোরোদ এলাকায় তাদের অবস্থা হইল আরও শোচনীয়। এখানে রুশ সৈন্য তাদের ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া যেন বর্শাফলকের মত ছুটিয়া গেল খারকোভের দিকে। ১১ই আগস্ট খারকোভের উত্তর-পশ্চিমের একটি শহর দখল হইয়া গেল, খারকোভ পোলটাভা-রেলপথ বিচ্ছিন্ন হইল এবং পরদিন খারকোভের দক্ষিণ-পূর্বে ডনেৎস নদী তীরবর্তী চুগুয়েভ দখল হইল। ফলে, ১৬ই আগস্টের মধ্যে কুরস্ক হইতে দক্ষিণে খারকোভ বেষ্টিত এবং উত্তরে ব্রিয়ানস্ক বিপন্ন হইল। জার্মানরা এই গুরুতর বিপদ রোধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল—বিশেষভাবে খারকোভ এলাকায়। তারা রুশ পার্শ্বদেশের একটা আক্রমণও সাময়িকভাবে রোধ করিল এবং সপ্তাহখানেক ধরিয়া যে প্রবল যুদ্ধ চলিল, তাতে যেন উভয় পক্ষে জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়া গেল। অবশেষে ২৩শে আগস্ট জেনারেল ভাতুতিন, জেনারেল ম্যালিনোভস্কি কর্নেল-জেনারেল কোনিয়েভের সম্মিলিত আক্রমণে খারকোভ দখল হইয়া গেল। এটাই ছিল খারকোভের চূড়ান্ত মুক্তি। এর আগে ১৬ই ফেব্রুয়ারী কর্নেল-জেনারেল গোলিকোভের সৈন্যেরা খাড়কোভ কাড়িয়া লইয়াছিল; কিন্তু ১৫ই মার্চ জার্মানরা আবার উহা দখল করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ২৩শে আগস্ট জার্মনরা শেষবারের মত খারকোভ হইত বিদায় লইতে বাধ্য হইল।

এদিকে ম্যালিনোভস্কির সৈন্যেরা নিম্ন ডনেৎস নদীর বাঁকে এবং জেনারেল তোলবুখিনের সৈন্যেরা রস্টোভ এলাকায় পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ শুরু করিল। ৩০শে আগস্ট ডনেৎস নদী এলাকায় জার্মানব্যূহ বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং রস্টোভ এলাকায় ট্যাগানরগ দখল হইল—এখানে ইতিপূর্বে দুইবার রুশ আক্রমণ ব্যাহত হইয়াছে। এভাবে সমগ্র রস্টোভ জেলা হইতে জার্মানীর উচ্ছেদ ঘটিল।

ইতিমধ্যে উত্তরদিকেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল ১৫ই আগস্ট জেনারেল রকোসোভস্কি ক্যারাচেভ দখল করিয়া ব্রিয়ানস্কের উপর প্রবল চাপ দিতে লাগিলেন। এর আগে ১৩ই আগস্ট ব্রিয়ানস্ক ও স্মলেনস্কের মধ্যবর্তী একটি শহর নূতন আক্রমণে দখল হইয়া গেল এবং এই দুই 'দুর্গ শহরের' প্রত্যক্ষ রেলপথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা হইল। আগস্ট মাসের শেষে ব্রিয়ানস্ক দক্ষিণ দিকের পার্শ্ব আক্রমণেও ঘায়েল হইবার জো হইল।

সেপ্টেম্বর মাসের আরম্ভ হইতে সোভিয়েট হাইকমাণ্ড ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মাভিযানে মোটামুটি দুইটি প্রধান লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া চলিলেন। প্রথমতঃ ডন অববাহিকা

অঞ্চলে ম্যালিনোভস্কি ও তোলবুখিনের যুগপৎ সাঁড়াশী আক্রমণে অবশিষ্ট জার্মান সৈন্যদলের ধ্বংসসাধন এবং খারকোভ এলাকা হইতে কোনিয়েভের সৈন্যদলেরও এই একই উদ্দেশ্যে সহযোগিতা। দ্বিতীয়তঃ কিয়েভ অঞ্চলে নীপার নদী অভিমুখে আক্রমণ চালাইয়া জার্মানবাহিনীর মধ্য রণাঙ্গন ও দক্ষিণ রণাঙ্গনের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া দেওয়া।

এই সময় জার্মানীর পক্ষে ওরেল এলাকায় দেসনা নদীর পশ্চিমে এবং দক্ষিণ রণাঙ্গনে নীপার নদী বরাবর পশ্চাদপসরণ ছাড়া উপায় রহিল না। পূর্ব রণাঙ্গনে হিটলারী হাইকমাণ্ড যে অবস্থায় পড়িলেন তাতে ঘড়ির কাঁটা সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়া গেল। অধিকন্তু ইতালীতে মুসোলিনীর পতন, সিসিল দ্বীপে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যদলের অগ্রগতি, যুগোশ্লোভিয়ায় মার্শাল টিটোর গেরিলাযুদ্ধ ইত্যাদি নাটকীয় ঘটনায় জার্মানী আরও বেকায়দায় পড়িল। হিটলার তাঁর 'ইউরোপীয় দুর্গের' ইতালীয় এবং বলকান প্রাচীর শক্তিশালী করিবার জরুরী তাগাদায় পড়িলেন। এদিকে তিন বৎসর ধরিয়া রাশিয়াতে শক্তিক্ষয়। সুতরাং এক্ষণে আক্রমণের নেশা ছাড়িয়া পিছু হঠার পালা লওয়া ছাড়া আর উপায় কি ?

কিন্তু লালফৌজ জার্মানীর পিছু হটিবার জন্য অপেক্ষা করিল না। তারা নিরন্তর আঘাত হানিয়াই চলিল এবং জার্মানরা যে বেশ ধীরেসুস্থে লটবহর গুছাইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিবে, কিংবা কোন প্রকার লোকসানের ভিতর না-গিয়া আত্মরক্ষার নূতন লাইন গড়িয়া তুলিবে, এমন সুযোগ রহিল না। সোভিয়েট বাহিনী তাদেরকে নীপার ও দেসনা নদীর দিকে তাড়াইয়া নিল। খারকোভের উত্তরে কুরস্ক অঞ্চলে ভাতুতিনের সৈন্যেরা দ্রুত অগ্রসর হইল, ২৬শে আগস্ট কনোটোপ দখল করিল এবং চেরনিগোভের দক্ষিণে ৪ ডিভিসন শত্রুসৈন্য ঘেরাও করিল। ২৫শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে লালফৌজ এক সাঁড়াশী আক্রমণে (যাহাকে রুশেরা 'হাতুড়ি ও কাস্তে' বলিত) কিয়েভের উত্তরে দেসনা নদী এবং দক্ষিণে নীপার তটে পেঁাছিল। প্যারাসুটি সৈন্যেরা প্রভূত পরিমাণে আত্মবলি দিয়া এখানকার শত্রু এলাকা মুক্ত করিল এবং ২৫শে অক্টোবর ১৯৪৩, কিয়েভের দক্ষিণে নীপার অতিক্রান্ত ও একটি সেতুমুখ প্রতিষ্ঠিত হইল।

এদিকে মধ্য রণাঙ্গনেও নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। জেনারেল রকোসোভস্কি মস্কোর দক্ষিণ হইতে সোজা পশ্চিমদিকে প্রবল আক্রমণ চালাইলেন এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর ব্রিয়ানস্ক দখল করিলেন। রকোসোভস্কির দক্ষিণ পার্শ্বে জেনারেল পপোভ্ তাঁরই সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতেছিলেন এবং তিনি উত্তরপূর্ব দিক হইতে গোমেলের উপর চাপ দিতেছিলেন। আর জেনারেল শকোলোভস্কি আরও উত্তর দিকে রস্লাভাল অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি স্মলেনস্ক শহরকে দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এই সময় জেনারেল জেরেমেঙ্কো ভেলিকিলুকি ও স্মলেনস্কের মধ্যে এক আক্রমণ চালাইলেন এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর স্মলেনস্কের উত্তর-পূর্বে জারেৎসেভো দখল করিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর খাস স্মলেনস্কের বিখ্যাত 'দুর্গ-শহরের' পতন হইল—শকোলোভস্কির সৈন্যেরা উহা কাড়িয়া লইল। ব্রিয়ানস্ক এবং স্মলেনস্ক, এই দুইটি শহরই ছিল মধ্য রণাঙ্গনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ১৯৪১ সালের যুদ্ধে যে শহর দুইটি নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। যোগাযোগ, সরবরাহ, রেলপথ এবং সড়ক ইত্যাদির বিবেচনায় এই ঘাঁটি দুইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল

বলিয়াই জার্মানরা এগুলিকে 'দুর্ভেদ্য দুর্গে' পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু সেই দুর্গ চূর্ণ হইয়া গেল এবং জার্মানরা দেসনার তটে তিষ্ঠিতে না পারিয়া, সেই নদী ছাড়াইরা চলিয়া গেল নীপারের দিকে—মোগিলেভ ও রোগাচেভ এলাকা অভিমুখে।

জার্মান এবং রুশ উভয়পক্ষই বিখ্যাত নীপার নদীর রেখা ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। জার্মানরা মনে করিল যে, একটানা যুদ্ধ ও আক্রমণের পর লালফৌজ নিশ্চয়ই ক্লান্ত হইয়াছে। সুতরাং অক্টোবর মাস হইতে শরৎকালের বৃষ্টি ও বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে রুশেরা নিশ্চয়ই নীপার নদী পার হইতে পারিবে না। অতএব তারা গোমেল শহর আঁকড়াইয়া ধরিবার ইচ্ছা করিল এবং এদিকে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ ত্যাগ করিতেও অনিচ্ছুক হইল, যদিও ১৬ই সেপ্টেম্বর তারা নভোরোসিস্ক বন্দর ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। ককেশাসের কিউবান অঞ্চলের শেষ বন্দর ঘাঁটি নভোরোসিস্ক রক্ষা করার জন্য তারা কম গোঁড়ামি দেখায় নাই এবং সেপ্টেম্বর মাসে এই বন্দরের পতন হওয়া সত্ত্বেও তারা কার্চ রণক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র সেতুমুখ ধরিয়া রাখিয়াছিল।

১৯৪৩-এর গ্রীষ্মাভিযান সুদীর্ঘ নীপারের তটে আসিয়া শেষ হইল। পূর্ণ শীতের প্রকোপে নীপার বরফে জমাট বাঁধিয়া শক্ত না হইলে এই বিশাল নদী লালফৌজের অতিক্রম করা সম্ভব নয় বলিয়া জার্মানরা ধরিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, লালফৌজ নিষ্ক্রিয় রহিল না। বোধহয় মাত্র ৭।৮ দিন বিশ্রামের পরই আবার অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে তাদের অভিযান শুরু হইল এবং শরৎকালের বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যেই নীপার নদী অতিক্রম করার মত 'অসম্ভব' ব্যাপারও তারা সম্ভব করিল। জার্মানরা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। ভেলিকিলুকির দক্ষিণ হইতে সমগ্র রণাঙ্গনে আক্রমণ আরম্ভ হইল। কিন্তু প্রধান অভিযান অনুষ্ঠিত হইল গোমেল, কিয়েভ এবং বিখ্যাত নীপার নদীর বাঁকে। জার্মান আত্মরক্ষার ব্যূহে যে সমস্ত দুর্বল স্থান ছিল, এই শরৎকালীন অভিযানে লালফৌজের লক্ষ্য হইল তাহাই। গোমেলের (মধ্য রণাঙ্গন) পশ্চিমে ছিল সুপরিচিত প্রিপেট জলাভূমি—যার দুই পাশ দিয়া ১৯৪১ সালে জার্মানী গ্রীষ্মাভিযান করিয়াছিল। সুতরাং এক্ষণে গোমেলে জার্মানরা আক্রান্ত হইলে তারা এই প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের কবলে পড়িয়া প্রিপেটের উত্তরে ও দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে—রুশ রণনীতি এটা লক্ষ্য করিল। আর দক্ষিণ রণাঙ্গনের চাবিকাঠি ছিল কিয়েভে—এখান হইতে আবার প্রধান প্রধান রেলপথ ও সড়ক গিয়েছে নীপার নদীর বাঁকে। যদি কিয়েভের পতন ঘটে, তবে, স্বভাবতঃই এখানে নাৎসী সৈন্যেরা ফাঁদে পড়িবে।

১৯৪৩-এর ৭ই অক্টোবর সমগ্র রণাঙ্গনে সমরানল জ্বলিয়া উঠিল কামানের প্রচুর গোলাবর্ষণের মধ্যে। জার্মানীর দৃঢ় পালটা আক্রমণ সত্ত্বেও রুশ রিজার্ভ সৈন্যেরা গোমেলের দক্ষিণে সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করিল, কিয়েভের উত্তরে এবং দক্ষিণেও দুইটি সেতুমুখ সৃষ্টি হইল। অর্থাৎ নীপার নদী তিনস্থানে অতিক্রান্ত হইল। তারা পূর্ব-তট হইতে পশ্চিমতটে অগ্রসর হইল, যে পশ্চিমতটে কেবল জার্মানদের সুরক্ষিত ঘাঁটিই ছিল না, উহা অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া রুশদিগকে বাধা দেওয়াও সুবিধা ছিল। নদীতট যুদ্ধের এবং নদী পার হওয়ার এই সমস্ত নিদারুণ সমস্যা সত্ত্বেও সোভিয়েট সৈন্যেরা অগ্রসর হইয়া গেল। এর দ্বারা তারা দুই মাস সময় বাঁচাইল, যুদ্ধের প্রশ্নে যার মূল্য অসাধারণ। জার্মানরাও হতবাক হইয়া গেল এবং ১৭ই অক্টোবর নীপার

নদীর বাঁকে প্রবল যুদ্ধ শুরু হইল। তারা এখানকার পূর্বদিকেও স্ফীতিমুখ রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করিল। জেনারেল কোনিয়েভ ক্রেমেনচুগের দক্ষিণে নদী পার হইয়া জার্মান সৈন্যদিগকে ঘেরাও করিবার উপক্রম করিল। কিন্তু ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টাইন প্রচুর ট্যাংক ও হাজার বিমানের সাহায্যে কোনিয়েভের গতিরোধ করিল। এদিকে জেনারেল ম্যালিনোভস্কি নিপ্রোপেট্রোভস্কের দুই দিকে নীপার অতিক্রম করিল এবং ২৫শে অক্টোবর শহরটি দখল করিয়া লইল। অপর দিকে একবারে দক্ষিণ-পূর্বে আজভ সাগরের তীরে জেনারেল তোলবুখিন উত্তরদিক হইতে মেলিটোপল শহর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং ৬ই নভেম্বর 'গৃহ-হইতে-গৃহাভ্যন্তরে' লড়াই করিয়া শহরটি জার্মানদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। আর জার্মানরা হটিয়া গেল ১০০ মাইল পিছনে নিম্নতম নীপারের বক্ররেখায় নিকোপোল এবং খেরসন বন্দরে।

১১ই নভেম্বর জেনারেল রকোসোভস্কি এক অতর্কিত আক্রমণে সাঁড়াশীর চাপ দিয়া গোমেল হইতে জার্মানদিগকে বিতাড়িত করিল। এখান হইতে যে দুইটি রেলপথ উত্তর-দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে, ২২শে ও ২৫শে নভেম্বর সেই পথ দুইটি বিচ্ছিন্ন হইল। রকোসোভস্কি এখানকার জার্মানবাহিনীকে ঘেরাও করিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য প্রথমে রেচিস্টা দখল করিয়া পরে উত্তরদিকে গোপনে বহু ট্যাংক জড়ো করিয়া জার্মানদিগকে বেষ্টনের চেষ্টা হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বহু নাৎসী সৈন্য পলায়ন করিতে সমর্থ হইল। তবে, তারা প্রিপেট জলাভূমির উত্তরে ও দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে জেনারেল ভাতুতিন এক চমৎকার রণকৌশলের প্যাঁচে উত্তরদিক হইতে আক্রমণ করিয়া উক্রাইনের রাজধানী কিয়েভ নগরী দখল করিয়া ফেলিলেন ৬ই নভেম্বর তারিখে। ফন্ ম্যানস্টাইন উত্তরদিকে কোনও ক্রমে বেষ্টন-ফাঁদ হইতে রেহাই পাইয়া গেলেন। কিয়েভের পুনরুদ্ধার স্বভাবতঃই সমগ্র রুশিয়ায় নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। আর জার্মানরা মরিয়া হইয়া বাধা দিতে লাগিল। রুশরা দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া নীপারের বাঁকে পৌঁছিতে চাহিল, কিন্তু ৭ই নভেম্বর ফ্যাসটোভে তাদের গতি রুদ্ধ হইল। কিন্তু অন্যান্য রুশবাহিনী পশ্চিমদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং ১২ই হইতে ১৭ই নভেম্বরের মধ্যে ঝিটোমির ও কোরোস্টেনের রেলজংসন দখল করিয়া ফেলিল। কিন্তু দ্রুত এই অগ্রগতিকে ব্যাহত করিবার জন্য ম্যানস্টাইন শক্তিশালী যান্ত্রিক বাহিনী ও মজুত সৈন্যদের সহায়তায় এক নিদারুণ পালটা-আঘাত হানিলেন এবং লালফৌজ ১৯শে নভেম্বর ঝিটোমির এবং ৩০ নভেম্বর কোরোস্টেন পরিত্যাগে বাধ্য হইল। দক্ষিণে ও পশ্চিমে জার্মানরা এমনভাবে আক্রমণ করিল যে, ঝিটোমির হইতে লালফৌজ কোনও ক্রমে এক ভয়ঙ্কর ফাঁদ হইতে বাঁচিয়া গেল। নাৎসী গোলন্দাজ বিমানবহর সমস্ত শক্তিশালী ঘাঁটি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল এবং ৬ই হইতে ১১ই ডিসেম্বরের মধ্যে কিয়েভের পশ্চিমে রুশদের সমস্ত দখলীকৃত এলাকা বিপন্ন হইল। এখানকার জার্মান পালটা-আক্রমণ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ছিল কিন্তু রুশরা প্রভুত মজুত সৈন্য প্রয়োগ করিয়া পুনরায় ঝিটোমির ও কোরোস্টেন দখল করিয়া লইল এবং জার্মানদিগকে প্রায় পোল্যাণ্ডের সীমানায় হটাইয়া দিল।

জেনারেল কোনিয়েভ নীপারের বাঁকে প্রবেশ করিলেন এবং ৯ই ডিসেম্বর জামেঙ্কা দখল করিয়া লইলেন। ফলে, জার্মানরা চেকরাসি ও ক্রেমেনচুগের মধ্যবর্তী নীপার

নদীবাঁকের অংশ পরিত্যাগে বাধ্য হইল। ইহাতে ক্রিভয়রগের উত্তর বাহু উন্মুক্ত হইয়া গেল। তখন সেই বাহুকে রক্ষা করার জন্য জার্মানরা দক্ষিণ দিক হইতে মজুত সৈন্য আনিয়া বলবৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইল। ফলে, ২০শে ডিসেম্বর খেরসন বন্দরের পতন হইল। কেননা, জেনারেল তোলবুখিন এখানে পুনঃ পুনঃ প্রবল আক্রমণ চালাইতেছিলেন।

এদিকে শরৎকালীন অভিযানে ককেশাসের শেষ কিউবান ঘাঁটিও জার্মানদের হাতছাড়া হইয়া গেল এবং জার্মানরা নীপারের নিম্ন বাঁকে বা মোহনার দিকে সরিয়া আসিল। ফলে, ক্রিমিয়া উপদ্বীপ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। লালফৌজ উত্তর-পশ্চিমে পেরেকোপের সংকীর্ণ যোজকও দখল করিয়া লইল এবং ক্রিমিয়ায় জার্মানরা ভূমিপথের সংযোগ হারাইয়া ফেলিল।

* * *

১৯৪৩-এর গ্রীষ্মের পর শরৎকালীন আবহাওয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী হইল এবং ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত মৃদু শীত ও ভিজে আবহাওয়া বজায় রহিল। এই অস্বাভাবিক ঋতুর জন্য রণক্রিয়ার অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছিল। তথাপি গত পাঁচ মাসের অক্লান্ত অভিযানে লালফৌজ অসাধ্য সাধন করিল। কিয়েভ, খারকোভ, নীপ্রোপেট্রোভস্ক, খেরসন ইত্যাদি উক্রাইনের প্রধান নগরীগুলি এবং ব্রিয়ানস্ক, স্মলেনস্ক, গোমেল ইত্যাদি মধ্য রণাঙ্গনের বড় বড় ঘাঁটি আবার রুশদের দখলে আসিল। উক্রাইনের খনিজ সম্পদ, শস্যসম্পদ ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আবার রুশদের হাতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, উত্তরে ভেলিকিলুকি হইতে দক্ষিণ কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৩৯ সালের নূতন পোল-রুশ সীমান্তের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল এবং অনেক স্থানে প্রাক্‌যুদ্ধ সীমানার ১০০ মাইল এবং রুমানীয়ার বেসারাবিয়া হইতে ১০০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিল। সুতরাং ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকাল রাশিয়াকে তার সীমান্ত উদ্ধারের পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিল, যে অগ্রবর্তিতা ১৯৪৪ সালে জার্মান সীমান্তের কাছে গিয়া পৌঁছিল।*

---

* গ্রন্থকার প্রণীত রুশ-জার্মান সংগ্রাম, ১৯৪৭।

ষষ্ঠ পর্ব

নবম অধ্যায়

কোয়ালিশনের রাজনীতি ও রণনীতি :
ওয়াশিংটন, কোয়েবেক ও মস্কো বৈঠক

১৯৪৩ সাল মিত্রপক্ষের বহু কর্মতৎপরতা এবং প্রচুর সভা ও সম্মেলন দ্বারা সমাকীর্ণ ছিল। ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রচেষ্টা যতই চরম পর্যায়ের দিকে যাইতেছিল, গণতন্ত্রবাদী শক্তিসমূহ ততই নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ ও আলোচনার তাগিদ অনুভব করিতেছিলেন। এইজন্য ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হইল বিখ্যাত ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন। স্ট্যালিন রুশ রণাঙ্গনের ব্যস্ততার জন্য এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না, কিন্তু চার্চিল ও রুজভেল্ট একত্র হইলেন। রাশিয়ার দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবী এই সম্মেলনেও মিটিল না, কিন্তু ক্যাসাব্লাঙ্কা বৈঠক থেকে অক্ষশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দাবী উত্থিত হইল। মে মাসে (১২ই—২৭শে) পুনরায় চার্চিল ও রুজভেল্ট একত্র হইলেন ওয়াশিংটনে, যে সম্মেলনের সাংকেতিক নাম ছিল 'ট্রিডেণ্ট'। তারপর ১৯৪৩ সালের দ্বিতীয় অর্ধে অনেকগুলি শীর্ষ বৈঠকের অনুষ্ঠান হইল, যেগুলিতে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা নিয়া আলোচনা, পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সামরিক প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তি সম্পর্কে একটি বিশ্ব সংগঠন গড়িয়া তোলার সংকল্প স্থির হইল। আগস্ট মাসে কানাডার কোয়েবেক শহরে চার্চিল-রুজভেল্টের পুনরায় যে বৈঠকে হইল, তার সাংকেতিক নাম ছিল 'কোয়াড-র‍্যাণ্ট'। তারপর অক্টোবর মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত হইল ত্রিশক্তির (ব্রিটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া) পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন। কতকগুলি গুরুত্বর সিদ্ধান্তের জন্য এই সম্মেলন ১৯৪৩-এর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের কায়রো (রুজভেল্ট-চার্চিল-চিয়াং কাইসেক) এবং তেহেরান সম্মেলন। রুজভেল্ট-চার্চিল ও স্ট্যালিন—এই তিন বিশ্বনেতা তেহেরানেই প্রথম একত্রিত হইয়াছিলেন এবং তিন নেতার ঐতিহাসিক মিলনে হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন বা মহাজোটের এক নূতন পর্ব শুরু হইয়াছিল।

সামরিক দিক থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী নাৎসী জার্মানী ও জাপানকে পৃথিবীব্যাপী মহাসংগ্রামে চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া যদি পরাজিত করিতে হয়, যদি পদানত দেশগুলির উদ্ধার ও মানুষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হয়, তবে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রপক্ষের একত্রে কোয়ালিশন গঠন না করিয়া উপায় ছিল না। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান কর্তৃক পার্লহারবার আক্রমণের পর থেকে রুজভেল্ট-চার্চিল-স্ট্যালিন সংকটের আবর্তে পড়িয়া পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইতে বাধ্য হইলেন এবং এভাবে যে মহাজোট গড়িয়া উঠিল পৃথিবীব্যাপী রণাঙ্গনের দায়িত্ব তার ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। ক্রমে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের উঠানামা ও

অগ্রগতির সঙ্গে মিত্র রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে তিন নেতা—স্ট্যালিন-রুজভেল্ট-চার্চিল বিশ্বনেতার পর্যায়ে পেঁৗছিলেন। কারণ, তাঁদের কার্য-কলাপ, দেখা-সাক্ষাৎ ও সম্মেলন ইত্যাদি অনিবার্যরূপেই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িল। এবং যে সমস্ত সম্মেলন ও বৈঠক তাঁরা অনুষ্ঠান করিলেন সেগুলির প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় গোলার্ধের কোটি কোটি মানুষের ভাগ্যও জড়িত ছিল। কার্যতঃ বিশ্বের দায়িত্ব এই তিন নেতার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। কিন্তু সেই দায়িত্ব কেবল সামরিক নয়, কেবল বিশুদ্ধ রণক্ষেত্রের নয়; এক-একটা যুদ্ধের জয়-পরাজয় ও ভাগ্যের উঠা-নামা সেই সমস্ত সংশ্লিষ্ট দেশের কিংবা অঞ্চলের সমাজনীতি, রাজনীতি ও কূটনীতির গভীর সংঘাত ডাকিয়া আনিল। ফলে, হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের তিন বিশ্বনেতার পারস্পরিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজ দর্শনের মধ্যে নানা বিরোধ, বিভেদ ও বৈষম্য দেখা দিল। অবশ্য জার্মানী, জাপান বা ইতালীকে পরাজিত করার লক্ষ্যে তিন নেতাই একমত ছিলেন, কিন্তু এই লক্ষ্যের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও রণনৈতিক বহু প্রশ্ন সময় সময় গভীর অন্তরায় সৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ছিলেন উদারতাবাদী মহাপ্রাণ 'পরিচ্ছন্ন ভদ্রলোক'—গণতন্ত্র মানবিকতার উপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল। যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে সামরিক বিষয়গুলির চেয়ে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়গুলির প্রাধান্য দিতে তিনি তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল ছিলেন পাকা সাম্রাজ্যবাদী এবং যুদ্ধের সামরিক দিকের চেয়েও রাজনৈতিক দিকের উপর নজর তাঁর বেশী ছিল। অর্থাৎ তাঁর সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের লক্ষ্য ছিল বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা। এই স্বার্থের হিসাব না করিয়া তিনি এক পা ফেলিতেও রাজী ছিলেন না। এজন্য যুদ্ধ ও রণনীতিকে তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাবার ঘুঁটির চালের মত ব্যবহার করিতেন। অপরপক্ষে বিপ্লবী সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক মার্শাল স্ট্যালিন ছিলেন হিটলারী আক্রমণে সবচেয়ে বেশী বিপন্ন, নাৎসী জার্মানীর রণনৈপুণ্য এবং সামরিক শক্তি ও সংগঠন অসাধারণ ছিল। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত রাশিয়াকে প্রায় একক হিটলারী আক্রমণের সমস্ত ক্রূরতা, প্রচণ্ডতা ও হিংস্রতা অজস্র মূল্য দিয়া প্রতিহত করিতে হইয়াছে। নিজের দেশ উদ্ধারের অভূতপূর্ব দায়িত্ব তাঁকে বহন করিতে হইয়াছে। অধিকন্তু 'বলশেভিক নেতা' হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও ধনতন্ত্রবাদী আমেরিকাকে সর্বদাই তাঁর পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি সারা ধনিক পৃথিবীর ভীতি ও অবিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। বিশেষতঃ ১৯১৯-১৯৩৯ সালের আন্তর্জাতিক ইতিহাস ছিল সোভিয়েট বিরোধী বিদ্বেষ, তিক্ততা ও অবিশ্বাসের ইতিহাস মাত্র। অথচ মহাযুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনে 'সাধারণ' শত্রুকে পরাজিত করিতে গিয়া এই তিন ভিন্ন চরিত্র ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্বনেতাকে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইতে হইল। ইতিহাসের এটা ছিল এক অভিনব দৃশ্য। অতএব এই তিন নেতার মধ্যে বিভিন্ন গুরুতর প্রশ্নে এবং সম্মেলনগুলিতে যে সমস্ত বিরোধ ও বিসম্বাদ গিয়াছে সেগুলি নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত কিংবা অস্বাভাবিক ছিল না।

* * *

১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাসে ক্যাসাব্লাংকা বৈঠকের পর মার্চ মাসে ওয়াশিংটনে গেলেন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন এবং সেখানে তিনি দুই সপ্তাহের অধিককাল

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মার্কিন নেতাদের সঙ্গে যুদ্ধ ও রাজনীতি সংক্রান্ত অজস্র বিষয় নিয়া আলোচনা করিলেন! পোল্যাণ্ডের সীমানা সমস্যা থেকে জার্মানীর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ইউরোপীয় দেশগুলির সমস্যা তো আলোচিত হইলই, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর প্রশ্নও আলোচিত হইল। ইডেনেরর পর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী চার্চিল দলবলসহ হাজির হইলেন ওয়াশিংটনে ১১ই মে। চার্চিল-রুজভেল্টের এই তৃতীয় ওয়াশিংটন সম্মেলনে প্রায় একশত বৃটিশ প্রতিনিধি চার্চিলের সহযোগী ছিলেন এবং ১২ দিন ধরিয়া বহু সমস্যার আলোচনা হইল। ইউরোপ ও এশিয়া দুই মহাদেশেরই যুদ্ধের সমস্যাগুলি আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। চীন-ভারত-ব্রহ্ম যুদ্ধের আলোচনার জন্য লর্ড ওয়েভেল ভারত থেকে এবং জেনারেল স্টিলওয়েল ও জেনারেল শেনল্ট চীন থেকে এই সম্মেলনে যোগ দিলেন। কিন্তু ওয়াশিংটনের এই সম্মেলনে (সাঙ্কেতিক নাম ট্রিডেণ্ট) চীনের যুদ্ধসমস্যা মিটিল না। চীন-ব্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গনের সৈনাপত্য নিয়া চিয়াং কাইসেক, স্টিলওয়েল ও শেনল্ট—এই তিন প্রধানের মধ্যে তীব্র মতভেদ ছিল এবং এর মীমাংসার জন্য মাঝে-মাঝে ওয়াশিংটনের স্মরণাপন্ন হইতে হইত। কিন্তু "ট্রিডেণ্ট' সম্মেলনে এই বিতর্ক ও বিরোধের শেষ হইল না। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৩) চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিংয়ে মাদাম চিয়াংকাইসেক ও তাঁর বোন মাদাম কুংয়ের চেষ্টায় একটা জোড়াতালি দেওয়া আপোস হইল জেনারেল স্টিলওয়েলের অনুকুলে। কিন্তু তাতে কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল না।[১]

'ট্রিডেণ্ট' বৈঠকে পশ্চিম ইউরোপে বা ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা নিয়া আলোচনা হইল বটে, কিন্তু তারিখটা ১৯৪৩ সালের বদলে পিছাইয়া গেল ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ চার্চিল রুজভেল্টের বৈঠকে স্থির হইল যে, ১৯৪৪ সালের ১লা মে উত্তর ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডিতে অবতরণ করা হইবে এবং এই অভিযানের চূড়ান্ত সাঙ্কেতিক নাম রাখা হইল 'ওভার লর্ড"।

এই সময় এবং তার কিছুকাল আগে হইতেই রাশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক ভালো যাইতেছিল না। এজন্য রুজভেল্ট কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং তিনি সমগ্র পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। মস্কোস্থিত প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ই. ডেভিস—যিনি তাঁর 'মিশন টু মস্কো' পুস্তকের জন্য বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁকে মে মাসে মস্কোতে পাঠানো হইল স্ট্যালিন-রুজভেল্ট সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য। রুজভেল্ট চার্চিলকে বাদ দিয়া এক স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, চার্চিল যদি উপস্থিত না থাকেন এবং তিনি একা যদি স্ট্যালিনের সঙ্গে কথা বলিতে পারেন, তবে, অচল অবস্থা দূর হইবে এবং স্ট্যালিনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তিন প্রধানের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

'It was Roosevelt's belief that he might be able to break the ice with Stalin more readily if Churchill were not present; with personal relations established a metting of the Big three could be held later on.'[২]

১। Robert Sherwood—P. 739-40.

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৭৩০।

সুতরাং স্ট্যালিন-রুজভেল্ট সাক্ষাতের প্রস্তাব নিয়া ডেভিস মস্কোতে গেলেন এবং স্ট্যালিনের সঙ্গে ১১ ঘণ্টা সাক্ষাতের পর (প্রস্তাবিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে স্ট্যালিন অনেক সন্দেহজনক প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন) স্ট্যালিন ১৫ই জুলাই তারিখ রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাতে রাজী হইলেন। কিন্তু মস্কো থেকে ডেভিসের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর 'টিডেণ্ট' বা ওয়াশিংটন বৈঠকের সমস্ত কাগজপত্র স্ট্যালিনের নিকট পৌঁছিল। তের মাস ধরিয়া যে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রতিশ্রুতি তিনি ইঙ্গ-মার্কিনের পক্ষ থেকে পাইয়া আসিতেছিলেন, সেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত পিছাইয়া যাওয়ায় স্ট্যালিন ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইলেন। ১১ জুন, ১৯৪৩, তিনি রুজভেল্ট-চার্চিলকে পত্রযোগে জানাইলেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন পিছাইয়া দেওয়ার ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে ভয়ানক অসুবিধার সৃষ্টি হইল। গত দুই বছর ধরিয়া রাশিয়া তার সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রায় একক হস্তে লড়িতেছে এবং লড়াই একমাত্র তার নিজের জন্য নয়, মিত্রপক্ষের জন্যও বটে। জার্মানবাহিনী এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ।

উভয় গভর্নমেন্টের তরফে চার্চিল জবাবে বলিলেন যে, পশ্চিম ইউরোপে এখনও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিলে বৃটেন ও আমেরিকাকে বিপর্যয় বরণ করিতে হইত ; কারণ, উভয়ের সৈন্যদল পরাজিত হইত। 'সুতরাং বৃটিশবাহিনীর সুবৃহৎ পরাজয় ও পাইকারী হত্যায় কিভাবে সোভিয়েত বাহিনীর লাভ হইত তা আমি বুঝিতেছি না।'

কিন্তু স্ট্যালিন চার্চিলের যুক্তি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। গ্রীষ্মে অভিযান করিতে গিয়া ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে 'পাইকারী হত্যা' ও বিপর্যয়' বরণ করিতে হইত, এই যুক্তি তিনি স্বীকার করিলেন না। বিশেষতঃ ইতিমধ্যে সোভিয়েট-বাহিনীর জয়লাভের ফলে দ্বিতীয়ত রণাঙ্গন খোলার পক্ষে আগের চেয়ে অনেক বেশী অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। ২৪শে জুনের এই বার্তার উপসংহারে তিনি জানাইলেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন না-খোলার জন্য সোভিয়েট রাশিরার হতাশাই একমাত্র বড় কথা নয়, তার মিত্রবর্গের উপর আস্থা রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। রাশিয়ার ও পশ্চিম ইউরোপের দখলীকৃত এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচানোর প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত, আর জড়িত সোভিয়েটবাহিনীর ত্যাগ স্বীকারের পরিমাণ হ্রাসের প্রশ্ন, যার তুলনায় ইঙ্গ-মার্কিন-সৈন্যবাহিনীর ত্যাগ স্বীকারকে নিতান্ত তুচ্ছ বলা যাইতে পারে।

'I must tell you that the point here is not just the disappointment of the Soviet Government, but the preservation of its confidence in its Allies, a confidence which is being subjected to severe stress. One should not forget that it is a question of saving millions of lives in the occupied areas of Western Europe and Russia and of reducing the enormous sacrifices of the Seviet armies, ccmpared with which the sacrifices of the Anglo-American armies are insignificant.'[১]

নিঃসন্দেহে স্ট্যালিনের বক্তব্য অত্যন্ত কঠোর ছিল এবং এই বক্তব্যে ইঙ্গ-মার্কিনের বিরুদ্ধে বিশ্বাস হননের গুরুতর ইঙ্গিত ছিল। চার্চিলও এর জবাবে কটু ও কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রুজভেল্ট চার্চিলের এই জবাবের কথা জানিতেন

১। Correspondence, Vol. I, P. 138.

না। কারণ, রুজভেল্টের সঙ্গে পরামর্শ না-করিয়াই চার্চিল এই জবাব পাঠাইয়াছিলেন। এদিকে স্ট্যালিন ওয়াশিংটন থেকে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত লিটভিনোভকে এবং লন্ডন থেকে রাষ্ট্রদূত মৈস্কিকে প্রত্যাহার করিয়া নিলেন। ফলে, মিত্রপক্ষীয় রাজনৈতিক মহলে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হইল এবং সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জো হইল। বলা বাহুল্য যে, রুজভেল্ট-স্ট্যালিন সাক্ষাতের প্রস্তাব অনির্দিষ্টকালের জন্য চাপা পড়িয়া গেল। তবে, ভাগ্যের কথা হিটলার মিত্রপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের এই শোচনীয় অবস্থার কথা জানিতেন না।[১]

* * *

ইতিমধ্যে পূর্ব রণাঙ্গনে জুলাই মাসের গ্রীষ্মকালীন অভিযানে কুরস্ক রণক্ষেত্রে জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিল এবং লালফৌজ ক্রমাগত আগাইয়া যাইতে লাগিল। তখন চার্চিল আবার ব্যগ্র হইলেন রুজভেল্টের সঙ্গে পরামর্শের জন্য। কানাডার কোয়েবেক শহরে উভয় নেতা সামরিক প্রতিনিধিদের সহিত মিলিত হইলেন ১১ই আগস্ট থেকে ২৪শে আগস্ট, ১৯৪৩, পর্যন্ত। এই সম্মেলনের সাংকেতিক নাম 'কোয়াড্র্যান্ট'। আগেকার সম্মেলনগুলির মত এবারও স্ট্যালিন বা সোভিয়েট প্রতিনিধিরা অনুপস্থিত ছিলেন। অবশ্য কোয়াড্র্যান্ট বা কোয়েবেক সম্মেলনে আলোচনার অন্যতম বড় বিষয় ছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ বা জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান। কিন্তু তখন রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি বলবৎ ছিল। সুতরাং বৈঠকে এই কর্মসূচীর আলোচনায় সোভিয়েটের পক্ষে যোগদান করা টেকনিক্যাল কারণে অসুবিধাব্যঞ্জক ছিল। কিন্তু রাশিয়ার পক্ষে আসল প্রশ্ন ছিল গ্রীষ্মকালে পশ্চিম উইরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি, যার দ্বারা জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আঘাত হানিয়া পূর্ব রণাঙ্গনে হিটলারী চাপ হ্রাস করা যাইতে পারে। এজন্য সোভিয়েট পত্র-পত্রিকায় ও বার্তাবিভাগীয় ইস্তাহারে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার উপর জোর দেওয়া হইল। কোয়েবেক সম্মেলনের পূর্বাহ্ণে 'প্রাভদা' 'দ্বিতীয় রণাঙ্গন' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিলেন যে, বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেণ্ট দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বিষয়ে তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব ক্রমাগত ভঙ্গ করিতেছেন। যদিও বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়তা দেখাইতেছেন, তবু উভয় দেশেই এমন-একটা ছোট্ট অথচ শক্তিশালী গ্রুপ আছে, যারা বাধা সৃষ্টি করিতেছেন ও বিলম্ব ঘটাইতেছেন। এই গ্রুপের মধ্যে অস্ত্র-ব্যবসায়ী, সামরিক সম্ভার সরবরাহকারী ও ব্যক্তিগত স্বার্থপরায়ণ এমন কতকগুলি লোক আছে, যারা তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ হোক এটা চায় না। হিটলারী দখলীকৃত এলাকার লক্ষ লক্ষ লোকের অবর্ণনীয় দুর্গতির চেয়েও এই সমস্ত লোক নিজেদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতেছে। কিন্তু বৃহৎ রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসায় নিশ্চয়ই এদের বেশী হাত থাকা উচিত নয়।[২]

কোয়েবেক সম্মেলনে অবশ্যই আবার দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। কিন্তু মার্কিন ও বৃটিশ প্রতিনিধিদের মধ্যে এই বিষয়ে আগের মতই মতভেদ ছিল। ফ্রান্সে ও পশ্চিম ইউরোপে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য মার্কিন

১। Robert Sherwood, P. 734.

২। প্রাভদা, ৬ই আগস্ট, ১৯৪৩।

প্রতিনিধিরা ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু বৃটিশপক্ষের গরজ ছিল না। কোন কোন সোভিয়েট ঐতিহাসিক সন্দেহ করেন যে, এর পিছনেও সাম্রাজ্যবাদীয় স্বার্থ ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের চক্রান্ত জড়িত ছিল। কেননা, পশ্চিম ইউরোপে একদিকে ফ্যাসিবিরোধী জনগণের আন্দোলন যেমন তীব্র হইতেছিল, তেমনি অন্যদিকে লালফৌজ হিটলারী বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত জয় অর্জন করিতেছিলেন। সুতরাং মার্কিনপক্ষ যুদ্ধোত্তর পশ্চিম ইউরোপে তাঁদের একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ ও প্রভাব বজায় রাখার জন্য পরিকল্পনা আঁটিতে ছিলেন এবং দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলায় জন্য বৃটেনের থেকে বেশী ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু অন্যপক্ষে চার্চিল বলকান অঞ্চলে অভিযানে পক্ষপাতী ছিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব কর্ডেল হাল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন যে, চার্চিল চাহিতেছিলেন যাতে সোভিয়েট রাশিয়া বলকানে ঢুকিয়া পড়িতে না পারে। কেননা, তাতে বৃটিশ স্বার্থের যেমন ক্ষতি হইবে, তেমনি আমেরিকার পক্ষেও অসুবিধা হইবে। চার্চিলের মনোগত অভিপ্রায় ছিল, ইউরোপের উপর বৃটিশ প্রভুত্ব রজায় রাখা এবং ভবিষ্যৎ মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে দূরে রাখা।

বৈঠকে মার্কিন মুখপাত্রগণ এমন যুক্তিও দেখাইতেছিলেন যে, সোভিয়েটবাহিনী শক্তিক্ষয় করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িবে এবং তখন পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী খোলা মাঠ পাইয়া যাইবে![1]

অবশ্য সম্মেলনে দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনার পর দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সিদ্ধান্ত আবার পিছাইয়া গেল ১৯৪৪ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত এবং তার বদলে ইতালীতে অভিযানের জন্য সুপারিশ করা হইল। জেনারেল দ্য'গলের 'ফ্রী ফ্রান্স' কমিটিকে এই বৈঠক থেকেই মার্কিন সরকার স্বীকৃতি দিলেন।

কোয়েবেক সম্মেলনে জার্মানীর ভবিষ্যৎ নিয়াও আলোচনা হইল। জার্মানীকে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রস্তাব তুলিলেন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্টনি ইডেন, আর মার্কিনপক্ষ জার্মানীকে বিচ্ছিন্ন ও টুকরা টুকরা করার জন্য 'মর্গেনথাউ পরিকল্পনা'—'a plan for Germany's dismemberment, known as Morgenthau Plan'—বৈঠকে পেশ করা হইল। কিন্তু জার্মানী সম্পর্কে এই সমস্ত আলোচনা হইল বটে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না, ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রহিল।

কোয়েবেক সম্মেলনে ইউরোপের চেয়ে এশিয়া নিয়াই ইঙ্গ-মার্কিন যুক্ত সেনানী-মণ্ডলীর বৈঠকে বেশী আলোচনা হইল এবং চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশের বিস্তৃত প্রসঙ্গ উঠিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও বৃটিশ ও মার্কিন অভিমতের মধ্যে কিছুটা বৈষম্য দেখা দিল। তবে, বৈঠকে আলোচনার পর চার্চিলের উদ্যোগে একটি নূতন কমাণ্ড গঠিত হইল। এই নব গঠিত "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ড"-এর সুপ্রিম কমাণ্ডার পদে নিযুক্ত হইলেন এ্যাডমিরাল লর্ড লুই ম্যাউন্টব্যাটেন এবং ডেপুটি সুপ্রিম কমাণ্ডার পদে নিযুক্ত হইলেন চীনা-বার্মা সেনানীমণ্ডলীর প্রধান মার্কিন সেনাপতি জেনারেল স্টিলওয়েল। চার্চিল মাউন্টব্যাটেনের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন এবং তাঁর গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা করিতেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যেমন প্রধানতঃ বৃটিশ দায়িত্বের অন্তর্গত হইল (বলাই বাহুল্য যে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এর অন্যতম মূল

১। জি. ডেবোরিন, পৃষ্ঠা ৩১৬।

কারণ ছিল) তেমনি জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান মূলতঃ আমেরিকার দায়িত্ব বলিয়া গৃহীত হইল। অবশ্য দূরপ্রাচ্যে ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযানে বৃটিশ ও মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের ব্যবস্থা আগে পাকা হইয়াছিল।

কোয়েবেক সম্মেলনে মিত্রপক্ষের নিকট আর-একটি শুভ সূচনা এই ছিল যে, অতলান্তিকের নৌ-যুদ্ধে মিত্রপক্ষের পাল্লা ক্রমেই ভারী হইতেছিল, জার্মান ইউ-বোটের সন্ত্রাস ক্রমেই দমিত হইতেছিল এবং মিত্রপক্ষের নৌবল উৎপাদন বৃদ্ধি সমুদ্রপথে ক্রমশঃ সাফল্য আনিয়া দিতেছিল।

কোয়েবেক সম্মেলনে মিত্রপক্ষের নিকট আর-একটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। উত্তর ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ফ্রান্সের টুলো-মার্সাই এলাকায় আর-একটি রণাঙ্গন খোলা হইবে। অবশ্য চার্চিল এই প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

কোয়েবেক সম্মেলনে রুজভেল্টের প্রতিনিধি হপ্‌কিন্সের হাতে এমন-একটা দলিল ছিল, যার গুরুত্ব উপেক্ষা করা কঠিন ছিল। বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক শেরউড লিখিয়াছেন যে, 'Russia's position' বা 'রাশিয়ার অবস্থান' এই শিরোনামায় দলিলটি রচিত হইয়াছিল মার্কিন সমর দপ্তরের কোন শীর্ষস্থানীয় রণনীতিকের দ্বারা এবং এতে উল্লেখ করা হইয়াছিল—

'Russia's post-war position in Europe will be a dominant one. With Germany crushed, there is no power in Europe to oppose her tremendous military forces. It is true that Great Britain is building up a position in the Mediterranean vis-a-vis Russia that she may find useful in balancing power in Europe. However, even here she may not be able to oppose Russia unless she is otherwise supported.'

অর্থাৎ 'যুদ্ধোত্তর ইউরোপে রাশিয়া প্রধান শক্তিতে পরিণত হইবে। জার্মানী চূর্ণ হইয়া গেলে পর ইউরোপে এমন কোন শক্তি থাকিবে না, যে শক্তি রাশিয়ার বিপুল সামরিক বাহিনীর বিরোধিতা করিতে পারে। এ কথা ঠিক যে, গ্রেট ব্রিটেন ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার পাশাপাশি একটা অবস্থান গড়িয়া তুলিতেছে, কিন্তু অন্য কোন দিক থেকে সমর্থন না পাইলে ব্রিটেন তার ভূমধ্যসাগরের অবস্থানের দ্বারাও রাশিয়াকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না।'

অতঃপর এই দলিলে বলা হইল যে, বর্তমান যুদ্ধে রাশিয়াই 'চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তি। অতএব রাশিয়াকে যথাসম্ভব সহায়তা দিতে হইবে এবং তার বন্ধুতা অর্জনে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই বন্ধুতা বজায় রাখিতে হইবে।

দলিলের উপসংহারে বলা হইল যে, আমেরিকার পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে রাশিয়ার সহযোগিতা অর্জন করা। কেন না, রাশিয়ার সহায়তার দ্বারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লোকক্ষয় ও সম্পদক্ষয় হ্রাস পাইয়া যাইবে। কিন্তু রাশিয়াকে দলে না-পাইলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে অসম্ভব রকমের বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে এবং সেই অবস্থায় আমেরিকার রণক্রিয়া ব্যর্থ হইয়াও যাইতে পারে।'

১৯৪৩ সালে রাশিয়া সম্পর্কে মার্কিন রণনৈতিক মহলের এই ধারণা ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন ছিল। এর দ্বারা পরিষ্কার স্বীকার করা হইতেছে যে

জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়াই 'চূড়ান্ত নিয়ামক' শক্তি এবং রাশিয়ার সাহায্যেই জাপানকেও খতম করিতে হইবে। অতএব এমন শক্তিমান রাশিয়ার বন্ধুতো আমেরিকার পক্ষে প্রয়োজন। এই সত্য রুজভেল্ট এবং তাঁর সমর্থকেরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক শেরউডও মন্তব্য করিয়াছেন যে, রাশিয়া সম্পর্কে এই ধারণাই তেহরান ও ইয়াল্টা (ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫) সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির পিছনে মার্কিন নীতিকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।...

কোয়েবেক সম্মেলনের শেষে জানা গেল স্ট্যালিন মস্কোতে ত্রিশক্তির—বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক সম্মিলিত বৈঠক অনুষ্ঠানে সম্মত হইয়াছেন। এই সংবাদে পশ্চিমী মিত্রমহল খুশী হইলেন। কেন না, রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্নে যে মতান্তরের মেঘ জমিয়াছিল, স্ট্যালিনের এই সম্মতির দ্বারা সেই মেঘ কাটিয়া গেল। কারণ, তিন প্রধানের বৈঠকের জন্য যে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল' তার আগে সমস্যাগুলির ঝাড়াই-বাছাইয়ের জন্য ত্রিশক্তির পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মস্কো বৈঠকের প্রয়োজন ছিল।

মস্কো পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন

১৮ই অক্টোবর, ১৯৪৩, থেকে ১২ দিন ধরিয়া মস্কোতে ত্রিশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তা উল্লেখযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। কেননা, এই সম্মেলনে যেমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, তেমনি হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন আরও শক্তিশালী ও দৃঢ় হইয়াছিল। বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব এন্থনি ইডেন, মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল এবং সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভি. মলোটোভ এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। রাশিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও কর্ডেল হালের প্রস্তাব ও অনুরোধক্রমে মস্কোস্থিত চৈনিক পররাষ্ট্রমন্ত্রীও এই বৈঠকে যোগ দিয়া চূড়ান্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন।

এই বৈঠক উপলক্ষে স্ট্যালিনের মন-মেজাজের আর-একবার নতুন পরিচয় পাওয়া গেল। এন্থনি ইডেন তাঁর রিপোর্টে বলিয়াছেন—'স্ট্যালিনকে চমৎকার খোস মেজাজে দেখা গেল। সারা সন্ধ্যাবেলাটার মধ্যে তিনি অতীতের ব্যাপার নিয়া একবারও কোন গাল-মন্দের কথা উল্লেখ করিলেন না। মনে হয়, তিনি এতদিনে বোধ হয়, উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সমুদ্র পারবর্তী অভিযান এত সহজ নয়। তবে, এটা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, ফ্রান্সে অবতরণের জন্য 'ওভারলর্ডের' আয়োজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পক্ষে তা করা উচিত। আমাদের কথার উপর তিনি এখন যে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তা অত্যন্ত চমকপ্রদ।'

বৈঠককে শেষে জাঁকজমকপূর্ণ এক বিশাল ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। এই বিষয়ে রুশদের আতিথেয়তা জগদ্বিখ্যাত।[২]

মস্কোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বৃহৎ ত্রিশক্তির মধ্যে সামরিক সহযোগিতার উপরেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়াছিল। সোভিয়েট গভর্নমেন্ট হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যত দ্রুত সম্ভব জয় অর্জনের জন্য যে দাবি তুলিলেন, মার্কিন ও বৃটিশ

১। হপ্‌কিন্স অ্যান্ড রুজভেল্ট—শেরউড, পৃষ্ঠা ৭৪৮-৪৯।
২। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৪০০।

প্রতিনিধিরা সেই দাবির সঙ্গে একমত হইলেন এবং প্রকাশিত ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইল যে, মিত্রশক্তির গভর্নমেণ্টসমূহের মূল লক্ষ্যই হইতেছে যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য ত্বরান্বিত করা। এ জন্য ত্রিশক্তির সামরিক প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে আরও সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় এবং ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির অন্তরায়গুলি দূর করার সিদ্ধান্ত হইল।

সম্মেলনের পক্ষ থেকে যুদ্ধের পরেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল এবং ঘোষণা করা হইল যে, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন করা হইতেছে, যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্যও অনুরূপ সহযোগিতা বজায় রাখা হইবে। জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণসাধনও একমাত্র শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার মধ্যেই সম্ভব।

মস্কো বৈঠকে পূর্ব ইউরোপের সমস্যাগুলি নিয়াও ত্রিশক্তির প্রতিনিধিরা বিচার-বিবেচনা করিলেন। চার্চিলের পরামর্শক্রমে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব এন্থনি ইডেন তুরস্কের সহযোগিতায় দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে আক্রমণের জন্য এক বৃটিশ পরিকল্পনা উত্থাপন করিলেন এবং এ জন্য মার্কিন ও সোভিয়েট সমর্থন দাবী করিলেন। কিন্তু সোভিয়েট প্রতিনিধি ঘোষণা করিলেন যে, এই পরিকল্পনা সামরিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, বরং এর পিছনে এমন উদ্দেশ্য আছে, যার সঙ্গে জনসাধারণের ইচ্ছা ও স্বার্থের কোন সম্পর্ক নাই।

বৈঠকে পোলিশ সমস্যার কথাও উঠিল এবং বৃটিশ ও মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয় লণ্ডনস্থিত পোলিশ সরকারকে পুনরায় কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। অবশ্য এই প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের শেষে পোল্যাণ্ডের মুক্তির পর লণ্ডনস্থিত পোলদের হাতে পোল্যাণ্ডের ভাবী সরকারের ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া। কিন্তু সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এমন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

মস্কো সম্মেলনে ব্রিটিশ ও মার্কিন প্রতিনিধিরা আর-একটি অভিনব প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন। তাঁরা অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বে দানিয়ুব নদী অধ্যুষিত দেশগুলির কনফেডারেশন (The Danubian Confederation) গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। সোজা কথায় তাঁরা এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই পুরাতন অস্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে চাহিতেছিলেন। এর পিছনে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধোত্তর দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদের একটি ঘাঁটি তৈরি করা এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরোধিতা করা। সোভিয়েট প্রতিনিধিরা এভাবে 'কৃত্রিম ফেডারেশন' গঠন ও চাপাইয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন।[১]

মস্কো সম্মেলন থেকে অস্ট্রিয়া সম্পর্কে একটি ঘোষণা দেওয়া হইল। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে হিটলারী জার্মানী অস্ট্রিয়া জোরপূর্বক দখল করিয়া জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে যে 'মিলন' ঘটাইয়াছিল, ত্রিশক্তির ঘোষণার দ্বারা সেই 'মিলন' বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং মুক্ত ও স্বাধীন অস্ট্রিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বস্তির জন্য এই সম্মেলন থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

১। জি ডেবোরিন, পৃষ্ঠা ৩২৯-৩১।

নেওয়া হইল। সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং চীন—এই চতুঃশক্তি স্বাক্ষরিত এক ঘোষণায় যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি বিশ্বসংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হইল।

'The Declaration noted the necessity of establishing 'at the earliest practicable date a general international organisation for the maintenance of international peace and security, based on the principle of sovereign equality of all peacc-loving states…'

এই ঘোষণাটি গভীর গুরুত্বব্যঞ্জক ছিল। কেন না, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বস্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশন্স অর্গানাইজেশন (সংক্ষেপে রাষ্ট্রসংঘ) গড়িয়া তোলার পক্ষে এই ঘোষণাটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

এই ঘোষণাটির ৬ নম্বর ধারায় বলা হইল যে, যুদ্ধ ও শত্রুতার অবসানের পর সংশ্লিষ্ট গভর্নমেণ্টসমূহ এই ঘোষণায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ছাড়া এবং পারস্পরিক পরামর্শ ব্যতিরেকে অপর কোন রাষ্ট্রের ভূমিতে কোন সামরিকবাহিনী নিয়োগ করিতে পারিবে না।

[কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এই ঘোষণার মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন বিদেশের বহু স্থানে সামরিক ঘাঁটির প্রতিষ্ঠা দিয়াছে এবং সৈন্য-বাহিনী নিয়োগ করিয়াছে।][১]

মস্কো বৈঠক থেকে ইতালী সম্পর্কে একটি ঘোষণা দেওয়া হইল এবং তাতে ইতালী থেকে ফ্যাসিজমের বিলোপ সাধন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

মস্কো পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের উপসংহারে আর-একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা দেওয়া হইল এবং এই ঘোষণা চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিনের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইল জার্মান নৃশংসতা সম্পর্কে—'Declaration on German Atrocities'—জার্মানীর নৃশংসতা ও যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে বিচার ও দণ্ডদানের কথা ঘোষণা করা হইল।

ঘোষণায় বলা হইল যে, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট নানা মহল থেকে হিটলারী সৈন্যদল কর্তৃক অনুষ্ঠিত নৃশংসতা, হত্যাকাণ্ড এবং ঠাণ্ডা-মাথায় প্রাণহননের বহু সংবাদ সাক্ষ্যপ্রমাণসহ আসিতেছে। সুতরাং—

'…The three Allied Powers hereby solemnly declare…(that the guilty Germans) will be brought back, regardless of expcnse, to the scene of their crimes and judged on the spot by the people they have outraged. Let those who have hitherto not imbrued their hands with innocent blood beware lest they join the ranks of guilty, for most assuredly the three Allied Powers will persue them to the uttermost ends of the earth and will deliver them to their accusers in order that justice may be done.'[২]

অর্থাৎ (সংক্ষেপে) ত্রিশক্তির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হইতেছে যে, অপরাধীদিগকে কোন মতেই রেহাই দেওয়া হইবে না। অপরাধ অনুষ্ঠানের জায়গায় তাদের ধরিয়া

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৩৩।

২। The War—Louis Snyder, P. 401.

আনা হইবে এবং যাঁদের উপর তারা এই সমস্ত অত্যাচার করিয়াছে, তাঁদের দ্বারা অপরাধীদের বিচার করা হইবে। এই সমস্ত লোককে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য দরকার হইলে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সন্ধান করা হইবে।...

মস্কোর পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এবং এটা ছিল হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের বা চার্চিলের ভাষায়—'গ্রাণ্ড এ্যালেয়েন্স'-এর ইতিহাসে এক নূতন দিকচিহ্নের মত। এই বৈঠক প্রমাণ করিল যে, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে আন্তর্জাতিক পূর্ণ সহযোগিতা সম্ভব এবং তা কার্যকর। এই বৈঠকে সিদ্ধান্তগুলি কেবল ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনায় নূতন সমঝোতা ও ঐক্যের সৃষ্টি করিল না, গণতন্ত্রের ভিত্তিতে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি ও স্বস্তিকেও নিশ্চিত করিল। 'মস্কো সম্মেলন স্বাধীনতাকামী জনগণের পক্ষে নূতন প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া আনিল।'—মস্কোর প্রাভদায় এই মন্তব্য করা হইল ২রা নভেম্বর, ১৯৪৩।

* * *

মস্কো বৈঠকের সাফল্যে চার্চিল এবং রুজভেল্টও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। রুজভেল্টের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কারণ এই ঘটিয়াছিল যে, সম্মেলনে উপস্থিত কর্ডেল হালের কাছ থেকে তিনি এই মর্মে রিপোর্ট পাইয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় যুদ্ধের শেষে সোভিয়েট রাশিয়াও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিবে। ৩০শে অক্টোবর সম্মেলনের শেষদিন রাত্রে স্ট্যালিন যে বিরাট নৈশভোজের বা ডিনারের আয়োজন করিয়াছিলেন, সেখানে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হালকে সোজা-সুজি পরিষ্কার ভাষায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের কথা বলিয়া দিলেন। ডিনার টেবিলে স্ট্যালিন কর্ডেল হালের সঙ্গে ত্রিশক্তির মধ্যে সহযোগিতা এবং রুজভেল্ট ও চার্চিলের সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠক সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি কথার মাঝখানে 'বিস্মিত ও চমৎকৃত' কর্ডেল হালকে পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন যে, মিত্রশক্তি কর্তৃক জার্মানীর পরাজয়ের পর সোভিয়েট ইউনিয়নও জাপানকে পরাজিত করার জন্য যুদ্ধে যোগ দিবে। স্টালিন অনুরোধ করিলেন যে, কর্ডেল হাল যেন একথা প্রেসিডেণ্টকে জানাইয়া দেন।

স্ট্যালিন যখন হালকে এই সমস্ত কথা বলিতেছিলেন, তখন সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটোভকে আভেরিল হ্যারিম্যান ও এণ্টনি ইডেন পানপাত্র হাতে জাপানের প্রসঙ্গ নিয়া বলিলেন—'যেদিন জাপানের বিরুদ্ধে আমরা একত্রে যুদ্ধ করবো, সেদিনের স্মরণে আমরা এই সুরাপান করছি।' তখন মলোটোভ বলিলেন, 'কেন জাপানের বিরুদ্ধে লড়বো না ?—সানন্দেই লড়বো এবং সেই সময়ও আসছে।' এই কথার পর সকলে মিলিয়া তাঁদের গ্লাস উপুড় করিয়া সবটুকু মদ্য নিঃশেষে পান করিলেন।[১]

সুতরাং বিশেষভাবে রুজভেল্টের পক্ষে মস্কো বৈঠকের সাফল্য নিয়া আনন্দিত হওয়ার কারণ ছিল বৈকি ? মনে রাখা দরকার ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার বহু আগে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে স্ট্যালিন 'গোপনে' বা প্রাইভেট আলোচনায় যে কথা দিয়াছিলেন, ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল।

অর্থাৎ কোয়ালিশনের অংশীদার হিসাবে সোভিয়েট-রাশিয়া তার দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করিয়াছিল।

১। Churchill Roosevelt Stalin—Herbert Feis. P. 233-34.

ষষ্ঠ পর্ব

দশম অধ্যায়

কায়রোতে চিয়াং কাইশেক—তেহরান শীর্ষ সম্মেলন : কোয়ালিশনের রাজনীতি ও রণনীতি

মস্কোতে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন (অক্টোবর, তৃতীয় সপ্তাহ, ১৯৪৩) অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে যে অনুকূল প্রতিক্রিয়া ঘটিল, তার ফলে তিন বিশ্বনেতার মনে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার পথ আরও খুলিয়া গেল। চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের মধ্যে এই সময় যে সমস্ত পত্র বিনিময় হইল, তাতে এই তিন নেতার মধ্যে শীঘ্রই একটা শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হইল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট খুব হৃষ্টচিত্তে ও প্রচুর আশা নিয়া মার্শাল স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য খুব উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। অবশ্য জার্মানীকে চূড়ান্ত আঘাত হানিবার আগে ১৯৪৪ সালের সামরিক প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধনেরও প্রয়োজন ছিল।

'Roosevelt had the buoyant notion that he could form a warm personal relation with Stalin of the same sort that he had with Churchill, so that he might work with him in the same open and intimate way.'

'রুজভেল্টের এমন একটা প্রাণোচ্ছল ধারণা ছিল যে, তিনি স্ট্যালিনের সঙ্গে চার্চিলের মতই হৃদয়ের উত্তাপে ভরা ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবেন এবং তার ফলে তিনি খোলাখুলিভাবে এবং অন্তরঙ্গতার সহিত তাঁর সঙ্গে কাজ করিতে পারিবেন।'[১]

স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের এই আগ্রহ দেখিয়া বিখ্যাত মার্কিন গ্রন্থকার রবার্ট ফীজ অনুমান করিতেছেন যে, স্ট্যালিন সম্পর্কে রুজভেল্টের কেবল কৌতূহলই ছিল না, 'সপ্রশংস মনোভাব'ও ছিল। অধিকন্তু এই প্রস্তাবিত সাক্ষাতের পিছনে রুজভেল্টের কোন অহমিকা বা ক্ষমতালোলুপতা ছিল না, ছিল ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের গভীর আগ্রহ এবং তার জন্য স্ট্যালিন ও রাশিয়ার সঙ্গে একত্র কাজ করার ইচ্ছা। শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যেই সোভিয়েট ডিক্টেটরকে সুযোগ দিতে হইবে আমেরিকাকে আরও ভালো করিয়া জানার জন্য ও বিশ্বাস করার জন্য—রুজভেল্টের মনের তলায় এই ধরনের চিন্তা ছিল।

এই প্রসঙ্গে আর-একজন মার্কিন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, চার্চিলকে বাদ দিয়াই রুজভেল্ট স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ইতিপূর্বেই মস্কোতে একা স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সুতরাং রুজভেল্ট

১। হারবার্ট ফীজ—পৃষ্ঠা ২৩৯।

এবার একাকী স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। কিন্তু চার্চিল যখন একথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি এই মর্মে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন যে, তাঁকে বাদ দিয়া রুজভেল্টের উচিত নয় স্ট্যালিনের সঙ্গে একা সাক্ষাৎ করা। বরং "সমস্ত পৃথিবী আশা করিতেছে" যে, তিন প্রধানের একত্র বৈঠক বসিবে। আর যদি তা না হয়, তবে, বৃটেনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়া শত্রুপক্ষ দারুণ প্রোপাগাণ্ডা চালাইবে এবং "অনেকেই আতংকিত ও বিভ্রান্ত হইবে।" কিন্তু এতৎসত্ত্বেও রুজভেল্ট স্ট্যালিনের সঙ্গে একাকী সাক্ষাতের জন্য জেদ প্রকাশ করিতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্ট্যালিনই তিন প্রধানের বৈঠকের প্রস্তাব করিয়া এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলেন।[১]

* * *

মস্কোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়েই তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাব চলিতেছিল। কিন্তু গোল বাধিল তিন বিশ্বনেতার মিলনের স্থান নিয়া। ২০শে অক্টোবর স্ট্যালিন এক বিস্তৃত বার্তায় রুজভেল্টকে জানাইলেন যে, যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়া তিনি এত ব্যস্ত আছেন যে, তাঁর পক্ষে মস্কো ছাড়িয়া খুব বেশী দূরে যাওয়া সম্ভব নয়, বড় জোর তিনি তেহরান পর্যন্ত যাইতে পারেন। তেহরানের নিরাপত্তা, গোপনীয়তা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে ভালো হইবে বলিয়া তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু রুজভেল্ট জানাইলেন যে, তেহরান তাঁর পছন্দ নয়, সেখানে নানা অসুবিধা আছে। তিনি বরং বসরাতে মিলিত হইতে রাজী আছেন। যদি তিনি বসরাতে মিলিত হইতে সম্মত থাকেন, তবে, রুজভেল্টকে আমেরিকার বাইরে যাইতে হইবে ৬০০০ মাইল, আর স্ট্যালিনকে যাইতে হইবে মাত্র ৬০০ মাইল! অবশ্য স্ট্যালিন যদি মনে করেন, তবে, কর্তব্যের খাতিরে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শান্তিপূর্ণ পৃথিবী নির্মাণে তিনি আরও দশগুণ পথ অতিক্রম করিতে রাজী আছেন।

কিন্তু স্ট্যালিন তাঁর মত পরিবর্ত করিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ১৯৪৪ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত শীর্ষ বৈঠক স্থগিত থাকুক, সেই সময় আলাস্কার ফেয়ারব্যাঙ্কসয়ে বরং তাঁর পক্ষে মিলিত হওয়ার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু মার্কিনপক্ষ এতদিন পর্যন্ত দেরী করিতে রাজী ছিলেন না।

ওদিকে চার্চিল খুব অস্থির হইয়া উঠিলেন। স্ট্যালিতের সঙ্গে অবিলম্বে সাক্ষাৎ হোক বা-না হোক রুজভেল্ট এবং তাঁর সামরিক পরামর্শদাতাদের সঙ্গে চার্চিল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মিলিত হইতে চাহিলেন। ফ্রান্সে অবতরণ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়া বিস্তৃত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জরুরী তাগিদ চার্চিল অনুভব করিলেন। এই সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হঠাৎ স্থির করিলেন যে, চিয়াং কাইশেকের সঙ্গেও তাঁর বৈঠক ও সাক্ষাৎ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

স্ট্যালিনের সঙ্গে বৈঠকের স্থান নিয়া আরও কিছু বার্তা বিনিময়ের পর শেষ পর্যন্ত স্থির হইল যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও প্রধানমন্ত্রী চার্চিল প্রথমে কায়রোতে মিলিত হইবেন এবং তারপর তাঁরা তিনজনে ২৬শে নভেম্বর নাগাদ তেহরানের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিবেন।

১। After Victory—William Newmann. P. 115.

* * *

২২শে নভেম্বর, ১৯৪৩, কায়রোতে যে শীর্ষ সম্মেলন শুরু হইল, তাতে জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক এই সর্বপ্রথম চার্চিল-রুজভেল্টের সঙ্গে একত্র হইলেন। কিন্তু এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এর কোন গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় নাই। সারা দুনিয়াতেই গুজব ছড়াইয়া পড়িল যে, চিয়াং কাইশেক-চার্চিল-রুজভেল্ট কায়রোতে মিলিত হইতেছেন।[১]

কিন্তু কায়রোর শীর্ষ সম্মেলনে চীনের কুওমিণ্টাং সরকারের প্রধান জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেকের উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কেন না, এতদিন চিয়াং-শাসিত জাতীয়তাবাদী চীনের আন্তর্জাতিক জগতে তেমন কোন মর্যাদা ছিল না। বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া তার প্রতি বিরূপ ছিল। কিন্তু মস্কোর পররাষ্ট্র মন্ত্রী-সম্মেলনে অক্টোবরের (১৯৪৩) শেষ সপ্তাহে যে চতুঃশক্তির ঘোষণা দেওয়া হইল এবং যে ঘোষণায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা হইল, সেই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলের চীন ছিল অন্যতম স্বাক্ষরকারী। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া চীনের স্বাক্ষরদানের অত্যন্ত বিরোধী ছিল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট—তথা মার্কিন নেতাগণ চীনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্ডেল হাল সোভিয়েট বিরোধিতার মুখে চীনা প্রতিনিধিকে সম্মেলনে গ্রহণের জন্য খুব জেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলে, মস্কো বৈঠকে চীন সমান অধিকার ও মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্ররূপে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে গৃহীত হইল। চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিংয়ে যখন এই খবর পেঁছিল, তখন সেখানে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল এবং ব্যক্তিগতভাবে চিয়াং কাইশেক অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন। কেন না, চতুঃশক্তির ঘোষণায় স্বাক্ষর এবং কাইরোর শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ, যুগপৎ এই দুই ঘটনায় চিয়াং কাইশেকের বুক গর্বে ভরিয়া উঠিল। এতদিন পর তিনি বিশ্বনেতৃত্বের মর্যাদায় উন্নীত হইলেন—চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের মত তিনিও বিশ্বনেতৃত্বের সমান অংশীদার হইলেন। কায়রোতে তাঁর উপস্থিতি সেই মর্যাদারই নূতন স্বীকৃতির মত।[২]

চুংকিং থেকে কায়রো যাত্রার আগে রুজভেল্টের একজন বিশেষ দূত চিয়াং কাইশেকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে কায়রো-তেহরান বৈঠকে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সহযোগিতার প্রশ্ন উঠে এবং চিয়াং তখন নিজের মর্যাদার কথা তুলিতে ভুলিলেন না ঃ

"Chiang expressed his willingness to co-operate with Russia, but stipulated for dignity's sake that Roosevelt must meet with him before meeting with Stalin. It was so arranged ; after conferring with Chiang at Cairo, Roosevelt and Churchill would move on to meet with Stalin···"

অর্থাৎ চিয়াং রাশিয়ার সহযোগিতা করিতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু

১। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৪০১।

"আত্মসম্মানের" খাতিরে এই শর্ত করিলেন যে, স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে রুজভেল্টকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সেই অনুসারে ব্যবস্থা হইল যে, চিয়াং-এর সঙ্গে কায়রোতে আলোচনার পর রুজভেল্ট ও চার্চিল স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করিবেন।[১]

চিয়াং কাইশেকের এই আত্মাভিমান লক্ষ্য করার মত। শীর্ষ বৈঠকে তিনি নূতন যোগ দিতেছেন। সুতরাং তাঁকে দেখার জন্য সকলেরই গভীর কৌতূহলের সৃষ্টি হইল। কিন্তু এখানেও তাঁর আত্মাভিমান আহত হইল। কেন না, নিরাপত্তার খাতিরে কায়রো বিমানবন্দরে তাঁর উপস্থিতির সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছিল। অধিকন্তু তাঁকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য রুজভেল্ট বা চার্চিল কেউ উপস্থিত ছিলেন না :

His arrival at the airport, unannounced for security reasons, was not met by Roosevelt or Churchill, with wounding result to the Generalissimo's pride"[২]

রুজভেল্ট এই প্রথম 'একজন খাঁটি প্রাচ্যবাসী'কে—'The first real oriental'—দেখিলেন। বৃটিশ সেনাপতি স্যার অ্যালান ব্রুক চিয়াং কাইশেকের মুখে "ধূর্ত শেয়ালের" সাদৃশ্য দেখিলেন। আর চার্চিল তাঁকে দেখিলেন "একজন শান্ত, গম্ভীর ও দক্ষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন" নায়করূপে।[৩]

* * *

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দূরবর্তী আমেরিকা থেকে কায়রো অভিমুখে যাত্রা করিলেন ১৩ই নভেম্বর যুদ্ধজাহাজ 'আইওয়া' যোগে। তিনি ওখানে আসিয়া অবতরণ করিলেন ২০শে নভেম্বর এবং সেখান থেকে বিমান যোগে কায়রো পেঁৗছিলেন।

আর চার্চিল সদলবলে-প্রায় ৫০০ লোকসহ "রিনাওউন" জাহাজযোগে মস্কো অভিমুখে যাত্রা করিলেন ১২ই নভেম্বর এবং সেখান থেকে আলেকজেন্দ্রিয়া পেঁৗছিলেন ২১শে নভেম্বর।

রুজভেল্ট কায়রোতে পেঁৗছিয়াই স্ট্যালিনকে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি তেহরানে স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন এবং সপ্তাহের শেষেই তেহরানে যাইবেন।

বৃটিশ-মার্কিন নেতারা কায়রোতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আগেই কোন দল পাকাইতেছে, এমন কোন সন্দেহ যাতে স্ট্যালিনের মনে দেখা দিতে না পারে, তার জন্যই রুজভেল্ট কায়রোতে পেঁৗছিয়াই স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যগ্রতার কথা জানাইয়া দিলেন।[৪]

কিন্তু চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে রুজভেল্টের জরুরী পরামর্শের প্রয়োজন ছিল। কারণ, চীনের অবস্থা সবদিক দিয়াই কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল। কার্যত চীন বহির্জগৎ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল—একমাত্র ভারতবর্ষ থেকে 'হিমালয়ের কুঁজের' উপর দিয়া বিমানযোগে সরবরাহ দেওয়া ছাড়া। কিন্তু হিমালয়ের উপর দিয়া যোগাযোগ রক্ষা করা কিংবা নিয়মিত সরবরাহ দেওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। ফলে, চিয়াং কাইশেক ও চৈনিক গভর্নমেন্ট নিজেদেরকে উপেক্ষিত মনে করিতেন। তাঁরা

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৯৭। ২। এবং
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪০১। ৪। হার্বার্ট ফীজ, পৃষ্ঠা ২৪৫।

মনে করিতেন যে, তাঁরা শক্তিশালী জাপানের বিরুদ্ধে এত দুঃখ কষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করিয়া লড়াই চালাইতেছেন, অথচ ফ্যাসি-বিরোধী কোয়ালিশনের অন্যতম অংশীদার হিসাবে মিত্রপক্ষের নিকট থেকে উপযুক্ত সাহায্য কিংবা স্বীকৃতি পাইতেছেন না।

অন্যদিকে দুর্দশাগ্রস্ত চীনের সামরিক নেতৃত্বও দুর্বল ও চক্রান্তমূলক ছিল। তাঁরা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, বড় রকমের কোন সাহায্য না পাইলে জাপানের বিরুদ্ধে চীনে বা বর্মাতে কোন আক্রমণাত্মক অভিযান চালানো যাইবে না। ফলে, মার্কিন সেনাপতি মহলেও এই ধারণার সৃষ্টি হইল যে, চীনের গভর্নমেণ্ট বা চীনের সমরদপ্তর এই যুদ্ধে উপযুক্ত কোন অংশ গ্রহণ করিবেন না।

'চীনের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। মুদ্রাস্ফীতি বল্গাহীন হইয়া উঠিয়াছিল, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং বণ্টনব্যবস্থা শোচনীয় ছিল। দুর্নীতি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতরভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছিল, এমন কি চীনা গভর্নমেন্টের মধ্যেও দুর্নীতি গভীর হইতেছিল। সমালোচক ও সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধে—কেবল কমিউনিস্ট নয়, নরমপন্থী সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে পর্যন্ত সরকারী দমননীতি ক্রমশঃ কঠোর হইতেছিল। চীনে অবস্থিত সমস্ত মার্কিন সামরিক ও অসামরিক অফিসার মহল রিপোর্ট দিতেছিলেন যে, গভর্নমেণ্ট জনসমর্থন হারাইয়া ফেলিতেছেন।'[১]

চারিদিকের এই অসহায় অবস্থার জন্য চীন সম্পর্কে এই ভয় দেখা দিল যে, চুংকিং গভর্নমেণ্ট যুদ্ধ থেকে সরিয়া পড়িতে পারেন। কারণ, তাঁরা আর যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম নন, পরাজিতের মনোভাব তাঁদের পাইয়া বসিয়াছে, অথবা উপেক্ষা ও অনাদরের ফলে তাঁরা হতাশায় ভাঙিয়া পড়িয়াছেন।

চীনের এই অবস্থার জন্যই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বিশেষভাবে জেনারেলেসিমো চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করিতে চাহিলেন। পৃথিবীব্যাপী রণনীতির প্রয়োজনে চীনের অবস্থান কি, কেনই বা উপযুক্ত সাহায্য দেওয়া যাইতেছে না, কিভাবে সামরিক পরিকল্পনার দ্বারা চীনকে রিলিফ দেওয়া যাইতে পারে এবং কি ভাবেই বা তার ক্ষীয়মান নৈতিক শক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটানো যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে চাহিলেন রুজভেল্ট।

এশিয়ার প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী-নেতা হিসাবে চিয়াং কাইশেকের প্রতি চার্চিলের মনোভাব সদয় ছিল বটে এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি চিয়াং-এর একজন গুণগ্রাহীও ছিলেন, কিন্তু আমেরিকানদের মত চিয়াং বা চীন সম্পর্কে তাঁর খুব বড় রকমের শ্রদ্ধা ছিল না। আমেরিকানরা চিয়াংকে "নূতন এশিয়ার উদ্‌গাতা" বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁকে পৃথিবীর একটা শক্তির স্তম্ভ বলিয়াও গণ্য করিতেন বটে, কিন্তু চার্চিলের মতে এগুলি ছিল চিয়াং বা চীন সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণা মাত্র। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আমন্ত্রণে চিয়াং কাইশেক যখন কায়রোতে আসিয়া হাজির হইলেন এবং চার্চিল ও রুজভেল্টের সাক্ষাৎ আলোচনার আগেই চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে রুজভেল্টের বৈঠক শুরু করিলেন, তখন চার্চিল ও বৃটিশ সেনানীমণ্ডলী রুজভেল্টের আচরণে অসুখী হইলেন। কারণ, তাঁদের আশঙ্কা হইল যে, রুজভেল্ট হয়তো মহাযুদ্ধে

১। হার্বার্ট ফীজ, পৃষ্ঠা—২৪৭।

চীনের ভূমিকা সম্পর্কে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়া এমন সমস্ত কথা দিয়া বসিবেন, যার ফলে ইউরোপ খণ্ডে যুদ্ধের পরিকল্পনা মার খাইয়া যাইতে পারে।[১]

চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে আলোচনা ও তাঁর প্রতি এই অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ সম্পর্কে চার্চিল তাঁর বিরক্তির কথা গোপন করেন নাই। তিনি তাঁর মহাযুদ্ধের ইতিহাসে পরিষ্কার লিখিয়াছেন—

'বৃটিশ ও মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর মধ্যে আলোচনা ও কথাবার্তার প্রস্তাব চীনা কাহিনীর জন্য ব্যাহত হইল। এই কাহিনী দীর্ঘ, জটিল এবং গুরুত্বহীন ছিল। চীন-ভারত-রণক্ষেত্র সম্পর্কে প্রেসিডেণ্টের মতামত অতিরঞ্জিত ছিল, তবু তিনি অবিলম্বেই জেনারেলেসিমোর সঙ্গে দীর্ঘ সম্মেলনে মগ্ন হইলেন।'

ফলে, চার্চিল যে প্ল্যান করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁরা তেহরান বৈঠক থেকে ফিরিয়া না-আসা পর্যন্ত চিয়াং কাইশেক ও তাঁর পত্নীকে "পিরামিডের দৃশ্য উপভোগ করিতে" পাঠাইবেন, সেই পরিকল্পনা একেবারে ভেস্তে গেল। তার ফলে এই দাঁড়াইল যে, কায়রোতে চীনের প্রশ্নটাই কর্মতালিকায় প্রথম স্থান গ্রহণ করিল, যদিও ওটার স্থান ছিল একেবারে শেষের দিকে।[২]

রুজভেল্ট ও চিয়াং কাইশেক উত্তর ব্রহ্ম অভিযান এবং তাতে সহায়তাদানের জন্য দক্ষিণ ব্রহ্ম ও বঙ্গোপসাগর থেকে নৌ-অভিযানের যে পরিকল্পনা করিলেন, তার তীব্র বিরোধিতা করিলেন। চার্চিলের মতে ব্রহ্ম-অভিযান জল-জঙ্গল-পাহাড় ইত্যাদির জন্য কষ্টকর ছিল এবং দক্ষিণ ব্রহ্মে সমুদ্রপথের অভিযানের জন্য নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও মালবাহী জাহাজ ইত্যাদির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আগামী মে মাসে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে গেলে ব্রহ্মদেশে এই সমস্ত রণসম্ভার ও সামরিক শক্তি নিয়োগ করা সম্ভব হইবে না। বিশেষতঃ অবতরণের নৌকা বা ল্যাণ্ডিং ক্রাফটের ভয়ানক টানাটানি ছিল—চার্চিল এই ধরনের বহু যুক্তি দেখাইলেন এবং দাবী করিলেন যে, বর্মা অভিযানের বদলে সিঙ্গাপুর, সুমাত্রা, হংকং কিংবা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযান জাপানকে কাবু করার পক্ষে অনেক বেশী কার্যকর ও ফলপ্রসূ হইবে।

চার্চিলের বৃটিশ পক্ষের আপত্তির জন্য চীন-ব্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গনের পরিকল্পনা অসমাপ্ত রাখিয়াই রুজভেল্ট তেহরানে গিয়া তিন প্রধানের বৈঠকে একত্র হইলেন এবং সেখানে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা স্থির হওয়ায় এবং স্ট্যালিন কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের সংকল্প ব্যক্ত হওয়ায়, বর্মা অভিযানের চিয়াং-রুজভেল্ট পরিকল্পনা বাতিল হইয়া গেল। তবে, চিয়াং কাইশেককে তার বদলে হিমালয়ের কুঁজের উপর দিয়া প্রভূত বিমান সাহায্যের ও সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

কায়রো বৈঠকে সোভিয়েট রাশিয়া যোগ দেয় নাই—যদিও রুজভেল্ট স্ট্যালিনের বদলে অন্ততঃ তাঁর একজন প্রতিনিধিকে (মলোটোভ্) চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মলোটোভ কায়রো বৈঠকে যান নাই। কেননা, এই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল জাপান, দূরপ্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া তখন পর্যন্ত সরকারীভাবে নিরপেক্ষ ছিল।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৪৭।
২। চার্চিল—পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৯-৯০।

কিন্তু চিয়াং কাইশেক সম্পর্কে রুজভেল্টের এত গরজ কেন ছিল এবং কেনই বা তিনি কায়রো বৈঠকে চীনকে নিয়া এত মাথা ঘামাইলেন ?—এর মূল কারণ এই যে, জাপানকে পরাজিত করা মার্কিন কূটনীতি ও রণনীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং এই বিষয়ে চীনের মূল ভূ-খণ্ডের সহযোগিতা পাওয়া অপরিহার্য ছিল। (তখন পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতা পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা ছিল না।) সুতরাং জাপানের বিরুদ্ধে অগ্রগতির অভিযানে চীনের ভূমিকা কি ধরনের হইবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিরুদ্ধে বৃটেনের সম্ভাব্য অভিযানই বা কি রূপ নিবে, এই সমস্ত নির্দিষ্টরূপে জানার একান্ত প্রয়োজন ছিল। সুতরাং আমেরিকা চাহিতেছিল দূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট রণনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে। অতএব চীনের ভূমিকা গুরুত্বসম্পন্ন ছিল। জন্ এরম্যান লিখিয়াছেন :

'The most urgent necessity here, was to define the role of China in the approach to Japan which in turn likely to depend on British action in South-East Asia. The Americans therefore wished to discuss operations in that theatre before going on to Teheran…'—[১]

তেহরানের বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগেই রুভেল্ট চাহিতেছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিতে। কিন্তু কায়রো বৈঠকে বৃটেনের মতলব ছিল অন্য প্রকারের। চার্চিলের মাথায় তখনও ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক দায়িত্বের কথা। কোয়েবেক সম্মেলনে ফ্রান্সে অবতরণ নিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তার কোন সংশোধন করা যায় কি না, এই চিন্তা ছিল বৃটিশ পক্ষের। কায়রো বৈঠকে সোভিয়েট-পক্ষ উপস্থিত ছিলেন না। অতএব সেই সুযোগে চার্চিল চাহিয়াছিলেন আমেরিকানদের ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গন এবং "ওভার লর্ড"-এ (ফ্রান্সে প্রস্তাবিত অবতরণ) মধ্যে সম্পর্কের পুনর্বিবেচনা করিতে। মার্কিন সেনানামণ্ডলীর সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বৃটিশ পক্ষ অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন।

কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যে চিয়াং কাইশেক কায়রোতে উপস্থিত হইয়া চার্চিলের মতলব মাটি করিয়া দিলেন। এজন্য চীন সম্পর্কে চার্চিল এতটা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

তথাপি দূরপ্রাচ্যের রাজনীতি নিয়া আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে কায়রো বৈঠকে যে আলোচনা হইল, তাতে কোন সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না। রুজভেল্ট চিয়াং কাইসেককে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে যে সহায়তা দিতে চাহিয়াছিলেন, চার্চিলের আপত্তির জন্য তা গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। কায়রো বৈঠকে অবশ্য মিত্র-পক্ষের ইউরোপীয় রণনীতি নিয়াও কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না। কেননা, সেই দায়িত্ব গিয়া পড়িল তেহরানে তিন বিশ্বনেতার শীর্ষ সম্মেলনের উপর।

চার্চিল বর্মার বিরুদ্ধে চীন-মার্কিন অভিযানের বিরোধী ছিলেন কেন? একথা সর্বজনবিদিত যে, চার্চিল ছিলেন গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী এবং এই যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষাই ছিল তাঁর আশু লক্ষ্য। কিন্তু চীন-মার্কিন যৌথ উদ্যোগে ব্রহ্মদেশ যদি

১। The Anti-Hitler Coalition—Victor Issraeljan, P. 215.

জাপানী গ্রাস থেকে মুক্তি পায়, তা হলে বৃটিশ সাম্রাজ্য-স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে। চার্চিল অবশ্যই জাপানীদিগকে বর্মা মুল্লুক থেকে তাড়াইতে চান। কিন্তু চীনের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপনের জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে বেশী গরজ ছিল বৃটিশ ইম্পিরীয়েল গরিমা উদ্ধারের জন্য। কিন্তু যদি চীন বা আমেরিকার চেষ্টায় বর্মার মুক্তি ঘটে, তবে বৃটিশ শক্তির বাহাদুরি প্রমাণিত হইবে না। বিশেষতঃ চার্চিলের চিন্তায় ব্রহ্মদেশ ছিল সাম্রাজ্যের একটা দূরবর্তী ঘাটি মাত্র—বৃহত্তর রণনীতির অন্তর্ভুক্ত কোন এলাকা নয়। বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক শেরউড্ চার্চিলের মনোভাবের সমালোচনা করিয়া অনুরূপ মর্মে লিখিয়াছেন:

'...he (Churchill) considered Burma solely as an outpost of the Empire, rather than as an area of strategic importance. He wanted to drive the Japanese out of it, not so much for the purpose of gaining access to China as to avenge a mortal insult to imperial prestige, and he did not relish the idea that the Americans or more specially the Chinese should have any share in the credit for its liberation'—[১]

বার্মা সম্পর্কে চার্চিলের যে সাম্রাজ্যবাদীয় মনোভাবের কথা মার্কিন গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই মনোভাবেরই রণনৈতিক প্রতিফলন দেখা যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে। কারণ, এই ক্ষেত্রে চার্চিল চাহিতেছিলেন আগে সিঙ্গাপুর ও হংকং-এ বৃটিশ কর্তৃত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে এবং তাঁর মতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সব চেয়ে গরুত্বপূর্ণ এলাকাই ছিল ওই দুইটি। কিন্তু এই বিষয়ে মার্কিন সেনাপতিদের মধ্যেও মতভেদ ছিল। মার্কিন নৌ-সেনাপতি এ্যাডমিরাল কিং এবং এ্যাডমিরাল নিমিৎস্ চার্চিলের সঙ্গে মোটামুটি একমত ছিলেন বটে, কিন্তু জেনারেল মার্শাল, জেনারেল আর্নল্ড এবং জেনারেল ম্যাক আর্থার ও স্টিলওয়েল ভিন্নমত পোষণ করিতেন। তাঁদের মতে কেবল জাপানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করিয়া দিয়া তাকে পরাভূত করা যাইবে না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে—চীনে, ইন্দোচীনে ও বার্মাতে এবং ফিলিপিন্সে জাপানী সৈন্যেরা থাকিবে, ততক্ষণ তারা স্বতন্ত্রভাবে দরকার মত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারিবে—[২]

* * *

কিন্তু কায়রো সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও চীন এই ত্রিশক্তির আলোচনা ও পরামর্শের পর এমন একটি যুক্ত ঘোষণা প্রচারিত হইল, যার গুরুত্ব কেবল চীনের পক্ষেই উল্লেখযোগ্য ছিল না, যুদ্ধোত্তর পৃথিবী বিশেষভাবে দূরপ্রাচ্যের পক্ষেও গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক ছিল। কারণ, এই ঘোষণার দ্বারা জাপানকে তার সাম্রাজ্য ও উপনিবেশসমূহ থেকে বঞ্চিত করা হইল।

ঘোষণাটির মর্ম এই:

'জাপানের আগ্রাসনকে দমন ও সংযত করার উদ্দেশ্যেই তিন বৃহৎ মিত্রশক্তি এই যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন। তাঁদের নিজেদের লাভের জন্য কোন লোভ নাই এবং

১। রবার্ট ই. শেরউড্—পৃষ্ঠা—৭৭২।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৭৭৩।

কোন ভূমি বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও তাঁদের নাই। কিন্তু ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে যে সমস্ত দ্বীপ দখল বা কাড়িয়া নিয়াছে, সেগুলি থেকে জাপানকে বিচ্যুত করাই তিন শক্তির মূল উদ্দেশ্য। চীনের কাছ থেকে জাপান যে সমস্ত ভূখণ্ড অপহরণ করিয়াছে, যেমন—মাঞ্চুরিয়া, ফরমোজা এবং পেসকাডোর—সেই সমস্তই চীন প্রজাতন্ত্রকে ফেরত দেওয়া হইবে। জাপান অন্যান্য যে সমস্ত দেশ হিংসা ও লোভের দ্বারা কাড়িয়া নিয়াছে, সেই সমস্ত স্থান হইতেও তাকে বিতাড়িত করা হইবে। পূর্বোক্ত তিন বৃহৎ শক্তি কোরিয়ার জনসাধারণের দাসত্বের কথা স্মরণে রাখিয়া এই দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করিতেছেন যে, যথাসময়ের কোরিয়া শৃঙ্খলমুক্ত ও স্বাধীন হইবে।'

বলা বাহুল্য যে, এই ঐতিহাহিক ঘোষণা-বাণী তেহরানে সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর প্রকাশ্যে প্রচার করা হইয়াছিল। নিঃসন্দেহে এই ঘোষণার গুরুত্ব অসাধারণ ছিল। কেননা, দূর প্রাচ্যের যুদ্ধে বৃটিশ ও মার্কিন নীতির মূল উদ্দেশ্য কি, তা এই ঘোষণায় পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইল। জাপানী সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের অবসান, চীনের হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ এবং কোরিয়ার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা—এই তিনটি প্রধান বিষয়ই ছিল ইতিহাসের নূতন দিগন্ত উন্মোচনের মত। এর দ্বারা পররাজ্য গ্রাসকে, ঔপনিবেশিক শাসনকে এবং পরাধীনতাকে কার্যতঃ অস্বীকার করা হইল। কিন্তু মিত্রপক্ষ কায়রো থেকে হঠাৎ এই ঘোষণা দিলেন কেন? তাঁদের কি উদ্দেশ্য ছিল? যদিও চার্চিল নিজে সাম্রাজ্য-প্রেমিক ছিলেন এবং অতলান্তিক সনদকে এশিয়ার পক্ষে প্রযোজ্য নয় বলিয়া ঘোষণা দিয়াছিলেন, তবু মনে রাখা দরকার কায়রোর ঘোষণার পিছনে সোভিয়েট রাশিয়ার বা স্ট্যালিনের অনুমোদন এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের (যিনি সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না) স্বাক্ষর ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে মিত্রপক্ষের চোখের উপর প্রমাণিত হইয়া গেল যে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার দ্বারা যুদ্ধ জয় করা সম্ভব নয়। এশিয়ার দেশগুলি যে অতিদ্রুত জাপানের হাতে পরাজয় স্বীকার করিল, তার অন্যতম কারণ ঔপনিবেশিক পরাধীনতা এবং এই মহাযুদ্ধের ফলে সেই পরাধীনতার বিরুদ্ধে এশিয়ার দেশগুলিতে স্বাধীনতার আন্দোলন নূতন জোয়ার আনিল। মিত্রশক্তির কায়রো ঘোষণায় এশিয়ার এই নব জাগরণ ও নূতন মুক্তির দাবীকে কার্যতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। তার প্রমাণ কোরিয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতি। এশিয়াতে যে আর পুরাতন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা চলিবে না এই সত্য কায়রো থেকে প্রচারিত দলিলে স্পষ্টরূপে ধরা পড়িল।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর-একটি তিক্ত সত্যও অস্বীকার করা যায় না। কায়রো ঘোষণার অন্তরালবর্তী সুর যাহাই হোক না কেন, জাপানকে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ-চ্যুত করার পিছনে বৃটেন ও আমেরিকার একটি গূঢ় মতলব ছিল বলিয়া সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কেন না, পূর্ব পৃথিবীতে জাপানই ছিল একমাত্র স্বাধীন ও শক্তিশালী দেশ, যার দোর্দণ্ড প্রতাপে বৃটেন ও আমেরিকা দূরপ্রাচ্যে ম্রিয়মান ছিল। বাণিজ্যে, রাজ্য বিস্তারে ও নৌ-শক্তিতে জাপান ইঙ্গ-মার্কিনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সুতরাং সেই জাপানকে দুর্বল করিতে পারিলে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বৃটেন ও আমেরিকা লাভবান হইবে, এমন একটা মতলব কায়রো ঘোষণার পিছনে ছিল না, এমন কথা হলপ করিয়া বলা যায় না। বিশেষতঃ জাপান ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী-ওলন্দাজ পশ্চিমের

সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই দূরবর্তী এশিয়াতে সদম্ভে চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছিল। সুতরাং সেই জাপানকে জব্দ করার চেষ্টা পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

*   *   *

চার্চিল, রুজভেল্ট, স্ট্যালিন—তিন প্রধান ইরানের রাজধানী তেহরানে মিলিত হইলেন ১৯৪৩ সালের ২৮শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত। সামরিক ও রাজনৈতিক বিভাগের বহু বিশিষ্ট প্রতিনিধিসহ চার্চিল তেহরান বৈঠকে যোগ দিলেন। রুজভেল্টের দলেও কম লোক ছিলেন না। মোট প্রায় ৭০ জন। তিনি তাঁর প্রিয় ফিলিপিনো পাচকদেরকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। কারণ, এই পাচকদের রান্না রুজভেল্টের খুব পছন্দসই ছিল। কিন্তু স্ট্যালিন সাদামাঠা গোছের। তাঁর সঙ্গে মার্শাল ভরোশিলোভ ও মলোটোভ এবং সামান্য কয়েকজন লোক ছিলেন।

কিন্তু তেহরানে তিন বিশ্বনেতার নিরাপত্তার প্রশ্নটি বিশেষ ভাবনার কারণ ছিল। কারণ, তেহরানে তখন শত্রুপক্ষের বহু চর ছিল। চার্চিল লিখিয়াছেন যে, তাঁর তেহরানের বিমান ঘাঁটিতে নামিবার পর বৃটিশ দূতাবাসে যাওয়ার জন্য যে তিন মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা অত্যন্ত কাঁচা ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং যে কোন দুইজন বা তিনজন দুষ্ট লোক যদি বোমা বা পিস্তল লইয়া আক্রমণ করিত, তবে আত্মরক্ষার কোন উপায়ই ছিল না। তবে বৃটিশ দূতাবাসে (লিগেশন) বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের কড়া পাহারার বেষ্টনী ছিল। সোভিয়েট দূতাবাস ও বৃটিশ দূতাবাস পরস্পরের একেবারে সংলগ্ন ছিল। ফলে, এই দুই দূতাবাসের ইঙ্গ-ভারতীয় এবং রুশ প্রহরী ও সৈন্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধের দিনে যে সতর্কতার প্রয়োজন তার জন্য বৃহৎ একদল রুশ সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছিল এবং এই দুই দূতাবাস একত্রে মিলিয়া যেন প্রহরী বেষ্টিত একটি পৃথক এলাকায় পরিণত হইল। কিন্তু মার্কিন দূতাবাস বৃটিশ ও সোভিয়েট দূতাবাস থেকে অন্ততঃ মাইলখানেক দূরে ছিল এবং রুজভেল্ট তাঁর দলবলসহ এই মার্কিন দূতাবাসেই প্রথম উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এর ফলে দেখা গেল যে, যদি সম্মেলনে তিন নেতার উপস্থিত থাকিতে হয় এবং দিনে অন্ততঃ দুই-তিনবার যাতায়াত করিতে হয়, তবে, তাঁদেরকে তেহরানের সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া চলিতে হইবে, যেটা বিপদের ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এদিকে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলোটোভ একদিন আগেই তেহরানে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি সোভিয়েট গোয়েন্দাদের সংগৃহীত এক ষড়যন্ত্রের কাহিনী উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেন যে, তিন প্রধানের একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করার এক বিষম চক্রান্ত হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে, যদি তেমন কিছু ঘটে, তবে, একটা ভয়ানক কাণ্ড হইবে। সুতরাং স্ট্যালিনের পক্ষে থেকে মলোটোভ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের (২৮শে নভেম্বর, রবিবার, তিনি তেহরানে পৌঁছিয়াছিলেন) নিকট আবেদন করিলেন তাঁকে সোভিয়েট দূতাবাসে উঠিয়া আসিবার জন্য। চার্চিল এই আবেদন অত্যন্ত জোরালোভাবে সমর্থন করিলেন।[১]

সোভিয়েট দূতাবাস অত্যন্ত বৃহৎ ছিল। অন্য দূতাবাসের চেয়ে অন্ততঃ ৩।৪ গুণ বড় ছিল এবং প্রচুর সৈন্য ও গোয়েন্দা পুলিশে ভর্তি ছিল, রুজভেল্টের অবস্থানের

১। দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার—চার্চিল, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৩।

জন্য সুবৃহৎ জায়গাসহ আরামদায়ক ব্যবস্থা হইয়াছিল। চার্চিলও তাঁর দূতাবাসে যথেষ্ট আরামেই ছিলেন। যদিও তিনি সেই সময়টা কিছুটা সর্দিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক লর্ড মোরানের যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না।

রুজভেল্টের সোভিয়েট দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ ও নিরাপত্তার প্রশ্ন সম্পর্কে শেরউড্ লিখিয়াছেন যে, স্ট্যালিন রুজভেল্টকে আমন্ত্রণ জানাইলেন সোভিয়েট দূতাবাসের একটি পৃথক ভিলাতে তাঁর অবস্থানের জন্য যেখানে পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত ছিল। এই নিরাপত্তার ব্যবস্থার কথা প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর পার্টির লোকেরা কখনও ভুলিতে পারেন নাই। কারণ, যে সমস্ত ভৃত্য তাঁদের বিছানা তৈয়ার করিত, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিত, তারা সকলেই ছিল রাশিয়ার বিখ্যাত গুপ্ত গোয়েন্দা ও রাজনৈতিক পুলিশ এন. কে. ভি. ডি.'র (N. K. V. D.) লোক। তাদের পরিধানের সাদা কোট ও প্যান্টের পকেটের দিকে মন দিয়া তাকাইলেই বুঝা যাইত যে, পকেটগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে। কারণ, সেখানে অস্ত্র লুক্কায়িত ছিল। হোয়াইট হাউসের গোয়েন্দাদের বড় কর্তাও এখানে উপস্থিত ছিলেন এবং এই সময়টা তাঁর বড়ই দুর্ভাবনায় কাটিয়াছিল। কারণ, এই গোয়েন্দাবাহিনীকে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছিল "প্রত্যেককে" সন্দেহ করার জন্য। এই সন্দেহ-বাতিকতা এত দূর পর্যন্ত গিয়াছিল যে, কেউ যদি দাঁত খুঁটিবার জন্য একটা সোনার খড়কেও সঙ্গে নিয়া আসিত, তবু তাঁকে রুজভেল্টের সামনে যাইতে দেওয়া হইত না।[১]

রুজভেল্ট মার্কিন দূতাবাস ছাড়িয়া নূতন আবাসে আসিলেন অপরাহ্ন তিনটার সময়—২৮শে নভেম্বর, রবিবার। ১৫ মিনিট পরেই স্ট্যালিন আসিয়া হাজির হইলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারের সময় একমাত্র দুইজন দোভাষী মিঃ বোলেন (Bohlen) এবং মঃ প্যাভলভ ছাড়া আর-কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন এবং রুজভেল্ট বলিলেন, 'আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি আনন্দিত, অনেকদিন ধরেই এই সাক্ষাতের জন্য আমি চেষ্টা করে আসছিলাম।' স্ট্যালিন বলিলেন যে, এই সাক্ষাতের বিলম্বের জন্য তিনিই দায়ী। কারণ, সামরিক ব্যাপার নিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।

দুই নেতা তখন সোভিয়েট রণাঙ্গন, ফরাসী রাজনীতির ব্যাপার (দ্য গল-পেতাঁ) ইন্দোচীন, বার্মা ও চীন ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়া আলোচনা করিলেন। চীনের প্রসঙ্গে স্ট্যালিন মন্তব্য করিলেন যে, চীনা সৈন্যদের লড়াইয়ের পটুতা অতি সামান্য এবং এর জন্য তাদের নেতারাই দায়ী। রুজভেল্ট এশিয়ার বিভিন্ন ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির কথা উত্থাপন করিয়া স্ট্যালিনকে একটি বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলেন—'খবর্দার, ভারতের সমস্যা নিয়ে যেন চার্চিলের সঙ্গে কথা বলবেন না।' স্ট্যালিন স্বীকার করিলেন যে, চার্চিলের নিকট বিষয়টি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। রুজভেল্ট মন্তব্য করিলেন যে, ভারতবর্ষে যদি সংস্কার সাধন করিতে হয়, তবে তলা থেকেই করা উচিত। স্ট্যালিন জবাবে বলিলেন, তলা থেকে সংস্কার করার অর্থ বিপ্লব।

১। রবার্ট ই. শেরউড—পৃষ্ঠা ৭৭৬।

'He (Roosevelt) cautioned Stalin against bringing up the problems of India with Churchill, and Stalin agreed that this was undoubtedly a sore subject. Roosevelt said that reform in India should begin from the bottom and Stalin said that reform from the bottom would mean revolution'.[১]

ভারতবর্ষ সম্পর্কে তেহরানে এই দুই নেতার সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যেই একজনের উদারতা এবং অন্যজনের দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—যে উদারতা ও দূরদর্শিতার একান্ত অভাব ছিল চার্চিলের।

রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের এই প্রথম সাক্ষাৎ ৪৫ মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল—যদিও অনেকটা সময় দোভাষীদের অনুবাদের জন্য ব্যয় হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ চারটার সময় তেহরান সম্মেলনের প্রথম পূর্ণ অধিবেশন শুরু হইল। তিন শীর্ষ নেতা ছাড়াও তিন দেশের প্রধান প্রধান সামরিক পুরুষগণ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা (আমেরিকার পক্ষে হ্যারি হপকিন্স) উপস্থিত ছিলেন। স্ট্যালিন ও চার্চিলের প্রস্তাবক্রমে রুজভেল্ট প্রথম দিনের বৈঠকে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতা হিসাবে তিনি সকলকে "এক পরিবারের নূতন সদস্য" রূপে স্বাগত জানাইলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, যথাশীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ জয়ের জন্য তাঁরা এখানে বন্ধুর মত খোলাখুলিভাবে সব আলোচনা করিবেন। যুদ্ধের সময়ে যেমন তেমনি ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্যও তাঁরা একত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিবেন।...

চার্চিল বলিলেন, 'এই সম্মেলন হইতেছে মনুষ্যজাতির ইতিহাসে পৃথিবীব্যাপী শক্তির সবচেয়ে বড় সমাবেশ। কিন্তু যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল হ্রাস, যুদ্ধ জয় করা ও মনুষ্য জাতির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার যে সমস্যা রহিয়াছে, তার মীমাংসা করার দায়িত্ব আমাদের হাতে। মনুষ্য জাতিকে সেবা করার যে মহান সুযোগ আমাদের সামনে আসিয়াছে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—আমরা যেন তার উপযুক্ত হইতে পারি।'

স্ট্যালিন বলিলেন, 'আমার মনে হয় ইতিহাসের আমরা প্রশ্রয়-পুষ্ট— (I think we are being pampered by history.) ইতিহাস আমাদের হাতে প্রকাণ্ড শক্তি ও প্রকাণ্ড সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। আমি আশা করি জনসাধারণ আমাদের উপর যে ক্ষমতা, যে কর্তৃত্ব ন্যস্ত করিয়াছেন, আমরা যেন এই সম্মলনে তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে পারি।'[২]

* * *

অত্যন্ত সদিচ্ছাপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ উদ্বোধনী মন্তব্যের মধ্য দিয়া তিন বিশ্বনেতার যে ঐতিহাসিক সম্মেলন তেহরানে শুরু হইল, চার দিনের আলোচনায় তার সাফল্য ও ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে দ্রুত যুদ্ধজয়ের প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া আনিল। এই বৈঠকের ফলে মিত্রশক্তির মহামৈত্রী আরও গভীর এবং দৃঢ় হইল। বৈঠকে রুজভেল্টের নেতৃত্বে রুশ ইতিহাসেরও উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।

সম্মেলনের আলোচনায় ও বিতর্কে কিছু কিছু মতভেদ সময় সময় আত্মপ্রকাশ

করিয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার জন্য মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে আটকায় নাই। তখন ১৯৪৩ সাল শেষ হইয়া ১৯৪৪ সাল আসিতেছিল এবং মিত্রপক্ষেও অনুভব করিতেছিলেন যে, যদি জার্মানীকে চূড়ান্ত আঘাত হানিতে হয়, তবে পূর্ব ও পশ্চিম দিকের রণ-পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। তেহরান সম্মেলনে সেটাই ছিল মূল সমস্যা। অর্থাৎ জার্মানীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানা সম্পর্কে তিন প্রধানের একমত হওয়া। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কঠিন সত্যও প্রতিভাত হইতেছিল যে যুদ্ধ যতই ট্যাংক ও প্লেনের গতিবেগ ধরিয়া আগাইয়া যাইবে, জার্মান নাৎসী ও তাদের সহোযোগীরা যতই ধরাশায়ী হইতে থাকিবে, ততই ইউরোপব্যাপী রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা, এমনকি গৃহযুদ্ধ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। সুতরাং এই সম্ভাব্য পটভূমিকায় তেহরান সম্মেলনের আলোচনার তিনটি প্রধান ক্ষেত্র ছিল। যথা—(১) জার্মানীর বিরুদ্ধে একত্রীভূত রণ-পরিকল্পনা, (২) ক্রমবর্ধমান এবং অমীমাংসিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিগুলির মোকাবিলা করা এবং (৩) ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক পৃথিবীর নিরাপত্তার জন্য সংঘঠন তৈরী করা।[১]

মোটামুটি এই ভিত্তির উপরেই তেহরান সম্মেলনের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনাগুলি নিয়া আলোচনা হইয়াছিল—এই সম্মেলনের মূল বক্তব্য আগেই মস্কোর পররাষ্ট্র মন্ত্রী-সম্মেলনে মোটামুটি স্থির হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তেহরানে খুব গভীর ও বিস্তৃত আলোচনার দরকার করে নাই।

বৈঠকে স্বাভাবিক কারণেই সামরিক সমস্যাগুলি প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল এবং তিন নেতা তেহরানের পূর্ণ অধিবেশনে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন রণাঙ্গন সম্পর্ক তাঁদের স্ব স্ব বক্তব্য বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিলেন। যদিও ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সে অবতরণ ও দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করা হইবে বলিয়া ইঙ্গ-মার্কিন বৈঠকগুলিতে ও মস্কো সম্মেলনে স্থির হইয়া গিয়াছিল, তবু চার্চিল ও বৃটেনের ভাবভঙ্গী সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁর স্বাভাবিক বাকচাতুর্যের দ্বারা রণাঙ্গনে ও ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে রণক্রিয়ার অগ্রাধিকারের উপর ইঙ্গিত করিতেছিলেন। বিশেষভাবে তিনি তুরস্কের যোগদানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতেছিলেন। সোজা কথায়, তিনি তাঁর বাগ্মীতার দ্বারা বুঝাইতে চাহিতেছিলেন যে, পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির বিরাট দায়িত্ব দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের রণক্রিয়ার সাফল্যের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তিনি বারে-বারেই অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ইতালী, যুগোশ্লাভিয়া, রোডস এবং তুরস্ক—এই স্থানগুলির রণক্রিয়ার কথা বলিতেছিলেন। অর্থাৎ চার্চিল পশ্চিম ইউরোপের চেয়ে ভূমধ্যসাগর ও বলকানের দিকেই বেশী নজর দিতেছিলেন। এর কারণ সহজেই অনুমেয়—রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থই চার্চিলের চিন্তায় বেশী ছিল।

স্ট্যালিন বৃটিশ পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া বলিলেন যে, সামরিক প্রশ্নের বিচারে 'অপারেশন ওভারলড' (ফ্রান্সে অবতারণ) হইতেছে প্রধান এবং চূড়ান্ত প্রশ্ন। "আমার মতে ১৯৪৪ সালের সমস্ত রণক্রিয়ার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত 'অপারেশান ওভারলড'। যদি যুগপৎ দক্ষিণ ফ্রান্সেও অবতারণ ঘটানো যায়, তবে, উভয় সেনা-বাহিনীই ফ্রান্সের অভ্যন্তরে গিয়া হাত মিলাইতে পারিবে। ঠিক একই সময়ে রোমের

১। হারবার্ট ফীজ—পৃষ্ঠা ২৫৮।

দিকে আক্রমণ চালাইয়া শত্রুপক্ষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা যাইতে পারে তবে, ফ্রান্সই হইতেছে জার্মানীর সবচেয়ে দুর্বলতম স্থান।"[১]

সোভিয়েট ডেলিগেশনের মতে তেহরান সম্মেলনের সামনে তিনটি মুখ্য সামরিক প্রশ্ন ছিল প্রথমতঃ, 'অপারেশন ওভারলর্ড' শুরু করার সুনির্দিষ্ট তারিখ স্থির করা। দ্বিতীয়তঃ একই সঙ্গে সময়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে অবতরণ ঘটানো এবং তৃতীয়তঃ 'অপারেশন ওভারলর্ড'-এর প্রধান বা সর্বোচ্চ সেনাপতিকে নিয়োগ করা। সোভিয়েট ডেলিগেশনের মতে 'অপারেশন ওভারলর্ড' ১৯৪৪-এর মে মাসের মধ্যেই আরম্ভ হওয়া উচিত।

সোভিয়েট ডেলিগেশনের মত মার্কিন প্রতিনিধিরাও চার্চিলের বলকান অভিযানের পরিকল্পনা পচ্ছন্দ করিলেন না। এবং তাঁরা এর সমালোচনা করিলেন। তবু চার্চিল নাছোড়বান্দা, তিনি ভুমধ্য সাগর অঞ্চলের ২০ টি বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত ডিভিসনের কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া একমাত্র ১লা মে 'ওভালর্ড' আরম্ভ করার জন্য তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তখন রুজভেল্ট বলিলেন—'অপারেশন ওভারলর্ড স্থগিত রাখার প্রশ্নে আমার আপত্তি আছে। অথচ চার্চিল ভুমধ্যসাগরের রণক্রিয়ার উপরেই বেশী জোর দিচ্ছেন।'

স্ট্যালিন তখন সোজাসুজি চাচিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"I should like to know whether the British believed in Operation Overlord or simply speak of it to reassure the Russians?"[২]

আমার জানতে ইচ্ছা করে বৃটিশরা সত্যিসত্যিই অপারেশন ওভারলর্ডে বিশ্বাস করেন, কিংবা কেবলমাত্র রুশদের আশ্বাস দেওয়ার জন্যে এমন কথা বলা হচ্ছে?'

চার্চিল জবাবে বলিলেন যে, অপারেশন ওভারলর্ড কার্যকর করিতে গেল যে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাদের সকলকেই জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য ওখানে পাঠাইতে হইবে।

স্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনায় চার্চিল আরও বলিলেন যে, অপারেশন ওভারলর্ড আরম্ভ করার সময় ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ যত সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিবে, জার্মানী যদি তার চেয়ে বেশী সৈন্য নিয়োগ করিতে না-পারে, তবেই, অপারেশন কার্যকর করা সম্ভব। কিন্তু জার্মানরা যদি ৩০/৪০ ডিভিসন অতিরিক্ত সৈন্য ফ্রান্সে স্থানান্তর করিতে পারে, তবে, ইঙ্গ-মার্কিনের অবতরণ সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া মনে হয় হয় না।...

বৈঠকে তিন পক্ষের সেনাপতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং সামরিক বিষয়ে তাঁরাও পরিকল্পনা রূপায়িত করা নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন। মার্শাল ভরোশিলোভ দাবী করিলেন যে, ১৯৪৪ সালে পশ্চিম ইউরোপে অভিযানের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত-রূপে অনুমোদন করা হোক এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের প্রধান আঘাতের বিরুদ্ধে দুর্বলতা সৃষ্টি করিতে পারে, এমন সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করা হোক।

অবশেষে ৩০শে নভেম্বর সামরিক নেতৃবৃন্দের বৈঠকে বলকান আক্রমণের বৃটিশ পরিকল্পনা বাতিল হইয়া গেল এবং ১৯৪৪ সালের মে মাসে পশ্চিম ইউরোপের দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইল।[৩]

১। The Teharan Yalta and Potsdam Conferences, P. 14.

২। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৩৭

৩। The Anti-Hitler Coalition, P. 222.

সম্মেলনের একটি পূর্ণ অধিবেশনে রুজভেল্টের নির্দেশে বৃটিশ সেনানীমণ্ডলীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল ক্যাপ্টেন অ্যালন ব্রুক দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে ঘোষণা করিলেন।

তখন স্ট্যালিন বলিলেন যে, সম্মিলিত এবং যুক্ত সেনানীমণ্ডলীর এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করিতেছেন এবং এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পক্ষে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন আছে, সেগুলিও তিনি অনুভব করিতেছেন। সুতরাং তিনি কথা দিতেছেন যে, অপারেশন ওভারলর্ডের রণক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার জন্য জার্মানী যাতে মজুত (রিজার্ভ) সৈন্যদল আমদানি করিতে কিংবা পূর্ব রণাঙ্গন থেকে সৈন্যদল সরাইয়া পশ্চিম রণাঙ্গনে আনিতে না পারে, তার জন্য রাশিয়া আগামী মে মাসে জার্মানীর বিরুদ্ধে নানা স্থানে প্রকাণ্ড রকমের আক্রমণ শুরু করিবে।...

"In order to prevent the Germans from manceuvring their reserves and transferring any sizeable forces from the Eastern Front to the West, the Russians undertake to organise a big offensive against the Germans in several places by May, in order to pin down the German divisions on the Eastern front and to prevent the Germans from creating any difficulties for Overlord...."[১]

স্ট্যালিনের এই বিবৃতির জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গভীর সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, তিন দেশের এই আসন্ন সম্মিলিত রণক্রিয়ার দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে 'আমরা একসঙ্গে কাজ করিতে শিখিয়াছি।'

এখানের স্মরণীয় যে, পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর চাপ হ্রাস করার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ এতদিন হাতে-কলমে তেমন কোন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, কিন্তু যে মুহূর্তে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে অগ্রসর হইলেন অমনি তাঁদের বিরুদ্ধে চাপ হ্রাস করার জন্য স্ট্যালিন পূব রণাঙ্গনে নূতন অভিযান শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

হিটলার-বিরোধী মহাজোট সম্পর্কে স্ট্যালিন বা রাশিয়ার আন্তরিকতার এটি আর একটি প্রমাণ।

* * *

যদিও তেহরান সম্মেলনে পশ্চিম ইউরোপে 'অপারেশন ওভারলর্ড' বা ফ্রান্সে অবতরণ ও অভিযানের প্রশ্নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তথাপি অন্যান্য কতকগুলি সমস্যারও আলোচনা হইয়াছিল। যেমন—যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নিরাপত্তা-বিধান, জার্মানীর ভবিষ্যৎ, পোল্যাণ্ডের সমস্যা ইত্যাদি। যদিও মস্কোর পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে এগুলি নিয়া আলোচনা হইয়াছিল, তথাপি সমস্যাগুলির গুরুত্বের জন্য পুনরায় এগুলি শীর্ষ সম্মেলনে কিংবা চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিনের একত্র বৈঠকে কিংবা রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের প্রাইভেট আলোচনায় পুনরায় উত্থাপিত হইয়াছিল। তেহরাণ বৈঠকে রুজভেল্ট পৃথিবীর শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘের বা ইউনাইটেড নেশন্সের একটা রেখাচিত্রের আভাস দেন। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জকে একটি অ্যাসেম্বলির মধ্যে গ্রহণ, একটি এক্‌জিকিউটিভ কমিটি গঠন এবং একটি 'পুলিশী

১। The Teharan Yalta & Potsdam Conferences. P. 38.

কমিটি' স্থাপন—এই তিন স্তরের সংগঠনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। পুলিশী কমিটি অর্থে রুজভেল্ট তাঁর সেই বিখ্যাত 'ফোর্ পুলিশমেন্'-এর পরিকল্পনা উত্থাপন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য 'পুলিশের' কাজ করিবে চারটি প্রধান শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়া, বৃটেন এবং চীন।

ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার জন্য তেহরানে তিন প্রধানের মধ্যে আলোচনা হইল বটে, কোন সুনির্দিষ্ট বাস্তব সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না।

হিটলারী জার্মানীর পরাজয়ের পর উহার ভবিষ্যৎ কি হইবে, তা নিয়া তিন প্রধানের মধ্যে প্রচুর আলোচনা হইল। রুজভেল্ট এবং চার্চিল জার্মানীকে পার্টিশন বা ভাগ করার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। রুজভেল্ট জার্মানীকে পাঁচটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ভাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। চার্চিলও—প্রুশিয়া, ব্যাভেরিয়া, দক্ষিণ জার্মানী ইত্যাদিকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করার পক্ষে ছিলেন। স্ট্যালিন, 'জার্মান জনগণকে' ধ্বংস করিতে চাহেন নাই বটে, কিন্তু হিটলারী রাষ্ট্র, হিটলারী সৈন্যবাহিনী ও তাদের নেতাদের ধ্বংস করার পক্ষে ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর ধ্বংসকাণ্ড ও বর্বর অত্যাচার স্ট্যালিনের পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং চার্চিল ও রুজভেল্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় তিনি পরাজিত জার্মানীর ভবিষ্যৎ উত্থানের সম্ভাবনা নিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। তিনি রুজভেল্ট ও চার্চিলের পরিকল্পিত জার্মানীর ভাগ-বাঁটোয়ারয়ার প্রস্তাবেও পুরাপুরি স্বস্তি বোধ করিতে পারিলেন না। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, ১৫।২০ বছর পরে জার্মানী পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে এবং পুনরায় অশান্তির কারণ হইয়া উঠিবে। সুতরাং রুজভেল্ট-চার্চিলের পরিকল্পনা 'উত্তর বটে, কিন্তু যথেষ্ট নয়'—'all very good but insufficient.' এমন কি রুজভেল্টের সঙ্গে এই আলোচনায় তিনি এমন সন্দেহও প্রকাশ করিলেন যে, জার্মানীর প্রতি চার্চিলের একটা নরম মনোভাব আছে এবং পরাজিত জার্মানীকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যাইবে বলিয়া তাঁর একটা অতিরিক্ত আশাবাদ আছে। কিন্তু স্ট্যালিন মনে করেন যে, জার্মান রাষ্ট্রকে গুঁড়া না করিলে ভবিষ্যতে আবার সে উঠিয়া দাঁড়াইবে।[১]

তেহরান বৈঠকে যুদ্ধোত্তর জার্মানী সম্পর্কে স্ট্যালিনের মতামত বিষয়ে মার্কিন-মহলের স্মারকলিপিতে প্রকাশ যে, জার্মানী সম্পর্কে রুজভেল্ট বা চার্চিলের পরিকল্পনাকে মার্শাল স্ট্যালিন যথেষ্ট মনে করেন নাই। জার্মান জনগণকে সংশোধন করিতে পারা যাইবে বলিয়াও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধে জার্মান শ্রমিকেরা যে ভাবভঙ্গী দেখাইয়াছিল, স্ট্যালিন তার অতিরিক্ত ও তীব্র নিন্দা করিলেন।......

হিটলার সম্পর্কে স্ট্যালিন বলিলেন যে, হিটলার অত্যন্ত দক্ষ লোক, কিন্তু মূলগতভাবে বুদ্ধিমান নন। তাঁর কালচার বা শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতি ছিল না। রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে তাঁর ধারণাগুলি আদিম যুগের। হিটলারের মানসিক ভারসাম্য নাই বলিয়া রুজভেল্টের যে ধারণা তার সঙ্গে স্ট্যালিন একমত নন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, হিটলার যেভাবে জার্মান জনগণকে ঐক্যবদ্ধ

১। চার্চিল – পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৭-১৮ এবং হারবার্ট ফীজ—পৃষ্ঠা ২৭২-৭৩।

করিয়াছেন, খুব দক্ষ লোক ছাড়া এমন কার্য অপরের পক্ষে করা সম্ভব নয়—তবে, তাঁর পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা যে মতামতই পোষণ করি না কেন।

'He said that Hitler was a very able man but not basically intelligent, lacking in culture and with a primitive approach to political and other problems. He did not share the view of the President that Hitler was mentally unbalanced and emphasised that only a very able man could accomplish what Hitler had done in solidifying the German people whatever we thought of the methods.'[১]

হিটলার সম্পর্কে স্ট্যালিনের এই মতামত নিশ্চয়ই ইতিহাসের দিক থেকে গভীর- ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যুদ্ধোত্তর জার্মানী সম্পর্কে স্ট্যালিনের দুর্ভাবনা কতদূর ছিল, সেই সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন চার্চিল তাঁর পুস্তকে। ২৯শে নভেম্বর স্ট্যালিন—চার্চিল ও রুজভেল্টকে ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন এবং ডিনার টেবিলে জার্মানীর ভবিষ্যৎ নিয়া মন্তব্য করিতে গিয়া স্ট্যালিন প্রস্তাব করেন যে, যদি জার্মানী সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হয়, তবে, জার্মান জেনারেল স্টাফের ৫০ হাজার লোককে খতম করিতে হইবে! জার্মানীর পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনী এই ৫০ হাজার অফিসারের উপরেই নির্ভরশীল। সুতরাং যুদ্ধের শেষে এঁদেরকে ধরিয়া আনিয়া গুলি করিয়া মারিলে জার্মান সামরিক শক্তি খতম হইয়া যাইবে।

চার্চিল স্ট্যালিনের এই মন্তব্যে তীব্র আপত্তি করেন এবং বলেন যে বৃটিশ পার্লামেন্ট ও বৃটিশ জনমত কখনও এই প্রকার গণহত্যা সমর্থন করিবে না।

কিন্তু স্ট্যালিন তথাপি জেদ করিতে ছিলেন যে, ৫০ হাজার জার্মান অফিসারকে গুলি করিয়া মারিতেই হইবে।

একথা শুনিয়া চার্চিল রাগিয়া গেলেন এবং বলিলেন যে, তার আগে আমার মৃত্যু বাঞ্ছনীয়।

তখন রুজভেল্ট বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিলেন—'না, ৫০ হাজার নয়, ৪৯ হাজারকে সাবাড় করলেই চলবে!"

যদিও স্ট্যালিন এবং মলোটোভ চার্চিলকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে পরে বলিয়াছিলেন, তিনি সমগ্র ব্যাপারটাই তামাশা বা রসিকতা করিয়া বলিয়াছেন মাত্র, তথাপি চার্চিলের মনে কিন্তু সন্দেহ থাকিয়াই গেল। স্ট্যালিন সত্য সত্যই রসিকতা করিয়াছেন কিংবা তাঁর মনের কথাই ছিল ঐ ৫০ হাজার জার্মান অফিসারকে সাবাড় করা?...[২]

কিন্তু বৃটিশ ও মার্কিন সূত্রে যুদ্ধোত্তর জার্মানী সম্পর্কে স্ট্যালিনের ব্যক্তিগত মতামত যেভাবেই উদ্ধৃত হইয়া থাকুক না কেন, প্রকাশ্য বক্তৃতায় স্ট্যালিন সরকারীভাবে জার্মানীকে খণ্ডবিখণ্ড করার প্রস্তাব কখনও করিয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে সোভিয়েট সূত্রে কোন সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট প্রমাণ নাই। কারণ, তেহরান বৈঠক চার্চিল-রুজভেল্ট যখন পরাজিত জার্মানীকে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেন, তখন স্ট্যালিন সেই প্রস্তাব সরাসরি সমর্থন করেন নাই। তবে, পরোক্ষ সমর্থন ছিল।[৩]

১। শেরউড্—পৃষ্ঠা ৭৮২।
২। চার্চিল—পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩০।
৩। দি তেহরান-ইয়াল্টা-পট্সডাম কনফারেন্সেস—পৃষ্ঠা ৪৯।

অবশ্য তেহরানে জার্মানী সম্পর্কে এত আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও তিন প্রধান কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। ভবিষ্যতের জন্য অধিকতর আলোচনার ভার দেওয়া হইল ইউরোপীয়ান অ্যাডভাইজারি কমিটির উপর।

পোল্যাণ্ডের সীমানা সম্পর্কে যদিও তেহরান বৈঠকে আলোচনা উঠিয়াছিল, তবু সেই বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে নাই। তবে, চার্চিল-রুজভেল্ট মোটামুটি সোভিয়েট প্রস্তাব (পূর্বে কার্জন লাইন এবং পশ্চিমে ওডের নদী সীমানা) 'নীতিগতভাবে' মানিয়া লইলেন।···

ফ্যাসিস্ট বিরোধী কোয়ালিশনের রাজনীতি ও রণনীতি তেহরানের শীর্ষ সম্মেলনে সার্থকতা অর্জন করিল। মিত্রপক্ষের মহামৈত্রী বন্ধন আরও দৃঢ় হইল এবং তিন প্রধানের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইল। রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন এই সর্বপ্রথম পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলেন এবং দুইজনের মধ্যে নিভৃতে একাধিকবার আলোচনা হইয়াছিল। এমন কি, পাছে স্ট্যালিনের মনে সন্দেহ জাগে এজন্য তিনি একা একা চার্চিলের সঙ্গে লাঞ্চ খাইতে পর্যন্ত রাজী ছিলেন না। তবু কিন্তু একথা সত্য যে, চার্চিলের ও রুজভেল্টের মধ্যে যে হৃদ্যতা ও বন্ধুতা গড়িয়াছিল, স্ট্যালিন ও রুজভেল্টের মধ্যে তেমন বন্ধুতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যদিও রুজভেল্ট স্ট্যালিনের গুণগ্রাহী ছিলেন।

* * *

তেহরানের শীর্ষ সম্মেলনে তিন প্রধানের রাজনৈতিক ও সামরিক বৈঠক ছাড়াও দুই তিনটি ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যব্যঞ্জক ছিল। যেমন—'স্ট্যালিনগ্রাদ তরবারি' উপহার এবং চার্চিলের জন্মদিনের ভোজ ইত্যাদি।

২৯শে নভেম্বর অপরাহ্নে সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল রাজা ষষ্ঠ জর্জের নির্দেশে স্ট্যালিনগ্রাদের অবিস্মরণীয় যুদ্ধের স্মরণে বিশেষ-ভাবে নির্মিত একটি 'সম্মানের তরবারি' আনুষ্ঠানিকভাবে মার্শাল স্ট্যালিনের হাতে অর্পণ করেন। সেই সময় বহু রাশিয়ান সৈন্য ও সেনাপতি সেই হলঘরে উপস্থিত ছিলেন। মার্শাল স্ট্যালিন অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে সেই তরবারি ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরেন এবং দুই ওষ্ঠাধরে সেই 'উজ্জ্বল দীপ্তিশীল জমকালো অস্ত্রটিকে' চুম্বন করেন। রুশ সৈন্যেরা 'গার্ড অব অনার্' দিয়া সেই অস্ত্রটিকে বহন করিয়া নিয়া যান।

* * *

৩০শে নভেম্বর ছিল উইনস্টোন চার্চিলের ৬৯তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে চার্চিল দুই বিশ্বনেতা রুজভেল্ট এবং স্ট্যালিনকে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভোজ উৎসবে আমন্ত্রণ জানাইলেন। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইল সোভিয়েট দূতাবাসের সংলগ্ন বৃটিশ দূতাবাসে। চার্চিল লিখিয়াছেন যে, স্ট্যালিনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সোভিয়েট রাজনৈতিক পুলিশ এন. কে. ভি. ডি. বৃটিশ দূতাবাসে ঢুকিয়া সমস্ত দরজা জানালা, এমন কি প্রত্যেকটি চেয়ারের কুশন পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিল। সমস্ত দরজা জানালার কাছে প্রায় ৫০ জন সশস্ত্র রুশ পুলিশ সতর্ক পাহারায় দণ্ডায়মান হইল। মার্কিন নিরাপত্তাবাহিনীর লোকেরাও এই পাহারার কার্যে অংশগ্রহণ করিল। প্রচুর প্রহরী বেষ্টিত হইয়া স্ট্যালিন হাজির হইলেন, তাঁর মেজাজ

খুব ভালো ছিল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও চাকাওয়ালা চেয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডিনার টেবিলে "স্বাস্থ্যপানের" ধুম পড়িয়া গেল এবং পারস্পরিক প্রশংসার বান ডাকিল। চার্চিল রুজভেল্টের উদ্দেশে বলিলেন যে, তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন দুর্বল ও অসহায়ের উদ্ধারের জন্য, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিপ্লব থেকে রক্ষা করিয়াছেন এবং দেশকে গণতন্ত্রের পথে পরিচালনা করিয়াছেন। আর স্ট্যালিন সম্পর্কে তিনি বলিলেন যে, মার্শাল স্ট্যালিন যথার্থই 'স্ট্যালিন দি গ্রেট', তিনি রুশ ইতিহাসের বলিষ্ঠতম ব্যক্তিদের অন্যতম। স্ট্যালিন জবাবে বলিলেন যে, তাঁকে যে সম্মান দেখানো হইল, তা প্রকৃতপক্ষে রুশ জনগণের প্রাপ্য। রাশিয়ার জনগণ এমন ধাতুতে তৈরী যে, তাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে গেলে বীর না হইয়া উপায় নাই। যারা বীর হইতে পারে না, তারা সেখানে মারা পড়ে। রুজভেল্ট বলিলেন যে, তেহরান সম্মেলন থেকে তাঁর সুন্দরতর পৃথিবীর জন্য আশা জাগিয়াছে এমন পৃথিবী যেখানে সাধারণ মানুষ তার শান্তিপূর্ণ পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে পারিবে।[১]

রাত দুইটায় এই ভোজ-উৎসব শেষ হইল। স্ট্যালিন এই ডিনার পার্টিতে চার্চিল ও রুজভেল্টকে "মাই ফাইটিং ফ্রেন্ড" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, আমেরিকার উৎপাদন ছাড়া মিত্রশক্তিপুঞ্জ এই যুদ্ধ কখনও জয় করিতে পারিতেন না।[২]

চার্চিল তাঁর জন্মদিনের এই ডিনার উৎসবকে তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়াছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, আর বামপার্শ্বে রাশিয়ার সর্বময় প্রভু। আমাদের সম্মিলিত আয়ত্তের মধ্যে ছিল পৃথিবীর নৌশক্তির বহুলাংশ, সারা পৃথিবীর বিমানবাহিনীর তিন-চতুর্থাংশ এবং আমাদের নেতৃত্বাধীনে ছিল এমন সমস্ত সৈন্যবাহিনী, যাদের সংখ্যা ছিল ২০ মিলিয়ন বা ২ কোটি এবং তারা মানুষের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা ভয়ংকরতম যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।…'[৩]

* * *

সম্মেলনের শেষে ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৩, রুজভেল্ট, স্ট্যালিন ও চার্চিল স্বাক্ষরিত তেহরান ঘোষণায় যা বলা হইল, তার মর্ম এই :—

যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের জাতিসমূহ একত্রে কাজ করিবে, এই প্রতিজ্ঞা আমরা গ্রহণ করিতেছি। অত্যাচার ও দাসত্ব থেকে যাঁরা মুক্তি চান ছোটবড় তাঁদের সকলকে আমরা সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানাইতেছি এবং পৃথিবীব্যাপী গণতান্ত্রিক জাতিসমূহের এক পরিবারের মধ্যে তাঁদের সকলকে স্বাগত জানাইতেছি।

আমরা জার্মানীর স্থলবাহিনীগুলিকে, সমুদ্রপথে ইউ-বোটগুলিকে এবং আকাশ থেকে তাদের যুদ্ধাস্ত্র কারখানাগুলিকে ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প। পৃথিবীর কোন শক্তি এই বিষয়ে আমাদের বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না।…

১। রবার্ট শেরউড—পৃষ্ঠা ৭৯৩।
২। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৪০২।
৩। চার্চিল—পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৯।

এই ঘোষণার উপসংহারে বলা হইল :

'We look with confidence to the day when all peoples of the world may live free lives, untouched by tyranny, and according to their varying desires and their own consciences.

We came here with hope and determination. We leave, here, friends in fact, in spirit and in purpose.'[১]

অর্থাৎ 'আমরা গভীর আস্থার সঙ্গে এমন দিনের দিকে তাকাইয়া আছি, যখন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তাদের বিভিন্ন প্রকার রুচি ও বিবেক অনুসারে স্বাধীন জীবন যাপন করিতে পারিবে—যে জীবন অত্যাচারের স্পর্শমুক্ত।

আমরা আশা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়া এখানে আসিয়াছিলাম। কার্যক্ষেত্রে, শক্তিতে এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়া আমরা পরস্পরের বন্ধুর মতই এই স্থান ত্যাগ করিতেছি।

* * *

১৯৪৩ সাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরাইয়া দিল। স্ট্যালিনগ্রাদ থেকে তার শুরু এবং চার্চিল-রুজভেল্ট অনুভব করিলেন যে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ণতর সহযোগিতা ছাড়া যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা মিটিবে না। বিশেষভাবে রুজভেল্ট এই সত্য উপলব্ধি করিলেন এবং এই উপলব্ধির মূলে ছিল স্ট্যালিনগ্রাদে রাশিয়ার অবিনশ্বর জয়।

সুবিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক শেরউড্ লিখিয়াছেন :

'The completion of the gigantic Russian viotory at Stalingrad changed the whole picture of the war and of thc foreseeable future. With one battle—whieh, in duration and in the terrible casualties, had amounted to a major war in itself—Russia assumed the position as a great world power to which she had long been entitled by the character as well as the number of her peple. Roosevelt knew that he must now look beyond the military campaigns of 1943 to the actual shape of things to come in the postwar world.'[২]

—১৯৪৩ সালের সামরিক অভিযানের চেয়েও রুজভেল্টকে বেশী করিয়া তাকাইতে হইবে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দিকে—এই তথ্য তিনি উপলব্ধি করিয়া ছিলেন। এজন্যই হিটলার-বিরোধী মহাজোটের সাফল্যের জন্যও তিনি উদগ্রীব ছিলেন এবং বিভিন্ন সম্মেলনে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। তেহরান সম্মেলনে স্ট্যালিনের কাছ থেকে হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিয়া আসিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বড়দিনের পূর্বাহ্ণে বিশ্বব্যাপী এক রেডিও ভাষণে স্ট্যালিন সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন :

'He is a man who combines a tremendous, relentless determination with a stalwart good humour. I believe he is truly representa-

১। The Teharan, Yalta & Postdam conferences. P. 52.

২। Roosevelt & Hopkins—Sherwood, P. 699.

tive of the heart and soul of Russia; and I believe that we are going to get along very well with him and the Russian people—very well indeed.'

অর্থাৎ 'স্ট্যালিন এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে বলিষ্ঠ রসিকতাবোধের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে অদম্য এবং প্রচণ্ড দৃঢ় সংকল্প। আমার বিশ্বাস তিনি রাশিয়ার হৃদয় ও আত্মার সত্যকার প্রতিনিধি এবং আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁর সঙ্গে এবং রাশিয়ার লোকেদের সঙ্গে আমরা ভালোভাবেই চলিতে পারিব—সত্যি সত্যি ভালোভাবে।'[১]

স্ট্যালিন ও রাশিয়ার সহযোগিতায় যুদ্ধজয় ও শান্তিময় পৃথিবী গড়িয়া তোলাব পক্ষে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের যে আন্তরিক আশা ও বিশ্বাস ছিল এই রেডিও ভাষণই তার অন্যতম প্রমাণ।

এই আশা ও বিশ্বাসের জন্যই ১৯৪৩ সালে অনেকগুলি সম্মিলিত বৈঠকের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। যেগুলিব মধ্যে প্রধান ছিল মস্কো, কায়রো, তেহরান এবং পুনরায় কায়রো।

তেহরান বৈঠকে তিন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে ইরানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের গ্যারাণ্টি দিয়া এক যুক্ত ঘোষণা প্রচারিত হইল। কারণ, ইরান তখন মিত্রপক্ষের দখলে ছিল।

তেহরান সম্মেলনের পর চার্চিল এবং রুজভেল্ট পুনরায় কায়বোতে একত্র হইলেন। চার্চিল পুনরায় তুরস্ককে দলে টানিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তুবস্ক 'ধরা' দিল না।

পশ্চিম ইউরোপে অপারেশন 'ওভার লর্ড'-এর প্রধান সেনাপতি কে হইবেন, এই প্রশ্ন স্ট্যালিন তুলিয়াছিলেন তেহরান বৈঠকে। কায়রো বৈঠক থেকে ঘোষণা করা হইল যে, জেনারেল ডুইট্ ডি· আইজেনহাওয়ার এই প্রস্তাবিত অভিযানের সর্বাধ্যক্ষ বা সুপ্রিম কমাণ্ডার নিযুক্ত হইবেন।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক,—পৃষ্ঠা ৮০৪।

ষষ্ঠ পর্ব

একাদশ অধ্যায়

যুগোশ্লাভিয়া, টিটো এবং গ্রীস

হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনকে ১৯৪৩ সালের শরৎকালে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের জটিল রাজনৈতিক সমস্যা নিয়া বিস্তর মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল। পোল্যান্ড ও চেকোশ্লভাকিয়ার সীমানা, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, ভবিষ্যৎ পোলিশ ও চেক সরকারের গঠন ইত্যাদি ইঙ্গ-মার্কিন মহলে এই সমস্ত সমস্যার প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ককে মাঝে মাঝে ঘোলাটে করিয়া তুলিতেছিল। এই সমস্ত সমস্যার সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের প্রশ্নও উদ্বেগের সঞ্চার করিতেছিল। কেননা, এই সমস্ত দেশে হিটলার-বিরোধী একাধিক স্বদেশপ্রেমী-দল যে পার্টিজান যুদ্ধ চালাইতেছিল, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন ভাবগত ঐক্য ও সহযোগিতা ছিল না। বরং ঐক্য ও সহযোগিতার বদলে তীব্র দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। মিত্রপক্ষের নিকট এই অবস্থাটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ছিল, সন্দেহ নাই। কেননা, ফ্যাসিস্ট দখলদারি থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য যাঁরা অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করিতেছিলেন, কার্যতঃ তাঁরা অনেক সময় নিজেদের মধ্যে লড়াই করিয়া শক্তিক্ষয় করিতেছিলেন। অথচ যুদ্ধজয়ের অপরিহার্য প্রয়োজনেই পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির একান্ত দরকার ছিল। যাঁরা এই গৃহযুদ্ধ চালাইতেছিলেন, তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ এক পক্ষের ছিল পশ্চিমের দিকে কিংবা প্রচলিত শাসনব্যবস্থা বজায় রাখা, আর অন্য পক্ষের ছিল পূর্বদিকে কিংবা বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের দিকে। অর্থাৎ সহজ কথায় পশ্চিমী গণতন্ত্র ও সোভিয়েট সমাজতন্ত্র এই দুই মতবাদের ভিত্তিতে ইউরোপের নাৎসী পদানত বিভিন্ন রাজ্যে তীব্র প্রতিরোধ সংগঠিত হইতেছিল। কিন্তু পারস্পরিক বিরোধ ও প্রতিরোধ যুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের দেশপ্রেমী যোদ্ধারা বোধ হয় শীর্ষস্থানে ছিলেন। মিত্রপক্ষ স্বভাবতঃই এই গৃহযুদ্ধ থামাইয়া দিতে চাহিতেছিলেন। কেননা, এর দ্বারা একমাত্র লাভবান হইতেছিল ঘরের ও বাইরের শত্রুরা। আরও দুর্ভাগ্যের কথা পার্টিজানদের এই গৃহযুদ্ধের ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হইতেছিল।

*   *   *

ইউরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও শোষিত দেশগুলির অন্যতম ছিল যুগোশ্লাভিয়া। জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ ছিল গ্রামের বাসিন্দা এবং তাদের জীবন-যাত্রা ছিল অত্যন্ত নীচু। নানা জাতি-অধিজাতিদের ভীড়ের জন্য সমগ্র যুগোশ্লাভিয়ার ঐক্য ও সংহতি যেমন দানা বাঁধিতে পারে নাই, তেমনি এই সমস্ত জাতি-অধিজাতি ও নৃতত্ত্ব ঘটিত প্রশ্নের জন্য যুগোশ্লাভিয়ার সমস্যাও ছিল অত্যন্ত জটিল। সার্ভিয়া, ক্রোশিয়া, শ্লোভেনিয়া, মণ্টেনিগ্রো, বোসনিয়া ও মেসিডোনিয়া—এই সমস্ত রাজ্য-উপরাজ্যে যুগোশ্লাভিয়া বিভক্ত ছিল। যে গুলির মধ্যে সার্ভিয়াই অন্যান্য সমস্তের উপর আধিপত্য খাটাইতে চাহিতেছিল—ফলে, যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ

ও দ্বন্দ্ব এবং সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে প্রচুর বিক্ষোভ ছিল, হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের আগে উহার পার্শ্বদেশ বলকান অঞ্চল গ্রাস করতে চাহিতেছিলেন। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানী ৫২ ডিভিসন সৈন্য নিয়া যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ ও দখল করিল। এই ৫২ ডিভিসন সৈন্যের মধ্যে ছিল ২৪ জার্মান, ২৩ ইতালীয়ান এবং ৫ হাঙ্গেরীয়ান ডিভিসন। আর ২২০০ জঙ্গী বিমান।[১]

মাত্র ১১ দিনের যুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ার পতন ঘটিল এবং জার্মান, ইতালীয়ান, হাঙ্গেরীয়ান, বুলগেরিয়ান ও আলবেনিয়ান—এই কয়টি শক্তির চধ্যে যুগোশ্লাভিয়া ৯টি অংশে বিভক্ত হইয়া গেল। কিন্তু সরকারী সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হইলেও যুগোশ্লাভিয়ার জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম গভীর ছিল। ফলে, যুগোশ্লাভিয়ার যে ঐতিহাসিক প্রতিরোধ-যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল, তা' আজও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই প্রতিরোধ যুদ্ধের একদিকে ছিলেন সার্ভিয়ার ড্রাজা মিহাইলোভিচ এবং অন্যদিকে ছিলেন ক্রোশিয়ার জোসিপ ব্রোজ টিটো। বলা বাহুল্য যে, মিহাইলোভিচ ছিলেন জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতা এবং কমিউনিস্টদের একান্ত বিরোধী। এ'রা চেৎনিক নামে পরিচিত ছিলেন। আর অন্যদিকে ছিলেন যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির অধিনায়ক এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী দেশপ্রেমিক যোদ্ধা টিটো। জার্মানী কর্তৃক যুগোশ্লাভিয়া দখলের পরেই কমিউনিস্ট নেতা টিটো ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ যুদ্ধের সংকল্প ঘোষণা করিলেন ১৯৪১ সালের মে মাস থেকে। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার উপরের তলার ভদ্র ও বিত্তবান শ্রেণী কমিউনিস্টদের বিপক্ষে ছিলেন। পরাজিত যুগোশ্লাভ গবর্নমেণ্ট ও বালক রাজা পীটার যদিও লণ্ডনে গিয়া আশ্রয় নিলেন, তবু তাঁরা টিটোর প্রতিরোধ যুদ্ধকে সমর্থন করিলেন না। তাঁরা স্বীকৃতি দিলেন কর্নেল মিহাইলোভিচকে এবং তাঁকেই সরকারী প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিরূপে মানিয়া লইলেন। এই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার জন্য চেৎনিকরা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তা এবং গোড়ার দিকে মিত্রপক্ষীয় মহলে স্বীকৃতি ও প্রশংসা পাইতেছিলেন। মিহাইলোভিচ ও তাঁর দলবলের গেরিলা যুদ্ধের জবাবে জার্মান ফ্যাসিস্টরা বর্বর প্রতিহিংসার আশ্রয় নিল এবং রাজধানী বেলগ্রেদে এক-এক বারে ৪।৫ শত বাছাই করা নাগরিকদের ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিতে লাগিল। এভাবে জার্মানী যে 'টেরর' বা ত্রাস সৃষ্টি করিল, তার ফলে, মিহাইলোভিচের সেনাপতিরা নাৎসীদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়ায় আসিল। ফলে ১৯৪১ সালের শরৎকালে সার্ভিয়ার কিংবা মিহাইলোভিচের প্রতিরোধ যুদ্ধ নামে-মাত্র দাঁড়াইল। কেবল যে, প্রতিরোধ সংগ্রামে ভাঁটা পড়িল এমন নয়, তারা কমিউনিস্টদের প্রতি বিরূপতার জন্য জার্মান নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতাও করিতে লাগিল। ফলে, চেৎনিক ও টিটোর পার্টিজান যোদ্ধাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দিল এবং সেই বিরোধ শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের আকার নিল। কারণ, যুগোশ্লাভিয়াতে এই সময়-জার্মান পক্ষপাতী ছদ্মবেশী ফ্যাসিস্ট এবং কুইসলিং বা বিশ্বাসঘাতকদেরও অভাব ছিল না।

মিহাইলোভিচের চেৎনিক এবং টিটোর পার্টিজান বাহিনীর মধ্যে ৩টি মূলগত বৈষম্য ছিল। যেমন—

(ক) সামরিক প্রক্রিয়ার দিক থেকে চেৎনিকরা বৃটিশ রণনীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল এবং তাদের আশা ছিল যে, মিত্রপক্ষ বলকান অঞ্চল আক্রমণ করিলে তারা তাদের সঙ্গেই সহযোগিতা করিবে এবং তাদের রণনীতি সেই সহযোগিতার ভূমিকা স্বরূপ ছিল।

কিন্তু টিটোর পার্টিজান বাহিনী কোন বাইরের প্রত্যাশায় ছিল না। তারা ফ্যাসিস্ট শত্রুর বিরুদ্ধে নির্মম গেরিলা যুদ্ধ চালাবার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল।

(খ) রাজনৈতিকভাবে টিটোর বাহিনী চেৎনিকদের তুলনায় প্রায় বিপরীত কোণে ছিল। কারণ, এই পার্টিজান বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্গত ছিল এবং মস্কো থেকে তারা সাহায্য ও সহযোগিতা পাইতেছিল। তারা সার্ভিয়ার আধিপত্য ও রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল। অপরপক্ষে চেৎনিকরা ছিল জাতীয়তা ও রাজতন্ত্রবাদী এবং তারা বালক রাজা পীটারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিল।

(গ) জাতিগতভাবে চেৎনিকরা ছিল প্রধানতঃ সার্ভিয়ার অধিবাসী এবং তাদের সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার থেকে দেড় লক্ষের মধ্যে! অপর পক্ষে টিটোর পার্টিজানরা সমগ্র যুগোশ্লাভিয়ার সমস্ত জাতি ও অধিজাতির প্রতিনিধি-স্থানীয় ছিল।[১]

সুতরাং এই রাজনৈতিক ও রণনৈতিক বৈষম্য উভয় পক্ষের মধ্যে হিংস্রতা ও প্রতিহিংসার প্ররোচনা দিল। বিশেষতঃ চেৎনিকরা টিটোর যুদ্ধরত বাহিনীর খবরা-খবর গোপনে জার্মান ফ্যাসিস্টদের কানে পেঁছাইয়া দিত। এজন্য চেৎনিকদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ উঠিয়াছিল। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল না, বৃটিশ সূত্রেই এগুলির প্রমাণ পাওয়া যাইতেছিল। কেননা, গোড়ার দিকে বৃটিশ সরকার মিহাইলোভিচের দলবলের সঙ্গেই যোগাযোগরক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। স্বয়ং চার্চিল লিখিয়াছেন যে, জার্মানদের পাশবিক প্রতিহিংসা নীতির ফলে চেৎনিকদের বাধা দান হ্রাস পাইয়া গেল। এমন কি জার্মানদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়ার মনোভাব পর্যন্ত গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপর পক্ষে কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত টিটো এবং তাঁর দলবল স্বদেশের মুক্তি-যজ্ঞে আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই মুক্তি সংগ্রামে তাঁদের নিকট জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা মুছিয়া গেল। তাঁরা উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁদের যখন মরিতেই হইবে, তখন শত্রুকে খতম করিয়া মরাই ভালো। এমন বেপরোয়া এমন দুর্ধর্ষ ও দুঃসাহসী পার্টিজান বাহিনীকে জার্মানীরা দমন করার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইল না। বরং তাঁরা জার্মানদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া জার্মানদেরই খতম করিতে লাগিলেন। নাৎসীদের হাতে শতশত প্রতিশোধাত্মক হত্যাকাণ্ডেও টিটোর অনুচরেরা পিছপা হইলেন না। মৃত্যুর জন্য তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। অধিকন্তু জার্মানদের নৃশংস অত্যাচারের ফলে টিটোর পার্টিজানবাহিনীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং তাঁরা জার্মানদের হাত থেকে দেশের পর্বত-অরণ্য-সঙ্কুল বৃহত্তর অংশ ক্রমাগত কাড়িয়া লইতে লাগিল।

...This confronted the Germans with a problem which could not be sloved by the mass executions of notables or persons of substance. They found themselves confronted by desperate men who had to be hunted down in their lairs. Toe Partisans under Tito

১। The Second Great War—Vol, VII, P. 2728.

wrested weapons from German hands. They grew rapidly in numbers. No reprisals, however bloody, upon hostages or villages deterred them. For them it was death or freedom. Soon they began to inflict heavy injury upon the Germans and became masters of wide regions.[১]

চার্চিলের এই বর্ণনা থেকেই বুঝা যাইবে যে, যুগোশ্লাভিয়ার মুক্তির জন্য টিটো এবং তাঁর পার্টিজান যোদ্ধারা কি ভয়ংকর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন। টিটোর শ্লোগানই ছিল Death to Fascism, Freedom to the people, অর্থাৎ ফ্যাসিজমের মৃত্যু এবং জনগণের মুক্তি। কোন প্রকার অত্যাচার কিংবা কোন ত্রাসসৃষ্টির দ্বারাই যুগোশ্লাভিয়ার গণমুক্তি আন্দোলনকে ঠেকাইয়া রাখা যায় নাই। জার্মান সূত্রেই স্বীকার করা হইয়াছে যে, মাত্র এক বছরের মধ্যে জার্মান সৈন্য ও পুলিশেরা যুগোশ্লাভিয়ার ৫০ হাজার নাগরিককে হত্যা করিয়াছিল এবং তার চিয়েও বেশী সংখ্যক লোককে তারা বন্দীনিবাসের মৃত্যুশিবিরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। এক একটা অভ্যুত্থানের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য তারা সমস্ত বাসিন্দাসহ গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল।[২]

তথাপি গোড়ার দিকে রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী চার্চিল বা বৃটেন যুগোশ্লাভ গবর্নমেণ্ট (লণ্ডন প্রবাসী) কর্তৃক স্বীকৃত জেনারেল মিহাইলোভিচকেই যুগোশ্লাভিয়ার দেশপ্রেমিক যোদ্ধারূপে মানিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া ১৯৪৩ সালের মে মাস থেকে বৃটেন তার এই ভ্রান্তনীতির সংশোধন করিল। মধ্য-প্রাচ্যের বৃটিশ সেনানীমণ্ডলীর প্রধান যুগোশ্লাভিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ নিয়া রিপোর্ট দিলেন যে, চেৎনিকরা নয়, আসল প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাইতেছে টিটোর গেরিলাবাহিনী। তিনি চেৎনিকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিলেন, এমনকি তাঁদেরকে সাবধান করিয়াও দিলেন। বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর যুগোশ্লাভ গবর্নমেন্টের উপর এই মর্মে চাপ সৃষ্টি করিলেন যে, মিহাইলোভিচ যেন নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন।

চার্চিল বরাবরই বলকান অঞ্চলের পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ন নজর রাখিতেছিলেন। কেননা, ভূমধ্যসাগর, ইতালী ও বলকান—এই গোটা অংশের রণনৈতিক গুরুত্ব চার্চিলের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। সুতরাং যখন তিনি দেখিলেন যে, বলকানে আসল প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাইতেছেন টিটোর গেরিলাবাহিনী এবং সেই বাহিনীর সৈন্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ২ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে, তখন চার্চিল ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টিটোর নিকট একটি বৃটিশ মিশন পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য তার আগেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যুগোশ্লাভিয়ার স্বদেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং নানাভাবে তাঁদেরকে সাহায্য দিয়া আসিতেছিলেন।

যুগোশ্লাভিয়ার নানা অংশে টিটোর গেরিলাবাহিনী জয় অর্জন করিতেছিল। সুতরাং নভেম্বর মাসের শেষে তিনি একটি রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করিলেন এবং সেই সম্মেলন থেকে যুগোশ্লাভিয়ায় একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করিলেন। কায়রোতে

১। Churchill Vol, V, P. 409.

২। Yugoslavia in the Seeond World War, P. 91.

অবস্থিত রয়েল যুগোশ্লাভ গবর্নমেণ্টকে অস্বীকার করিলেন এবং যুগোশ্লাভিয়ার পূর্ণ মুক্তি না-হওয়া পর্যন্ত রাজা পীটারকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে নিষেধ করিলেন। এদিকে চার্চিলের চাপে পড়িয়া পীটারও মিহাইলোভিচকে তাঁর যুদ্ধমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত করিলেন। ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় বৃটেন মিহাইলোভিচের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিল এবং যে সমস্ত বৃটিশ মিশন মিহাইলোভিচের এলাকায় কাজ করিতেছিল, সেগুলিকে প্রত্যাহার করিয়া আনা হইল। এই পটভূমিকার মধ্যে তেহরান সম্মেলনে চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিনের বৈঠকে যুগোশ্লাভিয়ার বিষয় বিবেচনা করা হইল এবং ১লা ডিসেম্বরের এক ঘোষণায় যুগোশ্লাভ পার্টিজান যোদ্ধাদের সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। অর্থাৎ টিটো এবং তাঁর বাহিনী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিলেন। যুগোশ্লাভিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পুনঃ সংস্থাপনের জন্যও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। তেহরান সম্মেলনের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন যুগোশ্লাভ সদর দপ্তরে একটি মিলিটারি মিশন পাঠাইল ১৯৪৪ সালের প্রথম ভাগে এবং যুগোশ্লাভ ন্যাশনাল কমিটিও মস্কোতে অনুরূপ একটি মিশন পাঠাইল। এদিকে চার্চিলও যুগোশ্লাভ মুক্তিবাহিনীর প্রধান মার্শাল টিটোর সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ দূত মারফৎ ব্যক্তিগত পত্র পাঠাইলেন এবং টিটোও তার যথারীতি উত্তর দিলেন। চার্চিল তাঁর চিঠিতে এবং যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিরোধ সম্পর্কে কমন্স সভার বক্তৃতায় (২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪) টিটো এবং তাঁর প্রতিরোধবাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।...

টিটো এবং তাঁর গেরিলাবাহিনী অমানুষিক যুদ্ধ ও প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা ক্রমে ক্রমে যুগোশ্লাভিয়ার সমস্ত অংশ দখল করিয়া নিলেন এবং বলকানের ভিতর দিয়া অগ্রসরমান লালফৌজের সহযোগিতায় জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে কাবু করিয়া ফেলিলেন। এই দিক দিয়া মার্শাল টিটো এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। তাঁর গণমুক্তি ফৌজের হাতে যুগোশ্লোভিয়ার মুক্তি ঘটিল এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইল। টিটোর ন্যাশনাল কমিটিকেই মস্কো যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দিল।

মুক্তিবাহিনীর চার বছরের যুদ্ধে যুগোশ্লাভ সৈন্য নিহত হইয়াছিল ৩ লক্ষ ৫ হাজার। আহত ৪ লক্ষের বেশী। যুগোশ্লাভিয়ার মোট প্রাণের ক্ষতি হইয়াছিল ১৭ লক্ষ। জার্মানী ও ইতালী মোট ৬টি অভিযান চালাইয়াও টিটোকে ঘায়েল করিতে পারিল না। এটা কম আশ্চর্যের কথা নয়।

এদিকে নাৎসী পক্ষপাতী ও কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী মিহাইলোভিচ তাঁর অনুচরদের নিয়া বোসনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করিলেন। কিন্তু ১৯৪৬ সালে মিহাই-লোভিচ ধরা পড়িলেন এবং দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর বিচার অনুষ্ঠিত হইল এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল।

* * *

যুগোশ্লাভিয়ার মত জার্মান অধিকৃত গ্রীসেও দেশপ্রেমিক গেরিলা যোদ্ধৃদল দেখা দিল এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানবাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত তাদেরকে দমন করিবার চেষ্টা করিল। যুগোশ্লাভিয়ার মত গ্রীসেও বাম ও দক্ষিণ দুইটি প্রতিরোধ বাহিনী সংগঠিত হইল। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার মত এই প্রতিরোধ যুদ্ধে মার্শাল টিটোর মত

কোন অসামান্য নায়ক ও যোদ্ধা গ্রীসে দেখা দিল না। ফলে, জার্মানদের বিরুদ্ধে পার্টিজান যোদ্ধা হিসাবে এমন কোন রণনায়কের আবির্ভাব ঘটিল না, যিনি মিত্রপক্ষের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাইতে পারেন। অথচ গ্রীসেও দুইটি প্রতিরোধ বাহিনী গঠিত হইয়াছিল—একটির নাম ছিল ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট বা ই. এ. এম. এবং তাদের সামরিক সংগঠনের নাম ই. এল. এ. এস. কিংবা গ্রীক পপুলার লিবারেশন আর্মি, এঁরা ছিলেন বামপন্থী কিংবা কমিউনিস্ট। এঁদের বিরোধী ছিলেন দক্ষিণপন্থীরা, এঁদের সংগঠনের নাম ছিল ই. ডি. ই. এস. বা গ্রীক ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক আর্মি। দক্ষিণ ও বাম এই দুই সংগঠন জার্মানদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাইলেও নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চালাইতে কম উৎসাহী ছিলেন না। এখানেও যুগোশ্লাভিয়ার মত হিংস্র তীব্র ও তিক্ত গৃহযুদ্ধের অনুষ্ঠান হইল ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪৪ থেকে ১১ই জানুয়ারী ১৯৪৫ পর্যন্ত। কিন্তু চার্চিল তথা বৃটিশ গবর্নমেণ্ট গ্রীসকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখিতে চাহিয়াছিলেন ভূমধ্যসাগরের রণনীতির বিচারে এবং তাঁরা এই দুই বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে আপোস রফা বিধানেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিছু দিন এই আপোসরফার চুক্তি পালিতও হইয়াছিল, কিন্তু তারপর আবার গৃহযুদ্ধ আত্মপ্রকাশ করিল। এখানেও রাজতন্ত্র কিংবা রাজা দ্বিতীয় জর্জকে নিয়া প্রবল মতবিরোধ দেখা দিল এবং বিশেষভাবে কমিউনিস্ট পন্থী ই. এল. ই. এস. রাজার বিরোধী ছিলেন। যখন সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানবাহিনী গ্রীস ছাড়িয়া পলায়ন করিতে শুরু করিল, তখন চার্চিল গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টিজান বাহিনী নিয়া বিশেষ উদ্বেগ বোধ করিলেন। কেননা, তাঁর আশঙ্কা হইল যে, জার্মানদের শূন্যস্থানে কমিউনিস্টরা দখলদার হইয়া বসিবে এবং রাজাসহ বাকী দক্ষিণ-পন্থীদিগকে উৎখাত করিবে। সুতরাং চার্চিলের নির্দেশে ও পরামর্শে গ্রীসকে কমিউনিস্টদের কবল থেকে রক্ষার জন্য বৃটিশবাহিনী গ্রীসে অবতরণ করিল এবং কঠোর হস্তে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গেরিলাবাহিনীকে দমন করিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সোভিয়েট রাশিয়া এই ব্যাপারে কোন বাধা সৃষ্টি করে নাই। কিংবা যুগোশ্লাভিয়াতে টিটোর পিছনে যেমন তাঁরা সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়াছিলেন, গ্রীসের কমিউনিস্টদের বেলা তাঁরা সেই সহায়তা দেন নাই—গ্রীসের ভাগ্য যেন একমাত্র বৃটেনের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ষষ্ঠ পর্ব

দ্বাদশ অধ্যায়

মহাযুদ্ধ ও ভারতের দুর্ভোগ

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর, যেদিন বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, সেদিন ভারতের বৃটিশ বড়লাটও সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে যুদ্ধরত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু বড়লাট লর্ড লিনলিথগো এতবড় একটা ঘোষণা দিতে গিয়া ভারতীয় জনমতের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা রাখিলেন না। জাতীয় জীবনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা বা পরামর্শের কোন প্রয়োজন বোধ করিলেন না। যুদ্ধ ঘোষণার শুরুতেই বৃটিশ ভাইসরয় যে স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিলেন, সেই স্বেচ্ছাচারিতা কার্যতঃ যুদ্ধের আগাগোড়া বজায় রহিল। কিন্তু পরাধীন ভারত বৃটেনের আজ্ঞাবহ-ভৃত্যরূপে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে রাজী ছিল না। ফলে, যেদিন যুদ্ধ ঘোষিত হইল, সেদিনই মাদ্রাজে যুদ্ধের বিরুদ্ধে হাজার হাজার লোক প্রতিবাদ জানাইল, বিক্ষোভ মিছিল বাহির করিল। আর ২রা অক্টোবর ১৯৩৯, বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হইল শ্রমিকদের বিরাট ধর্মঘট—যুদ্ধের বিরুদ্ধে ৪০টি কারখানার ৯০ হাজার শ্রমিকের এটাই ছিল প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট। এরপর জামসেদপুরের বিখ্যাত টাটা কোম্পানীর কারখানার শ্রমিকেরাও যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ধর্মঘটের অনুষ্ঠান করিলেন। দেশের বহু স্থানে শ্রমিক কৃষক ছাত্র ও যুবকেরা মিলিত হইয়া ভারতকে যুদ্ধের মধ্যে টানিয়া নেওয়ার বিরুদ্ধে সরকারী নীতির প্রতিবাদ জানাইলেন এবং একটি জাতীয় সরকারের হাতে সরকারী ক্ষমতা অর্পণের জন্য দাবী জানাইলেন।

পরাধীন ভারতকে জোরপূর্বক যুদ্ধের মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমত প্রতিবাদ জানাইল বটে, কিন্তু এই জনমত যেমন সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছিল, তেমনি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার স্বপক্ষে ছিল। ইউরোপে ফ্যাসিজম ও নাৎসীবাদের অভ্যুদয়ের পর হইতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিবাদ জানাইয়া আসিতেছিলেন। ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধে যখন বৃটেন ও ফ্রান্স 'নন-ইন্টারভেনশন'-এর (হস্তক্ষেপ না-করা) ভণ্ড নীতি অনুসরণ করিয়া কার্যতঃ ফ্যাসিস্ট শক্তিসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছিল, তখন কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐবছর ডিসেম্বর মাসে ফৈজপুর কংগ্রেস থেকে ঘোষণা করা হইল যে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসন বাড়িয়া যাইতেছে এবং ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে জোট পাকাইয়া ও পারস্পরিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিয়া যুদ্ধ বাধাইতে এবং ইউরোপ ও সারা দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব কায়েম করিয়া রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ধ্বংস করিতে চাহিতেছে।

পৃথিবীর সামনে যে নূতন উৎপাত দেখা দিয়াছে, সেই উৎপাতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল জাতি ও জনগণের মধ্যে যে সহযোগিতা প্রয়োজন কংগ্রেস সেই সম্পর্কে পূর্ণভাবে সচেতন ছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেস বহু আগে থেকেই ফ্যাসিজমের বিপদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হরিপুরা কংগ্রেস থেকেও ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের নিন্দা এবং যৌথ নিরাপত্তার (কালেকটিভ সিকিউরিটি) নীতির উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। যে কুখ্যাত মিউনিক চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লো-ভাকিয়াকে বলি দেওয়া হইয়াছিল, কংগ্রেস সেই চুক্তি এবং বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। অপর দিকে জাপানী আগ্রাসন নীতির বিরুদ্ধে জাপানী পণ্য বয়কটের জন্যও আহ্বান জানাইলেন। অর্থাৎ ভারতীয় কংগ্রেস যুদ্ধ ও ফ্যাসিজম সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই সচেতন ছিল।

তথাপি ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর যখন ভারতকে যুদ্ধরত বলিয়া ঘোষণা করা হইল, তখন বড়লাট ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একবারও পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন না। অধিকন্তু বড়লাটকে প্রায় ডিক্টেটরি ক্ষমতা দিয়া ১১ মিনিটের মধ্যে বৃটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ করানো হইল এবং এই আইনের বলে বড়লাট কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের বিধিবিধান লঙ্ঘনের অধিকারী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতরক্ষা আইন জারী করা হইল এবং এই আইনের বলে গভর্নমেন্টের হাতে স্বেচ্ছাচারিতার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা—বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতারি থেকে শুরু করিয়া মৃত্যুদণ্ডদান পর্যন্ত অর্পণ করা হইল।[১]

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, কংগ্রেস দীর্ঘ গবেষণার পর যে বিবৃতি প্রচার করিল, তাতে স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করা হইল যে, যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় পরিচালিত হইতেছে এবং যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভারতে ও অন্যত্র সাম্রাজ্যবাদকে পরিপুষ্ট করা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সেই যুদ্ধের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে কিংবা সহযোগিতা অর্পণ করিতে পারে না।

কংগ্রেস সরাসরি বৃটিশ সরকারের নিকট চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে জানিতে চাহিল—যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি, তা' দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হোক। গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের মতলব কি এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটেনের উদ্দেশ্য কি ও কি ভাবে এই সমস্ত নীতি বর্তমানে কার্যকর করিতে চান, সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হোক। ভারতবর্ষকে স্বাধীন জাতি হিসাবে গণ্য করার এবং ভারতীয় জনগণের ইচ্ছানুসারে গভর্নমেণ্ট পরিচালনা করার অধিকার দিতে বৃটেন প্রস্তুত আছে কি?

বলা বাহুল্য যে, জাতীয় কংগ্রেসের এই সরাসরি প্রশ্নের জবাবে বৃটিশ সরকার স্পষ্টাক্ষরে 'না' বলিলেন এবং সেই প্রথম মহাযুদ্ধের আমলের ডোমিনিয়ন স্টেটাসের প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করিলেন—যে প্রতিশ্রুতি গত ২২ বছরেও পালন করা হয় নাই। উল্লেখযোগ্য যে, এই ডোমিনিয়ন স্টেটাসও অবিলম্বেই দেওয়া হইবে না, যুদ্ধের পর কোন দূর ভবিষ্যতে দেওয়ার প্রস্তাব করা হইল। আর অনতিবিলম্বে দেওয়া হইল একটি 'পরামর্শ কমিটি' গঠনের প্রস্তাব, অর্থাৎ যুদ্ধ পরিচালনা ও ভারতকে দাবাইয়া রাখার জন্য বড়লাটকে পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে কমিটি গঠিত হইবে, তাতে ভারতীয়দিগকে গ্রহণ করা হইবে। বলা বাহুল্য যে, এমন প্রস্তাব স্বাধীনতাকামী ভারতের পক্ষে নিতান্তই অসম্মানজনক। সুতরাং বৃটেন কর্তৃক কংগ্রেসের দাবী অগ্রাহ্য

১। India Today—Rajani Palme Dutt, 1970, P. 552.

হওয়ার পর প্রতিবাদ স্বরূপ ১১টি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার মধ্যে ৮টি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাই পদত্যাগ করিলেন—সিন্ধু, পঞ্জাব ও বাংলা বাদে। এই তিনটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ছিল না।

যুদ্ধের গোড়া থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় স্বাধীনতাকামী জনমতের বিরুদ্ধে দমন ও পীড়ন নীতি অনুসরণ করিতে লাগিল। বিশেষভাবে যাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডনীতি উগ্র হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও সাম্প্রদায়িকতা উস্কাইয়া দিয়া জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঘায়েল করিতে চাহিল এবং তৃতীয়তঃ ভারতের উচ্চতর শ্রেণীকে, অর্থাৎ সম্পত্তি ও মূলধনওয়ালা মালিকপক্ষকে যুদ্ধের পর কিছু সুযোগ-সুবিধাদানের ও যুদ্ধের সময় প্রচুর মুনাফার প্রলোভন দেখাইয়া হাত করিতে চাহিল। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করিতেছিলেন। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইল এবং নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল। ১৯৪০ সালে ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের পতন এবং ডানকার্ক থেকে বৃটিশ সৈন্যদের পলায়ন—পরপর এই নাটকীয় ঘটনাগুলিতে সারা পৃথিবীতে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। বিশেষ-ভাবে পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধে ফ্রান্সের মত রাষ্ট্রশক্তির দ্রুত পতনে সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়া গেল। ফ্রান্স এবং পরাজিত পক্ষের প্রতি জাতীয়তাবাদী ভারতের যেমন সহানুভূতির উদ্রেক হইল, তেমনি জার্মান ফ্যাসিজমের অগ্রগতিতে প্রবল উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইল।

এই সময় জাতীয় কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আর-একবার আপোস-মীমাংসার চেষ্টা করিলেন। চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীর উদ্যোগে এই প্রস্তাব আগেকার তুলনায় অনেকখানি নরম করা হইল। এই প্রস্তাব ভারতীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং কেন্দ্রে একটি 'জাতীয় সরকার' অর্থাৎ নানা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়া একটি ন্যাশনাল গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী করা হইল। কিন্তু এর জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক নূতন কোন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল না, প্রচলিত ভারত সরকারের আইনের মধ্যে থাকিয়াই বড়লাট কর্তৃক একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করা হইল এবং যদি এই দাবী পূরণ করা হয়, তবে, ভারতের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সমস্ত প্রকার সহযোগিতা করা হইবে।

'It asked for a recognition of Indian freedom and the establishment of a national Government at the centre, which meant the co-operation of various parties. No fresh legislation by the British Parliament was envisaged at that stage. Within the legal framework then existing, Congress proposed that national government be formed by the viceroy······full co-operation in the war effort was offered'.[১]

কিন্তু এমন একটি নরম প্রস্তাবও বৃটিশ সরকার কর্তৃক গ্রাহ্য হইল না।

কিন্তু এই প্রস্তাব উপলক্ষে গান্ধীজীর সঙ্গে কংগ্রেসের বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। কেননা, ভারত কর্তৃক যুদ্ধে সহযোগিতা দানের অর্থ ছিল গান্ধীজীর শান্তিবাদ ও

অহিংস নীতির প্রত্যাখ্যান। যদিও গান্ধীজী অহিংস নীতির বিসর্জন দিয়া যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি মেজরিটি ভোটের জোরে তাঁর অহিংস নীতি অগ্রাহ্য হইল—জুলাই, ১৯৪০।

কিন্তু স্বাধীনতাকামী ভারতের সঙ্গে বৃটিশ সরকার কোন আপোসরফায় সম্মত ছিলেন না। সমস্ত কর্তৃত্ব, শাসন ও যুদ্ধ পরিচালনা তাঁরা নিজেদের হাতেই রাখিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এর প্রতিবাদে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৪০, অক্টোবর মাসে ব্যক্তিগত বা একক সত্যাগ্রহের আন্দোলন সংগঠিত হইল এবং নেতৃবৃন্দসহ প্রায় ২৫।৩০ হাজার লোক কারারুদ্ধ হইলেন—অক্টোবর, ১৯৪০, থেকে এক বছরের বেশী তাঁরা জেলে ছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলারী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হইল এবং ৪ঠা ডিসেম্বর অধিকাংশ কংগ্রেসী নেতা মুক্তি পাইলেন। এর তিন দিন পর জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযান শুরু হইল। সহসা যেন সমগ্র পৃথিবীর পট পরিবর্তন ঘটিয়া গেল।

সোভিয়েট রাশিয়ার জন্য ভারতবর্ষে প্রচুর সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। ফলে, সোভিয়েট রাশিয়া হিটলার কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের যেমন পরিবর্তন ঘটিয়া গেল তেমনি হিটলার-বিরোধী মহাজোট ক্রমে ভারতীয় জনমতের নিকট ফ্যাসিবিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ফ্যাসিজমের বিরোধিতা ও ভারতীয় স্বাধীনতার দাবীর উপর পুনরায় জোর দিয়া বলা হইল যে, একমাত্র স্বাধীন ভারতই ফ্যাসিবিরোধী মহাজোটের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করিতে সক্ষম।

রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর মহাযুদ্ধের চরিত্রের যে পরিবর্তন ঘটিয়া গেল সেকথা স্বয়ং জওহরলাল নেহরু তাঁর এক ঘোষণায় স্বীকার করিলেন:

'The progressive forces of the world are now aligned with the group represented by Russia, Britain, America and China'.[১]

পৃথিবীর প্রগতিকামী শক্তিগুলি এক্ষণে সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, যে গোষ্ঠীর সঙ্গে রহিয়াছে রাশিয়া, বৃটেন, আমেরিকা ও চীন—ডিসেম্বর ১৯৪১।

কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হইল:

Reflecting the mood of the broad masses whose sympathies were on the side of the U. S. S. R. and who were clamouring for active aid to the Soviet people in their struggle against the fascist aggressors, the All India Congress Committee passed an emergency resolution expressing its sympathy with the Soviet people and pointing out the historical significance of the measures undertaken to build a new society in the U. S. S. R. It also expressed the

sympathy of the Congress with the Chinese people in their struggle against Japanese aggression.[১]

কিন্তু কংগ্রেসের এই মনোভাবের সহিত ভারতীয় জনমতের সকলেই সম্পূর্ণ একমত ছিলেন, একথা বলিলে নিশ্চয়ই ভুল করা হইবে। কারণ গান্ধীজীর যুদ্ধবিরোধী অহিংসনীতির প্রতি যেমন নেতৃত্বের একাংশে সমর্থন ছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেও তেমনি অনেকেই অনিচ্ছুক ছিল। তবে, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ ও জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস হিটলার বিরোধী কোয়ালিশনের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু চার্চিলের নেতৃত্বে বৃটিশ সরকার বিন্দুমাত্র নত হইলেন না। বরং ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে চার্চিল-রুজভেল্ট কর্তৃক যে ঐতিহাসিক 'অতলান্তিক সনদ' ঘোষিত হইয়াছিল চার্চিল তার ব্যাখ্যা করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, নাৎসী অধিকৃত ইউরোপীয় রাজ্য ও জাতিগুলি সম্পর্কেই অতলান্তিক সনদ প্রযোজ্য, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশগুলির প্রতি এই সনদ প্রযোজ্য নহে!

কিন্তু ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অতলান্তিক সনদের এই চার্চিলীয় ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—

অতলান্তিক সনদ কেবল অতলান্তিক মহাসমুদ্রের তীরবর্তী দেশগুলির প্রতিই প্রযোজ্য নহে, সারা পৃথিবীর পক্ষেই উহা প্রযোজ্য।[২]

প্রকৃতপক্ষে রুজভেল্টের এই ঘোষণার দ্বারা কার্যতঃ ভারতের স্বাধীনতার দাবীর প্রতিই সমর্থন জানানো হইল। এই সময় অস্ট্রেলিয়া গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে উহার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এইচ. ভি. ইভাটও ভারতীয় জনগণের স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর প্রতি সমর্থন জানাইয়া বক্তৃতা দিলেন।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনারেল চিয়াং কাইশেক ও তদীয় পত্নী ভারত পরিদর্শনে আসিলেন এবং তাঁরাও প্রকাশ্যেই ভারতের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া বৃটিশ গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন জানাইলেন। চিয়াং কাইশেকের এই আবেদনে 'ভারতবাসীদের হাতে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণের' প্রস্তাব ছিল—যে প্রস্তাব কংগ্রেসের জাতীয় দাবীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

অতলান্তিক সনদের ব্যাখ্যায় চার্চিল যে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে মনোভাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন সেকথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তা ছাড়াও রুজভেল্ট ভারতীয় স্বাধীনতার দাবীর প্রতি সমর্থন জানাইয়া সরাসরি চার্চিলকে অনুরোধ করিয়া ছিলেন। যুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালের জুন মাসে 'খ্রিশ্চয়ান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকায় প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব সামনার ওয়েলস কর্তৃক লিখিত এক প্রবন্ধে চার্চিলের নিকট রুজভেল্টের এই প্রস্তাবের কথা প্রকাশ করা হইয়াছিল।

সেই প্রবন্ধের গোড়ায় স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছিল:

'In 1942 when Japanese menace was at its height and when unrest in India was acute, President Roosevelt urged Mr. Churchill

to agree that Indian independence should be no longer delayed and that the Indian leaders should be given the chance to frame a national constitution patterned upon the American Articles of Confederation...'[১]

এখানে স্মরণে রাখা উচিত যে, ১৯৪২ সালে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসন ও মহাযুদ্ধ যেন চুড়ান্ত পর্যায়ের দিকে যাইতেছিল, অথচ সেই সময় ভারতবর্ষে চলিতেছিল বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও অসন্তোষ। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ও চীনের পক্ষ থেকে ভারতের সঙ্গে আপোস মীমাংসার জন্য বৃটেনের উপর চাপ পড়িতেছিল। সুতরাং ৮ই মার্চ যখন জাপানীদের হাতে রেঙ্গুনের পতন ঘটিল, তখন অকস্মাৎ ১১ই মার্চ বৃটিশ সরকার ভারতের জন্য ক্রিপস মিশনের কথা ঘোষণা করিলেন।

বৃটিশ যুদ্ধমন্ত্রিসভা ভারতের জন্য একটি নূতন সাংবিধানিক পরিকল্পনার খসড়া রচনা করিয়াছিলেন এবং স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপসের উপর ভার দিয়াছিলেন সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতে মীমাংসার উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য। এই পরিকল্পনার দুইটি অংশ ছিল। একটি যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য এবং অপরটি চলতি যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য।

১। যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য প্রস্তাব করা হইল:

(ক) যুদ্ধের পর ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হইবে এবং ইচ্ছা করিলে ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিবে।

(খ) যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই একটি সংবিধান রচনা পরিষদ গঠিত হইবে। যুদ্ধের পর প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির সদস্যগণের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের জনগণের সংখ্যানুপাতিক হিসাবে নৃপতিবর্গ কর্তৃক আংশিকভাবে মনোনীত সদস্যগণের দ্বারা ভারতের জন্য একটি নূতন সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে এই পরিষদ গঠিত হইবে।

(গ) বৃটিশ ভারতের যে কোন প্রদেশ কিংবা যে কোন দেশীয় রাজ্য ইচ্ছা করিলে ভরতীয় ইউনিয়নের বাহিরে থাকিতে পারিবে কিংবা বর্তমান ভিত্তির উপরেই চলিতে পারিবে অথবা সমান অধিকার সহ আলাদা ডোমিনিয়ন হিসাবে একটি নূতন সংবিধানও রচনা করিতে পারিবে।

(ঘ) ভারতের জাতিগত ও ধর্মগত সংখ্যালঘুদিগকে রক্ষা করার যে বাধ্যবাধকতা বৃটিশ সরকারের রহিয়াছে, সেই অনুসারে সংবিধান রচনাকারী পরিষদের সঙ্গে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে।

২। যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য আশু প্রস্তাব এই:

ভারতীয় প্রতিনিধিগণের সঙ্গে পরামর্শমূলক সহযোগিতার অধিকারসহ বৃটেন কর্তৃক সমস্ত ক্ষমতা সংরক্ষণ।

বৃটিশ সরকার খুব ঢাক-ঢোল পিটাইয়া ভারতের সঙ্গে মীমাংসা করার নামে যে ক্রিপস্ প্রস্তাব বা পরিকল্পনা পেশ করিলেন, আসলে সেই পরিকল্পনা কেবল অন্তঃসার-শূন্যই ছিল না, বিপজ্জনকও ছিল। কেন না, যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতের হাতে

১। India To-day—R. Palme Dutt, P. 559.

বিন্দুমাত্র ক্ষমতা দেওয়া হইল না, জাতীয় সরকার গঠনের কোন অধিকার স্বীকার করা হইল না, অধিকন্তু ভবিষ্যৎ ভারতকে বিভিন্ন অংশে টুকরা টুকরা করার পরিকল্পনা করা হইল। এর দ্বারা একাধিক প্যাকিস্তান সৃষ্টির যেমন প্রস্তাব করা হইল, তেমনি দেশীয় রাজ্যগুলিকে (যেগুলির মোট সংখ্যা ৬ শতাধিক) আলাদা হইয়া যাওয়ারও অধিকার দেওয়া হইল।

আরও মজার কথা এই যে, কংগ্রেসের নেতৃবর্গ যখন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে এই পরিকল্পনা নিয়া আলোচনা করিলেন, তখন ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব উঠিলে নেতৃবৃন্দকে বলা হইল যে, ভারতীয়মন্ত্রী শুধু সৈন্যদের জন্য ক্যান্টিন ও স্টেশনারী দোকান চালাইবার অধিকার পাইবে! অধিকন্তু ক্রিপস্ পরিকল্পনাকে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে যখন ভাগে ভাগ বিবেচনার কথা উঠিল, তখন ক্রিপস্ সাহেব, পরিষ্কার বলিলেন—"Take it or leave it"—হয় গোটাটা গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা গোটাটাই বর্জন করিতে হইবে![1]

বলাই বাহুল্য যে, ক্রিপস্ প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল। জওহরলাল নেহরু লিখিয়াছেন যে, বৃটিশ প্রস্তাব কেবল যে কংগ্রেসই অগ্রাহ্য করিল, এমন নয়, প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। এমন কি, ভারতীয় রাজনৈতিক মহলের মধ্যে সবচেয়ে মডারেটপন্থী যাঁরা, তাঁরাও ক্রিপস্ প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন।[2]

অথচ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ বৃটেনের একজন বামপন্থী ও প্রগতিবাদী নেতারূপে পরিচিত ছিলেন। এমন কি ভারত সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতির মনোভাবও ছিল। সুতরাং ২২ মার্চ ১৯৪২, যখন তিনি লণ্ডন থেকে নয়াদিল্লীতে পৌঁছিলেন বৃটেনের যুদ্ধ মন্ত্রিসভার প্রস্তাব সহ, তখন স্বভাবতঃই ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে কিছুটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর আলোচনায় দেখা গেল যে, বৃটেন ভারতীয়দের হাতে কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতেই প্রস্তুত নহে, বরং ভবিষ্যতে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের ভিত্তিতে ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করার বিপজ্জনক চক্রান্ত ছিল ক্রিপস্ প্রস্তাবে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আলোচনার কিংবা ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (কংগ্রেসের প্রস্তাবিত) সংক্রান্ত চিঠির শেষ জবাব দেওয়ার আগেই স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ হঠাৎ ১২ই এপ্রিল নয়াদিল্লী ত্যাগ করিয়া বিমানযোগে লণ্ডনে ফিরিয়া গেলেন এবং যাওয়ার আগে এমন একটি বিবৃতি দিয়া গেলেন, যাতে ভারতবর্ষে তীব্র ক্ষোভ ও তিক্ততার সৃষ্টি হইল।

এদিকে ক্রিপস্ প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যান উপলক্ষ করিয়া বৃটিশ মন্ত্রিসভা ও তাঁদের অন্ধ সমর্থকগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে ভারতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যা প্রচার করিতে শুরু করিলেন। কেন না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে ভারতের জাতীয় দাবী ও ফ্যাসি-বিরোধী মনোভাবের প্রতি প্রভূত সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। আসলে, সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল ভারতীয় স্বাধীনতার এক নম্বর শত্রু ছিলেন এবং বৃটিশ যুদ্ধ মন্ত্রিসভাও ভারতের প্রতি একেবারে সহানুভূতিশূন্য ছিলেন। সেই সময় ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়েভেল

১। রজনী পাম দত্ত—পৃষ্ঠা ৫৬০-৬১।
২। ডিসকভারি অব্ ইন্ডিয়া—পৃঠা ৪৭৩।

স্বয়ং তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, চার্চিল ভারতকে ঘৃণা করিতেন এবং বৃটেনের যুদ্ধ মন্ত্রিসভাও ভারত সম্পর্কে আন্তরিক ছিলেন না কিংবা তাঁদের কোন দূরদৃষ্টি বা রাজনৈতিক সাহসও ছিল না। গান্ধীজী সম্পর্কে উইনস্টোন চার্চিলের এমন অবজ্ঞা ছিল যে, ১৯৪৪ সালের ৮ই মে তিনি লর্ড ওয়েভেলকে এক তারবার্তা পাঠাইয়া জানিতে চাহিলেন যে, গান্ধী এখনও মারা যান নি কেন ?

[Winston sent me a peevish telegram to ask why Gandhi had not died yet ?][১]

সোজা কথায় বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতীয় জাতীয় দাবীর প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন এবং চার্চিল সমগ্র যুদ্ধটাই বৃটেনের পক্ষ থেকে পরিচালনা করিতেছিলেন একান্তরূপে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য। সুতরাং ভারতের সঙ্গে অতি তীব্র ও তিক্ত সম্পর্কের উদ্ভব হইল। ভারতীয় জনমত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, যার পরিণতিতে ঘটিল সেই ইতিহাস বিখ্যাত 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব—গান্ধীজী 'হরিজন' পত্রিকায় এই চাঞ্চল্যকর দাবী তুলিলেন। ১৯৪২ সালের ৭ই এবং ৮ই আগস্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় এই দাবী উত্থাপিত হইল এবং বৃটেনের উদ্দেশ্যে কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাবটি সমগ্র জাতির নিকট একটি রণধ্বনি বা শ্লোগানের মত প্রতিধ্বনিত হইল। ভারতের আত্মসম্মান ও স্বাধীনতার অপরিহার্য দাবীর মর্যাদা রক্ষার জন্য পুনরায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস অহিংস গণ-আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ভারতবর্ষের সংকট চরম পর্যায়ে পেঁৗছিল।

'অবিলম্বে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান' দাবী করিয়া বোম্বাইতে কংগ্রেস প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, অর্থাৎ ৯ই আগস্ট ভোরবেলা ভারত সরকার গান্ধী, নেহরু আজাদ, প্যাটেল, কৃপালনী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ সমস্ত জাতীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করিলেন। একমাত্র বোম্বাইতেই ১৪৮ জন ধৃত হইলেন। ভারত সরকার পূর্বাহ্নেই গ্রেপ্তারি পরিকল্পনাসহ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হইল এবং সমগ্র ভারতে ধরপাকড় ও দমননীতি প্রসারিত হইল।

কিন্তু সারা ভারতের পরিস্থিতি ইতিমধ্যে বিস্ফোরণের অবস্থায় পেঁৗছিয়াছিল। সুতরাং জাতীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল—যে বিদ্রোহ ১৯৪২ সালের 'আগস্ট বিপ্লব' নামে ভারতের ইতিহাসে খ্যাত। এই বিদ্রোহ ঘটিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কেন না, কংগ্রেস এই বিদ্রোহে ডাক দেয় নাই এবং বিশিষ্ট নেতারা সকলেই ছিলেন কারা-অন্তরালে। ফলে জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ছিল নেতৃত্ব-বিহীন। অন্য পক্ষে বৃটিশ ভারতীয় সরকার প্রতি-হিংসাপরায়ণ, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হইয়া উঠিল। সারা ভারতে পুলিশ ও মিলিটারি যদৃচ্ছা গুলি চালাইয়া বিদ্রোহ দমন করিতে মরিয়া হইয়া উঠিল। নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের হোম মেম্বর এক বিবৃতিতে বলিলেন যে, ৯ই আগস্ট, থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২—এই কয় মাসে ৬০,২২৯ জন লোককে গ্রেপ্তার, ১৮,০০০ ব্যক্তিকে ভারত রক্ষা আইনে আটক, পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে ৯৪০ জনকে নিহত এবং ১,৬৩০ জনকে আহত করা হইয়াছে।[২]

জওহরলাল নেহরু লিখিয়াছেন যে, জনগণের অবরুদ্ধ ক্রোধ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। বৃটিশ শাসন ক্ষমতার প্রতীক স্বরূপ তাঁরা হাতের কাছে যাহা কিছু পাইলেন আক্রমণ করিতে লাগিলেন। থানা, পুলিশ, রেললাইন, রেলস্টেশন, ডাকঘর, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার ইত্যাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে লাগিলেন। নেতাশূন্য, অস্ত্রশূন্য এই জনতা পুলিশ ও মিলিটারির গুলির মুখে দাঁড়াইল। সরকারী বিবৃতেই প্রকাশ যে, ৫৩৮টি ঘটনা উপলক্ষে গুলি চালনা করা হইয়াছে এবং আকাশের নীচু দিয়া উড়িয়া গিয়া বিমান থেকে মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করা হইয়াছে। আর চার্চিল দম্ভভরে কমন্স সভায় ঘোষণা করিলেন যে, সরকার কঠোর হস্তে গোলযোগ দমন করিয়াছেন এবং ভারতে এই সময় এত বেশী গোরা সৈন্য ছিল যে, বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে তা' অভুতপূর্ব ![১]

আগস্ট বিপ্লবে সারা ভারতে জনতার হাতে প্রায় শ'খানেক লোক মারা গিয়াছিল। কিন্তু সরকারী হিসাবেই প্রকাশ যে, আগস্ট বিপ্লব দমন করিতে গিয়া পুলিশ ও মিলিটারি ১০২৮ লোককে নিহত এবং ৩২০০ লোককে আহত করিয়াছে। কিন্তু বে-সরকারী মতে ২৫ হাজার লোক নিহত হইয়াছিল। অপর পক্ষে নেহরুজীর ধারণা মোট নিহতের সংখ্যা ১০ হাজার।[২]

গ্রেপ্তারি, আটক ও হতাহত ছাড়া অন্যান্যভাবেও অত্যচারের বান ডাকানো হইয়াছিল। বহু জায়গায় কংগ্রেসের দপ্তর ও ঘরবাড়ী ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং কমন্স সভায় ভারত সচিব মিঃ আমেরী স্বীকার করিয়াছিলেন যে ভারতীয় জনগণের উপর ৯০,০০০০০ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছিল এবং এর মধ্যে ৭৮,৫০,০০০ টাকা আদায় করা হইয়াছিল। অর্থাৎ দরিদ্র ভারতবাসীর রক্ত মোক্ষণ করিয়া বৃটিশ ভারতীয় সরকার এই বিপুল পরিমাণ জরিমানার টাকা আদায় করিয়াছিলেন!

নিমর্মতা ও প্রতিহিংসার দ্বারা বৃটিশ শাসন কর্তৃপক্ষ ভারতের আগস্ট বিপ্লব দমন করিয়াছিলেন এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলের সেই কুখ্যাত দম্ভোক্তি পুরাপুরি বজায় রহিয়াছিল—

'I have not become the King's first minister in order to preside over the liquidition of the British Empire.'

অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কারবারে লালবাতি জ্বালাইবার জন্য আমি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করি নাই।

যদিও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের কারবারে লালবাতি জ্বলিয়াছিল' এবং স্বয়ং চার্চিলই স্বচক্ষে সেই লালবাতির রক্তশিখা দেখিয়া গিয়াছিলেন, তবু একথা সত্য যে, ১৯৪২ সালে চার্চিল ভারতের জাতীয় দাবীর প্রতি বিন্দুমাত্র আপোসের মনোভাব দেখান নাই এবং ফ্যাসিজমের বিরোধী হওয়া সত্বেও স্বাধীনতাকামী ভারতকে যেন বন্দীশালায় আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল।

* * *

১৯৪২ সালে বৃটেনের সহিত জাতীয়তাবাদী ভারতের বিচ্ছেদ ও আগস্ট বিদ্রোহের পর ১৯৪৩ সালে ভারতের অবস্থা ক্রমশঃ চরম পর্যায়ের দিকে যাইতেছিল। যুদ্ধের

১। ডিসকভারি অব্ ইন্ডিয়া—পৃষ্ঠা ৪৯৬।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক,—পৃষ্ঠা ৫০০।

থওকায় ভারতের এক শ্রেণীর লোক গভর্নমেন্ট সমরবিভাগের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জন করিল বটে, কিন্তু জনসাধারণের স্কন্ধে যুদ্ধের বোঝা অসহনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত যদিও আসল রণক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে ছিল, তথাপি জনগণের উপর অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপ কম ছিল না। দারিদ্র্য ও অন্নাভাব জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে ক্লেশকর করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের জনগণের অবস্থা অনেক বেশী দুর্বিষহ হইয়া উঠিল। অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি এবং শেষ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ভারত একটা যুদ্ধের ঘাঁটিতে পরিণত হইল এবং তার দুই পার্শ্বদেশে পশ্চিমে ইরান ও মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্ব দিকে ব্রহ্মদেশ ও মালয় ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের মধ্যে পড়িল। ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর নৌ-অভিযানের আওতার মধ্যে আসিল। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জাপানী অধিকারে চলিয়া গেল এবং যে কোন মুহূর্তে সিংহল দ্বীপ ও ভারতীয় উপকূলভাগ জাপানী নৌ ও বিমান আক্রমণের সম্ভাবনার মধ্যে পড়িল। অধিকন্তু পূর্ব ভারতে জাপানী স্থলসৈন্যের অনুপ্রবেশ ও আক্রমণের সম্ভাবনা আতংক বিস্তার করিল। কলিকাতা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত জাপানী বোমারু অভিযানের আশংকা জনগণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। আর সেই সঙ্গে ব্রহ্মদেশ থেকে পলায়িত অজস্র ভারতীয় নাগরিকের পূর্ব ভারতে আশ্রয় প্রার্থীরূপে আগমন এবং তাঁদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কাহিনী সারা ভারতে তুমুল উত্তেজনা ও আতংকের সঞ্চার করিল। পূর্ব দিক থেকে শত্রুর আগমন প্রথমে পূর্ববঙ্গেই ঘটিবে অনুমান করিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ "পোড়া মাটির নীতি" অনুসরণ করিতে চাহিলেন এবং এজন্য পূর্ববঙ্গের হাজার হাজার নৌকা ধ্বংস করিয়া ফেলা হইল। অথচ অজস্র নদীনালা ও খাল বিলের দেশ পূর্ববঙ্গে নৌকাই ছিল জনগণের সবচেয়ে বড় বাহন। এভাবে নৌকা ধ্বংস হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ যেমন একে অপরের কাছ থেকে যোগাযোগের অভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, তেমনি তাদের জীবিকার্জনের প্রধান অবলম্বন নষ্ট হইয়া গেল। পঞ্চাশের মন্বন্তরে পূর্ববঙ্গে অজস্র মানুষের মৃত্যুর এটাও ছিল অন্যতম কারণ। ভারতের সরকারী কর্তৃপক্ষ জাপানীদের আক্রমণের আশংকায় এমন 'নার্ভাস' হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ভারত মহাসাগরে জাপানী নৌবহরের অভিযান ও মাদ্রাজ আক্রমণের গুজবে বিশ্বাস করিয়া মাদ্রাজ থেকে সরকারী অফিসারেরা পলায়ন করিলেন এবং মাদ্রাজের পোতাশ্রয়ের একটা অংশ পর্যন্ত ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন!'[১]

দক্ষিণ এশিয়াতে ভারত যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রে পরিণত হইল। লক্ষ লক্ষ বৃটিশ ভারতীয় সৈন্য ছাড়াও আফ্রিকান আমেরিকান ও চীনা সৈন্য ভারত ও ব্রহ্মদেশে ভীড় করিল এবং এদের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব ভারতের স্কন্ধে পড়িল। অপরদিকে বিদেশ থেকে যুদ্ধের আগে ভারতে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টন যে খাদ্য-শস্য আমদানি হইত, জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে এবং ইন্দোচীন, থাইল্যান্ড ও বার্মার পতনের ফলে সেই সমস্ত আমদানি বন্ধ হইয়া গেল। ১৯৪২ সালের শরৎকালে মেদিনীপুরে ভয়াবহ সাইক্লোন ও বন্যার ফলে প্রচুর শস্যহানি (১০ লক্ষ টন) ঘটিল। এদিকে গভর্নমেন্টের হাতে জনসাধারণের জন্য কোন মজুত শস্য-ভাণ্ডার ছিল না। কারণ, জনসাধারণকে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বের কথা তাঁরা চিন্তাও করেন নাই। যুদ্ধের

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৪৭৫।

জরুরী অবস্থায় যে কন্ট্রোল ও রেশনিং অপরিহার্য ছিল, শাসন কর্তৃপক্ষ অনেকদিন পর্যন্ত সেই দিক দিয়া কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। সুতরাং ক্রমে ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের প্রথম পদধ্বনি যখন শুনা গেল, তখন গভর্নমেণ্টের ঔদাসীন্য ভঙ্গ হইল না। বরং ভারত রক্ষা আইন অনুসারে সংবাদপত্রে দুর্ভিক্ষ এমনকি সাইক্লোনের সংবাদ ও ফটো ছাপানো পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল।*

ইংরাজী ১৯৪৩ সাল কিংবা বাংলা ১৩৫০ সাল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্য ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছিল। বাংলার জনগণের কাছে এই দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে খ্যাত। ১৯৪৩ সালে প্রথমে বোম্বাইতে এর আরম্ভ, তারপর ক্রমে দেশের বৃহত্তর অংশে ছড়াইয়া পড়িল। বাংলা, মাদ্রাজ, বিহার, ওড়িশা ও আসাম পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িল। ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ কিংবা ১২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হইল।

প্রধানতঃ গ্রাম্য অঞ্চলের গরীব চাষী, ভূমিহীন মজুর ও কারিগর শ্রেণীর লোকেরাই সবচেয়ে বেশী মারা পড়িল। এই দুর্ভিক্ষ সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করিল বঙ্গদেশে। বাংলার গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে ও কলিকাতার রাস্তায় হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষের মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল।[১]

সেই সময় কলিকাতা মহানগরীর গৃহস্থ বাড়ীর দরজায় প্রায়শই অনাহারক্লিষ্ট নরনারী ও শিশুর করুণ আর্তনাদ শুনা যাইত 'মাগো, একটু ফ্যান দাও।'

১৭০ বছরের বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে এমন ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ আর কখনও হয় নাই। বাংলায় ও বিহারে যখন বৃটিশ শাসন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই ১৭৬৬ থেকে ১৭৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষের সঙ্গেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। দুর্ভিক্ষের পথ ধরিয়া গ্রামে গ্রামে যে মহামারী দেখা দিল, তার ফলেও অগণিত মানুষ প্রাণ হারাইল। কত লক্ষ লোক যে এই মন্বন্তরের ফলে মারা গিয়াছে, তার সঠিক হিসাব কোন দিন নির্ণীত হইবে না। স্যার জন উডহেডের নেতৃত্বে যে সরকারী দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিশনের মতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বাংলায় ১৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় জনমতের নিকট এই সংখ্যা সঠিক বলিয়া গৃহীত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এই সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাতে মৃতের সংখ্যা ৩৪ লক্ষ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। শ্রী কালীচরণ ঘোষ তাঁর বাংলার দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত পুস্তকে (মস্কো থেকে প্রকাশিত) মৃতের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ থেকে ৪৫ লক্ষ পর্যন্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ একমাত্র যুদ্ধের জন্য কিংবা প্রকৃতিক দুর্যোগের জন্যই সংঘটিত হয় নাই। স্বয়ং জওহরলাল নেহরু এই দুর্ভিক্ষকে 'মনুষ্য সৃষ্ট' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। গভর্নমেণ্টের অবহেলা, সরকারী আমলাতান্ত্রিক গাফিলতি এবং সরকার

* মহাযুদ্ধের সময় গ্রন্থকার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁকে বহুবার ভারতরক্ষা আইনের মুখে পড়িতে হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের মেদিনীপুরের সাইক্লোন সম্পর্কে গ্রন্থকারের লেখা "ঝড়ের বন্ধন মুক্তি" সম্পাদকীয় প্রবন্ধেরজন্য গভর্নমেণ্ট তিন দিনের জন্য যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। —লেখক।

নিযুক্ত এজেন্টদের মুনাফাখোরি, মজুতদারি ও কালোবাজারির জন্যই এই প্রচণ্ড বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। বৃটিশ ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের হাতে সরকারী খাদ্য ব্যবসায় ও বণ্টনের ভার ছিল এবং তারা ইচ্ছামত দাম চড়াইয়া মুনাফাবাজির চরম করিয়াছিল। অধিকন্তু মিলিটারি কনট্রাকটারদের হাতে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত ছিল। এরাও মজুতদারি ও মুনাফাবাজির দিকে ঝুঁকিয়াছিল। সরকারী অক্ষমতা, হৃদয়হীনতা, দুর্নীতি ও অপরিমিত লোভের কারসাজির জন্য পঞ্চাশের মন্বন্তর এত ব্যাপক ও ভয়াবহ হইয়াছিল। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয়দের জীবন ও নিরাপত্তা বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিল। বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধের সময়কালে বৃটেনে যখন রেশনিং ও কণ্ট্রোল সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এবং জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল, তখন বৃটিশ-ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া মারা গিয়াছিল।

সেই সময় থেকেই ভারতীয় ব্যবসার সঙ্গে মজুতদারি, মুনাফাবাজি ও কালোবাজারি শব্দগুলির ব্যাপকভাবে প্রচার হইতে থাকে এবং মহাযুদ্ধের পরেও সমাজজীবনে এই পাপ প্রচণ্ডভাবে চলিতে থাকে—আজও (১৯৮৬ সালেও) এই পাপ সমানভাবে চলিতেছে।

মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ভারতে এত ব্যাপক মজুতদারি, মুনাফাবাজি ও কালোবাজারি ছিল না। ভারতীয় সমাজজীবনে এটা ছিল মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিশাপ। সমাজের নৈতিক পতন ও দুর্নীতির আর-একটা বড় দিক এই সময় থেকে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। অর্থাৎ গণিকাবৃত্তি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। এমনকি, তথাকথিত 'ভদ্রমহলে' পর্যন্ত এই পাপ গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। বিদেশী সৈন্য ও অফিসারদের মনোরঞ্জন ও অবসর বিনোদনের নাম করিয়া 'সরকারী' ও 'বেসরকারী' পৃষ্ঠপোষকতায় গণিকাবৃত্তির বহুল প্রচলন হইয়াছিল। মিলিটারির নানা শাখায় মেয়েদের চাকুরী এই দুর্নীতিকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছিল।

অর্থাৎ ১৯৪৩ সাল যুদ্ধক্লিষ্ট ভারতের সমাজ জীবনে দুর্ভিক্ষ, অনাহারে মৃত্যু, মহামারী ইত্যাদি যেমন ডাকিয়া আনিয়াছিল তেমনি আর্থিক লালসা ও দুর্নীতির বান ডাকাইয়াছিল। স্যার জন উডহেডের নেতৃত্বে সরকার নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি ও অনাচারের জন্য কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে এবং মন্তব্য করা হইয়াছে যে সরকার যদি উপযুক্ত সময়ে সাহসিকতাপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তবে, এই ব্যাপক বিপর্যয় ঘটিত না।

কিন্তু সরকারী ঔদাসীন্য, অক্ষমতা এবং সমাজের মধ্যে আর্থিক লালসা—এই বিপর্যয়কে গভীর করিয়া তুলিল। কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

'Enormus profits were made out of the calamity, and in the circumstances, profits for some meant death for others. A large part of the community lived in plenty while others starved, and there was much indifference in face of suffering. Corruption was widespread throughout the province and in many classes of society.'

'The total profit made in this traffic of starvation and death is estimated at 150 crores of rupees (Rs. 1,500 millions). Thus if

there were a million and a half deaths by famine, eaeh death was balanced by roughly a 1,000 rupees of excess profits !'

অর্থাৎ এই বিপর্যয় থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা হইয়াছিল এবং যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাতে কিছু লোকের মুনাফার অর্থই অপরের মৃত্যু। অপর সমস্ত লোক যখন অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তখন সমাজের এক বৃহৎ অংশ দিব্যি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করিয়াছে এবং অপরের দুর্ভোগের জন্য তাদের কোন মাথাব্যথাও ছিল না। সমগ্র প্রদেশব্যাপী এবং সমাজের বহু অংশে দুর্নীতি ছাইয়া গিয়াছিল। ক্ষুধা ও মৃত্যুর এই ব্যবসায়ে মোট ১৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জিত হইয়াছিল। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের ফলে যদি ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তবে, প্রতি মৃত্যুর জন্য হাজার টাকা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জিত হইয়াছে![১]

দুর্ভিক্ষের ফলে, সরকারী মতে যদি ১৫ লক্ষ লোকেরও মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে, মজুতদারেরা ও ব্যবসায়ীরা প্রতি মৃত্যুর জন্য এক হাজার টাকা করিয়া লাভ করিয়াছে! পরাধীন ভারতের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বোধ হয় চরম মূল্য দিয়াছেন গ্রাম-বাংলার গরীব মানুষেরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পৃথিবীর অন্য কোথাও দুর্ভিক্ষে এত লোকের প্রাণ যায় নাই। এমন করুণ দৃশ্যেরও আর-কোথাও অবতারণা হয় নাই। ৩৫ থেকে ৪০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকের হৃদয় এতটুকু টলিল না। ভারতের স্বাধীনতার দাবী যেমন অগ্রাহ্য হইল, তেমনি লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যুও উপেক্ষিত হইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম বিশ্বনেতা উইনস্টোন চার্চিল বহুগুণের অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতবাসীর প্রতি তাঁর অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির নিকৃষ্টতম উদাহরণ ভারত সম্পর্কে তাঁর এই ঘৃণিত মনোভাব!—যে মনোভাবের জন্য ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্য পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছিল।

১। দি ডিসকভারি অব্ ইণ্ডিয়া—জওহরলাল নেহরু, পৃষ্ঠা ৫১১।

ষষ্ঠ পর্ব

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও ভূমিকা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর বহু দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও ভূমিকা নিয়া প্রচণ্ড বিরোধ ও বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ, আন্তর্জাতিক পার্টি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি প্রধানতঃ সোভিয়েত রাশিয়াকে, বিশেষভাবে মস্কোর পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইত এবং সেই সময় একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। বলা বাহুল্য যে, ফ্যাসিজম ছিল কমিউনিজমের নামডাকা শত্রু। সুতরাং মুসোলিনীর ইতালী বা হিটলারের জার্মানীর সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক ছিল বৈরিতার সম্পর্ক। এই অবস্থায় যখন হিটলারের জার্মানী ও স্ট্যালিনের রাশিয়ার সঙ্গে ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট দশ বছরের জন্য আচম্বিতে এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল, তখন সারা দুনিয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই স্তম্ভিত অবস্থা ও বিহ্বলতা চলিল ১৯৪১ সালের ২২শে জুনের পূর্ব পর্যন্ত। অর্থাৎ নাৎসী নায়ক হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত না-হওয়া পর্যন্ত। ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিস্টরা এক নিদারুণ কুজ্ঝটিকার মধ্যে পড়িলেন। কেন না, তাঁরা পূর্ব থেকেই প্রচার করিতেছিলেন যে, বৃটেন, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে নাৎসী জার্মানীর আসন্ন যুদ্ধ হইতেছে দুই সাম্রাজ্যবাদী পক্ষের যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে জনগণের কোন সাহায্য দেওয়া বা সহযোগিতা করা উচিত নয়। কিন্তু রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর একেবারে বিপরীত অবস্থার উদ্ভব হইল। মস্কো থেকে এমনও প্রচার করা হইল যে, হিটলার শান্তিবাদী, ফ্রান্স ও বৃটেনই যুদ্ধবাজ। ১৯৩৯ সালের ৩১ অক্টোবর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভ সুপ্রীম সোভিয়েতে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাতে এই ধরনের মন্তব্য ছিল। এমনকি, ১৯৪০ সালের ৩০শে নভেম্বর 'প্রাভদা' পত্রিকায় স্বয়ং স্ট্যালিনের মন্তব্যে ও অন্যান্য রুশ পত্রিকায় এবং মস্কো রেডিওতে নাৎসী জার্মানীর স্বপক্ষেই প্রচার কার্য চালানো হইয়াছিল, যদিও আজ এগুলি অবিশ্বাস্য মনে হইবে।*

অবশ্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তিসঙ্গতভাবেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে (রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের আগে) প্রচার করিতেছিলেন। এমন কি কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা এবং কংগ্রেস ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। কিন্তু ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলারী জার্মানী কর্তৃক অকস্মাৎ সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর সমগ্র পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোলাটে হইয়া উঠিল। কারণ, ভারত ছিল তখন সম্পূর্ণরূপে বৃটেনের অধীন। ভারতের কোনও জাতীয় দাবী বা স্বাধীনতার দাবী বৃটিশ ভারতীয় সরকার কিংবা খোদ বৃটিশ সরকার মানিয়া নিলেন

---

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯২-৯৩।

না। বরং কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত এবং জাতীয় নেতারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অথচ ট্রাজিডি এই যে, কংগ্রেস ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের সপক্ষে ছিলেন। তাঁরা ভারতীয় স্বাধীনতার শর্ত সাপেক্ষে যুদ্ধে সহযোগিতা করিতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এর পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সারা ভারতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, অসন্তোষ ও ক্রোধ দেখা দিল। কিন্তু বৃটিশের বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ড বিক্ষোভের দিনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা যুদ্ধে সাহায্যদানের জন্য আগাইয়া আসিলেন। কারণ, হিটলার কর্তৃক "বিশ্বের একমাত্র শ্রমিক কৃষক ও মেহনতী মানুষের রাষ্ট্র" আক্রান্ত হওয়ার ফলে সমগ্র যুদ্ধের চেহারা ও চরিত্র পালটাইয়া গিয়াছিল। যুদ্ধটা আর একমাত্র, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছিল না, ছিল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী মানুষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধ। সুতরাং নীতি ও আদর্শ হিসাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধে সহযেগাগিতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ফলে, যে কমিউনিস্ট পার্টি ৮ বছর ধরিরা নিষিদ্ধ ছিল, ১৯৪২ সালের ২২ শে জুলাই সেই পার্টির উপর ছেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হইল। সুতরাং তখনকার দিনের ভারতীয় রাজনীতিতে এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হইল। কারণ, ভারতের জাতীয় নেতারা যখন কারান্তরালে বন্দী এবং আগস্ট মাসে যখন বৃটিশ শাসন ও ত্রাসননীতির বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ দেখা দিল এবং যে বিদ্রোহ 'আগস্ট বিপ্লব' নামে পরিচিত, সেই দুর্দিনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধন, মুক্তি ও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যদানের ইচ্ছা ভারতীয় ভাতীয়তাবাদী মহলে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। সোভিয়েত রাশিয়ার মহান স্বদেশাত্মক যুদ্ধে যে ইতিহাস-বিখ্যাত 'পিপলস্ ওয়ার' বা জনযুদ্ধের নীতি ঘোষিত ও অনুসৃত হইয়াছিল, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতিতেও তার প্রতিধ্বনি শুনা গেল। একদা যে যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য যুদ্ধ, সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ সেই যুদ্ধ একেবারে 'জনযুদ্ধের' মূর্তি ধারণ করিয়া পরাধীন ভারতের মাটিতে আবির্ভূত হইল। এমন অদ্ভুত আকস্মিক রূপান্তরের মহিমা জাতীয়তাবাদী মহলের অনেকের কাছেই স্পষ্ট ও বোধগম্য ছিল না। সুতরাং সেদিন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যেমন নিন্দা ও গ্লানির বান ডাকিয়াছিল, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে 'আগস্ট বিপ্লবে' বাধাদান ও ফলে 'দেশদ্রোহিতার' গুরুতর অভিযোগও উঠিয়াছিল। এমন কি, বৃটিশ সরকারের সঙ্গে 'অশুভ মিতালী' ও যোশী-ম্যাক্সওয়েল চুক্তি' ইত্যাদি চক্রান্তের অভিযোগ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রচারিত হইল। কোন কোন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে হামলা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এত নিন্দা, গ্লানি এবং আক্রমণ সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির নৈতিক শক্তি ভাঙিয়া পড়ে নাই, কিংবা কমিউনিস্ট নেতারা তাঁদের আদর্শ ও নীতি থেকে সরিয়া দাঁড়ান নাই। বরং ১৯৪২ সালে যে পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০০, মাত্র এক বছরের কম সময়ের মধ্যে ১৯৪৩ সালের মে মাসে তাদের সংখ্যা দাঁড়াইল ১৬ হাজার। কলকারখানা বা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিতে (৩ লক্ষের বেশী সদস্য) কিষাণসভা সমূহে মহিলাদের (সদস্য সংখ্যা ৪১ হাজার) ও ছাত্র সংগঠনে এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে ২৫ হাজার সদস্য যোগ দিল। ১৯৪৩ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির

প্রথম কংগ্রেসে ১৬ হাজার সদস্যের পক্ষ থেকে ১৩৯ জন ডেলিগেট যোগ দিয়াছিলেন এই কাংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের মূল সুর অনুধাবন বরিলেই বুঝা যাইবে যে, কমিউনিস্টদের দেশপ্রেম, ভারতীয় স্বাধীনতার প্রতি দরদ ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভারতের মুক্তিকামী কোন পার্টির চেয়েই কম ছিল না। সেই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল এই ঃ

'The keynote of the Communist Party Congress was to mobilise all the country's forces in the struggle against the block of Fascist aggressors and turning the war into a people's war. At the some time it urged the masses to struggle for India's independence, for the establishment of a national government for the release of all political prisoners, including the Congress leaders'.[১]

অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত শক্তি সংহত করিতে এবং এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করিতে হইবে। সেই সঙ্গে একই সময়ে দেশের জনগণকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য এবং একটি জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় জন্য এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সহ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য লড়াই করিতে হইবে।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে কি হইবে, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের নীতি যুদ্ধারম্ভের কাল থেকেই গৃহীত হইয়াছিল।

১৯৪১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে হোম মেম্বর স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল ঘোষণা করিলেন যে, যে ৭০০ জনকে বিনা বিচারে জেলে আটক করা হইয়াছে, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪৮০ জন নামডাকা কমিউনিস্ট অথবা কমিউনিস্টদের সহিংস গণ-বিপ্লবের সমর্থনকারী। ৬৪৬৬ জনকে নানা অপরাধে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে এবং ১৬৬৪ জনকে আটক বা বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।[২]

ইতিমধ্যে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের ঘোরতর অবস্থা মিত্রপক্ষের সঙ্কট এবং পূর্ব দিক থেকে ভারতের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন অশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল এবং ভারতে ক্রিপস্ মিশন (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৪২) প্রত্যাখ্যাত হইল, তখন ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইল। ফলে, কট্টর জাতীয়তাবাদী এবং কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী মহলে প্রচারিত হইল যে, "যোশী-ম্যাক্সিওয়েল" গোপন চুক্তির ফল! কিন্তু সম্প্রতি বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে যে সমস্ত গোপন দলিলপত্র সর্বসাধারণের জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাতে দেখা যায় যে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে কোন গোপন চুক্তি হয় নাই এবং কমিউনিস্টরা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন বিশ্বাঘাতকতাও করেন নাই, বরং ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়া ভারতসহ বিভিন্ন পরাধীন দেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করিতে সাহায্য করিয়াছেন।

১৯৪২ সালের ৪ঠা মে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গভর্নর ভারতের বড়লাট লর্ড লিন-

লিথগোর কাছে এক চিঠিতে জানাইয়াছিলেন যে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইলে কমিউনিস্ট পার্টির উত্থানে ভারতীয় পুঁজিপতি অধ্যুষিত কংগ্রেসের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইতে পারে।

['So much support for Congress comes from the Banias that there may be consternation in the Congress Party at the prospect of the rise of the Communist Party.'

—'Transfer of power 1942-47, published by Brisish Govt., Vol. II, P. 21-22][১]

এই সরকারী দলিলেই দেখা যায় যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কায়েমী স্বার্থের বাহকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে আতঙ্কের মনোভাব ছিল। সুতরাং বিরুদ্ধতা ছিল প্রচুর। ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালের মে মাসে কমিউনিস্ট পার্টির নায়ক পি. সি. যোশী ভারত সরকারের হোম মেম্বর (স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত) স্যার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং এই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেই তথাকথিত 'যোশী-ম্যাক্সওয়েল চুক্তির' কথা কমিউনিস্ট বিরোধী মহল থেকে পল্লবিত আকারে প্রচারিত হইয়াছিল। এখানে আরও মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টির আগেকার লাইন, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতার লাইন রাতারাতি পালটানো হয় নাই। কারণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের "অনেকের মনেই প্রশ্ন সংশয় ও অস্বস্তি" ছিল, একথা স্বয়ং অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় এম. পি. তাঁর পুস্তকে ('তরী হতে তীর' পৃঃ ৪২৬) স্বীকার করিয়াছেন। আগেকার নীতি পালটাতে কমিউনিস্ট পার্টির অন্ততঃ ছয় মাস লাগিয়াছিল। নানা দ্বিধা ও সন্দেহের দোলা অতিক্রম করিয়া ১৯৪১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী পাটনাতে যে সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাতে ৬০০'এর বেশী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সম্মেলনে বিপুল ভোটাধিক্যে জনযুদ্ধের নীতি গৃহীত হইয়াছিল। মাত্র ৯ জন প্রতিনিধি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

'...হিটলারের বিরুদ্ধে আসল লড়াই লড়ছে সোভিয়েত দেশ, আর এই লড়াই জেতার ফলে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত বদলাবে এই হিসাব অনুযায়ী আমরা যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলি, ফ্যাসিস্ট বিরোধিতাকে প্রধান কর্তব্য বলে মানি, অবিলম্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে যুদ্ধে সহযোগিতার অকাট্য শর্ত বলে ধার্য করিনি। ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করলে তবেই সর্বদেশে মুক্তির ভিত্তিভূমি স্থায়ী হবে এই বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় বলেই দেশের প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আমরা সঙ্কোচ করিনি।'

'পার্টির ব্যাখ্যা এক কথায় বলতে গেলে ছিল এই যে, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামে বিশ্বের জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে সোভিয়েটের সাফল্য সাধনে সহায়তার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ সহ সকল পরাধীন দেশের দ্রুত বন্ধন মোচনের পরিপ্রেক্ষিত তখন উন্মুক্ত হতে চলেছিল। ৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' লড়াইয়ের মাদকতা ছিল সন্দেহ নেই। ইংরাজ

১। ডঃ পঞ্চানন সাহা লিখিত "কমিউনিস্ট পার্টি ও জনযুদ্ধ" সাপ্তাহিক কালান্তর ২৭-১-৭৩।

শাসনের দৌরাত্ম্য ও দুরভিসন্ধি আমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল নিশ্চয় ; গান্ধীজীও "করঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" ধরনের ডাক দিয়েছিলেন, যা তাঁর পক্ষে ছিল অভূতপূর্ব ···এমন অবস্থায় ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা তখন কর্মকৌশলের দিক থেকে ভুল কিছু কিছু করে থাকলেও বোধগম্য······ ।

'সোভিয়েট ধ্বংসের যে মতলব তখন শুধু হিটলার নয়, বকলমে আরও অনেকে নানা ঢঙে ও ছদ্মবেশে করেছিল, তাতে সৃষ্টি হয়েছিল এক মারাত্মক পরিস্থিতি। '৪২ সালে আমাদের মনোভাব ও কর্মনীতি বুঝতে হলে এটা মনে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। কোথাও আমাদের কথা ও কাজের ধরনে ভুলচুক নিশ্চয়ই হয়েছিল—সুভাষচন্দ্রকে ফ্যাসিজম-এর সহায়ক ভেবে আক্রমণ করা যে ভুল ছিল, তা পরে জেনে আমরা ভ্রান্তি স্বীকার করেছি। কিন্তু সেই সময় প্রকৃত ঘটনা জানবার উপায় ছিল না।'[১]

১৯৪২ সালের রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়া কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী নিন্দা রটনা করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে পার্টির অন্যতম শীর্ষ নেতা প্রয়াত ভবানী সেন লিখিয়াছিলেন ঃ

'আমরা অকৃত্রিম দেশভক্তদের কাছ থেকেও এই প্রশ্ন শুনে থাকি—কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৩৯ সালে যে যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল, ১৯৪২ সালে তাকে জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করল কেন ? তার্কিকদের মনোবৃত্তি নিয়ে প্রশ্ন করলে পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারা যায় যে, ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের হাইকমান্ডের কাছে যে যুদ্ধটা ছিল ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণতন্ত্রের যুদ্ধ সেই যুদ্ধটাই তাদের ১৯৪২ সালে হঠাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পরিণত হল কেমন করে ?"[২]

কিন্তু ১৯৪২ সালে ভারতে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, সেই অবস্থায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে, সঠিক পথে চলিতে পারেন নাই, সেই সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির আর-একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রীনরহরি কবিরাজ একটি বিশ্লেষণমূলক সাম্প্রতিকতম প্রবন্ধে তীক্ষ্ণ সমালোচনার সুরে লিখিয়াছেন—

'এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য কি ছিল ? জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে থাকা অথবা জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে জাতীয় আন্দোলনকে সুশৃঙ্খলভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করা। সঠিক পথ ছিল ঃ দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম যাতে পরস্পরবিরোধী অবস্থানের দিকে চলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করা।

'এখন প্রশ্ন—কমিউনিস্ট পার্টি এই কাজে কতটা সফলতা লাভ করিয়াছিল ?'

'মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়—এই সময়ে দুটি বিরোধ পাশাপাশি অবস্থান করছিল। একটি ফ্যাসিবাদ বনাম পৃথিবীর অবং জনগণের (ভারত সমেত) বিরোধ, যা ছিল তখনকার দিনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল বিরোধের তুঙ্গে। অপরটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতের জনগণের মধ্যে (বুর্জোয়া সমেত) বিরোধ যা ছিল জাতীয় ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধ। এই দুই বিরোধের একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে দাঁড় করানো নয়, এই দুইটিকে একত্রিত করাই ছিল সেই মুহূর্তের প্রধান কাজ।'

১। তরী হতে তীর—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪২৭, ৪২৯-৩০।
২। ভবানী সেনের নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ—পৃষ্ঠা ২৪৭

'কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সঠিকভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক বিরোধের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে জাতীয় বিরোধটিকে ছোট করে দেখেছিল।'

'বলা চলে, এই ব্যাপারে পরাধীন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কাছে কমিণ্টার্নের যে নির্দেশ ছিল, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তা সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেনি। ১৯৩৫ সালে প্রদত্ত রিপোর্টে জর্জি ডিমিট্রভ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যে স্ট্র্যাটেজি তুলে ধরেন তাতে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্টের প্রশ্নটিকে অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।'...

'এই নির্দেশের সারমর্ম ঃ ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলি নিজ নিজ দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম সংগঠিত করেই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে সাহায্য করবে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম স্থগিত রেখে নয়, একে জোরদার করেই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে এক সূত্রে আবদ্ধ করতে হবে, এই ছিল ডিমিট্রভের বক্তব্য।

'কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৪১ সালে সোভিয়েতের ওপর আক্রমণের পরে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে, এই মৌল অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ালো। আন্তর্জাতিক বিরোধটিকে (ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামকে) অগ্রাধিকার দেবার নামে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে থাকার পক্ষে মত জ্ঞাপন করল। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কমিউনিস্টরা ভারত ছাড়ো প্রস্তাবের বিরোধিতা করল। জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের যখন গ্রেপ্তার করা হল এবং তার প্রতিবাদে গণআন্দোলন আরম্ভ হল, কমিউনিস্টরা তার থেকে সরে দাঁরালো।

'যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া উচিত হবে না—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কমিউনিস্টরা স্ট্রাইক ও সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করলো।'

অতঃপর নরহরিবাবু লিখিয়াছেন—

'বলাই বাহুল্য এই পর্বত প্রমাণ ভুলের জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে বিশেষ খেসারত দিতে হয়েছিল। কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রস্তাবিত "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের বিরোধিতা করার নামে কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো......আগস্ট বিপ্লব যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ও বলিষ্ঠ প্রকাশ সেটি কমিউনিস্ট পার্টি অনুধাবন করিতে পারেনি। কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনকে জাপানী চর, পঞ্চম বাহিনী বা ধ্বংসকারীদের কাণ্ড মনে করে ভুল করেছিল।

'এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের কারুর কারুর মধ্যে এমন চিন্তা অবশ্যই ছিল যে জার্মানী ও জাপান—যেহেতু বৃটেনের শত্রু সেই হিসাবে আমাদের মিত্র। কিন্তু ১৯৪২ সালের বিরাট, বিশাল ও স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থানকে জাপানী চর ও পঞ্চমবাহিনীর কার্যকলাপ বলা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। হাজার বিভ্রান্তি সত্ত্বেও যাঁরা এই অভ্যুত্থানের সামিল হয়েছিলেন, যাঁরা এই আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক।'[১]

১। ১৩৮২ সালের (ইং ১৯৭৫) শারদীয় 'মূল্যায়ন' সাময়িকপত্রে শ্রীনরহরি কবিরাজ লিখিত "আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২) এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" প্রবন্ধ থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত।

* * *

১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী সি. রাজেশ্বর রাও বিখ্যাত 'ব্লিজ' সাপ্তাহিক পত্রের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্টির অনেক দুঃখ বরণ এবং ত্যাগ স্বীকার সত্ত্বেও কোন কোন সন্ধিক্ষণে খুব ভুল করিয়াছেন এবং জাতীয় জীবনের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যেমন, বলা যাইতে পারে ১৯৪২ সাল। পৃথিবীর একমাত্র সোসিয়েলিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে রাশিয়াকে সমর্থন জানানো নিশ্চয়ই যুক্তি-সঙ্গত ছিল। কিন্তু স্ট্যালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধজয়ের পর যখন মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল, তখন পার্টির পক্ষ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার কৌশল অবলম্বন করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করায় সি. পি. আই. জাতীয় জীবনের প্রধান শক্তির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কোন কোন দেশপ্রেমিক নেতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করাও ভুল হইয়াছিল।

—(ব্লিজ, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৬)

* * *

কিন্তু এই সমস্ত তর্ক বিতর্কের কথা বাদ দিলেও জানা দরকার যে, ১৯৪২ সালে পৃথিবীব্যাপ্ত যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সংকট ছিল অত্যন্ত গভীর এবং তখন চার্চিল রুজভেল্ট-স্ট্যালিন ফ্যাসিস্ট বিরোধী মহাজোট গঠন করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সময় পূর্ব দিক থেকে জাপান এবং পশ্চিম দিক থেকে মধ্য প্রাচ্যে জার্মানী কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে সাঁড়াশীর চাপ সৃষ্টির আশঙ্কার মুখে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে চার্চিল সহ বৃটিশ যুদ্ধমন্ত্রিসভার উদারতার নীতি অবলম্বন না করিয়া উপায় ছিল না। কারণ, কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে সহায়তা দানে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কংগ্রেস ছিল অসহযোগী। সুতরাং ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য ভারত সরকারের প্রস্তাব বৃটিশ সরকার অনুমোদন করিলেন। কিন্তু এর পিছনে কমিউনিস্ট পার্টির কোন কুমতলব কিংবা চক্রান্ত অথবা ভারতীয় স্বাধীনতার দাবীর প্রতি বিরোধিতার কোন প্রশ্ন ছিল না। এমন কি, ভারত সরকারও তাঁদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন নাই। এই সম্পর্কে ভারত সরকারের মহাফেজখানার সরকারী দলিলেই সাক্ষ্য বহন করিতেছে ঃ

'The C. P. I. however, did not find it expedient to follow suit until the very end of 1241···India was at that time in the grip of defeatism and panic with Japanese armies menacing its eastern frontier, and in July 1942, the Govt, of India decided to raise the eight year old ban on the C. P. I. to enable it to come out into the open and demonstrate its pro-war professions in a particular way···

'Nevertheless the party became in no sense pro-Govt. except to the extent that it supported certain economic measures of Government,···

'Since the party's legalisation, Communist literature has been for-

the most part a skilful blend of denunciation of the Japanese, adulation of Congress and Russia and pungent criticism of Govt. verging on sedition at times.

'...Despite their professed desire to hasten the overthrow of Fascism. the Communists have never abandoned their traditional strategy of introducing their followers into the armed forces with the object of preparing the ground for an outbreak of mutiny when the time for revolution is ripe.'...[১]

এই দলিলে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, আন্তর্জাতিক কারণে বাধ্য হইয়া ভারত সরকার সি. পি. আই-এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা কখনও সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাঁদের বিপ্লবের লক্ষ্যও তাঁরা হারান নাই।

রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ

ফ্যাসিজমের অভ্যুদয় ও কংগ্রেসীনীতির বিরুদ্ধে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস যে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া আসিতেছিলেন, সেকথা পুস্তকের অন্যত্র আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীব্যাপী এই দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠস্বর মিলাইয়াছিলেন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াইয়াছিলেন। এখানে তার বিস্তৃত আলোচনার সম্ভব নয়।*

তবে, কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। জার্মানী যখন হিটলারি নাৎসীবাদের করাল গ্রাসে, তখন ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—

'জার্মানির বর্তমান শাসকবর্গের উদ্ধত অন্যায়ের সাম্প্রতিকতম প্রকাশে সমগ্র বিশ্বের বিবেক গভীরভাবে বিচলিত। এই ঘটনা রাইখে ইহুদী দমন থেকে শুরু করে সাহসিক ও যথার্থই উদারচেতা চেকোশ্লোভাক রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ পর্যন্ত দুর্বলের উপর নির্যাতনের এক দীর্ঘ ইতিহাসের চূড়ান্ত পর্ব।......আমাদের কণ্ঠস্বর হয়ত জার্মানীতে শাসনাধিষ্ঠিত চক্রের কানে পৌঁছবে না, কারণ এই কণ্ঠস্বর প্রচণ্ড বিস্ফোরক বোমার বাহনে ভর করেনি। আমি শুধু এই আশায় প্রকাশ করতে পারি যে, এই ভয়ঙ্কর রক্তস্নানে শুচিস্নাত এক পৃথিবীতে জয়যুক্ত মানবসমাজ উত্তীর্ণ হবে এবং জীবনের শুভ ধর্ম ও সমস্ত নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতা চিরন্তন হবে।' —(ইংরাজী থেকে অনূদিত)[২]

১। Reference—Home Political Department, International Branch. File No. 7/1/5 Pol (1) K. W. 1945 National Archives of India. New Delhi. Subject: C. P. I. and the World War II.

* উৎসাহী পাঠকবর্গ এই বিষয়ে শ্রীনেপালচন্দ্র মজুমদার রচিত "ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ" চতুর্থ খণ্ড পড়িয়া দেখিতে পারেন।—লেখক।

২। ইন্দো—জি. ডি. আর. মৈত্রী সমিতির ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত ইস্তাহার থেকে।

ফ্রান্সের পরাজয় ও পতনের পর রবীন্দ্রনাথের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার উদয় হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে ১৯৭১ সালের ১৩ই মার্চ তারিখের "দেশ" সাপ্তাহিক পত্রে "রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" শীর্ষক আলোচনা স্তম্ভে জনৈক লেখক (শ্রীকান্তি গুপ্ত) পাঠকদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—আগ্রাসী উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং তজ্জনিত সর্বাত্মক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে চন্ডরূপ রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন তাঁর 'Cult of Nationalism' বক্তৃতামালায় সেই অন্ধ শক্তিই যখন ফ্যাসিবাদের আকারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিশ্বমানবতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হ'ল, মৃত্যুশয্যা থেকে তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে (তখন) তারবার্তা প্রেরণ করলেন (জুন, ১৯৪০) প্যারীর পতনের অব্যবহিত পরে :

"এক ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী শক্তি আজ সমগ্র বিশ্বকে ছেয়ে রেখেছে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি তার মুখোমুখি। প্রতিটি মুহূর্তে লজ্জায় আমার মাথা নত হয়ে আসছে এই ভেবে যে, আমাদের ক্ষমতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, আমাদের কণ্ঠ অতিক্ষীণ। যে পাপ আজ সভ্যতার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছে, তাকে জয় করার মত যথাযথ শক্তি ভারতের নেই। আমাদের সব ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সমস্যা আজ এক হয়ে গেছে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে। আধ্যাত্মিকতাবাদী মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে আজ সে সহায়তা ভিক্ষা করছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। যে বিশ্বব্যাপী সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী মনে হচ্ছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যুক্তরাষ্ট্র পিছপা হবে না এই আমার বিশ্বাস। আমি জানি এই বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। সেই বিশ্বাস জ্ঞাপন করতে এই কটি কথা না লিখে পারলুম না।"—(ইউ. এস. আই. এস. প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও আমেরিকা পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।)

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টর কাছ থেকে এই তারবার্তার কোন জবাব আসিয়াছিল কিনা, তার কোন উল্লেখ আলোচনার মধ্যে নাই।…

হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণে সারা ভারতের নাৎসী-বিরোধী জনমত এবং বুদ্ধিজীবী মহল উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের প্রায় সর্বত্র রাশিয়ার সমর্থনে সভাসমিতি শোভাযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আর্থিক সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হইয়াছিল। আর জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য দাবী জানানো হইতেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমিউনিস্ট নেতা, কর্মী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীগণ এই সমস্ত সভাসমিতি গঠনের উদ্যোগ নিয়াছিলেন। ১৯৪১ সালের ২০শে জুলাই সারা ভারতের শীর্ষস্থানীয় ৭০ জন বুদ্ধিজীবী এক স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে কলিকাতা থেকে সোভিয়েত জনগণের স্বদেশ রক্ষার যুদ্ধে আশ্চর্য প্রতিরোধ-শক্তির সচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাৎসী আক্রমণের দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ নূতন অধ্যায় খুলিয়া গিয়াছে।…

এই বিবৃতির প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।—(সোভিয়েত রিভিয়ু ১৯৭১, সংখ্যা ৩১, পৃষ্ঠা ৫১।)

সাহিত্যিক সাংবাদিক, শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা মহাযুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েতের সমর্থনে দেশব্যাপী নানা আন্দোলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (ফ্রেন্ডস্ অব্ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন)

প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ফ্যাসী-বিরোধী লেখক সমিতি, ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রভৃতি সেই সময় যেন এক নতুন প্রাণবন্যা সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং বহু বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ব্যক্তি এই সমস্ত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের জীবনসূর্য তখন অস্তাচলে। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিপুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ

'সদ্য স্থাপিত সমিতির (সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি) পক্ষ থেকে সুরেন গোস্বামী গেলেন শান্তিনিকেতনে—রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য তখন ভেঙে পড়েছে, কিন্তু তাঁর আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল আমাদের সবচেয়ে বেশী। কবি রাজী হলেন সোভিয়েট সুহৃদসমিতির পৃষ্ঠপোষক হতে, তবে, সাবধান করে দিয়ে বললেন যে, ইংরেজ নিজের স্বার্থে সোভিয়েটকে সাহায্য করবে বলছে বটে, কিন্তু 'বিশ্বাস করো না ওদের, তোমরা কমিউনিস্টরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গা ঢিলা দিয়ো না'।...

'রবীন্দ্রনাথের জীবনান্ত ঘটতে তখন দেরী ছিল না। সোভিয়েট আক্রান্ত হওয়ার ছয় সাত সপ্তাহের বেশী তিনি বাঁচেননি। শেষ রচনাগুলিতে (যেমন Eleanor Ralhbone-কে লেখা চিঠি) সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে তাঁর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল। আর সবাই তো জানি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়ে কেবল জানতে চাইতেন যুদ্ধের খবর। বলতেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ-এর মতো অন্তরঙ্গ সহচরকে যে সোভিয়েট কখনও হার মানবে না।'

'কবির ঋষিবাক্য ব্যর্থ হয় নি। আগুনের অক্ষরে ইতিহাসের আকাশে তা জাজ্বল্যমান হয়ে রইলো।'[১]

হিটলারি বর্বর আক্রমণে রক্তস্নাত সোভিয়েত জনগণের স্বপক্ষে ভারতের জনতা ও বুদ্ধিজীবীগণ যে একত্রে দাঁড়াইয়াছিলেন, আজও সে কথা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করার মত। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কিছু কিছু গুরুতর ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও তার ভূমিকা ততখানি নিন্দনীয় ছিল না, যতটা কমিউনিস্ট-বিরোধীরা প্রচার করিয়াছেন কিংবা এখনও করিতেছেন।

১। তীর হতে তীর—পৃষ্ঠা ৪১৭।

সপ্তম পর্ব

প্রথম অধ্যায়

লেনিনগ্রাদ : সোভিয়েটভূমি হইতে জার্মানবাহিনীর বিতাড়ন

কিয়েভ ও সেবাস্তপোলের মুক্তি

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েট রাশিয়া কুরস্ক-ওরেল রণাঙ্গনে যে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করিল, তাহা অব্যাহত ধারায় চলিতে লাগিল সারা শীতকাল উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৪৪-এর বসন্তকাল পর্যন্ত। এমন কি তারপরেও এই ধারা বজায় রহিল এবং এই সংগ্রামকে সোভিয়েটের মুক্তি অভিযান বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

এই অভিযান মুখ্যতঃ রাশিয়ার নিজস্ব শক্তি দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতেছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্জ ও ইজারা অনুসারে আমেরিকার নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্যও তুচ্ছ করিবার মত ছিল না। বিশেষতঃ যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনের মুহূর্তে যে সাহায্য পাওয়া যায়, পরিমাণের চেয়েও উহার কার্যকারিতা অনেক বেশী মূল্যবান। সুতরাং 'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার' বিশাল আমেরিকা ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যে সাহায্য দিয়াছিলেন, তার গুরুত্ব কম নহে। এই সম্পর্কে ষষ্ঠ পর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।...

সোভিয়েটভূমির পূর্ণ মুক্তি বিধান এবং শত্রুসৈন্যকে দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়নই এই সময় রাশিয়ার আসল লক্ষ্য ছিল এবং এই লক্ষ্যকে পূর্ণ করিবার জন্য লালফৌজ প্রধানতঃ 'রেলপথ ও সড়কের রণনীতি' (Rail-road strategy) গ্রহণ করিল। যে কোন যুদ্ধেই যোগাযোগ ও সরবরাহের প্রশ্ন অত্যন্ত মারাত্মক এবং এই যোগাযোগ ও সরবরাহ সাধারণতঃ চলিয়া থাকে রেলপথ ও সড়ক দিয়া কিংবা জলপথ যোগে। রাশিয়া সুবৃহৎ সমতল ভূমির দেশ এবং সেখানে রেলপথ ও সড়ক সর্বত্র প্রচুর নহে। সুতরাং যে সমস্ত বড় বড় রেলপথ ছিল, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়াই জার্মানী রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। আবার জার্মানীর শক্তঘাঁটি ও আত্মরক্ষার ব্যূহগুলিও এই সমস্ত রেলপথ, জংশন ও সড়ক কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত স্টারায়া রুশা, ভাইটেবস্ক, মোগিলেভ, ঝোলোবিন, করোস্টেন, ঝিটোমির, কিয়েভ, স্মেলা, ক্রিভয়রগ এবং নিকোলায়েভ— এইগুলি সমস্তই ছিল রেলপথের জংশন। যখন মস্কো, লেনিনগ্রাদ, খারকোভ, কিয়েভ, ওডেসা, রস্টোভ, ভরোনেজ, স্ট্যালিনগ্রাদ ইত্যাদি রাশিয়ার বৃহৎ শহরগুলির জন্য উভয় পক্ষে নিদারুণ লড়াই চলিতেছিল, তখন পাঠক লক্ষ্য করিতেছিলেন এই শহরগুলিতে কে হারে বা কে জিতে, কিন্তু আসলে উভয়পক্ষের যুদ্ধেরই একটা বড় লক্ষ্য ছিল রেলপথগুলি। উত্তর হইতে দক্ষিণগামী এই বৃহৎ রেলপথগুলি দ্রুত সরবরাহ ও যোগাযোগ রক্ষার পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য ছিল। সুতরাং প্রত্যেক অভিযানের নকশাই এই রেলপথগুলিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

জার্মানরা রাশিয়ার বড় বড় কয়েকটি রেলপথের সাহায্য পাইতেছিল। উত্তর বা লেনিনগ্রাদ রণক্ষেত্রে জার্মানদের সরবরাহ চলিতেছিল ওয়ারশ (পোল্যাণ্ড) হইতে ভিলনা, ডিনস্ক ও লুগা হইয়া লেনিনগ্রাদগামী রেলপথের দ্বারা। ওয়ারশ হইতে আর-একটি রেল লাইন গিয়াছে মিনস্ক, ওর্সা ও স্মলেনস্ক হইয়া মস্কো পর্যন্ত এবং আর-একটি দক্ষিণ শাখা গিয়াছে গোমেল ও ব্রিয়ানস্ক হইয়া কালুগা পর্যন্ত। দক্ষিণ রণাঙ্গন ছিল দুই ভাগে বিভক্ত—দীর্ঘ ডন ও নীপার নদীর উত্তরাংশ এবং নিম্নবর্তী দক্ষিণাংশ। এই উপরের অংশ ওয়ারশ হইতে লুবলিন, কোয়েল, সার্নি এবং কিয়েভ হইয়া কুরস্ক পর্যন্ত রেলপথের দ্বারা যুক্ত ছিল। দক্ষিণগামী রেলপথগুলি ছিল কোয়েল ও কিয়েভ হইয়া স্মেলা এবং নীপ্রোপেট্রোভস্ক ও ক্রিমিয়া পর্যন্ত। আর বার্লিন হইতে একটি ট্রাঙ্ক লাইন গিয়াছে ব্রেসলাউ, ক্রাকাউ, লোও, টার্নাপোল, জেমেরিঙ্কা ও ওডেসা পর্যন্ত। ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মাভিযানের ফলে জার্মানী উত্তর ও দক্ষিণ অংশের সঙ্গে সংযোগকারী বহু রেলপথ হারাইল, আর ১৯৪৩-৪৪-এর শীতাভিযানে খাস জার্মানী ও পোল্যাণ্ড হইতে দক্ষিণ রাশিয়াগামী ট্রাঙ্ক লাইনগুলির সংযোগ নষ্ট হইল।

এক রণাঙ্গন হইতে অন্য রণাঙ্গনে দ্রুত আঘাত হানিয়া লালফৌজ জার্মান বাহিনী-গুলিকে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর দিল না। এই বেগবান আক্রমণ ও প্রচণ্ড আঘাতে জার্মানীর সৈন্যশক্তি দ্রুত ক্ষয় পাইয়া যাইতে লাগিল। কোন কোন মাসে মোট হতাহতের সংখ্যা বোধ হয় দুই লক্ষে দাঁড়াইল। যদিও স্ট্যালিনগ্রাদের মত গোটা জার্মান আর্মির এত বড় বিপর্যয় আর হয় নাই, কিংবা তেমনভাবে তাহারা বেষ্টিতও হয় নাই, একমাত্র কোরসান (কিয়েভ অঞ্চলে) ছাড়া, তথাপি জার্মান সৈন্যদলের ক্ষতি হইয়াছে অসাধারণ। ফ্যাসিস্ট শক্তির মোট ২৫০ ডিভিসন সৈন্য তখনও পূর্ব রণাঙ্গনে ছিল এবং ইহার বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়া নিয়োগ করিল ৩২০ ডিভিসন। সুতরাং সোভিয়েট শক্তির দুর্দমনীয়তা অনুমেয়।

ক্রমাগত এই পরাজয়ের মুখে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মান হাইকম্যাণ্ড এক বৈঠকে পূর্ব রণাঙ্গনের নীপার নদীতট পর্যন্ত পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রমাগত বিরামহীন আঘাতের জন্য তাহা-দিগকে দক্ষিণাংশে নীপার পার হইয়া নীস্টার নদী পর্যন্ত, মধ্য রণাঙ্গনে পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে এবং উত্তর রণাঙ্গনে প্রায় বাল্টিক রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে হইল। ইহা রণনৈতিক চালসম্মত কেন পশ্চাদ্বর্তন নহে, কিংবা স্বেচ্ছাকৃত নহে। ইহা বাধ্যতা-মূলক পশ্চাদপসরণ, যদিও পশ্চাদপসরণ অনেক সময় শৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল। যদি তাহারা কোথাও পুনরাক্রমণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা কোথাও ৬ সপ্তাহের বেশী টিকে নাই, কিংবা নিতান্তই সাময়িকভাবে ছাড়া কোন জায়গা দখল করিতে পারে নাই।

তবে, ১৯৪৩-৪৪-এর শীতাভিযানে মধ্য রণাঙ্গনই ছিল সবচেয়ে বেশী নিষ্ক্রিয়। কিন্তু কয়েক মাস পর গ্রীষ্মকালের অভিযানে প্রিপেট জলাভূমির দুই পার্শ্ব ধরিয়া লালফৌজ জার্মান বাহিনীকে মধ্য রণাঙ্গন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। সেই আসন্ন অভিযানেরই প্রস্তুতিস্বরূপ জেনারেল রকোয়োভস্কি উত্তরে নেভেলে হইতে দক্ষিণে করোস্টেনগামী রেলপথের মোজরি জংশন কাড়িয়া লইলেন এবং প্রিপেট

জলাভূমির উত্তরে অগ্রসর হইলেন। ফলে ১৯৪৪ সালের ১২ই জানুয়ারী ঝোলোবিন ও মোগিলেভ বিপন্ন হইল। আরো উত্তরে কসাক ও স্কী সৈন্যদের নেতৃত্বে ১নং বাল্টিক আর্মি ভাইটেবস্কের শক্ত ঘাঁটি পার্শ্বদেশ হইতে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল এবং ২রা জানুয়ারী ভাইটেবস্কের পশ্চাৎদিকের রেলপথের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। ইহা ছাড়া মধ্য রণাঙ্গনে খুব উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই, যদিও সোভিয়েট বাহিনী সর্বদাই এখানে চাপ দিতেছিল। কিন্তু রাশিয়ার প্রধান আক্রমণ ঘটিল উত্তর এলাকায় লেনিনগ্রাদে এবং দক্ষিণে উক্রাইন অঞ্চলে।

আড়াই বৎসর ধরিয়া লেনিনগ্রাদে জার্মান ও ফিনিশ সৈন্যের দ্বারা বেষ্টিত ও অবরুদ্ধ ছিল এবং আড়াই বৎসরের অবরোধে লেনিনগ্রাদের যে দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। ১২ ইঞ্চি ও ১৬ ইঞ্চি মুখের সুবৃহৎ কামানগুলি লেনিনগ্রাদের উপর অনবরত গোলাবর্ষণ করিয়া সরকারী অট্টালিকাগুলি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। এই প্রচণ্ড ও ভয়াবহ গোলাবর্ষণে ৫ হাজার লোক নিহত এবং ১৫ হাজার আহত হইয়াছিল। নাগরিকদের জল ছিল না, আগুন ছিল না এবং বিদ্যুৎ ছিল না। আর খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা দৈনিক গোলাবর্ষণের চেয়েও অধিকতর ভয়াবহ ছিল। বোমায় ও গোলায় যত লোক প্রাণ হারাইয়াছে, তার চেয়ে অনেক বেশী মারা গিয়াছে খাদ্যের অভাবে। তথাপি এই সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যেও শত্রুকে প্রতিরোধের জন্য নাগরিকরা দুর্জয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং দৈনন্দিন কাজ যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়াছেন।

* * *

আধুনিক কালের ইতিহাসে লেনিনগ্রাদেরর অবরোধের সম্ভবতঃ কোন তুলনা নাই। হিটলার লেনিনগ্রাদের আত্মসমর্পণ চাহে নাই। সেনাপতিদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল যদি রুশরা পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে চাহে, তবে যেন সেই আত্মসমর্পণ গ্রহণ করা না হয়। কেননা, ৩০ লক্ষ অধিবাসীকে খাদ্য দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে নাৎসী রণনেতারা রাজী ছিল না। সুতরাং লেনিনগ্রাদকে জয় করিয়া একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে, গোটা শহরকে গুঁড়া করিয়া মাটিতে মিশাইয়া দিতে হইবে। তা'হলে আর রুটি যোগাইবার প্রশ্ন উঠিবে না—এই ছিল হিটলারের নৃশংস পণ। কিন্তু লেনিনগ্রাদ আত্মসমর্পণ করিল না। লেনিনের নামাঙ্কিত শহরকে জয় করাও গেল না এবং মাটিতে মিশাইয়া দেওয়ার সুযোগও পাওয়া গেল না। কিন্তু লেনিনগ্রাদ অবরুদ্ধ হইল। ১৯৪১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর শ্লুকেনবুর্গ জার্মানীর হাতে দখল হওয়ার পথে ভূমিপথে লেনিনগ্রাদ সম্পূর্ণ বেষ্টিত হইয়া গেল। একমাত্র লাডোগা হ্রদের জলপথ ছাড়া আর বাকি সমস্ত দিকে লেনিনগ্রাদ নিদারুণ অবরোধের মধ্যে পড়িল। রাশিয়ার অবশিষ্ট অংশ থেকে লেনিনগ্রাদ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ক্রমাগত ৯০০ দিনের অধিক কাল ধরিয়া লেনিনগ্রাদ অবরুদ্ধ ছিল—কেবল অবরোধ নয় অনাহারে মৃত্যুর মধ্যে পড়িল। মৃত্যু?—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মৃত্যুর কি কোন লেখাজোখা ছিল? হিরোসিমা নাগাসাকি, স্ট্যালিনগ্রাদ কিংবা ভারতের দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩) ও নাৎসী বন্দীশালাগুলিতে মৃত্যুর তালিকা যেমন দীর্ঘ, তেমনি ভয়াবহ। কিন্তু লেনিনগ্রাদের অবরোধে মৃত্যু এই সমস্তের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চারিদিকে অবরুদ্ধ হইয়া তিলে তিলে পুরুষ, নারী ও শিশু মৃত্যুবরণ করিয়াছে, অথচ শহর

রক্ষা করার জন্য আবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। ৯০০ দিনের এই নৃশংসতা ইতিহাসে প্রতিদিনের মৃত্যুর মধ্য দিয়া সোভিয়েট যুদ্ধের কাহিনীকে যেন এক নূতন গৌরব দিয়াছে। অথচ যুদ্ধের ইতিহাসে মস্কো ও স্ট্যালিনগ্রাদ যে মর্যাদা অর্জন করিয়াছে, লেনিনগ্রাদের এই আশ্চর্য অবরোধযুদ্ধ কিন্তু খাস রাশিয়াতেও সেই পারিসিটি কিংবা মর্যাদা পায় নাই।

একজন সেরা বিদেশী সাংবাদিক—'নিউইয়র্ক টাইমস"-এর সুবিখ্যাত হ্যারিসন স্যালিশবারি, যিনি রুশ-জার্মান যুদ্ধের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তিনি পর্যন্ত লিখিয়াছেন :

This was the greatest and longest siege ever endured by a modern city, a time of trial, suffering and heroism that reached peaks of tragedy and bravery almost beyond our power to comprehend. Even in the Soviet Union the epic of Leningrad has received only modest attention compared with that devoted to Stalingrad and the Battle of Moscow. And in the west not one person in fifty who thrilled to the courage of Londoners in the Battle of Britain is cognisant of that of the Leningraders.[১]

অর্থাৎ লেনিনগ্রাদের মত আর কোন আধুনিক শহরই এমন বৃহত্তম ও দীর্ঘতম অবরোধের মধ্যে পড়ে নাই। সময়ের অগ্নিপরীক্ষায়, দুর্ভোগে এবং বীরত্বে এই শহর যেন বিয়োগান্ত নাটকের শীর্ষস্থানে পেঁাছিয়াছিল এবং যে সাহসিকতা তাঁরা দেখাইয়াছিলেন আমাদের তা কল্পনাশক্তিরও প্রায় বাইরে ছিল। এমন কি সোভিয়েট ইউনিয়নেও স্ট্যালিনগ্রাদ বা মস্কোর যুদ্ধের তুলনায় লেনিনগ্রাদের মহাকাব্য তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। আর পশ্চিমে যাঁরা বৃটেনের যুদ্ধের (বোমারু আক্রমণ) দিনে লণ্ডনবাসীদের সাহসিকতায় এত উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁদের প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজনও লেনিনগ্রাদবাসীদের অনুরূপ বীরত্বের কথা জানেন না।

লেনিনগ্রাদের ৩০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ কিংবা প্রায় ১০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গিয়াছেন। কিন্তু সমবাদী মতে ৬ লক্ষ ৪২ হাজার। অথচ লেনিনগ্রাদ কিংবা পুরাতন সেন্ট পিটার্সবুর্গ কিংবা পরে পেট্রোগ্রাদ রূপে খ্যাত এই শহরে দুই শত বছর ধরিয়া রুশ সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার এটা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র এবং সাংস্কৃতিক সম্পদে সব চেয়ে উন্নত। বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালে সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট লেনিনগ্রাদ থেকে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত লেনিনগ্রাদ শহর নিজের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র এবং উজ্জ্বল। লেনিনগ্রাদবাসীরা নিজেদের মহানগরীর এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য এখনও গর্বিত।

লেনিনগ্রাদের অসামরিক এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ লেনিনগ্রাদকে জার্মানীর গ্রাস থেকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারীর খাদ্য সরবরাহের মূল সমস্যাটিকে মীমাংসা করতে পারেন নাই। যদি লেনিনগ্রাদ শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ হয়, তা হলে কি ভাবে খাদ্যের যোগান দেওয়া হইবে, সেই

১। Russia At War—Alexander Werth, P 281.

গুরুতর প্রশ্নের দিকে কর্তৃপক্ষ মন দিতে পারেন নাই। এমন কি, যুদ্ধের প্রয়োজনে যারা অপরিহার্য নয়, সেই সমস্ত বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে যে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন, গোড়ার দিকে সেই বিষয়ে পর্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করা হয় নাই। অনেকে আবার ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, জার্মানরা লেনিনগ্রাদে পৌঁছিতেই পারিবে না। সুতরাং সরকারী কর্তৃপক্ষ লেনিনগ্রাদ থেকে লোক অপসারণে ঢিলা দিলেন। জুলাই এবং আগস্ট মাসের (১৯৪১) মাত্র ৪০ হাজার শ্রমিককে এবং আক্রান্ত বালটিক রাজ্যগুলি থেকে যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোক আশ্রয় প্রার্থীরূপে পলাইয়া আসিয়াছিল, তাদেরকে পূর্বদিকে অপসারণ করা হইয়াছিল। এমন কি বালটিক রাজ্যগুলি থেকে জার্মান আক্রমণের আশঙ্কায় যে কয়েক হাজার টন খাদ্যশস্য অপসারণ করা হইয়াছিল, সেগুলি পর্যন্ত লেনিনগ্রাদে গুদামজাত না করিয়া পূর্বদিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সরকারী কর্তৃপক্ষ লেনিনগ্রাদ থেকে লোকাপসারণের অপরিহার্য কর্তব্য পর্যন্ত উপেক্ষা করিলেন। ফলে, অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে ৪ লক্ষ শিশুসহ ২৫,৪৪,০০০ লোক আটকা পড়িল, আর লেনিনগ্রাদের শহরতলীতে ও আশেপাশে ৩,৪৩,০০০ লোক অবরুদ্ধ হইল। এই সংখ্যার সঙ্গে অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে যে, লেনিনগ্রাদ রক্ষাকারী সৈন্য-বাহিনীকেও রেশন সরবরাহ করিতে হইল। অতএব ১৯৪১-৪২ সালের শীতকালটা লেনিনগ্রাদবাসীদের নিকট যেন মৃত্যুর পরোয়ানা লইয়া দেখা দিল। কারণ, জার্মানরা ক্রমাগত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ করিয়া শহরের কল-জল-কয়লা ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া ফেলিল। এদিকে লেনিনগ্রাদ শহরে মাত্র ৩৫ দিনের খাদ্যশস্য মজুত ছিল। ৮ই সেপ্টেম্বর শ্লুমেলবুর্গ জার্মানীর দখলের চলে যাওয়ার পর লেনিনগ্রাদ শত্রু কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত ও অবরুদ্ধ হইল। এর মাত্র দুই দিন আগে মস্কোতে ডিফেন্স কমিটির নিকট জরুরী বার্তা পাঠানো হইয়াছিল লেনিনগ্রাদে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। কারণ, ভূমিপথের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ১৯৪২-এর জানুয়ারী মাসে লাডোগা হ্রদের জল জমিয়া যখন কঠিন বরফ হইয়া গল, তখন সেই রাস্তা ধরিয়া লোকাপসারণের চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু তার আগেই শত সহস্র লোক না খাইয়া মারা গেল। অনেকের আবার ধারণা ছিল যে, লেনিনগ্রাদের অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হইবে না, শীঘ্রই জার্মানরা হটিয়া যাইবে। অবশ্য লাডোগা হ্রদের বরফ জমানো রাস্তা দিয়া কয়েক হাজার টন খাদ্যশস্য, মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং গোলাগুলি সরবরাহ দেওয়া হইল বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল সমুদ্রে শিশির বিন্দুবৎ। শহরবাসীদের জন্য রেশন কার্ডের প্রবর্তন করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই রেশনও অনেকের ভাগ্যেই জুটিত না—সরবরাহের একান্ত অভাব ছিল। অনাহারের জন্য প্রতিদিন, প্রতিমাসে লোক মারা যাইতে লাগিল। অনাহারের সঙ্গে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা (কয়লা ও জ্বালানীর অভাবে) একত্র হইয়া দলে দলে লোকের মৃত্যু ঘটাইতে লাগিল। নভেম্বর মাসে ১১ হাজার লোক মারা পড়িল, ডিসেম্বর মাসে ৫২ হাজার এবং প্রতিদিন ৩।৪ হাজার লোক প্রাণ হারাইতে লাগিল। এভাবে লেনিনগ্রাদের দুর্ভিক্ষে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় ১০ লক্ষ।

সোভিয়েট যুদ্ধের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক আলেকজান্দার ভার্থ লেনিন-গ্রাদের দুর্ভিক্ষ ও অবরোধের যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন, তাতে দেখা যায় যে, ভয়ঙ্কর

খাদ্যাভাব সত্ত্বেও লেনিনগ্রাদের কোন খাদ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার ক্ষুধার্ত জনগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয় নাই। অনিবার্য মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও তাঁরা আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের আশ্চর্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ওলগা বেরেখোলজ নাম্নী একজন সাহিত্যিক মহিলার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় যখন তিনি কাতর ছিলেন, তখন তাঁর শেষ সম্বল ছিল এক টুকরা রুটি ও একটি সিগারেট। আর-একটি সিগারেট তিনি রাখিয়াছিলেন তাঁর বাবার জন্য। তাঁর পিতাও অনাহারে মৃতপ্রায় এবং তিনি ছিলেন একজন ডাক্তার। মহিলাটি তাঁর পিতাকে ঐ সিগারেটটি দেওয়ার জন্য নেভা নদীর বরফ ও তুষার ভাঙিয়া ১০ মাইল পথ হাঁটিয়া গেলেন, আর পায়ে পায়ে মাড়াইয়া গেলেন মৃতদের স্তূপ! পিতার নিকট যখন তিনি পেঁীছিলেন, তখন সেই চিকিৎসক ভদ্রলোক নিজেও অনাহারে মৃতপ্রায় এবং তাঁর চারদিকে যে সমস্ত রুগী ছিলেন, তাঁরাও ক্ষুধার জ্বালায় মৃতবৎ। এভাবে লেনিনগ্রাদের জন্য অসংখ্য নরনারী প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। তারা প্রাণ দিয়াছিল বটে, কিন্তু বলাই বাহুল্য বাঁচিবার জন্যও যথাসাধ্য লড়াই করিয়াছিল। যখন আর কোনও খাদ্য মিলিল না, তখন ক্ষুধার জ্বালায় কাক, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি যা-কিছু হাতের কাছে তারা পাইয়াছিল, তাই ধরিয়া খাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। রাস্তায়, ঘাটে, সিঁড়িতে, কল-কারখানায়, ফুটপাতে যেখানে সেখানে লোক মারা পড়িতে লাগিল। এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, শব অপসারণের জন্যও লোক পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। এমন কি কফিন পর্যন্ত পাওয়া যাইত না। এমনও ঘটিয়াছে মৃতের আত্মীয়-স্বজন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আর কবর খুঁড়িতে পারে নাই, মৃতদেহ কবরখানায় ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ফলে, চারদিকে অসংখ্য শবের জন্য প্রতিদিন মহামারী দেখা দেওয়ার আশংকা সারা শহরকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। জ্বালানির অভাবে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষার জন্য লেনিনগ্রাদের বাসিন্দারা বাড়ীর আসবাবপত্র এবং লক্ষ লক্ষ বই পোড়াইয়া ফেলিল! লেনিনগ্রাদে হোটেল আস্টোরিয়া (Astoria) খুব নাম করা হোটেল।* এই হোটেল খাদ্য সংকটের সময় হাসপাতালে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে যাঁদের চিকিৎসার জন্য আনা হইত, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বুদ্ধিজীবী। এবং অধিকাংশই অনাহারের জন্য মারা পড়িয়াছিলেন। কিন্তু লোকের অনুভূতি ক্রমশঃ এমন ভোঁতা হইয়া গেল যে, মৃতকে কবরস্থ করিতে গিয়া কেউ চোখের জল ফেলিত না। ক্রমাগত অনাহারের জন্য নারীদের দেহের উপর এমন প্রতিক্রিয়া ঘটিল যে, তাদের মাসিক ঋতু পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল! মাতৃমঙ্গল হাসপাতালে নূতন শিশুও জন্মগ্রহণ করিত না।

অবরুদ্ধ ক্ষুধার্ত লেনিনগ্রাদের অবস্থা কি ভয়ংকর হইয়াছিল, এই সমস্ত ঘটনা থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যাইতে পারে।···

মহাযুদ্ধের পর লেনিগ্রাদের যুদ্ধে নিহত পাঁচ লক্ষ সৈন্যের জন্য যে বিরাট গণ সমাধিক্ষেত্র তৈয়ার হইয়াছে, ১৯৬৫ সালে বর্তমান গ্রন্থকার সেই সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন। লেনিনগ্রাদের দুর্ভিক্ষে মৃত তানিয়া নাম্নী একটি ছোট বালিকার যে

*১৯৫৫ সালের জুন মাসে আমি প্রথম সোভিয়েট রাশিয়া পরিদর্শন করিতে গিয়া লেনিনগ্রাদের হোটেল আস্টোরিয়াতে অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন শুনিয়াছিলাম যে, হিটলারের পরিকল্পনা ছিল লেনিনগ্রাদ জয়ের পর হোটেল আস্টোরিয়াতে বিজয়োৎসব সম্পন্ন করা হইবে। কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে আর সেই সুযোগ ঘটিল না। —লেখক

দিনপঞ্জী সেখানে রক্ষিত আছে, সেটি যেমন করুণ, তেমনি মর্মন্তুদ। সেই দিনপঞ্জীতে বালিকার কাঁচা হাতের অক্ষরে পর পর লেখা আছে :

"—আজ আমার ঠাকুমা মারা গেলেন।—২৫ শে জানুয়ারী

—আজ আমার কাকা মারা গেলেন।—১০ই মে, সকালে ৭-৩০

—আজ আমার মা মারা গেলেন।—১৩ই মে,

—এখন শুধু বেঁচে আছে তানিয়া।"

কিন্তু কয়েকদিন পর তানিয়ারও জীবনদীপ নিভিয়া গেল, সেকথা তার দিনপঞ্জীতে আর লেখা হইল না!···পৃথিবীর বিখ্যাত লোকেরা এই মর্মভেদী দিনপঞ্জী দেখে অশ্রু সম্বরণ করতে পারেননি।

১৯৪৩ সালের জানুয়ারীতে লেলিনগ্রাদের ঐতিহাসিক অবরোধ ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসের আগে লেলিনগ্রাদের দুর্ভোগের সম্পূর্ণ অবসান হইল না। কিন্তু ইতিমধ্যে লেলিনগ্রাদের ৩০ লক্ষ অধিবাসীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়া মাত্র ৬ লক্ষে দাঁড়াইল। এর দ্বারাই বুঝা যাইবে অবরুদ্ধ লেলিনগ্রাদে কি পরিমাণ লোকক্ষয় হইয়াছিল।

আত্মরক্ষার ইতিহাসে লেলিনের নামাঙ্কিত এই শহর ট্রাজেডির মহাকাব্যরূপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

* * *

জুকোভের নেতৃত্ব লেলিনগ্রাদ হইতে দুইটি আক্রমণাত্মক অভিযান অনুষ্ঠিত হইল—একটি লেলিনগ্রাদ হইতে দক্ষিণদিকে, অপরটি ভলকোভ নদী হইতে পশ্চিম-দিকে। ২০ শে জানুয়ারী দক্ষিণগামী অভিযানের ফলে মস্কোর রেলপথ মুক্ত হইল এবং পশ্চিমদিকের আক্রমণের দ্বারা নভগরোদের পার্শ্ব ছিন্ন হইল। এই দুই অভিযান গিয়া একত্রে মিলিত হইল চুদোভোর উত্তর-পশ্চিমে ১লা ফ্রব্রুয়ারী তারিখে এবং ইহার উদ্দেশ্য ছিল এস্থোনিয়া অভিমুখে পশ্চাদপসরণকারী জার্মান সৈন্যদিগকে ফাঁদে ফেলা। ১৩ই ফেব্রুয়ারী লালফৌজের স্কী-সৈন্যেরা লুগা শহর কাড়িয়া লইল। ১৭ই ফেব্রুয়ারী উত্তর রণাঙ্গনের অতি গুরুত্বপূর্ণ জার্মান শক্ত ঘাঁটি স্টারায়া রুশ বেষ্টিত এবং দখলীকৃত হইল। ২১ শে ফেব্রুয়ারী জার্মানরা মোটামুটি ৩০০ মাইল রণাঙ্গনে পশ্চাদপসরণ করিল—এই পশ্চাদ্বর্তনের রেখা উত্তরে ফিনল্যাণ্ড উপসাগর হইতে দক্ষিণে পস্কোভ, পূর্বে ইলমেন হ্রদ এবং দক্ষিণে ভেলিকিলুকিগামী অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত। মস্কো হইতে দাবী করা হইল যে, এই পশ্চাদপসরণের ফলে জার্মানরা ৯০ হাজার লোক হারাইল। লেনিনগ্রাদ আবার মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, ইহার গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্রের কারখানাগুলি আবার কাজ আরম্ভ করিল এবং সোভিয়েট হাইকম্যাণ্ড আসন্ন গ্রীষ্মে সমগ্র বালটিক রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

১৯৪৩-৪৪ সালের শীতকালের যুদ্ধে রাশিয়া সর্বাপেক্ষা লাভবান হইল দক্ষিণ রণক্ষেত্রে। সেখানে নীপার নদীর বাঁক এবং উক্রাইনের পূর্ণ মুক্তি ঘটিল। নাৎসী আক্রমণকারীরা সোভিয়েট রাশিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া আবার সেই পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার সীমান্তে ছুটিয়া গেল, যেখান হইতে তারা ১৯৪১ সালে রাশিয়া আক্রমণ ও দখল করিয়াছিল। তবে, ১৯৪৩-এর শেষভাগে জার্মানবাহিনী কিয়েভের চতুর্দিকস্থ

এলাকায় ৬ সপ্তাহ ধরিয়া প্রবল পালটা আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণ জমি পুনর্দখল করিয়াছিল। কিন্তু লালফৌজ শীতকালীন অভিযান আরম্ভ করিবামাত্র ১০ দিনের মধ্যে এই সমস্ত স্থান পুনরুদ্ধার করিল। ১৯৪৩-এর ২৯শে ডিসেম্বর জেনারেল ভাতুতিনের অধীন ২নং উক্রেনীয় বাহিনী ১৮৫ মাইল রণাঙ্গনে এক বিরাট ব্যূহভেদের দ্বারা যেমন বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল, তেমনিই তারা ২২ ডিভিসন জার্মান সৈন্যকে যেন বন্যাবেগে ভাসাইয়া লইয়া গেল এবং কিয়েভের পশ্চিমে ভেদ করিয়া চলিয়া গেল—৮০ মাইল দূরবর্তী করোস্টেন ও ঝিটোমিরের রেলজংশন দখল হইল এবং কিয়েভ হইতে ওয়ারশগামী রেলপথ ধরিয়া পোল্যাণ্ডের পুরানো সীমানায় গিয়া হাজির হইল। সারণিতে ওয়ারশ-কিয়েভ রেলপথ বিচ্ছিন্ন এবং ১২ জানুয়ারী (১৯৪৪) জার্মান সৈন্যেরা প্রিপেট জলাভূমির দিকে তাড়িত হইল। ফলে শত্রুসৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল এবং জার্মানীর উত্তর এবং দক্ষিণ রণক্ষেত্রের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। জেনারেল ভাতুতিনের বামপার্শ্বের সৈন্যেরা দক্ষিণ দিকে জেমেরিংকা অভিমুখে ধাবিত হইল—পোল্যাণ্ডের লোও হইতে ওডেসা পর্যন্ত ইহাই ছিল দক্ষিণ রাশিয়ায় জার্মানদের শেষ 'ট্রাংক' রেলপথ এবং জেমেরিংকা ছিল উহার জংশন। রুশরা জানিত যে, যদি ইহার পতন ঘটে, তবে, দূরে পূর্বাঞ্চলের নীপার বাঁকে অবস্থিত জার্মান সৈন্যেরা ফাঁদে পড়িবে। জার্মানরাও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং ফেব্রুয়ারী মাসে তারা প্রচণ্ড শক্তিতে এখানে পুনরাক্রমণ চালাইল এবং মাসাধিককাল ধরিয়া লালফৌজের গতিরোধ করিয়া রাখিল।

জার্মানরা আত্মরক্ষার খাতিরে পশ্চিম দিকে অপসরণ করিল বটে, কিন্তু রুশদের গতি মন্থর করিবার উদ্দেশে মাঝে মাঝে তীব্র আক্রমণ চালাইল। যেমন, ১১ই হইতে ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে ১৫ ডিভিসন নাৎসী সৈন্য কিয়েভের দক্ষিণ পশ্চিমে রুশ সৈন্যদিগকে শহর অভিমুখে চাপিয়া ধরিল এবং জেমেরিংকা অভিমুখে তাদের গতিরোধ ও নীপার বাঁকের এলাকায় জার্মানদিগকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করিল। এই পালটা-আক্রমণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য লালফৌজের দুইটি পুরা আর্মি বা সৈন্যবাহিনী রণক্রিয়ার এমন এক অদ্ভুত জটিল অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইল, যাহা এই যুদ্ধের ইতিহাসে ছিল অভূতপূর্ব! যে রণনৈতিক চাল ছিল রাশিয়ার দ্রুত অগ্রগতির গুপ্তমন্ত্রের মত, এখানে সেই পালটা চালের অসাধারণ কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠতা লালফৌজ দেখাইল। স্ট্যালিনগ্রাদের ইতিহাসবিখ্যাত অবরোধ সৃষ্টির পর নীপার বাঁকের উত্তরে কোরসানের অবরোধও কম বিস্ময়কর ছিল না। যদিও রুশ-জার্মান যুদ্ধের বহু বিস্ময়কর সংগ্রামের ডামাডোলের জন্য কোরসান প্রচারকার্যের মহিমার দ্বারা ততটা দীপ্তিমান হয় নাই। স্ট্যালিনগ্রাদের ৬নং জার্মানবাহিনীর মত এখানেও ছিল ৮নং বাহিনী। কোরসানের পূর্বে এবং চেরকাসির উত্তরে নীপার এলাকায় এই ৮নং জার্মানবাহিনী ৫০ মাইল রণাঙ্গন জুড়িয়া ছিল। তারা বেষ্টিত হইল জেনারেল ভাতুতিন ও জেনারেল কোনিয়েভের ১নং ও ২নং উক্রেনীয় বাহিনীর দ্বারা—যে বাহিনীর মধ্যে ছিল একমাত্র মোটরায়িত ডিভিসনই ১২ হইতে ১৫টি করিয়া। লালফৌজের এই দুইটি বাহিনী ২৪শে জানুয়ারী হইতে ৩রা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পরস্পরের সহিত মিলিত হইল এবং ৪ দিনে ৫০ মাইল অগ্রসর হইয়া জার্মানদের পশ্চাৎদিক ভেদ করিল—এভাবে আংটির মত এক দৃঢ় বেষ্টনীর সৃষ্টি হইল। জার্মানদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কেননা,

এই বেষ্টন চেষ্টাকে রুশেরা আড়াল করিয়াছিল ৮নং আর্মি হইতে বহু দূরে এক 'ধাপ্পা আক্রমণের' কৌশল খাটাইয়া ! এই রণক্রিয়া অত্যন্ত জটিল হইয়াছিল এই কারণে যে, ৮নং জার্মান বাহিনীকে কেবল বিচ্ছিন্ন ও বেষ্টনীর মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতেই হয় নাই, জেনারেল ম্যানস্টাইন উত্তর-পূর্ব হইতে কিয়েভের দিকে যে আক্রমণ চালাইতেছিলেন, তাহাও সেই সঙ্গে রোধ ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখার দরকার হইল। জেনারেল ভাতুতিন এক চমৎকার রণনৈতিক চালে পশ্চিম দিকে ঘুরিয়া গিয়া ম্যানস্টাইনকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিলেন এবং জেনারেল কোনিয়েভের সৈন্যদের পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া জার্মান সৈন্যদের মুখোমুখি হইলেন। জেনারেল ফন ম্যানস্টাইন যে মুহূর্তে এই কৌশল টের পাইলেন এবং জার্মানরা এক বিপজ্জনক ফাঁদে পড়িতেছে বলিয়া অনুভব করিলেন, তিনি সেই মুহূর্তে এই বেষ্টনী ভাঙ্গিবার জন্য তাঁর সৈন্যদিগকে পূর্বদিকে আক্রমণ ও ব্যূহভেদের হুকুম দিলেন। এই ভয়াবহ আক্রমণ চলিল দুই সপ্তাহ ধরিয়া—৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। জেনারেল ম্যানস্টাইন স্ট্যালিনগ্রাদের মতই ৮নং বাহিনীকে বিমানযোগে সরবরাহ পাঠাইতে লাগিলেন। এই বেষ্টনী হইতে পিছনের দিকের সৈন্যরা ও 'অ-লড়িয়ে সাহায্যকারীরা' ত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু ১৭ই ফেব্রুয়ারী লালফৌজ কোরসানের পশ্চিমে ১০ ডিভিসন শত্রুসৈন্য ঘায়েল করিয়া ফেলিল। ৫০ হাজারের অধিক নিহত নাৎসী সৈন্য রণভূমিতে পড়িয়া রহিল এবং ধরা পড়িল ১১ হাজার। যারা উদ্ধার পাইয়াছিল, তাদের মধ্যে ২ হাজার ছিল আহত, ইহাদিগকে বিমানযোগে উদ্ধার করা হইয়াছিল। স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের দ্বারা যেমন ভল্গা নদী দ্রুত শত্রুমুক্ত হইয়াছিল, কোরসানের (কেহ কেহ ইহাকে কোনিয়েভের যুদ্ধও বলিয়া থাকেন, নীপার তটে কোনিয়েভ পর্যন্ত জার্মান লাইন ছিল) এই পরাজয়ের ফলে নীপার বাঁকের উত্তর দিকটাও অতি দ্রুত মুক্ত হইয়া গেল এবং জার্মানরা পশ্চিম দিকে ৬০ মাইল পিছনে হটিয়া গেল।

এবার নীপার বাঁক সহ সমগ্র উক্রাইনের মুক্তি অভিযান আরম্ভ হইল এবং তিনটি সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী বা আর্মি ইহাতে যোগ দিল। জেনারেল ম্যালিনোভস্কির অধীন তৃতীয় উক্রেনীয় বাহিনী নিম্ন নীপারের জার্মান ব্যূহ ভেদ করিয়া ফেলিল এবং ১০০ মাইল রণক্ষেত্রে তারা অগ্রসর হইল ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখ, আর বিখ্যাত ম্যাঙ্গানিজ শহর নিকোপল তারা কাড়িয়া লইল। পৃথিবীর সমগ ম্যাঙ্গানিজের এক-পঞ্চমাংশ উৎপন্ন হইত এই নিকোপল শহরে। এই শহরের পতনের পর উত্তরপূর্ব দিকে আর-একটি বিখ্যাত শিল্পনগরী ক্রিভয়রগ, যাহা লৌহধাতুর জন্য বিখ্যাত, তারও পথ খুলিয়া গেল। ১৯৪৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ক্রিভয়রগ লালফৌজের দুই বাহুর একত্র আক্রমণে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। জার্মানরা অতি তাড়াতাড়ি একটি পার্শ্বদেশে মজুত সৈন্য প্রয়োগ করিতে গিয়া ব্যর্থ ও পরাজিত হইল। লালফৌজের গতি দুর্বার হইল।

স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানীর যে ৬নং আর্মি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, উহার বদলে আর-একটি নূতন ৬নং বাহিনী গঠিত হইয়াছিল এবং তারা নীপারের দক্ষিণাংশে নিকোলায়েভ এলাকায় ব্যূহ রচনা করিয়াছিল। ৬ই মার্চ হইতে ১৬ই মার্চের মধ্যে এই বাহিনী লালফৌজের 'কাস্তে ও হাতুড়ির' চাপে পরাজিত হইল। নিম্ন নীপারের খেরসন বন্দর ও নিকোলায়েভ উভয়েরই পতন হইল ১৩ই মার্চ। এখানে রুশ

পদাতিক ও ট্যাঙ্কবাহিনী কৃষ্ণ সাগরীয় নৌ-সৈন্যদের সহযোগিতায় এক সাঁড়াশী আক্রমণে জার্মানদিগকে কাবু করিয়া ফেলিল এবং তারা ২৮শে মার্চ অতি দ্রুত দক্ষিণ-পশ্চিমে বিখ্যাত ওডেসা বন্দরের দিকে পশ্চাদপসরণ করিল। এই বন্দরও কিছুকাল অবরোধ যুদ্ধের পর ১০ই এপ্রিল তারিখ রুশদের হাতে আসিল। প্রকাশ যে, ওডেসা বন্দরের এই মুক্তিযুদ্ধে লালফৌজের হাতে ২৬ হাজার নাৎসী সৈন্য নিহত ও ১১ হাজার বন্দী হইল। এভাবে সমগ্র নীপার নদীর বাঁক হইতে জার্মানরা বিতাড়িত হইল। বহু সৈন্য পলায়নের পথ করিয়া লইয়াছিল, সন্দেহ নাই, তবে প্রাণবলিও ঘটিয়াছিল প্রচুর।

ইতিমধ্যে কিয়েভ এলাকার বাহিরে জার্মানদের পালটা-আক্রমণ প্রতিহত হওয়ার পর মার্শাল জুকভ্ (ভাতুতিনের পর) ও কোনিয়েভের নেতৃত্বে ১নং ও ২নং উক্রেনীয় আর্মি উক্রাইন হইতে জার্মানদিগকে বিতাড়নের জন্য অভিযান আরম্ভ করিল। কোনিয়েভের বাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিমে রুমানিয়া অভিমুখে আক্রমণ চালাইল, ১৪টি নাৎসী ডিভিসনকে পর্যুদস্ত করিল, উমানের বিমান-ঘাঁটিগুলি দখল করিল এবং ১৯৪৪ সালের ১৫ই মার্চ বুগ নদীর মাঝামাঝি অতিক্রম করিল। বুগ নদী হইতে ১৯শে মার্চ তারা ৬০ মাইল দূরে অগ্রসর হইয়া গেল আগেকার রুমানীয় সীমান্তে নীস্টার নদীতটে। সেখানে মোগিলেভে নদী পার হইয়া তারা বেসারাবিয়ায় প্রবেশ করিল এবং ২৬শে মার্চ প্রুথ নদীর দিকে অগ্রসর হইল। প্রুথ নদীতে রুশ সৈন্যের উপস্থিতির দ্বারা এই সর্বপ্রথম 'সোভিয়েট রাষ্ট্রের সীমান্ত' উদ্ধার হইল এবং মার্শাল স্ট্যালিন সৈন্যদিগকে অভিনন্দন জানাইলেন। দেড় বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট বাহিনী স্ট্যালিনগ্রাদ হইতে ৯০০ মাইল অগ্রসর হইয়া গেল এবং ১৯৩৯ সালের পূর্ববর্তী সীমানার মাত্র এক-চতুর্থাংশ বাদে আর সমস্ত ভূভাগ উদ্ধার করিল।

জুকোভের ১নং উক্রেনীয় আর্মি কিয়েভের পশ্চিমে এক শত মাইল রণাঙ্গনে অভিযান আরম্ভ করিল এবং জার্মানদিগকে পোল্যাণ্ড অভিমুখে তাড়াইয়া নিয়া চলিল। ৭ই মার্চ এই অভিযান আরম্ভ হইল গোলন্দাজদের মারাত্মক গোলাবর্ষণের মধ্যে, যার ফলে জার্মানদের সমস্ত শক্ত ঘাঁটি ও কামানশ্রেণী বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তিন দিনে জুকোভের সৈন্যেরা দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩০ মাইল অগ্রসর হইয়া গেল। ১৭ই হইতে ২২শে মার্চের মধ্যেই এখানে যে সমস্ত যুদ্ধ ঘটিল, তাতে টার্নাপোল ও প্রসকুরোভের মধ্যবর্তী রেলপথ (যাহা পোল্যাণ্ডের লোও হইতে ওডেসা বন্দরকে যুক্ত করিয়াছে) বিপন্ন ও বিচ্ছিন্ন হইল। পশ্চিম উক্রাইনের শক্তিশালী ঘাঁটি ও রেল জংশন ভিনিৎসা ও জেমেরিংকা দখল হইল ৩০শে মার্চ। এখানে জার্মানীর প্রভূত পালটা-আক্রমণ প্রতিহত হইল। রুশ সৈন্যেরা অগ্রসর হইয়া চলিল দক্ষিণে সেরনা-উটির রেলজংশন অভিমুখে—এই রেলজংশন ছিল বিখ্যাত 'তাতার গিরিবর্ত্ম' (Tatar Pass) হইতে মাত্র ১৫ মাইল দূরে, যে গিরিবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে কর্পেথিয়ান পর্বতমালার ভিতর দিয়া হাঙ্গেরী এবং চেকোশ্লভাকিয়ায়। সুতরাং বলকান রাজ্যের দ্বার মুক্ত হইতে চলিল। মার্শাল জুকোভ তাঁর এই দ্রুত অগ্রগতির মুখে ২৪টি শত্রু ডিভিসন ঘায়েল করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিলেন। তাঁর সৈন্যেরা পুরানো পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিল ১৯৪৪ সালের ২রা এপ্রিল। ঐদিন সমগ্র সোভিয়েট

উক্রাইনের মুক্তি ঘটিল। রাশিয়ার শস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্প ঐশ্বর্যের দেশ তিন বৎসর পর আবার সোভিয়েটের হাতে ফিরিয়া আসিল।

ক্রিমিয়া উপদ্বীপ এবং সেবাস্তপোলের বিখ্যাত নৌদুর্গও আর জার্মানদের হাতে রহিল না। নাৎসীবাহিনী যখন নীপারের দিকে পশ্চাদপসরণ করিল, তখনও ক্রিমিয়ায় জার্মান ও রুমানীয় সৈন্য রহিয়া গেল। কিন্তু নিম্ন নীপারের নিকোলায়েভ বন্দরের পতনের পর এখানকার সৈন্যেরা বিচ্ছিন্ন হইয়া রুশদের হাতে ঘায়েল হইল ২৮শে মার্চ। কার্চ সেতুমুখ হইতে জেনারেল তোলবুখিন ও জেনারেল জেরেমেঙ্কোর অধীন দুইটি রুশবাহিনী পশ্চিম অভিমুখে আক্রমণ চালাইল দুই সপ্তাহ ধরিয়া। তারপর একদিনে তারা ৪০ মাইল অগ্রসর হইয়া গেল এবং ১৫ই এপ্রিল সেবাস্তপোলের রুমানীয় সৈন্যদিগকে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিল। প্রায় মাসখানেক ধরিয়া এখানে প্রবল যুদ্ধ হইল এবং ১০ই মে তারিখ রুশরা সেবাস্তপোল পুনরুদ্ধার করিল। জেনারেল তোলবুখিনের ৪নং উক্রেনীয় আর্মি জেরেমেঙ্কোর 'নৌ-অঞ্চল বাহিনী'র সহিত একযোগে আক্রমণ চালাইয়া পাহাড়ের দুর্গায়িত এলাকাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। লৌহ ও কংক্রীটের তৈয়ারী আত্মরক্ষার নিদারুণ বেষ্টনীগুলি ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ এবং বোমারুর সম্মিলিত আক্রমণে চূর্ণ হইয়া গেল। এই অভিযানের সময় সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর শত্রুসৈন্যের অপসারণে যথেষ্ট বাধা দিয়াছিল। ১৯১টি পোত জলমগ্ন হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ৬৯টি ছিল সৈন্যবাহী জাহাজ। সেবাস্তপোলের পতনের পর রুশরা দাবী করিল যে, ক্রিমিয়ার এই যুদ্ধে ৫০ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং ৬১ হাজার আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

১৯৪৪-এর প্রাক-বসন্তে লালফৌজ উত্তর রণাঙ্গনে লেনিনগ্রাদের অবরোধ মুক্ত করিল, মধ্য রণাঙ্গনে প্রিপেট জলাভূমির দিকে জার্মানদিগকে বিতাড়িত করিল এবং সমগ্র দক্ষিণ রণক্ষেত্র হইতে শত্রুকে উৎসাদিত করিয়া পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার অভ্যন্তরে তাড়াইয়া লইয়া গেল। অর্থাৎ সোভিয়েট ভূমির প্রায় অধিকাংশই জার্মানীর হাতছাড়া হইল এবং লালফৌজের নিকট বাল্টিক রাজ্য, পোল্যাণ্ড ও বলকান রাষ্ট্রসমূহের দ্বার মুক্ত হইল। জার্মান সৈন্যেরা গৃহাভিমুখে বিতাড়িত হইল। স্ট্যালিনগ্রাদের বিপর্যয়ের পর জার্মানবাহিনী সংহত আক্রমণের বেগ হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং ১৯৪৩-৪৪' এর গ্রীষ্ম বা শীতে লালফৌজের সহিত কোথাও আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। ক্রমে তার আত্মরক্ষার শক্তি ক্ষয় পাইতে লাগিল। কোরসানের বেষ্টনী ও নীপার বাঁকের যুদ্ধ জার্মানীকে বিষম ঘায়েল করিল।

লালফৌজ রণনীতি ও রণকৌশলের অবর্ণনীয় চমৎকারিত্বের পরিচয় দিল এবং উক্রাইনের যুদ্ধে যে সমস্ত সোভিয়েট সেনাপতি বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিলেন, তাঁদের মধ্যে ফিল্ড মার্শাল ভাতুতিনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কারণ, যে সময় তাঁরই জয়লব্ধ ফল উক্রাইন পুনরায় সোভিয়েটের হাতে আসিয়াছিল, সেই সন্ধিক্ষণে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘোষিত হইল ১৪ই এপ্রিল, ১৯৪৪। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে সোভিয়েট সমর-কর্তৃপক্ষ একজন দীপ্তমান প্রতিভার অধিকারী ও দক্ষ সেনাপতিকে হারাইলেন। তাঁর সম্পর্কে একটি ইংরাজী সামরিক গ্রন্থে যে প্রশংসা করা হইয়াছে, এখানে তার উল্লেখ করা যাইতে পারে—

'Perhaps the most brilliant of a number of brilliant commanders, he had a boldness in conception and a resolution in action that were inspiring ; and his great ability was never more conspicuous than when he was compelled to stand temporarily in the defensive while preparing for a riposte against an exhausted opponent.'[১]

এই প্রশংসা নিশ্চয়ই অপাত্রে বর্ষিত হয় নাই এবং রাশিয়া সম্পর্কে ইংরাজ লেখকদের পক্ষপাতিত্ব থাকিবারও কারণ নাই।

১। The Second Great War, edited by Sir John Hammerton Vol. VII, P. 3087.

সপ্তম পর্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোমের মুক্তি : ইতালীয় যুদ্ধের মন্থরতা

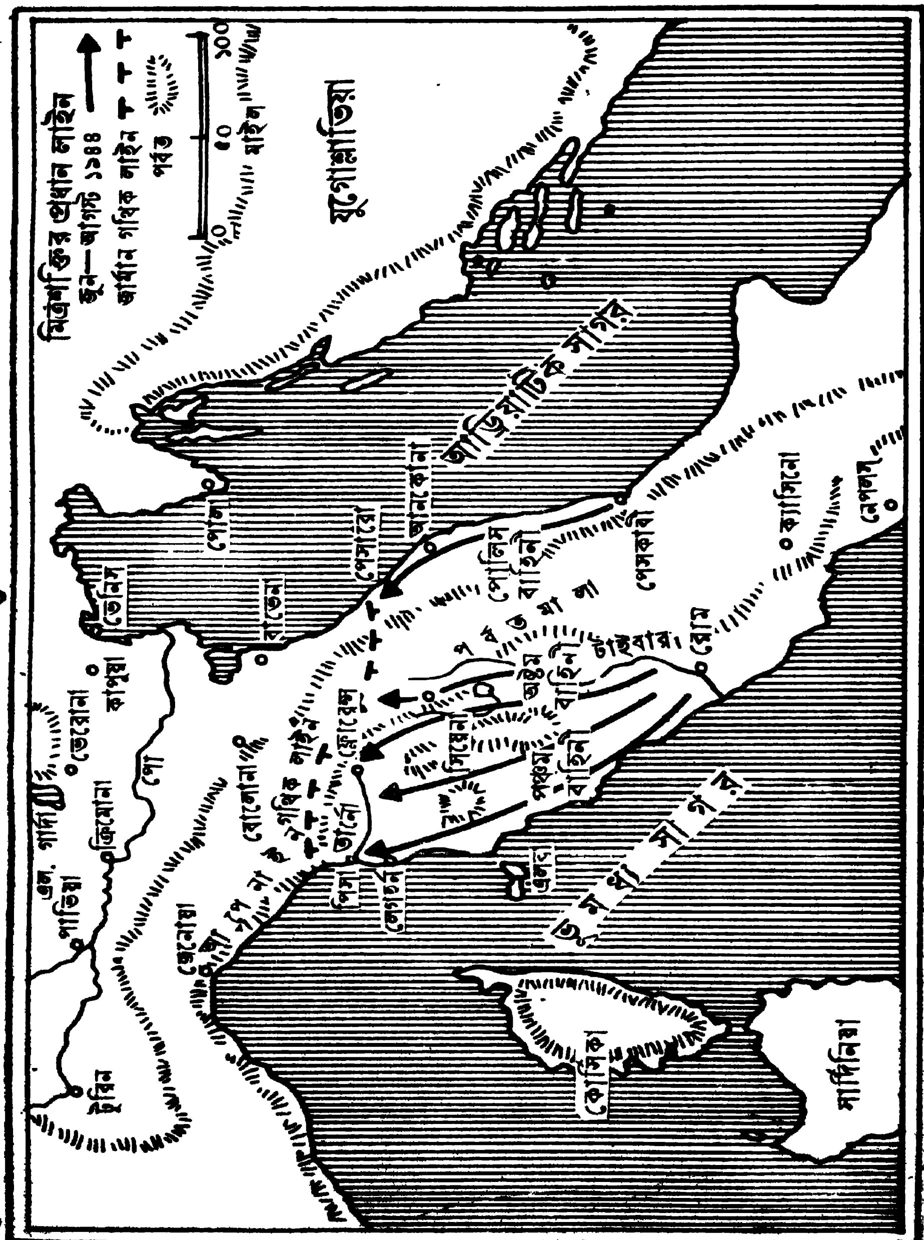
মুসোলিনীর পতন (পরে হিটলার কর্তৃক উদ্ধার) এবং ইতালীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ সত্ত্বেও ইতালীয় যুদ্ধের কিন্তু অবসান হইল না। মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এটা একটা নূতন দৃষ্টান্তের মত। ষষ্ঠ পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারেই বলা হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষের জয় সত্ত্বেও ইতালীর যুদ্ধ বিস্ময়কর রূপে দীর্ঘস্থায়ী হইল—১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৫ সালের মে মাসে জার্মানীর পতন পর্যন্ত এই যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। অবশ্য হিটলারী সৈন্যবাহিনীর প্রতিরক্ষার দৃঢ়তার জন্যই এটা সম্ভব হইয়াছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নাৎসী সৈন্যদলের পরাজয় এবং মুসোলিনীর ভাগ্য-বিপর্যয় সত্ত্বেও হিটলার ইতালী পরিত্যাগ কিংবা রোম নগরী হাতছাড়া করিলেন না। কেননা, খাস জার্মানীর রণনৈতিক আত্মরক্ষার পক্ষে বিশেষভাবে উত্তর ইতালীর যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি ইতালীর রাজধানী রোমনগরীকে করায়ত্ত রাখাও ফ্যাসিস্ট পক্ষের প্রেষ্টিজের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। ইউরোপীয় মহাদেশের অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় ইতালীয় যুদ্ধের প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল। কেননা, এখানকার ভৌগোলিক সংস্থান—নদী পাহাড় পর্বত জঙ্গল ইত্যাদির জন্য সোজাসুজি সমতল ক্ষেত্রের লড়াইয়ের উপযোগী ছিল না। সেই বিখ্যাত হিটলারী ব্লিজক্রীগ্ বা বিদ্যুৎগতি আক্রমণ ও অগ্রগতি এখানকার অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার জন্য সম্ভব ছিল না। প্রবল বন্যাস্রোতের মত অজস্র সৈন্যদলের রণক্ষেত্রে প্রবেশ ও অগ্রগতি এবং যান্ত্রিক যুদ্ধের গতিশীলতার নাটকীয় চমক এখানে ছিল না। এমন কি, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ পরস্পরের মুখ পর্যন্ত দেখিতে পাইতেন না। উভয় পক্ষের সৈন্যদেরই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া পাহাড়ের গলি দিয়া আগাইয়া যাইতে হইত। সুতরাং এই যুদ্ধ অত্যন্ত মৃদুগতিসম্পন্ন ছিল।[১]

কিন্তু এর ফলে ইতালীয় জনগণের দুর্গতির আর সীমা রহিল না। একদিকে মিত্র পক্ষ এবং অন্যদিকে ফ্যাসিস্ট জার্মানী এই দুই পক্ষের প্রচণ্ড রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য ইতালীয় নরনারীর অবস্থা মর্মান্তিক হইয়া দাঁড়াইল। মুসোলিনীর ক্ষমতাচ্যুতি ও পতনের পর ইতালীর জনগণ মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা মিত্রপক্ষকে স্বাগত জানাইবার সুযোগ পর্যন্ত পাইলেন না। কারণ, মুসোলিনীর বদলে হিটলার রোমসহ মধ্য ইতালী থেকে একেবারে উত্তরবর্তী ইতালী পর্যন্ত রণক্ষেত্রের প্রভু হইয়া দাঁড়াইলেন। উত্তর ইতালীর আত্মরক্ষার ভার দেওয়া হইল বিখ্যাত জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল রোমেলের হাতে। ১৯৪০ সালের এক সময় মুসোলিনী বলিয়াছিলেন যে, যদি জার্মানরা একবার এখানে (ইতালীতে) আসিতে পারে, তবে, আর কখনও দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিবে না। নিজের অজ্ঞাত-সারেই মুসোলিনী তখন একটা সত্য কথা বলিয়াছিলেন। কারণ, হিটলার ও তাঁর সৈন্য-বাহিনী যারা ইতালী দখল করিয়া রহিল, তাদের দখলদারীর মধ্যে মিত্রপক্ষীয় মার্কিন,

১। The War—Louis Snyder, P. 419.

বৃটিশ, ফরাসী, পোলিশ ও ব্রাজিলিয়ান সৈন্যেরা যখন ইতালীতে প্রবেশ করিল, তখন যেন তারা ভীমরুলের চাকের মধ্যে গিয়া পড়িল। নিদারুণ প্রাকৃতিক বিঘ্নের সুযোগ নিয়া জার্মানরা একটার-পর-একটা প্রতিরক্ষার লাইন গড়িয়া তুলিল এবং মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা আগাইতে গিয়া প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য দলে দলে প্রাণ দিতে লাগিল। কারণ, প্রতিরক্ষার যুদ্ধের পক্ষে ইতালীর ভুমি ছিল অতুলনীয়। রণপণ্ডিত লিডেল হার্ট এবং জে. এফ. সি. ফুলারও তাঁদের পুস্তকে ইতালীর এই যুদ্ধে প্রাকৃতিক বিঘ্নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছেন। অসংখ্য নদী-নালা-হ্রদ-জলাভুমি এবং পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করিল জার্মান সৈন্যেরা। ১৯শে আগস্ট, ১৯৪৩, মিত্র-পক্ষ জার্মানদের বিমানঘাঁটি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড বোমারু আক্রমণ চালাইল। ৩রা সেপ্টেম্বর মণ্টগোমারির বিখ্যাত অষ্টম বাহিনীর দুইটি ডিভিসন দক্ষিণতম ইতালীর মেসিনা প্রণালী পার হইয়া উত্তরে ক্যালাব্রিয়ার দিকে অগ্রসর হইল এবং কয়েকটি জায়গা দখল করিয়া নিল। ৬ দিন পর ৯ই সেপ্টেম্বর মার্কিন বাহিনী নেপলস অভিমুখে জল ও স্থল উভয় পথে এক অভিযান শুরু করিল। মার্কিন জেনারেল মার্ক ক্লার্কের অধীনে নবগঠিত পঞ্চম আর্মি (অর্ধেক মার্কিন, অর্ধেক ইংরাজ) নেপলস উপসাগরের ৪৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে প্রচুর নৌ ও বিমানশক্তির সহযোগিতায় স্যালার্নোর নিকট অবতরণ করিল। প্রথম মাসে মোট ১লক্ষ ৩৫ হাজার বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্য ১ লক্ষ টন সরবরাহ এবং ৩০ হাজার মোটরযান অবতরণ করানো হইল। স্যালার্নোর এই অবতরণের সংবাদ পাওয়া মাত্র হিটলার রোম নগরী দখল করিলেন এবং ভ্যাটিকান শহর রক্ষার ভার জার্মানদের হাতে রাখিলেন। উত্তর ইতালী, দক্ষিণ ফ্রান্স ও বলকান অঞ্চলে যে সমস্ত ইতালীয় সৈন্য ছিল, তারা সকলেই জার্মান-দের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। মিত্রপক্ষের নিকট আরও দুঃসংবাদ এই ছিল যে, জার্মানরা স্যালার্নোতেও বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণের উঁচু জমি থেকে জার্মানরা মিত্রসৈন্যদের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল এবং মিত্রপক্ষের সৈন্যদের অবতরণের চারদিন পর জার্মানরা পালটা আক্রমণ চালাইল এবং কিছু কিছু জমি কাড়িয়া লইল। বার্লিন রেডিও দাবী করিল যে, স্যালার্নোতে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যদের দ্বিতীয় ডানকার্কের অবস্থা হইয়াছে। মিত্রপক্ষ এর জবাবে সিসিলি ও উত্তর আফ্রিকার ঘাঁটি থেকে স্যালার্নোতে এবং পূর্ব দিকে ফোগিয়াতে (Foggia) বোমারু আক্রমণ চালাইল। অপর পক্ষে মণ্টগোমারি দক্ষিণের ক্যালাব্রিয়া থেকে ১৫০ মাইল উত্তরদিকে (ক্যালাব্রিয়া থেকে এ্যাপেনাইন পর্বতমালা উত্তর-দক্ষিণে ইতালীর মেরুদণ্ডের মত ৬০০ মাইল দীর্ঘ ছিল) জার্মানীর বাধা দান ও প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। তখন ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, জার্মানরা স্যালার্নো এলাকা থেকে হটিয়া গিয়া নেপলস অভিমুখে চলিয়া গেল। ৯ই সেপ্টেম্বর স্যালার্নোতে অবতরণের দিন বৃটিশ বিমানবাহিত এক ডিভিসন সৈন্য ইতালীর সুপরিচিত ট্যারাণ্টোর নৌঘাঁটি দখল করিয়া নিল। সেপ্টেম্বর মাসে ইতালীর দক্ষিণতম অংশ মিত্রপক্ষের দখলে গেল। সার্ডিনিয়া পরিত্যাগ করিয়া জার্মানরা প্রস্থান করিল এবং দ্য গলের ফরাসী সৈন্যেরা পার্টিজান যোদ্ধাদের সহযোগিতায় কর্সিকা দ্বীপ অধিকার করিল। ১লা অক্টোবর, ১৯৪৪, জেনারেল ক্লার্কের পঞ্চম আর্মির সৈন্যেরা আগ্নেয়গিরি ভিসুবিয়াস ও ধ্বংসপ্রাপ্ত পম্পাই নগরীর পাশ কাটাইয়া

জার্মানদের হটাইয়া দিয়া নেপলসে প্রবেশ করিল। কিন্তু জার্মানরা নেপলস



পরিত্যাগের আগে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নেপলস শহরকে একেবারে শ্মশানে

পরিণত করিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করিয়া হাসপাতাল, জল, বিদ্যুৎ ও ময়দার কারখানা ইত্যাদি সমস্ত কিছু চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

একই সময়ে নেপলসের বিপরীত দিকে পূর্ব উপকুলে ফোগিয়া বিমান ঘাঁটি অষ্টম বাহিনীর সৈন্যেরা দখল করিয়া নিল। ফলে, মিত্রপক্ষের আর সিসিলির ঘাঁটি থেকে উড়িয়া আসিয়া বোমা বর্ষণের দরকার হইল না। ফোগিয়ার বিমানঘাঁটি থেকে মিত্রবাহিনী সারা ইতালীতে, এমন কি অস্ট্রিয়াতে পর্যন্ত বোমা বর্ষণের সুযোগ পাইল। অধিকন্তু পূর্ব উপকুলে ব্যারি বন্দর দখলের ফলে আদ্রিয়াতিক উপসাগরের উপরেও মিত্রপক্ষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতালীয় নৌবহরের অধিকাংশই তখন মিত্রবাহিনীর করতলগত।

কিন্তু মার্শাল এলবার্ট কেসেলারিং ছিলেন এই অঞ্চলে জার্মান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। তিনি যখন দেখিলেন যে, মিত্রপক্ষের তরফ থেকে ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধি হইতেছে তখন তিনি ভলটার্নো নদীর উত্তর তীরে আরও সুরক্ষিত ঘাঁটির দিকে চলিয়া গেলেন। মিত্রপক্ষের নিকট রোম তখনও বহুৎ দূর। রাজধানী রোমে পৌঁছিবার জন্য মিত্রপক্ষের নিকট তখন মাত্র দুইটি রাস্তা ছিল—একটি রাস্তা হইতেছে পূর্ব উপকুলবর্তী সড়ক ধরিয়া এবং অন্যটি হইতেছে পাহাড জঙ্গল নদীতে ঘেরা মধ্য ইতালীর বিস্তৃত ক্যাসিনো শহরের পথ ধরিয়া। কিন্তু এই দুই রাস্তাই ছিল ভয়ঙ্কর কষ্টসাধ্য ও দুর্গম, আর প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের সুযোগ নিয়া জার্মানদের প্রচণ্ড বাধা দান। এর উপর জুটিল অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত, জল এবং কর্দম। মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার লিখিয়াছেন—

'Either way it would be tough going for them. For the rest of the year 1943 they tried to push through the mud, dirt and slugsh—ever onward. Vehicles broke down and bridges were washed out by the incesssent rains. From high ridges of almost solid rock, the Germans poured a withering fire down on the Anglo-Americans dug into the chasms, rocks, and half-caves. "They lived like men of prehistoaic times", observed one reporter, "and a club would have become them more than a machine gun." How they survived the dreadful winter was beyond us.'[১]

অর্থাৎ উপরে বর্ণিত এই যুদ্ধটা যেন ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের বর্বর মানুষদের। সুতরাং মেশিনগানের চেয়ে মুগুরই তাদের হাতে বেশী মানাইত। কিভাবে এই সৈন্যেরা সেই ভয়াবহ শীতকাল কাটাইল তা' কল্পনাতীত ব্যাপার।...

এদিকে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার উদ্দেশ্যে 'অপারেশন ওভারলড'-এর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করার জন্য ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গনের সৈনাপত্যের পুনর্গঠন করা হইল। জেনারেল আইজেনহাওয়ার ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে মণ্টগোমারী, ব্রাডলি এবং প্যাটন—এই তিনজন বিখ্যাত জেনারেলও গেলেন। ইতালীতে মিত্রপক্ষের প্রধান সেনাপতিরূপে অবস্থান করিলেন জেনারেল স্যার হ্যারল্ড আলেকজাণ্ডার। জেনারেল ক্লার্ক রহিলেন পঞ্চম মার্কিন বাহিনীর দায়িত্বে এবং জেনারেল স্যার অলিভার লীজ বৃটিশ অষ্টম বাহিনীর দায়িত্বে।

১। The War, P. 424.

অপর পক্ষে জার্মান সৈনাপত্যেরও পরিবর্তন ঘটিল। জেনারেল রোমেল স্থানান্তরিত হইলেন ফরাসী রণাঙ্গনে এবং জেনারেল কেসেলরিং সমগ্র ইতালীর জার্মান বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রোম নগরীর প্রতিরক্ষার জন্য কেসেলরিং ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীতে ক্যাসিনো শহরকে কেন্দ্র করিয়া 'গুস্তভ লাইন' নামে আত্মরক্ষার ব্যূহ গড়িয়া তুলিলেন। হিটলার হুকুম দিলেন রাজনীতি ও রণনীতি উভয় কারণেই গুস্তভ লাইন রক্ষা করিতেই হইবে।

মিত্রপক্ষও এই ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তাঁরা রোমের ৩৩ মাইল দক্ষিণে টাইরেনিয়ান সাগরের তীরে আঞ্জিও (Anzio) নামক ক্ষুদ্র শহরে সসৈন্যে অবতরণ করিলেন গুস্তভ লাইনের পার্শ্বদেশ ছিন্ন করার জন্য। কয়েক দিনের মধ্যেই ৭০ হাজার সৈন্য এবং ১৮ হাজার যানবাহন এখানে আমদানি করা হইল। কিন্তু এই কার্যের দ্বারা মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা প্রচণ্ড বিপদে পড়িল। কেন না, আঞ্জিওর সমুদ্র সৈকত ছিল একেবারে খোলা, কোন আশ্রয়স্থল ছিল না। আর জার্মানরা পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের উপর থেকে গোলাগুলির অগ্নিবৃষ্টি উদ্গীরণ করিতে লাগিল। মিত্র সৈন্যরা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়ার যোগাড় হইল। কোন মতে এক অবর্ণনীয় বিপর্যয় থেকে শেষ পর্যন্ত তারা রক্ষা পাইয়া গেল বটে, কিন্তু সমালোচকদের মতে আঞ্জিওতে এভাবে "অবতরণ মূর্খতার চরম ছিল"। মিত্রপক্ষকে এই "মূর্খতার" জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হইয়াছিল। আঞ্জিওর রক্তসমুদ্র থেকে রেহাই পাইতে ৬ ডিভিসনের অধিক মিত্রসৈন্যদের চার মাস সময় লাগিয়াছিল।

আঞ্জিওর সমুদ্রতীরের এই ব্যর্থতার জন্য মিত্রপক্ষ ঠিক করিলেন তাঁরা গুস্তভ লাইনের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইবেন। আঞ্জিওর ৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ছিল রোমক আমলের বিখ্যাত প্রাচীন শহর ক্যাসিনো। ক্যাসিনোর ১১৭৫ ফুট পাহাড়ের উপর ছিল ৫২৯ খৃস্টাব্দের সেণ্ট বেনেডিক্টের সুবিখ্যাত মঠ—খৃস্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান। কিন্তু এই স্থান থেকে জার্মানরা সামরিক বাধাদান গড়িয়া তুলিয়াছিল। জেনারেল বার্নাড সি· ফ্রেবার্গের অধীনে নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতীয় সৈন্যেরা ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে আক্রমণ চালাইয়া পার্শ্ববর্তী কয়েকটি পাহাড় এবং ক্যাসিনোর এক-তৃতীয়াংশ দখল করিয়া নিল। কিন্তু মণ্ট ক্যাসিনোর উপর সরাসরি আক্রমণ করিতে না পারিলে সেখান থেকে জার্মানদের হটানো যাইবে না। অথচ গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া ক্যাসিনোর মঠ ধ্বংস করিলে ক্যাথলিক খৃস্টানদের মনে নিদারুণ আঘাত লাগিবে। সুতরাং মণ্ট ক্যাসিনোর উপর সামরিক আক্রমণ চালানো হইবে কিনা, এই নিয়া সেনাপতিদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিল। মিত্রপক্ষের তরফ থেকে মঠবাসীদের উদ্দেশ্যে এক আবেদন প্রচার করা হইল ক্যাসিনো ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য। কিন্তু জার্মানরা সেই আবেদন উপেক্ষা করিল, অথচ আত্মরক্ষার যুদ্ধ তাহারা চালাইয়া যাইতে লাগিল। তখন মিত্রপক্ষ বাধ্য হইয়া সুবৃহৎ বোমারু বিমান থেকে ৫৭৬ টন বোমা মণ্ট ক্যাসিনোর উপর বর্ষণ করিল। তথাপি জার্মানদের হটানো গেল না।

কিন্তু একটি তাজ্জব ব্যাপার এখানে ঘটিল। মিত্রপক্ষের এই নিদারুণ বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও সাধু বেনেডিক্ট যে কুঠুরীতে বাস করিতেন সেটি এবং গত ১৪০০ বছর ধরিয়া যে কবরে তাঁর মৃতদেহ শায়িত ছিল সেই কবরটি—বোমাবর্ষণে এই দুটির বিন্দুমাত্র কোন ক্ষতি হইল না।...

এখানকার যুদ্ধে ট্যাংক অচল ছিল, যা কিছু যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তা পদাতিক সৈন্যদের রাইফেল, হাতবোমা ও মেসিনগানের দ্বারা।

* * *

১৯৪৩-৪৪ সালের শীতকালে জার্মানদের সঙ্গে মিত্রবাহিনীর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের এই তীব্রতা সত্ত্বেও মিত্রপক্ষের অগ্রগতি খুব মন্থর ছিল। তারা আঞ্জিওতে আটকা পড়িয়াছিল এবং ক্যাসিনোর উপর সুসংহত আক্রমণ সত্ত্বেও সেই আক্রমণ ব্যর্থ হইল। তখন মিত্রপক্ষের হাইকম্যাণ্ড তাঁদের সৈনাপত্যের পুনর্গঠন করিলেন। মার্কিন পঞ্চম আর্মিকে পাঠানো হইল পশ্চিম দিকে টাইরেনিয়ান সাগরের কুল ধরিয়া আঞ্জিও সেতুমুখের শক্তিবৃদ্ধির জন্য এবং বৃটিশ অষ্টম বাহিনীকে পাঠানো হইল ক্যাসিনো শহরের দিকে—উদ্দেশ্য রোম অভিমুখে জোরদার অভিযানের জন্য। এই অভিযানের প্রস্তুতি-স্বরূপ মিত্র বিমানবাহিনী উত্তর ইতালী থেকে দক্ষিণ ইতালী পর্যন্ত প্রসারিত রেললাইন ও সড়কগুলির উপর বোমা বর্ষণ করিতে লাগিল। জার্মান সেনাপতি কেসেলরিং এই আক্রমণ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার জন্য পার্বত্য প্রতিবন্ধকের আড়ালে গুস্তভ লাইন এবং তার পিছনে এডলফ হিটলার লাইন—পর পর এই দুইটি প্রতিরক্ষা ব্যূহের আশ্রয় নিলেন। যুদ্ধ উভয় পক্ষে ধীর গতিতে গড়াইয়া চলিল। ১৯৪৪ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে কেসেলরিং ক্যাসিনো শহর ও আঞ্জিওর রণাঙ্গনের মধ্যে মিত্রবাহিনীকে জব্দ করার জন্য পণ্টাইন জলাভূমিকে প্লাবিত করিয়া দিলেন। কিন্তু ১১ই মে, ১৯৪৪, পঞ্চম ও অষ্টম বাহিনী যুগপৎ অভিযান চালাইলেন এবং ২ দিনের নৃশংস যুদ্ধে মিত্রপক্ষ গুস্তভ লাইন ভেদ করিলেন। আর বৃটিশ বাহিনী ক্যাসিনো শহর ও মঠ বেষ্টন করিল—পোলিশ সৈন্যরা মঠ দখল করিয়া তাঁদের পতাকা উড্ডীন করিলেন, যদিও তাঁরা নিজেরাও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

অষ্টম আর্মি তখন হিটলার লাইন ভেদ করিয়া রোম অভিমুখে অগ্রসর হইল এবং পঞ্চম আর্মি উপকূলবর্তী আঞ্জিও দখলের জন্য আগাইয়া গেল। ২৩শে মে, ১৯৪৪, বৃটিশ ও মার্কিনবাহিনী একত্রে আঞ্জিও সেতুমুখ থেকে আক্রমণ চালাইল। ক্রমে সর্বত্র জার্মান ব্যূহভেদ হইতে লাগিল এবং জার্মানরা উত্তর দিকে পলাইতে লাগিল। রোমের ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে জার্মানদের যে দুইটি শক্ত ঘাঁটি ছিল, আমেরিকানরা সেই শহর দুইটি দখল করিয়া নিল। তথাপি জার্মানরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইল না, তবে, তারা রোমের রাস্তা খোলা রাখিয়া আরও উত্তর দিকে প্রস্থান করিল।

এতদিনে রোমের সড়ক মুক্ত হইল। ৪ঠা জুন, ১৯৪৪, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটের সময় লেঃ জেনারেল মার্ক ক্লার্কের নেতৃত্বে মার্কিন পঞ্চম আর্মির ৮৮তম ডিভিসন রোম নগরীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু সামরিক দিক থেকে ইতালীতে মিত্রপক্ষের এই অভিযান তেমন প্রশংসনীয় ছিল না। কেননা, দক্ষিণতম ইতালীর প্রান্তদেশ "স্পর্শ" করার ৯ মাস পর এবং সিসিলিতে অবতরণের ১১ মাস পর তাঁরা রোমে পৌঁছিতে পারিলেন। তারপরেও কয়েক মাস ধরিয়া উত্তর ইতালীতে এই যুদ্ধ চলিল এবং ১৯৪৫ সালের ১লা মে ইতালীর সমগ্র জার্মান বাহিনী আত্মসমর্পণে রাজী হইল, অথচ সারা ইতালীতে মাত্র ১৪ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল। সুতরাং মিত্রপক্ষের কৃতিত্ব কতটুকু?

সপ্তম পর্ব

তৃতীয় অধ্যায়

নরম্যাণ্ডিতে অবতরণ : ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন

১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই পশ্চিম ইউরোপে কিংবা ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য দাবী উঠিয়াছিল। অবশ্য সেই দাবী উঠিয়াছিল প্রধানতঃ নাৎসী-বিরোধী জনমতের পক্ষ থেকে। কিন্তু চার্চিলের মতে ১৯৪১ সালে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা অসম্ভব ছিল। কারণ, মিত্রপক্ষের সেই উপযুক্ত শক্তি ছিল না। অতএব ১৯৪১ সাল গেল, তারপর ১৯৪২ সালেও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইল না। এমন কি, ১৯৪৩ সালেও দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দেখা মিলিল না, যদিও ঐ বছর দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার জন্য লণ্ডন এবং ওয়াশিংটন মস্কোকে মোটামুটি একটা প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৩ সালেও যখন পশ্চিম ইউরোপে বা উত্তর ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের কোন অবতরণ ঘটিল না, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় মহল থেকে নানা সংশয় ও সমালোচনার উদ্রেক করিল। বিশেষতঃ স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে লালফৌজের হাতে জার্মান বাহিনীর ভয়াবহ পরাজয়ের পরেও ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যর্থতা রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় প্রকার সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৯৪৪-এর জুন মাসে উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের নরম্যাণ্ডি উপকূলে সেই বহু প্রার্থিত ও বহু বিতর্কিত দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বোধন হইল। কারণ, সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রমাগত অগ্রগতি ও জয়ের ফলে ১৯৪৪ সালে এমন সম্ভাবনা দেখা দিল যে, শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট বাহিনী একাই বোধহয় জার্মানীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ অর্জন করিবে এবং নাৎসী কবলিত সারা ইউরোপের মুক্তি বিধান করিবে। বিশেষভাবে চার্চিল ও তাঁর সমর্থক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মহলে এই আশঙ্কা দেখা দিল—যে মহল ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিকে বাধা দিয়া আসিতেছিল। সোভিয়েট ঐতিহাসিক জি. ডেবোরিন লিখিয়াছেন—

'The second front in Europe was not opened in 1941, and not in 1942. It was not opened in 1943, when the tide had turned and Germany lost its advantage in the battlefield. It was when the outcome of the war was a forgone conclusion that British and American troops landed in Northern France. This was on June 6, 1944'.

অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে যখন যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল নিশ্চিতরূপেই নির্ধারিত হইয়া গেল, একমাত্র তখনই বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী উত্তর ফ্রান্সে অবতরণ করিল—১৯৪৪ সালের ৬ই জুন তারিখ।[১]

১। দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার—জি. ডেবোরিন, পৃষ্ঠা ৩৬০।

জি ডেবোরিনের মতে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার এই বিলম্বের জন্য বৃটিশ ও মার্কিনসহ মিত্রপক্ষের অজস্র মানুষের প্রাণবলি হইয়াছিল।

অবশ্য ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়াছিল ১৯৪৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে তেহরানে তিন প্রধানের—স্ট্যালিন, চার্চিল, রুজভেল্টের সম্মিলিত বৈঠকে। সুতরাং চার্চিল ও তাঁর সেনানীমণ্ডলীর পক্ষে এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করিয়া উপায় ছিল না, যদিও চার্চিল তখনও ইতালী, বলকান ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপর জোর দিতেছিলেন। এমন কি, উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের উপকূলে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া দক্ষিণ ফ্রান্সে (ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল হইতে) আর-একটি রণাঙ্গন খোলার যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, চার্চিলের সেই বিষয়েও আপত্তি ছিল এবং তাঁর সেনানীমণ্ডলীর ইচ্ছা ছিল দক্ষিণ ফ্রান্স আক্রমণকারী বাহিনীগুলিকে ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গনে পাঠানো।[১]

অবশ্য চার্চিলের পক্ষে একটা যুক্তি ছিল এই যে, ইতালীর যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিতেছিল। সুতরাং ১৯৪৩-৪৪ সালের শীতকালের এই মন্থর-গতি যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া উত্তর ইতালী অতিক্রমপূর্বক ভিয়েনা বা বলকান অঞ্চল থেকে জার্মানীতে দক্ষিণ দিক দিয়া আক্রমণের জন্য রাস্তা উন্মুক্ত করা। কিন্তু 'অপারেশন ওভারলর্ড' বা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমপূর্বক পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স (উত্তরাংশে) বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ড আক্রমণের এবং শেষ পর্যন্ত জার্মানীতে প্রবেশের যে বিরাট পরিকল্পনা ছিল মিত্রপক্ষের, সেই পরিকল্পনার পূর্ণ প্রস্তুতিতে যা'তে কোন প্রকারে ব্যাঘাত না ঘটিতে পারে, সেজন্য চার্চিলের বলকান রণনীতির প্রস্তাব গৃহীত হইল না। কিন্তু সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া সসৈন্যে অপর দেশে অবতরণের চেষ্টা সর্বদাই অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং বিপজ্জনক। রণপণ্ডিত লিডেল হার্ট লিখিয়াছেন যে, নরম্যাণ্ডি (Normandy) অভিযান খুব বিপদসঙ্কুল বলিয়া ধারণা ছিল। কারণ, এই গোটা সমুদ্রতীর দীর্ঘ চার বছর ধরিয়া শত্রুপক্ষের করায়ত্ত ছিল এবং সুদৃঢ় 'অতলান্তিক প্রাচীর' (Atlantic Wall) গড়িয়া উঠিয়া ছিল।

গোয়েবলসের দপ্তর অবশ্য প্রচার চালাইতেছিল যে, গোটা ইউরোপই একটা 'ফ্যাসিস্ট দুর্গে' পরিণত হইয়াছে এবং অতলান্তিকের সমুদ্রতীর 'দুর্ভেদ্য প্রাচীর' হিসাবে শত্রুপক্ষের যে কোন আক্রমণ-চেষ্টা ধ্বংস করিয়া দিবে। এমন কি, স্বয়ং চার্চিল পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করিতেন এবং এজন্য পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার বিরোধী ছিলেন—১৯৪৪ সাল পর্যন্ত। যখন সুদীর্ঘ প্রস্তুতির পর উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের তীরে মিত্রপক্ষের অবতরণ ঘটিল, তখন চার্চিলই উহাকে "ইতিহাসের বৃহত্তম উভচর অভিযান" (…the greatest amphibious operation in history) বলিয়া বর্ণনা করিলেন।

এই আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য দক্ষিণ ইংলণ্ড এক বিরাট সামরিক তাঁবুতে পরিণত হইল এবং মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার লিখিলেন যে, ইংলণ্ডের বন্দরগুলিতে ইতিহাসের যে কোন সময়ের তুলনায় বৃহত্তম নৌবহরের সমাবেশ ঘটিল। 'অপারেশন ওভারলর্ড'-এর জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য আসিয়া হাজির হইল, ১৫ শত ট্যাঙ্ক,

১। দি এ্যান্টি হিটলার কোয়ালিশন, ভিক্টর ইস্রায়েলজান, পৃষ্ঠা, ২৯৪।

৫ হাজার ৩ শত জাহাজ ও নৌপোত এবং ১২ হাজার বিমানের সমাবেশ ঘটিল। ৩ ডিভিসন বিমানবাহিত সৈন্যের নরম্যাণ্ডিতে অবতরণের কথা ছিল।

সোভিয়েট ঐতিহাসিক ডেবোরিন লিখিয়াছেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ এই অভিযানের জন্য সুবিশাল আয়োজন করিয়াছিলেন। পরিকল্পনা ছিল অবতরণের প্রথম পর্যায়ে ৩৬ ডিভিসন সৈন্য নামানো হইবে এবং আরও ১০ ডিভিসন সৈন্য দক্ষিণ ফ্রান্সে অবতরণ করিবে। আর সমরসজ্জার মধ্যে থাকিবে ৫০৪৯ জঙ্গী বিমান, ১৪৬৭ ভারী বোমারু, ১৬৪৫ মাঝারি ও হাল্কা বোমারু, ২৩১৬ ট্রান্সপোর্ট প্লেন এবং ২৫১১টি গ্লাইডার। মোট যুদ্ধ জাহাজ ও পরিবহণযানের সংখ্যা ছিল ৬৪৮৩ (এগুলির মধ্যে ৬টি বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ ও ২৫টি ক্রুজার বা ছোট যুদ্ধ জাহাজ) আর মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীতে ছিল বৃটিশ, মার্কিন, কানাডীয়, ডাচ, পোল, নরওয়েজিয়ান, ফরাসী এবং গ্রীক।[১]

একথা সত্য যে, ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা খুব দুঃসাধ্য ছিল। কেননা, কখন এর চরম জোয়ারের তরঙ্গ এবং আবহাওয়া রুদ্র মূর্তি ধারণ করিবে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। তারপর তীরভূমির প্রতিরক্ষার প্রাচীরও কঠিন ব্যবস্থাগুলিকে চূর্ণ করিতে হইবে এবং প্রথম পর্যায়ে শেন (Caen) ও শেরবুর্গের মধ্যে ৬০।৭০ মাইল দীর্ঘ স্থানে ৫ ডিভিসন সৈন্য নামাইতে হইবে। প্রথম ৪৮ ঘণ্টাই সবচেয়ে মারাত্মক এবং এর মধ্যে ১ লক্ষ ৭ হাজার সৈন্য, ১৪ হাজার যানবাহন, ১৪ হাজার ৫ শত টন সরবরাহ তীরভূমিতে নামাইতে হইবে। যদি প্রথম পর্যায়ের এই অবতরণ অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয় তা'হলে শত্রুপক্ষ সহজে অভিযানকারীদের হটাইতে পারিবেন না।

এই প্রত্যক্ষ সমরায়োজন ছাড়া শত্রুপক্ষকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্যও ডোভারের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডে নকল সৈন্যবাহিনী সমাবেশের এক বিরাট আয়োজন হইল। এমন কি এরজন্য নকল রেডিওর পর্যন্ত ব্যবস্থা হইল। এই ধাপ্পার কৌশল জার্মান গোয়েন্দা বিভাগ ধরিতে পারিল না এবং এই ধাপ্পা এত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল যে, 'ডি-দিবসের' বা অবতরণ দিবসের পরেও ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত ১৯ ডিভিসন জার্মান সৈন্য আটকা রহিল। একথা বলাই বাহুল্য যে, এই অভিযানের প্রস্তুতি ও সমাবেশের জন্য কঠোরতম গোপনীয়তা অবলম্বিত হইল। কিছুকালের জন্য ইংলণ্ড থেকে বহির্গমনের পথ এবং আমেরিকা থেকে মার্কিন সৈন্যদের জন্য ডাকবিলি পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

এই অভিযানের সুপ্রীম কমাণ্ডার ছিলেন জেনারেল আইজেনহাওয়ার। একমাত্র তিনি এবং তাঁর স্টাফই জানিতেন এই অভিযানের সাঙ্কেতিক বার্তা কখন ফ্রান্সের অভ্যন্তরে আত্মগোপনকারী যোদ্ধাদের উদ্দেশ্য পাঠানো হইবে। "The arrow pierces steel"—(তীর ইস্পাত বিদ্ধ করছে)—এই ছিল সাঙ্কেতিক বার্তার বয়ান এবং ফরাসী আত্মগোপনকারী যোদ্ধারা মিত্রপক্ষের অবতরণের জন্য এই সাঙ্কেতিক বার্তার অপেক্ষায় ছিলেন।

অবশ্য জার্মানরাও মিত্রপক্ষকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্য নকল সৈন্যবাহিনী নকল সমরসজ্জা এবং নকল রেডিও বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ এই সমস্ত গুপ্তখবর সংগ্রহ করিয়া যথাসময়ে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিতেন। সুতরাং মিত্রপক্ষকে ধাপ্পা দেওয়া যায় নাই।

১। জি. ডেবোরিন, পৃষ্ঠা ৩৬২।

শেন (Caen) থেকে শেরবুর্গ পর্যন্ত ৭০ মাইল দীর্ঘ এলাকা জুড়িয়া মিত্রবাহিনীর অবতরণের কথা। শেরবুর্গ ছিল নরম্যাণ্ড প্রদেশের বিখ্যাত বৃহৎ বন্দর এবং মিত্রবাহিনীর অভিযানের পক্ষে অন্ততঃ একটি বৃহৎ বন্দরের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং স্থির হইল শেন থেকে শেরবুর্গের মধ্যে যে অবতরণ ঘটিবে, উহার পূর্বাংশে বৃটিশ-বাহিনী এবং পশ্চিমাংশে মার্কিন বাহিনী অবস্থান করিবে। এখানে সৈকতভূমি খুব চওড়া ছিল। সুতরাং সৈন্যদের নামিবার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল।

পশ্চিম ইউরোপ অর্থাৎ ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হল্যান্ড রক্ষার জন্য জার্মানীর মোট ৬০ ডিভিসন সৈন্য ছিল এবং এর মধ্যে তীরভূমি রক্ষার জন্য ছিল ৮ ডিভিসন সৈন্য। কিন্তু মার্শাল ফন রুণ্ডস্টেড ছিলেন সমগ্র ফরাসী রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক। কিন্তু শত্রুর আক্রমণ ও অবতরণ প্রতিরোধ করার জন্য হিটলার আহবান জানাইলেন তাঁর অন্যতম সেরা সেনাপতি সুবিখ্যাত ফিল্ড মার্শাল রোমেলকে। ১৯৪৪ সালের বসন্তকালে রোমেল রণক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া 'অতলান্তিক প্রাচীর'কে যথাসম্ভব দুর্ভেদ্য করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তখন জার্মানীতে অনেক বস্তুর টানাটানি ছিল, বিশেষতঃ উপযুক্ত পরিমাণ ইস্পাত ও কংক্রীটের অভাব ছিল। অপর পক্ষে রুণ্ডস্টেড ও রোমেলের মধ্যে রণনীতি ও রণকৌশল নিয়াও দারুন মতভেদ দেখা দিল। আফ্রিকা যুদ্ধের প্রভুত অভিজ্ঞতার পর রোমেলের ধারণা হইল যে, অবতরণকারী শত্রুকে সমুদ্র সৈকতে বাধা দিয়া চুর্ণ করিতে না-পারিলে অভীষ্ট সিদ্ধ করা যাইবে না। অর্থাৎ প্রথম ২৪ ঘণ্টাই চূড়ান্ত এবং দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশের আগেই শত্রুকে সংহার করিতে হইবে। কিন্তু রুণ্ডস্টেডের ধারণা ছিল উলটা। শত্রুকে সমুদ্রতীরে অবতরণ ও দেশের অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হইতে দেওয়া হোক। তারপর প্রচণ্ড পালটা আক্রমণের দ্বারা তাকে নিশ্চিহ্ন করা হইবে। কিন্তু হিটলার রোমেলের মতামতই সমর্থন করিলেন। অর্থাৎ শত্রুকে অবতরণের মুখেই ধ্বংস করিতে হইবে। হল্যাণ্ড, ইংলিশ চ্যানেলের তীর, নরম্যাণ্ড ও ব্রিতানি—এই দীর্ঘ ৮০০ মাইল সমুদ্রতীরে ৫ লক্ষ জার্মান সৈন্য ছড়ানো ছিল এবং রোমেলের উপর ভার ছিল আর্মিগ্রুপ 'বি' পরিচালনার জন্য। আর গতিশীল রিজার্ভ সৈন্যবাহিনী সহ রুণ্ডস্টেডের উপর ভার ছিল ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডের পিছনের দিকটা রক্ষা করার জন্য। কিন্তু জার্মান বাহিনী আর আগের মত দুর্ধর্ষ ছিল না। ডিভিসনগুলির পুরাশক্তি ছিল না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৈন্যসংখ্যা ২৫।৩০ শতাংশ কম ছিল। অধিকন্তু অর্ধেক সৈন্য ছিল অধিক বয়স্ক কিংবা নাবালক। আর বিমান ও যুদ্ধজাহাজের অবস্থাও খারাপ ছিল।

অপর পক্ষে মিত্রশক্তির বিমান ও নৌবহরের শক্তির সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপে জার্মান শক্তির কোন তুলনাই দেওয়া চলে না। কারণ, মিত্রপক্ষের যখন ১১ হাজার সামরিক বিমান ছিল তখন পশ্চিম ইউরোপে জার্মানীর তৃতীয় বিমানবহরের রণক্রিয়ার উপযোগী বোমারুর সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০ এবং জঙ্গী বিমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭০টি—যদিও মোট আকাশযানের সংখ্যা ছিল ৫০০। আর মিত্রশক্তির সমস্ত রকম অর্ণবযানের মোট সংখ্যা ছিল ৬ হাজার। আর ৩৭ ডিভিসন সৈন্যের মধ্যে ১০টি ছিল ট্যাংক ডিভিসন।[১]

এই বিশাল মিত্রবাহিনীর অভিযান আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল গোড়ার দিকে ১লা মে। কিন্তু উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে সেই তারিখ পিছাইয়া গেল ৫ই জুন পর্যন্ত।

১। Secrets of the Second World War—G. Deborin, P. 163.

কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলের আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ থাকায় সেই ঐতিহাসিক অভিযান শুরু করিতে হইল ৬ই জুন শেষ রাত্রে। কিন্তু অবতরণের আগে রাত্রিবেলা মিত্রপক্ষের এক হাজার বোমারু জার্মান প্রতিরক্ষার ঘাঁটিগুলিতে, রেলওয়ে কেন্দ্র ও সড়কগুলিতে হাজার হাজার টন বোমা নিক্ষেপ করিল এবং পরদিন সকাল বেলা পুনরায় হাজার বোমারু ব্যাপক ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালাইল। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জার্মান বাহিনীগুলিকে রেল ও সড়ক এবং সেতুর যোগাযোগ ও চলাচল থেকে বঞ্চিত করা এবং মূল রণক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া। জার্মানীর তুলনায় মিত্রপক্ষের বিমানশক্তি যখন ৫০ গুণ বেশী ছিল, তখন বোমবর্ষণের শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইল মিত্রপক্ষীয় বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ থেকে কামানের গোলাবর্ষণ। ফলে, নরম্যাণ্ডি থেকে প্যারিস পর্যন্ত জার্মানদের দিনের বেলা চলাফেরা বন্ধ হইল গেল।

পশ্চিমে মণ্ডবুর্গ থেকে পূর্বদিকে শেন পর্যন্ত কঁতঁতিন (Cotentin) উপদ্বীপের ৬০ মাইল পর্যন্ত পাঁচটি সৈকতে মিত্রসৈন্যেরা অবতরণ করিল। মেসিনগান থেকে খাদ্য পর্যন্ত সব-কিছু তীর ভূমিতে নামানো হইল। শত্রুপক্ষ বাধা দিয়া রাখিতে পারিল না। কিন্তু মিত্রপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইল। অনেকে জলে ডুবিয়া গেল—মোট হতাহতের সংখ্যা ১০,২৭৪ জন।

নরম্যাণ্ডিতে প্রথম মার্কিন ছত্রীসৈন্যেরা অবতরণ করিল। কিন্তু এদের মধ্যে হাওয়ার বেগে কেউ কেউ ৩৫ মাইল দূরে ছিটকাইয়া পড়িল, কেউ বা গাছের ডালে আটকা পড়িল কেউ বা জলাভূমিতে। চার ঘণ্টায় ১৩ হাজার বিমান সৈন্য অবতরণ করিল এবং শেনের কাছে ভিতরের দিকে নামিয়া পড়িল ৫ হাজার ৩ শত বিমান-সৈন্য। আর ডুবুরি ও স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে উপকূলভাগের জলের তলা থেকে (রোমেলের পরামর্শক্রমে তৈয়ারী) ইস্পাতের কঠিন প্রতিবন্ধকগুলি অপসারণ করা হইল।

মিত্রবাহিনীর অবতরণ ও জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নির্দেশনামা সকাল বেলা রেডিওযোগে ঘোষিত হইল। আর সকাল ১০ টায় ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস থেকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে রুজভেল্টের প্রার্থনা বাণী প্রচারিত হইল।…

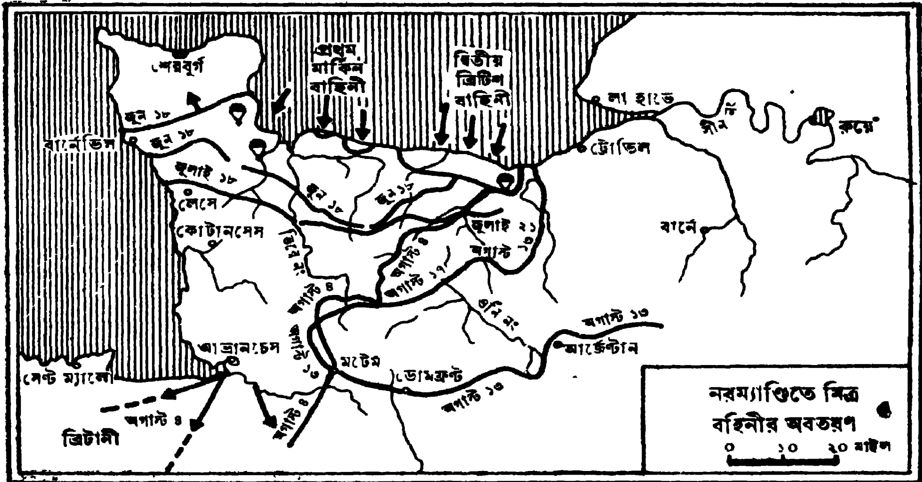
স্থানে স্থানে ঘোরতর সংঘর্ষের পর মিত্রবাহিনীর নরম্যাণ্ডির উপকূলে অবতরণ সাফল্যমণ্ডিত হইল। কিন্তু এই ত্রিধারার সংগ্রামে অর্থাৎ জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর পরিপূর্ণ সহযোগিতায় ও দক্ষতায় পশ্চিম ইউরোপীয় সমুদ্রতীরে মহাযুদ্ধের একটি নূতন চূড়ান্ত অধ্যায়ের সূচনা হইল। জার্মানী পূর্বে ও পশ্চিমে দুই রণাঙ্গনের বিপদে পড়িল—যে বিপদের বিরুদ্ধে জার্মান ইতিহাসের সমরনায়কেরা বার বার সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

কিন্তু জার্মানীর কপাল বোধহয় সত্য সত্যই খারাপ ছিল। কারণ, যদিও হিটলার মিত্রপক্ষের অবতরণের স্থান সম্পর্কে সঠিক অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন, তবু তাঁর ক্যালে বন্দরে অবস্থিত গোয়েন্দাদের প্রেরিত বার্তা নিয়া উচ্চতম সেনানীমহলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইল। ১লা জুন মিত্রপক্ষের তরফ থেকে যে সাংকেতিক রেডিও-বার্তা পশ্চিম ইউরোপীয় আত্মগোপনকারী যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ব্রডকাস্ট করা হইল, জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের কাছে তা ধরা পড়িল। কিন্তু ফিল্ড মার্শাল রোমেল, ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেড এবং বার্সেটগার্ডেনে অবস্থিত হিটলারের সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল জড্ল—এই প্রত্যেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি মনে করিলেন রোমেল,

রুণ্ডস্টেড ও জড্‌ল তাঁদের স্ব স্ব সৈন্যবাহিনীকে এই সাংকেতিক বার্তা দ্বারা সতর্ক করিয়া দিতেছেন। জে. এফ. সি. ফুলারের মতে সাধারণভাবে জার্মান সামরিক মহলের ধারণা ছিল যে, মিত্রবাহিনী পা দ্য ক্যালের দিকে অবতরণ করিবে।

যুদ্ধের পর জার্মান সেনাপতি জেনারেল ব্লুমেনট্রিট্ স্বীকার করিয়াছে যে, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ফরাসী সমুদ্রতীরের ঠিক কোন্ স্থানে অবতরণ করিতেছে কিংবা করিবে, সেই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সংবাদ দিতে জার্মান গোয়েন্দারা ব্যর্থ হইয়াছিলেন।[১]

ঠিক এই সময় ফিল্ড মার্শাল রোমেল তার জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করিলেন। যেহেতু গত কয়েকদিন ইংলিশ চ্যানেল অঞ্চলের আবহাওয়া খুব খারাপ ছিল এবং খারাপ আবহাওয়াতে যখন শত্রুপক্ষের নৌ-অভিযান প্রত্যাশিত নয়, তখন তিনি ৪ঠা জুন তারিখ জার্মানীতে ফিরিয়া গিয়া তাঁর স্ত্রীর জন্মদিবস উদ্‌যাপনের



এবং হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের (আরও সৈন্যবল বৃদ্ধির জন্য) জন্য সংকল্প করিলেন। কিন্তু জার্মানীতে ফিরিয়া গিয়া যখন তিনি নরম্যাণ্ডিতে ইঙ্গ-মার্কিন অবতরণের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি তাড়াহুড়া করিয়া ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিলেন বটে, কিন্তু তখন ২৪ ঘণ্টা পার হইয়া গিয়াছিল এবং প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করার পক্ষে অতিরিক্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।

রোমেল ছাড়া আরও অর্ধডজন সেনাপতি, যাঁরা তীর রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁরাও তাঁদের ঘাঁটিতে অনুপস্থিত ছিলেন। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, ওই অনুপস্থিত সেনাপতিরা মিত্রপক্ষের সম্ভাব্য অবতরণ-সংক্রান্ত সামরিক মহড়ার ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিলেন এবং লিডেল হার্ট লিখিয়াছেন যে, একজন সেনাপতি আবার এক যুবতীকে নিয়া রাত কাটাইতে ছিলেন।

অপর পক্ষে প্যারিসের উত্তর-পূর্বে যে দুইটি যান্ত্রিক ডিভিসন মজুত ছিল,

১। লীডেল হার্ট—পৃষ্ঠা ৫৪৮।

তাদের উপর রুণ্ডস্টেড বা রোমেলের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তারা খোদ সদর দপ্তরের হিটলারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অথচ রণক্ষেত্রের জরুরী প্রয়োজনে তাদেরকে নিয়োগ করা একান্ত দরকার ছিল। কিন্তু হিটলারের ব্যক্তিগত অনুমতি ছাড়া এই যান্ত্রিক ডিভিসন দুইটিকে আনা সম্ভব ছিল না। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, মিত্রপক্ষের আক্রমণ যখন শুরু হইল, হিটলার তখন ঘুমে। চার্চিলের মত হিটলারেরও অধিক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকার অভ্যাস ছিল এবং ঘুমের ঔষধ খাইয়া হিটলার রাত্রি শেষের দিকে নিদ্রা যাইতেন। এদিকে ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেডের পক্ষ থেকে ভোর রাত্রি ৪টার সময় হিটলারকে তাঁর সদর দপ্তরে টেলিফোন করা হইল। কিন্তু জেনারেল জড্‌ল তাঁর ঘুম ভাঙ্গাইতে সাহস পাইলেন না এবং হিটলারের পক্ষ থেকে তিনি নিজেই রুণ্ডস্টেডের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

বেলা দুইটার সময় হিটলার যথারীতি তাঁর সামরিক বৈঠকের অনুষ্ঠান করিলেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল যে, মিত্রপক্ষের এই আক্রমণ ও ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের দিয়েপ (ফরাসী উপকূলস্থিত) হানাদারির মত একটা বাজে আক্রমণ মাত্র।...

পাঁচদিন ধরিয়া নরম্যাণ্ডি উপকূলের অবতরণ স্থানগুলিতে রোমেলের সৈন্যদের সঙ্গে বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। ক্রমে জার্মান প্রতিরক্ষার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, মিত্রবাহিনী নরম্যাণ্ডি উপকূলের ৮০ মাইল দখল করিয়া নিল এবং ২০ মাইল ভিতরে প্রবেশ করিল। এই সময় ১৬ ডিভিসন মিত্র সৈন্য ফরাসী উপকূলে সাফল্যের সঙ্গে অবতরণ করিল, জার্মানদের পক্ষে এই অবতরণ ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব ছিল না। কারণ, মিত্রপক্ষ বিমানশক্তিতে ও নৌবহরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ফলে ৯ই জুন থেকে আক্রমণের উদ্যোগ মিত্রপক্ষের হাতে চলিয়া গেল।

১৭ই জুনের মধ্যে মিত্রপক্ষ ৫,৮৭৬৫৩ জন সৈন্য এবং ৮৯, ৭২৮টি যানবাহন সমুদ্রতীরে নামাইল। ঐ দিনই হিটলার তাঁর সেনাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করিলেন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এবং রুণ্ডস্টেড ও রোমেলের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন আক্রমণ প্রতিরোধে তাঁদের ব্যর্থতার জন্য। কিন্তু তাঁরা মিত্রশক্তির অস্ত্রের শ্রেষ্ঠতার উপর জোর দিলেন এবং অকপটে বলিলেন যে, জার্মান বাহিনীর অবস্থা সংকটজনক। বলাবাহুল্য যে, হিটলার চটিয়া গেলেন এবং রোমেলকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে হইবে না, তুমি তোমার নিজের রণাঙ্গন সামলাও।' হিটলার রোমেলকে রাজনৈতিক ব্যাপারেও মাথা ঘামাইতে নিষেধ করিলেন। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, রোমেল ইতিমধ্যে হিটলালেরর প্রতি খুব বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং দুইজনের মধ্যে ক্রমেই দূরত্বের ব্যবধান রচিত হইতেছিল।

মিত্রপক্ষ ক্রমেই শক্তি অর্জন করিতেছিল। '২৬শে জুনের মধ্যে তাদের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াইল ১০ লক্ষ, আর জার্মানীর মাত্র ১৪ ডিভিসন।'

সমুদ্র পারবর্তী অভিযানে এত সৈন্য ও সমরসম্ভার এবং অজস্র সরবরাহ যোগান দিতে গিয়া মিত্রপক্ষ অভুতপূর্ব সংগঠনশক্তি ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯ হাজার বৃটিশ শ্রমিকের সহায়তায় মিত্রপক্ষের ইঞ্জিনীয়ারগণ "গুজবেরি" ও "মালবেরি" নামে সম্পূর্ণ কৃত্রিমবন্দর ও পোতাশ্রয় তৈয়ার করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ইতিহাসে এটা ছিল একেবারেই নতুন। দীর্ঘ ফরাসী সমুদ্রতীরে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের অভাব পূরণের জন্য কংক্রীটের তৈয়ারী এই কৃত্রিম আশ্রয়গুলিকে ইংলিশ চ্যানেল পার করিয়া

লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তবে, প্রচণ্ড ঝড়ে একটি পোতাশ্রয় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষের উদ্যোগ, উদ্ভাবনী শক্তি ও কারিগরি বিদ্যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল সন্দেহ নাই।

হাজার বোমারু ও নৌকামানের গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়া শেরবুর্গের বিরুদ্ধে আক্রমণের উদ্বোধন হইল এবং ২৬শে জুন শেরবুর্গ আত্মসমর্পণ করিল।

ইংলিশ চ্যানেল সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম এবং পশ্চিম ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের এই জয়লাভকে সোভিয়েট রাশিয়া অভিনন্দন জানাইল।

জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন ঃ

'A week after D-day Stalin paid a glowing tribute to the Allies for their forcing of the Channel, a feat which he described as without precedent in military history and contrasted with the contemptible efforts of "invincible Napoleon" and "Hitlar the hysteric".'[১]

অর্থাৎ অবতরণের এক সপ্তাহ পরে স্ট্যালিন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমণের জন্য মিত্রবাহিনীর উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানাইলেন এবং মন্তব্য করিলেন যে, সামরিক ইতিহাসে এর কোন নজীর নাই। 'অপরাজেয় নেপোলিয়ন' এবং 'হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হিটলার' যা পারেন নাই মিত্রপক্ষ তাই সম্পন্ন করিয়াছেন।...

কিন্তু জার্মানী ক্রমশঃ বিপর্যয়ের-পর-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতেছে দেখিয়া ডঃ গোয়েবলসের প্রচার দপ্তর নিঃশব্দ ছিল না। জার্মান জাতিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য গোয়েবলস ভরসা দিলেন যে, ফুরারের উপর বিশ্বাস রাখুন, তিনি এমন-এক গোপন অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যে, সেই অস্ত্র প্রয়োগের ফলে "রুজভেল্ট ও চার্চিল নতজানু" হইয়া শান্তি ভিক্ষা করিবে।

এই "চরম অস্ত্র" বা পারমাণবিক অস্ত্র নিয়া জার্মান বিজ্ঞানীরা কিছুকাল যাবৎ গবেষণা ও অনুসন্ধান চালাইতেছিলেন, একথা সত্য। মিত্রপক্ষীয় গোয়েন্দারা এই সমস্ত গবেষণার ঘাঁটিগুলির সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগেই মিত্রপক্ষ নরওয়ের গোপন গবেষণা কেন্দ্রের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া উহা ঘায়েল করিয়া দিল। ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে বৃটিশ বিমানবহর বাল্টিক সমুদ্রের জঙ্গলাবৃত দ্বীপে এবং ফ্রান্সের উপকূলভাগের সমস্ত 'গোপন' ঘাঁটিতে প্রচণ্ড বোমারু আক্রমণ চালাইয়া ঐগুলি ধ্বংস করিয়া দিল। এভাবে জার্মানীর পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রগুলি নষ্ট হইয়া গেল। অবশ্য জার্মানীর মালমসলারও অভাব ছিল এবং গবেষণা চালাবার জন্য লোকবলও তেমন ছিল না।

তথাপি গোয়েবলসের বর্ণিত সেই "গোপন অস্ত্র" একদিন লণ্ডনের আকাশে আত্মপ্রকাশ করিল। ১৯৪৪ সালের ১৩ই জুন জার্মানীর নব আবিষ্কৃত উড়ন্ত বোমা "ভি-১" (V-1) লণ্ডনের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। পাইলট শূন্য জেটবাহিত ছোট্ট প্লেন এক টন বিস্ফোরক সহ লণ্ডনে বিস্ফোরিত হইল এবং বলাই বাহুল্য চারিদিকে বিস্ময় ও চমকের সৃষ্টি হইল। কিন্তু অবিলম্বেই এর প্রতিরোধ ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইল। প্রচুর বেলুন সৃষ্টি করিয়া উড়ন্ত বোমাকে ব্যাহত করা হইল এবং আর. এ. এফ. (রাজকীয় বিমানবহর) অনেক উড়ন্ত বোমা শূন্য পথেই ধ্বংস করিয়া দিল। কিন্তু

১। The Second World War—Basil Collier. P. 420.

এই সমস্ত সত্ত্বেও লণ্ডনের প্রচুর সম্পত্তি ধ্বংস এবং লোকজন হতাহত হইল। ১২ থেকে ২০শে জুন (১৯৪৪) মধ্যে ৮ হাজার উড়ন্ত বোমা লণ্ডনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এর মধ্যে প্রায় ২৩০০ বোমা লক্ষ্যস্থলে পেঁছিয়াছিল। লণ্ডনের ৫,৪৭৯ জন নিহত এবং ১৫,৯৩৪ জন আহত হইল, ২৫ হাজার ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ধ্বংস হইল এবং আরও অনেক গৃহ জখম হইল।

এরপর আগস্ট মাসে (১৯৪৪) ফুরার আর-একটি গোপন অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন—রকেট বোমা ভি-২। এই রকেট বোমা শব্দের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়া এবং এক টন বিস্ফোরক বহন করিয়া ঘণ্টায় ৩ হাজার মাইল বেগে এবং আকাশের ৬০।৭০ মাইল উঁচু দিয়া ছুটিয়া যাইত। এই রকেট বোমা চোখে দেখা যাইত না, কোন শব্দ শুনা যাইত না—একমাত্র বিস্ফোরণের শব্দ। এছাড়া নিঃসন্দেহে এই অস্ত্রগুলি ভয়ংকর ছিল এবং এগুলি যদি আরও অনেক আগে ব্যবহৃত হইত, তবে, মিত্রপক্ষের দারুণ বিপদ ঘটিত। এই বোমায় ৮ হাজার মানুষ নিহত হইল।[১]

১৯৪০ সালের 'লণ্ডনে ব্লিজ' বা বৃটেনের বিমান যুদ্ধের মতই এই উড়ন্ত বোমার আক্রমণও কম ভয়ানক ছিল না। সুতরাং গোয়েবলসের দপ্তর একেবারে মিথ্যা ডম্ফাই করে নাই।

লিডেল হার্ট লিখিয়াছেন যে, উড়ন্ত বোমার দ্বারা হিটলার মিত্রপক্ষের নরম্যাণ্ডি অভিযানের উপর কোন প্রতিক্রিয়া ঘটাইতে পারিলেন না। এই সময় হিটলারের সদর দপ্তর থেকে একদিন টেলিফোন যোগে ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেডকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল—'আমরা এখন কি করবো?' রুণ্ডস্টেড তুড়ুক জবাব দিলেন, 'যুদ্ধ খতম করুন। এছাড়া আর কি করা যেতে পারে?' ক্রুদ্ধ হিটলার তৎক্ষণাৎ রুণ্ডস্টেডকে পদচ্যুত করিলেন এবং তাঁর জায়গায় ফিল্ড মার্শাল ফন ক্লুজকে (তিনি তখন পূর্ব রণাঙ্গনে ছিলেন) প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করিলেন।

* * *

প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সে অবতরণের পর মিত্রবাহিনীর দুধর্ষ অভিযানের বিরুদ্ধে জার্মান সৈন্যরা তেমন কোন ভয়ংকর যুদ্ধ কিংবা ভয়াবহ কোন পালটা আক্রমণ করিতে পারে নাই। কারণ, মিত্রবাহিনীর বিমান ও যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদির শক্তি জার্মানীর তুলনায় অনেক বেশী ছিল। সুতরাং ১৬-২১ আগস্টের মধ্যে গোটা নরম্যাণ্ডি দখল হইয়া যাওয়ার পর সমগ্র ফ্রান্সে জার্মান সামরিক শক্তির পতন আসন্ন হইয়া উঠিল।

জুলাই মাসের মধ্য ভাগ থেকে জার্মান ব্যূহগুলি যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, মিত্রবাহিনী তেমনি প্যারিস অভিমুখে মুখ বাড়াইল। প্রতিদিন মিত্রপক্ষীয় সৈন্য ও ও সমরসম্ভার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এদিকে ফিল্ড মার্শাল রোমেল এক ভয়াবহ দুর্বিপ্যাকে পড়িলেন। ১৭ই জুলাই, ১৯৪৪, সকালবেলা তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী পরিদর্শনে এবং তাঁদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। সৈন্যবাহিনী ও অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলি পরিদর্শনের পর যখন তিনি প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁর গাড়ীতে চড়িলেন, তখন Livarot (লিভারোত) এবং Vimontiers (ভিমোতিয়ে) এই দুই শহরের মধ্যবর্তী সড়কে মিত্রবাহিনীর জঙ্গীবিমানের নজরে পড়িল গাড়ীটা। অবশ্য

১। এল. স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৪৬২।

এই নিঃসঙ্গ মোটরগাড়ীর আরোহী যে ছিলেন ভুবনবিখ্যাত রোমেল এ কথা বৈমানিকেরা জানিতেন না। কিন্তু জঙ্গী বিমানগুলির তিনটি অতি দ্রুত নীচে নামিয়া আসিল এবং ড্রাইভার তার গাড়ীসহ এক ঝাঁক পপলার গাছের নীচে আড়াল নেওয়ার আগেই জঙ্গী বিমানগুলি গুলি চালাইল। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে নিহত হইল। ফিল্ড মার্শাল রোমেল মারাত্মকভাবে আহত হইলেন, তাঁর মাথার খুলি, গলার হাড় এবং কপালের দুই পার্শ্ব ফাটিয়া গেল এবং বাঁ চোখ নিদারুণ জখম হইল। তাঁকে জীবন্মৃত অবস্থায় জার্মান বিমানবাহিনীর হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেখানে ২৪শে জুলাই-এর আগে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না। (রোমেল প্রসঙ্গ এবং ২০শে জুলাই হিটলারকে হত্যার ষড়যন্ত্র কাহিনী পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।...

তেহরানে তিন প্রধানের বৈঠকেই স্থির হইয়াছিল যে, 'অপারেশন ওভারলর্ড' বা নরম্যাণ্ডি অভিযানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ভূমধ্যসাগর থেকে দক্ষিণ ফ্রান্সেও মিত্রবাহিনী অবতরণ ও আক্রমণ চালাইবে। এই অভিযানের সাংকেতিক নাম রাখা হইয়াছিল 'অপারেশন এ্যানভিল', পরে এর নাম রাখা হইল 'অপারেশন ড্রাগন'। টুলঁ বন্দর থেকে নীস্ পর্যন্ত ১০০ মাইল ধরিয়া জার্মানীর ১৯তম আর্মি এখানে অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু এই বাহিনী তেমন শক্তিশালী ছিল না।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৪ মিত্রপক্ষের ১৫০০ জাহাজ, ৭টি বৃটিশ ও ২টি মার্কিন বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ, মার্কিন ৭ম আর্মি (অধিনায়ক লেঃ জেনারেল প্যাচ) এবং ফরাসী সেনাপতি জেনারেল Jean de Lattre de Tassigny'-এর নেতৃত্বে প্রথম ফরাসী আর্মির সৈন্যেরা দক্ষিণ ফ্রান্সের টুলঁ ও ক্যালের উপকূলে অবতরণ করিলেন। মিত্রপক্ষের পরিকল্পনা ছিল এই যে, দক্ষিণ ফ্রান্সে অবতরণকারী এই মিত্রবাহিনী জার্মান সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করিয়া ক্রমে উপরের দিকে (উত্তর অভিমুখে) অগ্রসর হইবে এবং নরম্যাণ্ডি বা উত্তর ফ্রান্স থেকে অভিযানকারী মিত্রবাহিনীর সহিত ফ্রান্সের অভ্যন্তরে পরস্পরের হাত মিলাইবে। সহজ কথায় সাঁড়াশীর দুই বাহু উত্তর ও দক্ষিণ থেকে একত্র হইয়া জার্মান বাহিনীগুলিকে পিষিয়া মারিবে। কার্যতঃ সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই জার্মান বাহিনীগুলি বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং মিত্রবাহিনী ফ্রান্সের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিল। অবশ্য ফ্রান্সের পার্টিজান যোদ্ধারা এই সমস্ত অভিযানে প্রচুর সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইতে আরও দীর্ঘ সময় লাগিত। প্যারিসের মুক্তি আসন্ন হইল।

সপ্তম পর্ব

চতুর্থ অধ্যায়

হিটলারকে হত্যার চরম চেষ্টা : ২০শে জুলাইয়ের চক্রান্ত কাহিনী

জার্মান রাষ্ট্রে হিটলারের সর্বাত্মক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন আদালত ও রাইখস্ট্যাগ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন পর্যন্ত সমস্ত-কিছু নাৎসীবাদে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও কিংবা নাৎসী-বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংস্থার উচ্ছেদ সত্ত্বেও ইংরাজ ঐতিহাসিক এ্যালান বুলকের মতে মাত্র দুইটি সংগঠন—চার্চ ও আর্মি সম্পূর্ণরূপে কিংবা পুরোপুরি নাৎসী গ্রাসে ছিল না। চার্চের কিছু কিছু যাজকদের মধ্যে এবং আর্মির কোন কোন অফিসারের মধ্যে কিংবা সিভিলিয়ান বা অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে হিটলারের প্রতি বিরোধিতা ছিল। কিন্তু এই সমস্ত বিরোধীরা বামপন্থী বা সাম্যবাদী ছিলেন না। তাঁরা সাধারণ গণতান্ত্রিক, কিংবা উদারনীতিক অথবা কেউ কেউ রাজতন্ত্রবাদী ছিলেন। হিটলারী রাজত্বের পাঁচ বা সাড়ে-পাঁচ বছর পর যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার সংকট (১৯৩৮) ঘনাইয়া আসিল এবং লণ্ডন, প্যারিস ও প্রাগে যুদ্ধের তীব্র উত্তেজনা দেখা দিল, অর্থাৎ ইউরোপ প্রায় যুদ্ধের মুখে আসিয়া পড়িল, তখন এই মুষ্টিমেয় বিরোধী মহলেও আতংক দেখা দিল। এই বিরোধী গ্রুপের মধ্যে সামরিক বিভাগের জেনারেল হ্যালডার ও জেনারেল ফন ভিৎসলবেন (Witzleben) ছিলেন, আর ছিলেন অর্থনীতির যাদুকররূপে পরিচিত ডঃ শাক্ট (Schact) এবং হ্যান্স গিসেভিয়াস (Hans Gisevius) ও এরিক কোরডট্ (Erich Kardat) নামে দুইজন বিশিষ্ট সরকারী অফিসার। কারণ, এঁরা মনে করিলেন হিটলারী বেপরোয়া নীতির ফলে বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে এবং জার্মানীর সামরিক শক্তি তখন এত দুর্বল যে, জার্মানী নির্ঘাৎ হারিয়া যাইবে। সুতরাং এরা হিটলারকে অপসারণ বা হনন করার সিদ্ধান্ত করিলেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখ তাঁরা হিটলারকে সাবাড় করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু সেদিনই তাঁরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া শুনিলেন যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মিঃ চেম্বারলেন মিউনিকে আসিতেছেন চেকোশ্লোভাকিয়া উপলক্ষে হিটলারের সঙ্গে আপোস মীমাংসার জন্য। নুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের সময় ডঃ শাক্ট এবং জেনারেল হ্যালডার উভয়েই এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) তারিখ হিটলারকে সাবাড় করার পরিকল্পনাটা মাটি হইয়া গেল চেম্বারলেনের জন্য। কারণ, তাঁদের কাছে হঠাৎ দালাদিয়েরের ও চেম্বারলেনের মিউনিকে আগমন অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছিল। ফলে হিটলার বিনা যুদ্ধেই জয়ী হইয়া গেলেন। সুতরাং ষড়যন্ত্রটা মাঠে মারা গেল।

কিন্তু ১৯৩৮ সালের এই ঘটনা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা ঠিক হইবে না যে, হিটলারের বিরোধীরা খুব শক্তিশালী ছিলেন, কিংবা দলে খুব ভারী ছিলেন। এই মুষ্টিমেয় জার্মানরা ছিলেন অসংলগ্ন একটি ছোট্ট দল, তাঁদের মধ্যে সংগঠন ও সংহতি

ছিল না এবং তাঁদের উদ্দেশ্যের মধ্যেও ঐক্য ছিল না। তবে, মোটামুটি নৈতিক ও অন্যান্য কারণে তাঁরা নাৎসী রাজত্বের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল যে, হিটলারের জন্য পরিণামে জার্মানী ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং তাঁর অপসারণ প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা এ কথাও উপলব্ধি করিলেন যে, হিটলারের সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের পক্ষে আঘাত করা সম্ভব নয় এবং এই আঘাত সফল হইতে পারে একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে।[১]

কিন্তু সশস্ত্রবাহিনীর পক্ষ থেকে হিটলারের বিরোধিতার কোন প্রশ্নই ছিল না। কেন না, প্রুশিয়ান আভিজাত্যে গর্বিত এই বাহিনী হিটলারের প্রতি বরং প্রসন্ন ছিল ভার্সাই সন্ধির অসম্মানজনক বন্ধন ছিন্ন করার জন্য এবং তার চেয়েও বড় কথা একে একে ইউরোপীয় রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে জয়াভিযানের জন্য। কিন্তু ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের পর যখন দুর্ধর্ষ জার্মান আক্রমণ প্রতিহত হইতে লাগিল এবং ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোর যুদ্ধে লালফৌজের পালটা আক্রমণে পরাজয় ঘটিল, তারপর থেকেই হিটলারের সঙ্গে তাঁর সেনাপতিমণ্ডলীর বিরোধ, মতান্তর ও বিক্ষোভ দেখা দিতে লাগিল এবং সেই বিক্ষোভ ক্রমে ঘনীভূত হইল সেনাপতিদের বিরুদ্ধে হিটলারের অত্যন্ত অসম্মানজনক আচরণের জন্য।

তথাপি ১৯৩৮ সালের সেই চেকোশ্লোভাকিয়া সংকটের কাল থেকে যাঁরা হিটলারের বিরোধিতা করিতেছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় সামান্য হলেও মোটামুটি তাঁদেরকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা যায়। এঁদের মধ্যে আবার কয়েকজন ছিলেন জার্মানীর অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশের সন্তান। যেমন—কাউণ্ট হেলমুথ, জেমস ফম মণ্টকে, যার পূর্বপুরুষ ফিল্ড মার্শাল মণ্টকে ১৮৭০ সালের ইতিহাস-বিখ্যাত ফ্রাংকো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অসামান্য কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ছিলেন কাউণ্ট পিটার ইয়র্ক ফন ভার্তেনবুর্গ (Wartenberg), যাঁর পূর্বপুরুষ জেনারেল ভার্তেনবুর্গ নেপোলিয়নের আমলে যুদ্ধে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং তৃতীয়ত ছিলেন কাউণ্ট ফন স্টাউফেনবুর্গ (Stauffenburg) দক্ষিণ জার্মানীর অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন জার্মান জেনারেল স্টাফের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তিনি সাহিত্যে, সঙ্গীতে, অশ্বচালনায়, যুদ্ধে এবং সাহসিকতায় একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। পোল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে এবং রাশিয়ায় তিনি একজন স্টাফ অফিসাররূপে রণবিদ্যায় প্রচুর কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং টিউনিসিয়ার (উত্তর আফ্রিকা) যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। এঁদের মধ্যে আবার ছিলেন লাইফজিগের প্রাক্তন মেয়র কার্ল গোয়েরডেলার (Karl Goerdeler) রাজতন্ত্রবাদী ও রক্ষণশীল।

দুইজন বয়স্ক ব্যক্তিকে হিটলার-বিরোধী ষড়যন্ত্রের নায়ক বলিয়া গণ্য করা হইত—একজন হইতেছেন—সেনানীমণ্ডলী প্রাক্তন অধিকর্তা জেনারেল লুডভিগ বেক্ (Ludwig Beck), অন্যজন হইতেছেন ডঃ কার্ল গোয়েরডেলার। আর-একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—রোমের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত উলরিচ ফন হেসেল (Ulrich von Hassel) এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন এবং ১৯৩৮ সাল থেকে কর্নেল (পরে জেনারেল) হ্যান্স ওস্টার (Hans

Oster) ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি ছিলেন হাইকম্যাণ্ডের পালটা-সামরিক গোয়েন্দা-বিভাগের (counter-intelligence) লোক এবং খোদ বড়কর্তা এ্যাডমিরাল ক্যানারিসের প্রধান সহকারী। সুতরাং ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ আড়াল করার পক্ষে এঁর সহযোগিতা অত্যন্ত মূল্যবান ছিল।

হিটলার-বিরোধী যে তিন-চারিটি গ্রুপের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ও পদস্থ ব্যক্তি থাকিলেও তাঁদের মধ্যে আদর্শ, নীতি ও মতামতের কোন ঐক্য ছিল না। যেমন, কাউণ্ট স্টাউফেনবুর্গ ছিলেন র‍্যাডিক্যালপন্থী এবং তিনি সোজাসুজি হিটলারকে হত্যা করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে অপারেশনের মূল দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেনারেল বেক-গোয়েরে ডেলার-হ্যাসেল এই গ্রুপটিও হিটলারকে অপসারণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু হিটলারের পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলপূর্বক কি ধরনের শাসন প্রবর্তিত হইবে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপই বা কি হইবে, তা নিয়া গোয়েরে ডেলারের সঙ্গে মতভেদ ছিল। কারণ, ইনি ছিলেন রক্ষণশীল। তাছাড়া এই গ্রুপের আর-একটা দুর্ভাবনা এই ছিল যে, হিটলারের অপসারণের পর যে নাৎসী-বিরোধী গবর্নমেণ্ট গঠিত হইবে, তাঁদের সঙ্গে মিত্রশক্তি কি ধরনের শান্তি-সন্ধিতে রাজী হইবেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটাও আগে থেকে জানা দরকার এবং এজন্য তাঁরা সুইজারল্যাণ্ড ও সুইডেনের রাজধানীতে মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। মিউনিক সংকটের সময় থেকেই একদল ষড়যন্ত্রকারীদের মাথায় এই চিন্তা ছিল।

কিন্তু অভিজাত বংশের তরুণ দীপ্তিমান মণ্টকে হিটলার-বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি হিটলারকে হত্যার বা জোরপূর্বক অপসারণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর আড্ডাখানার নাম ছিল 'ক্রাইসাউ সার্কেল' (Kreisau Circle)—সাইলেসিয়ার ক্রাইসাউতে মল্টকেদের যে বিরাট জমিদারী ছিল, সেই অনুসারেই বার্লিনের এই আড্ডার নাম ছিল ক্রাইসাউ সার্কেল।

কিন্তু এই আড্ডা কোন ষড়যন্ত্রকারীদের ঘাঁটি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল সেদিনের জার্মান বুদ্ধিজীবীদের একটা আড্ডা এবং এখানে হরেকরকমের লোকেরা যাতায়াত করিতেন—এঁদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, অধ্যাপক, কূটনীতিক, ধনী জমিদার বংশের ছেলে, এমন কি যাজক ও রক্ষণশীলেরাও আড্ডা দিতেন। এঁদের মধ্যে সাধারণতঃ আত্মিক, দার্শনিক, অর্থনীতিক, সামাজিক ইত্যাদি প্রশ্নই বেশী আলোচিত হইত এবং এঁদের বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধে হারিয়া গেলেই হিটলারি আপদ দূর হইয়া যাইবে। সুতরাং বলপ্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই।

কিন্তু তাঁরা নিজেরা ষড়যন্ত্রকারী না হইয়া থাকিলেও হিমলারের গোয়েন্দা বিভাগের দৃষ্টি এড়াইতে পারিলেন না। এবং এই আড্ডার প্রায় সকলকেই শেষ পর্যন্ত চরম মূল্য দিতে হইল। কিন্তু তরুণ মল্টকে বীরের মত মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন।[১]

১৯৪২ সালের মে মাসে ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি (Dietrich Bonhoffer) স্টকহোমে গিয়াছিলেন এবং বিশপ বেল-এর Bishop Bell of Chichester) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁর মাধ্যমে বৃটিশ সরকারকে হিটলার-বিরোধী

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক,—পৃষ্ঠা ৭৩৬।

চক্রান্ত ও সরকার পরিবর্তনের চেষ্টার কথা জানাইয়া দিলেন। অপর দিকে সুইজারল্যান্ডে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা এ্যালান ডালেস-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীরা যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। অর্থাৎ ষড়যন্ত্রকারীরা ইঙ্গ-মার্কিন মহল থেকে জানিতে চাহিলেন হিটলারের অপসারণের পর তাঁরা নূতন জার্মান গবর্নমেন্টের সঙ্গে কি ধরনের শান্তিচুক্তি করিতে ইচ্ছুক ? কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা ইঙ্গ-মার্কিন মহল থেকে কোন সাড়া পাইলেন না এবং তাঁরা হিটলারকে অপসারণপূর্বক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে পারিবেন, এমন বিশ্বাসও মিত্রমহলে ছিল না—বিশেষতঃ ১৯৪৩, জানুয়ারী মাসে ক্যাসাব্লাংকা সম্মেলন থেকে ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবীর পর।

কিন্তু স্টকহোমে ও সুইজারল্যান্ডে হিটলার-বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যকলাপ ও মনোভাব লক্ষ্য করিলে একটা কথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘটাইতে রাজী ছিলেন বটে, কিন্তু পূর্বদিকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেই কৃতসংকল্প ছিলেন। এমনকি, রাশিয়ার আগেই যাতে বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যেরা জার্মানী দখল করিয়া নিতে পারে তেমন সুযোগ সৃষ্টি করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা সোভিয়েট-বিরোধী ছিলেন এবং তাঁদের সংকল্প ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিতেই থাকিবে।[১]

এই সময় ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমহল, যাঁরা প্রায় সকলেই গোঁড়া নাৎসীভক্ত ছিল, স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধের পরাজয়ের পর তাঁদের একাংশেও মোহমুক্তি ঘটিতে লাগিল। সেই সময় মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় (যে মিউনিক শহর নাৎসীবাদের জন্ম দিয়াছিল)—বিদ্রোহী ছাত্রদের একটা ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছিল। হ্যান্স স্কোল (Hans Scholl) নামে একটি মেডিক্যাল ছাত্র এবং তাঁর ২১ বছরের বোন সোফি (Sophie) এই ছাত্র-বিদ্রোহের নায়কত্বে ছিলেন এবং বার্লিনের ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গেও তাঁদের যোগসূত্র ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের নজরও তাঁদের উপর পড়িয়াছিল। এই সময় একদিন ব্যাভেরিয়ার প্রশাসক পল গিজলার (Paul Giesler) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি সভা ডাকিলেন এবং সেই সভায় ঘোষণা করিলেন যে, সুস্থদেহী ও কর্মক্ষম পুরুষেরা প্রায় সকলেই আর্মিতে যোগ দিয়াছে, সুতরাং যে সমস্ত পুরুষ যুদ্ধে যোগ দিতে অসমর্থ তাদেরকেও যুদ্ধের কোন কোন প্রয়োজনীয় কাজে নিয়োগ করা হইবে। এই 'প্রয়োজনীয় কাজ' বলিতে তিনি 'কামদীপ্ত' কণ্ঠে প্রস্তাব করিলেন যে, জন্মভূমির কল্যাণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদেরকে প্রতি বছর একটি করিয়া সন্তান ধারণ করিতে হইবে ! তারপর তিনি আরও ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন ঃ

'If some of the girls', he added, lack sufficient charm to find a mate, I will assign each of them one of my adjutants···and I can promise her a thoroughly enjoyable experience.'[২]

অর্থাৎ তরুণীদের মধ্যে দেহসৌষ্ঠবের অভাবের জন্য যদি কেউ উপযুক্ত সঙ্গী না পায় তবে আমি আমার সহকারীদের মধ্য থেকে এমন এক-একজন পুরুষ দেব যে

১। The Second World War—G. Deborin, Moscow, P. 366-67.

২। The Rise and Fall of the Third Reich—W. L. Shirer. P. 1214.

তরুণীরা তাদের সঙ্গে দেহভোগের অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে—এই বিষয়ে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি!

ছাত্রেরা প্রশাসক মহাশয়ের এমন অশ্লীল ও কদর্য বক্তব্য শুনিয়া ক্ষেপিয়া গেল এবং তাঁকে তাঁর দেহরক্ষী এস. এস. ও গেস্টাপোদের সহ সভাকক্ষ থেকে তাড়াইয়া দিল। পরদিন মিউনিকের রাস্তায় নাৎসী-বিরোধী বিদ্রোহী ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল বাহির হইল। হিটলারের রাজত্বে এই প্রথম ছাত্রদের বিদ্রোহ ঘটিল। বলা বাহুল্য যে, এই 'অপরাধে' অনেক ছাত্র এবং একজন অধ্যাপককে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হইল। উপরে বর্ণিত ছাত্রনেতা ও তাঁর বোনকে প্রচণ্ডভাবে নির্যাতন করা হইল, কিন্তু তাঁরা স্থিরচিত্তে বীরের মত মৃত্যু বরণ করিলেন।

* * *

যদিও জার্মানী একটা পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল এবং হিমলারের গোয়েন্দা ও গেস্টাপোরা অবাধ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তথাপি হিটলারকে অপসারণের চক্রান্ত সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল না। বরং রণক্ষেত্রে পরাজয় ও ব্যর্থতা বৃদ্ধির সঙ্গে হিটলারকে হত্যার চেষ্টা বাড়িয়াই যাইতেছিল। একমাত্র ১৯৪৩ সালেই হিটলারকে হত্যার জন্য অন্ততঃ ৬ বারের বেশী চেষ্টা হইয়াছিল। ঐ বছর ১৩ই মার্চ তারিখ হিটলার তাঁর কপাল-গুণে বাঁচিয়া যান। হিটলার পূর্বদিকে মধ্য রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ফন ক্লুজের (Kluge) স্মলেনস্কস্থিত সদর কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্য থেকে জেনারেল ট্রেসকাউ (Tresckow) এবং তরুণ অফিসার শ্লাব্রেনডর্ফ (Schlabrendorff) হিটলারের প্লেনে একটা টাইম বোমা লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু হিটলারের এমনই জোর বরাত যে, সেই টাইম বোমাটা যথাসময়ে ফাটিল না। কোন বন্ধুর উদ্দেশ্যে পাঠানো দুই বোতল ব্রাণ্ডির প্যাকেটের সঙ্গে ওই বোমাটি লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বোমাটি যখন ফাটিল না, তখন ধরা পড়ার আগেই শ্লাব্রেনডর্ফ অত্যন্ত অদ্ভুত ধৈর্য ও শান্ত চিত্ততার সঙ্গে বোমাটি উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিয়াছিলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম নেতা ডঃ গোয়েরডেলার স্থির করিয়াছিলেন যে, মার্চ মাসে এক সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা হিটলারকে খতম করা হইবে এবং এই চক্রান্তের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'অপারেশন ফ্লাস'। আগের বছর (১৯৪২) নভেম্বর মাসে স্মলেনস্কের অরণ্যে ফিল্ড মার্শাল ক্লুজের সঙ্গে গোয়েরডেলারের এক গুপ্ত বৈঠকে এই চক্রান্তের পরিকল্পনা হইয়াছিল। স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে যখন জার্মান বাহিনীর গভীর বিপদ শুরু হইল, তখন জেনারেল পাউলাস এবং ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টাইন-এর নিকট আবেদন জানানো হইল বিপন্ন সেনাবাহিনীকে হিটলারের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু মৌখিক সহানুভূতি সত্ত্বেও ফিল্ড মার্শাল দুইজন এবং পাউলাস কাজের বেলা পিছ-পা হইলেন, অধিকন্তু গায়ে পড়িয়া হিটলারের প্রতি আনুগত্য দেখাইলেন। সুতরাং ষড়যন্ত্রকারীরা ফিল্ড মার্শালদের সম্পর্কে হতাশ হইলেন, কিন্তু তাঁরা হাল ছাড়িয়া দিলেন না। ২১ মার্চ ১৯৪৩ বার্লিনে বীরদের স্মৃতিসভার এক অনুষ্ঠানে হিটলার, গোয়েরিং, হিমলার ও কাইটেল প্রমুখ শীর্ষ নাৎসী নেতাদের উপস্থিত থাকিবার কথা। এই সুবর্ণ সুযোগ ষড়যন্ত্রকারীরা হারাইতে চাহিলেন না। ফিল্ড মার্শাল ক্লুজের প্রধান সামরিক গোয়েন্দা অফিসার কর্নেল জেরসডর্ফ

(Gersdorff) নিজের জীবন বিসর্জন দিয়া এই সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিলেন। অর্থাৎ স্থির হইল তিনি তাঁর ওভারকোটের লম্বা পকেটে দুইটি বোমা লুকাইয়া রাখিবেন এবং অনুষ্ঠানের সময় হিটলারের যত কাছে সম্ভব তিনি গিয়া দাঁড়াইবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে বোমা দুইটি বিদীর্ণ হইলে হিটলার তো মারা পড়িবেনই, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও নিহত হইবেন। কিন্তু এই বীরত্বপূর্ণ সুইসাইড মিশনও ব্যর্থ হইয়া গেল। কারণ, হিটলার আধ ঘণ্টার জায়গায় মাত্র ৮ মিনিট অপেক্ষা করিয়াই স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন।

হিটলার শেষের দিকে নিরাপত্তার খাতিরে নিজেই নাকি মাঝে মাঝে এই কৌশল খাটাইতেন। কেননা, তাঁর সন্দেহ এবং অবিশ্বাস বাড়িয়া গিয়াছিল। আরও তিনবার এই ধরনের 'ওভারকোট বোমার চক্রান্ত' হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বারেই সেই চক্রান্ত কোনও-না-কোন কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল। তারপর ১৯৪৪-এর কয়েক মাস পর্যন্ত হিটলারকে হত্যা করার আর চেষ্টা হয় নাই। কেননা, বিরোধীপক্ষের নেতাদের ব্যর্থতার জন্য অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক নেতা বা সদস্যরা হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এই ব্যর্থতার অনেক কারণ ছিল এবং সবচেয়ে বড় কারণ ফুরারকে হত্যাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত বিপুল ও কড়া সিকিউরিটির বা নিরাপত্তার ব্যবস্থা। পূর্ব প্রুশিয়ার হ্রদ ও অরণ্যের মধ্যে রাস্তেনবর্গের সদর দপ্তরে ২৪ ঘণ্টা সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত-অবস্থায় তিনি বাস করিতেন এবং কার্যতঃ এই সদর দপ্তরের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য ছিল। হিটলার তাঁর ভূগর্ভস্থিত 'শেলটার' বা আশ্রয়স্থল থেকে কদাচিৎ বাহির হইতেন—একমাত্র অরণ্যের পথ দিয়া ভ্রমণের সময় ছাড়া এবং তাঁর ভ্রমণের বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিল তাঁর আলশেশিয়ান কুকুর ব্লন্ডি (Blondi)। যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাইতেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত। তিনি বার্লিনে যাতায়াত করিতেন না এবং রণক্ষেত্রও পরিদর্শন করিতে যাইতেন না। যদি কখনও নতুন কোন অস্ত্র বা রণসজ্জা তাঁর পরীক্ষা করিয়া দেখার প্রয়োজন হইত, তবে, তাঁর উপস্থিতির সময় ও স্থান তিনি শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করিয়া দিতেন—যেন তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণের কোন পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ভেস্তে যাইতে পারে। এপ্রিল মাসের (১৯৪৪) গোড়ায় ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের আক্রমণ সম্ভাবনার মুখে তিনি রাস্তেনবুর্গ থেকে একবার বার্সেটস্-গ্যাডেনে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেখানেও সদর দপ্তরের মতই প্রচণ্ড সতর্কতা ও নিরাপত্তার কঠোর ব্যবস্থা ছিল।[১]

সুতরাং নিরাপত্তার এই দুর্ভেদ্য দুর্গ পার হইয়া হিটলারের নাগাল পাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু এই সমস্ত গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রকারীদের সবচেয়ে বড় উৎসাহী নায়ক কাউণ্ট স্টাউফেনবার্গ (যে গ্রুপের শীর্ষে ছিলেন জেনারেল বেক) চুপচাপ বসিয়া ছিলেন না। তিনি তাঁর পরিকল্পনা নিয়া আগাইয়া যাইতেছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইনি একজন বহুগুণান্বিত অসাধারণ পুরুষ ছিলেন এবং অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংস্কৃতিবান লোক ছিলেন। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে টিউনিশিয়ার রণক্ষেত্রে স্টাউফেনবার্গ যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ৭ই এপ্রিল তারিখে একটি মাইন বিস্ফোরণে তিনি গুরুতররূপে

আহত হইয়াছিলেন। তাঁর বাঁ চোখ নষ্ট হইয়া গেল, তার ডান হাত গেল এবং বাঁ হাতের দুইটি আঙুলও নষ্ট হইল, তাঁর বাঁ কানে এবং হাঁটুতেও গভীর আঘাত লাগিল। গোড়ার দিকে মনে হইয়াছিল তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যাইবেন। তবে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মিউনিক হাসপাতালে খুব নিপুণ চিকিৎসার গুণে তিনি বাঁচিয়া উঠিলেন এবং সেই অবস্থায় তিনি ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা বাম হাতের তিন আঙুলে কলম ধরিয়া জেনারেল ওলব্রিক্টকে (Olbricht) লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিন মাসের মধ্যেই তিনি পুনরায় কর্মজীবনে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। অথচ তাঁর শরীরের এই পঙ্গু অবস্থায় অন্য যে কোন অফিসার হইলে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করিতেন। কিন্তু স্টাউফেনবার্গ অন্য ধাঁচে গড়া ছিলেন। তাঁর সাহস ও দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। পূর্ব রণাঙ্গনে ইহুদী, রুশ ও যুদ্ধবন্দীদের উপর তিনি হিটলারী নৃশংসতার যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাতেই তাঁর দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, হিটলারের হাতে জার্মানীর সর্বনাশ হইবে। সুতরাং হিটলারকে অপসারণপূর্বক জার্মানীকে বাঁচাইতে হইবে—স্বদেশের প্রতি এই কর্তব্য বুদ্ধির দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। এজন্যই দৈহিক অক্ষমতা সত্ত্বেও মানসিক শক্তির জোরে তিনি কর্মক্ষেত্রে আগাইয়া চলিলেন এবং ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বরের শেষে তিনি বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আর্মির স্বরাষ্ট্রদপ্তরে জেনারেল ওলব্রিক্টের স্টাফের প্রধানরূপে লেঃ কর্নেল হিসাবে যোগদান করিলেন। ওলব্রিক্ট অনেকদিন ধরিয়াই হিটলার-বিরোধীদের অন্যতম নেতা ছিলেন। কিন্তু হিটলার-বিরোধীদের সন্দেহজনক কার্যকলাপের প্রতি হিমলারের গোয়েন্দা বিভাগ বা সিকিউরিটি সার্ভিসের যে নজর ছিল, তা আড়াল করিয়া রাখিত সশস্ত্র বাহিনীর নিজস্ব গোয়েন্দা-চক্র এবং তারা বিরুদ্ধবাদীদের জন্য একটা স্বতন্ত্র যোগাযোগ ব্যবস্থাও গড়িয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই বিভাগের কিছু কিছু লোক ধরা পড়ে এবং ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সন্দিগ্ধ হিটলার এই বিভাগটি তুলিয়া দেন এবং হিমলারের সিকিউরিটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন ১৯৪৪ সালের প্রথম ৬ মাসের মধ্যে স্টাউফেনবার্গ এবং ওলব্রিক্ট বহু পরিশ্রম করিয়া একটি আলাদা সংগঠন গড়িয়া তোলেন, যে সংগঠনের মারফৎ হিটলারের অপসারণের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ও পরিচালনা করা যাইতে পারে। বার্লিনের বেণ্ডলারস্ট্রাসিতে (Bendlerstrasse) হোমে আর্মি বা স্বরাষ্ট্র বাহিনীর সদর দপ্তরেই অবশ্য এই সংগঠন গড়িয়া তোলা হইল। সামরিক দিক থেকে এই অজুহাত দেখানো হইল যে, যদি কোন আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কিংবা হঠাৎ কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়, অথবা জার্মানীতে যে কয়েক লক্ষ বিদেশী শ্রমিক (অধিকৃত দেশগুলি থেকে সংগৃহীত) রহিয়াছে, যদি তারা কোন আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটায়, অথবা যদি শত্রুপক্ষীয় বিমানসৈন্য বার্লিনে অবতরণ করে, তবে, সেই বিপজ্জনক জরুরী অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ সামরিক ব্যবস্থা ও সংগঠনের প্রয়োজন। এই জরুরী অবস্থার সামরিক অপারেশনের সাঙ্কেতিক নাম হইল 'ভালকিরাই' (Walkyrie) এবং 'ভালকিরাই' অনুসারে আদেশ পাওয়া মাত্র বার্লিনে এবং অধিকৃত দেশগুলির রাজধানীতে সরকারী ক্ষমতার মূল কেন্দ্রগুলি এবং টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদি দখল করিয়া নিতে হইবে।*

* আলবার্ট স্পীয়ার তাঁর 'ইনসাইড দি থার্ড রাইখ' বইতে (পৃষ্ঠা ৫০১) উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ১৯৪২ সালের মে মাস থেকেই এই ধরনের একটা সরকারী পরিকল্পনা ছিল।

ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ছিল হিটলার নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ভালকিরাই' অনুসারে স্বদেশের ও বিদেশের কম্যাণ্ডারদের কাছে যে সাঙ্কেতিক নির্দেশ পাঠানো হইবে, তার দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইবে যে, ফুরার মারা গিয়াছেন এবং সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকে একটি নূতন গবর্নমেণ্ট গঠন করা হইয়াছে—জেনারেল বেক্ এই গবর্নমেণ্টের প্রধান, ফিল্ড মার্শাল ফন ভিৎসলবেন (Witzleben) সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং জেনারেল ওলব্রিক্ট চীফ অব দি স্টাফ নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং কমাণ্ডারগণ যেন গৃহযুদ্ধ এড়াইবার জন্য সমস্ত বড় বড় নাৎসী অফিসার, পুলিশ এবং এস. এস.-এর বড় বড় কর্তা ও প্রশাসকদেরকে গ্রেপ্তার করেন।

হিটলারের সদর দপ্তর থেকে পাছে এই সমস্ত আদেশকে নাকচ করিয়া দেওয়া হয় (অর্থাৎ হিটলারের মৃত্যুর পর অন্য কোন সামরিক অধিনায়ক) এজন্য ফুরারের ব্যক্তিগত স্টাফের প্রধান সিগন্যাল অফিসার জেনারেল এরিখ ফেলজিয়েবেলকে (Erich Fellgiebel) এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে গ্রহণ করা হইল। হিটলার নিহত হওয়ার পর তিনি রেস্তেনবুর্গের সদর দপ্তরের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দিতে রাজী হইলেন। আর রাজধানী বার্লিনে নাৎসীরা যাতে গোলমাল করিতে না পারে, তার জন্য পুলিশের বড়কর্তা ফন হেলডর্ফ (Helldorff) এবং বার্লিন দুর্গের বা গ্যারিসনের অধ্যক্ষ জেনারেল হেস (Hase) এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে সম্মত হইলেন। এঁদের উপর ভার দেওয়া হইল সরকারী ভবন ও দপ্তরগুলি ঘিরিয়া রাখার, গেস্টাপো ও এস.এস. বাহিনীর কার্যালয় এবং গোয়েবলসসহ তাঁর প্রোপাগাণ্ডা মিনিস্ট্রি দখল করিয়া নেওয়া এবং রেডিও যোগে সামরিক আইন ঘোষণা করা ইত্যাদি। আর গোয়েরডেলারকে চ্যান্সেলর বা প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিয়া তিন-চার দিন পর একটি অসামরিক গবর্নমেণ্ট গঠন করা হইবে এবং স্টকহোক ও মাদ্রিদের মারফৎ পশ্চিমী মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব যুদ্ধ বিরতি ঘটানো হইবে।[১]

অর্থাৎ হিটলারকে হত্যার পর একটি বিকল্প নাৎসী-বিরোধী সরকার গঠনের পরিকল্পনা তৈরী করা হইল এবং এই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য বার্লিনে, হিটলারের সদর দপ্তরে এবং পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গনের জার্মান বাহিনীতে যাঁদেরকে বিশ্বাস করা যায়, তাঁদের সহায়তা গ্রহণ করা হইল এবং স্টাউফেনবার্গ আশা করিলেন যে, আর্মি নেতাদের মধ্যে যাঁরা অনিচ্ছুক বা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তাঁরাও অবস্থার চাপে আগাইয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। যাতে এই পরিকল্পনা কোন দিক দিয়া শিথিল হইতে না পারে, সে জন্য খোদ হিটলারকে হত্যার দায়িত্ব তিনি নিজ হাতে নিলেন—যদিও দৈহিক জখমগুলির জন্য তিনি পঙ্গু ছিলেন, মাত্র বাঁ হাতের তিনটি আঙ্গুলের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই বিপজ্জনক কার্যোদ্ধারের সংকল্প করিলেন। তাঁর এই অদম্য উৎসাহ ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করিল, সন্দেহ নাই। তবে সেই সঙ্গে কিছুটা ঈর্ষারও উদ্রেক করিল এবং আগেই বলা হইয়াছে যে, তিনি মতবাদের দিক থেকে র‍্যাডিক্যাল ছিলেন। সুতরাং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে যাঁরা সোসিয়েলিস্ট ছিলেন, যেমন—জুলিয়াস লেবের (Julius Leber), এ্যাডলফ রাইখভিন (Adolf Reichwein) ও উইলহেলম লিউসনার (Wilhelm Leuschner) এবং

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৪২০-২১।

ভবিষ্যৎ গবর্নমেণ্টে যাঁদের যোগ দেওয়ার কথা ছিল, তাঁদের সঙ্গে বরং তিনি বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এদিকে স্বরাষ্ট্রদপ্তর ও গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা হিমলার সতর্ক হইলেন এবং সামরিক পালটা গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান এ্যাডমিরাল ক্যানারিসকে (যাঁকে আগেই পদ থেকে অপসারিত করা হইয়াছিল), একদিন তিনি বলিলেন যে, তিনি বেশ ভালোভাবেই জানেন যে, সৈন্যবাহিনীর অফিসারমহলে একটা বিদ্রোহের ঘোঁট পাকানো হইতেছে, কিন্তু তিনি উপযুক্ত সময়ে আঘাত হানিবেন ![1]

এই সময় ৬ই জুন নরম্যাণ্ডিতে মিত্রপক্ষের অবতরণ ও আক্রমণ ঘটিল। এই আকস্মিক অবতরণের ঘটনায় স্টাউফেনবার্গ, জেনারেল বেক এবং ডঃ গোয়েলডেলার কিছুটা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কেননা, পূর্বদিক থেকে লালফৌজের অগ্রগতি এবং পশ্চিমদিক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর আক্রমণ—জার্মানী দুই দিক থেকে দুই রণাঙ্গনের যে সাঁড়াশীর চাপে পড়িল, তাতে হিটলারকে হত্যা করিলেও মিত্রপক্ষ কি নূতন গবর্নমেণ্টের সঙ্গে কোন আপোসমূলক শান্তি-চুক্তি করিতে রাজী হইবেন? অথবা দেশবাসীর কাছে তাঁরা "জার্মানীর পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাতের" দুর্নাম অর্জন করিবেন? এই প্রকার দ্বিধায় ও সন্দেহে যখন তাঁরা আন্দোলিত ছিলেন, তখন পূর্ব রণাঙ্গন থেকে দ্বিতীয় আর্মির অধিকর্তা জেনারেল ট্রেসকাউ (Tresckow) স্টাউফেনবার্গের কাছে এই মর্মে এক বার্তা পাঠাইলেন যে, হিটলারকে হত্যার চেষ্টা করিতেই হইবে এবং যদি এই চেষ্টা ব্যর্থও হয়, তবু বার্লিনে ক্ষমতা দখলের অভিযান চালাইতে হইবে। কারণ, পৃথিবীর কাছে এবং আগামী দিনের বংশধরদের কাছে তাঁদের প্রমাণ দিতেই হইবে যে, হিটলারের বিরুদ্ধে "জার্মান প্রতিরোধের" নেতারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও একটা চূড়ান্ত পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই লক্ষ্য পূরণের কাছে অন্য কিছু বিবেচ্য নহে।[2]

ট্রেসকাউয়ের এই বার্তা স্টাউফেনবার্গকে পুনরায় তাঁর সংকল্পে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু মুশকিল এই যে, হিটলারকে আঘাত করার সুযোগ কোথায়? তাঁর সঙ্গে দেখা করাই যে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এই সময় হঠাৎ স্টাউফেনবার্গের বরাৎ খুলিয়া গেল। জুন মাসের গোড়াতেই তিনি কর্নেল পদে উন্নীত হইলেন এবং হোম আর্মির প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফ্রিৎস ফ্রোম (Fritz Fromm) তাঁকে তাঁর স্টাফের প্রধানের পদে নিয়োগ করিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য সরকারী কার্য উপলক্ষেই তাঁকে হিটলারের স্টাফ কনফারেন্সে (সেনাপতিদের সঙ্গে বৈঠকে) মাঝে মাঝে যোগ দিতে হইবে এবং স্বরাষ্ট্র বাহিনীর বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। সুতরাং হিটলারের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ তিনি পাইবেন।

এদিকে সময় দ্রুত ফুরাইয়া আসিতেছিল। কেন না, ৪ঠা জুলাই জুলিয়াস লেবের এবং এ্যাডলফ রাইখভেইন—সোসিয়েলিস্ট নেতাদ্বয় হিমলারের গোয়েন্দা চক্রের হাতে ধরা পড়িলেন এবং ১৭ই জুলাই গোয়েরডেলারকে গ্রেপ্তারের জন্যও পরোয়ানা জারি করা হইল। অর্থাৎ সমস্ত ষড়যন্ত্রটাই ভেস্তে যাওয়ার জো হইল। অতএব আর সময় নষ্ট করা চলে না।

স্টাউফেনবার্গ ইতিমধ্যে দুইবার চেষ্টা করিলেন হিটলারকে খতম করার জন্য।

---

১ এ্যালান বুলক—পৃষ্ঠা ৭০৯।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—ঐ পৃষ্ঠা।

১৯ই জুলাই বার্সেটসগ্যাডেনে হিটলারের সহিত সেনাপতিদের এক বৈঠকে তিনি যোগ দিলেন এবং তাঁর ব্রীফকেসে একটি টাইম বোমা লুকাইয়া নিয়া গেলেন। কিন্তু সেই বৈঠকে হিমলার ও গোয়েরিং ছিলেন না। অথচ স্টাউফেনবার্গ স্থির করিয়াছিলেন যে, এক আঘাতেই সব কয়টি শীর্ষ নাৎসী নেতাকে সাবাড় করিতে হইবে, যেন এরা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতা দখল করিতে না পারে। অতএব স্টাউফেনবার্গ অপেক্ষা করিলেন পরবর্তী সুযোগের জন্য। ১৫ই জুলাই সেই সুযোগ আবার আসিল, কিন্তু এবার পূর্ব প্রুশিয়ায় ফুয়ারের খাস সদর দপ্তরে। আর আগে বার্লিনে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিয়া রাখার জন্য তিনি ডেপুটি কমাণ্ডার জেনারেল ওলব্রিক্ট-এর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিলেন এবং স্থির করিলেন ফিরিয়া আসিয়াই হিটলারী বৈঠকে তিনি তাঁর 'কালান্তর' বোমা ফাটাইবেন। কিন্তু স্টাউফেনবার্গের দুর্ভাগ্য বার্লিনের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলার পর তিনি হিটলারের বাঙ্কারে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন বৈঠক প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে এবং হিটলার চলিয়া গিয়াছেন! সুতরাং ব্যর্থ মনোরথ স্টাউফেনবার্গ ব্রীফ কেসে লুকানো বোমা সহ পূর্ব প্রুশিয়া থেকে প্লেন যোগে বার্লিনে ফিরিয়া আসিলেন। যদি এই বোমা হিটলারের কংক্রিটের তৈয়ারী বাঙ্কারের অভ্যন্তরে বিস্ফোরিত হইত, তবে, সেদিন সকলেরই মৃত্যু অবধারিত ছিল। কিন্তু হিটলারের ভাগ্যক্রমে তা ঘটিল না।

বার বার তিনবার। ২০শে জুলাই আবার সেই সুযোগ আসিল। ঐ দিন হিটলারের সদর দপ্তরে মুসোলিনীর আসার কথা সাক্ষাতের জন্য। সুতরাং স্টাফ কনফারেন্সের সময় আগাইয়া দিয়া সাড়ে-বারোটা করা হইল। স্টাউফেনবার্গ প্রতিজ্ঞা করিলেন যাই ঘটুক না কেন আজ একটা হেস্তনেস্ত করা হইবে, কেন না আর সময় নাই। গোয়েরিং বা হিমলার সেদিনও ছিলেন না, কিন্তু আর অপেক্ষা করাও চলে না। কিন্তু বৈঠক হিটলারের বাঙ্কারে হইবে না। কেননা, আরও অতিরিক্ত কংক্রীট দিয়া বাঙ্কারটিকে তখন আরও শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য এবং মেরামত করা হইতেছিল। সুতরাং বৈঠক বসিবে পার্শ্বতী কাঠের তৈয়ারী একটি কুটীরে। বেলা প্রায় সাড়ে-১২টার সময় একদল বড় বড় অফিসার কুটীরের বাইরে হিটলারের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, যেমন—কাইটেল, জড্ল, ভার্লিমণ্ট (Warlimont), হিউসিঙ্গার (Heusinger—সৈন্যবাহিনীর অপারেশন স্টাফের প্রধান), ব্রাণ্ডট্ (Branbt—হিউসিঙ্গারের ডেপুটি), কোরটেন (Korten—বিমানবাহিনীর একজন প্রধান)—Bodenschatz (কোর্টেনের ডেপুটি) আসম্যান (Assmann—নৌবিভাগের অন্যতম প্রধান), পুটকেমার (Puttkamer—নৌবিভাগীয় অফিসার), Schmundt (হিটলারের এডজুটাণ্ট), বার্গার (Berger)—নামীয় একজন স্টেনোগ্রাফার এবং অন্যান্য আরও আধ ডজন লোক।

স্টাউফেনবার্গও বাইরে ভিতরের দিকের কম্পাউণ্ডে অপেক্ষা করিতেছিলেন বাঙ্কার থেকে হিটলারের আগমনের জন্য। অবশেষে হিটলার সেই কুটীরে প্রবেশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পদস্থ ও শীর্ষ অফিসারেরাও তাঁদের কাগজপত্র নিয়া হিটলারের পিছুপিছু সেই ঘরে ঢুকিলেন—ঘরটি সাদা-মাঠা গোছের। কিন্তু মার্কিন ঐতিহাসিক শাইরারের মতে কক্ষটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল—৩০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া ছিল

এবং এর ১০টি জানলা ছিল, দেওয়ালগুলি কংক্রীটের তৈরী ছিল, কিন্তু গরমের জন্য জানালাগুলি সবই খোলা ছিল। এই ঘরের মাঝখানে খুব ভারী ওক কাঠের তৈরী একটা প্রকাণ্ড টেবিল ছিল এবং টেবিলটার কোন পায়া ছিল না। কয়েক ইঞ্চি পুরু খুব শক্ত কাঠের ব্লকের উপর সেটা দণ্ডায়মান ছিল্ এবং কাঠের বর্গা দিয়া ঘরের কোণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই টেবিলের চারদিকে হিটলার তাঁর অফিসারদের সহিত দাঁড়ানো ছিলেন এবং সামরিক মানচিত্রগুলি সেই টেবিলের উপর পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মোট ২৪ জন লোক টেবিলের চারধারে ছিলেন। ফুরার টেবিলটির মাঝখানের ধারে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং বারে বারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মানচিত্র দেখিতেছিলেন। তাঁর বাম পার্শ্বে ছিলেন সর্বোচ্চ হাইকমাণ্ডের কাইটেল এবং জড্ল। স্টাউফেনবার্গ কর্নেল ব্রাণ্ডটের পর হিটলারের ডানপার্শ্বে একটা জায়গা করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু এই কক্ষে ঢুকিবার আগেই স্টাউফেনবার্গ তাঁর ব্রীফকেসে লুকানো টাইম বোমাটির ফিউজ বিস্ফোরণের উপযোগী করিরা ব্রীফ কেসটি টেবিলের তলায় রাখিয়া দিলেন এবং তারপর বার্লিনে একটি জরুরী টেলিফোন বার্তা আছে, এই অজুহাত দেখাইয়া সেই ঘর থেকে সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু যাওয়ার আগে তিনি পার্শ্ববর্তী ব্রাণ্ডটের কানে কানে ফিস ফিস করিয়া বলিলেন, "আমাকে এখন যেতে হবে টেলিফোন করার জন্য। আমার ব্রীফ কেসটির উপর নজর রাখবেন, ওটার মধ্যে গুপ্ত দলিলপত্র আছে।" কিন্তু হিটলারের কাছে রিপোর্ট দেওয়ার আগেই স্টাউফেনবার্গ কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ায় ফিল্ড মার্শাল কাইটেল 'এই তরুণ অফিসারের বিচিত্র আচরণে' বিরক্ত হইলেন কিন্তু কোন সন্দেহ করিলেন না।

টাইম বোমাটি ১০ মিনিটের মধ্যেই বিস্ফোরিত হওয়ার কথা। ওই সময় জেনারেল হিউসিঙ্গার (Heusinger) পূর্ব রণাঙ্গনের সংকটজনক অবস্থা সম্পর্কে হিটলারকে রিপোর্ট দিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন ঃ

'The Russian is driving with strong forces west of the Duna towards the north. His spearheads are already south-west of Dunaburg If our army group around Lake Peipus is not immediately withdrawn, a catastrophe…'

জার্মান সৈন্যদলের বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবাহী এই লাইনটি আর কখনও সম্পূর্ণ পড়া হইল না। ঠিক সেই সময় ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ১২টা ৪২ মিনিট—প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিদীর্ণ হইল!

ধোঁয়ায় ও ধুলায় ঘরটি আচ্ছন্ন হইল। আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠিল, ঘরদুয়ার ভাঙিয়া যেন শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং মনে হইল ঘরের ভিতর মানুষের দেহগুলি বিস্ফোরণের ঝাপ্টার বেগে খোলা জানালা দিয়া ছিটকাইয়া বাইরে নিক্ষিপ্ত হইল—গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত হওয়ার মত ঘরটি চুরমার হইল।[১]

স্টাউফেনবার্গ কাছ থেকেই এই সমস্ত স্বচক্ষে দেখিলেন, তখন ৮৮নং বাঙ্কারে ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার জেনারেল ফেলজিয়েবেলের সঙ্গে তিনি কথা বলিতেছিলেন। তার মনে হইল এই কালান্তক বোমার নিদারুণ বিস্ফোরণে হলের মধ্যে হিটলার সহ কেহই আর বাঁচিয়া নাই কিংবা বাঁচিয়া থাকিলেও অর্ধমৃত। সুতরাং তার

১। উইলিয়াম শাইরার —পৃষ্ঠা ১২৫১।

অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া তিনি সরকারী ক্ষমতা দখলের প্ল্যান কার্যকর করার জন্য অবিলম্বে বিমানযোগে বার্লিন যাত্রা করিলেন এবং পর পর যে তিনসারি সশস্ত্র প্রহরী হিটলারের আস্তানা পাহারা দিতেছিল, আকস্মিক বিস্ফোরণের হট্টগোলের সুযোগে তিনি অত্যন্ত কৌশলে তাঁদেরকে ধাপ্পা দিয়া নিষিদ্ধ এলাকা পার হইয়া বিমানঘাঁটিতে পেঁছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর প্লেনে চড়িয়া বিকেল ৩-৪৫ মিনিটে জার্মানীর র‍্যাংসডর্ফ বিমানঘাঁটিতে হৃষ্টচিত্তে অবতরণ করিলেন।...

এদিকে অভাবনীয় বোমা বিস্ফোরণের ফলে হিটলারী আস্তানায় যেন বিহ্বলতার সৃষ্টি হইল। ধূম্রজালে আচ্ছন্ন ও বিধ্বস্ত কক্ষের মধ্য থেকে আহতদের আর্তনাদ শুনা যাইতেছিল এবং হতবুদ্ধি প্রহরীরা ব্যস্ত-ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিল। স্বয়ং হিটলার টলিতে টলিতে ফিল্ড মার্শাল কাইটেলের বাহুর উপর ভর দিয়া কোন মতে দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁর এক পায়ের ট্রাউজার ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া কোথায় খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাঁর দেহ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল এবং নানাভাবে তাঁর শরীর জখম হইয়াছিল, তাঁর মাথার চুল ঈষৎ পুড়িয়া গিয়াছিল, তাঁর ডান হাত শক্ত হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল ও অকেজো হইয়া গিয়াছিল, উপর থেকে একটা বর্গা পড়িয়া তাঁর পিঠে আঘাত লাগিয়াছিল, তাঁর একখানা পা পুড়িয়া গিয়াছিল এবং তাঁর দুই কর্ণপটাহ বিস্ফোরণের জন্য জখম হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আহত হইলেও তিনি জীবিত ছিলেন। যাঁরা টেবিলের শেষ প্রান্তে ছিলেন স্টাউফেনবার্গের ব্রীফ কেসের বোমার আঘাতে তাঁদের মধ্যে অনেকেই হতাহত হইয়াছিলেন। কেননা, তাঁরা বোমার কাছেই ছিলেন। সরকারী স্টেনোগ্রাফার বার্গার (Berger) এবং কর্নেল ব্রান্ডট্, জেনারেল স্মান্ডট্ ও জেনারেল কোর্টেন মারা পড়িয়াছিলেন। আর কম বা বেশী আহত হইয়াছিলেন জেনারেল জডল্, জেনারেল হিউসিঙ্গার এবং গোয়েরিংয়ের বিমান বাহিনীর স্টাফের প্রধান বোডেনশাৎস (Bodenschatz) প্রভৃতি। কিন্তু হিটলার দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়া গেলেন, মোটা শক্ত ওক কাঠের টেবিলটার জন্য, যেটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তিনি ম্যাপ দেখিতেছিলেন। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, ফিল্ড মার্শাল কাইটেল সম্পূর্ণ অক্ষত ছিলেন। তবে তিনিও ধূম্রাচ্ছন্ন মুখে চীৎকার করিতে করিতে (Attentat ! Attentat !) বাহির হইয়া আসিলেন। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, বিস্ফোরিত কক্ষের দরজা জানালাগুলি সবই খোলা ছিল বলিয়া বিস্ফোরণের ঝাপটা অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছিল। বন্ধ এবং কংক্রীটের তৈরী বাঙ্কারের মধ্যে এই বিস্ফোরণ ঘটিলে কেউ রক্ষা পাইত না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, হিটলার এক চুলের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

তথাপি হিটলারের আচরণ খুব অদ্ভুত ছিল। কারণ, এত বড় কাণ্ডের পরেও (অবশ্য তখন পর্যন্ত টের পান নাই যে, তাঁকে হত্যা করার জন্যই জেনারেলদের ষড়যন্ত্রের ফলে বোমা বিস্ফোরিত হইয়াছিল, বরং তাঁর ধারণা ছিল যে, কোন শত্রু বিমানের আকস্মিক হানাদারির ফলেই এই বোমাবাজি ঘটিয়াছে।) তিনি খুব শান্ত ছিলেন এবং তিনি তাঁর কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া পোশাক বদলাইয়া ফেলিলেন এবং অপরাহ্ণ বেলা সদর দপ্তরের স্টেশনে গিয়া হাজির হইলেন মুসোলিনীকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য। তাঁকে দেখিয়া বাইরে থেকে বুঝিবার উপায় ছিল না যে, কিছুক্ষণ আগেই তাঁর উপর দিয়া এত বড় ঝড় বহিয়া গিয়াছে। তিনি মুসোলিনীকে স্বাগত

জানাইয়া করমর্দন করিলেন এবং বোমাবিধ্বস্ত আলোচনা কক্ষের কাছে নিয়া গিয়া সমস্ত কিছু দেখাইলেন এবং বলিলেন যে, এইমাত্র তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভাগ্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কেননা, তার অবস্থিতির মাত্র ৬ ফুটের মধ্যে বোমাটি ফাটিয়াছিল, কিন্তু দৈব তাঁকে রক্ষা করিয়াছে। তিনি মুসোলিনীর নিকট যতই এই দুর্ঘটনার বর্ণনা দিতেছিলেন, ততই তাঁর কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হইতেছিল, তিনি বলিলেন :

'After my miraculous escape from death to-day I am more than ever convinced that it is my fate to bring our common enterprise to a successful conclusion.'

'দৈবক্রমে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আজ যে আমি রক্ষা পেয়ে গেছি, তার ফলে আগের চেয়ে আরও বেশী আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, আমার ভাগ্যদেবতা চান যে, আমি যেন আমাদের এই দঃসাহসিক অভিযান সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে শেষ করতে পারি।'

মুসোলিনীও জবাবে মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন (এবং না দিয়াই বা তাঁর কি উপায় ছিল ?) এবং মন্তব্য করিলেন :

'After what I have seen here, I am absolutely of your opinion. This was a sign from Heaven.'

'আমি এখানে এসে যা কিছু দেখলুম, তাতে আমিও আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এটা স্বর্গ থেকে ভগবানেরই নির্দেশের লক্ষণ'।[1]

হিটলার মুসোলিনীকে নিয়া তাঁর স্বীয় আবাসকক্ষে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে তখন কাইটেল, জড্‌ল, গোয়েরিং, রিবেণ্ট্রপ, ডোনিৎস প্রভৃতি বড় বড় নায়কেরা চায়ের মজলিসে যোগ দিয়া উত্তেজিতভাবে যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পর্কে পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিতেছিলেন। এমনকি, গোয়েরিং রিবেণ্ট্রপকে গালাগালিও দিতেছিলেন। হিটলার ও মুসোলিনী এই আড্ডার মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময় কে একজন ১৯৩৪ সালের ক্যাপ্টেন রোয়েমের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিলেন। হঠাৎ যেন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল এবং হিটলার লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন তিনি এবার সকলের বিরুদ্ধেই প্রতিশোধ নিবেন কেননা, তিনি দৈব্যের দ্বারাই নির্দিষ্ট হইয়াছেন নতুন ইতিহাস সৃষ্টির জন্য এবং এই কাজে যাঁরা তাঁকে বাধা দিবেন তদের সকলকেই ধ্বংস করা হইবে।

এভাবে আধ ঘণ্টা ধরিয়া চীৎকার করার পর হিটলার ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

* * *

হিটলার-বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং একটি বিকল্প সরকার গঠনের পরিকল্পনার কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছিল দুইটি প্রশ্নের উপর। প্রথমতঃ হিটলারের হত্যার সাফল্য এবং দ্বিতীয়তঃ বার্লিনে সরকারী ক্ষমতা দখলের জন্য দৃঢ় ও সঙ্কল্পবদ্ধ অভিযান, যার ভূমিকা স্বরূপ 'অপারেশন ভাল্‌কিরাই' অনুসারে সৈন্য ও সেনাপতিদের

১। এলান বুলক্‌, পৃষ্ঠা ৭৪৪।

উপর নির্দেশ দান। কিন্তু প্রথম প্রশ্নতো আগেই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ হিটলার নিহত হন নাই—যদিও স্টাউফেনবার্গ তা' জানিতেন না এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কেও বার্লিনে কোন পন্থাই অবলম্বিত হয় নাই। কারণ, বেণ্ডেলস্ট্রাসিতে বা স্বরাষ্ট্র সৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তরে বেলা ১টা নাগাদ খবর পেঁছিয়াছিল যে, রেস্তেনবুর্গে একটা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু হিটলার বাঁচিয়াই আছেন। সুতরাং বার্লিনের আর্মি দপ্তরের প্রধান ডেপুটি জেনারেল ওলব্রিক্ট, যিনি ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম ছিলেন, তিনি 'অপারেশন ভালকিরাই' অনুসারে কোন নির্দেশও দেন নাই। ফলে, সরকারী ক্ষমতা দখলের কোন চেষ্টাও হয় নাই। এদিকে স্টাউফেনবার্গের বার্লিনে ফিরিয়া আসিতে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল এবং যদিও তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর ষড়যন্ত্রকারীরা একটু চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন, তথাপি ইতিমধ্যে দীর্ঘ ৩।৪ ঘণ্টা সময় বৃথা নষ্ট হইল। অথচ তখনও স্টাউফেনবার্গের বিশ্বাস ছিল যে, হিটলার মৃত। এমন কি, হিটলারের সদর দপ্তরের সাঙ্কেতিক যোগাযোগের বড়কর্তা জেনারেল ফেলজিয়েবেলও মনে করিয়াছিলেন যে, হিটলার মারা গেছেন। সুতরাং চক্রান্তের পরিকল্পনা অনুসারে তিনি বার্লিনে জেনারেল ওল্ডব্রিক্টকে সাঙ্কেতিক বার্তা জানাইয়া দিলেন যে, অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। (কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি তাঁর ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং র‍্যাস্তেনবুর্গের সঙ্গে সাঙ্কেতিক যোগাযোগ নষ্ট করার আর চেষ্টা তিনি করেন নাই।) ওলব্রিক্ট এই বার্তা পাইয়া হোম আর্মির প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফ্রোমকে গিয়া সোজা বলিলেন যে, হিটলার নিহত হইয়াছেন, সুতরাং অবিলম্বেই 'অপারেশন ভালকিরাই' অনুসারে নির্দেশ জারী করা উচিত।*

কিন্তু প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফ্রোম ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন না, তাঁর সম্মতি ছাড়া নির্দেশটা আইনসম্মতও হইতে পারে না। অতএব প্রধান সেনাপতি এই নির্দেশ দেওয়ার আগে রাস্তেনবুর্গে টেলিফোন করিয়া জানিতে চাহিলেন সত্যই হিটলার মারা গিয়াছেন কিনা। এদিকে ওলব্রিক্টের ধারণা ছিল যে, পরিকল্পনা অনুসারে রাস্তেনবুর্গের সঙ্গে বাইরের টেলিফোন যোগাযোগ নিশ্চয়ই নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ফ্রোমকে বাধা দেওয়ার দরকার নাই। কিন্তু জেনারেল ফ্রোম অবিলম্বেই রাস্তেনবুর্গের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিলেন এবং সেখান থেকে খোদ হাইকমাণ্ডের বড়কর্তা ফিল্ড মার্শাল কাইটেল জানাইয়া দিলেন যে, হিটলারের হত্যার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা, তিনি সামান্য আঘাত পাইয়াছেন বটে, কিন্তু জীবিতই আছেন।[১]

এদিকে স্টাউফেনবার্গ বার্লিনে আসিয়া পেঁছিলেন এবং তখনও সরকারী ক্ষমতা দখলের কোন চেষ্টা হয় নাই দেখিয়া তিনি বিষণ্ণ হইলেন এবং ওলব্রিক্টকে বুঝাইলেন যে, হিটলার সত্যই মারা গিয়াছেন। যাঁরা প্রতিবাদে করিতেছেন, আসলে তাঁরা নিজেরা ক্ষমতা দখলের মতলব আছেন। সুতরাং স্টাউফেনবার্গের তাগিদে ষড়যন্ত্রকারীরা স্বরাষ্ট্র বাহিনীর সদর দপ্তর দখল করিয়া নিলেন এবং জেনারেল ফ্রোমকে আটক

---

* জার্মানীর পৌরাণিক কাহিনীতে 'ভালকিরাই' নাম্নী কুমারীরা অতি সুন্দরী, কিন্তু অতি ভীষণা ছিল। সেকালের যুদ্ধক্ষেত্রে যারা হননযোগ্য ছিল এই সুন্দরীরা উড়িয়া গিয়া তাদেরকে নির্দিষ্ট করিয়া দিত। আলোচ্য ক্ষেত্রে হিটলার ছিলেন হননযোগ্য, সুতরাং সেই অপারেশনের সাঙ্কেতিক নামও রাখা হইল 'ভালকিরাই'। —শাইরার, পৃষ্ঠা ১২২৭।

১। চেষ্টার উইলমট, পৃষ্ঠা ৪২৭।

করিলেন। আর 'অপারেশন ভালকিরাই' অনুসারে মিউনিক, ভিয়েনা, ব্রুসেলস, প্যারিস ইত্যাদিতে ক্ষমতা দখলের বার্তা পাঠানো হইল। যাঁরা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন তাঁরা কিছু কিছু পন্থা অবলম্বন করিলেন। যেমন, প্যারিসে জেনারেল ফন স্টুনপনাজেল (Stulpnagel) গেস্টাপো ও এস.এস. বাহিনীর কিছু লোককে গ্রেপ্তার করিলেন। কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ক্লুজ আগে হিটলার-বিরোধী চক্রান্তে সায় দিলেও (১৯৪২ সালে যখন তিনি পূর্ব রণাঙ্গনে ছিলেন) যখন জানিতে পারিলেন যে, হিটলার জীবিত আছেন, তখন তিনি হাত গুটাইয়া নিলেন। অর্থাৎ পশ্চিমেও ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া গেল।

অন্যদিকে বার্লিনের গার্ড ব্যাটেলিয়নের কিছু সৈন্য মেজর রেমারের (Remer) নেতৃত্বে যখন প্রচার মন্ত্রী গোয়েবলসের দপ্তরে গেলেন তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য, গোয়েবলস খুব ঠাণ্ডা মাথায় এবং সাহসের সঙ্গে বলিলেন যে, তাঁদের দেওয়া সংবাদ মিথ্যা, হিটলার জীবিতই আছেন এবং তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তেনবুর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করিলেন এবং স্বয়ং ফুরারের সঙ্গে কথা বলিলেন। (অবশ্য এর আগে তিনি হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও তাঁর সদর দপ্তরে বোমা বিস্ফারণের খবর জানিতেন না)।

এভাবে বার্লিন দখলের পরিকল্পনা বানচাল হইয়াগেল এবং ষড়যন্ত্রকারীদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার মধ্যেই হিটলারের প্রতি অনুরক্ত অফিসারেরা হোম আর্মির সদর দপ্তরের আটক অবস্থা থেকে বাহির হইয়া আসিলেন এবং জেনারেল ফ্রোমকে মুক্ত করিলেন ও ষড়যন্ত্রকারীদের নিরস্ত্র করিলেন। ফ্রোম তখন নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ ও হিটলারের প্রতি আনুগত্য দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য সৈন্যেরা আসিয়া পড়িবামাত্র জেনারেল ফ্রোম স্টাউফেনবার্গ, ওলব্রিক্ট ও অন্য দুইজন অফিসারকে গুলি করিয়া মারার জন্য হুকুম দিলেন। স্বরাষ্ট্র বাহিনীর সদর দপ্তরের আঙ্গিনায় একটি বর্মাবৃত গাড়ীর হেড্‌লাইট জ্বালিয়া সেই আলোতে স্টাউফেনবার্গ, ওলব্রিক্ট প্রভৃতিকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইল। এভাবে স্টাউফেনবার্গের মত একজন দীপ্তিমান লোক হিটলারের বিরোধিতা করিতে গিয়া মর্মান্তিক মৃত্যু বরণে বাধ্য হইলেন। মৃত্যুর আগে তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "আমাদের পবিত্র জার্মানী দীর্ঘজীবী হোক।" জেনারেল বেককে একটি রিভলভার দিয়া আত্মহত্যার সুযোগ দেওয়া হইল এবং যখন তিনি ব্যর্থ হইলেন তখন ফ্রোম নিজ হাতে সেই কাজ সমাধা করিলেন। কিন্তু জার্মানীব্যাপী হত্যাকাণ্ডের এটা ছিল শুরু মাত্র।...

এদিকে হিটলারের সদর দপ্তরেও ষড়যন্ত্রর কথা ফাঁস হইয়া গেল এবং গোয়েবলস্ সন্ধ্যা ৬টার পর জার্মানীর সমস্ত রেডিও স্টেশন থেকে ঘোষণা করিলেন যে, ফুরারের জীবননাশের জন্য এক চক্রান্তমূলক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ফুরার জীবিত আছেন, তিনি সামান্য আঘাত পাইয়াছেন মাত্র। রাত ৮টার কিছু পরে হাইকমাণ্ডের বড়-কর্তা কাইটেল টেলিপ্রিন্টার যোগে সর্বত্র সেনাবাহিনীর অধিনায়কদিগকে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে একথাও ঘোষিত হইল যে, হিমলার স্বরাষ্ট্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

মধ্যরাতের কিছু আগেই প্রধান প্রধান ষড়যন্ত্রকারীরা হয় নিহত কিংবা ধৃত হইলেন।[১]

২০-২১শে জুলাই মধ্য রাত্রির আধঘণ্টা পর খোদ হিটলার রাস্তেনবুর্গে তাঁর সদর দপ্তর থেকে বেতারযোগে যে ভাষণ দিলেন তা সমগ্র জার্মানীর রেডিও স্টেশন থেকে প্রচারিত হইল। তিনি বলিলেন :

'আজ রাত্রে বেতার যোগে আমি যে ভাষণ দিচ্ছি, তা' প্রথমতঃ এই কারণে যে, যা'তে আপনারা আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পান এবং আপনাদের জানা উচিত যে, আমি ভালো আছি এবং আমার তেমন কোন আঘাত লাগেনি। দ্বিতীয়তঃ আপনাদের জানা উচিত যে, এমন একটা অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সমগ্র জার্মানীর ইতিহাসে যার তুলনা নেই। মুষ্টিমেয় একদল দুরাকাঙ্ক্ষী, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ও মূর্খ অফিসার-চক্র আমাকে এবং জার্মান হাইকমাণ্ডকে অপসারিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল। কর্নেল কাউণ্ট ফন স্টাউফেনবার্গ এই বোমা রেখেছিল এবং আমার দুই মিটারের মধ্যে বোমাটি বিস্ফোরিত হয়েছিল। আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন মারা গিয়েছেন।*

'আমার কয়েকজন প্রিয় সহকর্মী খুব গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আমার নিজের খুব সামান্য আঘাত লেগেছে! আমার অদৃষ্ট দেবতা আমাকে যে কর্তব্য সম্পাদনের ভার দিয়েছেন, আমি মনে করি এই ঘটনা তারই নিশ্চিত প্রমাণ। আমি এক্ষণে হুকুম দিচ্ছি এই ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ যদি কোন আদেশ দেয়, তবে, সেই আদেশ যেন মান্য করা না হয়।...

'আমি আরও আদেশ দিচ্ছি যে, যদি কোন লোককে এই ধরনের কোন আদেশ দিতে বা গ্রহণ করতে দেখা যায়, তবে, প্রত্যেকের উচিত হবে এমন লোককে গ্রেপ্তার করা এবং যদি বাধা দেয়, তবে, তাকে দেখা মাত্র হত্যা করা।......'[২]

হিটলারের হুকুম মানেই আইন এবং তাঁর হুকুমের শেষের কথাগুলির মধ্যে যে হিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের প্ররোচনা ছিল, তার ফলে সারা দেশে নাৎসী পার্টি ও গেস্টাপো টেরর বা ত্রাস সৃষ্টি করিল। ১৯৩৪ সালের রোয়েম প্রভৃতির হত্যাকাণ্ডের চেয়েও এবারের রক্তস্নান আরও মারাত্মক এবং ব্যাপক হইল। অন্ততঃ ৩৩ হাজার জার্মান সেই বছর গ্রেপ্তার হইল (মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডারের মতে) এবং যে এক হাজারকে বন্দী-নিবাসে পাঠানো হইল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আর ফিরিয়া আসেন নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের নায়কদিগকে সপরিবারে নির্যাতন বা নিহত করা হইল—যেমন কাউণ্ট স্টাউফেনবার্গ, গোয়েরডেলার এবং হ্যাসেল। ডাঃ শাক্ট এবং জেনারেল হ্যাল্ডার, যে দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাঁদেরকে পর্যন্ত বন্দীনিবাসে পাঠানো হইল।

২০শে জুলাইয়ের ঘটনার পর কত লোককে হত্যা করা হইয়াছিল, তা সঠিকভাবে কোন দিনই নির্ণয় করা যাইবে না। তবে, উইলিয়াম শাইরার, চেস্টার উইলমট এবং এ্যালান বুলক্ প্রমুখ বিখ্যাত সামরিক ঐতিহাসিকগণ একটা হিসাব-নিকাশের পর স্থির করিয়াছেন যে, অন্ততঃ ৪,৯৮০ জনকে হত্যা করা হইয়াছিল। সামরিক ও

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪৩২ এবং এ্যালান বুলক, পৃষ্ঠা ৭৪৭।

* প্রকৃতপক্ষে ৪ জন নিহত হয়েছিলেন।

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃঃ ৭৫০।

বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই এমন অনেককেই খুন করা হইয়াছিল, যাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের কোন সম্পর্ক ছিল না। হিটলার হুকুম দিয়াছিলেন যে, অপরাধীদিগকে যেন ছাগল ভেড়ার মতো ফাঁসিতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

হিটলারের বশংবদ কুখ্যাত নাৎসী জজ রোল্যান্ড ফ্রেইজলার (Roland Freisler) "পিপলস্ কোর্ট" নামে যে গণ-আদালত গঠন করিলেন, তাতে বিচারের নামে প্রহসন ও বর্বরতা অনুষ্ঠিত হইল। আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নিজস্ব কোন আইন-জীবী নিয়োগের উপায় ছিল না। ৭ই আগস্ট প্রথম বিচারের শিকার হইলেন ফিল্ড মার্শাল ফন ভিজলবেন (Witzleben), জেনারেল হপনার (Hoppner), জেনারেল হেস্ (Hase), জেনারেল স্টিয়েফ (Stieff) এবং আরও চারজন অফিসার। এঁদের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক ব্যবহার করা হইল এবং সরাসরি বিচারে এঁদের প্রাণদণ্ড হইল, এঁদের বক্তব্য শুনিবার ধৈর্যও জজের ছিল না। পরদিন ৮ই আগস্ট এঁদেরকে নৃশংসভাবে খুন করা হইল। কসাইয়ের দোকানে যে সমস্ত হুক ব্যবহার করা হয় মাংস ঝুলাইয়া রাখার জন্য, সেই হুকে দাঁড় দিয়া ঝুলাইয়া এবং আস্তে আস্তে গলায় ফাঁস আঁটিয়া এঁদেরকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলা হইল। অনেককে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিয়া ফেলা হইল এবং এই সমস্ত নৃশংস ও বর্বর হত্যাকাণ্ডের ছায়াচিত্র বা ফিল্ম তোলা হইল এবং সেদিনই সন্ধ্যাবেলা হিটলার রাইখ চ্যান্সেলারিতে সেই সমস্ত ছবি দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিলেন।[১]

যুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যন্ত এই ধরনের হত্যা চলিতেছিল। তবে, হিটলারের ওই শয়তান জজ ফ্রেইজলারেরও পরিণামে অপমৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ফ্যাবিয়ান ফন্ শ্লাব্রেনডর্ফ (Fabian von Schlabrendorff) নামক বিশিষ্ট আইনজীবীকে যখন আদালত কক্ষে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন হঠাৎ একটি মার্কিন বোমারু আদালত কক্ষের উপর বোমা নিক্ষেপ করে এবং জজ মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন, আর অনেক দলিল-পত্রও ধ্বংস হইয়া যায়। ফলে, অনেক আসামী এবং শ্লাব্রেনডর্ফও দৈবাৎ রক্ষা পাইয়া যান।[২]

রোমেলের বিষপান

এবার জার্মানীর সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় সেনাপতির পালা। ফিল্ড মার্শাল রোমেলের সঙ্গে হিটলারের যে বনিবনা হইতেছিল না এবং সামরিক প্রশ্নে যে মতভেদ হইতেছিল, সেকথা মিত্রবাহিনী কর্তৃক নরম্যান্ডিতে অবতরণের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। রোমেল ক্রমেই অনুভব করিতেছিলেন যে, হিটলারের নেতৃত্ব জার্মানীর পক্ষে সর্বনাশকর হইতেছে। এজন্য তাঁর অপসারণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু রোমেল হিটলারকে হত্যার পক্ষপাতী ছিলেন না, সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যেও তিনি যোগ দেন নাই। তিনি হিটলারকে 'শহীদ' বানাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং বার্লিনের বা প্যারিসের সামরিক মহলে যাঁরা হিটলারের বিরোধী ছিলেন, তাঁদের কোন কোন বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে যখন হিটলারকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে অভিযুক্ত করার প্রস্তাব উঠিল, তখন তিনি সেটা অনুমোদন করিলেন।

১। পূর্বোক্ত পুস্তক, ঐ পৃষ্ঠা।
২। শাইরার, পৃষ্ঠা ১২৭৪।

কিংবা পূর্ব রণাঙ্গনের কোন কোন জার্মান সেনাপতির মত তাঁরও ইচ্ছা ছিল হিটলারকে বন্দী করা এবং তাঁকে দিয়া জোরপূর্বক রেডিওযোগে এই মর্ম ঘোষণা প্রচার করানো যে, তিনি রাষ্ট্রীয় ও সামরিক নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করিয়াছেন। হিটলারের অপসারণের পর যদি জার্মানীতে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করিতে হয়, তবে, ষড়যন্ত্রকারীদের মতে তার একমাত্র নেতা হইতেছেন ফিল্ড মার্শাল রোমেল। কারণ, জার্মানীতে হিটলারের পর রোমেলই ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়।[১]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রোমেলের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না, কোন রাজনৈতিক দলভুক্তও তিনি ছিলেন না—যদিও গোড়ার দিকে তিনি হিটলারের একজন গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু তিনি সাহসী, আন্তরিকতাসম্পন্ন এবং বলিষ্ট চরিত্রের সৎ মানুষ ছিলেন। সুতরাং ফ্রান্সে আর্মি গ্রুপে বি-এর নেতৃত্ব নেওয়ার আগে যখন তিনি যুদ্ধবন্দীদের এবং পোলিশ, রুশ ও ইহুদীদের উপর বর্বর অত্যাচার এবং বন্দীনিবাসগুলিতে পাইকারি হত্যার ভয়াবহ কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁর মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল এবং এই সময় থেকে তিনি রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং হিটলারের অপসারণ চাহিলেন। হিটলারের পর যে নূতন সরকার গঠিত হইবে, সেই সরকার পশ্চিম দিকে মিত্রপক্ষের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক যুদ্ধ বিরতি ঘটাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু পূর্বরণাঙ্গনে আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া হইবে।

জার্মান সেনাপতিদের মধ্যে হিটলার-বিরোধী এই চক্রান্ত সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে, রাজনীতির দিক দিয়া এঁরা প্রায় সকলেই সোভিয়েট সাম্যবাদের বিপক্ষে ছিলেন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে এঁরা সাহসী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন, তবু রাশিয়া সম্পর্কে এঁরা আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন। সুতরাং নাৎসী-বিরোধী সেনাপতিদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘটাইয়া পূর্বদিকে রাশিয়াকে বাধা দেওয়া এবং ইতিমধ্যে বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্যদের জন্য জার্মানীর দ্বার মুক্ত করিয়া দেওয়া যেন মধ্য ইউরোপ ও জার্মানীতে রাশিয়া প্রবেশ করিতে না পারে।[২]

১৯৪৪, জুলাই মাসের গোড়ার দিকে পশ্চিম রণাঙ্গনের ফ্রান্সে জার্মানবাহিনীর অবস্থান সংকটজনক এবং এই যুদ্ধের অবসান (অর্থাৎ মিত্রপক্ষের পক্ষে যুদ্ধবিরতির চুক্তি) ঘটানো উচিত বলিয়া প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল রুন্ডস্টেড হিটলারের সদর দপ্তরে রিপোর্ট দেওয়ায় তিনি পদচ্যুত হইলেন এবং তাঁর বদলে পূর্ব রণাঙ্গনের ফিল্ড মার্শাল ক্লুজকে নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু তিনিও জার্মানবাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে প্রতিকূল রিপোর্ট দিলেন এবং এই বিষয়ে রোমেলের সঙ্গে একমত হইলেন। রোমেলও ইতিপূর্বেই হিটলারকে অনুরূপ মতামত জানাইয়াছিলেন। ফলে, আগস্ট মাসের মধ্যভাগে ক্লুজের বদলে ফিল্ড মার্শাল মডেল প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং হিটলার ক্লুজকে জার্মানীতে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। ২০শে জুলাইয়ের বোমা বিস্ফোরণ সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রের ফলে ক্লুজের কোন সম্পর্ক আছে, হিটলারের মনে এমন সন্দেহ দেখা দিল এবং একথাও সত্য যে, যদিও ক্লুজ হাতে-কলমে কিছু করেন নাই, তবু ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। সুতরাং ক্লুজ

১। রোমেল—ডেসমন্ড ইয়ং, পৃষ্ঠা ২৪০-৪১।
২। Secrets of the Second World War—Deborin, Moscow, P. 172.

হিটলারের কাছে ধরা দেওয়ার বদলে জার্মানীতে তাঁর স্বগৃহে যাত্রার পথে বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন।

এদিকে রোমেল ১৭ই জুলাই নরম্যাণ্ডির রণাঙ্গন পরিদর্শন করিতে গিয়া মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত হইবার পর যখন হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত, তখন হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের দলে যুক্ত ছিলেন তাঁর চীফ অফ দি স্টাফ জেনারেল স্পাইডেল (Speidel), ফ্রান্সের মিলিটারি গভর্নর জেনারেল স্টুলপনাজেল (Stulpnagel), তাঁর স্টাফ অফিসার হোফাকের (Hofaker) এবং বেলজিয়ামের মিলিটারি গবর্নর জেনারেল ফন্ ফলকেনহাইসেন (Falkenhausen) স্টুটগারটের মেয়র ডঃ স্ট্রোলিন (Strolin) প্রভৃতি। কিন্তু এঁরা সকলেই একে একে গেস্টাপোর সন্দেহের ফলে ধরা পড়িতে লাগিলেন এবং হিটলারের প্রতিশোধ নীতির শিকার হইলেন। জেনারেল স্টুলপনাজেল রিভলবার দিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়া ভার্দুনের কাছে রাস্তায় মারাত্মকভাবে আহত হইলেন, কিন্তু মারা পড়িলেন না। ভার্দুনের হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়া 'রোমেল' নাম উচ্চারিত হইল তারপর কর্নেল হোফাকের যখন বার্লিনে গেস্টাপোর দপ্তরে অসহ্য অত্যাচারে উৎপীড়িত হইলেন, তখন তিনি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে রোমেলের যোগসূত্রের কথা স্বীকার করিয়া ফেলিলেন।

'বার্লিনের লোকদেরকে বলো যে, আমি তাঁদের দলেই আছি'—রোমেলের নামে এই উক্তির তিনি পুনরাবৃত্তি করিলেন। সুতরাং হিটলারের সন্দেহ ঘনীভূত হইল।

এদিকে রোমেল হাসপাতালে অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে দ্রুত আরোগ্য লাভ করিলেও হিটলার সম্পর্কে তাঁর জিহ্বা সংযত করিলেন না। ৮ই আগস্ট তিনি উলমের (Ulm) নিকটবর্তী হেরলিংজনে তাঁর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে সেখানে দেখা করিতে আসিতেন। তিনি ৬ই সেপ্টেম্বর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারী জেনারেল স্পাইডেলের নিকট হিটলার সম্পর্কে তীব্র ভাষায় গালাগালি দিয়া বলিলেন—'ওই বিকারগ্রস্ত মিথ্যাবাদী লোকটা এক্ষণে পুরোপুরি উম্মাদ হয়ে গেছে। ২০শে জুলাইয়ের ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সে তার ধর্ষকামবৃত্তি (Sadism) চরিতার্থ করতে চাইছে। কিন্তু এখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে না।'[১]

পরদিন জেনারেল স্পাইডেল ধৃত হইলেন।...

জার্মান সেনাপতিদের উচ্চতর মহলে রোমেল সম্পর্কে ঈর্ষা ছিল। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে হিটলারের সন্দেহ এবং ক্ষোভ প্রকাশ পাওয়ায় হাইকমাণ্ডের নেতারা মনে মনে তেমন কোন অস্বস্তি বোধ করিলেন না এবং গুরুতরভাবে আহত রোমেলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে শীর্ষ নেতারা কেউ খোঁজ-খবরও নিলেন না। কিন্তু রাজনৈতিক গোয়েন্দাচক্র যথারীতি রোমেলের গৃহের উপর নজর দিতে শুরু করিল।

অবশেষে ১৪ই অক্টোবর দুপুরে বার্লিন থেকে হিটলারের দুই দূত জেনারেল বার্গডর্ফ (Burgdorf) এবং জেনারেল মৈসেল (Maisel) ও তাঁদের সঙ্গে আর একজন অফিসার আসিয়া হাজির হইলেন। গেস্টাপোর লোকেরা বাড়ীর চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং বহির্গমনের রাস্তাগুলি এস.এস.-এর লোকেরা গাড়ী দিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। এমন কি, টেলিফোনের সংযোগ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করা হইল। অর্থাৎ

১। শাইরার, পৃষ্ঠা ১২৮১।

জনপ্রিয় এবং সৈন্যদের উপর প্রভাবশালী ফিল্ড মার্শাল রোমেল যেন তাঁর বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ও গ্রেপ্তারি এড়াইয়া বাহিরে যাইতে না-পারেন, তার জন্যই এই কড়া সতর্কতা। সুতরাং রোমেলের বন্ধু এবং সহকারী ক্যাপ্টেন আলডিঙ্গার (Aldinger) তাঁকে জোরপূর্বক গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তা কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য বার্লিন থেকে আগত জেনারেল দুইজন হিটলারের আদেশনামা নিয়াই রোমেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, হিটলারকে হত্যা বা অপসারণ করার চক্রান্তের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন এবং ষড়যন্ত্রকারীরা হিটলারের বদলে রোমেলকেই জার্মান রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং হিটলার আদেশ দিয়াছেন যে, রোমেলের সামনে দুইটি পথ খোলা আছে—হয় তাকে পিপলস কোর্টে অভিযুক্ত এবং প্রকাশ্য বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে কিংবা বিষপানে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। অবশ্য এই বিষও তাঁরা সঙ্গেই নিয়া আসিয়াছেন। এই বিষের ক্রিয়া হইতে মাত্র ৩ সেকেন্ড সময় লাগিবে।···

যাঁরা বার্লিন থেকে হিটলারের আদেশ না-মানিয়া রোমেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁরা রোমেলের মৃত্যুর ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত পরিকল্পনা পাকা করিয়া নিয়াই আসিয়াছিলেন। রোমেল তাঁর বেদনার্ত স্ত্রীকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া বলিলেন—যদি হিটলারের দ্বিতীয় প্রস্তাব (বিষপানে আত্মহত্যা) গ্রহণ করা না হয়, তবে, তাঁর অশেষ দুর্গতি ঘটিবে তথাকথিত 'জন-আদালতের' বিচারে। এমন কি, তিনি জীবিত অবস্থায় বার্লিনে পৌঁছিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। অধিকন্তু তাঁর স্ত্রী-পুত্রের (১৫ বছর বয়স্ক কিশোর পুত্র ম্যানফ্রেড) উপর অশেষ নির্যাতন হইবে। আর যদি বিষপানে তিনি দেহত্যাগ করেন, তবে, তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে সমাহিত করা হইবে, তাঁর গুণকীর্তন করা হইবে এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র নিরাপদে থাকিবে। সরকার থেকে তাঁর বিধবা পত্নীকে পেন্সন পর্যন্ত দেওয়া হইবে। বাইরে প্রচার করা হইবে যে, মোটর-দুর্ঘটনার জন্য তিনি যে গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিলেন, তার ফলেই তিনি হঠাৎ হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন।······

স্থিরচিত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার কঠিন সংকল্প গ্রহণ করিয়া রোমেল তাঁর পত্নী ও কিশোর পুত্রের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং বার্লিন থেকে আগত জেনারেলদ্বয়ের সঙ্গে মোটরে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫ মিনিট পরেই রোমেলের গৃহে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল এবং বলা হইল যে, ফিল্ড মার্শাল হঠাৎ হার্টফেল করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। হাসপাতালের চীফ মেডিক্যাল অফিসার জানাইলেন যে, বেলা ১·২৫ মিনিটের সময় দুইজন জেনারেল রোমেলকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনিয়াছিলেন, কিন্তু মৃতদেহ পরীক্ষা করার কোন অধিকার হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের ছিল না।

রোমেলের মৃত্যু ঘোষিত হওয়ায় পর রোমেলের বিধবা পত্নীর কাছে জার্মানীর নানা অংশ থেকে শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপক বহু টেলিগ্রাম আসিল। হিটলারও এক বার্তা পাঠাইলেন, কিন্তু বার্তার মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস বা আন্তরিকতা ছিল না। 'আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য আমার গভীর সমবেদনা গ্রহণ করুন। মার্শাল রোমেলের নাম উত্তর আফ্রিকার বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের সঙ্গে চিরদিন যুক্ত হইয়া থাকিবে।'

১৮ই অক্টোবর রোমেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে সামরিক কায়দায় অনুষ্ঠিত হইল এবং হিটলার রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করিলেন। প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেড সম্ভবতঃ রোমেলের আকস্মিক মৃত্যুর আসল রহস্য জানিতেন না। সুতরাং তিনি মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাষণে রোমেলের যুদ্ধ-নৈপুণ্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 'আজ যখন যুদ্ধের সংকট, যখন তাঁর প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী, তখন নির্মম অদৃষ্ট তাঁকে আমাদের কাছ থেকে কাড়িয়া নিল।'

অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, রুণ্ডস্টেডের ভাষণে রোমেলকে 'রাইখ ও ফুয়ারের জন্য ক্লান্তিহীন যোদ্ধা' বলিয়া বর্ণনা করা হইল এবং উপসংহারে মন্তব্য করা হইল—

'His heart belonged to the Fuhrer !' অর্থাৎ তাঁর হৃদয় ফুয়ারের দখলেই ছিল।[১]

* * *

জার্মানবাহিনীর উজ্জ্বলতম সেনাপতিদের অন্যতম ফিল্ড মার্শাল রোমেলের এভাবে মৃত্যু ঘটিল হিটলারী অমানুষিকতার অসৎ আচরণ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার দুষ্প্রবৃত্তির জন্য। আসলে বিষপানে রোমেলের এই অপমৃত্যু ছিল বিষে জর্জর নাৎসী জার্মানীরই প্রতীক-তুল্য। কারণ, এরপর কয়েক মাসের মধ্যেই তৃতীয় রাইখেরও অপমৃত্যু ঘনাইয়া আসিল।

* * *

তবু রাইখের অনিবার্য অপমৃত্যু ঠেকাইয়া রাখার জন্য তখনও ভগ্নস্বাস্থ্য ও অর্ধ উন্মাদ হিটলারের গোঁয়াতুর্মির অন্ত ছিল না। অথচ তখন পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকে জার্মানী নিদারুণ সংকটের মুখে। এই সংকটের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য সৈন্যবাহিনী ও সেনানীমণ্ডলীর সহায়তা ও সহযোগিতা ছাড়া উপায়ও ছিল না। সুতরাং ২০শে জুলাইয়ের ষড়যন্ত্রকে নির্মূল করার জন্য সামরিক অসামরিক সকলের বিরুদ্ধে অমানুষিক এবং বর্বর প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেও হিটলার ও গোয়েবেলস তাঁদের বক্তৃতায় সমগ্র জার্মানবাহিনীর সেনানীমণ্ডলীকে অভিযুক্ত করিলেন না। ঘোষণা করিলেন— 'মুষ্টিমেয়' কাণ্ডজ্ঞানহীন অফিসারের দুরভিসন্ধির কথা এবং প্রচার করিলেন ওই 'মুষ্টিমেয়' কিছু 'বিশ্বাসঘাতক' ছাড়া আর বাকী সকলেই হিটলার ও তৃতীয় রাইখের প্রতি অনুরক্ত। অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী ও অফিসারবৃন্দ হিটলারের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা। ২৪শে জুলাই এক আদেশনামা বলে জার্মানবাহিনীর চিরাচরিত মিলিটারি স্যালুইট বা সামরিক অভিবাদন অবলুপ্ত করা হইল এবং উহার বদলে নাৎসী অভিবাদন প্রবর্তিত হইল। সোজা কথায় নাৎসী পার্টি ও হিটলারের সঙ্গে জার্মানবাহিনী এক হইয়া গেল। যতটুকু স্বাতন্ত্র্য এতদিন পর্যন্ত জার্মান আর্মি-সংগঠন ভোগ করিতেছিল, তা'ও ২০শে জুলাইয়ের হত্যামূলক ষড়যন্ত্রের পর অবলুপ্ত হইল।

এদিকে হিটলারের নির্দেশে আর্মি থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের অপসারণের জন্য প্রবীণ ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেড ও নবনিযুক্ত সৈন্যবাহিনীর সেনানীমণ্ডলীর প্রধান জেনারেল গুডেরিয়ানকে যথাক্রমে সভাপতি ও সদস্যপদে নিয়োগ (আরও কয়েক জন সদস্য ছিলেন) করিয়া একটি 'কোর্ট অব অনার' (সামরিক মর্যাদার বিচারালয়) গঠিত হইল। কিন্তু এই আদালতে অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন অধিকার

১। রোমেল—ডেসমণ্ড ইয়ং, পৃষ্ঠা ২৬৩।

রহিল না। বিস্ময়ের কথা এই যে, রুন্ডস্টেড বা গুডেরিয়ান কেউ এমন অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেন না। বরং অভিযুক্ত অফিসারদেরকে গেস্টাপোদের বর্ণিত অপরাধ বা অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া সরাসরি আর্মি থেকে বহিষ্কৃত করিয়া পিপলস্ কোর্টে বা 'গণ-আদালতে' সোপর্দ করা হইল এবং এভাবে শত সহস্র সহকর্মী অফিসারকে সাবাড় করা হইল।

* * *

এই সমস্ত ভয়ংকর ঘটনার কিছুকাল পরে হিটলার মনে করিলেন যে, তিনি এতদিন পরে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কেননা আর্মি থেকে বিশ্বাসঘাতকদের সাফ করা হইয়াছে। সুতরাং তিনি একদিন অস্ত্র ও গোলাবারুদ নির্মাণ-মন্ত্রী এ্যালবার্ট স্পীয়ারের কাছে মন্তব্য করিলেন যে, এতদিন পরে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যুদ্ধের সাফল্যজনক পরিচালনার জন্য কেন মার্শাল টুকাচেভস্কিকে এবং তাঁর জেনারেল স্টাফকে স্ট্যালিন 'লিকুইডেট' বা সাবাড় করিয়াছিলেন—যদিও ১৯৩৭ সালের মস্কোর ষড়যন্ত্র মামলাগুলি সম্পর্কে তাঁর বরাবরই সন্দেহ ছিল। কিন্তু ইদানীং কালের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তাঁর মনে হইতেছে যে, রুশ ও জার্মান জেনারেল স্টাফদের মধ্যে পারস্পরিক কোন বিশ্বাসঘাতকতার সম্পর্কের সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ তাঁর নিজস্ব 'সিগন্যাল কোর'-এর প্রধান জেনারেল ফেলজিয়েবেল যখন এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। হিটলার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন :

'Now I know why all my great plans in Russia had to fail in recent years. It was all treason ! But for those traitors, we would have won long ago. Here is my justification before history. Now we will find out whether Fellgiebel had a direct wire to Switzerland and passed all my plans on to the Russians.…'

'এক্ষণে আমি বুঝতে পারছি সাম্প্রতিককালের রাশিয়াতে আমার সমস্ত বড় বড় পরিকল্পনা কেন ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সমস্তই বিশ্বাসঘাতকতার ফল! যদি এই বিশ্বাসঘাতকগুলি না থাকত, তবে, অনেক দিন আগেই আমি জয়লাভ করতে পারতুম। ইতিহাসের সামনে এটাই আমার সাফাই। এক্ষণে আমার অনুসন্ধান করে দেখতে হবে যে, সুইজারল্যান্ডের (জেনেভাতে মার্কিন গোয়েন্দাচক্রের প্রধান অ্যালান ডালেসের সদর দপ্তর ছিল—লেখক) সঙ্গে ফেলজিয়েবেলের কোন প্রত্যক্ষ তার-সংযোগ ছিল কিনা এবং সে আমার সমস্ত প্ল্যান রুশদের কাছে জানিয়ে দিত কিনা।…'

সুতরাং হিটলার ক্রোধভরে প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি একে একে সমস্ত চক্রান্তকারীকে সংহার ও সাবাড় করিয়া ছাড়িবেন।[১]

হিটলার যে অক্ষরে অক্ষরে এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ছাড়িয়াছিলেন, তা' বলা বাহুল্য মাত্র। তখন গেস্টাপো পুলিশের ত্রাসের রাজত্ব সত্ত্বেও জার্মানীতে যে কয়েকজন ফ্যাসিস্ট-বিরোধী কর্মী ও নেতা কোনও প্রকারে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাঁরাও

ধরা পড়িলেন এবং যথারীতি নিহত হইলেন। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বিখ্যাত নেতা ছিলেন আর্নেস্ট থায়েলম্যান (Ernst Thælmann) তাকে বহু আগেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং ১১ বছর ধরিয়া জেলখানায় তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হইয়াছিল। তবু তিনি চরিত্রবল ও মনের বল হারান নাই। কিন্তু হিটলারের জীবননাশের চেষ্টার পর ১৯৪৪ সালের ১৪ই আগস্ট স্বয়ং হিটলার হুকুম দিলেন তাঁকে হত্যা করার জন্য। ১৭-১৮ই আগস্ট রাত্রে বুখেনভাল্ড বন্দীনিবাসে তাঁকে পিছন থেকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইল। তাঁর হত্যা যে আসন্ন, একথা অনুমান করিয়া তিনি তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি বাণী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সেই বাণীতে তিনি মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিজমকে রোধ করার জন্য দৃঢ় আহবান জানাইয়াছিলেন।···

* * *

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হিটলার ও তাঁর ঘাতকবাহিনী যে ভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া ছাড়িয়াছিলেন, ইতিহাসে সেই নজির যেমন একান্ত দুর্লভ, তেমনি ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে হিটলার যেভাবে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন তা'ও ইতিহাসের প্রায় নজিরবিহীন ঘটনার মত।

সপ্তম পর্ব

পঞ্চম অধ্যায়

বেলোরুশিয়ার মুক্তি এবং ওয়ারশর অভ্যুত্থান

১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে স্ট্যালিনগ্রাদ এবং গ্রীষ্মকালে বা জুলাই মাসে কুরস্কে জার্মানবাহিনীর বিপর্যয়ের পর পশ্চিমদিকে লালফৌজের যে দুর্বার গতি শুরু হইল, তার ফলে পূর্ব রণাঙ্গনে গোটা যুদ্ধের মোড়ই ঘুরিয়া গেল। অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালের হিটলারী আক্রমণাত্মক অভিযানে সোভিয়েত রাশিয়ার যে বিশাল ভূমি নাৎসী দখলে চলিয়া গিয়াছিল, ১৯৪৩ সালের শেষভাগে সেই ভূমির দুই-তৃতীয়াংশেরই মুক্তি ঘটিল লালফৌজের হাতে। কিন্তু তখন পর্যন্ত জার্মানীর দখলে রহিয়া গেল পশ্চিম উক্রাইন, বেলোরুশিয়া এবং বালটিক রাজ্যগুলি। কিন্তু ১৯৪৪ সালের অভিযানে সমগ্র সোভিয়েতভূমি থেকেই জার্মানবাহিনী বিতাড়িত হইল এবং শুরু হইল পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতবাহিনীর প্রবেশ, আর সেই সঙ্গে দেখা দিল রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক জটিলতা—বিশেষভাবে পোল্যান্ড ও বলকান রাজ্যগুলির প্রশ্নে।

কিন্তু সেকথা আলোচনা করার আগে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার ১০টি বড় রকমের জয় অনুষ্ঠিত হইল, যেগুলির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কেননা, এই সমস্ত জয়লাভের ফলেই লালফৌজের নিকট খাস জার্মানীতে প্রবেশের সদর দুয়ার খুলিয়া গেল। অবশ্য এজন্য লালফৌজকে প্রচুর মূল্যও দিতে হইয়াছিল। কেননা, জার্মান প্রতিরোধের তীব্রতা তখনও কম ছিল না। কিন্তু যে দশটি উল্লেখযোগ্য জয় সোভিয়েতবাহিনী অর্জন করিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে প্রথমেই ছিল:

১. লেনিনগ্রাদের অবরোধ মুক্তি। ত্রিশমাস বা আড়াই বছরের ভয়াবহ অবরোধ যুদ্ধের পর সোভিয়েতবাহিনীর পালটা-আক্রমণে জার্মান বেষ্টনী সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িল এবং লেনিনগ্রাদের পূর্ণ মুক্তি ঘটিল।

২. ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসে নীপার, বুগ, ডিনিস্টার ও প্রুথ নদী পার হইয়া লালফৌজ ঢুকিয়া পড়িল সোজা রুমানিয়ায়। অবশ্য সেখানে বা উত্তর রুমানিয়ায় কয়েক মাসের জন্য তাদের গতি রুদ্ধ হইল।

৩. এপ্রিল মাসে ওডেসা এবং মে মাসে ক্রিমিয়া সম্পূর্ণরূপে শত্রুমুক্ত হইল।

৪. জুন মাসে ফিনল্যান্ড পরাজিত হইল। ক্যারেলিয়ান যোজক অতিক্রম করিয়া সোভিয়েত সৈন্যেরা ভীবুর্গ বা ভীপুরি দখল করিয়া নিল এবং ১৯৪০ সালের সীমান্তে (সেই বছর রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি অনুসারে স্থিরীকৃত) পেঁাছিয়া লালফৌজ আর রাজধানী হেলসিঙ্কির দিকে অগ্রসর হইল না।

৫. মার্চ মাসে বেলোরুশিয়ার মুক্তি ঘটিল এবং ৩০ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ঘায়েল হইল, পূর্ব পোল্যান্ডের একটি সুবৃহৎ অংশ লালফৌজের হাতে আসিল (অস্থায়ী রাজধানী লুবলিন সহ)। সেই সঙ্গে প্রায় সমগ্র লিথুয়ানিয়ারও মুক্তি

ঘটিল। আর নিয়েমেন নদী পার হইয়া সোভিয়েট সৈন্যেরা পূর্ব প্রুশিয়ার সীমান্তে পেঁাছিল।

৬. জুলাই মাসে লালফৌজ পশ্চিম উক্রাইনকে শত্রু কবল থেকে উদ্ধার করিল এবং ওয়ারশর দক্ষিণে ভিশ্চুলা নদীর পশ্চিম তীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুমুখ স্থাপন করিল, কিন্তু ওয়ারশ দখল করিতে পারিল না। অন্য স্থানের তুলনায় জার্মানী পোল্যাণ্ডে সবচেয়ে বেশী শক্তির সমাবেশ করিয়াছিল।

৭. আগস্ট মাসে সোভিয়েট সৈন্যেরা রুমানিয়ার জেসি-কিসিনেভ এলাকায় আঘাত হানিয়া জার্মান ও রুমানিয়ান ডিভিসনগুলিকে ঘায়েল করিল এবং রুমানিয়ার আত্মসমর্পণ আসন্ন করিয়া তুলিল। তারা বুলগেরিয়া ছাইয়া ফেলিল, হাঙ্গেরীয় সীমান্তে পেঁাছিল এবং যুগোশ্লাভদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিল।

৮. সেপ্টেম্বর মাসে এস্তোনিয়া ও ল্যাটভিয়ার মুক্তি ঘটিল—যদিও কিছু জার্মান সৈন্য এই অঞ্চলে রহিয়া গেল একেবারে জার্মানীর আত্মসমর্পণের সময় পর্যন্ত।

৯. অক্টোবর মাসে লালফৌজ হাঙ্গেরী ও পূর্ব চেকোশ্লভাকিয়ায় ঢুকিয়া পড়িল এবং যুগোশ্লাভদের সঙ্গে সহযোগিতায় বেলগ্রেদের উদ্ধার করিল। বুদাপেস্ট দখলের জন্য জার্মানদের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ চলিল কয়েকমাস ধরিয়া—পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাসের আগে অবশ্য শহরের উদ্ধার ঘটিল না।

১০. অক্টোবর মাসে লালফৌজ ফিনল্যাণ্ডের একেবারে উত্তরবর্তী অঞ্চলে আক্রমণ করিল, পেটসামো দখল করিয়া নিল এবং উত্তর নরওয়ের সীমায় পেঁছিল।[১]

১৯৪৪ সালের এই জয়গুলির জন্য সোভিয়েতবাহিনীকে যে প্রচুর রক্তের মূল্য দিতে হইয়াছিল, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

* * *

পূর্ব পোল্যাণ্ডের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন বেলোরুশিয়াতে ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম-কালে ২৩শে জুন লালফৌজ যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল, তার জন্য জার্মানী প্রস্তুত ছিল না। কারণ, জার্মানদের বিশ্বাস ছিল যে, রুশ আক্রমণ ঘটিবে রণাঙ্গনের দক্ষিণে—প্রিপেট জলাভুমি ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী এলাকায়।

তখন পশ্চিমদিকে ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিন বা মিত্রপক্ষ দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিয়াছিলেন এবং সেখানে জার্মানীর মোট লড়িয়ে সৈন্যের শতকরা ৩০ ভাগ রণলিপ্ত ছিল। সুতরাং এতদিন পরে জার্মানী দুই রণাঙ্গনের যুদ্ধের বিপদে পড়িল যে বিপদের বিরুদ্ধে অতীতে ইম্পিরিয়েল জার্মানীর সমরবিশেষজ্ঞরা বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ খুব গোপনে ও সতর্কতার সঙ্গে বেলোরুশিয়াতে বিপুল ও বিশাল সৈন্য ও সমরসম্ভারের সমাবেশ ঘটাইয়া ছিলেন। ১৬৬ ডিভিসন সোভিয়েত সৈন্য (কিন্তু জার্মানীর মতে মোট ১৮৩ ডিভিসন) এখানে যখন অতর্কিতে আক্রমণ চালাইল, তখন জার্মান পক্ষ এই আকস্মিক আক্রমণে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। বেলোরুশিয়া দখলকারী জার্মানবাহিনীর অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল ফন বুশ বেগতিক দেখিয়া হিটলারের কাছে অনুমতি চাহিলেন পশ্চাদপসরণের জন্য। ফলে, বুশ পদচ্যুত হইলেন এবং তাঁর বদলে আসিলেন ফিল্ড মার্শাল মডেল, যিনি কুর্স্কের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন।

১। রাশিয়া অ্যাট ওয়ার—আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৮৮৭-৮৮।

লালফৌজের এই গ্রীষ্মাভিযান শুরু হইয়াছিল ৪৫০ মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে, পরে এই রণাঙ্গন বিস্তৃতি লাভ করিয়া ৬০০ মাইলে দাঁড়াইল। এই অভিযান চালাইবার জন্য চারটি পৃথক ফ্রণ্ট গঠিত হইয়াছিল। যেমন ঃ

১. জেনারেল বাগরামিয়ানের অধীন ১নং বাল্টিক্ ফ্রণ্ট।
২. জেনারেল চেরনিয়াখোভস্কির অধীন ৩নং বেলোরুশিয়ান ফ্রণ্ট।
৩. জেনারেল রকোসোভস্কির অধীন ১নং বেলোরুশিয়ান ফ্রণ্ট।
৪. জেনারেল জাখারোভের অধীন ২নং বেলোরুশিয়ান ফ্রণ্ট।

প্রথম দুইটি ফ্রণ্টের সর্বময় অধিনায়কত্বে ছিলেন মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি এবং শেষের দুইটি ফ্রণ্টের সর্বোচ্চ নায়কত্বে ছিলেন মার্শাল জুকোভ।

রুশপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, এতদিন পর তাঁরা জার্মানীর তুলনায় সব দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছেন। বেলোরুশিয়াতে তাঁদের সৈন্যসংখ্যা তো বেশী ছিলই—১৬৬ ডিভিসন (মজুত সৈন্যসহ), কামান ও মর্টার ৩১ হাজার, ট্যাঙ্ক ৫ হাজার ২ শত এবং প্লেন অন্ততঃ ৬ হাজার। অর্থাৎ আনুপাতিক হিসাবে জার্মানীর তুলনায় রাশিয়ার সৈন্যসংখ্যা ছিল দ্বিগুণ। কামান ও মর্টার আড়াই গুণেরও বেশী, ট্যাঙ্ক চার গুণেরও বেশী এবং প্লেন বা বিমান সাড়ে-চার গুণ। অধিকন্তু রণক্ষেত্রের যে সমস্ত অংশ দিয়া ব্যূহভেদ করা হইয়াছিল, সেখানে গোলন্দাজী শক্তি এত বেশী কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছিল যে, প্রতি মাইলে ৩২০টি কামান বসানো হইয়াছিল। আর খাদ্য, পেট্রোল এবং গোলাবারুদ অজস্র পরিমাণে সরবরাহ করা হইয়াছিল। এই চারিটি ফ্রণ্টের জন্য প্রতিদিন ১০০ খানা ট্রেন-ভর্তি সরবরাহ আসিতেছিল। এছাড়া প্রচুর সংখ্যায় লরী-ভর্তি সরবরাহও যোগান দেওয়া হইয়াছিল এবং এই লরীগুলি পাওয়া গিয়াছিল আমেরিকার কাছ থেকে। মোটর এম্বুলেন্সের এক বিরাট বহর প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল, আর আহত সৈন্যদের জন্য যে হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাতে ২ লক্ষ ৯৪ হাজার শয্যা ছিল। বেলোরুশিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার আয়োজন ও প্রস্তুতি অন্য যে কোন রণাঙ্গনের চেয়ে বেশী নিখুঁত করা করা হইয়াছিল। এমন কি, স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে যে সমস্ত সমরসম্ভার ও পরিবহণের অভাব ঘটিয়াছিল, এখানে সেগুলির কোন অভাব ছিল না।

বেলোরুশিয়ার যুদ্ধে আর-একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল জার্মান লাইনের পিছনে রুশ পার্টিজান সৈন্যদের কার্যকলাপ। এই গেরিলা যোদ্ধার দল রুশ আর্মি কমাণ্ডের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া জার্মান বাহিনীর পশ্চাদভাগে ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ঘটাইয়াছিল। বেলোরুশিয়ার সমস্ত রেল সংযোগ একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ফলে, জার্মান সরবরাহ ও সৈন্য চলাচলে তারা অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। জার্মানরা এর প্রতিশোধও নিয়াছিল ভয়াবহ! গ্রামের-পর-গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিল এবং সমস্ত গ্রামবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করিয়াছিল। বেলোরুশিয়াতে জার্মানদের হাতে ১০ লক্ষের অধিক সোভিয়েট নাগরিক খুন হইয়াছিল—পার্টিজানদের পরিবারের স্ত্রীলোক ও শিশুরাও রেহাই পায় নাই। বেলোরুশিয়ার অধিকাংশ স্থানই শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু এত অত্যাচার ও বর্বরতা সত্ত্বেও জার্মানরা লালফৌজের হাতে সর্বত্র পরাজিত হইতে লাগিল। বেলোরুশিয়ার রাজধানী পুরাতন শহর মিনস্ক মুক্তিলাভ করিল ৩রা জুলাই। লুবলিন দখল হইল ২৩শে জুলাই।

অর্থাৎ রকোসোভস্কির সৈন্যেরা পোল্যাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল, যার রাজনৈতিক ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। আর বিখ্যাত ব্রেস্ট-লিটোভস্ক লালফৌজের দখলে আসিল ২৮শে জুলাই। ফলে, সমগ্র বেলোরুশিয়া নাৎসী কবল মুক্ত হইল।

জার্মানরা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন (তাঁদের সামরিক মুখপাত্র) যে, সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধে বেলোরুশিয়ার মত শোচনীয় পরাজয় তাদের আর কোথাও হয় নাই—২৫ থেকে ২৮ ডিভিসন, অর্থাৎ কমপক্ষে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য খতম হইয়াছিল—'স্টালিনগ্রাদের চেয়েও যে বিপর্যয় ছিল বেশী'। স্বয়ং জার্মান জেনারেল গুডেরিয়ানও সেকথা স্বীকার করিয়াছেন যুদ্ধ পরবর্তীকালে।[১]

বেলোরুশিয়ার এই অসামান্য জয় কেবল পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না। ১নং উক্রাইন ফ্রণ্টসহ সমগ্র বাল্টিক রাজ্যগুলির বিভিন্ন ফ্রণ্টেও অনুকূল প্রতিক্রিয়া ঘটাইল এবং জার্মানরা এই সমস্ত পরাজয়ের ধাক্কা নামলাইয়া উঠিতে পারিল না। রুশ পক্ষ থেকে বলা হইয়াছে, আগস্টের শেষে রুশ-জার্মান ফ্রণ্টের এই সমস্ত গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধে উভয় পক্ষে মোট অফিসার ও সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ, কামান ও মর্টার ৮৫ হাজার, ট্যাঙ্ক ১১ হাজার এবং রণবিমান ১০ হাজার ৫ শত। পদানত ইউরোপ যেমন ক্রমশঃ মুক্তির দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিল, তেমনি জার্মানীর পতনও ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।[২]

কিন্তু ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ও সামরিক উভয়দিক দিয়া এক বিষম চাঞ্চল্যকর নাটকের অভিনয় শুরু—হইল যার ট্রাজিডির দিকটা কম মর্মান্তিক ছিল না।…

ওয়ারশর অভ্যুত্থান

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার-বিরোধী মহাজোট বা গ্রেট কোয়ালিশনের অংশীদার মিত্রপক্ষের মধ্যে যে সমস্ত সামরিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়া তীব্র মত-বিরোধ ঘটিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ড ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই পোল্যাণ্ড ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার একান্ত বিরোধী। সেখানকার শাসককুল এবং জমিদার ও ধনধান শ্রেণী কমিউনিজমের আশংকায় অত্যন্ত ভীত ছিল। ১৯৩৯ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত রাশিয়া যখন নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যৌথ নিরাপত্তার ও সামরিক মৈত্রী চুক্তির বিশদ প্রস্তাব নিয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আলোচনা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তখন তোষণনীতি বিশারদ চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের প্রভৃতি অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন তো বটেই, পোল্যাণ্ডও গররাজী হইল। তারপর হিটলারের দ্বারা আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত পোল্যাণ্ডের শাসককুল লণ্ডনে পলাইয়া গিয়া এক 'আশ্রয় প্রার্থী' বা 'নির্বাসিত গভর্নমেণ্টের' প্রতিষ্ঠা দিলেন—যে 'গভর্নমেণ্ট' ছিল বৃটেন ও আমেরিকার পৃষ্ঠপোষিত। সেই হিটলারী আক্রমণের সময় সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত রাশিয়া পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ দখল করিয়া নিয়াছিল জার্মানীর সহিত চুক্তি অনুসারে। কারণ, রাশিয়ার মতে ওই অংশ তাদেরই প্রাপ্য ছিল। এই প্রশ্ন নিয়া মিত্রশক্তির মধ্যে মহাযুদ্ধের পরেও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে

মতভেদ ছিল এবং লণ্ডনের 'পোলিশ গবর্নমেণ্ট' তো আগাগোড়াই রাশিয়ার উপর খাপ্পা ছিলেন—যদিও ১৯৪১ সালের ৩০শে জুলাই উভয় গভর্নমেণ্টের মধ্যে কিছু বুঝাপড়া এবং কূটনৈতিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাটিন অরণ্যের (যেখানে নিহত পোলিশ বন্দীদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল) প্রশ্ন নিয়া এই সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গেল।···

১৯৪৪ সালে লালফৌজের গ্রীষ্মকালীন অভিযানে বেলোরুশিয়া ও পূর্ব পোল্যাণ্ডের মুক্তির সঙ্গে ২৩শে জুলাই লুবলিন শহরের মুক্তি ঘটিল এবং এই শহরে লণ্ডনের পোলিশ কমিটি বা তথাকথিত গভর্নমেণ্টের পালটা একটি পোলিশ ন্যাশনাল লিবারেশন কমিটি গঠিত হইল এবং শীঘ্রই এই নূতন সংগঠন লুবলিন কমিটি নামে পরিচিত হইল। সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট ছিলেন এই কমিটির পৃষ্ঠপোষক এবং ইতিমধ্যে একটি পোলিশ আর্মিও রাশিয়াতে গঠিত হইয়াছিল। সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করিলেন যে, যেহেতু পোল্যাণ্ড একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র, সেহেতু রাশিয়া পোল্যাণ্ডে কোন প্রশাসনিক সংগঠন স্থাপন করিবেন না, পোল্যাণ্ডের কোন অংশও তাঁরা দখল করিয়া নিবেন না এবং একমাত্র শত্রুকে উৎখাত করার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজনে ছাড়া তাঁরা পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরেও ঢুকিবেন না। পোল্যাণ্ডের সরকারী শাসনের দায়িত্ব লুবলিন কমিটির উপর এবং এই কমিটিকে সোভিয়েত সরকার সহায়তা দিবেন, পোল্যাণ্ডে একটি গণতান্ত্রিক শক্তিশালী গবর্নমেণ্ট গঠনের জন্য। লালফৌজের সঙ্গে পোলিশ আর্মিও একত্রে পোল্যাণ্ডের মুক্তি অভিযান চালাইবে এবং লুবলিন কমিটি সোভিয়েট হাইকমাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবে। এই কমিটির মধ্যে সোসিয়েলিস্ট ও কমিউনিস্ট উভয় মতবাদের সদস্য ছিলেন এবং কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হইল যে, তাঁরা বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং ফ্রান্সের সঙ্গে 'ঐতিহ্যগত বন্ধুতার সম্পর্ক' বজায় রাখিবেন।···

এদিকে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ'তে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী বা পার্টিজান বাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বভাবতঃই তাঁরা আত্মগোপনকারী কিংবা 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড'-এ থাকিয়া কাজ করিতেছিলেন এবং নাৎসী বাহিনী ও গেস্টাপোর অমানুসিক অত্যাচার ও বর্বরতা সত্ত্বেও তাঁরা পোল্যাণ্ডের মুক্তির জন্য কর্মতৎপরতা চালাইতেছিলেন। এই প্রতিরোধ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন বোর-কোমারাভস্কি (Bor-Komarowski) এবং লণ্ডনের পোলিশ কমিটি বা 'গবর্নমেণ্টে'র প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মিকোলাজিকে (Mikolajczyk)। তিনি পোলিশ সমস্যার একটি আপোস-মীমাংসার উদ্দেশ্যে লণ্ডন থেকে মস্কো যাওয়ার আগে তাঁর "মন্ত্রিসভার" সিদ্ধান্ত অনুসারে জেনারেল বোরকে এই ক্ষমতা অর্পণ করিয়া গেলেন যে, তিনি যখন উপযুক্ত মনে করিবেন, তখনই ওয়ারশ'তে জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানাইতে পারিবেন। এই রণক্রিয়ার সাংকেতিক নাম রাখা হইল "অপারেশন টেম্‌পেস্ট" (Tempest)। সুতরাং জেনারেল বোর উপযুক্ত মুহূর্তের জন্যঅধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।[১]

অর্থাৎ জেনারেল বোরের অধীন প্রতিরোধবাহিনী বা হোম আর্মি ছিল লণ্ডনের সোভিয়েত-বিরোধী পোলিশ কমিটি বা 'গবর্নমেণ্টের' অনুচর মাত্র। এঁরা মনে

১। Herbert Feis—Churchill, Roosevelt, Stalin, P. 379.

করিলেন যে, লালফৌজ যখন দুর্বার গ্রীষ্মাভিযানে পূর্ব পোল্যান্ড জয় করিয়া ভিশ্চুলা নদীর ধারে আসিয়া পেঁাছিয়াছে, তখন তাদের পক্ষে রাজধানী ওয়ারশতে প্রবেশের আর বিলম্ব নাই। সুতরাং জেনারেল বোরের পক্ষে জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের এটাই উপযুক্ত সময়। অতএব 'অপারেশন টেম্পেস্ট' অনুযায়ী তিনি ১লা আগস্ট তারিখ পোলিশ স্বরাষ্ট্র বাহিনীকে (হোম আর্মি) অভ্যুত্থানের জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনীর পক্ষ থেকে ওয়ারশতে প্রবেশ তো ঘটিলই না, উপরন্তু সেই সময় কোন সাহায্যও আসিল না। যদিও জেনারেল বোরের অধীন সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০ হাজারের মত এবং ও গোলাগুলি ছিল সাত দিন চলার মত। তথাপি ওয়ারশর এই অভ্যুত্থানে ৩ লক্ষ পোলিশ জড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বর দুই মাস ধরিয়া ওয়ারশর অভ্যন্তরে যে ভয়াবহ যুদ্ধ, বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস ঘটিল, পোল্যান্ডের ইতিহাসে তার তুলনা নাই। অবশেষে ২রা অক্টোবর তিনলক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়ে জেনারেল বোর-কোমারভস্কি জার্মানদের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইলেন। ওয়ারশ অভ্যুত্থানের এর চেয়ে বড় ট্রাজিডি বা মর্মান্তিক ঘটনা আর কি হইতে পারে ?

যদিও লণ্ডনের পোলিশ কমিটির নেতারা এবং তাঁদের পক্ষপাতী ইঙ্গ-মার্কিন মহলের সোভিয়েত বিরোধীরা এটাকে রাশিয়ার 'বিশ্বাসঘাতকতা' এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজ বলিয়া তীব্র নিন্দা ও প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন, তথাপি আসলে এটা কোন বিশ্বাসঘাতকতার কিংবা স্বেচ্ছাকৃত অবহেলার বিষয় ছিল না।

'১লা আগস্ট তারিখ যখন ওয়ারশর হোম আর্মিকে অভ্যুত্থানের জন্য ডাক দেওয়া হইল, তখনই পরিষ্কার বুঝা গেল যে, এর জন্য কোন উপযুক্ত প্রস্তুতি ঘটানো হয় নাই। তাড়াহুড়া করিতে গিয়া বিদ্রোহের সংগঠকরা স্বরাষ্ট্রবাহিনীর অনেক ইউনিটকে এবং অন্যান্য ভুগর্ভের সংগঠনকে পূর্বাহ্নে নোটিশ পর্যন্ত দিতে পারেন নাই। অস্ত্র ও গোলাবারুদের যথেষ্ট অভাব ছিল। ফলে, তাঁরা বিষম অসুবিধার মধ্যে পড়িলেন, তাঁরা কোন সামরিক গুরুত্বপূর্ণস্থান, যেমন রেলওয়ে স্টেশন, ব্রীজ ইত্যাদি দখল করিতে পারেন নাই এবং তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী জার্মানবাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে বা হটাইয়া দিতে পারেন নাই—যদিও দলে দলে বীর পোলিশ জনগণ এই অভ্যুত্থানে যোগ দিয়াছিলেন এবং স্ত্রীলোক, শিশু ও সাধারণ নাগরিকেরা প্রাণ হারাইয়াছিলেন।'……

'যদি লালফৌজ ভিশ্চুলা নদী অতিক্রম করার পর এই অভ্যুত্থান ঘটিত, তবে এই প্রতিরোধ অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিত। কিন্তু বিদ্রোহের সংগঠকগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা অন্ধ হওয়ার ফলে পূর্ব রণাঙ্গনের সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই।··· বেলোরুশিয়া, পশ্চিম উক্রাইন ও লিথুয়ানিয়ায় ক্রমাগত ৪০ দিন ধরিয়া একটানা যুদ্ধের এবং প্রচণ্ড ক্ষয় ক্ষতির পর লালফৌজের দম ফুরাইয়া গিয়াছিল এবং পুনর্গঠনের জন্য তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল। একথা জার্মান সেনাপতি টিপেলস্কার্শ পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন।'[১]

মস্কোতে মিকোলাজিককে লুবলিন কমিটি ও লণ্ডন কমিটির মধ্যে আপোস-মীমাংসার জন্য তিন দিন ধরিয়া যে সমস্ত আলোচনা চালাইলেন, তাতে কোন মীমাংসা হইল না।

৯ই আগস্ট স্ট্যালিনের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনার সময় তিনি যখন ওয়ারশর অবস্থার কথা উল্লেখ করিলেন, তখন স্ট্যালিন জবাব দিলেন যে, তিনি তিনদিন আগেই (৬ই তারিখ) ওয়ারশ দখল করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন সময় ৪টি জার্মান যান্ত্রিক ডিভিসন ও অন্যান্য ডিভিসন আসিয়া পড়ায় তাঁর সৈন্যেরা আর ভিশ্চুলা নদী পার হইতে পারিলেন না।[১]

রুশ পক্ষের আরও বক্তব্য এই যে, ওয়ারশর এই অভ্যুত্থানের পিছনে লণ্ডনের পোলিশ কমিটির রাজনৈতিক মতলববাজি তো ছিলই, অধিকন্তু মার্কিন ও বৃটিশ মহলের সোভিয়েত-বিরোধীরাও এর পিছনে মদত দিয়াছিলেন।

জি. ডেবোরিন লিখিয়াছেন যে, অসময়ের এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইতে বাধ্য ছিল।

'Although the uprising was against the German occupation forces, its purpose was political. It was to shone that the Polish emigre government was still influential in Poland, with the Polish reactionaries hoping to appear as national liberators and assume control over the national liberation movement. The reactionaries thought this would be best served by seizing control over Warsaw, if only for a few hours.'[২]

অর্থাৎ সংক্ষেপে—যদিও এই অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল জার্মান দখলদারির বিরুদ্ধে, তবু এর পিছনে ছিল রাজনৈতিক মতলব। একথা প্রমাণ করা যে, আশ্রয়প্রার্থী (লণ্ডনের) গবর্নমেণ্টের এখনও পোল্যাণ্ডে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে এবং তাঁরাই আসলে পোলিশ জাতির মুক্তির নায়ক। সুতরাং ওয়ারশ দখলে আনা দরকার—এমন কি মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য হইলেও ওয়ারশর উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োজন।

অতঃপর ডেবোরিন মন্তব্য করিয়াছেন যে, যখন ১লা আগস্ট ওয়ারশর অভ্যুত্থান ঘটিল, তখন পর্যন্ত লালফৌজ ওয়ারশর ধারে-কাছে ভিশ্চুলা নদীর তীরেও পেঁছিতে পারেন নাই। কেবল দক্ষিণ দিকের পশ্চিম তীরে একটা সামান্য সেতুমুখ মাত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কার্যতঃ ১৪-১৫ই সেপ্টেম্বরের আগে সোভিয়েত সৈন্যেরা ১নং পোলিশ আর্মির সহযোগিতায় ভিশ্চুলা নদীর পূর্ব তীরে ওয়ারশর উপকণ্ঠে প্রাগা নামক শহরটি দখল করিতে পারেন নাই।…অথচ অভ্যুত্থানের সাহায্য করিতে অনেক সৎ ও দেশপ্রেমিক পোল নরনারী আগাইয়া আসিয়াছিলেন।…[৩]

* * *

কিন্তু ওয়ারশ অভ্যুত্থানের এই গভীর ট্রাজিডি উপলক্ষে চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে যে সমস্ত বার্তা বিনিময় হইয়াছিল, তাতে ছিল এক দিকে চার্চিলের ক্রমবর্ধমান বিরক্তির সুর এবং অন্যদিকে স্ট্যালিনের ক্রুদ্ধ মনোভাবের প্রকাশ। চার্চিলের বিরক্তির কারণ এই যে, ওয়ারশর অভ্যুত্থানের প্রতি রাশিয়ার সহানুভূতি ও সহযোগিতার অভাব, আর স্ট্যালিনের রাগের কারণ এই যে, রাশিয়ার সঙ্গে পরামর্শ ও যোগাযোগ না করিয়াই অত্যন্ত অসময়ে এই অভ্যুত্থান ঘটানো হইয়াছে। অথচ অভ্যুত্থানকারীদের না আছে

কামান, না আছে বিমান, না আছে ট্যাংক। অপর পক্ষে জার্মানরা চারটি পুরাপুরি বর্মাবৃত ডিভিসন নিয়া পোলদের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল।

কিন্তু চার্চিলের গভীর সন্দেহ এই ছিল যে, রুশরা ভিশ্চুলা নদীর কাছে পৌঁছিয়াও ইচ্ছা করিয়াই আর ওয়ারশর দিকে অগ্রসর হয় নাই এবং বিদ্রোহকারী পোলদেরও কোন সহায়তা দেয় নাই। অথচ রুশরা ইচ্ছা করিলেই বিমানযোগে খাদ্য, অস্ত্র ও সমরসম্ভার যোগান দিতে পারিত। কিন্তু যেহেতু লণ্ডনে 'পোলিশ গবর্নমেণ্টের' নির্দেশে এই অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে সেজন্যই রাশিয়া ওয়ারশর মুক্তিকামী পোলদের প্রতি বিরূপ হইয়াছে।

এই সমস্ত ঘটনা লইয়া লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনের সংবাদপত্রেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমালোচনা হইতেছিল। এমন কি, রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিল যে, মিত্রপক্ষের যে সমস্ত বিমান দূরবর্তী ইতালী থেকে অনেক কষ্টে ওয়ারশতে কিছু কিছু সরবরাহ দিতেছিল, সেই সমস্ত বিমানকে ফিরিবার পথে রুশ লাইনের পিছনে অবতরণ করিতে পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। কারণ, 'ওয়ারশর এই এ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে সোভিয়েট সরকার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনভাবেই জড়িত থাকিতে চাহেন না।'

তখন নাৎসী-বিরোধী বিশ্বজনমতের দোহাই দিয়া চার্চিল-রুজভেল্ট একত্রে স্ট্যালিনের নিকট একটি আবেদন পাঠাইলেন (২০শে আগস্ট) এবং তার উত্তরে স্ট্যালিন জানাইলেন যে, আজ হোক, কাল হোক ওয়ারশর এই 'মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী ক্রিমিন্যালদের স্বরূপ' প্রকাশিত হইবেই। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই কার্যের দ্বারা নিরস্ত্র পোলদেরকে জার্মান কামান বন্দুক ও ট্যাংকের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এর দ্বারা ওয়ারশর মুক্তি ঘটিতেছে না, বরং হিটলারী ঘাতকেরা প্রতিদিন অসামরিক জনগণকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে সাবাড় করিতেছে।

স্ট্যালিন তাঁর এই জবাবে আরও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, বর্তমান সামরিক পরিস্থিতি লালফৌজের অগ্রগতির পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক। কারণ, জার্মানরা নূতন করিয়া পালটা আক্রমণ চালাইতেছে। তবে তিনি এই ভরসাও দিলেন যে, শীঘ্রই লালফৌজ ওয়ারশ দখল ও জার্মানদের চূর্ণ করার জন্য পালটা-অভিযানে অবতীর্ণ হইবে এবং পোলদের অনুকূলে ওয়ারশর মুক্তি বিধান করিবে…

কিন্তু স্ট্যালিনের এই জবাব সত্ত্বেও চার্চিল রুশদের 'দূরভিসন্ধি' সম্পর্কে সন্দেহ-মুক্ত হইলেন না। কারণ, ওয়ারশর এই অভ্যুত্থানের আগে মস্কো রেডিও থেকে এই অভ্যুত্থান ঘটাইবার জন্য বার বার আহ্বান জানানো হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে যখন রুশপক্ষকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তখন তাঁরা জবাব দিলেন যে, এগুলি ছিল রেডিওর মামুলি প্রচারকার্য মাত্র।

ওয়ারশতে জার্মানদের বর্বরতার দৃষ্টান্ত হিসাবে চার্চিল উল্লেখ করিয়াছেন যে, হাসপাতালে প্রবেশ করিয়া তারা আহত ও রুগ্ন পোল নরনারীদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত। যখন তারা তাদের কোন ঘাঁটিতে সরবরাহ নিয়া যাইত, তখন তারা তাদের ট্যাংকগুলির সম্মুখে পোল স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে আগে আগে তাড়া করিয়া নিয়া যাইত। প্রতিরোধকারী পোল সৈন্যেরা যাতে গুলি চালাইতে না পারে, তার জন্যই এই অমানুষিক কৌশল অবলম্বন করা হইত।

ওয়ারশর আত্মগোপনকারী বা আণ্ডারগ্রাউণ্ডের পোল সৈন্যদের এই যুদ্ধের

বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চার্চিল মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই যুদ্ধটাও আসলে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বা ভুগর্ভেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ, পোলরা বিভিন্ন রণক্ষেত্রের খণ্ডাংশের সঙ্গে নর্দমার ভিতর দিয়া যোগাযোগ রক্ষা করিত। আর জার্মানরা ম্যানহোলের ভিতর দিয়া হাত বোমা এবং গ্যাস বোমা ছুঁড়িয়া মারিত। যুদ্ধটা ঘটিত ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে এক কোমর নোংরার মধ্যে দাঁড়াইয়া, সময় সময় ছোরা হাতে পরস্পর হাতাহাতি যুদ্ধ করিত এবং পরস্পরকে নোংরা জলকাদার মধ্যে চুবাইয়া মারিতে চেষ্টা করিত। আর মাটির উপর জার্মান গোলন্দাজ সৈন্যেরা শহরের এক-একটা অংশের বাড়ীঘর সব জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া দিত।[১]

* * *

ওয়ারশর অভ্যুত্থান নিয়া রুশদের বিরুদ্ধে সমালোচনা সত্ত্বেও রাশিয়ার সরকারী ইতিহাসে কিন্তু দাবী করা হইয়াছে যে, ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবরের মধ্যে (জেনারেল বোরের আত্মসমর্পণের মুহূর্তে) ওয়ারশতে রুশ বিমান প্রচুর খাদ্য, অস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার সরবরাহ করিয়াছে এবং এজন্য সোভিয়েট বিমানগুলি অন্ততঃ দুই হাজার বার ওয়ারশর আকাশে উড়িয়াছে।

আর ১লা আগস্ট থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে বেলোরুশিয়ার রণক্ষেত্রে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার এবং দ্বিতীয় উক্রাইনীয়ান রণক্ষেত্রে (একমাত্র আগস্ট মাসে) ১ লক্ষ ২২ হাজার সোভিয়েত সৈন্য হতাহত হইয়াছে। সুতরাং ওয়ারশ বা পোল্যাণ্ডের জন্য সোভিয়েত রাশিয়াকে কম মূল্য দিতে হয় নাই. এবং রাশিয়া ইচ্ছা করিয়াই ওয়ারশর অভ্যুত্থানকারীদের কোন সাহায্য দেয় নাই, এই অভিযোগ সত্য কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই গভীর সন্দেহ আছে। কারণ, পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর তদানীন্তন অধ্যক্ষ জেনারেল গুডেরিয়ান বলিয়াছেন যে, জার্মানবাহিনীর সফল প্রতিরোধের জন্যই ২৫শে জুলাই ডেবলিনের নিকট লালফৌজ ভিশ্চুলা নদী অতিক্রম করিতে পারে নাই এবং আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে রুশেরা ওয়ারশ দখলের জন্য যে গুরুতর চেষ্টা করিয়াছিল, তা'ও জার্মানদের বাধা দানের জন্য সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ওয়ারশর অভ্যুত্থান 'অত্যধিক আগে' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।...

ওয়ারশ'তে জার্মানবাহিনীর এত তীব্র বাধা দানের কারণ এই যে, ওয়ারশ হইতেছে জার্মানীর মর্মস্থলে পৌঁছিবার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম রাস্তা। সুতরাং হিটলার কেবল বাধা দেন নাই, ওয়ারশ শহরকে গুঁড়া গুঁড়া করিয়া ধ্বংস করারও নির্দেশ দিয়াছিলেন। কার্যতঃ জার্মানবাহিনী সেই হুকুম পালনও করিয়াছিল। কারণ, ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে লালফৌজ যখন ওয়ারশতে প্রবেশ করিল, তখন প্রায় সমগ্র শহর (১০ ভাগের ৯ ভাগ) ধ্বংসস্তুপে পরিণত![২]

ওয়ারশর এই যুদ্ধে চার্চিলের মতে জার্মানবাহিনীর ১০ হাজার নিহত, ৭ হাজার নিখোঁজ এবং ৯ হাজার আহত হইয়াছিল।

কিন্তু আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ওয়ারশ'তে ৩ লক্ষ পোলিশ নর-নারী অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিল এবং নাৎসী-অধিকৃত সমগ্র পোল্যাণ্ডে যেন বর্বরতার বান ডাকিয়াছিল।

১। চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২১-২২।
২। আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ—পৃষ্ঠা ৭৮৯-৯০।

সপ্তম পর্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্যারিসের মুক্তি

১৯৪৪ সালের ৪ঠা জুন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইতালীর রাজধানী রোম দখল করিয়া নিল। অথবা বলা যাইতে পারে যে, পরাজিত জার্মানরা রোম এলাকা ছাড়িয়া একেবারে উত্তরদিকে চলিয়া গেল এবং মিত্রবাহিনী বিনা বাধায় রোমে প্রবেশ করিল। এর দুই দিন পর ৬ই জুন মিত্রপক্ষ ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম উপকূল নরম্যাণ্ডিতে অবতরণ করিলেন। কিন্তু জার্মানদের তুলনায় অনেক বেশী সমরশক্তি থাকা সত্ত্বেও ২৫শে আগস্ট কিংবা তিন মাসের আগে মিত্রবাহিনী প্যারিসে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। ১৯৪০ সালের মে-জুন মাসে ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে ঐতিহাসিক জয়লাভের পর হিটলারী বাহিনী ১৪ই জুন প্যারিসে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেই প্যারিস থেকে তারা নিষ্ক্রান্ত হইতে বাধ্য হইল চার বছর পর ১৯৪৪ সালের ২৫শে আগস্ট।

মে মাস থেকেই নাৎসী সামরিক মহল মিত্রপক্ষের অবতরণের আশংকা করিতেছিল। কিন্তু গোয়েন্দাদের ভুল রিপোর্টের ফলে তাদের ধারণা হইয়াছিল যে, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পা দ্য ক্যালেতে অবতরণ করিবে এবং জেনারেল আইজেনহওয়ারও সেই ধরনের একটা ধাপ্পা দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমদিকে আক্রমণের এই আশংকা সত্ত্বেও জার্মান হাইকম্যাণ্ড পূর্ব রণাঙ্গণে সোভিয়েট বাহিনীর নূতন অভিযানে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইতালী, স্কাণ্ডিনাভিয়া, এমন কি পশ্চিম ইউরোপ থেকে কয়েক ডিভিসন সৈন্য পূর্বদিকে পাঠাইয়া দিলেন। মহাযুদ্ধের সময় বি.বি.সি.-র বিখ্যাত সামরিক সংবাদদাতা চেস্টার উইলমট তাঁর বইতে ('দি স্ট্রাগল ফর ইউরোপ') লিখিয়াছেন যে, ফ্রান্সের উপর নজর রাখা সত্ত্বেও জার্মান হাইকম্যাণ্ড সোভিয়েট রণাঙ্গন সম্পর্কে কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটান নাই বরং ফ্রান্স রক্ষাকারী জেনারেল ফন রুন্ডস্টেডের সর্বোৎকৃষ্ট চারটি ডিভিসন পূর্বদিকে পোল্যাণ্ড অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। এর ফলে মিত্রপক্ষ উপলব্ধি করিলেন যে, পশ্চিম ইউরোপে তাঁদের অবতরণ ও অভিযান ঠেকাইতে গিয়া হিটলার কোন কেন্দ্রীয় রিজার্ভ বাহিনীর সহায়তা পাইবেন না এবং অন্য কোন রণাঙ্গন থেকে সৈন্যও আনাইতে পারিবেন না।

অধিকন্তু ১৯৪৪ সালের বসন্তকালে স্ট্যালিন চার্চিল ও রুজভেল্টকে জানাইয়া দিলেন যে, পশ্চিম ইউরোপে মিত্রপক্ষের অভিযানে যথাসাধ্য সহায়তা করার জন্য সোভিয়েট বাহিনী তেহরান চুক্তি অনুসারে নূতন আক্রমণে অবতীর্ণ হইবে।[১]

সোভিয়েট রাশিয়া মিত্রপক্ষের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল, ৬ই জুন মিত্রবাহিনী নরম্যাণ্ডি উপকূলে অবতরণ করিল। আর ১০ই জুন সোভিয়েট বাহিনী লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া ক্যারেলিয়ান যোজকের প্রতিরক্ষার ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

১। Correspondence...Vol. II, P. 138

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে পূর্ব রণাঙ্গণে সোভিয়েট বাহিনী যেন তরঙ্গের-পর-তরঙ্গের-মত জার্মানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং এভাবে পূর্বে ও পশ্চিমে আক্রান্ত হইয়া জার্মানবাহিনী ফ্রান্সে দ্রুত পরাজয় মানিতে বাধ্য হইল। মিত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইজেনহাওয়ার রাজধানী প্যারিস নগরীকে অক্ষত অবস্থায় পুনর্দখল করিতে চাহিলেন এবং এজন্য তিনি শহরের উপর বোমা বর্ষণে ক্ষান্ত রহিলেন। জার্মানীর দিকে আরও আগাইয়া যাওয়ার জন্য তিনি পেট্রোল এবং গোলাগুলিও যথাসম্ভব বাঁচাইতে চাহিলেন। অর্থাৎ অবিলম্বেই প্যারিস দখলের গরজ তাঁর ছিল না। কিন্তু নগরীর অভ্যন্তরে যে সমস্ত কাণ্ড ঘটিতেছিল, তা'তে আইজেনহাওয়ার হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসের প্রথম তিন সপ্তাহ যখন সংকটজনক ছিল, তখন প্যারিসে যে সমস্ত জার্মান সৈন্য অবস্থান করিতেছিল, তারা শহর থেকে নিষ্ক্রমণের জন্য তাড়াহুড়া লাগাইয়া দিল। অবশ্য এই পলায়মান জার্মান সৈন্যদের অনেকে রাস্তায় বা নদী অতিক্রম করিতে গিয়া মারাও পড়িল। তখন প্যারিসে আত্মগোপনকারী ফরাসী যোদ্ধারা স্থির করিলেন যে, আর অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। সুতরাং ১৯শে আগস্ট, ১৯৪৪, ফাইটিং ফ্রান্সের ২০ হাজারের অধিক সদস্য প্যারিসে জার্মানবাহিনীর ছাউনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তখন আইজেনহাওয়ারও আগাইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

মার্কিন বাহিনী উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিক থেকে প্যারিসকে ঘিরিয়া ধরার জন্য অর্ধবৃত্তাকারে অগ্রসর হইল। কিন্তু প্যারিসের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছিয়া মার্কিন ট্যাংকগুলি সহসা থামিয়া গেল। কারণ, জেনারেল ব্রাডলি একজন ফরাসী সেনাপতিকে মনোনীত করিলেন প্রথম ফ্রান্সের রাজধানীতে প্রবেশ করার গৌরব অর্জনের জন্য। ইনি হইলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জ্যাক ফিলিপ ল ক্ল্যার, যিনি আফ্রিকার যুদ্ধে সাহারা মরুভূমি অতিক্রমণের আশ্চর্য দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন (মণ্টগোমারীর অষ্টম বাহিনীর সঙ্গে)।

২৫শে আগস্ট ১৯৪৪, বেলা ২টার সময় জেনারেল ল ক্ল্যার ১০ হাজার জার্মান সৈন্যের আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করিলেন। চার বছর নাৎসী কবলে থাকার পর প্যারিসের মুক্তি ঘটিল এবং পরদিন জেনারেল দ্য গল আসিয়া হাজির হইলেন। মুক্তিপ্রাপ্ত প্যারিসের নাগরিকেরা আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনদিনব্যাপী উৎসবে মত্ত হইলেন। দ্য গল পায়ে হাঁটিয়া জনতার সঙ্গে আগাইয়া চলিলেন।···

কিন্তু ফ্রান্সের এই মুক্তির ব্যাপারেও বৃটিশ ও মার্কিন মহলের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এমনভাবে অগ্রসর হইতে চাহিল যাতে সাম্যবাদ-বিরোধী ও নাৎসী পক্ষপাতী উপাদানগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া না যায় এবং সোভিয়েট বাহিনী পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য একেবারে খোলা মাঠ না পায়। ইউরোপে মার্কিন সৈন্যদলের সেনাপতি জেনারেল ওমর ব্রাড্‌লি স্পষ্টই তাঁর বইতে লিখিয়াছেন যে, 'ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নরম্যাণ্ডিতে অবতরণের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় মহাদেশকে বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করার জন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া আসা, জার্মানীতে প্রবেশ করা, জার্মান সৈন্যদলকে নিরস্ত্র করা এবং গোটা জার্মান জাতির নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করা।'[১]

১। Secrets of the Second World War, P. 161.

হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন গঠিত হওয়া সত্ত্বেও মিত্রমহলের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের এই মনোভাব কেন ? কারণ, হিটলার কর্তৃক পদানত ফ্রান্সে আত্মগোপনকারী ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিল। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সমগ্র ফ্রান্সব্যাপী জনগণের একটা অভ্যুত্থান ঘটাইবার জন্য তাঁরা চেষ্টা করিতে ছিলেন। এর ফলেই প্রতিক্রিয়াশীল মহলে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। কেবল ফ্রান্সেই নয়, হল্যান্ড এবং ইতালীতেও পার্টিজান যোদ্ধাদের জোরদার সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য এর ফলে, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অগ্রগতির পক্ষেও খুব সুবিধা হইয়াছিল। কেননা, পার্টিজানবাহিনীগুলি জার্মান সৈন্যদের জীবন অতিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। ফরাসী ঐতিহাসিক পীয়ের মঁতোবাঁ (Pierre Montauban) লিখিয়াছেন যে, যদি পার্টিজান যোদ্ধারা শত্রুবাহিনীর একটি বৃহৎ অংশকে ছিন্ন করিয়া দিতে না পারিতেন কিংবা ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অবতরণের সময় জার্মাম শক্তিরবলবৃদ্ধিতে বাধা দিয়া রুখিতে না পারিতেন, তবে, মিত্রবাহিনী হয়তো সমুদ্রের জলে নিক্ষিপ্ত হইতেন।

এমন কি, মিত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইজেনহাওয়ারও স্বীকার করিয়াছেন যে, ফরাসী দেশপ্রেমিকদের কার্যকলাপ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। তিনি তাঁর 'Crusade in Europe' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :

'Throughout France the Free French had been of inestimable value to the compaign. They were particularly active in Brittany, but on every portion of the front we secured help from them in a multitude of ways. Without their great assistance the liberation of France and the defeat of the enemy in western Europe would have consumed a much longer time and meant greater losses to ourselves."

সোজা কথায়—মিত্রপক্ষের এই অভিযানে 'স্বাধীন ফ্রান্সের' সাহায্যদান অপরিমিত হইয়াছিল। যদিও বিশেষভাবে তাঁরা ব্রিতানিতে সক্রিয় ছিলেন, তবু রণাঙ্গনের প্রত্যেক অংশেই নানাভাবে তাঁদের সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। তাঁদের এই প্রভুত সাহায্য ছাড়া ফ্রান্সের মুক্তি বিধান কিংবা পশ্চিম ইউরোপে শত্রুপক্ষের পরাজয়ে আরও অনেক বেশী সময় লাগিয়া যাইত এবং সেই সঙ্গে আমাদের পক্ষে আরও বেশী লোকক্ষয় হইত।

স্বয়ং জেনারেল আইজেনহাওয়ারের এই প্রশংসামূলক স্বীকারোক্তি থেকেই বুঝা যাইবে ফ্রান্সে আত্মগোপনকারী দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা এবং কমিউনিস্ট পার্টিজানরা কতটা শক্তি অর্জন করিয়াছিলেন ও ফ্রান্সের মুক্তিতে নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সোভিয়েট ঐতিহাসিক ডেবোরিন লিখিয়াছেন যে, ফরাসী বিদ্রোহীরা দেশের এক বৃহত্তম অংশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সংগঠিত ফরাসী হোমগার্ড বাহিনীতে ৫ লক্ষ লোক যোগ দিয়াছিলেন এবং জাতীয় অভ্যুত্থানে অন্ততঃ আরও ১০ লক্ষ লোক অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের এই মুক্তি চেষ্টা চরম পর্যায়ে পৌঁছিল ১৯শে আগস্ট তারিখ যখন প্যারিসে অভ্যুত্থান ঘটিল এবং ২২শে আগস্টের মধ্যে প্যারিসের ৭০টি ব্লক দখল করিয়া নিল। তখন ক্রুদ্ধ জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য সারা শহর ধ্বংস করিয়া ফেলার হুকুম দিল। কিন্তু হুকুম দিলে কি হইবে, ফরাসী দেশপ্রেমিকদের শক্তি তখন অনেক, তাঁরা প্রচন্ড বাধা দিলেন। ২৩শে ও ২৪শে আগস্ট প্যারিসের মূল নাৎসীবাহিনী দেশপ্রেমিকদের হাতে পর্যুদস্ত হইল এবং ২৫শে আগস্ট

সকালবেলা শত্রুপক্ষের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিল। মুক্তি বাহিনীর সহযোগিতায় মিত্র-বাহিনীর সেনাপতিরা একত্রে জার্মানদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিলেন।

* * *

সোভিয়েট লেখকদের মতে ফ্রান্স থেকে নাৎসী আক্রমণকারীদের বিতাড়নের পর সেই শূন্য স্থানে পশ্চিমী শক্তিবর্গ দখলদারি নিতে চাহিয়াছিলেন। এ জন্য উত্তর ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রস্তুতিতে পর্যন্ত ফরাসী মুক্তিবাহিনীর কমিটিকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই। জেনারেল দ্য গলকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ আদৌ পছন্দ করিতেন না এবং বৃটিশদের সঙ্গেও তাঁর বনিবনা হইতেছিল না। অথচ ফ্রান্সের মুক্তির পর সেখানকার শাসন পরিচালনার দায়িত্ব কে নিবে এবং গবর্নমেণ্টই বা কারা গঠন করিবেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবিলম্বে মীমাংসার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট দ্য গলের উপর অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিলেন। সুতরাং সেই জরুরী প্রশ্নের মীমাংসার যথাসম্ভব দেরী করা হইয়াছিল। বিখ্যাত মার্কিন লেখক হার্বার্ট ফীজ 'চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিন' নামক তাঁর সুবিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, দ্য গলকে "সাদা ঘোড়ায়" চড়িয়া ফ্রান্সে প্রবেশ এবং গভর্নমেণ্ট গঠন করিতে দিতে রুজভেল্ট একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন। ফরাসী ভূখণ্ডের শাসন পরিচালনার জন্য ফরাসী মুক্তিবাহিনীর কমিটিকে অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের মর্যাদা দিতে রুজভেল্ট আদৌ রাজী ছিলেন না।

ফরাসী কমিটি সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের মনোভাবও মার্কিন সরকারের অনুরূপ ছিল। ১৯৪৪ সালের বসন্তকালে সংবাদপত্রে যখন এই মর্মে রিপোর্ট প্রকাশিত হইল যে, ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটি ফ্রান্সের শাসনভার পরিচালনার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী ফরাসী গভর্নমেণ্টের হাতে ক্ষমতা অর্পণের জন্য আইন প্রণয়ন করিতেছেন, তখন বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে জানানো হইল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন ক্রমেই ফরাসী কমিটিকে অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট হিসাবে স্বীকৃতি দিবেন না এবং বৃটিশ সরকারও এই স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক। স্বয়ং দ্য গল তাঁর আত্মস্মৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে চার্চিলের সঙ্গে তাঁর যে সমস্ত কথাবার্তা হইয়াছিল, তখনই তাঁর মনে হইয়াছিল যে, চার্চিল ও রুজভেল্ট মনে করেন তাঁরা ফ্রান্সে তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী যা-কিছু করিতে পারেন এবং দ্য গলের প্রতি তাঁরা অসন্তুষ্ট এই কারণে যে, দ্য গল এই অবস্থাটা মানিয়া নিতে রাজী নন। এমনকি "ওভার লর্ড" পরিকল্পনার (ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া ফ্রান্স আক্রমণ) চেহারা, চরিত্র, তারিখ এবং এতৎ সংক্রান্ত কোন বিস্তৃত আলোচনা সম্পর্কে ফরাসী মুক্তি কমিটির নায়ক দ্য গলকে কিছুই জানানো হইল না। একেবারে শেষ মুহূর্তে এবং "ওভার লর্ড" পরিকল্পনার কার্যকর করার মাত্র একদিন আগে দ্য গলকে উত্তর আফ্রিকা থেকে লণ্ডনে ডাকিয়া আনা হইল। চার্চিলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দ্য গল অনুভব করিলেন যে, তাঁকে এভাবে ডাকিয়া আনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (দ্য গলকে) দিয়া ফরাসী জাতির নিকট এই মর্মে আবেদন প্রচার করা যে, মিত্রবাহিনীর ফ্রান্স অভিযানে ফরাসী জনগণ যেন এই বাহিনীকে ফ্রান্সের মুক্তিদাতার মত সাহায্য ও সহযোগিতা দেন।[১]

মিত্রবাহিনীর ফ্রান্সে অবতরণের পর মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলিতে মিত্রপক্ষীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ শাসন পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন এবং তাঁরা এমন ভঙ্গী দেখাইলেন যে,

১। The Anti-Hitler Coalition, P. 298.

ভবিষ্যৎ ফরাসী গভর্নমেণ্টের রাজনৈতিক কাঠামো তাঁরা নিজেরাই গঠন করিবেন। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, জেনারেল আইজেনহাওয়ার মিত্রপক্ষীয় অভিযানের সময় ফ্রান্সের জনগণের উদ্দেশ্যে যে আবেদন প্রচার করিলেন, তা'তে দ্য গলের ফরাসী জাতীয় কমিটির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করিলেন, না। অথচ ২রা জুন, ১৯৪৪ তারিখের এক বিশেষ বিধান বা ডিক্রি জারী করিয়া ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটি অস্থায়ী ফরাসী গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষ দ্য গলের এই অস্থায়ী সরকারকে অগ্রাহ্য করিলেন। এমন কি, ফ্রান্সে যে শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন ও সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল, মিত্রপক্ষ ইউরোপের সেই সেরা সংগঠনকেও উপেক্ষা করিলেন। অধিকন্তু ফরাসী সার্বভৌমিত্বকে অগ্রাহ্য করিয়া মার্কিন কর্তৃপক্ষ মিত্র-বাহিনীর জন্য ফরাসী মুদ্রা ও ব্যাংক নোট নিজেরা ছাপাইয়া প্রচার করিলেন। ফরাসী অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে অবশ্যই এই সমস্ত আর্থিক বিলি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের নিকট প্রতিবাদ জানানো হইল।···

কিন্তু দ্য গল এবং তাঁর ফরাসী কমিটি সম্পর্কে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট গোড়া থেকেই উপযুক্ত মর্যদা দেখাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁরা ফ্রান্সের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসুক ছিলেন এবং ফ্রান্স আবার একটি বৃহৎ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করুক, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এমন ইচ্ছাই পোষণ করিতেছিলেন। গত তিন বছর ধরিয়া ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটিকে মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করা হইতেছিল এবং সোভিয়েট ও ফরাসী জনগণের মধ্যে 'সংগ্রামশীল সহযোগিতা গড়িয়া উঠিল এবং কোন কোন রণক্ষেত্রে সোভিয়েট বিমানবাহিনীর সঙ্গে ফরাসী বৈমানিকেরাও যোগদান করিলেন। ফরাসী বাহিনীর অনেক পাইলট সোভিয়েটের কাছ থেকে তাঁদের সামরিক কৃতিত্বের জন্য পদকও লাভ করিলেন। এভাবে উভয় দেশের মধ্যে মিত্রতা ও সম্ভাব গড়িয়া উঠিল এবং ২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৪, সোভিয়েট সরকার দ্য গলের কমিটিকে অস্থায়ী ফরাসী গভর্নমেণ্ট হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন। ১৯৪৩-এর শেষভাগে যখন ইউরোপীয়ান এ্যাডভাইসরি কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তখনও সোভিয়েট রাশিয়া ফ্রান্সকে উহার সদস্যপদে গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিনিধিরা তাতে সম্মত ছিলেন না। ১৯৪৪-এর ডিসেম্বর মাসে ফরাসী অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের প্রধান হিসাবে জেনারেল দ্য গলকে মস্কোতে সরকারীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হইল এবং উভয় দেশের প্রতিনিধিবর্গ ফ্রান্স ও সোভিয়েটের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে আলোচনা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, স্ট্যালিনের সঙ্গে দ্য গলের সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হইল। জার্মানীর ভবিষ্যৎ নিয়াও তাঁরা আলোচনা করিলেন এবং পূর্বদিকে জার্মানীর নূতন সীমানা (ওডের-নেইসী লাইন) সম্পর্কে একমত হইলেন। মস্কোতে এই সমস্ত আলোচনার ফলে ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র ও পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং এই চুক্তিতে ঘোষণা করা হইল যে, জার্মানীর কাছ থেকে যদি ভবিষ্যতে নূতন কোন আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে, উভয় দেশ একত্রে উহাতে বাধা দিবে।[১]

প্যারিসের মুক্তির সঙ্গে ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন মিত্রতার ইতিহাসও গড়িয়া উঠিল এবং মহাযুদ্ধের পরেও উহা অব্যাহত রহিল।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৬৫।

সপ্তম পর্ব

সপ্তম অধ্যায়

মস্কোতে চার্চিলের গোপন বুঝাপড়া ?
পোল্যাণ্ড ও বলকান নিয়ে সমস্যা

যদিও পোল্যাণ্ড ও ওয়ারশর অভ্যুত্থান নিয়া উইনস্টোন চার্চিল প্রচুর মাথা ঘামাইয়াছেন এবং অভ্যুত্থানকারীদের যথাসময়ে স্ট্যালিন সাহায্য দেন নাই—এই অভিযোগে স্ট্যালিনের সঙ্গে কড়া চিঠিপত্রের বিনিময় করিয়াছেন এবং বৃটিশ জেনারেল স্টাফকে পর্যন্ত এই প্রশ্নে যথেষ্ট উত্তেজিত করিয়াছিলেন। তথাপি মহাযুদ্ধের ৩০ বছর পর লণ্ডন থেকে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রকাশিত গোপনীয় দলিলপত্রে কিন্তু একটি ভিন্নরকমের—এমন কি প্রায়-বিপরীত-চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই চিত্রে দেখা যায় যে, পোল্যাণ্ড নিয়া চার্চিল স্ট্যালিনের সঙ্গে একটি বুঝাপড়ায় আসিয়াছিলেন।

১৯৭৩ সালের ২রা আগস্ট লণ্ডন থেকে প্রকাশিত স্যার উইনটোন চার্চিলের যুদ্ধকালীন সর্বপেক্ষা গোপনীয় কাগজপত্রে ('most secret war-time papers') প্রকাশ যে, ১৯৪৪ সালে যোসেফ স্টালিনের সঙ্গে বৃটিশ নেতার গোপন বৈঠকে পোল্যাণ্ড নিয়া যে আলোচনা হইয়াছিল, তাতে পোল্যাণ্ডের ভাগ্য সোভিয়েত রাশিয়ার হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। বৃটেনের রক্ষণশীল পত্রিকা 'ডেলি টেলিগ্রাফ' মন্তব্য করিয়াছেন যে, মহাযুদ্ধের পরবর্তী বৃটেনের পরিকল্পনার প্রতি সোভিয়েতের সমর্থন লাভের আশায় চার্চিল স্ট্যালিনের সঙ্গে যে কারবার' (deal) করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেটা ছিল সবচেয়ে বড় রকমের রাজনৈতিক ভুল (the biggest political blunder)। কেননা, মহাযুদ্ধের শেষে এই গোপন চুক্তি থেকে বৃটেন কিছুই লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই গোপনীয় দলিলপত্রের একটা অংশ এবং যে অংশে উভয় নেতার রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ছিল, সেই অংশটি খোয়া (missing) যাওয়ায় এই চুক্তির রাজনৈতিক দিকটার উপর কোন বিস্তৃত আলোকপাত সম্ভব হয় নাই।···

দূরপ্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছ থেকে কোন অনুকূল সম্মতি আদায় করিতে না পারিয়াই চার্চিল তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্থনি ইডেনকে সঙ্গে নিয়া বিমানযোগে মস্কো যাত্রা করেন। বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, যুদ্ধের পরবর্তীকালে হংকংকে বৃটেনের কুক্ষিগত করিয়া রাখিতে এবং ভুমধ্যসাগরের উপর বৃটিশ প্রভুত্ব বজায় রাখিতে স্ট্যালিন যদি বৃটেনকে সমর্থন করিতেন, তবে, চার্চিলও পোল্যাণ্ডের ভাগ্য স্ট্যালিনের হাতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে চার্চিল তাঁর মস্কোযাত্রা সম্পর্কে এমন ভঙ্গী দেখাইলেন যে, যেন জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়া কবে পর্যন্ত যুদ্ধে যোগদান করিবে, সেই বিষয়ে আলোচনার জন্যই তিনি মস্কো যাইতেছেন। কিন্তু গোপনীয় কাগজপত্রে দেখা যায় যে, বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে যদি একটা বুঝাপড়া হইত, তবে চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে কথা অনুসারে

নির্বাসিত লন্ডন প্রবাসী পোলিশ নেতাদের মস্কোতে আনা যাইত এবং পোল্যান্ড সম্পর্কে একটা মীমাংসা তাঁদেরকে দিয়া গ্রহণ করানো যাইত।[১]

* * *

একথা সর্বজনবিদিত যে, চার্চিল ছিলেন সাম্রাজ্যবিলাসী এবং মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে ভারত মহাসাগর হইয়া প্রশান্ত মহাসমুদ্রের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত সর্বত্র তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ রক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং চার্চিলের যুদ্ধকালীন গোপনীয় দলিলপত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে তাঁর যে মনোভাব এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে দর-কষাকষির যে ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে তা' আদৌ ভিত্তিহীন নাও হইতে পারে। তবে সোভিয়েত সর্বাধিনায়ক স্ট্যালিন কতটা রাজী ছিলেন, সে দিকটা এই গোপন দলিলের সারাংশ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল না। কিন্তু চার্চিলের দ্বিতীয়বার মস্কো যাত্রার বিবরণী যে সমস্ত প্রামাণ্য পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে, তা'তে একথা বুঝা যায় যে, তিনি স্ট্যালিনের সঙ্গে এই দ্বিতীয়বার সাক্ষাতে খুব খুশী হইয়াছিলেন এবং একটা সন্তোষজনক বুঝাপড়ায় আসিয়াছিলেন।···

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সোভিয়েত রাশিয়ার জয়যাত্রা এবং লালফৌজ কর্তৃক বাল্টিক রাজ্য, পূর্ব প্রুশিয়া, পূর্ব পোল্যান্ড ও মধ্য ইউরোপে চার্চিলের নিকট দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দ্বিতীয়বার কোয়েবেক (কানাডা) সম্মেলনের পরেই তিনি এন্থনি ইডেনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার মস্কোতে আসিলেন স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার জন্য। তাঁর এই দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ যে খুব সার্থক হইয়াছিল এবং অন্য যে-কোন সময়ের তুলনায় স্ট্যালিনের সঙ্গে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে। বলকান অঞ্চলের রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াকে তিনি রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চল বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী ছিলেন, কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া ও হাঙ্গেরীর বেলা ততটা রাজী ছিলেন না এবং গ্রীসের বেলা তো নয়ই। কারণ, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের রাজন্যদ্বয় কমিউনিজমের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ায় জন্য বৃটেনের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন।···

৯ই অক্টোবর মস্কোতে তিনি ইডেনের সঙ্গে পেঁৗছিলেন অপরাহ্ণ বেলা। আগের বার তিনি মস্কোর বাইরে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় আড়ম্বর ও আরামের মধ্যে ছিলেন। এবার তিনি খাস মস্কোতেই খুব আরামপ্রদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ গৃহে অবস্থানের সুযোগ পাইয়া রুশ আতিথ্যের জন্য খুব প্রসন্ন ছিলেন এবং সেদিনই রাত্রি ১০ টায় ক্রেমলিনে তিনি স্টালিনের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইলেন। তিনি সোজাসুজি বলকান অঞ্চলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ভাগাভাগির প্রশ্ন তুলিলেন। তিনি একটি কাগজের টুকরায় অঙ্ক কষিবার আকারে লিখিলেন:

রুমানিয়া—রাশিয়ার আধিপত্য শতকরা ৯০। অন্যান্যরা শতকরা ১০।

গ্রীস—গ্রেট বৃটেন (আমেরিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যসহ) শতকরা ৯০। রাশিয়া শতকরা ১০।

১। ১৯৭৩ সালের ৩রা আগস্ট অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'Churchill's secret war time papers released.' দ্রষ্টব্য।

যুগোশ্লাভিয়া—শতকরা ৫০ : ৫০।
হাঙ্গেরী—শতকরা ৫০ : ৫০।
বুলগেরিয়া—রাশিয়া শতকরা ৭৫। অন্যান্য শতকরা ২৫।

অবশ্য এই ভাগাভাগির কথা আগে মুখে বলিয়া লিখিত কাগজের টুকরাটি চার্চিল স্ট্যালিনের নিকট টেবিলের উপর দিয়া ঠেলিয়া দিলেন। স্ট্যালিন কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া পরে একটি নীল পেনসিল দিয়া কাগজটির উপর একটি বড় রকমের টিক দিলেন। অবশ্য এটা ছিল যুদ্ধকালীন সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। যুদ্ধের পর শান্তির টেবিলে সমস্ত ব্যবস্থারই চূড়ান্ত মীমাংসার আশা উভয় পক্ষের ছিল। ইতিমধ্যে কাগজের টুকরাটি টেবিলের উপরেই পড়িয়া রহিল এবং কিছুটা দীর্ঘ নীরবতার পর চার্চিল স্ট্যালিনকে বলিলেন—'এভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য একটা কাগজের টুকরার উপর নির্ধারণ করা কি একটা খেলো বিষয়ের মত মনে হচ্ছে না? তার চেয়ে বরং কাগজের টুকুরোটা পুড়িয়ে ফেলি।'

স্ট্যালিন জবাবে বলিলেন—'না কাগজটা আপনার কাছে রেখে দিন।'[১]

এভাবে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমগ্র বলকান সমস্যার 'মীমাংসা' হইয়া গেল!

কিন্তু মস্কো থেকে প্রকাশিত 'যুদ্ধকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি' সংক্রান্ত পুস্তকে এই ধরনের মীমাংসা কাহিনীর তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে! সেই পুস্তকে বলা হইয়াছে যে যুগোশ্লাভিয়াকে 'প্রভাবাধীন অঞ্চল' হিসাবে ভাগ করার কাহিনী সত্য নয়। কেননা কূটনীতি বা ডিপ্লোম্যাসিতে অনভিজ্ঞ আনাড়ি লোকেরাও জানেন যে এভাবে এক টুকরা কাগজে কোন আন্তর্জাতিক সমস্যার মীমাংসা-চুক্তি সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। আসলে এটা ছিল চার্চিলের মনোগত অভিপ্রায় মাত্র। এমনকি চার্চিলের উপরে-উদ্ধৃত-কাহিনীতেই দেখা যায় যে, স্ট্যালিন চার্চিলের প্রস্তাব সম্পর্কে 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বলেন নাই। মস্কো বৈঠকের আলোচনা সম্পর্কে কোন নিয়মিত রেকর্ডও রাখা হয় নাই। যদি চার্চিলের এই ধরনের প্রস্তাব গৃহীত হইত, তবে, সোভিয়েত পররাষ্ট্রীয় দলিলপত্রে নিশ্চয়ই এর কোন উল্লেখ থাকিত। কিন্তু তেমন উল্লেখ কোথাও নাই। বরং লালফৌজের সহযোগিতার জন্যই যুগোশ্লাভিয়ার যে মুক্তি ঘটিয়াছে, সেটা তাদের নেতারাও স্বীকার করেন।[২]

* * *

যদিও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে লিখিয়াছিলেন যে, মুখ্যত দূর-প্রাচ্যের সমস্যা মীমাংসার জন্যই তিনি মস্কোতে স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছেন, তথাপি আসলে কিন্তু পোল্যাণ্ড, পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সমস্যাগুলিই তাঁর শিরঃপীড়ার কারণ হইয়াছিল। বিশেষভাবে বলকান অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাবের সীমা নির্ধারণ এবং পোলিশ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসাই চার্চিলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

পোলিশ সমস্যার মীমাংসার উদ্দেশ্যে লণ্ডনের তথাকথিত পোলিশ গবর্নমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী মিকোলাজিকের নেতৃত্বে এবং অন্য দিকে লুবলিনের ন্যাশনাল লিবারেশনের পোলিশ কমিটির নেতা মিঃ বিয়েরুটের (Bierut) নেতৃত্বে দুইটি প্রতিনিধি-দল মস্কোতে

১। চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৮।
২। ভি. ট্রুখানোভস্কি—মস্কো, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৪০৭-৮।

পৌঁছিলেন। লুবলিন কমিটির প্রতিনিধিগণ পোল্যাণ্ডের ১৯২৫ সালের শাসনতন্ত্রের বদলে ১৯২১ সালের শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে আপোস-মীমাংসা করিতে রাজী ছিলেন। কারণ, ১৯৩৫ সালের সংবিধান ছিল ফ্যাসিস্ট মার্কা এবং মার্শাল পিলসুদ্স্কির ব্যক্তিগত ডিক্টেটরির উপর প্রতিষ্ঠিত। সোভিয়েট-পোলিশ নূতন সীমানা সম্পর্কে তাঁরা পূর্বদিকে কার্জন লাইন মানিয়া লইতে এবং পশ্চিম সীমানায় তাঁদের আগেকার জমি ফেরত পাইতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু লণ্ডনের 'আশ্রিত' গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধিরা এই সমস্ত কিছুই মানিয়া নিতে রাজী ছিলেন না। তাঁরা কার্জন লাইনের উল্লেখও করিলেন না, বরং বলিলেন যে, যুদ্ধের পর যে সংবিধান পরিষদ গঠিত হইবে, সেই পরিষদই সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সীমা নির্ধারণ করিবে।

বলা বাহুল্য যে, সোভিয়েট সরকারের প্রতিনিধিরা লণ্ডনের 'পোল গবর্নমেণ্ট' কর্তৃক কার্জন লাইনের সীমানা প্রত্যাখ্যানের জন্য তাঁদের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিলেন।

কিন্তু বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা একটা আপোসের মনোভাব দেখাইলেন এবং দুইটি সূত্রের উপর জোর দিলেন। যথা—

১. পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমানা হিসাবে কার্যতঃ কার্জন লাইন গ্রহণ, তবে এর চূড়ান্ত মীমাংসা ঘটিবে আগামী শান্তি সম্মেলনে।

২. লুবলিনের ন্যাশনাল লিবারেশন কমিটির সঙ্গে একটি বন্ধুতামূলক চুক্তি নিষ্পন্ন হইবে, যে চুক্তির দ্বারা লণ্ডনের পোলিশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্রে একটি ঐক্যবদ্ধ সরকার গঠন করা হইবে এবং অবস্থা অনুযায়ী সংশোধন গৃহীত হইবে।

১৩ই অক্টোবর চার্চিল এই আলোচনা বৈঠকের এক বক্তৃতায় বলিলেন:

'As regards the frontier problems, I must declare on behalf of the British Government that the sacrifices made by the Soviet Union in the course of the war against Germany and its effort towards liberating Poland entitle it, in our opinion, to a western frontier along the Curzon Line···

'I also understand that the Allies will be continuing the struggle against Germany in order to obtain in ıetuın for the Polish concession in the East an equal balance···in the from of territories in the North and in the West, in East Prussia and in Silesia including a good sea coast, an excellent port in Danzig and valuable raw materials in Silesta.'[১]

চার্চিলের এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, 'জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এবং পোল্যাণ্ডের মুক্তি বিধানের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে, তাতে সোভিয়েত রাশিয়ার পশ্চিম সীমানা কার্জন লাইন বরাবরই হওয়া উচিত।'

'পূর্বদিকে পোল্যাণ্ডের এই কনশেসনের বদলে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারা পোল্যাণ্ডকে উত্তরে ও পশ্চিম দিকে এবং পূর্ব-প্রুশিয়ায় জমি দেওয়া হইবে এবং

পোল্যাণ্ড ডানজিগের চমৎকার বন্দর এবং সাইলেশিয়ার উৎকৃষ্ট কাঁচামালও পাইবে—এটাই আমার বিশ্বাস।'

১৬ই অক্টোবর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী যে খসড়া প্রস্তাব পেশ করিলেন, তা'তে পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমানা সম্পর্কে সামঞ্জস্য বিধানের কথা ছিল এবং পূর্ব সীমানা সম্পর্কে বলা হইল যে, সোভিয়েত রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে কার্জন লাইনকে পোলিশ গভর্নমেণ্ট "ভাগাভাগির লাইন" (ডিমারকেশন লাইন) হিসাবে মানিয়া লইতেছেন।

কিন্তু লণ্ডনের "পোলিশ সরকারের" প্রতিনিধিগণ এই সমস্ত মানিয়া লইতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তবে, মস্কোর বৈঠকে বৃটেন ও সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট পোলিশ সমস্যা মীমাংসায় অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁরা (বৃটেন) পোল্যাণ্ডের বাস্তব অবস্থাটা অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং লণ্ডনের "পোলিশ গভর্নমেণ্ট" সম্পর্কে সোভিয়েত মনোভাবের ন্যায্যতাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

জনৈক মার্কিন লেখক বলিয়াছেন যে, পোল্যাণ্ডের বাস্তব অবস্থা মানিয়া লইতে লণ্ডনের পোলদের অসম্মতির জন্য চার্চিল তাঁদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁদের বিষয় নিয়া আর মাথা ঘামাইবেন না, এমন ভীতিও দেখাইয়াছিলেন—যদিও চার্চিল কার্যতঃ তা করেন নাই।

মস্কো সম্মেলনে অবশ্য পোল্যাণ্ড বা বলকান ছাড়া বৃটিশ, মার্কিন ও সোভিয়েত রণনেতাদের মধ্যে মহাযুদ্ধের অন্যান্য সমস্যা—যেমন, সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন, পশ্চিম ইউরোপ, ইতালী এবং প্রশান্ত মহাসাগর নিয়াও আলোচনা হইয়াছিল এবং মিত্রপক্ষের সমস্ত ফ্রণ্টেই যুদ্ধজয়ের জন্য দৃঢ় আশা ব্যক্ত করা হইয়াছিল।...

মস্কো বৈঠকের বিভিন্ন বিবরণীতে দেখা যায় যে, চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে এত ভালো সম্পর্ক আর কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বৃটিশ দূতাবাসের এক ভোজসভায় পর্যন্ত স্ট্যালিন যোগ দিলেন—যে কাজ তিনি ইতিপূর্বে কখনও করেন নাই। চার্চিল স্ট্যালিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন এবং রাত্রে দুইজনে মিলিয়া যখন বিখ্যাত বলসয় থিয়েটারে গেলেন, তখন দর্শকবৃন্দ কয়েক মিনিট ধরিয়া উচ্চ করতালি-ধ্বনি সহকারে তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন।

এক সাংবাদিক বৈঠকে চার্চিল ঘোষণা করিলেন যে, মস্কোতে আলোচনার ফলে পোলিশ সমস্যা মীমাংসার সম্ভাবনা আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল হইয়াছে। পোল্যাণ্ড নিয়াই বৃটেন যুদ্ধে নামিয়াছিল। সুতরাং পোলিশ প্রশ্নের মীমাংসা বৃটেনের একান্ত কাম্য। তিনি আশা করেন পোলিশ সমস্যা কোয়ালিশনের মিত্রতায় বাধা সৃষ্টি করিবে না।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য এই যে, মাত্র ১৪ দিন আগে ওয়ারশ অভ্যুত্থানের যে নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক পরিণতি ঘটিয়া গিয়াছে এবং চার্চিল যে বিষয় নিয়া গোড়াতে স্ট্যালিনের সঙ্গে কড়া চিঠিপত্রের বিনিময় করিয়াছিলেন, মস্কোতে সেই সম্পর্কে তিনি টু শব্দটিও করিলেন না। অথচ ৯ই অক্টোবর থেকে ১৮ই অক্টোবর তিনি মস্কোতে ছিলেন এবং স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর ইতিমধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা হইল যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর লণ্ডন যাত্রার সময় তিনি স্বয়ং বিমানবন্দরে গিয়া বিদায় অভ্যর্থনা জানাইয়া আসিলেন।

অধিকন্তু চার্চিলের কন্যার জন্য স্ট্যালিনের মেয়ে এবং স্বয়ং স্ট্যালিন চার্চিল ও তাঁর স্ত্রীর জন্য মূল্যবান উপহার দিলেন। আর লন্ডনে ফিরিয়া আসিয়া চার্চিল কমন্স-সভায় স্ট্যালিন ও রাশিয়া সম্পর্কে এক উচ্ছ্বসিত বক্তৃতায় বলিলেন :

'I am very glad to inform the House, that our relations with Soviet Russia were never more close, intimate and cordial than they are at the present time. Never before have we been able to reach so high a degree of frank and friendly discussions of the most delicate and often potentially vexatious topics...'[১]

'কমন্সসভাকে আমি সানন্দে জানাতে চাই যে, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে আগে কখনও এত ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ ও সহৃদয়তাপূর্ণ হয় নাই, বর্তমানে যতটা হইয়াছে। খুব দুরূহ ও বিরক্তিকর সমস্যাগুলি সম্পর্কেও আমরা আগে কখনও এত বন্ধুতাপূর্ণ এবং এত সরলভাবে আলোচনার সুযোগ পাই নাই।'

* * *

চার্চিলের দ্বিতীয়বারের মস্কো বৈঠকে এমন কি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা হইয়াছিল, যার জন্য চার্চিল-স্ট্যালিনের সম্পর্ক এমন গভীরতায় পৌঁছিয়াছিল? সুতরাং ত্রিশ বছর পরে প্রকাশিত চার্চিলের যুদ্ধকালীন 'অত্যন্ত গোপনীয়' কাগজপত্রে স্ট্যালিনের সঙ্গে পোল্যান্ড ও দূর-প্রাচ্য সম্পর্কে যে গোপন চুক্তির আভাস পাওয়া যায়, ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে তেমন কিছু ঘটিয়াছিল কি? অবশ্য কৌতূহলী পাঠকের এই প্রশ্নের জবাব সুনির্দিষ্টভাবে দেওয়া কঠিন।

তবে, পশ্চিমী লেখকদের বইতে চার্চিল-স্ট্যালিনের মস্কো বৈঠকে চার্চিলের একটি বিষয়ে খুব বড় রকমের লাভের কথা জানা যায় এবং সেটা হইতেছে গ্রীস সম্পর্কে চার্চিলের সাফল্য। যদিও বলকান রাজ্যগুলি সম্পর্কে ইঙ্গ-রুশ বুঝাপড়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আপত্তি ছিল, তথাপি সেই আপত্তি ডিঙ্গাইয়া চার্চিল গ্রীসের উপর আধিপত্য খাটাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

'Churchill, however, found his bargain with Moscow in one respect a very useful one. As the British forces occupied Greece, they crushed with force the Greek Communist movement and its allies without protest from Moscow'.[২]

অর্থাৎ মস্কোতে চার্চিল একটি বিষয়ে খুব বড়রকম লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন। বৃটিশ সৈন্যেরা গ্রীস দখল করিয়া বলপূর্বক গ্রীক কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের মিত্রদিগকে দমন করিলেন। কিন্তু মস্কো থেকে কোন প্রতিবাদ জানানো হইল না!

বলকান ও ভূমধ্যসাগরের প্রশ্নে গ্রীসের গুরুত্ব ছিল এবং চার্চিলের ভূমধ্যসাগরীয় রণনীতির এগুলি অন্তর্গত ছিল। সুতরাং এই সাফল্যের জন্যই কি চার্চিল ১৯৪৪ সালের অক্টোবরের মস্কো বৈঠকে সম্পর্কে এত উল্লসিত ছিলেন? অথবা পোল্যান্ডের

১। The Anti-Hitler Coalition, P. 323.
২। After Victory—P. 131.

ভবিষ্যৎ নিয়া সত্য সত্যই স্ট্যালিনের সঙ্গে চার্চিলের কোন গোপন কথাবার্তা বা বুঝাপড়া হইয়াছিল ?

কোয়েবেক সম্মেলনের গুরুত্ব

মস্কোতে চার্চিল-স্ট্যালিনের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আগে ডাম্বারটন-ওকস্ (ওয়াশিংটন) এবং কোয়েবেকে (কানাডা) আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তেহরান সম্মেলনে (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৩) তিন বিশ্ব-নেতার ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ ও ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিধানের পর ১৯৪৪ সালে মিত্রশক্তিবর্গের যে সমস্ত সামরিক সাফল্য অর্জিত হইয়াছিল, তার ফলে এমন কতকগুলি রাজনৈতিক ও রণনৈতিক প্রশ্ন দেখা দিল যেগুলির আশু মীমাংসার জন্য তিন শীর্ষ নেতার পুনরায় সাক্ষাৎ ও আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে পূর্বদিক থেকে লালফৌজ যেমন আগাইয়া আসিতেছিল, তেমনি পশ্চিমদিক থেকে মিত্রবাহিনীরও জয়াভিযানের দ্বারা অগ্রসর হইতেছিল। সুতরাং পুনরধিকৃত ইউরোপীয় দেশগুলি ও জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যেমন আলোচনার প্রয়োজন ছিল, তেমনি পূর্ব ও পশ্চিমদিক থেকে অগ্রসরমান লালফৌজ ও মিত্রবাহিনীগুলির মিলনের সীমারেখা স্থির করারও দরকার ছিল। আর দরকার ছিল ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়িয়া তোলা। ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে উত্তর স্কটল্যাণ্ডে শীর্ষ রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে তাতে আপত্তির কোন কারণ ছিল না বটে, কিন্তু স্ট্যালিনের পক্ষে তখন যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজনের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং স্থির হইল ১৯৪৪ সালের শরৎকালে পর-পর দুটি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা-গুলির মীমাংসার চেষ্টা হইবে। এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে কোয়েবেকে রুজভেল্ট ও চার্চিলের বৈঠকে এবং মস্কোতে চার্চিল-স্ট্যালিনের পারস্পরিক সাক্ষাতে। অবশ্য এই সমস্ত বৈঠকে মিত্রপক্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারাও প্রয়োজন মত আলোচনায় যোগ দিবেন।

ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের জন্য বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিশিষ্ট নেতা ও বিশেষজ্ঞগণ যে সমস্ত দলিল-পত্র রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির ভিত্তিতেই ২১শে আগস্ট ডাম্বারটন-ওকস্ (ওয়াশিংটন) শহরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল এবং সেই সম্মেলন চলিল ৭ই অক্টোবর, ১৯৪৪ পর্যন্ত। শেষের দিকে এই বৈঠকে চীনের প্রতিনিধিও যোগ দিয়াছিলেন। ভাবী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের খসড়া এখানেই প্রস্তুত হইল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী লীগ অব্ নেশন্স-এর মত যাতে নূতন আন্তর্জাতিক সংগঠন অকেজো ও ব্যর্থ না হয়, সেদিকে বিশেষজ্ঞগণ নজর রাখিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে দীর্ঘ আলোচনা ও বিচার-বিবেচনার পর "একটি জেনারেল ইণ্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন" গঠনের যে প্রস্তাব গৃহীত হইল, সেটাই

প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ ইউনাইটেড নেশন্সের (ইউ. এন.) চার্টার বা সনদ রচনার ভিত্তিতে পরিণত হইল।[১]

* * *

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মধ্যে ১৯৪৪ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে দ্বিতীয় কোয়েবেক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল, তাতে প্রধানতঃ ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে কিভাবে চুড়ান্ত আঘাত হানা যাইতে পারে, সেই গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় নিয়া আলোচনা হইল। অবশ্য আলোচনা ও পরিকল্পনার বিষয় এবং সিদ্ধান্তগুলি চার্চিল-রুজভেল্টের পক্ষ থেকে মস্কোতে স্ট্যালিনকে জানাইয়া দেওয়া হইল। স্ট্যালিনকে জানানো হইল যে, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পশ্চিম দিকে জার্মানীর রুড় (Ruhr) ও সার্ (Saar) অঞ্চলে আঘাত হানিবে। কারণ, তাঁদের ধারণা এই যে, শত্রুপক্ষ তার শেষ সৈন্যশক্তি ওদিকেই নিয়োগ করিবে। তা ছাড়া উত্তর দিকের রটারডম এবং এণ্টোয়ার্প এলাকায় উৎকৃষ্ট বন্দরগুলিও তাঁরা শীতের বিশ্রী আবহাওয়া শুরু হওয়ার অগেই দখল করিয়া নিবেন। কোয়েবেক সম্মেলনে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের খুব আশাবাদীতা দেখা গিয়াছিল। এমন কি, তাঁরা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, জার্মানীর পতন খুব আসন্ন এবং যে কোন দিন সে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে পারে। এই আকস্মিক পতন সম্ভাবনার কথা স্মরণে রাখিয়াও তাঁরা কিছু কিছু পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন।...

কোয়েবেক সম্মেলনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এবং ব্রহ্ম রণাঙ্গনের অবস্থা নিয়াও বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত এই অঞ্চলে যুদ্ধের পরিস্থিতি আমেরিকার প্রতিকূলে ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত জেনারেল চিয়াং কাইসেককে তাগাদা দেওয়া হইতেছিল জাপানের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য। এই সময় মার্কিন নেতারা চিয়াং কাইসেক ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিরোধের এবং গৃহযুদ্ধের কোন উস্কানি দেন নাই। কেননা, সেই অবস্থায় জাপানেরই লাভ হইত। কারণ, তখন জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেয়ে গৃহযুদ্ধের দিকেই বেশী মন দিতে হইত। কিন্তু ১৯৪৪ সালে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। তখন মার্কিন সামরিকশক্তি খুব সামলাইয়া উঠিয়াছিল এবং আমেরিকার আক্রমণে জাপানের আন্তঃ প্রতিরক্ষার লাইন বা 'ইনার ডিফেন্স লাইন' ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এরপর চিয়াং কাইসেক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার বদলে কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করার দিকেই বেশী মন দিলেন। অবশ্য ১৯৪৪ সালে চিয়াং কাইসেকের সৈন্যেরা জাপানের হাতে প্রচণ্ড মার খাইয়াছিল এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল। সুতরাং কুওমিণ্টাংয়ের সামরিকশক্তি সম্পর্কে আমেরিকারও আর ভরসা রহিল না।

কোয়েবেক সম্মেলনে উইনস্টোন চার্চিলের ভাবভঙ্গীটাও খুব উল্লেখযোগ্য ছিল এবং মার্কিন সেনাপতিরাও কিছুটা বিস্ময় বোধ করিতেছিলেন। কারণ, চার্চিল প্রস্তাব করিলেন যে, দূর-প্রাচ্যের বা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বৃটেনকেও অংশ নিতে দেওয়া হোক—বিশেষতঃ বৃটিশ নৌবহর ও বিমানবহরকে। সম্মেলনে চার্চিলের এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১। এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৩০৮-৯

প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে বৃটেনের অংশ গ্রহণ নিয়া চার্চিলের এত আগ্রহের কারণ এই যে, যদি একমাত্র আমেরিকার হাতেই সমগ্র যুদ্ধের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে, মহাযুদ্ধের শেষে রাজনৈতিক বিলিব্যবস্থার ব্যাপারে বৃটেনের কোন দাবীই টিকিবে না। দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার কাছ থেকে বৃটেন কর্জ ও ইজারা আইন অনুসারে যে সমস্ত সাহায্য পাইতেছিল, জার্মানীর পরাজয়ের পর সেগুলি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং জাপানের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিলে আমেরিকার কাছ থেকে বৃটেন আগের মতই সাহায্য পাইতে পারিবে এবং তৃতীয়তঃ দূর-প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটেনের যে বিশাল ঔপনিবেশিক স্বার্থ ও সাম্রাজ্য রহিয়াছে তা পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষিত করার জন্যও বৃটেনের উচিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে যোগদান করা। সেজন্য চার্চিল ব্রহ্ম রণাঙ্গন থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধে পর্যন্ত অংশ গ্রহণের জন্য এত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন।

জার্মানীর ভবিষ্যৎ নিয়াও কোয়েবেক সম্মেলনে আলোচনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু জার্মানীকে টুক্‌রা টুক্‌রা করার জন্য যে মর্গেনথাউ (Morgenthau) পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল, সেটা এত খারাপ ছিল যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট শেষ পর্যন্ত সেটা বাতিল করিয়া দিলেন।

সপ্তম পর্ব

অষ্টম অধ্যায়

জার্মান তাঁবেদারদের রণে ভঙ্গ : রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরীর বিদায়

১৯৪৪ সালে নাৎসী জার্মানীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি একে একে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইল এবং জার্মানীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। কেবল সম্পর্ক ছিন্ন নয়, অধিকাংশ তাঁবেদার রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া ও মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরের পর পালটা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল! অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়া গেল। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে রুমানিয়া, ফিনল্যান্ড, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী (১৯৪৫ জানুয়ারী) সোভিয়েতবাহিনীর হাতে পরাজিত হইয়া পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় নিল। কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে, বিশেষভাবে বলকান রাজ্যসমূহে সোভিয়েত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া বৃটিশ ও মার্কিন মহলে যেন একটা চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হইল এবং কে কার আগে বলকান অঞ্চলে ঢুকিয়া পড়িবে, এমন একটা প্রচ্ছন্ন মনোভাবের আভাস ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু চার্চিল ও বৃটেন যেন ধরিয়াই নিয়াছিলেন যে, একমাত্র গ্রীস বাদে বলকান রাজ্যগুলির বাকি অংশে সেভিয়েট আধিপত্য মানিয়া না-লইয়া উপায় নাই। অক্টোবর মাসে (১৯৪৪) চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে সাক্ষাৎকারে এই ধরনের একটা বুঝাপড়াও হইয়াছিল। কিন্তু বলকান রাজ্যগুলির অভ্যন্তরে অভিযানের আগে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হইয়াছিল, একমাত্র যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং নাৎসীবাহিনীকে হটাবার জন্যই লালফৌজ এই সমস্ত দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দেশগুলির উপর রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক কোন পরিবর্তন চাপাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা সোভিয়েত সরকারের নাই। বিখ্যাত মার্কিন গ্রন্থকার হার্বার্ট ফীজ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

'The ultimate intentions of the Soviet Government remained obscure. It saw to it that the Governments which came to power in the countries along its borders were well disposed to the Soviet Union and feared it. But it did not seem to be trying to impose on them in haste communist economic or social systems. The Soviet rulers avowed that they did not wish or plan to interfere in the internal affairs of these countries...'[১]

অর্থাৎ সহজ বাংলায়—শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া এই সমস্ত দেশ নিয়া কি করিবে, তাদের সেই উদ্দেশ্যটা তখন অস্পষ্ট ছিল। তবে, একটি বিষয়ে তাঁরা লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত সীমান্তবর্তী দেশে যে সমস্ত গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে,

১। Charchill-Roosevelt-Stalin, P. 410.

সেগুলি যেন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সম্ভাবসম্পন্ন হয় এবং তারা যেন রাশিয়াকে ভয় করে। সোভিয়েট শাসকেরা অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এই সমস্ত দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁদের কোন হস্তক্ষেপের ইচ্ছা বা পরিকল্পনা নাই।···

কিন্তু মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাশিয়ার কিংবা স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে এই মর্মে প্রচার চলিল যে, তাঁরা পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপীয় রাজ্যগুলিকে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছেন। অবশ্য আজও এই প্রোপাগান্ডা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই।

* * *

অবশ্য ১৯৪৪ সালে পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান হাইকমাণ্ডের পক্ষে আর আক্রমণাত্মক অভিযান সংগঠিত করার সাধ্য ছিল না। তবে, লালফৌজের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বা প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার জন্য জার্মানী প্রাণপণ চেষ্টা করিল এবং আগের মত তার সৈন্যশক্তির অধিকাংশই নিয়োগ করিল পূর্ব রণাঙ্গনে। ১৯৪৪ সালের আরম্ভে জার্মানীর হাতে ছিল মোট ৩১৫ ডিভিসন ও ১০ ব্রিগেড সৈন্য। এর মধ্যে ১৯৮ ডিভিসন ও ৬ ব্রিগেড সৈন্য ছিল একমাত্র পূর্ব রণাঙ্গনে। আর সেই সময় মিত্রপক্ষের ইতালীয় রণাঙ্গনে মাত্র ১৯ ডিভিসন এবং ১ ব্রিগেড জার্মান সৈন্য মোতায়েন ছিল। অধিকন্তু ১৯৪৪ সালের আরম্ভে জার্মান তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ৩৮ ডিভিসন এবং ১৮ ব্রিগেড সৈন্য সোভিয়েতবাহিনীর বিরুদ্ধে রণলিপ্ত ছিল। কিন্তু সৈন্যসংখ্যায় ও অস্ত্রসজ্জায় সোভিয়েতবাহিনীর শক্তি জার্মানীর তুলনায় অনেক বেশী ছিল। সুতরাং ১৯৪৪-এর গোড়ার দিকে সোভিয়েতবাহিনী যে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করিল, তাতে পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানীর পক্ষে আর দীর্ঘকাল আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আশা রহিল না। ১৯৪৪ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সোভিয়েতবাহিনী ৫৫০ কিলোমিটার থেকে ১১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত আগাইয়া গেল এবং উক্রাইন, বেলো-রুশিয়া, মলদাভিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও লিথুয়ানিয়া হইতে জার্মান সৈন্যেরা বিতাড়িত হইল। ১৯৪৪ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ও মিত্রপক্ষের এত দ্রুত জয়লাভের অন্যতম কারণ ছিল এই যে, তেহেরান সম্মেলনে তিন প্রধানের (চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিন) বৈঠকে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আক্রমণাত্মক অভিযানের যে পরিকল্পনা হইয়াছিল এবং বিশেষভাবে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইয়াছিল, তারই ফলে ১৯৪৪ সালে জার্মানীর অবস্থা আরও কাহিল হইয়া পড়িল। এই সমস্ত অভিযানের ফলে সমগ্র সোভিয়েত সীমানার পুনরুদ্ধার ঘটিল এবং পূর্ব প্রুশিয়ার দিকে লালফৌজ খাস জার্মানভূমিতে প্রবেশ করিল।···

কিন্তু নাৎসী জার্মানীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি নিশ্চিত পরাজয় জানিয়াও ১৯৪৪ সালের যতদিন সম্ভব, ততদিন জার্মানীর সহিত সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিল। কিন্তু মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের জনগণ ফ্যাসিস্ট দৌরাত্ম্য আর বরদাস্ত করিতে রাজী ছিল না। সুতরাং ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে ইউরোপের নানা দেশে এবং দূর-প্রাচ্যে জঙ্গীবাদী জাপানের বিরুদ্ধে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অংশে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান দেখা দিল। মহাযুদ্ধের আরম্ভে নাৎসী ব্লকে যে দশটি দেশ ছিল, অতি দ্রুত তাদের আয়ু শেষ হইয়া আসিল। ১৯৪৩ সালে একমাত্র ইতালী নাৎসী ব্লক ছাড়িয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৩-১৯৪৪ সালে জার্মান তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সকলেই ভিতরে ভিতরে যুদ্ধবিরতি

ও শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, প্রচলিত ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বজায় এবং শাসকচক্রের আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া যুদ্ধবিরতি ঘটাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তারা ইউরোপের নিরপেক্ষ দেশগুলিতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া কিংবা রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিল। অর্থাৎ 'বলসেভিক' রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি না ঘটাইয়া তারা বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ বা অস্ত্র সংবরণ করিতে ইচ্ছুক ছিল। কমিউনিষ্ট আধিপত্যের আশঙ্কায় এই সমস্ত তাঁবেদার দেশের শাসকচক্র অত্যন্ত ভীত ছিল। কারণ, এই সমস্ত শাসকচক্র গঠিত ছিল বড় বড় ধনিক, বণিক ও ভূম্যধিকারীদের দ্বারা। সুতরাং তাদের মনে সামাজিক বিপ্লবের আতঙ্ক ছিল। এ জন্যই নাৎসী জার্মানীর পক্ষপুট ছাড়িতে তাদের এত অনিচ্ছা ও আপত্তি ছিল।...

গোড়াতেই ফিনল্যাণ্ডের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কারণ, ১৯৪৩ সালেই ফিনল্যাণ্ডের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া শান্তি স্থাপনের জন্য ফিনিশ প্রেসিডেণ্টের নিকট এক আবেদন পেশ করিয়াছিলেন এবং সোস্যাল ডেমোক্রাট পার্টিও জনগণের পক্ষ থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দাবী জানাইলেন। এমনি কি জেনারেল ম্যানারহাইমের মত ফ্যাসিস্টপন্থী সামরিক নেতা পর্যন্ত ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর আর জয়লাভের আশা নাই। ফিনল্যাণ্ডের পক্ষেও আর সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালনার সম্ভাবনা নাই। 'সুতরাং যদি এখন শান্তি প্রতিষ্ঠা না করা যায়, তবে এক ঘোরতর বিপর্যয় ঘটিয়া যাইবে! কারণ, সোভিয়েত রাশিয়া এখন যুদ্ধে জয়লাভের নেশার দ্বারা আচ্ছন্ন'—ম্যানারহাইম এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক পুস্তকে।[১]

সোভিয়েত সরকার ফিনল্যাণ্ড সম্পর্কে কোন কড়া মনোভাব অবলম্বন করেন নাই কিংবা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণেরও দাবী করেন নাই। কিন্তু ফিনিশ সরকার ১৯৩৯ সালের পুরাতন সীমানা (১৯৪০ সালের রুশ-ফিনিশ যুদ্ধের ফলে যে সীমানার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল) পুনরায় ফেরৎ পাওয়ার দাবী করিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে এই শর্ত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, সুতরাং যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া গেল। এর পর ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সোভিয়েতবাহিনী লেনিনগ্রাদ ও নভোগোরোদ অঞ্চলের শক্তিশালী জার্মান ব্যূহগুলি প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা চূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং জার্মান সৈন্যদেরকে বাল্টিক রাজ্যের মধ্য দিয়া তাড়া করিয়া নিয়া গেল। সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের উত্তর-পশ্চিম অংশের যুদ্ধে লালফৌজের এই সাফল্য দেখিয়া ফিনিশ সরকার বিচলিত হইলেন এবং পুনরায় সোভিয়েতের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়া সরাসরি আলোচনার উদ্যোগ নিলেন। ষ্টকহোমের মহিলা সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আলেকজেন্দ্রা কোলোনতাইয়ের সঙ্গে ফিনিশ সরকারের প্রতিনিধি জুহো প্যাসিকিভি (Juho Passikivi) জ্যাকব ওয়ালেনবার্গ নামক একজন বিশিষ্ট সুইডিশ শিল্পপতির মারফৎ দেখা করিলেন এবং শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ফলে, মস্কো থেকে ফিনিশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হইল সরাসরি আলোচনার জন্য।

১। Diplomacy of Aggression—V. Issraeljans & L. Kutakov, P. 329.

২৬শে মার্চ ফিনিশ সরকারের দুইজন প্রতিনিধি প্যাসিকিভি এবং কার্ল এঙ্কেল (Carl Enckell) মস্কোতে পৌঁছিলেন ও আলোচনা বৈঠকে যোগ দিলেন। সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধাবসানের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি উত্থাপিত হইল :

১. জার্মানীর সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের অবিলম্বে সম্পর্কচ্ছেদ এবং জার্মান সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজগুলির বহিষ্কার কিংবা আটক।

২. ১৯৪০ সালের সোভিয়েত-ফিনিশ শান্তি সন্ধির পুনর্নবীকরণ।

৩. সোভিয়েত ও মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দান।

৪. ১৯৪৪, মে মাসের মধ্যে ফিনিশ সৈন্যবাহিনীর অর্ধেক হ্রাস এবং শান্তির সময়ের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন।

৫. সোভিয়েত রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচ বছরের মধ্যে ৬০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের দ্রব্যাদি সরবরাহ।

৬. ১৯২০ এবং ১৯৪০ সালের শান্তি-সন্ধি অনুযায়ী ফিনল্যাণ্ডকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে পেটসামো এবং পেটসামো অঞ্চল অর্পণ করিয়াছিলেন, সেগুলির প্রত্যর্পণ।

এই ছয় দফা দাবী মানিয়া নিলে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের হ্যাঙ্কো উপদ্বীপ নিয়া যে লীজ সম্পাদন করা হইয়াছিল, বিনা ক্ষতিপূরণে তা বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে।

যদিও প্যাসিকিভি এই সমস্ত শর্ত গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন, তথাপি ফিনিশ সরকার রাজী হইলেন না কিংবা কোন বিকল্প প্রস্তাবও উত্থাপন করিলেন না। আসলে বার্লিন ফিনিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছিল যুদ্ধবিরতির বিরুদ্ধে। ১৯৪৪, ফেব্রুয়ারী মাসে হেলসিংকিতে জার্মান রাষ্ট্রদূত ব্লুচার (Blucher) প্রেসিডেণ্ট রাইটিকে (Ryti) পরিষ্কার বলিলেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে পৃথক সন্ধি স্বাক্ষর করিলে সেটা বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া গণ্য হইবে এবং জার্মানবাহিনী হাঙ্গেরীর মত ফিনল্যাণ্ডও দখল করিয়া নিবে। ফিনিশ শাসকচক্র ছিল নাৎসী জার্মানীর পক্ষপাতী ও সহযোগী। সুতরাং জার্মানীর এই হুমকির নিকট মাথা নত করিয়া ফিনিশ সরকার মস্কোর সঙ্গে শান্তি আলোচনায় ভঙ্গ দিলেন এবং জার্মানীর সঙ্গে আরও ৬ মাস ধরিয়া সহযোগিতা করিয়া চলিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে জার্মানীর দিক থেকে যুদ্ধের অবস্থা আরও খারাপ হইল। ফিনিশ প্রেসিডেণ্ট রাইটি অসুস্থতার জন্য পদত্যাগ করিলেন এবং ১লা আগস্ট জেনারেল ম্যানারহাইম প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ ও নূতন সরকার গঠন করিলেন। এই সরকার আগস্ট মাসে পুনরায় মস্কোর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনার জন্য যোগাযোগ স্থাপন করিলেন এবং ৩রা ও ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রে সোভিয়েত সরকারকে জানাইলেন যে, তাঁরা যুদ্ধবিরতির প্রাথমিক শর্ত গ্রহণ করিতেছেন এবং শত্রুতা বন্ধ করিতেছেন। অপর পক্ষে ফিনিশ সরকার ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪, তাঁদের জার্মান মিত্রকে জানাইয়া দিলেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে তাঁরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতেছেন। ফিনিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী কার্ল এঙ্কেল যখন জার্মান দূত ব্লুচারকে ডাকিয়া আনিয়া উপরোক্ত মর্মে একটি বিবৃতি তাঁকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন, তখন দূত মহাশয়ের প্রতিক্রিয়া বড় অদ্ভুত হইয়াছিল। ব্লুচার রাগিয়া টঙ্ হইয়াছিলেন এবং ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন :

'আপনার তো সাহস কম নয়? এরূপ একটা বিবৃতি আপনি আমাকে পড়ে শুনাচ্ছেন?'[১]

কিন্তু জার্মান প্রভুরা ফিনিশ সরকারের উপর যতই ক্রুদ্ধ হউক, ফিনল্যান্ড রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চালাইতে আর ইচ্ছুক ছিল না। কেননা, ফিনিশ জনগণ ও নেতাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধে জয়লাভের আর কোন আশা নাই। সুতরাং ১৪ই সেপ্টেম্বর মস্কোতে ফিনিশ সরকারের প্রতিনিধিরা মিত্র-শক্তিপুঞ্জের প্রতিনিধি সোভিয়েত ও বৃটিশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির আলোচনা শুরু করিলেন এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর ফিনল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।...

১৯৪৪-এর গোড়ার দিকে রুমানিয়া ও সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে জার্মানীর অবস্থা দেখিয়া যুদ্ধবিরতির দিকে ঝুঁকিল, কিন্তু তারাও অন্যান্য বলকান রাজ্যের মত সোভিয়েত রাশিয়ার বদলে একমাত্র ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিতে চাহিল। সোভিয়েতবাহিনী যতই রুমানিয়ার সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ততই রুমানিয়ার আন্তোনেস্কু ফ্যাসিস্ট শাসকচক্র বৃটেন ও আমেরিকার দিকে ঝুঁকিল। কিন্তু কার্যত পৃথক সন্ধিচুক্তি করা সম্ভব ছিল; কেননা, ফ্যাসি-বিরোধী কোয়ালিশনের শক্তিবর্গের মধ্যে, অর্থাৎ রাশিয়া বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষরিত (১৯৪৩ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র সম্মেলনে) হইয়াছিল যে, শত্রুপক্ষের কাহারও সঙ্গে কোন পৃথক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করা যাইবে না। অথচ লক্ষ্য করার এই যে, যদিও রুমানিয়া সরকারীভাবে রাশিয়া, বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে "যুদ্ধরত" ছিল, তবু সে হাতে-কলমে যুদ্ধ চালাইতেছিল একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে। সুতরাং ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৪, বৃটিশ সরকার সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট একটি মন্তব্য লিপিতে স্বীকার করিলেন যে, রুমানিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতির শর্ত আলোচনায় রাশিয়ার প্রাধান্য মানিয়া লওয়া হইবে।...

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে সোভিয়েতবাহিনী বুগ নদী অঞ্চলে প্রকান্ড আক্রমণ চালাইল এবং নীপার নদীর পশ্চিমে সমগ্র উক্রাইন দখল করিয়া রুমানিয়া ও চেকোশ্লভাকিয়ার সীমান্তে পৌঁছিল। কিন্তু রুমানিয়ার শাসকচক্রের প্রধান আন্তোনেস্কুর প্রতিনিধিরা কায়রোতে ইঙ্গ-মার্কিন মহলের সঙ্গে দহরম-মহরমের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত চেষ্টা বৃথা গেল। বরং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মিত্রপক্ষীয় প্রধান সেনাপতি জেনারেল মেইটল্যান্ড উইলসন আন্তোনেস্কুর নিকট একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়া অবিলম্বে রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য দাবী করিলেন। তখন সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করিলেন যে অধিকতর রক্তপাত বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁরা রুমানিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতির শর্ত আলোচনা করিতে রাজী আছেন। কায়রোতে রুমানিয়ার প্রতিনিধি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট বারবু স্টারবির (Barbu Stirbey) নিকট সোভিয়েত প্রতিনিধি ৬ দফা শর্ত সম্বলিত যুদ্ধবিরতির একটি চুক্তিপত্র পেশ করিলেন—১২ই এপ্রিল। এই ছয় দফা শর্তের মধ্যে ছিল রুমানিয়াকে জার্মানীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। রুমানিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এবং

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৬১।

রুমানিয়া ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ১৯৪০ সালের সীমানার পুনরুজ্জীবন করিতে হইবে। আর ভিয়েনা বাঁটোয়ারার দ্বারা (হিটলারের 'মধ্যস্থতায়') ট্রান্সালভিনিয়ার যে অংশ হাঙ্গেরীকে অর্পণ করা হইয়াছিল, সেই বাঁটোয়ারা বাতিল করিয়া রুমানিয়াকে সেই অঞ্চলটি ফেরৎ দেওয়া হইবে। এই তিনটি প্রধান শর্ত ছাড়া আরও কয়েকটি শর্ত ছিল সোভিয়েত রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণ সম্পর্কে।

বলা বাহুল্য যে, আন্তোনেস্কু সরকার যুদ্ধবিরতির এই সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন এবং নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধ চালাইবার জন্য হিটলারের সঙ্গে আরও শলা-পরামর্শ করিলেন।

কিন্তু ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব সোভিয়েত অভিযান দুর্বার হইয়া উঠিল এবং এই অভিযানে বাধা দেওয়ার জন্য জার্মান হাইকমাণ্ড প্রায় ৫০ ডিভিসন সৈন্য (এর মধ্যে ২৫ ডিভিসন জার্মান) নিয়োগ করিলেন এবং এই সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশই সন্নিবেশ করিলেন জ্যাসি ও কিসিনেভ এলাকায়—রুমানিয়ায় প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ করার জন্য। অপরপক্ষে সোভিয়েত জেনারেল ম্যালিনোভস্কির অধীন দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্ট এবং জেনারেল তোলবুখিনের অধীন তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্ট একযোগে জার্মানবাহিনীর বিরুদ্ধে ৯০ ডিভিনন পদাতিক সৈন্য (জার্মানীর হিসাব অনুসারে) এবং ৪১টি ট্যাংক বহর ও তিনটি অশ্বারোহী দল সহ প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইলেন। ২০শে আগস্ট থেকে কয়েকদিন ধরিয়া এখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। ১৫টি জার্মান ডিভিসন ফাঁদে পড়িল, ৬০ হাজার নিহত হইল এবং কয়েকজন (২৭ জন) সেনাপতি সহ ১ লক্ষ ৬ হাজার সৈন্য বন্দী হইল, ৭ জন সেনাপতিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। প্রচুর ট্যাংক, কামান ও বিমান ধৃত বা ধ্বংস হইল। কার্যতঃ ৬নং জার্মান আর্মি ধ্বংস হইয়া গেল এবং ৮নং আর্মি তাড়াহুড়া করিয়া পশ্চিমদিকে কার্পেথিয়ান পর্বত অভিমুখে পলায়ন করিল। ২২শে আগস্ট জ্যাসি এবং ২৪শে আগস্ট কিসিনেভ দখল হইয়া গেল এবং ৩০শে আগস্ট ম্যালিনোভস্কির বিজয়ী সৈন্যেরা বুখারেস্টে এবং তৈলকেন্দ্র প্লোয়েস্টিতে প্রবেশ করিল। এর সাতদিনের কিছুপরেই তোলবুখিনের সৈন্যের বুলগেরিয়া ছাইয়া ফেলিল।[১]

লালফৌজের এই অভিযানের সুযোগে রুমানিয়ার আন্তোনেস্কু ফ্যাসিস্ট চক্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান শুরু হইল। এই অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবিরোধী জনগণ ও কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল এবং ডিক্টেটর আন্তোনেস্কু, যিনি তখনও হিটলারের ভরসায় ছিলেন, রাজা মাইকেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দলবলসহ রাজপ্রাসাদে বন্দী হইলেন। রুমানিয়ায় নতুন গবর্নমেণ্ট গঠিত হইল এবং হিটলার সেই সংবাদে ক্ষিপ্ত হইয়া দক্ষিণ অঞ্চলের প্রধান জার্মান সেনাপতি জেনারেল ফ্রাইসনারকে (Friessner) হুকুম দিলেন নতুন রুমানীয় গবর্নমেণ্টকে উচ্ছেদের জন্য। কিন্তু ততক্ষণে রুমানীয় সৈন্যেরাও নাৎসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল এবং রুমানিয়ায় আর ফ্যাসিস্টদের প্রতিষ্ঠার সুযোগ রহিল না। অধিকন্তু জার্মানেরা সমগ্র রুমানিয়া থেকে বিতাড়িত হইল। এর কিছু দিন পরেই রুমানিয়ার এক প্রতিনিধিদল মস্কোতে আমন্ত্রিত হইলেন এবং ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪, রুমানিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল।

১। আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ—পৃষ্ঠা ৮০৬-৭।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে রাজা বোরিসের আকস্মিক মৃত্যুর পর বুলগেরিয়াতে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব শুরু হইল। কিন্তু কিভাবে রাজা বোরিস হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ? এই সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের গবেষণায় একটি বিষয় নিশ্চিতরূপে বুঝা গেল এবং তা এই যে, রাজা বোরিসের মৃত্যু ঘটিয়াছে বিষক্রিয়ার জন্য। কিন্তু কে বা কারা এই বিষ প্রয়োগ করিল ? একদল বলিলেন যে, জার্মান সিক্রেট সার্ভিস (গোয়েন্দা বিভাগ) এই বিষ প্রয়োগের জন্য দায়ী। কিন্তু হিটলার দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন যে, না, এই বিষ প্রয়োগের জন্য দায়ী বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিস। কেননা, রাজা বোরিস জার্মানীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং জার্মানী ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সহযোগিতার ভক্ত ছিলেন।

কিন্তু বোরিসের মৃত্যুর পর বুলগেরিয়ার বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল, তাতে জার্মানীর তদ্বিরে ও চাপের ফলে ফ্যাসিস্টপন্থীরা ক্ষমতা দখল করিল। কিন্তু বুলগেরিরার জনসাধারণ ফ্যাসিস্ট অনুরাগী ছিলেন না। তাঁরা সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি বুলগেরিয়ার ফ্যাসিস্টপন্থী শাসকচক্র জার্মানীকে বুলগেরিয়ায় সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিল এবং নানাভাবে সাহায্য করিল। সোভিয়েত সরকার বুলগেরিয়ার এই সমস্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইল এবং হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলিল যে, বুলগেরিয়ার ঘাঁটি ও বন্দর থেকে জার্মান নৌবহর কৃষ্ণসাগরীয় এলাকায় রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে এবং বুলগেরিয়া 'নিরপেক্ষতার' আড়ালে জার্মানীকে সহায়তা দিতেছে বলকানের অভ্যন্তরে সামরিক তৎপরতার জন্য।

কিন্তু একদিকে যখন বুলগেরিয়ার শাসকচক্র সোভিয়েত-বিরোধী নীতি অনুসরণ করিতেছিল, অন্যদিকে তখন তারা চেষ্টা করিতেছিল ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সঙ্গে পৃথক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার জন্য। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে কায়রোতে বুলগেরিয়ার প্রতিনিধি বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন সোভিয়েত সরকার বুলগেরিয়ার নিকট এক চরমপত্র পেশ করিয়া দাবী করিলেন যে, অবিলম্বে জার্মানীর সঙ্গে বুলগেরিয়ার সম্পর্কচ্ছেদ করিতে হইবে। কিন্তু এই দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায় সোভিয়েত সরকার বাধ্য হইলেন বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য। ৮ই সেপ্টেম্বর মার্শাল তোলবুখিনের নেতৃত্বে তৃতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্টের সৈন্যেরা রুমানিয়া থেকে বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বুলগেরিয়ার সোভিয়েত পক্ষপাতী জনগণ ফ্যাসিস্ট কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় লালফৌজকে স্বাগত জানাইল এবং ৮-৯ই সেপ্টেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় জনগণের যে অভ্যুত্থান ঘটিল, তার ফলে "ফাদারল্যাণ্ড ফ্রণ্ট গবর্নমেণ্ট" গঠিত হইল। এই নূতন ফ্যাসিবিরোধী গবর্নমেণ্ট অবিলম্বে জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। অধিকন্তু জার্মানীর বিরুদ্ধে পালটা যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই নূতন গবর্নমেণ্ট মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তাব করিলেন। তখন সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দাবী করা হইল যে, গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়াতে যে সমস্ত বুলগেরিয় সৈন্য ও প্রশাসক কর্মী রহিয়াছেন, তাঁদেরকে অবিলম্বে ঐ সমস্ত ভূখণ্ড হইতে সরাইয়া আনিতে হইবে। বুলগেরিয়ার ফাদারল্যাণ্ড ফ্রণ্ট গবর্নমেণ্ট এই দাবী মানিয়া নিলেন। তখন বুলগেরিয়ার নূতন সরকারী প্রতিনিধিদিগকে মস্কোতে আহ্বান জানানো হইল যুদ্ধবিরতির চুক্তি

আলোচনার জন্য। রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ২৬-২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪, আলোচনার পর বুলগেরিয়ার প্রতিনিধিরা যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলেন।...

১৯৪৪ সালের শরৎকালে সারা ইউরোপে নাৎসী জার্মানীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র বাকি রহিল হাঙ্গেরী এবং হাঙ্গেরীয় রাষ্ট্রপ্রধান এ্যাডমিরাল হোর্থি (Horthy) যদিও ফ্যাসিস্টভক্ত ছিলেন এবং ২৫ বছর ধরিয়া হিংস্র ডিক্টেটরি চালাইয়া আসিতেছিলেন, তবু রুশ-জার্মান রণাঙ্গনের পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া (বিশেষতঃ পূর্ব রণাঙ্গনে হাঙ্গেরীয় সৈন্যদলের শোচনীয় পরাজয়ের) হাঙ্গেরীও রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে উদ্‌গ্রীব হইল। কিন্তু হোর্থি শাসকচক্র সোভিয়েতের বদলে একমাত্র ইঙ্গ মার্কিন পক্ষের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিবেন। কিন্তু হাঙ্গেরীর দুর্ভাগ্যক্রমে চার্চিলের 'বলকান রণনীতি, বানচাল হইয়া যাওয়ার ফলে (মার্কিনপক্ষও এই রণনীতির বিরোধী ছিলেন) হোর্থির মনোবাসনা আর পূর্ণ হইল না। তখন হোর্থি নিজেই স্বীকার করিলেন যে, 'হাঙ্গেরীর সীমানা পশ্চিম ইউরোপ থেকে এত দূরবর্তী যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে পৃথক চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব নয়।'[১]

যদিও হাঙ্গেরী পূর্ব রণাঙ্গন থেকে তার সৈন্যদলকে ফিরাইয়া আনিতে চাহিল 'স্বদেশের সীমানার প্রতিরক্ষার' জন্য, তথাপি হিটলার এবং কাইটেল হাঙ্গেরীর এই অনুরোধ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অধিকন্তু হাঙ্গেরীর মতিগতি পর্যবেক্ষণ করিয়া হিটলারের মনে সন্দেহ দেখা দিল এবং তিনি হাঙ্গেরী দখলের মনস্থ করিলেন। তিনি এ্যাডমিরাল হোর্থিকে এক সাক্ষাৎকারে জানাইয়া দিলেন যে, হাঙ্গেরীকে আর বিশ্বাস করা চলে না। সুতরাং তিনি হাঙ্গেরী দখল করাই স্থির করিয়াছেন। হোর্থি নিজের জান বাঁচাইবার জন্য হিটলারের প্রস্তাবে রাজী হইলেন এবং উভয়ে মিলিয়া স্থির করিলেন যে, হাঙ্গেরী ও জার্মানী একত্রে 'বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' চালাইয়া যাইবেন!

হোর্থি ফ্যাসিজমের ভক্ত এবং বলশেভিজমের ঘোর বিরোধীরূপে নিজেকে জাহির করা সত্ত্বেও হিটলারের হাত থেকে হাঙ্গেরীর কোন স্বাতন্ত্র্য বা নিজের কর্তৃত্ব রক্ষা করিতে পারিলেন না। কারণ, 'ইউরোপীয় তরণীর কর্ণধাররূপে' হিটলার যতদিন খুশী হাঙ্গেরীকে নিজের মুঠির তলায় রাখিতে চাহিলেন।

১৯শে মার্চ জার্মান সৈন্যেরা উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে হাঙ্গেরী দখল করিতে শুরু করিল এবং ২২শে মার্চ হিটলার হুকুম দিলেন বুদাপেস্ট দখলপূর্বক হাঙ্গেরীয় সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করার জন্য।

আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে হাঙ্গেরী ও জার্মানী একত্রে সোভিয়েত রাশিয়াকে বাধা দেওয়ার জন্য যখন মতলব আঁটিতেছিল, তখন লালফৌজ আগাইয়া আসিতেছিল হাঙ্গেরীর সীমানার দিকে। তখন হাঙ্গেরী যুদ্ধবিরতি ঘটাইবার উদ্দেশ্যে মস্কোতে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাইলেন এবং ১১ই অক্টোবর প্রাথমিক যুদ্ধবিরতির শর্তে স্বাক্ষর দিলেন। কিন্তু এই চুক্তিতে মিত্রপক্ষ এমন কয়েকটি শর্তের উল্লেখ করিয়াছিলেন, যেগুলি গ্রহণ করিতে হোর্থিচক্র রাজী ছিল না। তথাপি ১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৪,

১। ডিপ্লোম্যাসি অব্ অ্যাগ্রেসন—মস্কো, পৃষ্ঠা ৩৪৩।

হোর্থি রেডিওযোগে এক বক্তৃতায় কৈফিয়ৎ দিলেন কেন হাঙ্গেরী নাৎসী-বিরোধী জোটের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইতেছেন। এই বক্তৃতার মধ্যে জার্মানীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল। তখন ক্রুদ্ধ নাৎসীরা বুদাপেস্টে এক অভ্যুত্থান ঘটাইল এবং হোর্থি ও তাঁর দলবলকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করিল।

এদিকে ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরের শেষে মার্শাল ম্যালিনোভস্কির নেতৃত্বে দ্বিতীয় উক্রাইনীয় ফ্রণ্ট হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং জার্মান সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া হাঙ্গেরীয় জনগণের মুক্তি বিধান করিতে লাগিল। হাঙ্গেরীর মুক্ত অঞ্চলগুলিতে ফ্যাসিবিরোধী জনগণ স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় নিজেদের শাসন প্রবর্তন করিলেন। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও নেতা হোর্থির ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরোধী ছিলেন, তাঁরা ২২শে ডিসেম্বর ডেব্রিসেনে (Debrecen) একটি অস্থায়ী জাতীয় গবর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা দিলেন। এই গবর্নমেণ্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই নূতন সরকারেরা প্রতিনিধিরা মস্কোতে আহূত হইলেন যুদ্ধবিরতির শর্ত আলোচনার জন্য। ইতিপূর্বে রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড ও বুলগেরিয়ার সঙ্গে মিত্রপক্ষের যে সমস্ত শর্তে যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৫, সেই সমস্ত শর্তেই হাঙ্গেরীর সঙ্গেও যুদ্ধবিরতির চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল।

এভাবে ১৯৪৪ সালে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের রাজ্যগুলি একে একে নাৎসী জার্মানীর কবল থেকে মুক্তি লাভ করিল এবং ১৯৪৫ সালে জার্মানীর চূড়ান্ত পতন আসন্ন করিয়া তুলিল।

* * *

কিন্তু এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বলকান অঞ্চলে যবনিকা পতনের আগে জার্মানবাহিনী এবং সরকারী হাঙ্গেরীয় বাহিনীর একাংশ সম্মিলিতভাবে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালাইয়াছিল এবং রাজধানী বুদাপেস্টের সংগ্রাম দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। মার্শাল ম্যালিনোভস্কি নভেম্বর মাসে বুদাপেস্ট অবরোধ করেন এবং ডিসেম্বর মাসে জেনারেল তোলবুখিন এই অবরোধে আসিয়া যোগ দিলেন। ফলে, বুদাপেস্ট নগরী (বুদা এবং পেস্ট এই দুই শহর একত্রে বুদাপেস্ট— মধ্য দিয়া বিখ্যাত দানিয়ুব নদী প্রবাহিত) ২৯শে নভেম্বর থেকে আংটির মতো সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে জার্মান ও হাঙ্গেরীয় বাহিনী প্রায় আড়াইমাস কাল প্রশংসনীয় অবরোধ যুদ্ধ চালাইয়াছিল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ বুদাপেস্টের পতন হয়। কিন্তু এর আত্মরক্ষা যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচায়ক ছিল এবং পূর্ব রণাঙ্গনে এটাই ছিল শেষ সামরিক নাটকীয় ঘটনা।

এমন কি সোভিয়েত সামরিক পুস্তকে পর্যন্ত এই অবরোধ যুদ্ধকে পরোক্ষে প্রশংসা করা হইয়াছে।

'In no operation in 1944 was the defensive fighting as fierce as in Budapest. No encircled enemy group required so much time to be liquidated'[১]

অর্থাৎ সারা ১৯৪৪ সালে বুদাপেস্টের আত্মরক্ষার যুদ্ধের মত এত হিংস্র যুদ্ধ আর হয় নাই। কোন অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনীকে সাবাড় করার জন্য এত দীর্ঘ সময়ও আর লাগে নাই।

বুদাপেস্টে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়াছিল এবং অবরোধ ভাঙ্গার পর ১ লক্ষ ৩৮ হাজার সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

এর পর শুরু হইয়াছিল ইউরোপের সুবিখ্যাত বালাতন হ্রদের যুদ্ধ।*

সেই সময় বালাতন হ্রদের যুদ্ধকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল এই কারণে যে, এর সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অস্ট্রিয়ার ভাগ্য জড়িত ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের জার্মান নায়ক জেনারেল লুডেনডর্ফ একদা 'ভবিষ্যদ্বাণী' করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতের যুদ্ধ বালাতন হ্রদের নিকটবর্তী কোন সংগ্রামে চূড়ান্তরূপে নির্ণীত হইবে:

'that the future war would be decided in a battle near Lake Balatan.'

এবারও বালাতন হ্রদের নিকট জার্মান ও হাঙ্গেরীয় সৈন্যেরা সোভিয়েতবাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালাইল। কিন্তু মার্চ মাসের শেষ ভাগে বালাতন হ্রদের প্রতিরক্ষা চূর্ণ হইয়া গেল, এবং মার্শাল তোলবুখিন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার রাস্তা খোলা পাইলেন। এপ্রিল মাসে (১৯৪৫) ভিয়েনা দখল হইয়াছিল। সুতরাং বালাতন হ্রদের যুদ্ধ সম্পর্কে লুডেনডর্ফের ভবিষ্যদ্বাণী কিছুটা ফলিয়াছিল বৈকি। কারণ, এর পরেই বার্লিনের পতন হইয়াছিল।

* * *

১৯৪৪ সালে লালফৌজের এই অভিযান ইউরোপের মুক্তির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। গত তিন বছর ধরিয়া জার্মানী পূর্ব রণাঙ্গনে যে প্রচণ্ড ক্ষয় ও ক্ষতি বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে কথা উল্লেখ করিয়া বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল ২রা আগস্ট, ১৯৪৪ এক বক্তৃতায় স্বীকার করেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া জার্মান বাহিনীকে এত বড় প্রচণ্ড আঘাত আর কেহ দিতে পারিত না। আকাশে এবং সমুদ্রে মিত্রপক্ষ তাল সামলাইতে পারিতেন বটে, কিন্তু পৃথিবীতে আর কোন শক্তিই রাশিয়ার মত জার্মানীকে এত ঘায়েল করিতে পারিত না:

'It is the Russian Army that has done the main work of tearing the guts out of the German Army. In the air and on the ocean and seas we can maintain ourselves, but there was no force in the world which could have been called into being except after several more years that would have been able to maul and break the German Army and subject it to such terrible slaughter and manhandling as has fallen upon the Germans by the Russian Soviet armies'.[১]

মিত্রপক্ষের তরফ থেকে রণবিশারদ মিঃ চার্চিলের এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্যের মধ্যেই সোভিয়েত রাশিয়ার গৌরব ও কৃতিত্বের অকপট স্বীকৃতি রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ১৯৪৪ সালেই ইউরোপের মুক্তি শুরু হইয়াছিল।

সপ্তম পর্ব

নবম অধ্যায়

চীনের বিতর্কিত ভূমিকা :
জাপানী যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ ও অন্যান্য সঙ্কট

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চীনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত বিতর্কিত। যদিও সে মিত্রশক্তিপুঞ্জের অন্তর্গত ছিল, তবু বৃটেন বা সোভিয়েত রাশিয়া তাকে কোন বৃহৎ শক্তিরূপে মানিয়া লইতে উৎসাহী ছিল না। দ্বিতীয়তঃ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যদিও তাকে সমর্থন ও সম্মান দিয়াছিলেন, তথাপি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় চীন ব্যর্থ হইয়াছিল এবং চীন-বর্মা রণাঙ্গনের মার্কিন জেনারেল স্টিলওয়েলের সঙ্গে তাঁর বনিবনা ছিল না। ফলে, অবস্থা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। তৃতীয়তঃ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে চিয়াং কাইসেকের বিরোধ শত্রুতার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে চিয়াং বরং কমিউনিস্টদেরকে সংহার করার ব্যাপারে বেশী উৎসাহী ছিলেন। চতুর্থতঃ গোটা চীনের উপর চীয়াং সরকারের আধিপত্য ছিল না। জাপানী অধিকৃত মাঞ্চুরিয়াসহ প্রকাণ্ড ভূভাগ ছাড়াও মাও-সেতুংয়ের কমিউনিস্ট পার্টির দখলে ছিল উত্তর পশ্চিমের সুবৃহৎ অংশ, আর ছিল অতীত ইতিহাসের জেরস্বরূপ কিছু কিছু প্রচ্ছন্ন 'রণপ্রভু' (ওয়ারলর্ড) যারা কোন কোন অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব খাটাইতে চেষ্টা করিত আর সর্বোপরি বা পঞ্চমতঃ ছিল আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, ঘুষ, অনাচার, অপশাসন এবং নৈতিক পতন। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও তাঁর সহকর্মীদের পৃষ্টপোষকতায় জনসংখ্যাবহুল (চীনের এই বিশান জনসংখ্যা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজে লাগিবে বলিয়া রুজভেল্টের বিশ্বাস ছিল) চীন বৃহৎ শক্তিবর্গের পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও এবং বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়া শেষ পর্যন্ত চীনের এই স্টেটাস্ বা রাষ্ট্রিক মর্যাদা মানিয়া নিলেও মহাযুদ্ধে চীনের ভূমিকা যেমন গৌরবোজ্জ্বল ছিল না, তেমনি চিয়াং কাইসেক ও কুওমিণ্টাং-এর ভূমিকা নিয়া ঘরে-বাইরে বিতর্ক ও বিতণ্ডাও অভাব ছিল না। চীনের জটিল ও সঙ্কটজনক অবস্থার জন্য চিয়াং কাইসেক জাপানের সঙ্গে পৃথক সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া ফেলিতে পারেন, কোন কোন সময় মিত্রপুঞ্জ মহলে এমন আশঙ্কার কথাও শুনা যাইত। এমনকি, মহাযুদ্ধের পরে চীনে সর্বাত্মক কমিউনিস্ট প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা নিয়া আজও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলে মতভেদের অন্ত নাই। কেবল চিয়াং কাইসেক নহেন; স্বয়ং রুজভেল্টও সমালোচনার পাত্র হইয়াছিলেন।...

* * *

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান কর্তৃক গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে চীন মনে করিল এতদিন পরে তার দুঃখের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। কারণ, ১৯৩৭ সালের জুলাই মাস থেকে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাইয়া আসিতেছিল, চীন চার বছর ধরিয়া এককভাবে সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল। কিন্তু এতদিন পরে বৃটেন ও আমেরিকার মত

মহাশক্তিশালী রাষ্ট্র চীনের মিত্রপর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং জাপানের এই জঙ্গী আস্ফালন আর কতদিন টিকিবে ? কিন্তু চিয়াং কাইসেক ও চুংকিং গভর্নমেণ্ট পার্ল হারবারে মার্কিন বিপর্যয়ের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন না। সুতরাং এই মহাযুদ্ধ যে দীর্ঘস্থায়ী হইবে, তখন সেই ধারণাও তাঁদের ছিল না। কিন্তু জাপানীরা অতি দ্রুত হংকং কাড়িয়া নিল এবং মালয় ও ব্রহ্মদেশ বিপন্ন হইল। তখন জেনারেল চিয়াং কাইসেক মিত্রপুঞ্জ কর্তৃক চীন, শ্যাম ও ফরাসী ইন্দোচীন এলাকার সুপ্রীম কমাণ্ডার পদে নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি জেনারেল ওয়েভেলের সঙ্গে পরামর্শের জন্য বর্মাতে গেলেন। ওয়েভেল তখন ভারত-ব্রহ্ম-মালয় ও পূর্ব ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের সর্বপ্রধান সেনাপতি ছিলেন। লেঃ জেনারেল স্টিলওয়েল, যিনি পিকিং-এ গত কয়েক বছর ধরিয়া মার্কিন দূতাবাসে মিলিটারির প্রতিনিধির কাজ করিতেছিলেন, তিনি মার্চ মাসে বর্মার প্রতিরক্ষার জন্য পঞ্চম ও ষষ্ঠ চীনা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বীরত্বপূর্ণ লড়াই সত্ত্বেও চীনা সৈন্যেরা পরাজিত হইল। রেঙ্গুন ও লাসিওর পতন এবং বর্মা রোডের সঙ্গে চীনের সংযোগ নষ্ট হইল। ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে জেনারেল শেনল্টের (Chennault) নেতৃত্বে চীনে মার্কিন বিমান বাহিনী পুনর্গঠিত হইল এবং তাঁরা জাপানী ঘাঁটি, জাহাজ যাতায়াতের পথ ও সরবাহ লাইনের উপর বোমারু আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। তখন রেঙ্গুনের পতন ও বর্মা রোড বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর চীন কার্যতঃ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। এমন কি, ভূমিপথে মধ্য এশিয়ার মধ্য দিয়া রাশিয়া থেকে চীন যে সরবরাহ পাইতেছিল, হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের (জুন ১৯৪১) ফলে তা'ও বন্ধ হইয়া গেল। তখন একমাত্র যোগসূত্র রইল আকাশ পথে ভারতের সঙ্গে। পূর্ব হিমালয়ের ১৬ থেকে ২০ হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু পর্বতশৃঙ্গের উপর দিয়া এই সমস্ত মার্কিন বিমান অত্যন্ত সাহসিকতা ও বিপদের ঝুঁকি নিয়া উড়িয়া যাইত এবং রণসম্ভার সরবরাহ দিত। যদিও পরিমাণে এই সরবরাহ বেশী ছিল না, তবু সেই দুর্দিনে এই সরবরাহেরও গুরুত্ব ছিল। বলা বাহুল্য যে, কলকারখানায় ও শ্রমশিল্পে চীন আদৌ উন্নত ছিল না। কিন্তু যেটুকু কলকারখানা ছিল, তাও সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি জাপানের দখলে চলিয়া যাওয়ায়, এই সমস্ত কলকারখানা ভিতরের দিকে স্থানান্তরিত করিতে হইল। তৈল ও খনিজ সম্পদের উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা হইল এবং যে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছিল, তাও হ্রাস করার চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু পাঁচ বছরের যুদ্ধের পর সেই চেষ্টা সার্থক হওয়া কঠিন ছিল। তবে, চীন চাষী-প্রধান দেশ বলিয়া ১৯৪২ সালেও ফসল ভালো হইয়াছিল এবং দীর্ঘ অবরোধ সত্ত্বেও কিছু কিছু পুনর্গঠনের এবং সড়ক, রেলওয়ে ও জলপথের পরিবহণগুলির উন্নয়নের চেষ্টা হইল। কিন্তু জাপানী আক্রমণ ও জাতীয় জীবনে গভীর সংকটের অন্ধকারের মধ্যে একটা ভালো লক্ষণ এই দেখা গেল যে, চীনের সমাজজীবনে মেয়েদের মধ্যে নূতন চেতনা আসিল এবং মাদাম চিয়াং কাইসেকের মত বুদ্ধিমতী ও বিদুষী মহিলা নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য 'New Life Movement' বা 'নবজীবন আন্দোলনের' প্রবর্তন করিলেন। প্রত্যেক শহরে, গ্রামে ও জনপদে সমবায় প্রথায় শ্রমশিল্প প্রসারের চেষ্টা হইল এবং জাতির পুনরুজ্জীবন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে মাদাম চিয়াং কাইসেক তাঁর 'নবজীবন আন্দোলনের' দ্বারা সমস্ত প্রকার ভোগবিলাসের বিরুদ্ধে জনমত জাগাইবার

চেষ্টা করিলেন। এমন কি, রাজধানী চুংকিংয়ে প্রকাশ্যে নৃত্য ও ক্যাবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।[১]

অক্ষশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে চুংকিং যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে পৃথিবীর ঘটনাবলী সম্পর্কে চীনা জনগণের মধ্যে আগের চেয়ে ঔৎসুক্য বাড়িয়া গেল। চীন ইউনাইটেড নেশন্সের অন্তর্গত হইল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্যাসিফিক কাউন্সিলে (প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত) স্থান লাভ করিল এবং ওয়াশিংটন ও লন্ডনের বৈঠকে যোগদান করিল। ১লা জানুয়ারী, ১৯৪২, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের (মোট ২৬টি জাতি) ঘোষণায় চীনও স্বাক্ষর দিল এবং কোন পৃথক সন্ধি না করার প্রতিশ্রুতি দিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কর্জ ও ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এবং বৃটেন ও আমেরিকা যথাক্রমে চীনকে ৫ কোটি পাউন্ড ও ১২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড ঋণদান করিল।

চীন ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত হইল এবং ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চীন-ভারত সম্পর্ক দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে চিয়াং কাইসেক ও তাঁর পত্নী ১৪ দিনের জন্য ভারত পরিদর্শনে আসিলেন এবং ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন। কিন্তু এর অনেক আগেই ১৯৩৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে জওহরলাল নেহরু চুংকিং পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং চিয়াং দম্পতীর ভারত দর্শনের ফলে সেই সম্পর্ক আরও গভীর হইল। এছাড়া ইরাক, মিশর, তুরস্ক, পারস্য, আর্জেনটিনা ও নেদারল্যাণ্ডেসের সঙ্গে এবং বিশেষভাবে ভ্যাটিকানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইল। চীনের প্রতি সদিচ্ছা প্রদর্শনের জন্য নভেম্বর মাসে একটি বৃটিশ পার্লামেণ্টারি মিশন চুংকিং পরিদর্শন করিলেন। কিন্তু ৯ই অক্টোবর তারিখ জাতীয়তাবাদী চীনের উদ্দেশ্যে একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদত্ত হইল। ঐদিন বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনে তাঁদের রাষ্ট্রাতিরিক্ত অধিকার (Extra territorial rights) পরিত্যাগের কথা ঘোষণা করিলেন- যার ফলে ১০০ বছর পর চীন অন্তত কাগজে-কলমে সত্যি সত্যি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লাভ করিল এবং এক নব যুগের প্রবেশ দ্বারে পেঁছিল।...

কিন্তু ১৯৪৩ সালে চীন-জাপান যুদ্ধের সপ্তম বর্ষে চীন জাপানী অভিযানের ফলে প্রায় সামগ্রিক অবরোধের মধ্যে পড়িল। তবে, সেই অবস্থায়ও চীন মিত্রশক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিল এবং জানুয়ারী মাসে চুংকিং-এ বৃটেনের সহিত এবং ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের সৌভাগ্য অর্জন করিল। মিত্রশক্তির দিক থেকে চীনের মর্যাদা ক্রমশঃ বাড়িয়াই গেল এবং চার্চিল ও রুজভেল্টের প্রতিনিধিরূপে বৃটিশ ও মার্কিন সামরিক বাহিনীর শীর্ষ নেতা ফিল্ড মার্শাল স্যার জন ডিল্ এবং লেঃ জেনারেল হেনরি আর্নল্ড চুংকিং পরিদর্শনে গেলেন। এরপর নয়াদিল্লীতে চীনের সমর-সচিব ও সেনানীমণ্ডলীর বড় কর্তা জেনারেল হো ইং-চিন ও অন্য একজন চীনা সেনাপতি উপরোক্ত বৃটিশ ও মার্কিন সামরিক নেতাদের সঙ্গে এবং ভারতের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল স্যার আর্চিবল্ড ওয়েভেলের সঙ্গে পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হইলেন। কিভাবে জাপানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত অভিযান চালানো যায় এবং কিভাবেই বা ভারত-চীন যোগাযোগ ও

১। দি সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ার—স্যার জন হ্যামারটন ও মেজর জেনারেল স্যার চার্লস গাইন সম্পাদিত, ১৯৪৮, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা ২২৯৩।

সরবরাহ লাইনের উন্নতি বিধান করা যায়, সেই সমস্ত বিষয় নিয়া আলোচনা করিলেন। কোয়েবেক সম্মেলনে চার্চিল ও রুজভেল্টের সঙ্গে একজন বিশিষ্ট চীনা প্রতিনিধিও যোগ দিলেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান ও চীনকে সাহায্য দানের প্রশ্ন নিয়া মিত্রপক্ষের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে আলোচনা হইল। এই বৈঠক থেকেই ভাইস এ্যাডমিরাল লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের নেতৃত্বে একটি নূতন সৈনাপত্য—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইল। অর্থাৎ এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে চিয়াং কাইসেক, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জেনারেল ম্যাক-আর্থার এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া খণ্ডে মাউণ্টব্যাটেন—এই তিন রণক্ষেত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনা বা পরামর্শ হইল। এছাড়া ১৯৪৩-এর নভেম্বর মাসে কায়রোতে চার্চিল ও রুজভেল্টের সঙ্গে ঐতিহাসিক বৈঠকে চিয়াং কাইসেকের যোগদানের কাহিনী আগেই (ষষ্ঠ পর্ব, দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী চীনকে একটি বৃহৎ শক্তিরূপে দাঁড় করাইবার জন্য মিত্রপক্ষের, বিশেষভাবে আমেরিকার পক্ষ থেকে অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে।···

কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও চীনের বিরুদ্ধে জাপানের অবরোধ সৃষ্টির জন্য ১৯৪৩ সালে চীন অত্যন্ত বেকায়দায় পড়িল। তার সৈন্যবাহিনী উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষতঃ ভারী অস্ত্রের অভাবে অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে ছিল। এই সময় জাপান চীনকে চরম আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে এবং চুংকিংকে চূর্ণ করার জন্য মধ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে নূতন উদ্যমে আক্রমণ শুরু করিল। চীনাদের মতে ১ লক্ষ ২০ হাজার জাপানী সৈন্য এই অভিযানে মাতিয়া উঠিল এবং চুংকিং অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু তিন সপ্তাহ যুদ্ধের আগেই চীনারা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাশের পাহাড়-পর্বতের আড়ালে গিয়া আশ্রয় নিল। তারপর পাহাড়ের পার্শ্বদেশ ধরিয়া অগ্রসরমান জাপানী সৈন্যদেয় উপর আক্রমণ চালাইল এবং এই রণকৌশলের ফলে জাপানীরা পরাজিত হইয়া পিছনে হটিতে বাধ্য হইল, জাপানীদের আর চুংকিং দখল করা হইল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১৯৪৩ সালে চীনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপত্তি কম ঘটিল না। হংকং ও বর্মার পতনের ফলে বাইরের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গেল এবং হংকং বন্দর দিয়া চীনের যে আমদানি বাণিজ্য ছিল এবং যে বাণিজ্যের উপর জনসাধারণ তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য নির্ভরশীল ছিল, তা বন্ধ হইয়া গেল। ফলে, জনগণের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়া গেল।

এদিকে ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে চীনে মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়াই চলিল এবং কতকগুলি প্রতিরোধের পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইল না। এদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা মজুতদারি শুরু করিল এবং বসন্তকালে উত্তর-পূর্ব দিকে হোনান প্রদেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, যার ফলে ১ কোটি লোক চরম খাদ্যসংকটে পড়িল। (১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষেও অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল)। সামগ্রিক বিচারে চীনে সেবার ফসল ভালো হইয়াছিল বটে, কিন্তু যানবাহনের গুরুতর অভাবের জন্য এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা কঠিন ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব চীনের কোয়াটাং প্রদেশেও শরৎকালে এই দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিল।···

রাজনৈতিক দিক থেকেও চীনে এই সময় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। চীনা রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট লিন সেন ১১ বছর ধরিয়া সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্রিক পদে থাকার পর ৩১ জুলাই, ১৯৪৩, মৃত্যুমুখে পড়িলেন। স্বয়ং চিয়াং কাইসেক তাঁর স্থলে প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান সংশোধনপূর্বক প্রেসিডেণ্টকে সশস্ত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক এবং পররাষ্ট্রনীতির চরম নিয়ামকের পদে নির্বাচিত করা হইল—অনেকটা মার্কিন প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতার মত। চিয়াং কাইসেক অবশ্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই তিনি চীনের জন্য গণতান্ত্রিক সংবিধান ও শাসন প্রবর্তন করিবেন। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কুওমিণ্টাংয়ের বিরোধ বাড়িয়াই চলিল এবং উত্তর-পশ্চিম চীনের শেনসি প্রদেশে কমিউনিস্টদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। স্থানে স্থানে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সরকারী সৈন্যদলের সংঘর্ষও হইল-যদিও ১৯৩৭ সালে জাপানী আক্রমণের পটভূমিকায় উভয় পক্ষের মধ্যে একটা বুঝাপড়া হইয়াছিল এবং পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা উভয় শক্ষই জাপানের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল। তথাপি উভয় তরফে বিবাদ ও বিরোধের অবসান ঘটিল না। কারণ, জানুয়ারী ১৯৪১-এ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাতকতার' অভিযোগ আনিয়া চিয়াংয়ের ন্যাশনালিস্ট বাহিনী ৫ হাজায় কমিউনিস্টকে আক্রমণ এবং কার্যতঃ সকলকে হত্যা করিল। তখন থেকে চীনের যুদ্ধ যেন ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামে পরিণত হইল—ন্যাশনালিস্ট, কমিউনিস্ট ও জাপানী। সুতরাং সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা উচিত চীনের সমস্যা কিরূপ জটিল ছিল।

* * *

১৯৪৩ সাল চীনের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বৎসর ছিল। কিন্তু এই বছরেই চীনে ১৪নং মার্কিন বিমানবাহিনী গড়িয়া উঠিল এবং এই উপলক্ষে চীনা সৈন্যেরাও রণক্ষেত্রে কিছু কিছু সহায়তা পাইল। অপর দিকে উত্তর-পূর্ব আসাম থেকে লেডো রোড তৈরী শুরু হইল এবং উত্তর বর্মার যুদ্ধে জেনারেল স্টিলওয়েলের অধীন চীনা ও মার্কিন বাহিনী সাময়িক অগ্রগতি লাভ করিল বটে, কিন্তু চীনের মৌলিক পরিস্থিতির তেমন কোন পরিবর্তন ঘটিল না। ১৯৪৪ সালে জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-যাত্রার জন্য অপেক্ষমান রহিল।[১]

১৯৪৪ সালে মিত্রপক্ষ অবশ্যই ইউরোপে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে চূড়ান্ত জয়লাভের দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু চীন থেকে জাপানের অশুভ কালো ছায়া দূর হইল না, বরং নূতন উদ্যমে আক্রমণ শুরু হইল। তবে, এই অবস্থার মধ্যেও বর্মা রোডের দিকে চীন উল্লেখযোগ্য জয় অর্জন করিল। বর্মা রোড যেখানে চীনের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেখানে পশ্চিম ইউনানে চীনা সেনাপতি মার্শাল উইলিহুয়াং জাপানীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইলেন এবং জেনারেল স্টিলওয়েলের অধীনে যে চীনা বাহিনী ভারত থেকে উত্তর ব্রহ্মের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, কয়েক মাস যুদ্ধের পর তাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিলেন এবং জাপানীরা পরাজিত ও বিতাড়িত হইল—চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকৃত হইল। বর্মা রোডের চীনা অংশ শত্রুর কবল মুক্ত হইল এবং ২৩শে জানুয়ারী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বোচ্চ

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭০৯।

কমাণ্ডার এ্যাডমিরাল মাউণ্টব্যাটেন ঘোষণা করিলেন যে, স্থলপথে চীনের সঙ্গে বর্মা রোডের সংযোগ আবার খুলিয়া গিয়াছে।...

উত্তর বর্মা ও চীন বর্মা সড়কের এই একমাত্র উল্লেখযোগ্য জয় ছাড়া ১৯৪৪ সালে চীন জাপানের বিরুদ্ধে আর কোন জয়লাভ করিতে পারে নাই। মিত্রপক্ষের কাছ থেকে চীন যে সরবরাহ পাইয়াছিল, তার দ্বারা এক ডিভিসন সৈন্যেরও এক সপ্তাহের বেশী লড়াই করা সম্ভব ছিল না। রেলওয়ে যন্ত্রপাতি ও যানবাহনেরও অত্যন্ত অভাব ছিল। সুতরাং এপ্রিল মাসে হোনান থেকে জাপানীরা পূর্ব চীন ধরিয়া যে আক্রমণ চালাইল, অক্টোবর মাস পর্যন্ত তাতে জাপানের একটানা জয় হইল। ডিসেম্বর মাসের আরম্ভে জাপানীরা এই অঞ্চলের সমস্ত শহর ও মার্কিন বিমান ঘাঁটি—কোইলিন, লিউচাউ এবং নানুনিং দখল করিয়া নিল এবং মাঞ্চুরিয়া থেকে ইন্দো-চীনের সীমান্ত পর্যন্ত একটা কোরিডোর সৃষ্টি করিল এবং স্বাধীন চীনকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ফেলিল।

১৯৪৪-এর শেষভাগে জাপানীরা চীনের পূর্বার্ধভাগের সমস্ত রেলরথ কাড়িয়া নিল এবং জাপানী দখলীকৃত ইন্দোচীনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিল। এমন কি রাজধানী চুংকিং নিয়া পর্যন্ত টান পড়িল। তবে, সৌভাগ্যক্রমে বছর শেষ হওয়ার আগেই চুংকিংয়ের দিকে জাপানী আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, জাপানীরা যুদ্ধনিপুণ, অভিজ্ঞ এবং আধুনিক অস্ত্র ও সমরসজ্জায় চীনাবাহিনীর তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং অবরুদ্ধ এবং গৃহ-বিবাদে বিদীর্ণ চীনের পক্ষে জাপানকে হটাইয়া দেওয়া আদৌ সহজ ছিল না।

এই সময় কোইলিনে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন মার্কিন জেনারেল স্টিলওয়েল, যিনি বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি হঠাৎ অপসৃত হইলেন ২৮শে অক্টোবর এবং ওয়াশিংটনে ফিরিয়া গেলেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কৈফিয়ৎস্বরূপ শুধু মন্তব্য করিলেন—'চিয়াংয়ের অনুরোধেই এটা করা হয়েছে। কারণ, এটা ছিল ব্যক্তিত্বের বিরোধ।'

অর্থাৎ চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে জেনারেল স্টিলওয়েলের আদৌ বনিবনা ছিল না। স্টিলওয়েল স্পষ্টভাষী ও মেজাজী ছিলেন। চিয়াংয়ের নীতি ও পদ্ধতির সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন না। ৩১শে অক্টোবর তাঁর শূন্য স্থানে চীনে মার্কিন বাহিনীর সেনাপতি পদে মেজর জেনারেল ওয়েডমেয়ার নিযুক্ত হইলেন। আর লেঃ জেনারেল সুলতান ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গনের ভার নিলেন। এই সমস্ত ঘটনায় চিয়াংয়ের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল এবং মাও সে-তুংয়ের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে চিয়াংয়ের বিরোধ-প্রসঙ্গ রাজনৈতিক মহলের আলোচনায় প্রাধান্য অর্জন করিল।[১]

* * *

এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে যেটা আমাদের দেশে জানা ছিল না। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে চিয়াং কাইসেক যখন কায়রোতে চার্চিল ও রুজভেল্টের সঙ্গে একত্র বৈঠকের সৌভাগ্য ও সম্মান অর্জন করিলেন, তখন কিন্তু চুংকিং-এ তরুণ সামরিক অফিসারেরা সরকারের বিরুদ্ধে এক গোপন চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। এই সমস্ত

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৮০।

অফিসারেরা অবশ্য স্বয়ং চিয়াং কাইসেককে উচ্ছেদ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু চিয়াং-এর বিশ্বাসভাজন কয়েকজন সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিকে অপসারণ করিতে চাহিয়াছিলেন, যাঁরা চক্রান্তকারীদের মতে অযোগ্য, অপদার্থ ও দুর্নীতির বাহন ছিলেন। বিশেষভাবে তাঁরা সাবাড় করিতে চাহিয়াছিলেন হো-ইয়িং-চিন, তাই লি, ডঃ কুং প্রমুখ পদস্থ ব্যক্তিদের। প্রকাশ যে, এই ষড়যন্ত্রে ২০০ থেকে ৬০০ অফিসার যুক্ত ছিলেন। "ইয়ং জেনারেলস' প্লট" নামে অভিহিত এই ষড়যন্ত্র অবশ্য ফাঁস হইয়া গিয়াছিল। ফলে, ১৬ জন জেনারেলকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। এঁদের মধ্যে চিয়াংয়ের বিশ্বাসভাজন কয়েকজন অফিসারও ছিলেন। কিন্তু যে দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে তরুণ সামরিক অফিসারেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন, চিয়াং কাইসেক কিন্তু তার প্রতিকারে এক পাও অগ্রসর হইলেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র কমিউনিস্টরাই কুওমিণ্টাং শাসনের বিরোধী ছিলেন না, সরকারী মহলের সামরিক ও অসামরিক অফিসারদেরও অনেকেই এই শাসনের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন কি, জাপানের বিরুদ্ধে চীনকে সহায়তা দানের জন্য যে সমস্ত মার্কিন অফিসার চীনে আসিয়াছিলেন, তারা জানুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত চীনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া কুওমিণ্টাং শাসনের অধঃপতন সম্পর্কে অত্যন্ত মর্মন্তুদ রিপোর্ট দিলেন। তাঁদের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল এই ঃ

'Their burden was that China was becoming progressively demoralized, official life infected by unprecedented corruption, the army ineffective and the Government engaged in a prolonged suicide in which the only hold on life was preparation for civil war against the communists. Under the long strains of war and occupation, the paste of unity was cracking and the pattern of warlord separatism reappearing.'

সোজা কথায় 'চীন ক্রমেই গভীর অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সরকারী মহল অভূতপূর্ব দুর্নীতির দ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে, সৈন্যবাহিনী অকেজো হইয়া পড়িতেছে এবং গভর্নমেণ্ট এমন এক দীর্ঘস্থায়ী আত্মহত্যার মধ্যে লিপ্ত হইতেছে, যেখানে একমাত্র কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি চালাইয়া যাওয়াই জীবনের লক্ষণরূপে প্রতিভাত ছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ এবং বৈদেশিক দখলদারির চাপের জন্য জাতীয় ঐক্যের জোড়াতালি ক্রমশঃ ফাটিয়া পড়িতেছে এবং আগেকার মত রণপ্রভুদের বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে।'[১]

এই রিপোর্ট চিয়াং-বিরোধী কোন রাজনৈতিক দলের নয়, কমিউনিস্টদেরও নয়, খোদ মার্কিন অফিসারেরাই কুওমিণ্টাং শাসনের এই আসল চেহারা উদ্ঘাটন করিয়াছেন, এবং যে গ্রন্থ থেকে উপরের এই উদ্ধৃতি দেওয়া হইল, তা'ও একজন বিখ্যাত মার্কিন মহিলার রচিত।

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে চুংকিংয়ের এই পঙ্গু অবস্থার জন্য আমেরিকানরা স্বভাবতঃই চীনা কমিউনিস্টদের যুদ্ধক্ষমতার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। উত্তর চীনে

১। Stillwell and the Americrn Experience in China by Barbara W. Tuchman, Newyork, 1971, P. 455.

ছিল কমিউনিস্টদের সব চেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি এবং সেখান থেকে শান্টং, হোপেই, শানসি ও উত্তর কিয়াংসু প্রদেশগুলিতে কমিউনিস্ট সৈন্যেরা জাপানের বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ চালাইতেছিল। জাপানীদের সর্বাধিক সৈন্য সমাবেশও ছিল এই উত্তর অঞ্চলে। মাঞ্চুরিয়ার পর চীনের এই ভূখণ্ডেই জাপানীদের শ্রমশিল্পের আধিক্য ছিল এবং রণনীতির দিক থেকে আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই ছিল যে, ভবিষ্যতে সম্ভাব্য রুশ অভিযানের পক্ষেও এই অঞ্চল নিকটতম এবং অবিচ্ছিন্ন ছিল। ১৯৩৭ সাল থেকে মাও-সে-তুংয়ের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস-বিখ্যাত লং মার্চের পর যাঁরা বাঁচিয়াছিলেন, এবং ইয়েনানে পৌঁছিয়াছিলেন, তাঁরা এই অধিকৃত ভূখণ্ডে(যার আয়তন ছিল জাপানের সমান) নিজেদের গবর্নমেণ্ট গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। গত সাত বছরে কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডের আয়তন ৩৫ হাজার বর্গমাইল থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ৫৫ হাজার বর্গমাইলে দাঁড়াইল এবং জনসংখ্যা দাঁড়াইল ১৫ লক্ষ থেকে ৫ কোটি ৪০ লক্ষে এবং সশস্ত্রবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল ১ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজারে।

উত্তর কিয়াংসু এবং হোপেই প্রদেশে এবং দক্ষিণে ক্যাণ্টন অঞ্চলে কমিউনিস্ট গেরিলারা জাপানী লাইনের পিছনে প্রভূত কর্মতৎপরতা চালাইলেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনের নৈপুণ্যের দ্বারা স্থানীয় এলাকার উপর প্রভাব বিস্তার করিলেন। তাঁরা চাষীদের খাজনা ও ট্যাক্সের পরিমাণ কমাইয়া দিলেন এবং তাদের উপর জমিদারদের জোর জুলুম ও নির্যাতন বন্ধ করিলেন। ফলে কমিউনিস্টরা জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন অর্জন করিতে লাগিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় ক্রমেই তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমগ্র অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশংকা হইল যে, কুওমিণ্টাং বনাম কমিউনিস্ট গৃহযুদ্ধে চীন বিধ্বস্ত হইলে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো কঠিন হইবে। সুতরাং তারা রাজনৈতিক আপোষ মীমাংসাস্বরূপ দুই পক্ষের মিলিত কোয়ালিশন গবর্নমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব দিলেন। ১৯৪৩ সালে এজন্য আলোচনাও শুরু হইল। কারণ, আমেরিকানদের বিশ্বাস ছিল যে, কমিউনিস্টরা চীনের উপর প্রভুত্ব চায় না, কিন্তু তারা কুওমিণ্টাংয়ের সঙ্গে একত্রে জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে চায়। আমেরিকানদের এই বিশ্বাসের একটা কারণ ছিল এই যে, চীনের বর্তমান অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মনে করিতেন চিয়াং কাইসেকই চীনের ঐক্য রক্ষার সব চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি এবং স্ট্যালিনও তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে একমত ছিলেন। কিন্তু তিনি (স্ট্যালিন) চিয়াং কাইসেকের ত্রুটিগুলি সম্পর্কেও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং রাষ্ট্রদূত হ্যারিম্যানের কাছে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, পাঁচ বছর আগে চীনারা বর্তমানের চেয়ে অনেক ভালো যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে চিয়াং কাইসেকের চারিদিকে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভণ্ড ও দেশদ্রোহী এবং এঁদের মারফৎ জাপানীদের কাছে কোন তথ্য গোপন থাকে না। জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কমিউনিস্টদের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ না করা চিয়াং কাইসেকের পক্ষে বোকামির চূড়ান্ত বলিয়া স্ট্যালিন মনে করিতেন। কারণ, তাঁর মতে "চীনা কমিউনিস্টরা আসল কমিউনিস্ট ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন 'মার্গারিন' (কৃত্রিম মাখন) কমিউনিস্ট। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁরা সাচ্চা দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উৎসাহী ছিলেন।[১]

১। হার্বার্ট ফীজ, পৃষ্ঠা ৪০৭।

সুতরাং এমন কমিউনিস্টদের সঙ্গে চিয়াং কাইসেকের কোয়ালিশন সরকার গঠনে আপত্তি থাকা আমেরিকানদের মতে যুক্তিসঙ্গত ছিল না। বিশেষতঃ গৃহযুদ্ধ যদি চলিতেই থাকে, তবে, কমিউনিস্টদেরই জয়ের সম্ভাবনা বেশী এবং সেই অবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়ারও হস্তক্ষেপ ঘটিতে পারে। সেই পরিণতি আমেরিকারও পছন্দসই ছিল না এবং চিয়াং কাইসেক তো সেই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আরও বেশী উদ্বিগ্ন ছিলেন। সুতরাং চিয়াং কুটবুদ্ধির কৌশল খাটাইতে চাহিলেন। অর্থাৎ মিত্রশক্তি যখন ইউরোপীয় যুদ্ধে ব্যস্ত আছে, তখন তিনি সেই সুযোগে আগে কমিউনিস্টদের দমন করিতে চাহিলেন এবং এই কাজটা শেষ করিতে হইবে চীনের মার্কিন অবতরণ কিংবা দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার আগমনের আগেই !

চীনা পরিস্থিতির এই জটিল গ্রন্থি মোচনের জন্য আমেরিকার পক্ষ থেকে আগ্রহের কোন অভাব ছিল না। সুতরাং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হেনরি ওয়ালেস (Wallace) চুংকিং পরিদর্শনে আসিলেন এবং ২১শে থেকে ২৪শে জুন, ১৯৪৪, চারদিন চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে আলোচনা করিলেন এবং ওয়ালেসও বলিলেন যে চীনা কমিউনিস্টরা আসল কমিউনিস্ট নয়, তারা 'কৃষিজীবী ডেমোক্রাট' মাত্র। কিন্তু চিয়াং এই অভিমতের প্রতিবাদ করিলেন এবং বলিলেন, তারা চীনে নিশ্চিতরূপেই ক্ষমতা দখল করিতে চায় এবং তারা কার্যত—'more communistic than the Russian communists'—অর্থাৎ রুশ কমিউনিস্টদের চেয়েও তারা বেশী কমিউনিস্ট ![1]

চিয়াং কাইসেকের এই মনোভাবের সঙ্গে আপোসরফা ঘটানো সহজ ছিল না। কেবল কমিউনিস্টদের সঙ্গেই তাঁর বিরোধ ছিল না, তিনি লেঃ জেনারেল স্টিলওয়েলেরও বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর এত প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাও তিনি বরদাস্ত করিতে রাজী ছিলেন না। তিনি চিয়াং কাইসেকের জেনারেল স্টাফের প্রধান, সামরিক পরামর্শদাতা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া কমাণ্ডের ডেপুটি সেনাপতি ছিলেন। অথচ ওয়াশিংটনের সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর দপ্তর চীনের রাজনীতি নিয়া মাথা ঘামাইতে রাজী ছিলেন না। তাঁরা চাহিতেছিলেন যুদ্ধ জয় এবং সেই উদ্দেশ্যে চীনে স্টিলওয়েলের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও চীনের সশস্ত্রবাহির পরিচালনভার তাঁর হাতে অর্পণের জন্য। বলা বাহুল্য যে, চিয়াং এতে রাজী ছিলেন না।···

এদিকে জুন মাসে প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের সাইপান দ্বীপ তিন সপ্তাহের তীব্র যুদ্ধের পর আমেরিকার দখলে গেল এবং সেখানে সেদিনের বিখ্যাত মার্কিন বোমারু 'বি-২৯'-এর জন্য উপযুক্ত ঘাঁটি তৈয়ার হইল। সুতরাং চীনের মূল ভূখণ্ডে মার্কিন বিমানঘাঁটির গুরুত্ব হ্রাস পাইল। কারণ, সাইপান থেকেই প্রশান্ত মহাসাগরের জাপানী ঘাঁটিগুলির কিংবা খোদ জাপানের বিরুদ্ধে বোমা বর্ষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসিল। এদিকে চিয়াং কাইসেক স্টিলওয়েলের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু বর্মায় চীনাবাহিনী পরিচালনার নৈপুণ্য এবং প্রবল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও মিটকিনা দখলের "ঐতিহাসিক কৃতিত্বের' জন্য মার্কিন সমরবিভাগ ৩০শে জুন স্টিলওয়েলকে পুরাপুরি জেনারেল পদে প্রোমোশন দিলেন। আর ৬ই জুলাই তারিখ প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইসেকের নিকট একটি ব্যক্তিগত বার্তায় চীনের আসন্ন বিপর্যয়ের জন্য গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলেন এবং জেনারেল স্টিলওয়েলকে

১। বার্বারা টাচম্যান, পৃষ্ঠা ৪৬৪।

সমগ্র চীনা ও মার্কিনবাহিনীর প্রধান সেনাপতিপদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করিলেন। চিয়াং এই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিলেন না বটে, কিন্তু তিনটি শর্ত আরোপ করিলেন—যার একটি ছিল এই যে,—যতক্ষণ পর্যন্ত কমিউনিস্টরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব মানিয়া না লইবেন, ততক্ষণ তাঁরা স্টিলওয়েলের পরিচালনাধীনে আসিতে পারিবেন না।···

মার্কিন মিলিটারি মিশন ও বিখ্যাত পত্রিকা 'টাইমসে'র বিশেষ প্রতিনিধি এতদিন পর চুংকিং সরকারের অনুমতি পাইলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদর ঘাঁটি ইয়েনান পরিদর্শনের জন্য। তাঁরা ইয়েনানে গেলেন এবং বিখ্যাত ৮নং রুট্ আর্মির সৈন্য ও তাঁদের কার্যকলাপ দেখিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। তাঁদের সৈন্যদল উৎকৃষ্ট খাদ্য, অস্ত্র ও পোশাকের অধিকারী ছিলেন এবং কুটির শিল্প, কৃষি ও কল-কারখানার উৎপাদনেও তাঁরা নৈপুণ্য দেখাইতেছিলেন। মাও সে-তুং চীনের জন্য মার্কিন সাহায্য ও মার্কিন সৈন্যের অবতরণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কারণ, কুও-মিণ্টাং নামেমাত্র গভর্নমেণ্ট ছিলেন। সুতরাং মাও, চৌ এন-লাই, লিন পিয়াও, ইয়ে চিয়েন-ইং এবং চু তে প্রমুখ নেতারা বলিলেন যে, কুওমিণ্টাং 'অকর্মন্যতার মৃত্যুশয্যায়' শায়িত। কিন্তু কমিউনিস্টরা একটি সক্রিয়, প্রাণবন্ত ও বলিষ্ঠ সরকার ও সৈন্যদলের প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। অতএব মিত্রপক্ষের কমাণ্ডের অধীনে মার্কিন সহযোগিতায় যুদ্ধ চালানো যাইতে পারে। মার্কিন প্রতিনিধিদলের মতে চীনা কমিউনিস্টরা—'They talked in terms of coalition not revolution'—অর্থাৎ তাঁরা বিপ্লবের কথা বলিলেন না, বলিলেন কোয়ালিশন সরকার গঠনের কথা এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার কথা। কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রা কেন্দ্রীয় কুওমিণ্টাং সরকারের নেতৃত্বে কিংবা চিয়াংয়ের প্রতি আনুগত্যের শর্তে চলিতে পারে না।

আমেরিকান প্রতিনিধিদের নিকট কমিউনিস্টরা কাজের লোক বলিয়া প্রতিভাত হইলেন। কিন্তু চিয়াং কাইসেক রুজভেল্টের নূতন প্রস্তাব অনুযায়ী জেনারেল হারলিকে (Hurley) তাঁর নিজের ও স্টিলওয়েলের মধ্যবর্তী হিসাবে কাজ করার জন্য গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন বটে, কিন্তু স্টিলওয়েলের হাতে পূর্ণক্ষমতা কিংবা কমিউনিস্ট সৈন্যদের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণের প্রশ্নটি এড়াইয়া গেলেন।

* * *

আসলে চিয়াং কমিউনিস্টদেরকে বৃহত্তর বিপদ বলিয়া মনে করিতেন। জাপানীরা পূর্ব চীনের যত খুশী অঞ্চল দখল করুক, তিনি একেবারে পশ্চিমের শেষ প্রদেশে গিয়া আশ্রয় নিবেন এবং তারপর মিত্রপক্ষের হাতে জাপানের পরাজয় ঘটিবার পর তিনি বিজয়ী পক্ষের দলে আবির্ভূত হইবেন!—চিয়াংয়ের বিশ্বাস ছিল যে, জাপানীরা 'চীনের বাইরেই' মিত্রপক্ষের হাতে পরাজিত হইবে। সুতরাং তার দুর্ভাবনার আর কারণ কি? চিয়াংয়ের এই অনুমান অবশ্য মিথ্যা ছিল না। অতএব কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তিনি শর্তহীন কোয়ালিশন গঠনে রাজী ছিলেন না এবং জেনারেল স্টিলওয়েলের হাতেও সর্বময় ক্ষমতা অর্পণে সম্মত ছিলেন না—যদিও আমেরিকা চীনকে বৃহৎ শক্তির অন্তর্ভুক্তরূপে বিবেচনা করিতেছিলেন। এজন্য তাঁরা ঐক্যবদ্ধ চীনের জন্য বারবার তাগিদ দিতেছিলেন। কিন্তু ঐক্যের বদলে দেখা গেল অভিনব দৃশ্য। জাপানীরা যখন কোয়াংসির দিকে ব্যূহভেদ করিয়া অগ্রসর হইল, তখন

উত্তরদিকে ১৬টি চীনা আর্মি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পাহারা দেওয়ার জন্য অলস বসিয়া রহিল। যখন ৯৩নং বাহিনীকে কেন্দ্রীয় সরকার কোয়েইলিনে পাঠাইলেন, তখন তাঁরা যুদ্ধের চেয়ে লুঠতরাজের দিকে বেশী মন দিল![1]

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে জাপানীরা চীনের দুই দিক থেকে—পূর্ব উপকূল থেকে ভিতরের দিকে এবং কোয়াংসির ভিতর দিয়া দক্ষিণদিকে বাহু বিস্তার করিল—এই দুই বাহু লিও চাওতে মিলিত হইল। এপ্রিল মাস থেকে ৮টি প্রদেশ, ৫ লক্ষ সৈন্য ও ১০ কোটি জনসংখ্যা চীন হারাইল এবং উপকূল ভাগের শেষ প্রবেশপথও নষ্ট হইয়া গেল।

বলা বাহুল্য যে, ইতিমধ্যে জেনারেল স্টিলওয়েলকে তাঁর সৈনাপত্য থেকে বিদায় নিয়া ওয়াশিংটনে ফিরিয়া যাইতে হইল। চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে মতবিরোধের এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে চিয়াংয়ের শত্রুতার এই পরিণতি ঘটিল।···

চিয়াং কাইসেকের একজন গুণমুগ্ধ জীবনচরিত লেখক এইপ্রসঙ্গে যে অভিনব মন্তব্য করিয়াছেন, সেটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য—

'···that many great men would be considered greater if they have had the sense to die earlier, for example Napolean before Waterloo, Wilson before Versailles and Chiang Kaishek before the recall of General Stillwell.'

অর্থাৎ পৃথিবীতে অনেক মহান লোক আরও মহানরূপে প্রতিভাত হইতে পারিতেন, যদি তাঁদের আরও কয়েক বছর আগে মারা যাওয়ার সুবুদ্ধি হইত! যেমন ওয়াটারলু যুদ্ধের আগে নেপোলিয়ন, ভার্সাই সন্ধির আগে উইলসন (মার্কিন প্রেসিডেণ্ট) এবং জেনারেল স্টিলওয়েলের পদচ্যুতির আগে চিয়াং কাইসেক![2]

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪৮২, ৪৮৮।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫০৯।

সপ্তম পর্ব

দশম অধ্যায়

জাপানের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ
জলে স্থলে ও আকাশে মিত্রপক্ষের জয়যাত্রা

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবার আক্রমণের পর থেকে মাত্র ৬ মাসের মধ্যে জাপান কার্যতঃ সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ব্রহ্ম-ভারত সীমান্ত পর্যন্ত যে বিশাল ও দূর-বিস্তৃত-সাম্রাজ্য দখল করিল (প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পর্ব দ্রষ্টব্য) ও ভারত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হইল, সম্ভবতঃ ইতিহাসে তেমন নজির দুর্লভ। এই বিশাল সাম্রাজ্য থেকে জাপানকে অবিলম্বে কিংবা দুই এক বছরের মধ্যে হঠাইয়া দেওয়াও সহজ ছিল না। কেননা, মিত্র শক্তিপুঞ্জ যুক্তিসঙ্গতভাবেই জার্মানী বা ইউরোপের যুদ্ধকেই অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তাঁরা জাপানের উপরেও নজর রাখিয়াছিলেন এবং ১৯৪২ সালের দুর্দিনেও যতটা সম্ভব জাপানকে প্রত্যাঘাত করিতে চেষ্টা করিরাছিলেন।...

রণশাস্ত্র-বিশারদ লীডেল হার্ট জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করিয়াছেন, যথা—

প্রথম পর্যায়ে জাপান কর্তৃক প্রশান্ত মহাসাগরের সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা, এই সমস্ত এলাকার সমস্ত দ্বীপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সন্নিকটবর্তী সমস্ত দেশ দখল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জাপান কর্তৃক হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের এবং অস্ট্রেলিয়ার মার্কিন ও বৃটিশ ঘাঁটিগুলির উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় নৌ ও বিমানযুদ্ধে সে হাওয়াইয়ের দিকে মিডওয়ে দ্বীপে এবং অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে সলোমোন দ্বীপপুঞ্জের গুয়াদেলক্যানেলে প্রতিহত হইল।

তৃতীয় পর্যায়ে জাপানকে আত্মরক্ষা কিংবা প্রতিরক্ষার রণনীতি অবলম্বন করিতে হইল। কারণ, জাপানী সমর কর্তৃপক্ষ তাঁদের সেনাপতিদেরকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নিউগিনি ও সুলোমোন দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত ঘাঁটি রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু মিডওয়ে দ্বীপের যুদ্ধে জাপানের ৪টি বিমানবাহী জাহাজ এবং গুয়াদেলক্যানেলের যুদ্ধে ২টি ব্যাটলশিপ বা বড় যুদ্ধজাহাজ এবং অনেকগুলি ছোট ছোট পোত ও কয়েক শত বিমান নষ্ট হইল। সুতরাং জাপানের হাত থেকে মিত্রশক্তি কিছু 'সুবিধা' কাড়িয়া নিল। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াইল কোথায় এবং কিভাবে এই 'সুবিধা' প্রয়োগ করা হইবে?

জাপানের এই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযান সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান তার আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক—এই উভয় প্রকার যুদ্ধের পক্ষেই খুব উপযোগী ছিল এবং এটাই ছিল কার্যতঃ তার উভয় রণনীতির ভিত্তির মত। প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্রের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে

যে, অতি দ্রুত দ্বীপ-দ্বীপান্তর ও দেশ-দেশান্তর জয় করার ফলে জাপানের চারিদিকে আংটির মত এমন কতকগুলি বেষ্টনী গড়িয়া উঠিল, যেগুলি মিত্রপক্ষের পালটা-আক্রমণের পক্ষে—দুর্ভেদ্য, দুর্গম এবং দুঃসাধ্য ছিল।[১]

বাহ্যতঃ মানচিত্রের দিকে তাকাইলে মনে হইবে যে, জাপানের বিরুদ্ধে পালটা আক্রণের অনেকগুলি বিকল্প পথ আছে। কিন্তু কার্যতঃ সেগুলি বাস্তবতাসম্মত ছিল না। কারণ, উত্তরবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরে কোন উপযুক্ত ঘাঁটি ছিল না এবং সেখানকার আবহাওয়া সর্বদাই কর্দম ও কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। দূর-প্রাচ্যের সোভিয়েট রাশিয়ার দিক থেকেও আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ, জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া তখন নিরপেক্ষ ছিল, আর চীন ও ব্রহ্মদেশের অবস্থা এত কাহিল ছিল যে, ওই দুই স্থান থেকে মিত্রশক্তির পক্ষে কোন পালটা আঘাত হানার উপায় ছিল না। অথচ ইতিমধ্যে কাঁচামালের ঐশ্চর্যপূর্ণ তার বিশাল সাম্রাজ্যে জাপান কায়েম হইয়া বসিতে চাহিল এবং বিজিত দেশগুলিকে হাতে রাখার জন্য কিছু কিছু 'পুতুল সরকারে'র প্রতিষ্ঠা দিল—যদিও এই কৌশলে স্বাধীনতাকামী জনগণ শেষ পর্যন্ত প্রতারিত হইল না।

কিন্তু জাপান সম্পর্কে আমেরিকার পক্ষে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকার উপায় ছিল না। সুতরাং মার্কিন সামরিক নেতাদের নিকট প্রশ্ন দেখা দিল কোন্ পথে জাপানকে আক্রমণ করা যায়? আমেরিকার পক্ষে অবশ্য দুইটি বিকল্প পথ ছিল। প্রথমটি নিউগিনি থেকে ফিলিপিন্স পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের রুট্ অথবা দ্বিতীয়টি মধ্য বা সেণ্ট্রাল প্রশান্ত মহাসাগরের পথ দিয়া অগ্রগতি। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান সেনাপতিরূপে জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থার স্বভাবতঃই প্রথম রুট্‌টি পছন্দ করিলেন। কারণ, তাঁর মতে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দিকেই কাঁচামালের ঐশ্বর্যপূর্ণ দেশগুলি জাপানের দখলে রহিয়াছে এবং জাপানের পক্ষে যুদ্ধ চালাইবার জন্য এই সমস্ত দেশের উপর নির্ভর করিয়াই তাকে চলিতে হইতেছে। সুতরাং এই দেশগুলির সঙ্গে জাপানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে জাপান বিপদে পড়িবে। আর মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া আগাইতে গেলে জাপানী অধিকৃত বহু দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রচণ্ড বাধা ও পালটা আক্রমণ ঘটিবে।

কিন্তু ম্যাক-আর্থারের এই অভিমত সত্ত্বেও মার্কিন নৌ-প্রধানেরা মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের রুট্‌টিই বেশী পছন্দ করিলেন। কারণ, ইতিমধ্যে আমেরিকার যে প্রচুর সংখ্যক এবং সুবৃহৎ বিমানবাহী জাহাজ ও অন্যান্য রণপোত তৈয়ার হইয়াছে, সেগুলিকে দক্ষিণদিকের নিউগিনি অঞ্চলের বহু দ্বীপের দ্বারা আচ্ছন্ন সমুদ্রের চেয়ে মধ্য প্রশান্ত মহাসমুদ্রের পথে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যাইবে। দক্ষিণদিকের চেয়ে এই অঞ্চলের পথে পার্শ্বদেশ দিয়া জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনাও কম। লিডেল হার্টের মতে 'মধ্যপন্থা' বাছিয়া লওয়ার জন্য মার্কিন নৌ-প্রধানদের নাকি আর-একটা 'প্রাইভেট কারণ' এই ছিল যে, তাঁরা সমস্ত বিমানবাহী জাহাজ ম্যাক্-আর্থারের হেপাজতে অর্পণ করিতে রাজী ছিলেন না। কারণ, ম্যাক-আর্থারের নাকি 'একচেটিয়া দখলদারির' ঝোঁক ছিল!

অবশেষে উভয় তরফের এই মতবিরোধের মীমাংসা হইল ওয়াশিংটনের 'ট্রাইডেণ্ট' কনফারেন্সে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে শীর্ষ মার্কিন নেতারা স্থির করিলেন যে,

১। হিস্ট্রি অব্ দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা ৪৯৮।

দুইদিক দিয়া এবং দুই রুট ধরিয়াই জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হইবে এবং এর দ্বারা জাপান দুইদিকের যুদ্ধের ঝামেলায় ও ফ্যাসাদে এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িবে।[১]

আসলে দুই বছর ধরিয়া মার্কিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমাণ্ডকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। যদিও তাঁদের রণনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমতঃ জাপানের বহির্ব্যূহের লাইন ভেদ করা এবং তারপর অন্তর্ব্যূহ বিচ্ছিন্নপূর্বক খাস জাপানের মর্মস্থলে আঘাত হানা, তথাপি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা আদৌ সহজ ছিল না। কারণ, কোন প্রত্যক্ষ আঘাতের উপযুক্ত প্রস্তুতি ও সুযোগ ছিল না।

এই সমস্ত সমস্যা নিয়া ওয়াশিংটনে জয়েণ্ট চীফস্ অব্ স্টাফ-এর বৈঠকে দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা হইল এবং সামগ্রিক রণপরিকল্পনার কথা বিবেচনা করা হইল। এই পরিকল্পনা অনুসারে অস্ট্রেলিয়া, নিউগিনি, নেদারল্যাণ্ডস্, ইস্ট ইণ্ডিজ (পূর্বভারতীয় ওলন্দাজ-দ্বীপপুঞ্জ) এবং ফিলিপিন্স সহ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের ভার দেওয়া হইল জেনারেল ম্যাক-আথারকে। আর এ্যাডমিরাল চেস্টার ডব্লিউ. নিমিৎস-এর (Nimitz) উপর ভার পড়িল বৃহত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের। অর্থাৎ দক্ষিণে সলোমোন সহ সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের এবং উত্তরদিকে আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত, আর সেই সঙ্গে গিলবার্টস, মার্শালস্, ক্যারোলাইন্স এবং ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ। এশিয়া মহাদেশের ভুখণ্ডে চীন-ব্রহ্ম-ভারত রণাঙ্গনের ভার প্রথমে পড়িল লেঃ জেনারেল জোসেফ ডব্লিউ. স্টিলওয়েলের উপর। কিন্তু পরে চার্চিলের প্রস্তাবানুসারে আগস্ট মাসে ১৯৪৩, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ড নামে একটি পৃথক সৈনাপত্যের প্রতিষ্ঠা হইল, যার ভার পাইলেন ভাইস-এ্যাডমিরাল লর্ড লুই মাউণ্ট-ব্যাটেন। আর জেনারেল স্টিলওয়েল তাঁর ডেপুটি নিযুক্ত হইলেন।

এই রণপরিকল্পনা অনুসারে স্থির হইল 'দ্বীপ-থেকে-দ্বীপান্তরে ভেকের মত লাফ দিয়া' অগ্রসর হওয়া ('leap frog hops from one island to another') এবং জল-স্থল-আকাশের মধ্যে রণক্রিয়ার সামঞ্জস্য বিধান করা। এক একটি জায়গা দখল করিয়া সেখানে নৌঘাঁটি ও বিমানঘাঁটি স্থাপন করা হইবে এবং সেখান থেকে আবার পরবর্তী দ্বীপপুঞ্জে অগ্রসর হওয়া যাইবে। কিন্তু শত্রুপক্ষের অত্যন্ত শক্ত ঘাঁটিগুলির সমস্তই দখল করিয়া নেওয়া হইবে না। এগুলির অনেকের পাশ কাটাইয়া যাওয়া হইবে এবং রাবাউল বা ট্রুকের (Truk) মত অত্যন্ত সুরক্ষিত মূল জাপানী ঘাঁটির উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানিয়া দখল করার চেষ্টা হইবে না। কিন্তু প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের দ্বারা এই ঘাঁটিগুলি ঘায়েল করার চেষ্টা হইবে। এর মূল উদ্দেশ্য হইতেছে যতটা সম্ভব মার্কিন সৈন্যদের জীবন বাঁচানো। কিন্তু সেইসঙ্গে শত্রু ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি করা।[২]

'অবশ্য ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস হইতেই দ্বীপ-থেকে-দ্বীপান্তরের যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং এর পত্তন হইয়াছিল গুয়াদেল-ক্যানেলে মার্কিন আক্রমণের দ্বারা। কিন্তু এই সমস্ত যুদ্ধ অত্যন্ত কষ্টকর এবং দীর্ঘস্থায়ী ছিল। বলাই বাহুল্য যে, দ্বীপগুলি উন্নত ছিল না। রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং জঙ্গল ও

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪১৯।
২। লুই স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৪৩০।

পাহাড়ের জন্য এত দুরধিগম্য যে, সাধারণ পথিকের পক্ষেও চলা কঠিন ছিল। এর উপর মশামাছি, কীটপতঙ্গ, জলাভূমি, নদী এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নানারকম ব্যাধির উপদ্রব ছিল। ফলে, মার্কিন ও অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যদের পক্ষে এই সমস্ত দ্বীপে আক্রমণ, অবতরণ ও যুদ্ধ পরিচালনা দস্তুরমত সমস্যাসঙ্কুল ছিল। রণভূমির দুর্গমতার সঙ্গে জাপানীদের আত্মরক্ষার শক্তি মিলিত হইয়া মার্কিন অভিযানকে স্বভাবতঃই অত্যন্ত মন্দ করিয়া তুলিল। একমাত্র গুয়াদেল-ক্যানেল ও বুনা-গোনার নাম ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে তখনকার দিনের সংবাদপত্র পাঠকদের বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছিল। কারণ, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের যুদ্ধ শেষ হইতে প্রায় সাত মাস—১৯৪২ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত লাগিয়াছিল।'[১]

অবশ্য ১৯৪২ সালের প্রসঙ্গে আরও দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। পার্ল হারবারে জাপানের "ঐতিহাসিক" আক্রমণের পর মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর কয়েক মাস নিঃশব্দ বা চুপচাপ ছিল। এই নীরবতার ভঙ্গ হইল ১৯৪২ সালের ১৮ই এপ্রিল, যখন মার্কিন বোমারু অকস্মাৎ খোদ টোকিওর উপর হানা দিল এবং বোমা বর্ষণ করিল। লেঃ কর্নেল জেমস্ এইচ্. ডুলিট্ল অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এই বোমারু আক্রমণ সংগঠিত করিয়াছিলেন। মার্কিন নৌবহরের একটি বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজে টোকিওর ৮০০ মাইলের মধ্যে পেঁছিয়া লেঃ কর্নেল ডুলিট্লের নেতৃত্বে কয়েকটি বোমারু বিমান খাস জাপানের ভূভাগে টোকিও শহরে বোমারু বর্ষণ করিল। এমন আকস্মিক এবং অভাবিত বোমা বর্ষণের জন্য জাপানীরা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং তারা কিছুটা অবাক হইল। কারণ, তারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, প্রশান্ত মহাসাগরের হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী কোন্ স্থান বা ঘাঁটি থেকে এই সমস্ত বোমারু হানা দিতে আসিয়াছিল। আমেরিকানদের মতে জাপানের কয়েকটি কারখানা এই বোমা বর্ষণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল এবং ইওকোসুকাতে কিছু কিছু জাপ নৌ-সৈন্য হতাহত হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিন বিমানগুলি প্রত্যাবর্তনের পথে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে পড়ায় অন্ততঃ ৮ জন মার্কিন বৈমানিক অবতরণে বাধ্য হইয়াছিল। তারা জাপানীদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিল।···

টোকিওতে ডুলিট্লের এই বিমান হানার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে জাপানী সমর কর্তৃপক্ষ পার্ল হারবার থেকে ১১৩৫ মাইল পশ্চিমে গুরুত্বপূর্ণ মিডওয়ে দ্বীপ আক্রমণ ও দখল করার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। জাপানের বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি ইয়ামামোতোর নেতৃত্বে এক বিরাট নৌ ও বিমানবহর মিডওয়ে দ্বীপের দিকে অভিযান করিল। ১৯৪২ সালের ৭ই জুন এই আক্রমণের তারিখরূপে নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু জাপানীদের দুর্ভাগ্যক্রমে ওয়াশিংটনের সমর বিভাগ জাপানীদের সমস্ত সাঙ্কেতিক গোপন বার্তা ধরিয়া ফেলিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের প্রধান সেনাপতি এ্যাডমিরাল চেস্টার নিমিৎস উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। জাপানী নৌবহরের ইতিহাসে এটা ছিল একটা সেরা অভিযান এবং এই অভিযানের জন্য ১১টি যুদ্ধ জাহাজ, ৮টি বিমানবাহী জাহাজ, ২২টি ক্রুজার, ৬৫টি ডেস্ট্রয়ার এবং ২১টি সাবমেরিন—মোট ২০০ রণপোত সন্নিবিষ্ট হইল। এই প্রচণ্ড নৌশক্তি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হইল এবং স্থির হইল গোলা ও বোমাবর্ষণের

১। গ্রন্থকার প্রণীত 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৫) পৃষ্ঠা ৩১৪।

দ্বারা মিডওয়ে দ্বীপকে ঘায়েল করার পর ৫ হাজার জাপানী নৌসৈন্য এই দ্বীপে অবতরণ করিয়া উহা দখল করিয়া নিবে এবং তারপর এখানে একটি জাপানী বিমান ঘাঁটি তৈয়ার হইবে। যদিও এই দ্বীপটি ছিল নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবু এর আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য উভয় পক্ষেই প্রচণ্ড তোড়জোড় হইল। চার দিন ধরিয়া এই অভিযানে মিডওয়ে দ্বীপ দখলের জন্য যে যুদ্ধ হইল, তাতে জাপানীদের পাঁচ হাজার সৈন্য নিহত হইল, ৪টি বিমানবাহী জাহাজ, একটি বড় ক্রুজার ধ্বংস বা নিমজ্জিত হইল, আর-একটি বৃহৎ ক্রুজার প্রচণ্ডভাবে ঘায়েল হইল, ২টি ডেস্ট্রয়ার চূর্ণ হইল এবং আর-একটি ডেস্ট্রয়ার ও যুদ্ধ জাহাজ জখম হইল, আর ৩২২টি বিমান ধ্বংস হইল। বাকী জাপানী নৌবহর পিছনে হটিয়া গেল। এই যুদ্ধে আমেরিকানদেরও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হইল। একটি বিমানবাহী জাহাজ ও একটি ডেস্ট্রয়ার ধ্বংস হইল এবং ১৪৭টি বিমান নষ্ট হইল। কিন্তু মিডওয়ে দ্বীপ আমেরিকানদের হাতেই রহিয়া গেল। জাপানের প্রবলতর শক্তির সঙ্গে যুঝিয়া মার্কিন নৌ ও বিমানশক্তির এই জয়লাভ আমেরিকায় বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করিল—বিশেষতঃ পার্ল হারবারের বিপর্যয়ের পর। মিডওয়ের যুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হইল।

* * *

উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরকে জাপানের দূরবর্তী দুইটি বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বদেশ বলিয়া বর্ণনা করিলেও অযৌক্তিক হইবে না। যদিও জাপান অভিমুখে অগ্রসর কিংবা তার বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণাত্মক অভিযান আরম্ভের সাধ্য সেই সময় মিত্রপক্ষের ছিল না। তথাপি জাপানকে যথাসম্ভব প্রতিরোধের জন্য উহার দূর-বিস্তৃত দুই সামুদ্রিক বাহুর আঙ্গুলের ডগাগুলির উপর আমেরিকা তার নৌ-বহর ও বিমানবহর যোগে যেন হাতুড়ির ঠোকা দিতে লাগিল। অবশ্য এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাপানের দুই প্রসারিত বাহুকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া আনা কিংবা জাপানকে শক্ত হইয়া বসিতে না দেওয়া।[১]

* * *

কিন্তু মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রশান্ত মহাসাগরের ডবল রুটে অভিযান চালাইবার যে সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন, দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি ছাড়া তা' কার্যকর করা সম্ভব ছিল না এবং ইতিমধ্যে জাপান আরও জোরদার প্রতিরক্ষা গড়িয়া তোলার সুযোগ পাইয়া গেল। কিন্তু আমেরিকার পক্ষেও একেবারে নিক্রিয় থাকা কঠিন ছিল। সুতরাং ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে তাঁরা একান্ত উত্তর প্রান্তবর্তী আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণ চালাইলেন এবং কুয়াশাচ্ছন্ন আওু ও কিস্কা দ্বীপে ৩৪ হাজার সৈন্যসহ অবতরণ করিলেন। পাঁচ দিন ধরিয়া তাঁরা এই দ্বীপে পাঁচ হাজার শত্রুসৈন্যের খোঁজ করিয়া দেখিলেন যে, দ্বীপটি একেবারে খালি! জাপানীরা আগেই দ্বীপটি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। অথচ সমগ্র আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের এই অভিযানে ১ লক্ষ মার্কিন সৈন্য এবং প্রচুর নৌ ও বিমানবহর নিয়োগ করা হইয়াছিল। যেন কাকের উপর কামান দাগানো!···

মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর মধ্যে যেমন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযান নিয়া মতবিরোধ হইয়াছিল, আমেরিকার ভাগ্যক্রমে জাপানের আর্মি ও নেভীর মধ্যেও তেমন প্রচণ্ড

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩১২।

মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল। অবশ্য আর্মি ও নেভীর উভয়পক্ষের কর্তারাই জাপানের অধিকৃত সমস্ত স্থান দখলে রাখিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেদিক দিয়া তাদের কোন মতভেদ ছিল না। কিন্তু এই দখলদারি বজায় রাখার সর্বোত্তম উপায় কি, সেই প্রশ্নে বিতণ্ডা দেখা দিল। আর্মি বা স্থলবাহিনী চাহিতেছিল নিউগিনির স্থলভাগে রণক্রিয়া। কারণ, নিউগিনির এই অগ্রবর্তী ঘাঁটি থেকেই পূর্ব-ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপিন্সের নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব ছিল। কিন্তু নৌবাহিনীর প্রধানগণ চাহিতেছিলেন সলোমোন ও বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জের জন্য অগ্রাধিকার। কারণ, এর দ্বারা ক্যারোলিন দ্বীপ থেকে হাজার মাইল দূরবর্তী জাপানীদের প্রকাণ্ড নৌ-ঘাঁটি ট্রুক রক্ষা করা সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু জাপানে আর্মি ও নেভির মধ্যে যেমন বরাবরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্মির অনুকূলে সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, আলোচ্যক্ষেত্রেও তাই হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পপুয়া উপদ্বীপের পশ্চিম অঞ্চলের দ্বীপগুলিকেই আত্মরক্ষার লাইন হিসাবে গ্রহণ করা হইল। নেভির ভাগে পড়িল সলোমোন দ্বীপপুঞ্জের এলাকা, আর আর্মির ভাগে পড়িল নিউগিনি দ্বীপের এলাকা।

এই সমগ্র অঞ্চলের সদর দপ্তর ও সৈন্যপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল রাবাউলে এবং সেখান থেকে সলোমোন দ্বীপে ১৭নং আর্মি এবং নিউগিনিতে ১৮নং আর্মি পরিচালিত হইল। বলা বাহুল্য যে জাপানী নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীও এর সঙ্গে যুক্ত হইল।

* * *

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রশান্ত মহাসাগরীয় পালটা নৌ-অভিযানের জন্য নৌ-ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বিভিন্ন ধরনের আর্মাডা তৈরী হইল। ১৯৪৪ সালের মধ্যে মার্কিন নৌশক্তি এত বৃদ্ধি পাইল যে, উহা বৃটিশ নৌশক্তির তুলনায় তিনগুণ এবং জাপানের তুলনায় অনেক গুণ বাড়িয়া গেল। তিন বছরের কিছু কম সময়ের মধ্যে মার্কিন জাহাজের সংখ্যা ১,০৭৬ থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ৪,১৬৭টি দাঁড়াইল এবং যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা ৩৮৩ থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ৬১৩ সংখ্যায় দাঁড়াইল। আর প্লেনের সংখ্যা ১,৭৪৪ থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ১৮,২৬৯ সংখ্যায় দাঁড়াইল এবং নৌ ও বিমানবাহিনীর সৈন্য ও লোকজনের সংখ্যা ৫ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষে পেঁছিল। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের নানা ধরনের মার্কিন বিমানবাহী জাহাজের সংখ্যা দাঁড়াইল প্রায় একশত, এগুলির মধ্যে অন্ততঃ ডজনখানেক ছিল অতি বৃহৎ বিমানবাহী পোত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার প্রধান মার্কিন নৌ-সেনাপতি এ্যাডমিরাল নিমিৎস তাঁর যুদ্ধজাহাজগুলির জন্য 'ভাসমান ঘাঁটি' সঙ্গে নিয়া আসিলেন। বড় ছোট যে কোন আকারের যুদ্ধজাহাজের মেরামতি ও সরবরাহের জন্য এক বিশেষ ধরনের পোত নিয়োগ করা হইল। সুতরাং মেরামতি ও সরবরাহের জন্য কোন জাহাজকেই আর দূরবর্তী কোন ঘাঁটিতে ফিরিয়া যাইতে হইল না। মার্কিন নৌবহরের জন্য এই ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে অভিনব ছিল। এক নূতন ধরনের উভচর যুদ্ধের কৌশল মার্কিন সমরবিভাগ অবলম্বন করিল। সারা প্রশান্ত মহাসাগরে অজস্র দ্বীপপুঞ্জ তো রহিয়াছে বটেই এবং সেই সঙ্গে প্রবাল দ্বীপ (coral), উপহ্রদ (lagoon) বা অগভীর হ্রদ, জল থেকে উদ্ভূত শৈলশ্রেণী (reef) এবং প্রবাল প্রাচীর ইত্যাদি বিচিত্র প্রাকৃতিক বাধাও ছিল এবং সেগুলি অতিক্রমণের জন্য এক নূতন ধরনের অবতরণ যান তৈরি হইল যার সংখ্যা ছিল

৮০ হাজার। এই সমস্ত জলযানে সৈন্য, যানবাহন এবং অস্ত্রাদিও বহন করা হইত এবং প্রাকৃতিক বাধা উত্তীর্ণ হইয়া এই সমস্ত জলযানে সৈন্যেরা অস্ত্রাদি সহ ভূভাগে অবতরণ করিত। অবশ্য এদের সঙ্গে সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনীয়াররাও থাকিতেন, তাঁরা যত দ্রুত সম্ভব সেতু, রাস্তাঘাট ও বিমান-ময়দান এবং ডক তৈরী করিতেন। অবতরণের আগে দ্বীপগুলির উপর কামানের গোলা এবং বিমান থেকে বোমা বর্ষিত হইত। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপক ব্যবস্থা ও নিখুঁত আয়োজন সত্ত্বেও জাপানীদের হাত থেকে দ্বীপ অধিকার করা বা কাড়িয়া লওয়া আদৌ সহজ ছিল না। কারণ, জাপানী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ বা পদাতিকদের হাতাহাতি যুদ্ধের পরেই প্রচুর প্রাণের মূল্যে এই সমস্ত দ্বীপ দখল করা যাইত।

* * *

এখানে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের একটি নাটকীয় এবং রোমহর্ষক ঘটনার উল্লেখ না-করিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ঘটনাটি এই ঃ

১৯৪৩ সালের ১৭ই এপ্রিল মার্কিন নৌ-সচিব মিঃ ফ্রাংক নক্সের স্বাক্ষরিত একটি অতি গোপনীয় বার্তা ওয়াশিংটন থেকে গুয়াদাল-ক্যানেলের হেণ্ডার্সন ফিল্ডে সাঙ্কেতিক ভাষায় পাঠানো হইল। এই সাংকেতিক বার্তায় জানাইয়া দেওয়া হইল যে, জাপানের সম্মিলিত নৌবহরের প্রধান সেনাপতি এ্যাডমিরাল ইসোরোকু ইয়ামামাতো পরদিন সকালে রাবাউলের সুরক্ষিত নৌঘাঁটি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের জাপানী ঘাঁটিগুলি পরিদর্শনে বাহির হইবেন। তিনি দুই ইঞ্জিনযুক্ত মিৎসুবিশি বোমারু যোগে যাত্রা করিবেন এবং তাঁর সহকারীগণ আর-একটি বোমারুতে তাঁর পিছন পিছন রওনা হইবেন। তাঁদের এই যাত্রাপথে পাহারা দেওয়ার জন্য ৬ খানা 'জিরো' জঙ্গী বিমান তাঁদেরকে অনুসরণ করিয়া চলিবে। এই ৮ খানা বিমানই রাবাউল থেকে ৩০০ মাইল দূরবর্তী বোগেনভিলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কাহিলি নামক বিমানঘাঁটিতে সকাল ৯-৪৫ মিনিটের সময় অবতরণ করিবে। সুতরাং মার্কিন নৌ-সচিব সেই গোপন বার্তায় হুকুম দিলেন—'ইয়ামামাতোকে ধরো এবং ধ্বংস করো! এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না।

অভিজ্ঞ এবং দক্ষ জাপানী নৌ-সেনাপতি ইয়ামামাতোই পার্ল হারবার আক্রমণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং মিডওয়ে দ্বীপে আঘাত হানিয়াছিলেন। সুতরাং মার্কিনীদের চোখে তিনি এক নম্বরের শত্রু এবং এই শত্রুকে সাবাড় করিতেই হইবে। ১৮ খানা আর্মি পি-৩৮ জঙ্গী বিমানের বহরকে আদেশ দেওয়া হইল এই কার্যসাধনের জন্য। এর মধ্যে ৪ খানা জঙ্গী বিমান ইয়ামামাতোর বোমারুকে আক্রমণ করিবে এবং বাকী ১৪ খানা এদেরকে রক্ষা করিয়া চলিবে। ইয়ামামাতো একজন কড়া সেনাপতি, তিনি অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী এবং ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া চলেন। অতএব তাঁকে ধরিতে হইলে মার্কিন জঙ্গী বিমানগুলিকেও ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া চলিতে এবং অনুসরণ করিতে হইবে। ওয়াশিংটনের গোপন বার্তায় এই সমস্তই উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং কাজেও সেগুলি ফলিয়া গেল। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় যথাসময়ে ইয়ামামাতো এবং তাঁর সহকর্মীদের বোমারু দুইটি কাহিলি বিমানঘাঁটির দিকে আসিয়া হাজির হইল। অবতরণের ঠিক দশ মিনিট আগে মার্কিন জঙ্গী বিমানগুলিও জাপানী বোমারুগুলির

পিছন পিছন ধাওয়া করিয়া আসিল। তখন ইয়ামামাতো এবং তাঁর সহকর্মীদের বোমারু দুইটিও নিরাপত্তার জন্য গাছের মাথার সমান উঁচুতে নামিয়া আসিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। মার্কিন জঙ্গী বিমানগুলির তড়িৎ আক্রমণে ইয়ামামাতো এবং তাঁর সহকর্মীদের বোমারু দুইটি অগ্নিদগ্ধ হইয়া জঙ্গলের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইয়ামামাতোকে তাঁর বোমারু বিমানের সিটে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। কিন্তু তখনও তাঁর সামুরাই তরবারি তাঁর দুই হাঁটুর মধ্যে ধরা ছিল। এভাবে জাপানের একজন বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি আমেরিকানদের হাতে মারা পড়িলেন। কিন্তু জাপানীরা মনে করিলেন এটা নিতান্তই ভাগ্যদোষের ফল। কিন্তু ভাগ্যেদোষ এর মধ্যে কিছুই ছিল না। আসলে মার্কিন নৌ-বিভাগীয় গোয়েন্দা বিভাগ জাপানীদের প্রেরিত সমস্ত সাংকেতিক বার্তা ধরিয়া ফেলিয়াছিল এবং ইয়ামামাতো সংক্রান্ত সমস্ত খবর তাঁদের জানা ছিল—যদিও জাপানীরা তখন এই গোয়েন্দাগিরির খবর জানিতেন না।[১]

* * *

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী সমরনেতারা সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, ইউরোপীয় মিত্রদের কাছ থেকে তাঁদের আর কোন সহায়তা পাওয়ার আশা নাই। কেননা, ইতিমধ্যে মুসোলিনীর পতন এবং স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানবাহিনীর বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইউরোপে যেমন অক্ষশক্তিবর্গের জয়ের আশা কম, তেমনি প্রশান্ত মহাসাগরের দূরবিস্তৃত সাম্রাজ্যও মার্কিন পালটা অভিযানের মুখে সর্বত্র রক্ষা করা যাইবে না। অতএব দূরপ্রসারিত আত্মরক্ষার লাইনগুলিকে আরও ভিতরের দিকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে হইবে, যেমন—কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ থেকে ক্যারোলাইন দ্বীপ ও পশ্চিম নিউগিনির ভিতর দিয়া তিমুর পর্যন্ত।

এই সময় কিংবা ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে প্রধান প্রধান জাপানী সৈন্যবাহিনীর সন্নিবেশ এবং সংখ্যা কিরূপ ছিল? সেই অবস্থান ও সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ:

১. জাপান, শাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে ৬ ডিভিসন স্থলসৈন্য এবং ১ ডিভিসন বিমানসৈন্য।
২. মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় ১৯ ডিভিসন, বিমান ২ ডিভিসন।
৩. চীন ২৬ ডিভিসন, বিমান ১ ডিভিসন।
৪. ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয় ও সুমাত্রা ৩ ডিভিসন, বিমান শূন্য।
৫. বর্মায় ৬ ডিভিসন, বিমান ১ ডিভিসন।
৬. ফিলিপিন্স ২ ডিভিসন, বিমান শূন্য।
৭. সেলিবিস, আম্বোইনা, তিমুর ও পশ্চিম নিউগিনি ২ ডিভিসন, বিমান শূন্য।
৮. পূর্ব নিউগিনি, সলোমোন এবং দক্ষিণ প্রষান্ত মহাসাগর ৬ ডিভিসন, বিমান ২ ডিভিসন।

অর্থাৎ মোট ৭০ ডিভিসন স্থলসৈন্য এবং ৭ ডিভিসন বিমানসৈন্য।[২]

১। লুই স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৪০২-৩৩।
২। A Short History of the Second World War by Basil Collier, P. 488.

বিমানবাহিনী ও স্থলবাহিনীর এই সংখ্যা নিয়া জাপানের দখলীকৃত বিশাল সাম্রাজ্য যে সর্বত্র অটুট রাখা যাইবে না, জাপানী নেতারা সেই অবস্থাটা অনুভব করিতে লাগিলেন। তথাপি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ-থেকে-দ্বীপান্তরের-যুদ্ধে মার্কিন শক্তিকে যথাসম্ভব প্রতিরোধ না করিয়াও উপায় ছিল না। যদিও জাপানী সমর-নেতারা মনে করিতেন যে, তাঁদের মত নিপুণ যোদ্ধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেউ নাই। তথাপি সেটা ছিল নিতান্তই আত্মম্ভরিতা মাত্র। কারণ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার দুই মার্কিন সেনাপতি এ্যাডমিরাল নিমিৎস এবং জেনারেল ম্যাক-আর্থার অত্যন্ত নিপুণ, সাহসী ও দৃঢ়সংকল্পের লোক ছিলেন। নিমিৎস যদিও বয়সে অপেক্ষাকৃত কম ছিলেন, তথাপি এই কম বয়সেই তিনি হাইকমাণ্ডের অন্তর্গত ছিলেন এবং সেটা তাঁর নিজস্ব কৃতিত্বের গুণেই। অল্প বয়সেই সাবমেরিন যুদ্ধের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি নাম করিয়াছিলেন এবং এক নূতন ধরনের নৌ-যুদ্ধে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ক্যাপিটাল শিপ্ বা বড় যুদ্ধজাহাজের চেয়ে বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজই নৌ-সংগ্রামের চূড়ান্ত ভাগ্য-নিয়ামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অপরপক্ষে জেনারেল ম্যাক-আর্থার ছিলেন অন্য সকলের চেয়ে বয়সে প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ। ১৯৩৫ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ফিলিপিন্স গভর্নমেণ্টের সামরিক বিভাগে যোগ দিয়াছিলেন। যখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হইল, তখন তিনি দুইটি পদের অধিকারী ছিলেন—প্রথমতঃ দূর-প্রাচ্যের মার্কিন স্থলবাহিনীর সেনাপতি এবং ফিলিপিন্সের সশস্ত্রবাহিনীর ফিল্ড-মার্শাল। তাঁর পিতা ছিলেন ফিলিপিন্সের সামরিক গভর্নর। সুতরাং ম্যাক-আর্থার তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে খুব সচেতন ছিলেন এবং যদিও রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে তিনি রক্ষণশীল কিংবা ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতি সহানুভূতিশূন্য ছিলেন এবং সেজন্য সেনানীমণ্ডলী ও গভর্নমেণ্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সহজ ছিল না, তথাপি তাঁর কোন বিকল্পও ছিল না।....

প্রশান্ত মহাসাগরের এই অভিনব উভচর যুদ্ধে এবং দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের বিচিত্র কণ্টকর সংগ্রামে যেমন বহু দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল, তেমনি অজস্র স্থান এবং সমুদ্রের অলিগলি জড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই কাহিনীর কোন বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে রাবাউল ছিল জাপানী ঘাঁটিগুলির মূল চাবিকাঠি স্বরূপ। কিন্তু মার্কিনপক্ষ প্রত্যক্ষ আঘাতের দ্বারা এই ঘাঁটি অবিলম্বেই দখলের চেষ্টা না করিয়া এর পাশ কাটাইয়া গেলেন এবং রাবাউলের চতুর্দিকের দ্বীপগুলির—বিসমার্ক, সলোমোন, নিউ আয়র্ল্যাণ্ড ইত্যাদির উপর নৌ-বিমান ও স্থলসৈন্যের দ্বারা আঘাত হানিলেন, আর প্রচণ্ড বোমা-বর্ষণের দ্বারা রাবাউলকে অকেজো করিয়া ফেলার চেষ্টা করিলেন।

১৬ই জুন, ১৯৪৩, গুয়াদাল-ক্যানেলের উপর যে বিমান যুদ্ধ হইল, তা'তে জাপানের ৯৬ খানা বিমান নষ্ট হইল, আর আমেরিকানদের মাত্র ৬ খানা এবং সেদিনই ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশ করা হইল যে, ৩১শে জুলাই, ১৯৪২, থেকে এ পর্যন্ত দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় জাপানের ১,৩৩৭ খানা বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা, ৫১৪-১৫

মুণ্ডা, সলোমোন দ্বীপপুঞ্জ, বোগেনভিল, নিউগিনি ইত্যাদি দ্বীপের বিরুদ্ধে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু ১লা মার্চ, ১৯৪৩, বিসমার্ক সাগরে মার্কিন বিমান-বহর জাপানী নৌ-বহরের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চালাইয়াছিল, তাতে জাপানের প্রভুত ক্ষতি হইল। কনভয়যোগে যে ২২ খানা জাহাজ যাইতেছিল, সেগুলির মধ্যে ১০ খানা যুদ্ধজাহাজ ও ১২ খানা পরিবহণ পোত এবং উহাদের আরোহী সৈন্যেরা অধিকাংশই নিমজ্জিত হইল। ১৫০ খানা জাপানী বিমানের মধ্যে ১০২ খানাই অকেজো হইয়া গেল। জেনারেল ম্যাক-আর্থারের মতে বিসমার্ক সাগরের এই যুদ্ধ ছিল একটা চূড়ান্ত রকমের সংগ্রাম এবং এই যুদ্ধই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী প্রভুত্বের অবসান সূচনা করিল।...

এক বছরের কিছু কম সময়ের মধ্যে মিত্রপক্ষ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ৩ হাজার মাইলের বেশী আগাইয়া গেল এবং ১ লক্ষ ৩৫ হাজার জাপানী সৈন্য এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল যে, তাদের উদ্ধারের আর কোন আশা রহিল না।

কিন্তু এটা ছিল জাপানের বিরুদ্ধে প্রারম্ভিক অভিযান মাত্র।...

উত্তরবর্তী আলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে মার্কিনী সাফল্যের কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী শক্তির পরাজয়ের জন্য মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের দরজাও খুলিয়া গেল।

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, জাপানী সাম্রাজ্যের বহির্ব্যূহের প্রতিরক্ষার (outer defence) লাইন ছিল গিলবার্ট, মার্শাল, ক্যারোলাইন ও ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ। এই বহির্ব্যূহের মধ্য দিয়া জলে স্থলে ও আকাশে প্রচণ্ড মার্কিন আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল এবং মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের এই সংগ্রামে তারাওয়া দ্বীপের রক্তস্রাবী যুদ্ধ আমেরিকানদের নিকট মর্মান্তিক স্মৃতিরূপে চিহ্নিত হইয়া রহিল। কারণ, ২০ নভেম্বর, ১৯৪৩, তারাওয়ার সুরক্ষিত দ্বীপ আক্রান্ত হইয়াছিল এবং চার দিনের ভয়ংকর যুদ্ধের পর আমেরিকানদের দখলে উহা গেল বটে, কিন্তু 'আত্মহননকারী' জাপানীদের বীভৎস লড়াইয়ের পর।...

মার্শাল ও ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জ জয়ের দ্বারা আমেরিকা জাপানী প্রতিরক্ষার বহির্ব্যূহ ভেদ করিয়া ফেলিল এবং ট্রুকের গুরুত্বপূর্ণ জাপানী নৌ-ঘাঁটি অকেজো হওয়ার ফলে মার্কিন নৌবহর এক্ষণে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে স্বচ্ছন্দ বিচরণের সুযোগ পাইল। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে এই পালটা মার্কিন অভিযানে নৌবহর যেমন প্রাধান্য অর্জন করিল, তেমনি বিমানবহরও মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিল। মার্কিন বিমানশক্তি জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাম্রাজ্যকে আলুশিয়ান, সলোমোন, নিউগিনি দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারত ও চীনের ঘাঁটি থেকে যেন চারিদিকে ঘিরিয়া ধরিল।...

এবার জাপানের অন্তর্ব্যূহ (inner defensive line) ভেদ বা বিদ্ধ হওয়ার পালা এবং এই অন্তর্ব্যূহের মোটামুটি লাইন ছিল টোকিও থেকে বোর্নিও দ্বীপ হইয়া মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের মেরিয়ানা, সাইপান, টিনিয়ান, গুয়াম, ইয়াপ ইত্যাদি পার হইয়া দক্ষিণ দিকে আম্বয়না ও তিমুর দ্বীপ এলাকা পর্যন্ত। ১৯৪৪ সালের প্রথম ভাগে অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতায় মার্কিন শক্তি ধাপে ধাপে টোকিওর দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিল।

১৯৪৪, জুন মাসে গুয়ামের উপর ৮ ঘণ্টারও অধিক কাল ধরিয়া অতি প্রচণ্ড বিমানযুদ্ধে জাপানীরা ঘায়েল হইয়া গেল। তাদের ৩১৫ খানা প্লেন ধ্বংস হইল এবং সেই সঙ্গে জাপান হারাইল তার সর্বোৎকৃষ্ট পাইলটদের। মধ্য প্রশান্ত মহাসমুদ্রের আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ সাইপানও আক্রান্ত হইল ১৫ই থেকে ১৯শে জুন পর্যন্ত। এখানে জাপানী সুইসাইড বা আত্মহননকারী বাহিনী মরিয়া হইয়া প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাইল। অধিকাংশ দ্বীপে জাপানীরা যে প্রতিরক্ষার ব্যূহ রচনা করিয়াছিল সেগুলি ছিল নারিকেল গাছের গুঁড়ি, ইস্পাত এবং কংক্রীটের দ্বারা তৈরী। আর যেখানে ছোট ছোট পাহাড় বা পাহাড়ের গহ্বর ছিল, সেগুলির ভিতর থেকেও জাপানী সৈন্যেরা অত্যন্ত দৃঢ়তার ও সাহসের সঙ্গে প্রচণ্ড বাধা দিল। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও জাপানীরা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। সাইপান দ্বীপ আমেরিকার দখলে যাওয়ায় সেখানকার অসামরিক জাপানীরাও আত্মহত্যা করিল। কেননা, তাদের মতে সম্রাটের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই সবচেয়ে বড় পবিত্র কাজ।

সাইপানের যুদ্ধে জাপানের এই পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া কেবল আত্মহত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না, খোদ জাপানী মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট নিয়া টান পড়িল। ১৮ই জুলাই, ১৯৪৪, সমরবিলাসীদের অন্যতম গোঁড়া নায়ক প্রধানমন্ত্রী হিদেকি তোজো তাঁর সমগ্র মন্ত্রিসভাসহ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। জেনারেল কুনিয়াকি কইসো (Kuniaki Koiso) নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে আরও নির্মম ও তীব্র যুদ্ধ চালাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। যদিও জাপানে এভাবে মন্ত্রিসভার উত্থান-পতনের অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল যুদ্ধে জাপানের পরাজয়, তবু প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার করিতে কেউ রাজী ছিলেন না। ফলে, এই যুদ্ধ চলিল আরও ১২ মাস ধরিয়া।

এই সময় বা ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে প্রধান প্রধান জাপানী সৈন্যবাহিনী ও তাদের সহায়ক বিমানবাহিনীর সংখ্যা ও অবস্থান ছিল নিম্নলিখিত রূপ ঃ

১. জাপান, শাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের সৈন্যসংখ্যা ১৫ ডিভিসন এবং বিমানসৈন্য ৪ ডিভিসন।
২. রিউকিউ দ্বীপ ও ফরমোজায় ৭ ডিভিসন ও বিমান ১ ডিভিসন।
৩. ফিলিপিন্সে ১০ ডিভিসন ও বিমান ২ ডিভিসন।
৪. মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় ১২ ডিভিসন।
৫. চীনে ২৬ ডিভিসন ও বিমান ১ ডিভিসন।
৬. ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয় ও সুমাত্রায় ৪ ডিভিসন এবং বিমান ১ ডিভিসন।
৭. বর্মায় ১০ ডিভিসন ও বিমান ১ ডিভিসন।
৮. সেলিবেস, আম্বয়না ও তিমুরে ৬ ডিভিসন এবং বিমান ১ ডিভিসন।
৯. মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে ৫ ডিভিসন।
১০. দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ৬ ডিভিসন।

অর্থাৎ মোট ১০১ ডিভিসন স্থলসৈন্য এবং সৈন্যবাহিনীর সহযোগী বিমানবাহিনী মোট ১১ ডিভিসন।[১]

যদিও ১৯৪৩-এর আগস্টের তুলনায় ১৯৪৪ সালের আগস্টে জাপানের সৈন্যবল

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা, ৫২৫।

যথেষ্ট বাড়িয়া গেল, তবু এর দ্বারা জয় সূচিত হইল না। কেননা, এদের অধিকাংশের সঙ্গেই মিত্রবাহিনীর কোন প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হয় নাই। বরং অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। কারণ, ১৯৪৪-এর আগস্টের মধ্যভাগে ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্র ও আকাশ এবং সাইপান, টিনিয়ান ও গুয়াম—এই সমস্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ ও স্থান মার্কিন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলিয়া গেল এবং জাপানের অন্তর্ব্যূহ (ইনার ডিফেন্স লাইন) ভাঙ্গিয়া গেল।

এ্যাডমিরাল নিমিৎসের উভচর বাহিনী মধ্য প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপগুলি একটির-পর-একটি করিয়া কাড়িয়া নিতে লাগিল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায়ও অনুরূপভাবে জাপানী ঘাঁটিগুলি আমেরিকার হাতে যাইতে লাগিল। এর ফলাফল খুব গুরুতর হইল। কেননা, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুবৃহৎ বি-২৯ বোমারু বিমান প্রচুর সংখ্যায় তৈরী হইয়াছিল এবং এগুলির গতি ছিল ঘণ্টায় ৩০০ মাইল এবং এগুলির বোমা বহনের ক্ষমতা ছিল ১০ টন। সুতরাং অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জের ঘাঁটিগুলি থেকে এই সমস্ত সুবৃহৎ মার্কিন বোমারু জাপানীদের শহরে ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ শুরু করিল।

জেনারেল ম্যাক্-আর্থারের মার্কিন ও অস্ট্রেলীয় বাহিনী ফিলিপিন্সের দিকে অগ্রগতির জন্য সলোমোন ও নিউগিনির মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দখল করিল। এভাবে দ্বীপ-থেকে-দ্বীপান্তরের যুদ্ধে অজস্র জাপানী জাহাজ ও বিমান ধ্বংস হইল এবং হাজারে হাজারে জাপানী সৈন্য মারা পড়িতে লাগিল।

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৪, মধ্য ফিলিপিন্সের মর্মস্থান লেতি দ্বীপে ম্যাক্-আর্থার ২ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য এবং ৬০০ যুদ্ধজাহাজসহ আক্রমণ ও অবতরণ করিলেন। বাতান ও করিজিডোর যুদ্ধের আড়াই বছর পর ম্যাক-আর্থার ফিলিপিন্সে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ফিলিপিন্স মার্কিন দখলে গেলে জাপানীরা ইন্দোচীন, মালয় ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে সংযোগ হারাইয়া ফেলিবে এবং যুদ্ধের অপরিহার্য মূল্যবান বস্তু পেট্রোল থেকে বঞ্চিত হইবে। সুতরাং লেতি উপসাগরে জাপানী নৌ ও বিমান বহর আমেরিকানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধে মাতিয়া উঠিল। ১৯৪৪ সালের অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে মার্কিন নৌ-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। এই যুদ্ধে ১৬৬ খানা মার্কিন ও প্রায় ৭০ খানা জাপানী যুদ্ধজাহাজ এবং ১২৮০ খানা মার্কিন ও ৭১৬ খানা জাপানী জঙ্গী বিমান পরস্পরের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ সংগ্রামে লিপ্ত হইল। এই নৌ-সংগ্রামের জাপানী অধিনায়ক ভাইস এ্যাডমিরাল নিশিমুরা যেমন তিনি নিজে নিহত হইলেন, তেমনি তাঁর বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করিল। লেতির যুদ্ধে ৫৬,২৬৩ জাপানী সৈন্য নিহত, ৩৮৯ জন বন্দী হইল এবং আমেরিকার নিহত হইল ২,৮৮৮ জন, আহত ৮,৪২২ জন। কিন্তু তবু জাপানীরা রণে ক্ষান্ত দিল না। অক্টোবরের শেষে (১৯৪৪) মালয় ও সিঙ্গাপুর যুদ্ধ জয়ের খ্যাতিমান জাপানী সেনাপতি জেনারেল ইয়ামাসিতার নেতৃত্বে নূতন জাপ সৈন্যদল ফিলিপিন্সে পেঁৗছিল এবং মিণ্ডানাও, লুজন ইত্যাদি প্রধান প্রধান দ্বীপগুলিতে তীব্র ও রক্তাক্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। রাজধানী ম্যানিলা শহর যেন শ্মশানে পরিণত হইল। যদিও অপরিসীম দৃঢ়তা ও বীরত্বের সঙ্গে জাপ সৈন্যেরা অধিকাংশ যুদ্ধক্ষেত্রে—জলে স্থলে ও আকাশে লড়াই করিয়াছে, তবু তারা শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। শ্রেষ্ঠতর মার্কিন শক্তির হাতে

জাপানীদের পরাজয় ঘটিতে লাগিল এবং ১৫ই জুলাই, ১৯৪৫, জেনারেল ম্যকা-আর্থার ফিলিপিন্স যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করিলেন। এই সমস্ত যুদ্ধে ২৩টি জাপানী ডিভিসন বা ৪ লক্ষ জাপানী সৈন্য নষ্ট হইল। ১৭টি মার্কিন ডিভিসন ও ফিলিপিনো গেরিলা বাহিনী এই যুদ্ধে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিল।

বর্মা পুনর্দখল

জাপানের বিরুদ্ধে পালটা অভিযানে ব্রহ্মদেশের পুনর্দখল মিত্রপক্ষের নিকট অত্যন্ত জরুরী ছিল। কারণ, ১৯৪২ সালের ৭ই মার্চ রেঙ্গুনের পতনের পর গোটা বর্মাদেশ জাপানীদের দখলে চলিয়া গেল। ফলে উত্তর বর্মার মধ্য দিয়া ভারত থেকে চীনে সরবরাহ পাঠাইবার যোগাযোগ ও সড়ক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সুতরাং জেনারেল চিয়াং কাইসেক ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল উভয়েই বর্মা দেশকে জাপানের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য উৎসুক ছিলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। চার্চিল ব্রহ্মদেশকে সুবৃহৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অচ্ছেদ্য অংশ বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং জাপানের হাতে হতমান বৃটেনের প্রেস্টিজ পুনরুদ্ধার এবং হৃত সাম্রাজ্য ফেরৎ পাওয়ার আশাতেই তিনি বর্মা থেকে জাপানীদের বিতাড়ন চাহিতেছিলেন। অর্থাৎ চীনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনরায় সংস্থাপনের জন্য যত না গরজ তাঁর ছিল, তার চেয়ে বেশী গরজ ছিল তাঁর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য। কিন্তু জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইসেকের মতে বর্মার পুনরুদ্ধার ছিল সমগ্র এশীয় অভিযানের মূল চাবিকাঠির মত।

'Burma is the key to the whole campaign in Asia. After the enemy has been cleared out of Burma, his next stand would be in North China and finally, in Manchuria. The loss of Burma would be a very serious matter to the Japanese and they would fight stubbornly and tenaciously to retain their hold on the country.'[১]

অর্থাৎ চিয়াং কাইসেকের মতে এশিয়ার ভূখণ্ডে জাপানীদের বিরুদ্ধে অভিযানের পক্ষে বর্মার পুনরুদ্ধার অপরিহার্য। বর্মা থেকে এই শত্রু বিতাড়িত হইলে, সে গিয়া দাঁড়াইবে উত্তর চীনে এবং সর্বশেষে মাঞ্চুরিয়ায়। সুতরাং জাপানীদের পক্ষে বর্মা মুলুক হারানো একটা ভয়ানক গুরুতর বিষয় এবং বর্মার এই দখলদারি রক্ষার জন্য তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে এবং মরিয়া হইয়া লড়াই করিবে।

এই কথাগুলি চিয়াং কাইসেক বলিয়াছিলেন ১৯৪৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে কায়রোতে তিন প্রধানের (চার্চিল-রুজভেল্ট-চিয়াং) বৈঠকে। কিন্তু উত্তর বর্মাকে জাপানী মুক্ত করার এই প্রস্তাবিত অভিযানে তিনি দক্ষিণ দিক থেকে বৃটিশ নৌ-বিমান ও স্থল বাহিনীর যুগপৎ আক্রমণের প্রয়োজনীয়তার উপরেও জোর দিলেন। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উত্তর বর্মার বিরুদ্ধে চীনা মার্কিণ যুক্ত অভিযানের প্রশ্নে চার্চিলের তেমন উৎসাহ ছিল না। তিনি বরং হংকং ও সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অভিযানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু রুজভেল্ট চিয়াং কাইসেক ও চীনকে সহায়তা দানে আগ্রহী ছিলেন।...

১। Roosevelt and Hopkins—Sherwood, P. 772.

অবশ্য মিত্রপক্ষীয় সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর নিকট সেই সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের তুলনায় চীন-বর্মা-ভারত (ইংরাজীতে সংক্ষেপে সি. বি. আই.) রণাঙ্গনের গুরুত্ব তেমন বেশী ছিল না এবং ব্রহ্মদেশের পতনের পর প্রায় দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে তাঁরা এই অঞ্চলে কোন বড় রকমের যুদ্ধের প্রস্তুতিও করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং দুরধিগম্য জঙ্গল পাহাড় নদী ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিঘ্নের জন্য উপযুক্ত সরবরাহ পাঠানো বা সৈন্যবল বৃদ্ধি করা কার্যতঃ প্রায় অসম্ভব ছিল। তারপর বৃষ্টি ও বর্ষাকালের জন্য একমাত্র মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ছাড়া অন্য সময় স্থলপথে রণক্রিয়া চালানো অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। তবু, ভারতের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা কিছু কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। এই বিষয়ে মিত্রপক্ষের প্রধান সহায়ক হইলেন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল উইনগেট, যিনি প্যালেস্টাইনে ও ইথিওপিয়াতে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়া খুব সাফল্যজনক গেরিলা যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। এজন্য মিত্রপক্ষীয় মহলে তাঁর খুব নাম-ডাক হইয়াছিল। উইনগেট ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে বর্মাতে জাপানী লাইনের পিছনে গেরিলা আক্রমণ শুরু করিলেন। উত্তর ইরাবতী নদী অঞ্চলে জাপানীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরবরাহ, সেতু ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিলেন। উইনগেটের এই গেরিলা-বাহিনী চিন্দিৎ (Chindits) নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। এদের সঙ্গে আবার যোগ দিলেন মার্কিন বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারল ফ্রাঙ্ক ডি মেরিল (Merrill), যাঁর অধীনে তিন হাজার সৈন্য ও অফিসারের একটি দল ছিল। সারা ১৯৪৩ সাল ধরিয়া উইনগেট ও মেরিল আকস্মিক গেরিলা আক্রমণের দ্বারা জাপানীদিগকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন—সেই সময় মার্কিন জেনারেল স্টিলওয়েলের পরিচালনাধীন চীনা সৈন্যেরা মিটকিনার উত্তরে ও পশ্চিমে পাহাড় ও জঙ্গল এলাকায় জাপানী বাহিনীকে অবশ করিয়া রাখিল। উইনগেটের গেরিলা যোদ্ধারা উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ইরাবতী, চিন্দুইন এবং সালুইন নদী উপত্যকায় এবং মিটকিনা থেকে মান্দালয় পর্যন্ত রেলপথের যোগাযোগের উপর আক্রমণ করিয়া সেগুলিকে নষ্ট করিয়া দিল। এই সমস্ত গেরিলা যোদ্ধাকে মিত্রপক্ষ একমাত্র বিমানযোগে সরবরাহ যোগান দিত। মিত্রপক্ষের উচ্চতর সামরিক কর্তৃপক্ষ বর্মাতে গেরিলা বাহিনীর এই সাফল্য দেখিয়া তাঁদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইলেন। কিন্তু এই গেরিলা যুদ্ধের বিখ্যাত নায়ক উইনগেট তাঁর এই দুঃসাহসিক কার্যকলাপের সফল পরিণতি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। ১৯৪৪ সালের ২৪শে মার্চ বর্মাতে এক বিমান দুর্ঘটনায় মাত্র ৪১ বছর বয়সে উইনগেট নিহত হইলেন। তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে স্বয়ং চার্চিল অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন, উইনগেট ছিলেন এমন এক বিরল প্রতিভা যিনি মানুষের ভাগ্য নিয়ামকও হইতে পারিতেন।'[১]

* * *

জাপানের বিরুদ্ধে চীনে সরবারাহ জোগানের ব্যবস্থা মিত্রপক্ষের নিকট ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিল। কেননা, চীনের দীর্ঘ সমুদ্রোপকুল জাপানীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং ভারত থেকে চীনে সরবরাহ দেওয়ার জন্য এক অদ্ভুত ও অভিনব

১। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৫৭০।

ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। আসাম থেকে পূর্ব ভারতীয় হিমালয়ের মাথার উপর দিয়া অর্থাৎ ১৭ থেকে ২৩ হাজার ফুট উঁচু দিয়া চীনের কুনমিং পর্যন্ত এই সরবরাহ যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। হিমালয়ের এই উচ্চ শৃঙ্গগুলি মার্কিন মহলে হিমালয়ের কুঁজ নামে অভিহিত ছিল। কিন্তু এভাবে বরাবর সরবরাহ দেওয়া সম্ভব নয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং মার্কিন জেনারেল জোসেফ স্টিলওয়েলের মাথায় এক নতুন পরিকল্পনা খেলিয়া গেল। এই পরিকল্পনা অনুসারে তাঁর সামরিক ইঞ্জিনিয়ারগণ বিখ্যাত লেডো রোড—ভারত বা উত্তর-পূর্ব আসাম থেকে উত্তর ব্রহ্ম পর্যন্ত তৈয়ার করিতে মনস্থ করিলেন। এই সড়ক উত্তর বর্মার বর্মা রোডের সঙ্গে যুক্ত হইল এবং বর্মা রোড গিয়া মিশিয়াছিল চীনের সঙ্গে।

কিন্তু এই সড়ক নির্মাণ মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনার মত ছিল। কেননা, এই সড়কের জন্য হাজার রকমের মালমসলা আসাম থেকে একটি সরু রেলপথ দিয়া কোন রকমে উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত লেডোতে আনিতে হইত এবং এই সমগ্র অঞ্চলটি পাহাড় পর্বত ও জঙ্গলের জন্য ভয়াবহ রকমের দুর্গম ও বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু চীনা কুলিরা অদ্ভুত পরিশ্রম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতার সঙ্গে রাস্তা খুঁড়িয়া ও মাটি কাটিয়া এবং সেই মাটি মাথার উপর ঝুড়িতে বহিয়া নিয়া যাইত। এর সঙ্গে ছিল ধূলাবালি, বৃষ্টি-বাদলা ও ভয়ঙ্কর মশার উপদ্রব এবং হঠাৎ ধ্বস নামিবার আশংকা। এই প্রকার অসম্ভব স্থানে ও অসম্ভব অবস্থায় যে সড়ক নির্মাণ করা যায়, তা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা যাইত না। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে এই সড়ক নির্মাণ শুরু হইল —দৈনিক মাত্র এক মাইলের তিন-চতুর্থাংশ তৈয়ার করা যাইত এবং ১৯৪৩ সালের মে মাস পর্যন্ত মাত্র ৪৭ মাইল রাস্তা তৈয়ার হইল। অথচ আরও ৪৩১ মাইল পথ বাকী ছিল! অবশেষে ১৯৪৫ সালের ৭ই জানুয়ারী—২ বছর ২৩ দিন পর ৪৭৮ মাইল দীর্ঘ লেড়ো সড়ক নির্মিত হইল। পাহাড়-পর্বতের উপর দিয়া এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়া অজস্র বাঁক সৃষ্টি করিয়া এই বিখ্যাত সড়ক গিয়া মিশিল চীন-ব্রহ্ম সড়কের বা বর্মা রোডের সঙ্গে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান সেনাপতি লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে তাঁর ডেপুটি জেনারেল স্টিলওয়েলের এই সড়ক নির্মণ নিয়া তীব্র ঝগড়া বাধিয়াছিল, অবশ্য শেষ পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেন এই সড়ক নির্মাণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। ১৯৪৫ ফেব্রুয়ারীতে এই সড়ক দিয়া প্রথম কনভয়ের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে সময় লাগিয়াছিল ২৮ দিন। মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার এই সড়ক নির্মাণকে 'মাস্টারপিস্ অব ইঞ্জিনিয়ারিং' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সড়ক নির্মাণের সময়ের মধ্যে চীনে সরবরাহ দেওয়া বন্ধ থাকে নাই। বিমানযোগে হিমালয়ের কুঁজের উপর দিয়া মাসে ৪৫ হাজার টন সামরিক সম্ভার সরবরাহ করা হইত। নিঃসন্দেহে এটাও কম প্রশংসনীয় ছিল না।

* * *

১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের আরাকান, কোহিমা, ইম্ফল, টিডিম ইত্যাদি স্থানে যে সমস্ত আক্রমণ ও যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল, সেগুলি সমস্তই পাশ্চমী লেখকদের মতে জাপানীদের ভারত প্রবেশের চেষ্টা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কোথাও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বা আক্রমণের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। কোন কোন পুস্তকে যেটুকুও বা করা হইয়াছে

তাও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। (এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মুক্তিসংগ্রাম—অষ্টম পর্ব, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু ব্রহ্মদেশে জাপানীদের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের পালটা আক্রমণে ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৫-এর প্রথম ভাগের মধ্যে জাপানীরা সর্বত্র পরাজিত হইল। মিত্রপক্ষের অস্ত্রসম্ভার এবং বিশেষভাবে বিমানশক্তি জাপানীদের তুলনায় বহুগুণ বেশী ছিল। সুতরাং বর্মার যুদ্ধে যে বৃটিশ-ভারতীয় চতুর্দশ আর্মি মুখ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাদের হাতে জাপানী বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটিল। ইম্ফলের দিকে জাপানীদের ৫০ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছিল এবং ১৯৪৪-এর প্রথমভাগের মধ্যে চতুর্দশ আর্মি'রও ৪০ হাজার সৈন্য হতাহত হইল। আর ২ লক্ষ ৩৭ হাজার সৈন্য বীভৎস আবহাওয়ার জন্য গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইল। কিন্তু মিটকিনা থেকে শুরু করিয়া রেঙ্গুনসহ সমগ্র বর্মাদেশ ১৯৪৫-এর প্রথম ভাগের মধ্যে দখল হইয়া গেল। আর জাপানীরা থাইল্যাণ্ডের দিকে পলায়ন করিল। তবে, উভয় পক্ষকেই বর্মাদেশের অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রাণপণ লড়াই করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ-ভারতীয় সরকারী মহলে চতুর্দশ আর্মি'র খুব নাম হইয়াছিল।

অষ্টম পর্ব

জনগনের প্রতিরোধ ঃ বন্দিশালার বর্বরতা

প্রথম অধ্যায়

নেতাজী সুভাষের মুক্তিসংগ্রাম
আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরব কাহিনী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক কিংবদন্তী নায়কে পরিণত হইয়াছেন এবং তাঁর কাহিনী আজ ঘরে ঘরে প্রচারিত। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন এবং সেই সরকারের পক্ষ থেকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও আজাদ হিন্দ ফৌজ-কর্তৃক হাতে-কলমে সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত-অঞ্চলে মুক্তি অভিযান ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মহাযুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন একমাত্র গান্ধীজী বা কংগ্রেসের জন্যই সম্ভব হয় নাই, সেই স্বাধীনতার মূলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের দানও অসামান্য। অবশ্য জার্মানী বা জাপানের মত ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের সহায়তায় ভারতকে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত করার এই দুঃসাহসিক চেষ্টা নিয়া আজও রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের শেষ হয় নাই। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অতুলনীয় দেশপ্রেম, তাঁর আশ্চর্য সংগঠনশক্তি এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ঘৃণা, আর অবিশ্বাস্য সাহস, ধৈর্য ও পরিশ্রম তাঁর নেতৃত্বকে এমন এক মহিমান্বিত রূপ দিয়াছে যে, ভারতের জনসাধারণের কাছে আজও তিনি মৃত্যুহীন নায়কের মত বন্দনীয়। সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করিতে হইবে, যে, তিনি কখনও জার্মানী বা জাপানের হাতের পুতুল ছিলেন না এবং ভারতের স্বাধীনতার বিনিময়ে অক্ষশক্তিবর্গের সঙ্গে কোন প্রকার আপোস-মীমাংসায়ও তিনি রাজী ছিলেন না। যুদ্ধ চলাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে যত কুৎসাই রটনা হইয়া থাকুক না কেন, মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক, দলিল ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিবৃতি থেকে একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি অখন্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বৃটিশ শক্তির বদলে অন্য কোন বৈদেশিক শক্তির নিকট মাথা নত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সত্য সত্যই 'আপোসহীন বিরামহীন' যোদ্ধা ছিলেন।...

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এই আশ্চর্য কাহিনী প্রায় সর্বজনবিদিত। সুতরাং এখানে তার বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক এবং পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের বিরাট পটভূমিকায় সেই আলোচনার স্থানও নিতান্ত সংকীর্ণ। অতএব এখানে সেই দুঃসাহসিক অভিযানের একটা রেখাচিত্র মাত্র উল্লেখ করা গেল।...

* * *

১৯৪১ সালের ১৮ই জানুয়ারী গভীর রাত্রে (রাত্রি ১টা ১৫মিঃ) সুভাষচন্দ্র তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশিশিরকুমার বসুর সহায়তায় এলগিন রোড়ের বাসগৃহ থেকে গোপনে

এবং ছদ্মবেশে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পেশোয়ার অভিমুখে রওনা হন এবং সেখান থেকে প্রধানতঃ শ্রী ভগৎরাম তলোয়ারের সাহায্যে ও সাহচর্যে প্রকাণ্ড বিপদের ঝুঁকি নিয়া অত্যন্ত দুর্গম পথ অতিক্রমপূর্বক কাবুলে গিয়া উপস্থিত হন। সেদিনের যুদ্ধরত ভারতের গোয়েন্দাচক্রের চোখে ধূলি দিয়া তিনি যে সাফল্যের সঙ্গে ভারত ত্যাগ করিয়া আফগানিস্তানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন, সেটাও এক অবিশ্বাস্য কাহিনীর মত। বলাই বাহুল্য যে, তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর, সহকর্মী ও বন্ধুর অত্যন্ত সতর্ক উদ্যম এবং সাহসিক চেষ্টার ফলেই এভাবে তাঁর পক্ষে কাবুলে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

কাবুল থেকে তিনি ইতালীয় রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় আফগানিস্তান পার হইয়া রাশিয়ায় পেঁছিলেন এবং ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে মস্কো থেকে তিনি জার্মানীতে বা বার্লিনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কয়েকজন ভারতীয় দেশপ্রেমিক—যেমন নাম্বিয়ার, গণপুলে, আবিদ হাসান, ডঃ গিরিজা মুখার্জি, প্রমোদ সেনগুপ্ত, ডাঃ সুলতান, এম. ভি. রাও, ডঃ মল্লিক, কান্তরাম প্রভৃতি তাঁর সঙ্গী ও সহায়ক হইলেন। সেখানে গঠিত হইল আজাদ হিন্দ সংঘ, ২রা নভেম্বর, ১৯৪১, এই সংঘের প্রথম বৈঠকে তিনটি অবিস্মরণীয় কথার জন্ম হইলঃ জয়হিন্দ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, আর নেতাজী—যে কথাগুলি পরবর্তীকালের ভারতবর্ষে যেন বৈপ্লবিক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। আফ্রিকার যুদ্ধে যে সমস্ত ভারতীয় সৈনিক জেনারেল রোমেলের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১০ হাজার বন্দী সৈন্যকে জার্মানীতে আনা হইয়াছিল। সেই বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের ভিতর থেকেই সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় প্রথম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন সামান্য ১৫ জন মাত্র। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে বন্দীদের আগ্রহের জন্য মাত্র এক বছরেই তাঁদের সংখ্যা দাঁড়াইল সাড়ে-তিন হাজারে। কিন্তু অর্থাভাবের জন্য এই সংখ্যা আর বাড়ানো গেল না। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জার্মান কর্তৃপক্ষের এই মর্মে একটা বুঝাপড়া হইয়াছিল যে, জার্মান সরকার আপাততঃ টাকাটা ঋণ হিসাবে দিবেন এবং পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে সমস্ত টাকাটা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে।

যদিও ১৯৪১ সালের মার্চ থেকে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে বা বার্লিনে অবস্থান করিয়াছিলেন, তবু যুদ্ধের পরবর্তীকালে প্রকাশিত দলিলপত্র ও পুস্তকাদিতে দেখা যায় যে, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নাৎসী নেতা ও নাৎসী সরকারের তেমন কোন সদ্ভাব ছিল না, বা তেমন কোন আন্তরিক সহায়তাও তিনি জার্মানীর কাছ থেকে পান নাই। এর প্রথম কারণ ছিল এই যে, নাৎসী জার্মানরা অন্য কোন দেশের—বিশেষতঃ ভারতের মত পরাধীন দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করিত না। দ্বিতীয়তঃ সুভাষচন্দ্র কোন ক্রমেই সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সম্মত হন নাই এবং তাঁর বহু বেতার ভাষণের মধ্যে কোথাও তিনি রাশিয়ার নিন্দা করেন নাই কিংবা হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ সমর্থনও করেন নাই। ১৯৪১ সালের মে মাসে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফন্ রিবেণ্ট্রপের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই সাক্ষাতে জার্মানী কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতায়

১। নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ (তৃতীয় খণ্ড), নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা—৩১।

সাহায্য দানের কথা দূরে থাকুক, রিবেণ্ট্রপ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার পর্যন্ত করেন নাই। হিটলারের সঙ্গেও সুভাষচন্দ্রের মাত্র একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—১৯৪২ সালের ২৯শে মে। এই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, হিটলার তাঁর আত্মজীবনীমূলক পুস্তক 'মেইন ক্যাম্ফে' (Mein Kampf) ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে সমস্ত অপমানজনক মন্তব্য করিয়াছিলেন, সুভাষচন্দ্র সেই বিষয়ে হিটলারকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু হিটলার সেই সমস্ত কথার জবাব দিতে অস্বীকার করেন। জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারতীয় শাখার একজন বিশিষ্ট অফিসার ডঃ আলেকজাণ্ডার ভার্থ এই সাক্ষাৎকারের কথা একটি পুস্তকে* লিপিবদ্ধ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিটলারের কাছ থেকে তাঁর প্রশ্নের কোন জবাব না পাইয়া সুভাষচন্দ্র পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের পর ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কোন গ্যারেণ্টি দিয়া তিনি (হিটলার) কোন ঘোষণা দিতে রাজী আছেন কিনা ? এই প্রশ্নের জবাবে হিটলার সোজা বলিয়া দিলেন যে, আগামী ১৫০ বছরের মধ্যেও ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিবে না।…

হিটলারের এই অসম্মানজনক মন্তব্যের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন এবং হিটলার তা নিঃশব্দে শুনিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হিটলার ও জার্মানীর কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র হতাশই হইয়াছিলেন বেশী এবং পরে যখন তিনি জাপানে গেলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো মুখে খুব সমর্থন ও সহানুভূতি দেখাইলেন বটে, কিন্তু কাজের বেলা সুভাষচন্দ্র বৈষয়িক ও সামরিক সাহায্য খুব সামান্যই পাইয়াছিলেন। তথাপি নেতাজী সুভাষ আজাদ হিন্দ সরকার ও ফৌজের গঠনে যে অসামান্য কৃতিত্ব, সংগঠনশক্তি এবং অবর্ণনীয় সাহস দেখাইয়াছিলেন, সেটা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজেরই প্রতিভার গুণে—জাপানীদের কোন সাহায্যের জন্য নয়।

১৯৭৩ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বার্লিনের হ্যামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কীয় গবেষণা বিভাগের প্রধান ডঃ এম. সি. ওয়াইডম্যান কলিকাতার এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে (জি. ডি. আর.) সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক গবেষণা হইয়াছে। সেই গবেষণা থেকে জানা যায় যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার করার জন্যই দেশত্যাগপূর্বক সুদূর জার্মানীতে গিয়াছিলেন। 'কিন্তু তিনি কোন দিনই সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল হইতে চান নাই।' বরং নাৎসী সাম্রাজ্যবাদীরা সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজেদের স্বার্থে নেতাজীকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাদের সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল। ডঃ ওয়াইডম্যান আরও প্রকাশ করেন যে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদ নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজকে (বার্লিনে গঠিত) সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের সময় ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় সৈন্যেরা দৃঢ়তার সঙ্গে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সেই 'অপরাধেই' জার্মানীতে ভারতীয় সৈন্যদের সামরিক আদালতে বিচার করা হইয়াছিল।'

হিটলার ও জার্মানী সম্পর্কে মোহমুক্তির পর সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বার্লিন থেকে তিনি তাকাইয়া দেখিলেন সুদূর প্রাচ্যের দিকে—প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিতে তখন জাপান অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং ব্রহ্মদেশসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বৃটিশ ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত এবং জাপানের করতলগত। সুতরাং যদি জাপানের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়া যায়, তবে, ভারত সীমান্ত সংলগ্ন ব্রহ্মদেশ থেকে তিনি অনায়াসে ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চালাইতে ও ভারতে প্রবেশ করিতে পারিবেন—যেটা ৬ হাজার মাইল দূরবর্তী জার্মানী থেকে সম্ভব নয়। বিশেষতঃ তখন স্ট্যালিনগ্রাদ ও ককেশাসের যুদ্ধে জার্মানী ছিল বিপর্যয়ের মুখে।...

ঠিক সেই সময় একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ দেখা দিল। মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু তখন জাপানে। ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন তিনি ২৬ বছরের যুবক, তখন দিল্লীতে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা করার জন্য তিনি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তারপর আত্মগোপন করিয়া ১৯১৫ সালে জাপানে গিয়া আশ্রয় নিয়াছিলেন এবং বৃটিশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য জাপানী নাগরিকত্ব ও একটি জাপানী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে এই অগ্রগণ্য নায়ক জাপানে আসিয়াও নিরলস বসিয়া রহিলেন না। ভারতের বন্ধন মোচনের জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বৃটেনের বিরুদ্ধে "নিউ এশিয়া" নামে একটি সাময়িক-পত্র প্রকাশ করিলেন এবং ১৯২৪ সালে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেস লীগ স্থাপন করিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই লীগ থেকেই ইতিহাস বিখ্যাত আই.এন.এ. বা আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্ভব হইয়াছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশ থেকে ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় নাগরিক এবং সিঙ্গাপুরের পতনের পর জাপানীদের হাতে বন্দী ৫০ হাজার ভারতীয় সৈন্যের মধ্য থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়িয়া উঠিল। এই সংগঠনের প্রথম কৃতিত্ব বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর। কিন্তু তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। সুতরাং তিনি অনুভব করিলেন যে, ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজন। সুতরাং এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি আমন্ত্রণ জানাইলেন। টোকিওস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতের মারফৎ বার্লিনস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। সুভাষচন্দ্র সোৎসাহে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩, জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে সুভাষচন্দ্র সাবমেরিন যোগে যাত্রা করিলেন সেই সুদূর জাপান অভিমুখে—সঙ্গে একমাত্র সহকারী আবিদ হাসান। (জার্মানীতে যে সংগঠন তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সেটা পরিত্যাগ করিতে হইল। কারণ, কোন গত্যন্তর ছিল না)। পুরা তিন মাস তিনি সাবমেরিনে কাটাইলেন। এই বিপজ্জনক সমুদ্র যাত্রায় অজস্র অসুবিধারও সম্মুখীন হইয়াছিলেন স্বল্পায়তন এই সাবমেরিনে। পরে আফ্রিকার উপকূলবর্তী মাদাগাস্কার দ্বীপের কাছে তিনি পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী জার্মান সাবমেরিন বদল করিয়া জাপানী সাবমেরিনে আরোহণ করিলেন এবং ৬ই মে, ১৯৪৩, তিনি সুমাত্রার সাবান বন্দরে পৌঁছিলেন এবং সেখান থেকে বিমানযোগে তিনি টোকিওতে উপস্থিত হইলেন ১৬ই মে। রূপকথার রাজপুত্রের মত তিনি যেন ভারতীয় স্বাধীনতার রাজকন্যাকে

উদ্ধারের জন্য সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হইয়া গেলেন! আধুনিক ভারতে এই কাহিনীর তুলনা নাই।

ভারতীয় স্বাধীনতার দুই মহান যোদ্ধা রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হইল টোকিওর বিখ্যাত ইম্পিরীয়েল হোটেলে এবং দুই জনেই ভাবাবেগের দ্বারা উদ্বেলিত হইয়াছিলেন, পরামর্শ করিলেন তাঁরা আসন্ন কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে।...

১০ই জুন এবং ১৪ই জুন সুভাষচন্দ্র দেখা করিলেন জেনারেল তোজোর সঙ্গে এবং তোজো আকৃষ্ট হইলেন সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রতি। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং এই প্রতিশ্রুতির কথা তিনি জাপ পার্লামেণ্টে ঘোষণাও করিলেন।[১]

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৩ তারিখটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। কারণ ওই দিন সিঙ্গাপুরের এক প্রকাশ্য জনসভায় বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তাঁর এত দিনকার গঠিত ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ এবং আই. এন. এ.'র সর্বময় কর্তৃত্ব তুলিয়া দিলেন সুভাষচন্দ্রের হাতে এবং বক্তৃতার শেষে তিনি ঘোষণা করিলেন—'সুভাষ তারুণ্যের প্রতীক। ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর কোথাও তাঁর নতুন করে পরিচয় দেওয়ার মত কিছু নেই। তাঁর পরিচয় তিনি নিজেই। এখন থেকে তিনিই আমাদের নেতা। আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবাহী সৈনিক মাত্র।' প্রকাশ্য জনসভায় রাসবিহারী বসুর ওটাই ছিল জীবনের শেষ ভাষণ।

সুভাষচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন এবং রাসবিহারী বসুর প্রতি তিনি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করিলেন। আর জন্মভূমির শৃংখল মোচনের জন্য সমস্ত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাইলেন।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের শীর্ষ সমর নায়ক জে.কে. ভোঁসলে নেতাজীর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, সেদিন সিঙ্গাপুরের ভারতীয়-অভারতীয় সমগ্র জনতার পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র অপূর্ব সম্বর্ধনা এবং সমর্থন লাভ করিলেন এবং পরদিন ৫ই জুলাই সশস্ত্র বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করিলেন।

সেদিন থেকে শুরু হইল নতুন ইতিহাস এবং নেতাজীরূপে সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা।...

সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মিগণ অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হইলেন পুরাতন সংগঠনের সংস্কার ও নতুন করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য। তিনি আগেই জনসভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্বাগ্রে চাই একটি 'অস্থায়ী' জাতীয় সরকার বা আজাদ হিন্দ সরকার গঠন এবং এই সরকার একটি স্বাধীন গবর্নমেণ্টরূপে কাজ করিবে। ('অস্থায়ী' সরকার এজন্য যে, ভবিষ্যতে একমাত্র স্বাধীন ভারতের জনগণই স্থায়ী সরকার গঠনের অধিকারী)।

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩, ইতিহাসের আর-একটি লাল তারিখ। কেননা, ঐদিন প্রতিষ্ঠিত হইল আজাদ হিন্দ সরকার এবং ভারতের বাইরে সেই প্রথম স্বাধীন ভারত সরকার (অস্থায়ী) গঠিত হইল। এই সরকারকে স্বীকৃতি দিলেন জাপান, জার্মানী ও ইতালী এবং তাঁদের অনুগত কয়েকটি গবর্নমেণ্ট। আর সুদূর আয়র্ল্যাণ্ড থেকে

১। আমি সুভাষ বলছি (তৃতীয় খণ্ড)—শ্রীশৈলেশ দে, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯।

অভিনন্দন বার্তা পাঠাইলেন স্বনামধন্য বিপ্লবী নেতা ডি. ভ্যালেরা। বলা বাহুল্য যে, এই অভিনন্দন-বার্তায় সুভাষচন্দ্র মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আজাদ হিন্দ বাহিনী ও সরকারের সর্বাধিনায়করূপে নেতাজী উচ্ছ্বসিত জনতার সম্মুখে নিম্নলিখিত শপথবাক্য উচ্চারণ করিলেন :

"ভগবানের নামে ভারতবর্ষ এবং আমার ৩৭ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য, আমি সুভাষচন্দ্র বসু এই পবিত্র শপথ করছি যে, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এই সংগ্রাম চালিয়ে যাব।"[১]

ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে নেতাজী সুভাষ তাঁর এই শপথ বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।…

মেয়েরাও পিছনে পড়িয়া রহিলেন না, তাঁরাও দলে দলে আগাইয়া আসিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশ থেকে। গঠিত হইল ঝাঁসীর রানী বাহিনী এবং এই বাহিনীর উদ্বোধন হইল ২২শে অক্টোবর। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন এই বাহিনীর অধিনেত্রী নিযুক্ত হইলেন এবং এই বাহিনীর কথা বিদ্যুৎগতিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০০।

কিন্তু কাদের নিয়া সেদিন আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হইয়াছিল ? নিম্নে সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম উদ্ধৃত করা গেল :

সুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন—নারী সংগঠন।

এস. এ. আয়ার—প্রচার সচিব।

লেঃ কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জি—অর্থ।

সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি—কর্নেল জে. কে. ভোঁসলে, লেঃ কর্নেল আজিজ মহম্মদ, লেঃ কর্নেল ভগৎ, লেঃ কর্নেল গুলজারা সিং, লেঃ কর্নেল এম. জেড. কিয়ানী, লেঃ কর্নেল এ. ডি. লোগনাথন, লেঃ কর্নেল ঈশান কাদির এবং লেঃ কর্নেল শাহনওয়াজ খান।

এ. এম. সহায়—সেক্রেটারি (মন্ত্রীর সম-মর্যাদা সহ)।

রাসবিহারী বসু—প্রধান উপদেষ্টা।

উপদেষ্টা—করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি. এম. খাঁ, এ ইয়েলাপ্পা, জে. থিবি, সর্দার ঈশ্বর সিং।

এ. এন. সরকার—আইন বিষয়ক উপদেষ্টা।

সেদিন সিঙ্গাপুরের আকাশ-বাতাস জয়হিন্দ ধ্বনিতে এবং নেতাজী জিন্দাবাদ, আর 'চলো দিল্লী' 'চলো দিল্লী' আওয়াজে মুখরিত হইয়া উঠিল।[২]

কিন্তু স্বাধীন সরকার পরিচালনা ও সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ চাই। সেই অর্থ কে দিবে ? কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সুভাষচন্দ্রের আবেদনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্নদেশ থেকে ধনী-ব্যবসায়ী ও সাধারণ লোক কিংবা সমাজের সর্বস্তর থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি টাকা সংগৃহীত হইল। এক ব্রহ্মদেশ থেকেই ২৫ কোটি টাকা

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১২০।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ১২১-২২।

পাওয়া গিয়াছিল! আজাদ হিন্দ সরকার তাঁদের নিজেদের ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

আজাদ হিন্দ সরকারের নিজস্ব কোন ভূখণ্ড ছিল না, এজন্য জাপানী গবর্নমেণ্ট আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুইটি নেতাজীর হাতে তুলিয়া দিলেন এবং এই দ্বীপ দুইটির নতুন নামকরণ হইল শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৪৩, ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের আর-একটি লাল তারিখ। ঐ দিন আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু রাত্রি বারোটা পাঁচ মিনিটের সময় বেতারযোগে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

* * *

আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে আক্রমণাত্মক অভিযান সংগঠিত করার জন্য উদ্যোগ নিল এবং ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে নেতাজী সুভাষ তাঁর সদর দপ্তর সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করিলেন—উদ্দেশ্য ইম্ফলের দিকে আক্রমণ।

মোট তিনটি ডিভিসন গঠিত হইল এবং প্রত্যেকটি ডিভিসন আবার তিনটি ব্রিগেডে বিভক্ত হইল এবং কয়েকটি ব্রিগেড জাতীয় নেতাদের নামে চিহ্নিত হইল। প্রথম ডিভিসনের অধিনায়ক ছিলেন মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানী, দ্বিতীয় ডিভিসনের কর্নেল আজিজ আমেদ (পরে শাহ নওয়াজ খান) এবং তৃতীয় ডিভিসনের এন. এস. ভগৎ (পরে জি. আর. নাগর)। এগুলি ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি গ্রুপ এবং মেডিক্যাল ইউনিটও ছিল।

ভারতের অভ্যন্তরে বাহিনীর খবরা-খবর সংগ্রহ এবং গোয়েন্দাগিরি ও নাশকতামূলক কার্যের জন্য নেতাজী সুভাষ তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর, সহকর্মী ও হিতৈষীদের সঙ্গে কিছুটা গোপন যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কয়েকটি স্থানে গুপ্ত ঘাঁটি ও শক্তিশালী ট্রান্সমিটারের সাহায্যে সংবাদের আদান-প্রদানও করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিপজ্জনক কার্য করিতে গিয়া কিছু সংখ্যক দেশপ্রেমিক বৃটিশ-ভারতীয় গোয়েন্দা-পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন এবং গোপন বিচারে ও গুপ্তভাবে তাঁদেরকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। আবার কেউ কেউ আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাও করিয়াছিল।

নেতাজীর মুক্তি অভিযানে সহায়তা করিতে গিয়া যাঁরা ভারতে নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সাহসী স্বদেশ প্রেমিকদের মধ্যে ডাঃ পবিত্র রায়, শ্রীহরিদাস মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী বেলা মিত্রের নাম আজও উল্লেখযোগ্য হইয়া রহিয়াছে।

* * *

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে অভিযানের আগে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে জাপানীদের সঙ্গে এই মর্মে একটা চুক্তি করিয়াছিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁদের অভিযান হইবে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র এবং জাপানীদের যুদ্ধ হইবে আলাদা। অর্থাৎ আজাদ হিন্দ বাহিনীর উপর জাপানীদের কোন কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ চলিবে না এবং ভারত সীমান্তের অভ্যন্তরে যে সমস্ত এলাকা ও জমি আজাদী সৈন্যেরা দখল করিয়া নিবে, সেগুলি থাকিবে সম্পূর্ণরূপে আজাদী সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধীন এবং যেখানে ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইবে। এই চুক্তির দ্বারাই বুঝা

যাইবে যে, সুভাষচন্দ্র জাপানীদের কর-ধৃত পুত্তলিকা ছিলেন না এবং তাঁর স্বদেশ প্রেমের মধ্যে কোন প্রকার ভেজাল ছিল না কিংবা তাঁর স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে কোন সন্দেহজনক কলুষ ছিল না। অথচ তাঁর বিরোধী এবং শত্রুপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে তখন নানা মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছিলেন। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, যুদ্ধের সেই ঘোরতর তীব্রতার দিনে সত্য সংবাদ ও প্রকৃত অবস্থা জানারও কোন সুযোগ ছিল না।

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার—সুভাষচন্দ্রের দুর্জয় সাহস, অসাধারণ মনোবল এবং অতুলনীয় দেশপ্রেমই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের আসল সম্বল। কারণ, কার্যতঃ আজাদী ফৌজের কোন আধুনিকতম সমর সম্ভার ও যান্ত্রিক যুদ্ধের উপযোগী ব্যবস্থা ছিল না। যে বিমান ও ট্যাংক আধুনিক যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বাহন, তার কিছুই আজাদী ফৌজের ছিল না। এমন কি উপযুক্ত সাজপোশাক এবং খাদ্যদ্রব্যও ছিল না। অপর পক্ষে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত ছিল অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল পাহাড় ও অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। সোজা কথায় প্রাকৃতিক বিঘ্নগুলিও যেন শত্রুপক্ষের সহায়ক ছিল। তথাপি এই অবস্থার মধ্যে আজাদী ফৌজের আক্রমণে (৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪) আরাকান থেকে পাওয়া গেল প্রথম জয়ের খবর। উল্লাসে ফাটিয়া পড়িল দেশপ্রেমিক জাতীয় বাহিনী। ৮ই এপ্রিল কোহিমা দখল হইল, ১৪ই এপ্রিল ময়রাং এবং তারপর বিষেণপুর মুক্ত হইল। ভারতের অভ্যন্তরে ভারতের মাটিতে জাতীয় জয়-পতাকা উড্ডীন হইল—আর আওয়াজ উঠিল সহস্র কণ্ঠে জয় হিন্দ, চলো দিল্লী এবং নেতাজী জিন্দাবাদ!

কিন্তু তখনও ইম্ফল জয় বাকি এবং ইম্ফলে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ তাদের প্রচণ্ডতম শক্তির সমাবেশ ঘটাইয়াছিল—আধুনিক সমরসম্ভার থেকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পর্যন্ত। তবু বিস্ময়ের কথা এই যে, আজাদ হিন্দ বাহিনী তিনমাস কাল ইম্ফল অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং অবর্ণনীয় বাধা-বিপত্তি ও শত্রুপক্ষের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও আজাদী সৈন্যেরা ইম্ফলের উপকণ্ঠে পেঁাছিয়াছিল। এখানে জাপানী সৈন্যবাহিনীও ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ চালাইয়াছিল। কিন্তু জেনারেল শ্লিমের অধীনে মিত্রপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬০ হাজার, আর আধুনিক যুদ্ধের মারণাস্ত্র এবং বিমান-শক্তির একাধিপত্য। আর আজাদী বাহিনীর না ছিল খাদ্য, রসদ এবং বিমান ও অন্যান্য অস্ত্র কিংবা যানবাহন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের এই সমগ্র যুদ্ধটাই মিত্রপক্ষের ইস্তাহারে ও সংবাদে একমাত্র জাপানীদের যুদ্ধ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। সুভাষচন্দ্র বা আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম ভুলক্রমেও উচ্চারণ করা হয় নাই। তবে, যুদ্ধের শেষে চার্চিল তাঁর মহাযুদ্ধের ইতিহাসে একবার মাত্র 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'র নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন।[১]

কিন্তু তাঁর ইতিহাসের পঞ্চম খণ্ডে (পৃষ্ঠা ৫০৩) চার্চিল স্বীকার করিয়াছেন যে, সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়কেরা জুন মাসে ইম্ফলের সংকটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আরও রিজার্ভ সৈন্য, গোলাগুলি এবং সরবরাহ ছাড়া অবস্থা যে সামলানো যাইবে না, একথাও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বোচ্চ অধিনায়ক লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের নিকট এক পত্রে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

১। চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৫।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যলক্ষ্মী মাউণ্টব্যাটেনের প্রতিই প্রসন্ন হইলেন, জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইম্ফল ও মিটকিনার বিপদ কাটিয়া গেল এবং "জাপানীদের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনাও দূর হইয়া গেল।"—(মাউণ্টব্যাটেনের রিপোর্ট)

কিন্তু আসলে এই যুদ্ধটা একমাত্র "জাপানীদের ভারত আক্রমণ" ছিল না, ছিল সেই সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত মুক্তির অভিযান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অভিযান সামরিক দিক দিয়া ব্যর্থ হইল। কেননা, আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আজাদী বাহিনীর আধুনিক যুদ্ধের উপযোগী সমরাস্ত্র, এরোপ্লেন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমরসম্ভার ছিল না। এদিকে হঠাৎ ভীষণ বৃষ্টি ও বর্ষা নামিয়া গেল। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে এবং অরণ্য ও পাহাড়িয়া নদীবহুল এলাকাগুলিতে এই বর্ষা নিদারুণ বিপদের সৃষ্টি করিল। সব যেন ভাসিয়া যাওয়ার জো হইল। সমস্ত সরবরাহ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং মান্দালয় থেকে ইম্ফল পর্যন্ত বহুদূরের এই সাপ্লাই-পথ চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়িল। "হিকারী কিকান" নামক যে জাপানী সংগঠনের উপর সাপ্লাই যোগানোর দায়িত্ব ছিল, তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল। খাদ্য-বস্তু ছিল না, ঔষধপত্র ছিল না। আহতদের চিকিৎসা করা এক কঠিন সমস্যা ছিল। তার উপর ছিল অসংখ্য পোকামাকড় ও হিংস্র জোঁকের উৎপাত—আহতদের ক্ষতস্থানে এই সমস্ত পোকামাকড়ের কামড় অত্যন্ত মর্মান্তিক অবস্থার সৃষ্টি করিল। সুতরাং আজাদী বাহিনীর পশ্চাদপসরণ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। সুতরাং ময়রাং, বিষেণপুর, ইম্ফল ইত্যাদি পরিত্যক্ত হইল। আর আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হইল। এই মুক্তিযুদ্ধে ২৭ হাজার জওয়ান প্রাণ বিসর্জন দিলেন। স্বাধীনতা-কামী ভারত সীমান্তের মাটি হাজার হাজার শহীদের রক্তে সিক্ত হইল। আধুনিক ভারতে এক নতুন ইতিহাসের সূচনা হইল।

* * *

বর্ষার শেষে নূতন বছরে আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ থেকে আবার যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা আর সম্ভব হইল না। কারণ, একটির-পর-একটি করিয়া দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সমাবেশ হইল। ২১ জানুয়ারী, ১৯৪৫ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সুতরাং তাঁর সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে আজাদ হিন্দ সরকার বঞ্চিত হইল। এদিকে রণক্ষেত্রে জাপানীদের ক্রমাগত ব্যর্থতার জন্য প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো পদত্যাগে বাধ্য হইলেন (জুলাই, ১৯ ৪) এবং নূতন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন জেনারেল কুনিয়াকি কইসো (Koiso)। জাপানীদের আওতায় গঠিত এবং ডাঃ বা ম পরিচালিত 'স্বাধীন' বর্মা সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের নেতা জেনারেল আউঙ্গ সান বিদ্রোহ করিলেন এবং জাপানীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। অন্যদিকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীও প্রচণ্ড শক্তি নিয়া উত্তর বর্মা পুনরায় দখল করিল এবং রেঙ্গুনের দিকে অভিযান করিল। জাপবাহিনী তখন রেঙ্গুন থেকে পলায়ন করিল। তখন আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পূর্ণরূপে একক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ৩রা মে, ১৯৪৫, রেঙ্গুন মিত্রশক্তির দখলে চলিয়া গেল। সুতরাং এই অবস্থায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর আর যুদ্ধ চালাইবার সুযোগ রহিল না। কারণ, সেই যুদ্ধ চালাইবার অর্থ ছিল নিশ্চিত ধ্বংস। অতএব ২৪শে এপ্রিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রকেও ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিতে হইল। তাঁর ইচ্ছা ছিল

চীন বা রাশিয়া থেকে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করা। কিন্তু জাপানীরা এই বিষয়ে কোন সহায়তা দিতে রাজী ছিল না। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় আগত দুইজন জাপানী জেনারেল লেঃ জেনারেল ইসোদা এবং লেঃ জেনারেল ফুজিওয়ারা, যাঁরা নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, তাঁরা এক সাংবাদিক বৈঠকে নেতাজীর উপরোক্ত সংকল্পের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।[১]

কিন্তু ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করার আগে ঝাঁসীর রানী বাহিনীর মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং তাদেরকে নেতাজীর একনিষ্ঠ সহকর্মী দেবনাথ দাসের নেতৃত্বে ব্যাংককে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর অনেক বিশিষ্ট সেনাপতি ও সেনানী রেঙ্গুন বিজয়ী বৃটিশদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন।

আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র সহকর্মিদের অনুরোধে রেঙ্গুন থেকে মৌলমিন এবং সেখান থেকে ব্যাংককে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। সেখান থেকে তিনি গেলেন সিঙ্গাপুর এবং ১৬ই আগস্ট বিমানযোগে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করার আগে তিনি মেজর জেনারেল কিয়ানীকে তাঁর অনুপস্থিতিতে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া গেলেন। কিন্তু তার আগেই তিনি জাপানের পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়াছিলেন।...

বর্মা দেশ ত্যাগ করার আগে নেতাজী তাঁর সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এক বিদায়-বাণীতে বলেন:

'আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতি ও সৈনিকেরা, ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আজ আমি বার্মা ছেড়ে যাচ্ছি। এখানে থাকলে তোমাদের সংগ্রাম ক্ষেত্রের অম্লান বীরত্বগাথা, যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এবং আজও যা নিঃশেষ হয়নি। ইম্ফল ও বার্মার রণাঙ্গনে আমরা মুক্তিসংগ্রামের প্রথম পর্বে পরাজিত হয়েছি, কিন্তু সে পরাজয় কেবলমাত্র প্রথম পর্বের পরাজয়। শেষ নয়।'

'আগামী দিনের নতুন ভারতবর্ষ জন্ম নেবে স্বাধীনতার দেব-দেউলে, পাশবন্ধ জীবন নয়; তোমাদের আজকের এই বিস্ফারিত আত্মদান তাদের জন্ম সম্ভব করে তুলবে, স্মরণ করিয়ে দেবে তাদের কানে এই পরম তথ্য তোমরাই তাদের পূর্বসূরী।... আমারই মত এ-কথা বিশ্বাস করো যে, নব ঊষার পূর্বক্ষণ চিরদিনই থাকে দুর্গম আঁধারে ঢাকা। আর-একটি কথাও বিশ্বাস করো যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং হবে অচিরেই।'[২]

সুভাষচন্দ্রের এই ভবিষ্যৎবাণীও দুই বছরের মধ্যেই (১৯৪৭ সালে) ফলিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু বর্মা দেশের পতনের পর নেতাজীর পক্ষে সিঙ্গাপুরে অবস্থান করাও আর নিরাপদ ছিল না। অতএব তাঁর মন্ত্রিসভার অনুরোধে ও চাপে পড়িয়া তিনি সিঙ্গাপুর থেকে চলিয়া গেলেন সায়গনে এবং সেখান থেকে দালাত ও তুরান হইয়া ১৮ই আগস্ট অপরাহ্নে তিনি পৌঁছিলেন ফরমোজা দ্বীপের তাইহোকু বিমানবন্দরে—সঙ্গে একমাত্র কর্নেল হাবিবুর রহমান।

১। ২৪-১-১৯৭৫ তারিখের কলিকাতার হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত।
২। নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ—(তৃতীয় খণ্ড) নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ১৭৯-৮০

তারপরের ইতিহাস সর্বজন বিদিত এবং বিতর্কিত। তাইহোকু বিমানবন্দর থেকে নেতাজী ও হবিবুর রহমান যে বিমানে চড়িয়া যাত্রা করিয়াছিলেন সেটি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে ও প্লেনটিতে আগুন ধরিয়া যায় এবং প্লেনের বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে নেতাজীর পোশাকে আগুন লাগে এবং তিনি গুরুতররূপে আহত হন, তাঁকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নেওয়া হয় বটে, কিন্তু সেই রাতেই তাঁর জীবনান্ত ঘটে। পাঁচ দিন পর ২৩শে আগস্ট সেই খবর জাপান থেকে সরকারীভাবে প্রচার করা হইল রেডিও যোগে।

কিন্তু সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত (১৯৭৭) ত্রিশ বছরের অধিক কাল ধরিয়া বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু নিয়া বহু বিতর্ক, আন্দোলন ও আলোড়ন ঘটিয়া গিয়াছে। কেননা, রাজনৈতিক মহলের এবং জনগণের মধ্যে অনেকের নিকট সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু এখনও রহস্যাবৃত। তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে, সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁদের ধারণা সুভাষচন্দ্র কোথাও আত্মগোপন করিয়া আছেন। এমন কি গত ত্রিশ বছরে ভারত সরকার কর্তৃক একাধিক তদন্ত কমিশন গঠন এবং তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধানের পরেও জনচিত্ত থেকে সংশয় ও সন্দেহ দূর হয় নাই। পঞ্জাব হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি জি. ডি. খোসলাকে নিয়া যে একক তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছিল, চার বছর ধরিয়া সেই কমিশন বিস্তৃত অনুসন্ধানের পর ১৯৭৪ সালের ১লা জুলাই ভারত সরকারের নিকট এই মর্মে রিপোর্ট দিয়াছেন যে, ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু কমিশনের এই সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিলেও জনগণের মধ্যে অনেকেই এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়চিত্তে গ্রহণ করে নাই।

অবশ্য জাতীয় জনচিত্তে নেতাজী সুভাষচন্দ্র চিরদিনই অমর থাকিবেন।

নেতাজীর সংগ্রামের মূল্যায়ন

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়া এ পর্যন্ত অজস্র আলোচনা হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে বোধ হয় বিদেশীদের দ্বারা নেতাজীর সংগ্রামের মূল্যায়নের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতার নেতাজী ভবনে যে আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু কর্তৃক সম্পাদিত একটি গ্রন্থে সেই আলোচনার বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।[১]

স্বদেশের ও বিদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন এবং এই আলোচনার সারমর্ম থেকে জানা যায় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য সুভাষচন্দ্রের দুর্জয় সংকল্প এবং দুঃসাহসিক সংগ্রাম ও অভূতপূর্ব ধৈর্য এবং কষ্ট স্বীকারের কোন তুলনা ছিল না। তিনি কোনমতেই নাৎসী জার্মানী ও জাপানের বশংবদ ছিলেন না, ছিলেন স্বাধীনচেতা। কিন্তু বৃটিশ পরাধীনতার পাশ ছিন্ন করার জন্য যতটুকু সাহায্য ও সহযোগিতা না নিলে কার্যোদ্ধার সম্ভব নয়, বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে ততটুকু নিতে তিনি নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সেই সাহায্য বা সহযোগিতাও আত্মসম্মানের বিনিময়ে নয়।

এই সম্পর্কে নাৎসী জার্মানীর পররাষ্ট্র-দপ্তরের প্রাক্তন অফিসার Dr. Alexander Werth (ইনি 'রাশিয়া এ্যাট্ ওয়ার' নামক রুশ-জার্মান সংগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক আলেকজাণ্ডার ভার্থ ও ওয়ার্থ নন। ইনি পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বনের অধিবাসী ছিলেন, বর্তমানে মৃত।) একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে, যে চিত্তাকর্ষক মন্তব্য করিয়াছেন নীচে তা উল্লেখ করা গেল :

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অক্ষশক্তিবর্গের সঙ্গে নেতাজীর সহযোগিতার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি :

'Regardless of the fact that he was operating in Axis countries in 1941-1945 Subhas Chandra Bose remained an uncompromising fighter for Indian Independence, made a very significant contribution to Indian independence and—what is more—he continued to be a planner and builder of the free India of his dreams. The Axis Powers lost the war. But Subhas Ch. Bose won the victory of India over Britain and his ideas of national reconstruction will win many more victories in the days to come.'[১]

'১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বসু যদিও অক্ষশক্তিবর্গের দেশে কার্যকলাপ চালাইতেছিলেন, তথাপি তিনি বরাবরই ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতার একজন আপোসহীন সংগ্রামী। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে তিনি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, তিনি তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন ভারতকে গড়িয়া তোলার জন্য পরিকল্পনা ও নির্মাণকার্য চালাইয়া যাইতেছিলেন। অক্ষশক্তিবর্গ যুদ্ধে হারিয়া গেলেন বটে, কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু ভারতে বৃটেনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। আগামী দিনের ভারতের জাতীয় পুনর্গঠনে তাঁর চিন্তাধারা আরও অনেক জয়লাভ করিবে।'···

একথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সুভাষচন্দ্র কখনও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর আক্রমণকে সমর্থন করেন নাই। বরং ভারত ত্যাগের পর তিনি প্রথম আফগানিস্তান হইয়া রাশিয়াতেই গিয়াছিলেন সোভিয়েত সাহায্যলাভের আশায়। কিন্তু সেটা সম্ভব না হওয়ায় তিনি বার্লিনে গেলেন। কিন্তু বার্লিনেও হিটলারী নেতাদের আচরণে ও মনোভাবে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। বরং হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের জন্য তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই বিষয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলান হাউনার (Milan Hauner) মন্তব্য করিয়াছেন :

'The outbreak of war between Germany and Russia shocked Bose profoundly. He felt that at one stroke his plans were falling to pieces.'

"জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে বসু গভীরভাবে আঘাত পাইলেন। তিনি অনুভব করিলেন যেন একটি আঘাতে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া পড়িতেছে।'[২]

১। পূর্বোল্লেখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৫৬।
২। পূর্বোল্লেখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৮০।

প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার ফলেই তিনি জার্মানী ছাড়িয়া সুদূরপ্রাচ্যে—জাপানে যাওয়ার সংকল্প করিয়াছিলেন—'যদিও চীন-জাপান যুদ্ধে সুভাষচন্দ্র চীনের প্রতিই বেশী সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন।'—(ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৫৫)

জাপান থেকে রাসবিহারী বসুর আহবান ও সুভাষচন্দ্রের উপর স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইবার ভার অর্পণ ইতিহাস-বিদিত-ঘটনা। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাটিতে পদার্পণ করিয়াই তিনি 'অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার' গঠন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন কেন? কারণ সুভাষচন্দ্র বলিতেন :

'ইতিহাস থেকে শিখেছি যে স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য গোড়াতেই চাই একটি জাতীয় বাহিনী ও জাতীয় সরকার।'—(ঐ পুস্তক পৃষ্ঠা ৩৫১)

এজন্যই প্রথমে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত এবং সঙ্গে সঙ্গেই আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

* * *

১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তরের এশীয় ব্যুরোতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যে দলিল তৈরী হইয়াছিল, তাতে জাপান ও নেতাজীর মধ্যে সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই দলিলে সুভাষের অজস্র প্রশংসা করা হইয়াছে এবং ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অঞ্চলের যুদ্ধে শত্রুর বিমান আক্রমণের মুখে নেতাজী কিরূপ অবিচলিত ছিলেন এবং খোলা জায়গায় অবস্থান করিয়া আশ্চর্য সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, সে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, হাজার বিঘ্ন বিপদ সত্ত্বেও নেতাজীর সংগ্রামের ইচ্ছা বিন্দুমাত্র কমে নাই। সারা জীবন তিনি তাঁর প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে অতি তিক্ত সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন।[১]

আলোচ্য জাপানী দলিলে উদ্ধৃত অংশগুলির মধ্যে উপসংহারে গান্ধী ও নেহরুর মতামত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

'Making an assessment of Bose's Work Gandhi said the Bose achieved in a few years what others would have taken several decades to achieve. In Gandhi's opinion the use of arms was regrettable, but Bose's achievements and contributions to Indian Independence movement was boundless. Nehru once said that I.N.A. under Bose's command believed the past judgement of Britishers that Indians did not have military leaders of high standard. Though I.N.A. was poor in eqipment compared to the British it fought gloriously and defeated the white armies.'

'সুভাষচন্দ্র বসুর কার্যকলাপের পর্যালোচনা করিয়া গান্ধী বলিয়াছিলেন যে, অন্যের পক্ষে যে কাজ করিতে কয়েক যুগ লাগিয়া যাইত, বসু তা' কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। গান্ধীর মতে অস্ত্রের ব্যবহার দুঃখজনক ছিল বটে, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সুভাষের কীর্তি ও অবদান সীমাহীন ছিল।'

'নেহরু একদা বলিয়াছিলেন যে, বৃটিশরা আগে মনে করিত ভারতীয়েরা উৎকৃষ্ট সামরিক নেতা হইতে পারে না। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর অধীনে আজাদ হিন্দ

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৯৭।

ফৌজের লড়াই সেই ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। যদিও বৃটিশদের তুলনায় আই. এন. এ.'র সামরিক সাজসজ্জা খুব সামান্যই ছিল, তবু তাঁরা গৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদিগকে হারাইয়া দিয়াছিলেন।'[১]

*　　　*　　　*

১৯৪৪ সালের শেষ দিনে সুভাষেরও জীবনব্রতের বা অভিযানের শেষ পর্যায় চিহ্নিত হইল। বৃটিশ সৈন্যেরা আকিয়াবে অবতরণ ও দখল করিয়া নিল।

শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে পিছনে হঠিয়া ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। তিনি রাশিয়ায় আশ্রয় লাভের জন্য মাঞ্চুরিয়ায় যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ সম্মত হইলেন না। টোকিওর রুশ রাষ্ট্রদূতও নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন না।···

জাপানী ভাষ্য অনুসারে ১৮ আগস্ট' ১৯৪৫, তাইপে বিমানবন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র আহত ও তাঁর সারা দেহে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। 'কিন্তু সারা দেহে আগুন সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র অবিচলিত ছিলেন।'

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে নেতাজী বলিয়াছিলেন ঃ

'একমাত্র দুঃখ ভারতের স্বাধীনতা দেখা যেতে পারলুম না।'[২]

১। পূর্বোল্লেখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪২০-২১।
২। পূর্বোল্লেখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪১৬।

অষ্টম পর্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

অধিকৃত ইউরোপে পার্টিজান যুদ্ধ
জনগণের ও বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

নাৎসী জার্মানবাহিনী যখন একের-পর-এক ইউরোপীয় দেশগুলি জয় করিয়া নিতে লাগিল এবং পীড়ন, লুণ্ঠন ও শোষণের রাজত্ব কায়েম করিতে লাগিল, তখন সেই ঘোরতর দুর্বিপাকে পড়িয়া গোড়ার দিকে জনসাধারণ বিমূঢ় ও হতভম্ব হইয়া পড়িল। কিন্তু ক্রমেই জনসাধারণের এক বিরাট অংশের মধ্যে নূতন চেতনা ও সাহস দেখা দিতে লাগিল। হিটলার অবশ্য অধিকৃত ইউরোপে 'নিউ অর্ডার' বা 'নববিধান' চালু করিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই নববিধানের অর্থ গিয়া দাঁড়াইল 'বিশুদ্ধ আর্য' জার্মান জাতির নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্বীকার এবং বিজিত জাতিসমূহের পরিপূর্ণ দাসত্ব। অবশ্য সামান্য কিছু সংখ্যক লোক প্রায় প্রত্যেকটি বিজিত দেশেই 'প্রভু জার্মানদে'র বশ্যতা স্বীকার করিল এবং নানা কারণে তাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত হইল। কিন্তু এই সমস্ত সামান্যসংখ্যক দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক ছাড়া জনসাধারণের অধিকাংশই হিটলারী-দাসত্ব-বন্ধন ছিন্ন করার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল এবং ক্রমেই জনগণের মধ্য থেকে প্রতিরোধ-যুদ্ধ দানা বাঁধিতে লাগিল। দেখা দিল পার্টিজান যোদ্ধা কিংবা গেরিলার দল, যারা ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি বিজিত দেশে জার্মান লাইনের পিছনে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্য চালাইল, যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া এবং অতর্কিতে হানা দিয়া জার্মান সৈন্য ও অফিসারদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বলা বাহুল্য যে, জার্মানবাহিনীর প্রচুরসংখ্যক সৈন্য ও অফিসার মারা পড়িল। ফলে, ক্ষিপ্ত জার্মান প্রতিপক্ষ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অবর্ণনীয় অত্যাচার, সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড চালাইল। ফলে, এর পালটা প্রতিক্রিয়ায় 'নিরীহ' গ্রামবাসী থেকে শুরু করিয়া 'পলাতক' শহরবাসী পর্যন্ত প্রায় সকলের মধ্যেই নূতন নূতন প্রতিরোধ যুদ্ধ বা গেরিলা যুদ্ধের প্রেরণা সঞ্চারিত হইল। সেই গৌরবদীপ্ত ইতিহাস এবং দেশপ্রেমিক পার্টিজান যোদ্ধাদের আশ্চর্য বীরত্ব ও ত্যাগ-স্বীকারের কাহিনী বোধ হয় কোনদিনই সম্পূর্ণ লেখা যাইবে না। কেননা, তাঁদের অধিকাংশই মৃত এবং তাঁরা কোনদিনই ফিরিয়া আসিয়া তাঁদের অপূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করার আর সুযোগ পাইবেই না। অথচ নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর ঐতিহাসিক সংগ্রামের সঙ্গে এই পার্টিজান বাহিনীর আত্মদানও কম গুরুত্বব্যঞ্জক ছিল না।...

১৯৪১ এবং ১৯৪২ সাল এই পার্টিজান যুদ্ধের যেন প্রারম্ভিক পর্ব ছিল। কিন্তু ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে লালফৌজ ও মিত্রবাহিনীর জয়যাত্রার ফলে সেই প্রারম্ভিক পর্বের প্রতিরোধ-যুদ্ধ যেন চরম পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হইল এবং ইউরোপে ফ্যাসিস্ট শক্তির মৃত্যু ডাকিয়া আনিল। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালী, গ্রীস এবং সোভিয়েত রাশিয়া—অর্থাৎ প্রায় সর্বত্র শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। অবশ্য অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই এরা ছিল আত্মগোপনকারী বা ভুগর্ভের (আণ্ডারগ্রাউণ্ড) সাহসী যোদ্ধা এবং হানাদার। গভীর জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদীতীর, দূরবর্তী বা দূরধিগম্য গ্রাম ও স্থান এবং গোপন কোন আড্ডা বা আস্তানা ছিল এদের প্রধান আশ্রয়। অবশ্য ছোট-বড় শহর অঞ্চলেও এদের গোপন কার্যকলাপের কেন্দ্র কম ছিল না এবং জনগণের কাছ থেকে এরা যেমন খাদ্য ও আশ্রয় পাইত, তেমনি মিত্রবাহিনীর সদর কেন্দ্রগুলি থেকে গোলাগুলি, অস্ত্র, সমরসম্ভার ও ঔষধপত্র ইত্যাদিও পাইত। আর পাইত গোপন রেডিওবার্তা। কিন্তু সময় সময় শত্রুপক্ষের গুপ্তচর এবং স্বদেশের বিশ্বাস-ঘাতকেরাও মিত্রের ছদ্মবেশে এদেরকে ধরাইয়া দিত। সুতরাং পার্টিজান বা গেরিলা যোদ্ধাদের জীবন সর্বদাই বিপদসঙ্কুল ছিল। তথাপি ইউরোপব্যাপী প্রতিরোধের তরঙ্গ উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও এদের মধ্যে রাজনৈতিক মত-বিরোধ ছিল, তথাপি নাৎসী বা ফ্যাসিস্ট কবল থেকে দেশোদ্ধারের জন্য এদের লক্ষ্য এক ছিল।[১]

মার্কিন ঐতিহাসিক লুই স্নাইডার ইউরোপে পার্টিজানদের রণক্রিয়া ও কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি সুন্দর রেখাচিত্র দিয়াছেন :

'The pattern was European-wide. Armed bands sniped at Germans from the hills and at night sneaked down to derail trains, blow up bridges, clear roadblocks, and explode ammunition dumps. Guerrillas fell on isolated sentinels and cut their throats; they knifed or garroted German officers in the dark and dumped their bodies into canals and rivers. In the factories, humming with war production, members of the underground gave go-slow signals, threw sand or powdered glass into the gears of their machines, manufactured dud shells, or surreptitiously dropped poison into food being canned for the German army. All this was done at the risk of torture or death, but despite vicious reprisals it never ceased.'

অর্থাৎ পার্টিজানদের কার্যকলাপের ইউরোপব্যাপী একটা প্যাটার্ন বা নক্সা ছিল। পাহাড় থেকে সশস্ত্র দল জার্মানদের প্রতি চোরাগোপ্তা গুলি চালাইত এবং রাত্রিবেলা নামিয়া আসিত ট্রেন লাইনচ্যুত করার জন্য, সেতুগুলি উড়াইয়া দেওয়ার জন্য, রাস্তার প্রতিবন্ধক পরিষ্কার করার জন্য এবং গোলাবারুদের স্তূপে বিস্ফোরণ ঘটাইবার জন্য। গেরিলারা বিচ্ছিন্ন প্রহরীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত এবং তাঁদের গলা কাটিয়া ফেলিত। রাত্রির অন্ধকারে জার্মান অফিসারদেরকে ছুরিকাঘাতে কিংবা গলায় ফাঁস পরাইয়া হত্যা করিত এবং নদীতে বা খালে তাদের মৃতদেহগুলি গাদা করিয়া ফেলিয়া দিত। যে সমস্ত কারখানায় যুদ্ধাস্ত্র উৎপন্ন হইত, সেখানে ভুগর্ভের আড়াল থেকে আত্মগোপনকারীরা উৎপাদন 'মৃদু করা'র জন্য সংকেত দিত এবং মেসিনের গীয়ারের মধ্যে বালি কিংবা কাঁচের চূর্ণ নিক্ষেপ করিত, নকল বা বাজে শেল (কামানের গোলা)

১। Second Great War-Vol. VII, Chapter 273 এবং Europe Rises—by Dorothy Woodman, Published by Victor Gollancz Ltd. 1944, পুস্তক বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য।

তৈয়ার করিত এবং জার্মান সৈন্যবাহিনীর যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য কৌটায় ভর্তি করা হইত, সেগুলির মধ্যে অত্যন্ত গোপনে বিষ মিশাইয়া দিত। এই সমস্ত কার্যই ভয়ঙ্কর নির্যাতন বা মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়া করিতে হইত কিন্তু ভয়াবহ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার আশংকা থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত কার্যে তারা (পার্টিজানরা) কখনও ক্ষান্ত দিত না।[১]

পার্টিজান ও গেরিলাদের বিরুদ্ধে জার্মানরা যে বীভৎস প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছে, তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। সম্প্রতি লণ্ডনে প্রকাশিত একটি পুস্তকে এই সম্পর্কে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা-চক্রের যে বিবরণী দেওয়া হইয়াছে, তা'তে বিশেষভাবে ইহুদী, পোল ও রুশদের বিরুদ্ধে পৈশাচিক প্রতিশোধের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

'Provoked partly by a terrible hatred of Jews, Slaves and Bolsheviks, partly by the desire for Lebensraum the German leadership set about reducing Poland and the lands conquered in Russia to a degree of subjugation unparalleled anywhere else, accompanied by an equally unparalleled regime of terror and extermination···there is little to compare with the unbelievable savagery of the treatment meted out in Poland and Russia. It was not accidental that Poland was the scene of the final solution, of the most notorious of the extermination camps ; that in response to the killing of one German by local resisters the number of local inhabitants shot in reprisal was, in Norway ten, in Yugoslavia 100, and in Poland 1000.'[২]

'সোজা কথায় ইহুদী, শ্লাভ ও বলসেভিকদের প্রতি ঘৃণায় ও বসতভূমি বিস্তারের আকাঙ্খায় ক্ষিপ্ত হইয়া জার্মান নেতারা পোল্যাণ্ডকে এবং রাশিয়াতে অধিকৃত ভূমিগুলিকে এমন এক তুলনাবিহীন বশ্যতার নিম্নতম স্তরে নামাইয়া আনিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে তুলনাহীন সন্ত্রাস ও সংহার নীতিও অনুসরণ করিয়াছিল যে, অন্যত্র তার নজীর পাওয়া যায় না।···পোল্যাণ্ডে এবং রাশিয়াতে যে অবিশ্বাস্য বর্বরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তার সঙ্গে অন্য কোন স্থানেরও তুলনা দেওয়া যায় না (জাতি বিদ্বেষের) চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য পোল্যাণ্ডকে যে বাছিয়া নেওয়া হইয়াছিল এবং সর্বাপেক্ষা জঘন্যতম সংহার-শিবির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেটা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। সুতরাং অন্যত্র যেমন নরওয়েতে স্থানীয় প্রতিরোধকারীরা যদি একজন জার্মানকে হত্যা করিত, তবে, সেখানে স্থানীয় লোকদের ১০ জনকে হত্যা করা হইত, তেমনি যুগোশ্লোভিয়ায় ১০০ জনকে এবং পোল্যাণ্ডে প্রতি জার্মান পিছু ১০০০ পোলকে হত্যা করা হইত।'

* * *

পশ্চিম ইউরোপের পার্টিজান যোদ্ধারা লণ্ডনের বি. বি. সি. থেকে নিয়মিত সংবাদ পাইত এবং আত্মগোপনকারীরাও পালটা লণ্ডনে শত্রুপক্ষের কার্যকলাপের বহু সংবাদ

পাঠাইত। এমন কি, যুদ্ধবন্দী-নিবাসগুলি থেকে পলায়নের জন্য তাঁরা গোপন সুড়ঙ্গ পথও খনন করিত এবং সেই গোপন পথ দিয়া মিত্রপক্ষের অনেক সৈন্য ও বৈমানিক পলাইয়া গিয়াছিল। ভুগর্ভের আত্মগোপনকারী যোদ্ধারা নিয়মিত সংবাদপত্রও প্রকাশ করিত এবং জনসাধারণকে মুক্তির প্রেরণা যোগাইত। শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে হানাদারিতে এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ চালনায় এই সমস্ত পার্টিজানদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত ইংলন্ডে এবং তারপর বিমান থেকে প্যারাসুটযোগে এদেরকে নামাইয়া দেওয়া হইত নাৎসী-অধিকৃত দেশ বা অঞ্চলগুলিতে। নরওয়েতে, হল্যান্ডে এবং ফ্রান্সে (Maquis নামে যারা প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল) এদের কার্যকলাপের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছিল। কিন্তু যুগোশ্লোভিয়া ও গ্রীসে এই সমস্ত গেরিলা বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্যও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। (ষষ্ঠ পর্বের একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তথাপি এই সমস্ত বিরোধ ও বিপত্তি সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশে গেরিলাদের কার্যকলাপ প্রায় একটা যুদ্ধের রূপ নিয়াছিল। অনেক সময় এদের হাতে আক্রমণকারীর 'নিঃশব্দ মৃত্যু' বা 'Silent death' ঘটিত। সুতরাং গেরিলা-প্রধান অঞ্চলগুলিতে জার্মান সৈন্যদের ভয়ে ভয়ে দিন বা রাত কাটাইতে হইত এবং কয়েক ডিভিসন সৈন্য পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করিতে হইত।

সোভিয়েত যুদ্ধে পার্টিজানদের ভূমিকা

পূর্ব রণাঙ্গনে বা রুশ-জার্মান যুদ্ধে পার্টিজান বা গেরিলাযোদ্ধাদের ভূমিকা ছিল ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর ৩রা জুলাই, ১৯৪১, স্ট্যালিনের সেই বিখ্যাত রেডিও বক্তৃতায় শত্রুর পশ্চাদ্দেশে বিরাট গেরিলাযুদ্ধ সংগঠনের জন্য যে জোরালো আহ্বান জানানো হইয়াছিল, তার ফলে সরকারী প্রচারকার্যে এবং সামরিক পরিকল্পনায় গেরিলাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোর যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন জার্মান লাইনের পিছনে পার্টিজান·যোদ্ধারা সক্রিয় হইয়া উঠিল এবং বহু তরুণীও এই দুঃসাহসিক কার্যে যোগ দিয়াছিল। জয়া কসমোডেমিয়ানাস্কায়া নাম্নী স্কুলের একটি কৃতি ছাত্রী ছিল তাদের অন্যতমা। কিন্তু শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানিতে গিয়া জয়া নাৎসীদের হাতে ধরা পড়িল এবং তার উপর বর্বর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল এবং তাকে নির্দয়ভাবে ফাঁসি দেওয়া হইল। এই ঘটনা সেই সময় প্রায় একটা কিংবদন্তীতে পরিণত হইল এবং তাকে কেন্দ্র করে এমন প্রচারকার্য করা হইল যে, জয়া একজন 'জাতীয় নায়িকা'-রূপে প্রতিভাত হইল। ১৯৪১-৪২ সালের সেই শীতকালীন মস্কো যুদ্ধে ১০ হাজার পার্টিজান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাদের হাতে ১৮ হাজার জার্মান প্রাণ হারাইয়াছিল। তথাপি একথা সত্য যে, যুদ্ধের একেবারে গোড়ার দিকে পার্টিজান যুদ্ধ সংগঠিত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কেননা, উপযুক্ত খাদ্য, অস্ত্র ও মেডিক্যাল সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৪২ সালে অবশ্য গেরিলাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইল উক্রাইন, লেনিনগ্রাদ ইত্যাদি অঞ্চলে এবং ১৯৪৩ সালে এটা যেন একটা ব্যাপক গণ-আন্দোলনে পরিণত হইল। কারণ, ইতিমধ্যে আর্মি ও উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং একটি কেন্দ্রীয় কমিটির

মারফত বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট পার্টি গেরিলাদের সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব নিল। বিশেষতঃ স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মানীর বিপর্যয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াসহ সারা ইউরোপে প্রতিরোধ-যুদ্ধের নূতন প্রেরণা আসিয়াছিল। কিন্তু পশ্চিমী সামরিক লেখকদের অনেকে মনে করেন যে, সোভিয়েত রাশিয়াতে নাৎসীদের ভয়াবহ অত্যাচারের জন্যই পার্টিজান যোদ্ধারা এত মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি, প্রচারবিশারদ গোয়েবলসও মনে করিতেন যে, 'যদি রাশিয়াতে অন্ততঃ কিছু কিছু লোকের আস্থা আমরা অর্জন করিতে এবং তাদেরকে দিয়া অন্ততঃ স্থানীয়ভাবে একটা ভুয়া গবর্নমেণ্ট ও গঠন করিতে পারিতাম, তবে, পার্টিজানদের পক্ষ থেকে এত বিপদের কারণ ঘটিত না।'[১]

কিন্তু রুশ লেখকেরা (যেমন জি ডেবোরিন) এর জবাবে বলিয়াছেন যে, নাৎসী অত্যাচারের জন্য সোভিয়েত পার্টিজানদের যুদ্ধ ও বাধাদানের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এর আসল কারণ ছিল দুইটি—প্রথমতঃ নাৎসী কবল থেকে মাতৃভুমির উদ্ধার এবং দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক আশীর্বাদগুলিকে রক্ষা করা। যদি এটা সত্য না হইত, তবে, বেলোরুশিয়াতে এবং এস্তোনিয়ায় ও উক্রাইনে জার্মানদের উদোগে যে সমস্ত ভুয়া স্বায়ত্ত শাসনশীল কমিটি গঠিত হইয়াছিল, মুষ্টিমেয় দেশদ্রোহী ছাড়া বাকী সকলে সেগুলিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিল কেন এবং কেনই বা দলে দলে গ্রামের লোকেরা পর্যন্ত নাৎসীদের বিরুদ্ধে পার্টিজান যুদ্ধে যোগ দিল? উক্রাইনে কিছু কিছু 'জাতীয়তাবাদী বা ন্যাশনালিস্ট'রা জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সংখ্যায় তারা কয়জন এবং শেষপর্যন্ত জার্মানরা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল কেন?...

অধিকৃত অঞ্চলে জার্মানদের বিরুদ্ধে পার্টিজানদের আক্রমণ, হানাদারি ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্য ইত্যাদির জন্য নাৎসী বাহিনীর সৈন্য ও অফিসারেরা এবং গেস্টাপো যে সমস্ত ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল তা অবর্ণনীয়। এই প্রতি-শোধের একটা প্রধান পদ্ধতি ছিল। জামিনদার বা 'হোস্টেজ' রূপে ধৃত ব্যক্তিদের বধ করা। এজন্য সংবাদপত্রে পূর্বাহ্ণেই নোটিশ দিয়া কিংবা পোস্টারযোগে ঘোষণা করা হইত—প্রতি একজন জার্মানের প্রাণনাশের জন্য ১০০ জন জামিনদারকে বধ করা হইবে। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড ও রাশিয়া সর্বত্র এই ধরনের নোটিশ প্রচারিত হইয়াছিল। বিশেষভাবে জামিনদারের পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গুলি করিয়া মারা হইত টেরর বা সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য। এই সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর প্রধান অধিকর্তা জেনারেল কাইটেলের স্বাক্ষরিত অনেক 'গোপন নির্দেশ' ন্যুরেমবার্গের আদালতে পেশ করা হইয়াছিল। ফ্রান্সে এই ধরনের ২৯,৬৬০ জন, পোল্যাণ্ডে ৮ হাজার এবং হল্যাণ্ডে ২ হাজার জামিনদারকে হত্যা করা হইয়াছিল। ডেনমার্কেও এই পাশবিকতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ক্যাজ মুঙ্ক (Kaj Munk) নামে সমগ্র স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া অঞ্চলে খ্যাতিমান কবি ও নাট্যকারকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল।[২]

আর সোভিয়েত রাশিয়াতে?—সেখানে তো নাৎসী জল্লাদদের অত্যাচারের কোন

সীমা সংখ্যাও ছিল না। পার্টিজানদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য গ্রামকে-গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া হইত, কর্মক্ষম লোকদিকে দাস-শ্রমিক রূপে জার্মানীতে চালান দেওয়া হইত এবং বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে নির্বিচারে খুন করা হইত। অবশ্য সমস্ত পুরুষদেরকেই দাস-শ্রমিকরূপে গ্রহণ করা হইত না, অধিকাংশকেই মারিয়া ফেলা হইত। যেমন একমাত্র কালুগা প্রদেশেই ২০ হাজার অসামরিক ব্যক্তিকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছিল। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ব্রিয়ানস্কের নিকটবর্তী এলাকায় ২ হাজার অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হইল, ৫০০ ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হইল আর ৫ হাজার অসামরিক লোককে দাস-শ্রমিকরূপে চালান দেওয়া হইল। বেলোরুশিয়াতে পার্টিজানদের কার্যকলাপ খুব জোরদার ছিল। সুতরাং সেখানে অত্যাচারেরও মাত্রা চড়িয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন কোন জায়গায় জার্মাননের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর গেরিলারা ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইত যে, জার্মানরা সমস্ত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে। রাস্তাঘাট সর্বত্র কেবল মৃতদেহে ভর্তি—সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে হত্যা করা হইয়াছে। একমাত্র তারাই রক্ষা পাইয়াছে, যারা পার্টিজানদের সঙ্গে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। ধৃত পার্টিজানদেরকে জার্মানরা অত্যন্ত বর্বরের মত খুন করিত। এমন কি, তাদের পরিবারবর্গকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হইত।...

রুশ ঐতিহাসিক তেলপুখোভস্কির লেখায় প্রকাশ যে, ১৯৪৩ সালের শেষ ভাগে উক্রাইনে ২ লক্ষ ২০ হাজার পার্টিজান জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল এবং জার্মানদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেক সময় সমগ্র গ্রাম, এমন কি, সমগ্র পরিবার গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিত। ১৯৪৩ সালের আগস্ট-নভেম্বরে বেলোরুশিয়াতে পার্টিজান যোদ্ধারা ২ লক্ষ রেলপথ উড়াইয়া দিয়াছিল, ১০১৪ ট্রেন ধ্বংস বা লাইনচ্যুত করিয়াছিল, ৮১৪টি রেল ইঞ্জিন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল এবং ৭২টি ব্রীজ নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। এমন কি, জার্মান সেনাপতি জেনারেল জড্ল পর্যন্ত রেলের ব্যাপক ধ্বংস ও ক্ষতি সাধনের কথা স্বীকার করিয়াছেন। তেলপুখোভস্কি আরও লিখিয়াছেন যে, ১৯৪১-৪৪ এই তিন বছরে বেলোরুশিয়াতে পার্টিজানদের হাতে ৫ লক্ষ জার্মান নিহত হইয়াছে এবং তাদের মধ্যে ৪৭ জন জেনারেল। উইলহেল্ম কুবে (Wilhelm Kube) নামক হিটলারের একজন হাইকমিশনার বেলোরুশিয়ার একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে প্রেম করিয়াছিলেন। সুন্দরী সেই প্রেমের সুযোগ নিয়া হাই কমিশনারের শয্যার নীচে একটি টাইম বোমা পাতিয়া রাখিয়াছিল। ফলে বিস্ফোরণের ধাক্কায় বেচারার প্রাণপাখী উড়িয়া গেল!

*

যুদ্ধবিদ্যার যাঁরা সংবাদ রাখেন, তাঁরা জানেন যে, কোন সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ সুনিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং সঙ্ঘবদ্ধ না থাকিলে সেই বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। কেননা, নিয়মিত খাদ্য ও সমরসম্ভার ইত্যাদি সরবরাহ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা অক্ষুন্ন না থাকিলে সৈন্যবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করা স্বভাবতই অত্যন্ত কঠিন। সোভিয়েত দেশে এই কঠিন সমস্যাতেই পড়িয়াছিল জার্মানবাহিনী। কেননা, তারা খাস জার্মানী থেকে শত শত মাইল দূরে রাশিয়ার অভ্যন্তরে চলিয়া আসিয়াছিল। সুতরাং এই সুদীর্ঘ পথে যোগাযোগ রক্ষা করা যেমন একটা কঠিন সমস্যা ছিল, তেমনি

অধিকৃত অঞ্চলগুলি থেকে কোন প্রকার সহায়তা পাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। অধিকন্তু সর্বদাই পার্টিজান বা গেরিলা যোদ্ধাদের অকস্মাৎ আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে রেলপথ ও রেলওয়ে সরঞ্জাম ধ্বংস করা ছিল পার্টিজানদের একটা বড় কাজ এবং সেকথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ধ্বংস কার্যটা 'রেল ওয়ার' বা রেলযুদ্ধ নামে পরিচিত ছিল। সোভিয়েত রেলপথের কর্মচারীরা এই বিদ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।

অবশ্য পার্টিজান বা গেরিলা যুদ্ধ বিদ্যায় রাশিয়ার একটা ঐতিহ্য ছিল। ১৮১২ সালে নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় রুশ গেরিলারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। তারপর ১৯১৮-১৯২২ সালে হোয়াইট গার্ডদের এবং বিদেশী হস্তক্ষেপ-কারীদের যুদ্ধেও পার্টিজানরা উক্রাইনে, সাইবেরিয়ায় এমন কি দূর-প্রাচ্যে পর্যন্ত বহু কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। কিন্তু অতীতের এই সমস্ত কীর্তি এবং কৃতিত্বই সোভিয়েত গেরিলারা অতিক্রম করিয়া গেল ১৯৪১-১৯৪৪ সালের হিটলারের বিরুদ্ধে মহান স্বদেশাত্মক যুদ্ধে—যে যুদ্ধের সঙ্গে অতীতে কোন-কিছুই তুলনা ছিল না।

তথাপি রুশ পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন যে, গোড়ার দিকে যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসে পার্টিজানরা অনেক ভুল-ত্রুটিও করিয়াছে। কারণ, এই ধরনের যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না এবং গেরিলা যুদ্ধের কায়দা-কানুনও তাদের জানা ছিল না। সুতরাং কোন কোন ইউনিট যেমন অতিরিক্ত সতর্ক ছিল এবং রণক্রিয়ায় অত্যন্ত মন্দগতি ছিল, তেমনি কোন কোন ইউনিট আবার শত্রুপক্ষের শক্তির কোন বিচার-বিবেচনা না করিয়াই অতিরিক্ত দ্রুততার সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িত। কিন্তু ক্রমে পার্টিজান দলপতিগণ শিক্ষালাভ করিলেন যে, 'উপযুক্ত সময়ে শত্রুর বিরুদ্ধে কৌশলপূর্ণ আক্রমণই সাফল্যের চাবিকাঠি স্বরূপ।'[১]

দখলদার জার্মান সৈন্যেরা সোভিয়েত রাশিয়ায় যত বেশী অত্যাচার, ধ্বংস ও নৃশংসতার মাত্রা বাড়াইতে লাগিল, পার্টিজান সৈন্যেরাও ততই পালটা শোধ নেওয়ার জন্য জার্মানদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করিতে লাগিল। এমন কি, জেনারেল গুডে-রিয়ানের মত দায়িত্বশীল জার্মান সেনাপতি পর্যন্ত এই বলিয়া আপশোশ করিয়াছেন যে, গেরিলা যুদ্ধ যেন প্লেগের মত মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল, যার ফলে, রণাঙ্গনের সৈন্যবাহিনীর নৈতিক শক্তির উপর পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া ঘটাইল। ভার্নার পিক্ট (Werner Picht) নামে একজন জার্মান সামরিক তত্ত্ববিদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

'The greater the space that the soldiers seized, the more of a hell that space became for them.'

অর্থাৎ সৈন্যেরা যতবেশী পরিমাণ জমি দখল করিতে লাগিল, ততবেশী পরিমাণ সেই জমি নরককুণ্ড হইয়া দাঁড়াইল।[২]

এই মন্তব্য থেকেই বুঝা যাইবে যে, পার্টিজান যুদ্ধের জন্য জার্মান সৈন্যদের অবস্থা কিরূপ দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং জার্মানরা প্রতিহিংসাও চরিতার্থ করিয়াছিল সাংঘাতিকভাবে। এমন কি, হিটলারেরই নির্দেশ ছিল পার্টিজানদের বিরুদ্ধে চরম পর্যায়ের নির্মমতা অনুষ্ঠানের জন্য। সুতরাং পার্টিজন-অধ্যুষিত-অঞ্চল-

১। জি. ডেবোরিন, পৃষ্ঠা ২০৪।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২০৬।

গুলিতে শত শত গ্রাম ও হাজার হাজার অসামরিক নর-নারী ও শিশুকে হত্যা করা হইত। হিটলারী প্রস্তাবেরই অনুসরণ করিয়া ঘাতক বাহিনীর প্রধান হিমলার হুকুম দিয়াছিলেন শ্লাভজাতির সংখ্যা তিন কোটি হ্রাস করিবার জন্য—ন্যুরেমবার্গের আদালতের নথিপত্রে এটা প্রমাণিত হইয়াছে। রুশ অভিযানের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল শ্লাভজাতিকে সংহার করা!

কিন্তু এই সমস্ত অমানুষিক কাণ্ড সত্ত্বেও সোভিয়েত গেরিলারা বহু স্থানে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াও বহু বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে। উত্তরে লেনিনগ্রাদ থেকে দক্ষিণে ক্রিমিয়া পর্যন্ত তাদের কার্যকলাপ বিস্তৃত ছিল। নিজেদের স্বদেশে ছাড়া তারা বিদেশে—ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইতালী, পোল্যান্ড এবং চেকোশ্লভাকিয়াতে পর্যন্ত স্থানীয় পার্টিজান যোদ্ধাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়ার পার্টিজানদের এই যুদ্ধ যেন জনযুদ্ধের রূপ ধারণ করিয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালে যখন পার্টিজান 'আন্দোলন' তুঙ্গে উঠিয়াছিল, তখন সোভিয়েত রাশিয়ায় ন্যূনপক্ষে ৫ লক্ষ সশস্ত্র পার্টিজান যোদ্ধা ছিল। কিন্তু এই পার্টিজানদের এবং তাদের সমর্থকদের মধ্যে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল, তা' সুনির্দিষ্টরূপে বলা কঠিন। আলেকজান্দার ওয়ার্থের মতে একমাত্র বেলোরুশিয়াতেই ১০ লক্ষ লোকের প্রাণ গিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস।

কিন্তু মস্কো থেকে প্রকাশিত কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায় যে, শত্রুর বিরুদ্ধে পার্টিজানদের অস্ত্রধারণ জনযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল এবং শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদির মধ্য থেকে প্রায় ১০ লক্ষ লোক পার্টিজানবাহিনীতে যোগ দিয়াছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বহুজাতিক দেশ। সুতরাং পার্টিজানবাহিনীতেও সোভিয়েত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বহুজাতি ও অধিজাতির লোক যোগ দিয়াছিল। এমন কি, স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল এবং তাদের সংখ্যা কোন কোন দলে শতকরা ১০ থেকে ২৫ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। মেয়েরা বহু ত্যাগ স্বীকার এবং বহু বীরত্বের পরিচয়ও দিয়াছিল। ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে গেরিলাদের আক্রমণ ও হানাদারি থেকে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের জন্য জার্মানীকে ২৫ ডিভিসন প্রথম সারির সৈন্য নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। এছাড়া যোগাযোগ ও সরবরাহের লাইন রক্ষা করার জন্য আরও কয়েক লক্ষ জার্মান সৈন্যের দরকার হইয়াছিল। লালফৌজের অভিযান-গুলির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পার্টিজানদের আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইত। ফলে, নিয়মিত বাহিনীর পক্ষে সাফল্যলাভে যথেষ্ট সহায়তা করা হইয়াছিল।

পার্টিজান যোদ্ধাদের অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সোভিয়েত গবর্নমেন্ট মোট ৩,১১০০০ যোদ্ধাকে পদক দিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন এবং ১১০ জনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'হিরো' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন।[১]

এই মহান স্বদেশাত্মক যুদ্ধে সোভিয়েত পার্টিজানদের হাতে মোট ১৫ লক্ষ নাৎসী সৈন্য, দখলদার অফিসার এবং তাদের সহযোগীরা হতাহত কিংবা ধৃত হইয়াছিল। কিন্তু গেরিলাদের মধ্যেও হতাহত হইয়াছিল প্রচুর, তবু শত্রুর হাতে ধরা পড়ার পর চরম নির্যাতনের মুখেও তারা হীনতা বা বশ্যতা স্বীকার করে নাই এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও করে নাই।

শ্লোভাকিয়ায় অভ্যুত্থান

নাৎসী দখলীকৃত ইউরোপের প্রায় সর্বত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই প্রতিরোধের অন্যতম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইতেছে শ্লোভাকিয়া। কুখ্যাত মিউনিক চুক্তির দ্বারা চেকোশ্লভাকিয়াকে জবাই করার পর ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে শ্লোভাকিয়া জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হইল এবং ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে শ্লোভাকিয়াকে পুরাপুরি অক্ষশক্তিবর্গের কবলে আনা হইল। কিন্তু চেকোশ্লভাকিয়ার দেশপ্রেমিকরা ভিতরে ভিতরে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি ঘটাইতে ছিলেন। ফলে, ১৯৪৪ সালের শ্লোভাকিয়া সমগ্র চেকোশ্লভাকিয়ার প্রতিরোধকেন্দ্রে পরিণত হইল এবং আগস্ট মাসের শেষের দিকে এই প্রতিরোধ প্রস্তুতি এক ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধের রূপধারণ করিল। এমন কি, একটা জাতীয় অভুত্থান পর্যন্ত ঘটিল। সুতরাং জার্মানরা বিপদ গণিল এবং সৈন্য সমাবেশ ঘটাইতে লাগিল। একদিকে পার্টিজানরাও জার্মানদের বিরুদ্ধে রণক্রিয়া শুরু করিয়া দিল। শ্লোভাকিয়ার পূর্বাংশে এবং মধবর্তী অংশের ১৮টি জেলার জনগণ এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িল। এই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল, পিছন থেকে নাৎসী সৈন্যদেরকে আক্রমণ করিয়া একদিকে স্বদেশ মুক্তিতে এবং অন্যদিকে অগ্রসরমান লালফৌজকে কার্পেথিয়ান পর্বতের দুর্গম স্থানগুলি অতিক্রম করিতে সহায়তা করা। পার্টিজান ইউনিটগুলির মধ্যে চাষী ও শ্রমিকদের ভুমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল যদিও জার্মানরা প্রতিরোধ-বাহিনীর বিরুদ্ধে ৮ ডিভিসন বাছাই-করা সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল, তথাপি প্রতিরোধকারী সৈন্যেরা দীর্ঘ দুই মাস ধরিয়া জার্মানদের আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল এবং প্রচুর শত্রুসৈন্যকে হতাহত করিয়াছিল। সোভিয়েত পার্টিজানবাহিনীও শ্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্লোভাক গেরিলাদের সঙ্গে কাঁধে-কাঁধ-মিলাইয়া প্রতিরোধ লড়াই চালাইল। সোভিয়েত বিমানবহর অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ এবং মেডিক্যাল সরবরাহ যোগান দিতে লাগিল বান্স্কা-বাইস্ট্রিকা শহরের নিকট। প্রত্যাবর্তন পথে এই সমস্ত সোভিয়েত বিমান আহত ও পীড়িত সৈন্য এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে উদ্ধার করিয়া আনিত। যে সমস্ত চেক্ ও শ্লোভাক সৈন্য রাশিয়াতে সামরিক প্রশিক্ষণ পাইয়াছিল, তারাও এই যুদ্ধে যোগদান করিল।

শ্লোভাক অভ্যুত্থানকে সমর্থন করার জন্য সোভিয়েত সরকার 'পূর্ব কার্পেথিয়ান অপারেশন' গঠন করিলেন। প্রাকৃতিক কারণেই এই পার্বত্য অঞ্চল অত্যন্ত দুর্গম ছিল এবং জার্মানরা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও অত্যন্ত কঠোর করিয়াছিল। কিন্তু সেই কঠিন ও দুরূহ অবস্থার মধ্যে ৮ই সেপ্টেম্বর ডুকলা গিরিবর্ত্মের (the Dukla Pass) রণক্রিয়া বা অপারেশন শুরু হইল এবং ৬ই অক্টোবর চেকোশ্লভাক ও সোভিয়েত সৈন্যেরা সীমান্তে পৌঁছিল এবং ডুকলা পাশ অধিকার করিল। বলা বাহুল্য যে, এর দ্বারা শ্লোভাক অভ্যুত্থানে যথেষ্ট সাহায্য করা হইল। কিন্তু আনুপাতিক হিসাবে শত্রুপক্ষের শক্তি অনেক বেশী হওয়ায় অভ্যুত্থানের নেতারা মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চল থেকে সরিয়া আসিলেন এবং গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করিলেন—শ্লোভাকিয়ার চূড়ান্ত মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, এই মুক্তিসংগ্রামে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন চেক ও শ্লোভাক কমিউনিস্টরা। কিন্তু কার্যতঃ শ্লোভাকদের এই অভ্যুত্থান যেন একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়া গেল।

কারণ, প্রায় ৩০টি জাতি ও খণ্ডজাতি এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল, যাদের মধ্যে ছিল ৩ হাজার সোভিয়েত পার্টিজান, ২ হাজার চেক্, ৮০০ হাঙ্গেরীয়ান, ৪০০ ফরাসী, ফ্যাসিস্ট বিরোধী ৮০ জন জার্মান, ৭০ থেকে ১০০ জন পোল, শতাধিক যুগোশ্লাভ, ৫০ জন মার্কিন ও বৃটিশ এবং সেই সঙ্গে কিছু গ্রীক, ইতালীয়, বুলগেরিয়ান, বেলজিয়ান, ডাচ এবং অস্ট্রিয়ান প্রভৃতি। সুতরাং এটা যেন ছিল ইউরোপব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের মত। শ্লোভাকিয়ার এই অভ্যুত্থানে পার্টিজানদের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া জার্মানীর প্রায় ৫৬ হাজার সৈন্য মারা পড়িল এবং নাৎসীদের রণনৈতিক নক্সা গুরুতরভাবে ব্যাহত হইল।[১]

লেখনী যেন সঙ্গীন

হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার এই স্বদেশাত্মক যুদ্ধ নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ছাড়া যেমন অধিকৃত অঞ্চলে কিংবা জার্মান লাইনের পিছনে জনগণের মধ্য থেকে পার্টিজান যুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছিল এবং এই অদ্ভুত যুদ্ধ সত্য সত্যই জনযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল, তেমনি লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং কবি ও বুদ্ধিজীবীরাও এই মুক্তিযুদ্ধের গৌরবজনক অংশীদার হইয়াছিলেন। যেহেতু এই যুদ্ধটা ছিল, 'টোট্যাল ওয়ার' বা 'সর্বাত্মক যুদ্ধ' সেহেতু এই যুদ্ধ সমাজের সর্বস্তরকে স্পর্শ করিয়াছিল। তবে, কোথাও কম, কোথাও বা বেশী। সুতরাং সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এই মহাযুদ্ধে কোন কোন দেশেরই নির্বিকার বা নিরপেক্ষ থাকার উপায় ছিল না। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার এই যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হওয়ায় সেখানকার শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদেরও রণাঙ্গনে সমাবেশ ঘটিয়াছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সেই কাহিনীর কোন বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু একটা সামান্য রেখাচিত্র মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রসিদ্ধ সোভিয়েত কবি ভ্লাডিমির মায়াকোভস্কি যুদ্ধের সময় শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবিদের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন ঃ

> I want
> that the pen
> be equated to thc bayonct.

"আমি চাই যে, লেখনী সঙ্গিনের পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠুক।"

সোভিয়েত রাশিয়ায় সত্য সত্যই লেখক ও কবিদের কলম, শিল্পীদের তুলি, ভাস্করদের বাটালি এবং ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা পর্যন্ত রণক্ষেত্রের বেয়নেট ও রাই-ফেলের পর্যায়ভুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ লেখক ও সৈনিকে কোন তফাৎ ছিল না, বরং কবি ও সাহিত্যিকদের অগ্নিবর্ষী রচনায় থেকে গৃহাঙ্গন পর্যন্ত সর্বত্র বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল। শত্রুর প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা চরমে লঠিয়াছিল।...

এক হাজারের অধিক সোভিয়েত লেখক সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—এম. বাঝান, এ. বেঝিমেনস্কি, পি. ব্রোভকা, ভি. ভিষেণভস্কি, এ. গাইডার, ভি. গ্রসম্যান, ইয়ে দোলমাতোভস্কি, এ. কোরানিচুক, ভি. কোঝেনিকোভ, কে. ক্রাপিভা, ইউ. ক্রাইমোভ, এম. লাইনোকোভ. এস. মিখালকোভ, পি. পাভলেংকা,

১। জি. ডেবোরিন পৃষ্ঠা ১৭৫-৭৬।

ইয়ে পেট্রোভ, এ. প্রকোফাইয়েভ, ভি. সেয়ানোভ, এম. স্বেৎলোভ, কে. সিমোনোভ, এল. শ্লাভিন, ভি. স্তাভস্কি, এ. সুরকোভ, এম. ট্যাঙ্ক, এ. ত্বারদোভস্কি, এন. টিখানোভ এবং রম শোলোকোভ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট লেখক-লেখিকারা ছাড়া বহু সুরকার ও সঙ্গীত রচয়িতারাও যোগ দিয়াছিলেন। অভিনেতা, চিত্রশিল্পী এবং আলোকচিত্র শিল্পীরাও পিছনে পড়িয়াছিলেন না। সকলেই রণক্ষেত্রে আগাইয়া গিয়াছিলেন। স্বদেশমুক্তির এই মহানযুদ্ধে অন্ততঃ ২৭৫ জন লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে অপূর্ব সাহস, আশ্চর্য ধৈর্য এবং যুদ্ধরত বন্ধুদের প্রতি গভীর আনুগত্য দেখাইয়াছিলেন। সোভিয়েত দেশের জনগণের চিত্তে তাঁদের স্মৃতি সর্বদাই দীপশিখার মত উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

যে সমস্ত সাহিত্যিক ও শিল্পী রণক্ষেত্রে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁরা ছাড়াও প্রাভদা, ইজভেস্তিয়া ও অন্যান্য সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে অনেক বিশিষ্ট ও বিখ্যাত লেখক জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। যেমন—ভি. লেবেদেভ-কুমাচের 'Holy War' বা 'পবিত্র যুদ্ধ' নামে কবিতা মহাযুদ্ধের প্রায় জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছিল। ইলিয়া এরেনবুর্গ, আলেক্সিতলস্তয়, মিখায়েল শোলোকোভ্, আলেকজেন্দার ফেদায়েভ প্রমুখ খ্যাতিমান ও প্রতিভাশালী সাহিত্যিকগণ সমগ্র জনগণের মধ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় নিদারুণ উম্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

'কামান যখন মুখর হয়, সঙ্গীত তখন স্তব্ধ হয়'[১]—এই প্রবাদ বাক্য কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। কারণ, কামান গর্জনকে অতিক্রম করিয়া কবিতা ও সঙ্গীত জাতীয় জীবনকে অনেক বেশী মুখরিত করিয়াছিল। শত সহস্র সঙ্গীত ও কবিতার চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছিল। কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প ও ফীচার-প্রবন্ধের চাহিদা এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, যুদ্ধের বছরগুলিতে মোট ১৬ কোটি ৯৫ লক্ষ গল্পের বই ছাপা হইয়াছিল।[২]

রণক্ষেত্রে যাঁরা আত্মদান করিয়াছেন, যে সমস্ত পার্টিজান যোদ্ধা শহীদ হইয়াছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে অনেক কবিতা, গান ও কাহিনী রচিত হইয়াছে। অনেক লেখক আবার শত্রুর হাতে ধরা পড়িয়া বীরের মত মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন। যেমন, বিখ্যাত কবি মুসা জলিল (Mussa Jalil) গেস্টাপোদের হাতে বন্দী হইয়া এবং কারাগারে অসহ্য অত্যাচার ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও ঘাতকের হাতে নিহত হওয়ার আগে স্বদেশের মুক্তির জন্য লিখিয়া গেলেন :

> **I sang, sensing the freshness of spring,**
> **I sang, going to battle for my country.**
> **Now, I write my last song**
> **With the axe raised over my head.**
> **Song taught me to cherish freedom,**
> **Song orders me to die fighting.**
> **May my life be a song for my people,**
> **May my death be a song of struggle.**

১। 'When the guns speak, the Muses are silent'.
২। জি. ভেবোরিন, পৃষ্ঠা ১৩৬, ১৩৭-১৩৯।

[মূল রুশ কবিতার একাংশ ইংরাজীতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনূদিত ।] [১]

একটা জাতির জীবনে যখন মুক্তির জোয়ার আসে, তখন তার সাহিত্যেও নতুন প্লাবন দেখা দেয়। আমাদের দেশেও বৃটিশ-শাসন-শক্তির-বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় স্বদেশী বা বিপ্লবী যুগের বাংলায় এবং ভারতব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অজস্র কবিতা, গান, উপন্যাস, গল্প ও নাটক ইত্যাদি রচিত হইয়াছিল—দেখা দিয়াছিলেন মুক্তিকামী বুদ্ধিজীবীরা। সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার জীবন-মৃত্যুর নিদারুণ সংগ্রামে যে শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কবি, নাট্যকার এবং চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে নব যৌবন-জলতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে, সেটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট দস্যুতার বিরুদ্ধে নিয়মিত সৈন্য-বাহিনী এবং গেরিলাবাহিনীর মত লেখক বাহিনী'ও যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল এবং আমাদের ভারতেও সেই সময় ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘ গঠিত হইয়াছিল। হিটলার পদদলিত ইউরোপের বহু দেশেই বুদ্ধিজীবীরা প্রতিরোধ যুদ্ধের সামিল হইয়াছিলেন এবং জনগণের মধ্যে প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৯৯।

অষ্টম পর্ব
তৃতীয় অধ্যায়
বন্দিশালার বর্বরতা
অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে নাৎসী জার্মানী কর্তৃক বন্দীশালার বর্বরতা এমন-একটা-অধ্যায় জুড়িয়া আছে, যার সঙ্গে প্রাচীন কালের, এমন কি আদিম যুগের নৃশংসতারও তুলনা দেওয়া কঠিন। কিন্তু বিংশ শতকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন মহিমান্বিত যুগে এমন পাশবিক হিংস্রতা ও অবর্ণনীয় নৃশংসতা কিভাবে সম্ভব হইল? বাহ্যতঃ এর একটা 'যুক্তিসঙ্গত' ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে পোল্যাণ্ড বা ওয়ারশ থেকে। মহাযুদ্ধের প্রথম বলি পোল্যাণ্ড—১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পোল্যাণ্ড পাঁচ বছর ধরে নাৎসী বুটের তলায় নিষ্পেষিত ছিল এবং অবিশ্বাস্য অত্যাচারের সম্মুখীন হইয়াছিল। সামরিক ও অসামরিক এবং স্ত্রীলোক ও শিশুসহ সমস্ত প্রকার নাগরিকদের উপর যে সমস্ত বীভৎস অত্যাচার হইয়াছিল, সেগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য যুদ্ধের পরবর্তীকালে একটি কমিশন গঠিত হইয়াছিল। সেই কমিশনের রিপোর্ট ওয়ারশ থেকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরাজীতে অনূদিত সেই রিপোর্টে আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাতে বলা হইয়াছে যান্ত্রিকতার জন্য যুদ্ধটা এক্ষণে 'নৈর্ব্যক্তিক' রূপ ধারণ করিয়াছে এবং আগেকার 'ব্যক্তি-প্রধান' যুদ্ধের সঙ্গে আধুনিক যুদ্ধের কোন মিল নাই।

'Modern warfare has long ceased to bear any resemblance to any kind of single combat. It is highly mechanized and the human element is confined to the control of death-dealing machinery. There is a great deal of space separating the belligernts ; often they cannot even see each other. Thus the enmy is not only the soldier on the other side but every living being on the territory to be captured and against which the attack is directed. In these conditions war has become depersonalized. It is now a gigantic machinery of destruction set in motion by an invisible hand. Perhaps it is this depersonalization that has led to the disappearance of humanity in modern wars...'

অর্থাৎ 'আধুনিক যুদ্ধ অনেক কাল আগেই যে কোন প্রকার একক লড়াইয়ের সঙ্গে তার সমস্ত সাদৃশ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধটা এক্ষণে একান্তরূপে যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত এবং প্রাণহননকারী যন্ত্রগুলির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে মাত্র মানুষের সংস্পর্শ সীমাবদ্ধ। পরস্পর যুধ্যমান সৈন্যদের মধ্যে রহিয়াছে ভূমিগত প্রকাণ্ড আয়তনের

তফাত। প্রায়শই তারা পরস্পরের মুখ পর্যন্ত দেখিতে পায় না। সুতরাং অপর পক্ষে একমাত্র সৈন্যই শত্রুপর্যায়ভুক্ত নয়, বরং যে ভূমি দখল করিতে হইবে এবং যার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হইতেছে, তার প্রত্যেকটি জীবিত প্রাণীই শত্রু। এই অবস্থার মধ্যে আধুনিক যুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক রূপ ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে যুদ্ধটা দাঁড়াইয়াছে একটা প্রকাণ্ড ধ্বংসকারী যন্ত্রের মধ্যে—যে যন্ত্রের গতিবেগ অদৃশ্য হস্তের দ্বারা পরিচালিত। সম্ভবতঃ এই প্রকার নৈর্ব্যক্তিকতার জন্যই আধুনিক যুদ্ধ থেকে মানবিকতা সম্পূর্ণরূপে উবিয়া গিয়াছে।'

১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ডে জার্মান যান্ত্রিকবাহিনীর আক্রমণ থেকে যুদ্ধের এই 'নৈর্ব্যক্তিক' রূপের শুরু এবং তার পরিণতিও ঘটল চূড়ান্ত বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে। সামরিক-অসামরিক, স্ত্রীলোক-শিশু-বৃদ্ধ কোন মানুষই এই নির্মমতার গ্রাস থেকে রক্ষা পাইল না এবং বন্দীশিবিরগুলি হইয়া দাঁড়াইল বড় বড় নিধনযজ্ঞের কেন্দ্র মাত্র।···

কিন্তু জার্মানীতে বন্দীনিবাসের শুরু মহাযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই, অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে হিটলারের ক্ষমতালাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বন্দীনিবাস স্থাপনের প্রথম 'আইডিয়া' (চিন্তা) আসিয়াছিল গোয়েরিং-এর উর্বর মস্তিষ্কে। ১৯৩৩ সালে তিনি ছিলেন প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং রাজনৈতিক গোয়েন্দা পুলিশের বড়কর্তা। এই বন্দীনিবাসগুলি তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন নাৎসী রাজত্বের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। সুতরাং কাঁটাতারের বেড়ার আড়ালে আটকা পড়িলেন নাৎসী-বিরোধী কমিউনিস্ট এবং গণতন্ত্রবাদীরা অথবা সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা। প্রুশিয়ার এই দৃষ্টান্ত শীঘ্রই জার্মানীর অন্যান্য অংশেও অনুসৃত হইল। এই ব্যাপারে আবার ব্যাভেরিয়া পথ দেখাইল, যেখানে ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হইল পরবর্তীকালের অতি কুখ্যাত ডাচাউ (Dachau) ক্যাম্প। ভবিষ্যতের সমস্ত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের এটাই ছিল পথ-প্রদর্শক।

জার্মানীতে এবং জার্মানীর বাইরে সমস্ত অধিকৃত দেশগুলিতে প্রায় এক হাজার বন্দীনিবাস গড়িয়া উঠিল। মনে রাখা দরকার এই হিসাবের মধ্যে পি. ও. ডব্লিউ. বা যুদ্ধবন্দী নিবাসগুলির সংখ্যা ধরা হয় নাই, অর্থাৎ এগুলি ছিল অসামরিক বন্দীনিবাস। ১৯৩৬ সালে হেইনরিক হিমলার এস. এস. বাহিনীর অধিকর্তারূপে সমগ্র জার্মানীর স্টেট পুলিশের প্রধান অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইলেন। বন্দীনিবাস প্রথার 'পরিপূর্ণ বিকাশের' পথে এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং বলা বাহুল্য যে, হিমলারের হাতে প্রচুর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইল।[১]

জার্মানীর বাঁচিবার জন্য আরও জমি চাই। কিন্তু এই জমি কিভাবে পাওয়া যাইবে? হিটলার মহাযুদ্ধের আগেই ১৯৩৯ সালের ২২শে আগস্ট সৈন্যবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের এক বৈঠকে ঘোষণা করিলেন: 'দ্রুত গতিবেগ ও নৃশংসতার মধ্যেই আমাদের শক্তি লুকানো আছে। চেঙ্গিস খাঁ লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক ও শিশুকে নির্বিচারে এবং স্বেচ্ছায় খুন করিয়াছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইতিহাসে সে একজন মহান রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাতারূপে পরিচিত। পশ্চিমের অসহায় সভ্যতা আমার জন্য কি ভাবিবে, তার জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নাই। সুতরাং আমার এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য একমাত্র কোন একটা ভূমিরেখা দখল করা নয়, শত্রুকে দৈহিকভাবে নির্মূল করা।

১। পূর্বোধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫৭।

অতএব যারা এই নীতির বিরুদ্ধে একটিমাত্র শব্দও উচ্চারণ করিবে, তাদেরকে গুলি করিয়া মারার জন্য আমি হুকুম দিয়াছি। আপাততঃ কেবলমাত্র পূর্বদিকে পোলিশ বংশজাত বা পোলিশ ভাষাভাষী সমস্ত নর-নারী ও শিশুকে বিন্দুমাত্র মমতা বা করুণা না দেখাইয়া হত্যা করার জন্য আমি আদেশ দিয়াছি। কারণ, একমাত্র এভাবেই আমরা আমাদের বাসভূমির জন্য জায়গা পাইতে পারি।"[১]

পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশ দখলের সঙ্গে পোল্যাণ্ড দখলের মূলগত বৈষম্য এই ছিল যে, যেহেতু কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক বা শিশু জাতিতে পোলিশ—একমাত্র সেই অপরাধেই তাদের প্রত্যেককে সাবাড় করিতে হইবে! এই হিটলারী পৈশাচিক পরিকল্পনা থেকেই পোল্যাণ্ডে বিভিন্ন ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যেগুলি ছিল বন্দীনিধনশালা মাত্র। ইউরোপীয় ইহুদীকে হত্যা করার প্রধান কেন্দ্র ছিল পোল্যাণ্ড এখানকার বন্দীশালাগুলিতে পোল্যাণ্ডসহ জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, গ্রীস, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লভাকিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ধৃত লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে মারিয়া ফেলা হইত।

বাহ্যতঃ ক্যাম্পগুলি দুইপ্রকারের ছিল। প্রথমতঃ—আটক বন্দীশালা, যেখানে আগে বন্দীদিগকে দাস-শ্রমিকের কাজ করানো হইত এবং অমানুষিক খাটুনির ফলে সে যখন জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলিত, তখন তাকে আটক বন্দীশালায় পাঠাইয়া দেওয়া হইত এবং সেখানে সে 'স্বাভাবিকভাবে' মারা যাইত কিংবা অন্য কোনভাবে তাঁকে নিধন করা হইত।

আর এক শ্রেণীর বন্দীশালা ছিল শুধুমাত্র সংহার করার জন্য—এগুলিকে ইংরেজীতে বলা হইত 'ডেথ ক্যাম্প'। এগুলি বিশেষভাবে নির্মিত হইত একমাত্র সংহারের জন্য।...সুতরাং এগুলির সাজসজ্জায় গ্যাস ও মৃত্যুর চুল্লি প্রাধান্য অর্জন করিত।

পোল্যাণ্ডে ৪টি ছিল সর্ববৃহৎ বন্দীশিবির বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। যথা—আউসভিৎস-বার্কেনাউ (Auschwitz-Birkenau), মাজডানেক (Majdanek), স্টাট্‌হফ (Stutthof) এবং গ্রস-রোজেন। এই চারটি সুবৃহৎ শিবিরের সারা পোল্যাণ্ডব্যাপী আবার ১০০টি শাখা-শিবির বা সাব-ক্যাম্প ছিল। ছোট-বড় সব শিবিরেই মৃত্যু ঘটানো হইত, তবে সবগুলিতে একই পদ্ধতিতে সকলকে মারা হইত না। বিভিন্ন প্রকারের টেকনিক অবলম্বন করা হইত। আউসভিৎস-বার্কেনাউ এবং মাজডানেক মৃত্যু-শিবিরগুলিতে গণহত্যা ও মৃতদেহগুলি ধ্বংস করার জন্য গ্যাস-চেম্বার ও ক্রিম্যাটোরিয়ামের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। লুবলিন প্রদেশে দুইটি শিবির পোজনান (Hoznan) প্রদেশে চেলমনো (Chelmno) এবং ওয়ারশর নিকটবর্তী ট্রেবলিংকা—এই চারটি মৃত্যু শিবির একমাত্র ইহুদীদের জন্য 'সংরক্ষিত' ছিল। নানা প্রকার বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা এই সমস্ত মৃত্যু ঘটানো হইত। কার্যতঃ এই সমস্ত মৃত্যু-শিবির ছিল গণহত্যার কেন্দ্র মাত্র। জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড দখলের প্রথম দুই বছরে পোল্যাণ্ডে যে অসামরিক (সিভিলিয়ান) আটক বন্দীশালাগুলি স্থাপিত হইয়াছিল, সেগুলিতে নাৎসী-বিরোধী পোলিশ নাগরিক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এবং শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও যাজক (প্রিস্ট) প্রভৃতিকে নিধন করা হইত। একমাত্র

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫৯।

চেলমনো মৃত্যু-শিবিরেই ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ইহুদীকে হত্যা করা হইয়াছিল। আর একটি কুখ্যাত শিবির ছিল ট্রেবলিঙ্কা। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি এই শিবিরটি ট্রেবলিঙ্কা রেল স্টেশন থেকে চার কিলোমিটার দূরে জনবসতিশূন্য নির্জন স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল এবং এখানে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ইহুদীকে সাবাড় করা হইয়াছিল। এই ভয়াবহ গ্যাস-চেম্বারে পাঠাইবার আগে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকলকে উলঙ্গ হইতে বাধ্য করা হইত এবং জামাকাপড় ও মূল্যবান জিনিশপত্র বা অলংকার ইত্যাদি কাড়িয়া নেওয়া হইত। পরে স্নানের নাম করিয়া এই সমস্ত হতভাগ্য স্ত্রী-পুরুষকে বিষবাষ্প-পরিপূর্ণ চেম্বারের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইত। তবে, মৃত্যু ঘটিতে ১৫ মিনিটের বেশী সময় লাগিত না। কিন্তু অসহ্য নারকীয় অবস্থার মধ্যে অন্ততঃ একবার বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। ১৯৪৩ সালের ২রা আগস্ট ক্যাম্পের দেড় হাজার ইহুদী কর্মী পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্রোহ করিল। কয়েকটি ক্যাম্প বিল্ডিং পোড়াইয়া দিল এবং কয়েকজন প্রহরী ও এস. এস. বাহিনীর লোককে হত্যা করিল। এই সুযোগে কয়েকশত বন্দী পলাইয়া যাইতে পারিয়াছিল। অবশ্য ১৯৪৩ সালের নভেম্বর ক্যাম্পটি উঠিয়া গেল।

বন্দীশিবির ও মৃত্যু-শিবিরগুলির মধ্যে আউসভিৎস-বার্কেনাউ ছিল সর্ববৃহৎ। এখানকার সুবৃহৎ দুইটি বৈদ্যুতিক চুল্লিতে প্রত্যহ ১০ হাজার মৃতদেহ পোড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। বন্দীদের পাইকারীহারে হত্যা করা যেমন একটা কঠিন সমস্যা ছিল, তেমনি সেই মৃতদেহগুলি পোড়ানোও একটা সুকঠিন সমস্যা ছিল এবং যতই গোপনে এগুলি করা হোক, মৃতদেহের দুর্গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। ১৯৪০ সালের প্রথমভাগে প্রতিষ্ঠিত এই শিবিরের কলেবর পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এই ক্যাম্পের রেজেস্ট্রি খাতায় ৪ লক্ষ ৫ হাজার বন্দীর রেজেস্ট্রি সংখ্যা পাওয়া গিয়াছিল। এদের অধিকাংশই ছিল পোলিশ। তবে, ইউরোপের নাৎসী-অধিকৃত প্রায় সমস্ত দেশের বন্দীই এখানে ছিল। এমন কি একজন চীনা, ইরানীয়ান ও মিশরীয় বন্দীও ছিল। কিন্তু বন্দীদিগকে দাস-শ্রমিকের মত খাটাইবার ফলে এবং বহু প্রকার অনাচার ও অত্যাচারের জন্য শতকরা ৭৫ জনেরও বেশী বন্দী প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

এই সমস্ত বন্দীশালা ছাড়া পোল্যাণ্ডে সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের জন্যেও ৩০টির বেশী বন্দীশিবির তৈরী হইয়াছিল। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ যে, সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী শিবিরগুলির নিকট যে সমস্ত গণ-সমাধি (mass graves) আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেগুলিতে ৫ লক্ষ বন্দীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। এমন কি, খাস জার্মানীতে যে ৩৬ লক্ষ সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী ছিল, তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকশত শ্রমিকেরা কাজের জন্য বাঁচিয়া ছিল। আর বাকী সব অনাহারে, অত্যাচারে বা সংক্রামক ব্যাধিতে মারা গিয়েছিল। একথা অধিকৃত দেশসমূহের মন্ত্রী রেজেনবার্গের এক চিঠিতে, (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২, জার্মানবাহিনীর অধিকর্তা কাইটেলের নিকট লিখিত) স্বীকার করা হইয়াছে।[১]

ওয়ারশতে ইহুদীদের জন্য নির্মিত এবং কাঁটাতারের বেড়ার দ্বারা বেষ্টিত একটি পৃথক জেলা কিংবা ইহুদীপাড়া সৃষ্টি করা হইয়াছিল ইহুদীদিগকে ঐ অঞ্চলে আবদ্ধ করিয়া রাখার জন্য। এই ইহুদীপাড়া ইতিহাসে 'ওয়ারশ ঘেটো' নামে কুখ্যাত হইয়া

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৯০।

রহিয়াছে। জার্মান ঘাতকবাহিনীর জল্লাদেরা এই সমগ্র পাড়াটি ধ্বংস করিয়া ফেলে। এখানে ৪ লক্ষ ইহুদীর বাস ছিল এবং অধিকাংশই ট্রেবলিঙ্কার মৃত্যুশিবিরের গ্যাস-চেম্বারে ও অনাহারের ফলে মারা গিয়াছিল। কিন্তু অন্য একটি রিপোর্টে প্রকাশ-যে, ১৯৪১ সালের জানুয়ারীর মধ্যভাগে এখানে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৯০ হাজার![১]

ইহুদী সমস্যার 'চূড়ান্ত মীমাংসা' এবং পোলিশ জাতিকে সমূলে উচ্ছেদের জন্য নাৎসী ঘাতকেরা যে সমস্ত বর্বর পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, এখানে তার সামান্য বিবরণী মাত্র দেওয়া হইল। এছাড়া গুলি করিয়া হত্যা এবং নির্বাসনে পাঠাইয়া কত লোককে হত্যা করা হইয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই।

১৯৩৯-১৯৪৫ সালের মধ্যে যুদ্ধ ও জার্মান দখলদারির সময় ৬০ লক্ষ ২৮ হাজার পোলিশ নাগরিক প্রাণ হারাইয়াছিল। এর মধ্যে ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার নিহত হইয়াছে রণক্রিয়ার জন্য আর নাৎসী টেরর বা ত্রাসের কবলে পড়িয়া ৫৩ লক্ষ ৮৪ হাজার পোলিশ নর-নারী ও শিশু মারা পড়িয়াছিল। এই মোট সংখ্যার মধ্যে নিহত পোলিশ ইহুদীর সংখ্যা ছিল ৩২ লক্ষ। আর ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার পোলিশ নাগরিককে নির্বাসনে, বিশেষভাবে জার্মানীতে দাস শ্রমিকের কার্যের জন্য পাঠানো হইয়াছিল। নাৎসী-অধিকৃত দেশগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু ও ধ্বংসই ছিল সর্বাধিক।[২]

* * *

যদিও জার্মানীতে ও জার্মানীর বাইরে অধিকৃত ইউরোপীয় দেশগুলিতে শত শত বন্দীনিবাস গড়িয়া উঠিয়াছিল, তবু এগুলির মধ্যে ৩০টির অধিক বন্দীশালা ছিল সবচেয়ে বড় এবং কুখ্যাত। এই কুখ্যাত বন্দীনিবাসগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যেমন: আউসভিৎস, এটা সবচেয়ে বড় ও বীভৎস ছিল এবং এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বার্কেনাউ (Birkenau) ও অসউইচেম (Oswiecim)—যেখানে প্রত্যহ হাজার হাজার মৃতদেহ পোড়ানো হইত। অন্যান্য নিধন ক্যাম্পের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিল বেলসেন, মাইভানেক, ব্রেসলাউ, ডাচাউ, চেলমনো, বেরগেন-বেলসেন, ট্রেবলিঙ্কা, লোড্জ, মাউথাউসেন, বুখেনভাল্ড, রাভেনস্ব্রুক ও লর্ডহাউসেন ইত্যাদি। মৃত্যুর চুল্লিযুক্ত এই সমস্ত ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ বন্দীকে নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়া, উপবাসে রাখিয়া এবং গ্যাস চেম্বারে পাঠাইয়া হত্যা করা হইত। রুশদের মতে একমাত্র আউসভিৎসে ৪০ লক্ষ লোককে মারা হইয়াছিল। হিটলারী নেতৃত্বে নাৎসী নরঘাতকদের রক্ত ও খুনের পিপাসা যেন চরমে উঠিয়াছিল। তাদের সবচেয়ে বেশী বিদ্বেষ, ক্রোধ ও হিংস্রতা ছিল ইহুদী, পোলিশ ও রুশদের বিরুদ্ধে। জাতিবিদ্বেষের এমন বীভৎসতার নজির ইতিহাসে দুর্লভ। ইউরোপের ৬০ লক্ষ ইহুদীকে সাবাড় করা হইয়াছিল এবং এই প্রকার নরঘাতন একমাত্র যুদ্ধের জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের জন্য ঘটে নাই, ঘটিয়াছে নাৎসী জার্মানীর জাতিবিদ্বেষ ও ইহুদী বিদ্বেষের জন্য। ইহুদী সমস্যার 'চরম মীমাংসা'র (final solution) এই নির্দেশ দিয়াছিলেন স্বয়ং হিটলার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৯, রাইখস্ট্যাগের এক বক্তৃতায়: 'আবার একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে ইউরোপব্যাপী সমগ্র ইহুদীজাতিকে সংহার করা হইবে।'

১। ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০৩।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২১৫-১৬।

১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে নাৎসী অফিসারেরা বিশ্বাস করিত যে, জার্মানী ইতিমধ্যেই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে এবং শীঘ্রই তারা ইংলণ্ড বা আয়ারল্যাণ্ডসহ সারা ইউরোপের প্রভু হইবে। সুতরাং হিটলারের একজন ঘাতক সর্দার হেড্রিক (পরবর্তীকালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় পার্টিজানদের হাতে নিহত) অফিসারদের বুঝাইলেন যে, সারা ইউরোপে যে ১১ মিলিয়ন বা ১ কোটি ১০ লক্ষ ইহুদী আছে, তাদেরকে শেষ করিতে হইবে এবং এজন্য তিনি ইংলণ্ডসহ প্রত্যেকটি দেশের ইউরোপীয় ইহুদীদের সংখ্যা তালিকা উল্লেখ করিলেন। গেস্টাপোবাহিনীর ইহুদী দপ্তরের আর-একজন বড়কর্তা কার্ল আইখম্যান গর্বভরে রিপোর্ট দিয়াছিল যে, পূর্বদিকে ২০ লক্ষ লোককে, যাদের অধিকাংশই ইহুদী, তাদের সকলকে সাবাড় করা হইয়াছে।[১]

(এখানে স্মরণ করা দরকার যে, এই নিষ্ঠুর নরঘাতক ১৯৪৫ সালে মার্কিন আটকবন্দীত্ব থেকে পলাইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়া আশ্রয় নিয়াছিল, কিন্তু পরে ধরা পড়িয়া ইস্রায়েলে নীত হইয়াছিল বিচারের জন্য এবং সেখানে ১৯৬৩ সালে তার ফাঁসি হইয়াছিল।)

সারা ইউরোপব্যাপী নাৎসী জল্লাদেরা যে বিভীষিকা ও বর্বরতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তার সবিস্তার বর্ণনা সম্ভব নয় এবং বিভিন্ন স্থানে ও ক্যাম্পে ঠিক কত সংখ্যক মানুষ—পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু প্রাণ হারাইয়াছিল, সেই সঠিক-সংখ্যা বোধ হয় কোন দিনই চূড়ান্তরূপে স্থির করা যাইবে না। কারণ, অনেক নথিপত্র নষ্ট হইয়াছে এবং অনেকে সম্পূর্ণরূপে নিখোঁজ হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত জঘন্য অপরাধের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণার্হ ও পৈশাচিক ব্যাপার ছিল স্ত্রীলোক ও শিশুদের হত্যা। কেবল হত্যা নয়, তাদেরকে নানাভাবে যন্ত্রণাও দেওয়া হইয়াছিল। ছোট ছোট মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছিল।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে মানবের কাছে সবচেয়ে সুন্দর হইতেছে শিশু এবং শিশুরা নিষ্পাপরূপেই জন্মগ্রহণ করে। তারা মানবিক প্রেম ও পবিত্রতার প্রতীক। কিন্তু নাৎসীরা সেই নিষ্পাপ শিশুদেরকে পিতামাতার কাছ থেকে ছিনাইয়া নিত। মায়েরা তাদের শিশুদের রক্ষা করার জন্য নানাভাবে জামাকাপড়ের আড়ালে লুকাইয়া রাখার চেষ্টা করিত। কিন্তু বৃথা—নাৎসী জল্লাদেরা খুঁজিয়া বাহির করিয়া কাড়িয়া লইত এবং অত্যন্ত বর্বরের মত মারিয়া ফেলিত, অনেক সময় বাপ-মায়ের চোখের সামনেই। যুদ্ধের নানা পুস্তকে এইসব হত্যাকাণ্ডের যে সমস্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি পড়িতে পর্যন্ত অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয়। অনাহারে রাখিয়া কিংবা বিষ-বাষ্পপূর্ণ চেম্বারে ঢুকাইয়া, গুলি করিয়া, চুন-ভর্তি গর্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কিংবা আঘাত করিয়া অথবা অন্যান্য হিংস্র উপায়ে তাদের জীবননাশ করা হইত। শিশুদের ফাঁসি দিয়া মারা হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু নাৎসীরা এদিক দিয়াও নতুন নজির সৃষ্টি করিয়াছে, বহু শিশুকে তারা ফাঁসি দিয়া মারিয়াছে। কোন কোন সময় বন্দীদিগকে যখন গরু ভেড়া ছাগলের মত ওয়াগনে ভর্তি করিয়া মৃত্যু-ক্যাম্পের দিকে লইয়া যাওয়া হইত, তখন পথিমধ্যে শিশুদিগকে মায়ের কোল থেকে ছিনাইয়া নিয়া জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত। একটি পুস্তক থেকে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে জার্মানদেরই প্রদত্ত রিপোর্ট থেকে।

১। উইলিয়াম শাইরার, পৃষ্ঠা ১১৪৫-৪৮।

'The killings were done in this way that particular SS-men or policemen would seize them by the legs and then smash the heads of these children against the trunks of trees.'[১]

অর্থাৎ 'হত্যাগুলি সাধারণতঃ এভাবে ঘটিত কোন এস্. এস. জল্লাদ বা পুলিশ শিশুদিগকে দুটি ঠ্যাং ধরিয়া পাকড়াও করিত এবং তারপর গাছের গুঁড়িতে আছাড় দিয়া তাদের মাথা চূর্ণ করিয়া দিত।'

কোন সভ্য মানুষ শিশুদিগকে হত্যার এমন বর্বর পন্থার কথা বোধহয় কল্পনা করিতেও পারে না। কিন্তু হিটলারী জল্লাদেরা কোন প্রকার হিংস্রতা অনুষ্ঠানেই পশ্চাৎপদ ছিল না। ইউরোপের নিহত ৬০ লক্ষ ইহুদীর মধ্যে ১৬ বছরের কম বয়স্ক বালকের বা শিশুর সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ! এই সমস্ত শিশুর বাবা-মা এবং ভাই-বোন বা আত্মীয়দেরকেও অত্যন্ত হিংস্রতার সঙ্গে হত্যা করা হইত।

মার্কিন ঐতিহাসিক লুই স্নাইডারের বই থেকে বন্দীশালার এই নাৎসী বর্বরতা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ

যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই অবশ্য নাৎসী বন্দীনিবাসগুলির অবর্ণনীয় বীভৎসতা সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল। কিন্তু অনেকেই সেগুলি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। বরং এগুলিকে বিপক্ষের তরফ থেকে প্রোপাগান্ডা বলিয়া মনে করিতেন। কারণ, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ও কাইজারের জার্মানীর বিরুদ্ধে হিংস্রতার অতিরঞ্জিত প্রচারকার্য শুনা গিয়াছিল। ফলে, এবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া অনেকেই এই বীভৎসতার কাহিনী সত্য বলিয়া মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়াবহ সত্য উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা যখন দ্রুত জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন এবং একে একে 'মৃত্যুপুরী'র বন্ধ-দ্বার মুক্ত করিতে লাগিলেন, তখন অভাবনীয় এবং অবিশ্বাস্য সমস্ত সত্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইউরোপের মিত্রপক্ষীয় সুপ্রীম কমান্ডার জেনারেল আইজেন-হাওয়ার বলিয়াছেন যে, যখন গোথা (Gotha) শহরের নিকট একটি 'সন্ত্রাসের শিবির' (horror camp) তিনি পরিদর্শন করিলেন, তখন তিনি আর জীবনে কখনও এমন ভয়ঙ্কর আঘাত অনুভব করেন নাই। যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যু, মৃতদেহের গন্ধ এবং ভয়াবহ দৃশ্যাবলীর সঙ্গে একান্তরূপে পরিচিত, সেই সমস্ত অভিজ্ঞ যোদ্ধারা পর্যন্ত বন্দীশালার এই সমস্ত নারকীয় দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না—বরং শত্রুপক্ষের প্রচারকার্য বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং জেনারেল আইজেনহাওয়ার বন্দীশালার সর্বত্র অনুসন্ধান করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটনে ও লন্ডনে সরকারী মহলের নিকট অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন অবিলম্বে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক ও আইনসভার সদস্যদিগকে পাঠাইবার ও স্বচক্ষে সমস্ত কিছু দেখিবার জন্য। কারণ, তিনি কোন সন্দেহের অবকাশ রাখিতে চাহিলেন না।

যে সমস্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তার কোনো তুলনা নাই। মহাযুদ্ধের পর

ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে অপরাধগুলিকে কয়েকটি দফায় ভাগ করা হইয়াছিল। যেমন :

ক. আটক বন্দীদের গানবাজনার সুরের সঙ্গে গণহত্যার অনুষ্ঠান।

খ. বন্দীনিবাসের কর্মচারী ও প্রহরীগণের দ্বারা মাথার খুলি স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সংরক্ষণ এবং মৃত বন্দীদের চামড়া দিয়া বাতির আচ্ছাদন (ল্যাম্প শেড), হ্যাণ্ডব্যাগ ও হাতের দস্তানা তৈয়ার করণ।

গ. যে সমস্ত বন্দী তখনও জীবিত ছিল, তাদেরকে নির্বিচারে মৃতদেহে ভর্তি দুই চাকার গাড়ীতে (কার্ট) নিক্ষেপ করিয়া দাহন-চুল্লিতে (ক্রিমেটারি) আনয়ন।

ঘ. ক্ষৌরকারদের দিয়া মৃতদেহের মাথা মুণ্ডন (চুল সংগ্রহ) এবং চুল্লিতে দাহ করার আগে দন্ত চিকিৎসকদের দ্বারা দাঁতের সোনা সংগ্রহ করণ।

ঙ. যে সমস্ত বন্দী কথা বলিতে অস্বীকার করিত, এক ধরনের উত্তপ্ত সেলের মধ্যে তাদেরকে রাখিয়া দেওয়া হইত, যতক্ষণ না তারা অসহ্য গরমে সিদ্ধ হইত।

জার্মানীর এই নরক থেকে শিশুরাও যে অব্যাহতি পায় নাই, সেই সম্পর্কে ন্যুরেমবার্গের আদালতে যে অভিযোগ করা হইয়াছিল তার মর্ম এই :

'প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে নাৎসী ষড়যন্ত্রকারীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে শিশুদেরকে পর্যন্ত মারিয়া ফেলিত। বিভিন্ন গ্রুপে বাপ-মায়ের সঙ্গে কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে একাকী তাদের হত্যা করা হইত। শিশুদের আবাসে কিংবা হাসপাতালে তাদেরকে সংহার করা হইত, জ্যান্ত শিশুদের কবরের মধ্যে ফেলিয়া মাটি চাপা দেওয়া হইত। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেওয়া হইত, বেয়নেট দিয়া খোঁচাইয়া তাদেরকে হত্যা করা হইত, তাদেরকে বিষ খাওয়ানো হইত, তাদের উপর মেডিকেল পরীক্ষা চালানো হইত, তাদের রক্ত মোক্ষণ করিয়া সেই রক্ত জার্মান সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইত, কারাগারে এবং গেস্টাপোদের অত্যাচার-কক্ষে ও বন্দীনিবাসে তাদের আটক রাখা হইত এবং সেখানে তারা অত্যাচারে, ক্ষুধায় এবং সংক্রামক ব্যাধিতে মারা পড়িত।'

স্নাইডার আরও লিখিয়াছেন যে, জার্মানীর ২০০ চিকিৎসক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নাম করিয়া বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। যে সমস্ত বন্দীনিবাস সবচেয়ে বীভৎস মৃত্যু-পুরীতে পরিণত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বুখেনভাল্ড (Buchenwald) বিখ্যাত ভাইমারের চার মাইল দূরে—যে ভাইমার গ্যেটে ও শিলারের মত ভুবনবিখ্যাত কবি ও সংস্কৃতিবানদের বাসস্থান ছিল। ১০ই এপ্রিল, ১৯৪৫, মার্কিন সৈন্যবাহিনী বুখেনভাল্ড বন্দীশিবিরকে মুক্ত করে এবং তারা দেখিতে পায় যে, এই মৃত্যু-শিবিরকে একটা পাকাপাকি প্রতিষ্ঠানের মত গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এখানে অজস্র অত্যাচার এবং হত্যা ও মৃত্যু ঘটাইবার যে বিস্তৃত ও ভয়াবহ ব্যবস্থা ছিল, তার সবিস্তার বর্ণনা অসম্ভব। ভাইমারের নাগরিকদেরকে এই মৃত্যু-শিবির দেখানো হইলে অনেকেই কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন এবং অনেকেই আবার বলিয়াছেন যে, তাঁরা আগে এই নারকীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না।*

* বর্তমান গ্রন্থ লেখক ১৯৫৯ সালে পূর্ব জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিদর্শনে গেলে ভাইমার থেকে বুখেনভাল্ডের কুখ্যাত শিবির স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাইয়াছিলেন। যে সমস্ত অত্যাচারের কথা লেখা হইয়াছে, সেগুলি যে সত্য, সেই প্রমাণ বর্তমান লেখক প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন।

* * *

হিটলার অধিকৃত দেশগুলিতে ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন দেখা দিয়াছিল এবং মাতৃভুমির মুক্তির জন্য অত্যন্ত সাহসী গেরিলাবাহিনী শত্রুর নিপাতে সংঘবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এজন্য নাৎসী জল্লাদেরা প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিল, এক কথায় তাকে পৈশাচিক বলা যাইতে পারে। মহাযুদ্ধের ইতিহাসে অনেক বর্বরতার কাহিনীর মধ্যে এজন্য চেকোশ্লভাকিয়ার লিডিস গ্রাম বিখ্যাত বা কুখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

লিডিসের ভয়াবহ কাহিনী

হেইনহার্ড হেড্রিক ছিল হিটলারী জল্লাদদের একজন সর্দার। অর্থাৎ সরকারীভাবে সে ছিল সিকিউরিটি পুলিশের বড় কর্তা, গেস্টাপোবাহিনীর ডেপুটি কর্তা এবং ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া রাজ্যের শাসনকর্তা বা প্রোটেক্টর্। এর বয়স ছিল মাত্র ৩৮। কিন্তু অত্যন্ত বদ চরিত্রের লোক ছিল এবং এর অত্যাচারে চেকোশ্লভাকিয়ার লোকেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে রাজার হালে প্রাগের এক প্রাচীন রাজপ্রাসাদে থাকিত। তবে, তার কপালে এই সুখ বেশী দিন সহ্য হইল না। ১৯৪২ সালের ২৯শে মে সকাল বেলা যখন সে তার দামী মার্সেডিস্ গাড়ীতে তার পল্লী প্রমোদাবাস হইতে প্রাগে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, তখন পথিমধ্যে হঠাৎ একটি নিদারুণ বোমা (ইংলণ্ডে তৈয়ারী) তার গাড়ীর উপর নিক্ষিপ্ত হইল। গাড়ীটি চূর্ণ এবং হেড্রিকের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। ইংলণ্ডে ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুইজন চেক দেশপ্রেমিক যোদ্ধা আর. এ. এফ. বিমান থেকে প্যারাসুট যোগে নীচে নামিয়াছিলেন এবং তাঁরাই অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে হেড্রিকের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া উধাও হইয়া যান এবং প্রাগের একটি গীর্জায় আত্মগোপন করেন।

৪ঠা জুন হেড্রিক মারা গেল এবং তারপর শুরু হইল চেকদের বিরুদ্ধে অমানুষিক প্রতিশোধ গ্রহণ। গেস্টাপোর রিপোর্টে প্রকাশ যে, ২০১ জন স্ত্রীলোকসহ ১৩৩১ জন চেককে তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া মারা হইল। যে গীর্জায় আততায়ীরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সিকিউরিটি বাহিনীর নাৎসীরা সেটি ঘিরিয়া ফেলিল এবং সেখানে যে ১২০ জন পার্টিজান যোদ্ধা আত্মগোপন করিয়াছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে হত্যা করা হইল। প্রাগে হেড্রিকের মৃত্যুর জন্য দূরবর্তী বার্লিনে পর্যন্ত গোয়েবেলস আত্মগোপনকারী ৫০০ ইহুদীকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং তাদের মধ্যে ১৫২ জনকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু শান্ত সুন্দর লিডিস গ্রামটির অদৃষ্টে কি ঘটিল ? ৯ই জুন, ১৯৪২, সকাল বেলা ১০টি ট্রাকভর্তি নাৎসী নিরাপত্তা পুলিশ বাহিনীর লোকেরা আসিয়া হাজির হইল। গ্রামটিকে তারা ঘিরিয়া ফেলিল। একটি ১২ বছরের বালক ভয় পাইয়া লুকাইতে গিয়াছিল, তাকে গুলি করিয়া মারা হইল। গ্রামের সমস্ত পুরুষ অধিবাসীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া গ্রামের অশ্বশালায় বা গোলাবাড়ীগুলিতে লইয়া যাওয়া হইল। পরদিন সকাল থেকে বৈকাল পর্যন্ত সেই হতভাগ্য ধৃত ব্যক্তিদিগকে গোলাবাড়ীর পিছনে একটি বাগানে লইয়া গিয়া দাঁড় করানো হইল এবং প্রত্যেককে গুলি করিয়া মারা হইল। ১৬ বছরের উর্ধ্বে বালকসহ মোট ১৭২ জনকে হত্যা করা হইল। সেই সময় যে ১৯ জন পুরুষ একটি খনিতে কার্যরত ছিল, তাদেরকেও গ্রেপ্তার করিয়া প্রাগে

পাঠাইয়া দেওয়া হইল। লিডিস থেকে ধৃত সাতজন স্ত্রীলোককে গুলি করিয়া মারা হইল এবং গ্রামের বাকী ১৯৫ জন স্ত্রীলোককে জার্মানীতে বন্দীশালায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে তাদের প্রায় সকলেরই মৃত্যু ঘটিল। লিডিসের যে চারজন স্ত্রীলোক সদ্য সদ্য সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, তাঁরাও রেহাই পাইলেন না। তাঁদেরকে 'নির্বাসনে' পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং সদ্যোজাত শিশুদিগকে খুন করা হইল। এর পরেও বাপ-মা হারা যে সমস্ত অনাথ শিশু রহিল, তাদের সমস্তকেই বাইরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। আর লিডিস গ্রামটিকে ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল এবং ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইল। সোজা কথায় গ্রামটিকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করা হইল। একজন জার্মানকে হত্যার এই বীভৎস প্রতিশোধ।*

কিন্তু অধিকৃত ইউরোপে জার্মান ফ্যাসিস্টরা যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছিল, তাতে একমাত্র চেকোশ্লোভাকিয়াতেই লিডিসের মত বর্বর কাণ্ড ঘটে নাই। পোল্যাণ্ড, রাশিয়া, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, এমন কি পশ্চিম ইউরোপে, যেখানে অপেক্ষাকৃত কম অত্যাচার হইয়াছে, সেখানেও অর্থাৎ ফ্রান্সেও ওরাডুর (Oradour) নামক গ্রামে ১৯৪৪ সালের ১০ই জুন অনুরূপ হিংস্রতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গ্রামে বিস্ফোরক লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, এই অভিযোগে সমগ্র গ্রামটিকে আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইল এবং ৬৪২ জন অধিবাসীকে, যাদের মধ্যে ২৪৫ জন স্ত্রীলোক, ১৯০ জন পুরুষ এবং ২০৭ জন শিশু ছিল, তাঁদের সকলকে খুন করা হইল। লিডিসের মত ওরাডুর গ্রামটিকেও স্মৃতি হিসাবে রক্ষা করা হইয়াছে।

এই নাৎসী ঘাতকের দল যদি সত্য সত্যই মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিত, তা হলে সারা ইউরোপের, তথা পৃথিবীর ভাগ্যে কি ঘটিত, তা চিন্তা করিবার মত। তারা যে কেবল বর্বর ও ব্যাপক অত্যাচার ও অমানুষিক হত্যাকাণ্ডই ঘটাইয়াছে, এমন নয়, সারা ইউরোপের ধনরত্ন এবং বহু মূল্যবান চিত্রকলা ইত্যাদিও লুঠ করিয়াছিল, যার মোট মূল্য দাঁড়াইবে ২,৬০০ কোটি ডলার! (মার্কিন ঐতিহাসিক শাইরারের মতে)।

সোভিয়েত রাশিয়ায় নাৎসী অত্যাচার

আগেই বলা হইয়াছে ইহুদী, পোলিশ ও রুশ—এদের উপরই নাৎসী জার্মানরা সবচেয়ে বেশী অত্যাচার করিয়াছিল এবং যেহেতু যুদ্ধটা ছিল সর্বাত্মক, এজন্য অত্যাচারও ও সর্বাত্মক রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই সমস্ত অত্যাচারের খবর যুদ্ধের সময় পৃথিবীর নানা সংবাদপত্রে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও অনেকেই উহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কারণ, প্রতিপক্ষের মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত প্রোপাগাণ্ডা বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে যখন নাৎসী-ফ্যাসিস্ট যুদ্ধাপরাধী নায়কদের বিচার আরম্ভ হইল, তখন নথিপত্র, সাক্ষ্য, স্বীকারোক্তি এবং গৃহীত আলোকচিত্র বা ফটো ও অনান্য প্রামাণিক সূত্র থেকে যে সমস্ত অবিশ্বাস্য অপরাধ ও বর্বরতার কাহিনী উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল,

* ১৯৫৫ সালে গ্রন্থকার ভারতীয় শান্তি প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে চেকোশ্লোভাকিয়া ভ্রমণ করিতে গিয়া উক্ত লিডিস গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সেই নিদারুণ বধ্যভূমিকে একটি আন্তর্জাতিক পুষ্প কাননে (গোলাপ বাগান) পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু সেখানকার স্মৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া তখনও স্থানীয় মহিলারা চোখের জল ফেলিয়াছিল।—লেখক।

তখন সারা বিশ্বের মানুষ স্তম্ভিত হইয়া গেল। একমাত্র ন্যুরেমবার্গের (অন্যান্য দেশেও এই ধরনের বিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যেমন জাপানে) আদালতেই জার্মানদের 'বাছাই-করা' যুদ্ধাপরাধ (War Crimes) সম্পর্কে যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হইয়াছিল তার ফলে ২২ খণ্ড (22 volumes) রিপোর্ট তৈয়ারী হইয়াছিল এবং সমস্ত অপরাধের অধিকাংশই ঘটিয়াছিল হিটলারী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়ায়।

নাৎসী জার্মানীর 'আর্যদের' চোখে রুশেরা ছিল নীচুস্তরের মানুষ। সুতরাং তারা অনাহারে মারা গেলে বা নিহত হইলে কোন ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ সোভিয়েত রাশিয়া ছিল কমিউনিস্ট এবং হিটলারী জার্মানী ন্যাশনাল সোসিয়েলিস্ট। সুতরাং এই রাজনৈতিক মতবাদের জন্য রুশ সামরিক বা অসামরিক নরনারী-শিশু নাৎসীদের কাছে হননযোগ্য ছিল। হিটলার, গোয়েরিং, হিমলার প্রভৃতি তো ঘোষণাই করিয়াছে, যদি ৩০ মিলিয়ন বা তিন কোটি রুশ না খাইয়া মারা যায়, তাতে জার্মানীর কিছু যায় আসে না। কারণ, এত লোককে—তারা অসামরিক নাগরিকই হোক কিংবা বন্দী সৈন্যই হোক, তাদেরকে খাওয়াবার দায়িত্ব জার্মানী গ্রহণ করিতে পারে না। এই নিষ্ঠুর নীতির জন্য যুদ্ধের প্রথম দুই বছরে লক্ষ লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দী ও নাগরিক অনাহারে মারা পড়িয়াছিল। অধিকন্তু হিটলারের আদেশে সোভিয়েত বাহিনীর 'কমিশার' (সামরিকবাহিনীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা, যারা কার্যত সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল) এবং কমিউনিস্ট ও ইহুদীগকে যুদ্ধবন্দী বলিয়া স্বীকার করা হইল না। সুতরাং তাদেরকে সরাসরি হত্যা করা জার্মানদের কাছে কোন দোষের ছিল না।

জার্মানীতে যখন যুদ্ধের জন্য ক্রমশঃ শ্রমিকের সংখ্যায় টান পড়িতে লাগিল, তখন অধিকৃত দেশগুলি থেকে ধৃত লোকদের আনিয়া কল-কারখানায় শ্রমিকের কাজে নিয়োগ করা হইল এবং রাশিয়া থেকে ৩০ লক্ষ লোককে নির্বাসন দিয়া দাস-শ্রমিকের কাজ লাগানো হইল। ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরের শেষে জার্মানীতে বিদেশী অসামরিক দাস-শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৭৫ লক্ষ। কিন্তু এখানেও অন্যদেশের তুলনায় রুশ দাস-শ্রমিকদের উপর অনেক বেশী অত্যাচার করা হইয়াছিল। অনাহার, অর্ধাহার এবং বসবাসের জঘন্য অবস্থা ও পীড়নের জন্য দাস-শ্রমিক হিসাবে অনেক রুশ মারা গেল।

রুশ সামরিক গ্রন্থকার জি. ডেবোরিন 'সিক্রেটস্ অব্ দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার' পুস্তকে (পৃষ্ঠা ১৯৯) লিখিয়াছেন যে, জার্মানীতে যুদ্ধবন্দীসহ সমগ্র বিদেশী-দাস-শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১৪ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৪০ লক্ষ। এ জন্য জার্মান কর্তৃপক্ষকে সর্বদাই বিদেশী শ্রমিকদের বিদ্রোহের ভয়ে তটস্থ থাকিতে এবং প্রচুর সৈন্য-পাহারা বজায় রাখিতে হইত। কারণ, অত্যাচারের তো সীমা ছিল না।

* * *

আর একটা অত্যাচারও ভয়ংকর ছিল। জার্মান-অধিকৃত দেশগুলিতে পার্টিজান বা গেরিলাবাহিনী সংগঠিত হইয়াছিল এবং তারা জার্মান লাইনের পিছন ব্যাপক নাশকতার কার্য করিত কিংবা সুযোগ পাইলেই শত্রুসৈন্য বা অফিসারদিগকে হত্যা করিত। এই পার্টিজানদের মোকাবিলা করিতে গিয়া নাৎসীরা বীভৎস প্রতিহিংসার পথ ধরিয়াছিল। বহু লোককে এবং বিশিষ্ট নাগরিকদিগকেও তারা জামিনস্বরূপ আটক রাখিত এবং এক একজন জার্মানকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়া অজস্র রুশকে খুন করিত। তারা গ্রামকে-গ্রাম-জ্বালাইয়া দিত এবং পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু

নির্বিশেষে সকলকে সংহার করিত। বলা যাইতে পারে যে, চেকোশ্লভাকিয়ার একটি লিডিসের মত সোভিয়েত ইউনিয়নে শত শত লিডিসের সৃষ্টি হইয়াছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রত্যেকটি অধিকৃত শহরে ও জনপদে গেস্টাপোদের আড্ডা ছিল এবং জেলখানাগুলিতে বন্দীদের উপর অত্যাচারের সীমাসংখ্যা ছিল না। যখন অগ্রসরমান লালফৌজের ভয়ে তারা অধিকৃত স্থানগুলি ছাড়িয়া যাইত, তখন যাওয়ার আগে সমস্ত বন্দীকে সাবাড় করিয়া যাইত। বলা বাহুল্য যে, অধিকৃত রাশিয়ার যেখানে যেখানে তারা ইহুদীদের সন্ধান পাইত, সেখানেই তাদেরকে একেবারে ঝাড়ে-বংশে উচ্ছেদ করা হইত। যেমন, কিয়েভের কাছে প্রায় ১ লক্ষ ইহুদী—পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুকে খুন করা হইল এবং এই সমস্ত পাইকারী হত্যা অনুষ্ঠিত হইল বাল্টিক রাজ্যগুলি ও বেলোরুশিয়া থেকে শুরু করিয়া একেবারে দক্ষিণবর্তী ক্রাসনাগের বা ক্রিমিয়া পর্যন্ত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অসামরিক নরনারীর অদৃষ্টে যখন এই দশা ঘটিতেছিল, তখন রুশ যুদ্ধবন্দীদের কপালে কি জুটিল? অন্ততঃ ৩০ লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দীকে গুলি করিয়া, অনাহারে রাখিয়া কিংবা ভয়ানক ঠাণ্ডার মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া প্রাণনাশ করা হইল। এই সমস্ত হতভাগ্যদের অনেককে মাউথাউসান বন্দীনিবাসে রাখিয়াও হত্যা করা হইল।

জার্মানরা রুশ যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে কোন প্রকার আন্তর্জাতিক আইন-কানুন গ্রাহ্য করে নাই এবং সে কথা হিটলার রাশিয়া আক্রমণের আগেই সেনাপতিদের বৈঠকে বলিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য স্বেচ্ছায় রুশ যুদ্ধবন্দীদিগকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল এবং এই সমস্ত অসহায় রুশ বন্দীদের ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া গোয়েরিং যে কাউন্ট চিয়ানোর কাছে স্থূল রসিকতা করিয়াছিলেন, সেটাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। গোয়েরিং ইতালীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে রসিকতার সুরে বলিলেন যে, ক্ষুধার্ত রুশ যুদ্ধবন্দীরা এক্ষণে নরমাংস ভক্ষক হইয়া উঠিয়াছে। এই তো সেদিন তারা একজন জার্মান প্রহরীকে খাইয়া ফেলিয়াছে!

শত শত নয়, হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দীকে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও অনাহারের মধ্যে রাখা হইয়াছিল। বিশেষতঃ স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানীর পরাজয়ের আগে পর্যন্ত রুশ বন্দীদের উপর নির্যাতনের বান ডাকিয়াছিল। একজন হাঙ্গেরীয় ট্যাঙ্ক অফিসার যুদ্ধের পর লিখিয়াছেন:

'আমরা যখন রোভনোতে অবস্থান করছিলাম, তখন একদিন খুব সকালে উঠে পড়লাম এবং শুনতে পেলাম যেন বহুদূর থেকে হাজার হাজার কুকুরের চীৎকার ভেসে আসছে। তখন আমি আমার আর্দালিকে ডেকে বললাম—'দেখতো ব্যাপারটা কি? এত চীৎকার ও চাপা গোঙানির শব্দ কোত্থেকে আসছে?' তখন আমার আর্দালি বললো—'এখন থেকে বেশী দূরে নয়, হাজার হাজার রুশ যুদ্ধবন্দী খোলা মাঠে পড়ে আছে। তাদের সংখ্যা অন্ততঃ ৮০ হাজার হবে। যেহেতু তারা ক্ষুধার্ত এবং উপবাস ক্লিষ্ট, সেজন্যই তাদের এই গোঙানি ও চাপা আর্তনাদ শুনা যাচ্ছে।'

'তখন আমি স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। দেখলুম হাজার হাজার রুশবন্দী কাঁটাতারের বেড়ার আড়ালে পড়ে আছে। তাদের মধ্যে অনেকেই মুমূর্ষু। খুব কম সংখ্যক বন্দীই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতো। তাদের চোখ মুখ শুকিয়ে একেবারে বসে গিয়েছিল। প্রত্যহ শত শত বন্দী মারা যাচ্ছিল এবং

যাদের সামান্য কিছু জীবনীশক্তি ছিল, তাদেরকেও গাদা করে একসঙ্গে প্রকাণ্ড গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হতো !'[১]

একজন হাঙ্গেরীয় অফিসারের এই অভিজ্ঞতা আদৌ ব্যতিক্রম নয়। কারণ সাধারণভাবেই এবং সর্বত্র রুশ যুদ্ধবন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছিল। অনাহার ও নির্যাতনের ফলে অন্ততঃ ৩০ লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দী প্রাণ হারাইয়াছিল। কিন্তু প্রুশিয়ান আভিজাত্যগর্বী জার্মান সেনাপতিরা এমন-একটা ভঙ্গি দেখাইতেছিলেন যেন এই সমস্ত ব্যাপার তাঁরা জানিতেন না এবং এই সমস্ত অত্যাচারের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু ন্যুরেমবার্গের আদালতে অন্ততঃ দুইজন শীর্ষস্থানীয় জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল রাইখনাউ ও ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টাইন স্বাক্ষরিত যে দলিলপত্র পেশ করা হইয়াছিল, তাতে এই সমস্ত 'ভদ্র' সেনাপতিরা যে এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেটা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁদের আদেশপত্রে লেখা ছিল যে, শত্রু দেশে বৃহৎ জনসংখ্যাকে অনাহারে থাকিতে হইবে এবং যুদ্ধবন্দীদিগকেও কোন প্রকার মানবতার খাতিরে খাদ্য দেওয়া হইবে না, যদি না তারা জার্মানবাহিনীতে যোগ দেয়।

সুতরাং শীর্ষস্থানীয় জার্মান সেনাপতিদেরও ভদ্র আচরণ ও ঐতিহ্যের বড়াই নিতান্তই ভণ্ডামি ও মিথ্যা ছিল। তবে ১৯৪২ সালের মধ্যভাগের পর রুশযুদ্ধবন্দী-দিগকে মারিয়া না ফেলিয়া দাস-শ্রমিকের কাজে লাগাইবার পরিকল্পনা হইয়াছিল। তখন রুশ বন্দীদিগকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা হইত। বলা হইত—'হয় ভ্লাশভের আর্মিতে যোগ দাও, নতুবা না খেয়ে মরো।'

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, জেনারেল ভ্লাশভ ছিলেন একজন নাম-করা রুশ সেনাপতি। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিখ্যাত মস্কো যুদ্ধে জার্মানবাহিনীকে পরাজিত করার গৌরব যে সমস্ত সোভিয়েত সেনাপতি অর্জন করিয়াছিলেন জেনারেল ভ্লাশভ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কিন্তু ১৯৪২ সালের বসন্তকালের এক যুদ্ধে তিনি জার্মানদের হাতে ধরা পড়েন এবং বন্দী হন। ব্যক্তিগতভাবে ভ্লাশভ অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং স্ট্যালিনের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি খুব দ্রুত লালফৌজের সংগঠনে শীর্ষস্থানে উঠিতেছিলেন। বিখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক ইলিয়া এরেনবুর্গের মতে ভ্লাশভ এত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন যে, তিনি মনে করিতেন তাঁর ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষার পূরণ ঘটিতে পারে একমাত্র জার্মানীর জয়লাভের মধ্যে। সুতরাং জার্মানদের হাতে ধরা পড়ার পর তিনি ধৃত রুশ সৈন্যদের মধ্য থেকে 'স্বেচ্ছাসেবক' সংগ্রহ করিয়া জার্মানদের সহযোগী একটি আর্মি গড়িয়া তুলিলেন। মনে হয় উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের লোভ দেখাইয়াই এই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হইয়াছিল। কিন্তু জার্মানীর পরাজয়ের পর ভ্লাশভ আমেরিকানদের হাতে ধরা পড়েন এবং আমেরিকানরা তাঁকে রুশদের হাতে অর্পণ করেন। বলা বাহুল্য যে, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভ্লাশভকে তাঁরা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেন।

কিন্তু অনেক সোভিয়েত সৈন্য ও অফিসার খাদ্যের বিনিময়েও ভ্লাশভের বাহিনীতে যোগ দিতে রাজী হন নাই। যুদ্ধের শেষের দিকে তাঁদের অনেকের মৃতদেহ ডাচাউ এবং মাউথাউসেন বন্দীনিবাসে পাওয়া গিয়াছিল।

১। আলেকজান্ডার ওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৬৩৬।

ইউরোপে নাৎসী জার্মানী কর্তৃক ইহুদীদের পরেই রুশদের উপর সবচেয়ে বেশী অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত অত্যাচার অবিশ্বাস্য রকমের নিষ্ঠুর ছিল। জার্মানদের হাতে বন্দী অবস্থায় সম্ভবতঃ ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ রুশ সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছিল। জার্মান সূত্রে প্রকাশ যে, ১৯৪৪ সালের মে মাস পর্যন্ত মোট ৫১ লক্ষ ৬০ হাজার রুশ সৈন্য জার্মানদের হাতে বন্দী হইয়াছিল। এদের মধ্যে ১৮ লক্ষ বাদে আর বাকী সকলেই প্রাণ হারাইয়াছিল।[১]

বিখ্যাত মার্কিন সামরিক গ্রন্থকার উইলিয়াম শাইরার লিখিয়াছেন যে, জার্মানীতে রুশ যুদ্ধবন্দীর মোট সংখ্যা ছিল ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার। অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা একত্র করিলে যা দাঁড়ায় একা রুশবন্দীর সংখ্যা ছিল তার চেয়েও বেশী। কিন্তু ১৯৪৫ সালে বিজয়ী মিত্রপক্ষ যখন এই সমস্ত যুদ্ধবন্দী শিবির মুক্ত করিয়াছিলেন, তখন মাত্র ১০ লাখের মত বন্দীকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। আর ১০ লাখের মত বন্দীকে বোধ হয় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ২০ লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দী অনাহারে, ব্যাধিতে কিংবা শূন্য তাপাঙ্কের নীচে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখার ফলে ঠাণ্ডায় মারা গিয়াছিল এবং আরও ১০ লক্ষ বোধ হয় এস. এস. সিকিউরিটি সার্ভিসের হাতে কিংবা অন্যান্য কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।[২]

অথচ এত লক্ষ লক্ষ রুশ যুদ্ধবন্দীকে অনাহারে রাখিয়া মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। কারণ, নাৎসী পার্টি 'দার্শনিক' রোজেনবার্গ ফিল্ড-মার্শাল কাইটেলকে এক চিঠিতে জানাইয়াছিলেন যে, তখন রাশিয়াতে যে পরিমাণ খাদ্য ছিল, তাতে অনাহারেই এত ব্যাপকহারে রুশ যুদ্ধ-বন্দীদের অনাহারে মৃত্যুকে এড়ানো যাইত।

কিন্তু এই সমস্ত মৃত্যু স্বেচ্ছায় ঘটানো হইয়াছে। অটো ওলেনডর্ফ (Otto Ohlendorf) নামে সিকিউরিটি সার্ভিসের একজন বড় পাণ্ডা ন্যুরেমবার্গের আদালতে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁদের উপর হুকুম ছিল সমস্ত ইহুদী ও কমিউনিস্ট 'কর্মকর্তাদের'কে যুদ্ধবন্দী শিবির থেকে সরাইয়া নিয়া গিয়া হত্যা করার জন্য এবং তিনি যতদূর জানেন, তাতে বলিতে পারেন যে, গোটা রুশ অভিযানের সময়েই এই আদেশ কার্যকর করা হইয়াছিল।

অধিকন্তু আদালতের এক প্রশ্নের জবাবে অটো ওলেনডর্ফ অম্লান বদনে এবং গর্বভরে স্বীকার করেন যে, তাঁর আদেশে তাঁর অধীন ঘাতকেরা এক বছরে ৯০ হাজার স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করিয়াছিল। ইহুদী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই ইহুদী শিশুদেরকেও মারিয়া ফেলা হইয়াছিল।

স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীদের এবং স্ত্রীদের কাছ থেকে শিশুদের কাড়িয়া নেওয়ার সময় অত্যন্ত মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা হইত। কিন্তু তাতে নাৎসী ঘাতকদের হৃদয় বিন্দুমাত্র টলিত না। এদের মধ্যে এস. এস. ক্যাপ্টেন জোসেফ ক্রেমার (Josef Kramer) ছিল একজন নামকরা ঘাতক। বেলসেন, আউসভিৎস, মাউথাউসেন, ডাচাউ ইত্যাদি নানা বন্দীশালায় নিধনকার্য নিষ্পন্ন করার জন্য এই ব্যক্তিটি 'Beast of Belsen' বা 'বেলসেনের জানোয়ার' নামে পরিচিত ছিল। এই ব্যক্তিটির নির্দেশে

১। আলেকজান্দার ওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৬৩৯।
২। দি রাইজ এ্যান্ড ফল অব্ দি থার্ড রাইখ, পৃষ্ঠা ১১৩৩।

স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গ করিয়া গ্যাস-চেম্বারে পাঠাইয়া হত্যা করা হইত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জার্মান বন্দীশিবিরগুলিতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষের মত লোক প্রাণ হারাইয়াছিল।

কিন্তু যে সমস্ত নরনারীকে হত্যা করা হইত, তাঁদের বাঁধানো দাঁতে যদি সোনা থাকিত, তবে সেই সোনা খুলিয়া নেওয়া হইত। জামাজুতা এবং পোশাক ইত্যাদিও এভাবে সংগ্রহ করা হইত। আর মৃতদেহের ফ্যাট্ বা চর্বি থেকে সাবান, মৃত্যুচুল্লির ছাই থেকে সার তৈয়ার করা হইত এবং নিহত ব্যক্তিদের চামড়া থেকে আলোর শেড্ বা আচ্ছাদন প্রস্তুত করা হইত এবং বন্দীশালাগুলির নাৎসী কর্মচারী পুরুষ বা স্ত্রীলোকেরা নির্বিকার চিত্তে সেগুলি ব্যবহার করিত।*

হতভাগ্য বন্দী স্ত্রী-পুরুষদের নিয়া নাৎসী ডাক্তার বা চিকিৎসকরা আর একটি বীভৎস কার্য করিতেন। তাঁরা গবেষণার বা মেডিক্যাল এক্সপেরিমেণ্টের নাম করিয়া অনেক বন্দী বা বন্দিনীকে গিনিপিগের মত ব্যবহার করিতেন এবং সেই যন্ত্রণাদায়ক পরীক্ষার ফলে প্রায় সকলেই বিষক্রিয়ার জন্য, নানা ব্যাধির জীবাণুর জন্য কিংবা অতিরিক্ত ঠাণ্ডার মধ্যে উলঙ্গ থাকার জন্য মারা পড়িত। কতটা ঠাণ্ডায় বা কত ডিগ্রি তাপের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের যৌনক্রিয়া সম্ভব, সেই "বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা" পর্যন্ত বন্দীদের উপর করা হইত। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত ঘৃণার্হ ও ভয়াবহ কার্যের বিরুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর নাম-করা চিকিৎসকেরা পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ করেন নাই!

* * *

নাৎসী জার্মানী কর্তৃক ইহুদীদের উপর অত্যাচার মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এক ভয়াবহ কলঙ্কিত অংশ জুড়িয়া আছে। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও অ্যান ফ্রাঙ্ক নামে ১৩/১৪ বছরের একটি ইহুদী কিশোরী কিভাবে এক সুন্দর এবং প্রেমময় পৃথিবীর স্বপ্ন রচনা করিয়াছিল, সেই কাহিনী তার রচিত একটি ডায়েরি থেকে পাওয়া গিয়াছে। জার্মানীতে নাৎসীদের অত্যাচার থেকে বাঁচিবার জন্য অ্যান ফ্রাঙ্কের পরিবার অন্য একটি ইহুদী পরিবারের সঙ্গে পালাইয়া আসিয়া আমস্টারডাম শহরের একটি বাড়ীর চারতলার পিছনের কুঠুরীতে আত্মগোপন করিয়াছিল। ১৯৪২-এর জুন থেকে ১৯৪৪-এর আগষ্ট মাস পর্যন্ত অবিশ্বাস্য রকমের কষ্ট ও বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়া এই পরিবার দুইটি আত্মগোপন করিয়াছিল। এই সময় অ্যান ফ্রাঙ্ক যে একটি কল্পিত বান্ধবীর উদ্দেশ্যে ডায়েরী রচনা করে মহাযুদ্ধের পর তা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এর সাহিত্যিক ও মানবিক মূল্যের জন্য ইউরোপের ২৮টির অধিক ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের বাংলাভাষায়ও এই বইটির অনুবাদ হইয়াছে। মহাযুদ্ধের কতকগুলি বইতেও এর উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে সেই বই থেকে সামান্য একটি পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করা গেল যুদ্ধ, বর্বরতা ও জাতিবিদ্বেষ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটি বুদ্ধিদীপ্ত, অনুভূতিপ্রবণ কিশোরী মেয়ের মনোভাব বুঝাইবার জন্য—যে মনোভাব মানবতার আদর্শে মহিমামণ্ডিত:

* ১৯৫৯ সালে গ্রন্থকার স্বয়ং পূর্ব জার্মানী পরিদর্শন করিতে গিয়া একটি বৃহৎ বন্দীশালায় এই সমস্ত চামড়ার শেড্ ও মাথার চুল ইত্যাদি দেখিয়া আসিয়াছেন। —লেখক

মঙ্গলবার, ৬ই জুন, ১৯৪৪

প্রিয় কিটি,

আজ এক অবিস্মরণীয় দিন। অবশেষে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হলো। ফরাসী উপকূলের বিভিন্ন জায়গায় মিত্রপক্ষের সৈন্যদল অবতরণ করেছে।···

জার্মানীর খবরেও স্বীকার করা হয়েছে যে, ফরাসী উপকূলে বৃটিশবাহিনী অবতরণ করেছে। বি. বি. সি. থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বৃটিশ অবতরণ-পোতের সঙ্গে জার্মান যুদ্ধজাহাজের লড়াই চলছে।

আমাদের এই গোপন আবাসে জোর আলোচনা শুরু হয়ে গেছে—এটা কি ব্যাপক আক্রমণ, না দু বছর আগে ডিয়েপে যা হয়েছিল, সেই থেকে পরীক্ষামূলক কোন ছোটখাটো সংঘর্ষ? দশটার সময় বৃটিশ রেডিও ঘোষণা করলো যে, আক্রমণ শুরু হয়েছে। তাহলে এটা সত্যি সত্যি আক্রমণ। এগারোটার সময় বৃটিশ বেতার হতে সর্বাধিনায়ক জেনারেল ভুইট্ আইজেনহাওয়ারের বক্তৃতা জার্মান ভাষায় প্রচারিত হলো। জেনারেল আইজেনহাওয়ার ফরাসী নাগরিকদের উদ্দেশ করে বলেছেন, 'সামনে কঠিন সংগ্রাম—কিন্তু জয় সুনিশ্চিত। ১৯৪৪ সালের মধ্যেই আমরা চরম চরম বিজয় লাভ করবো। শুভমস্তু।'

আমাদের গোপন আবাস আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সেই বহু প্রতীক্ষিত মুক্তি যা এতদিন আমাদের কাছে ছিল সুদূর স্বপ্নরাজ্যের কাহিনীর মত, তা কি সত্যিই আমাদের কাছে এলো? সত্যিই কি ১৯৪৪ সালের মধ্যে আমরা বিজয় লাভ করব? এ-সম্বন্ধে আমরা কেউই সুনিশ্চিত নই। কিন্তু হতাশার অন্ধকার ছিন্ন করে আবার আশার আলোক জেগেছে। আবার আমরা নতুন করে সাহস ও শক্তি ফিরে পেয়েছি। এখন আমাদের সাহসের সঙ্গে সমস্ত দুঃখকষ্ট, ভয়কে জয় করতে হবে। এখন আমাদের একমাত্র কাজ—ধীর ও স্থির থাকা। দাঁতে দাঁত চেপে আমরা শেষ মুহূর্তের সমস্ত যন্ত্রণা যেন নীরবে সহ্য করতে পারি। ফ্রান্স, রুশিয়া ও জার্মানী সব দেশের লোকেরা চীৎকার করে তাদের দুঃখের কাহিনী ঘোষণা করতে পারে, কিন্তু আমাদের সে অধিকার আসে নি।

এই আক্রমণের সবচেয়ে সুমধুর দিক হচ্ছে যে, আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি যে, হাজার হাজার বন্ধু যেন বরাভয় নিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। এতদিন পর্যন্ত ঐ ভয়ংকর গেস্টাপো পুলিশ ও তাদের উদ্যত ঝকমকে ছোরা ছাড়া আর কিছুই চোখের সামনে দেখতে পাইনি। এখন এই সমস্তকে আড়াল করে বন্ধুদের ধীর ও প্রসন্নমূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠছে।—তোমারই অ্যান[১]

যদিও প্রেম, করুণা ও মানবতায় বিশ্বাসী এই কিশোরী ইহুদী মেয়েটি তাঁর 'প্রসন্নমূর্তি বন্ধুদের' সঙ্গে হাত মিলাইবার সুযোগ পায় নাই, কেননা, তার আগেই গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়িয়া সে বন্দীনিবাসে প্রেরিত হইয়াছিল এবং সেখানে সে মারা গিয়াছিল তবু সে তার ডায়েরির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বর্বরতার উপর মানবতার জয়ের যে বিশ্বাস লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছে, শেষ পর্যন্ত সেই মানবতারই জয় হইয়াছে—ক্রূরতার নয়, জাতিবিদ্বেষের নয়, হিংস্রতার নয়!

১। অ্যান ফ্রেঙ্কের ডায়েরি—অনুবাদক অরুণকুমার সরকার ও অংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১৬৭-৬৯।

অষ্টম পর্ব

চতুর্থ অধ্যায়

পশ্চিম থেকে জার্মানী অভিমুখে :

আর্দেনেস অঞ্চলে স্ফীতিমুখ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

২৫শে আগস্ট, ১৯৪৪, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের মুক্তি বা পুনর্দখলের পর মাত্র ২০ দিনের মধ্যে মিত্রবাহিনী জার্মানীর সীমান্তে পেঁছিল এবং ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের দক্ষিণ ফ্রান্স থেকে আর-একটি মিত্রবাহিনী (যার সাংকেতিক নাম ড্রাগুন) ক্রমাগত উপরের দিকে আগাইয়া আসিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর তৃতীয় আর্মির সঙ্গে হাত মিলাইল এবং এভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত আগাগোড়া একটি অবিচ্ছিন্ন লাইন গড়িয়া তুলিল। ১৩ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে মিত্রপক্ষের একটি যান্ত্রিক ডিভিসন আকেন (Aachen) শহরের ঠিক ১০ মাইল দক্ষিণে সিগফ্রিড লাইনের একটি 'নরম স্থানে' ট্যাংক সহযোগে আঘাত হানিয়া জার্মান সীমান্তের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বিগত ৭০ বছরের মধ্যে জার্মানরা অন্তত তিনবার এই সমস্ত অঞ্চল দিয়া পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এবারই প্রথম তারা নিজেদের মধ্যে শত্রুর পালটা আক্রমণের মুখে পড়িল। কিন্তু অবিলম্বেই মিত্রপক্ষের জার্মান সীমান্ত অতিক্রমের এই উৎসাহ একেবারে নিস্তেজ হইয়া গেল। কারণ, ৬ সপ্তাহ ধরিয়া একটানা যুদ্ধ ও অগ্রগতির পর জার্মান সীমান্তে পেঁছিয়া মিত্রপক্ষের গতিবেগ হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। কেননা 'সরবরাহের দুর্ভিক্ষ' ('ফ্যামিন ইন সাপ্লাই'—এই শব্দটিই বিশিষ্ট মার্কিন রণনেতা ওমর ব্রাড্‌লি ব্যবহার করিয়াছেন) দেখা দিল এবং মিত্রবাহিনীকে দীর্ঘ দুইমাস অপেক্ষা করিতে হইল সিগফ্রিড লাইনের ধারে—যতক্ষণ না শেরবুর্গ বন্দর থেকে দীর্ঘ সরবরাহ লাইনের বদলে এণ্টোয়ার্প বন্দরের মুখ খোলা গেল। সুতরাং বিখ্যাত রাইন নদী পার হইয়া অতি দ্রুত জার্মানীকে ঘায়েল ও যুদ্ধ শেষ করার যে আশা মিত্রপক্ষের ছিল, তা চূর্ণ হইয়া গেল।[১]

* * *

১৯৪৪ সালের মধ্যেই যুদ্ধ খতম করার আশা রহিল না বটে, কিন্তু জার্মানীর পক্ষেও যে আর অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত প্রতিরক্ষার যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়, সেই লক্ষণও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কারণ, জার্মানী পূর্বে ও পশ্চিমে দুই রণাঙ্গনের বিষম চাপের মধ্যে পড়িল এবং এই দুই রণাঙ্গনের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য অতীতের জার্মান রণপণ্ডিতগণ বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিটলার নিজেকে একজন অদ্বিতীয় রণবিশারদ বলিয়া মনে করিতেন এবং প্রুশিয়ার 'ঐতিহ্যবাহী' অফিসার শ্রেণীকে অবজ্ঞার, এমন কি সন্দেহের চোখে দেখিতেন—বিশেষতঃ সেনাপতিবৃন্দ কর্তৃক হিটলারকে হত্যার ২০শে জুলাইয়ের বিখ্যাত চক্রান্তের পর। নরম্যাণ্ডিতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ ও আক্রমণের পর হিটলার ফ্রান্সের এই দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে

১। A Soldier's Story—Omar Bradley, Popular, Library, New York, 1964, P. 406.

(১৯৪০ সালে প্রথম বারের যুদ্ধে তিনি সহজেই জয়লাভ করিয়াছিলেন) হতাহত সহ ৫ লক্ষ সৈন্য খোয়াইলেন। এই পাঁচ লক্ষের মধ্যে অবশ্য প্রায় লাখ-দুই সৈন্য উপকূলভাগের বন্দরগুলিতে আটকা পড়িয়া রহিল। কারণ, মিত্রবাহিনী তাদের পাশ কাটাইয়া আগাইয়া গেল। জার্মানীর প্রায় ২০ টি পদাতিক এবং ৫টি যান্ত্রিক বা ট্যাঙ্ক ডিভিসন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল এবং আরও ১২টি পদাতিক ও ৬টি যান্ত্রিক ডিভিসন গুরুতররূপে ঘায়েল হইল। ফিল্ড-মার্শাল ভালথার মডেল ছিলেন এদের প্রধান সেনাপতি। কিন্তু তাঁর পরাজিত সৈন্যদলের পক্ষে তৃতীয় রাইখের শেষ প্রতিরক্ষাব্যূহ সিগফ্রিড লাইনে গিয়া আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।

এদিকে মিত্রপক্ষ ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ তারিখের মধ্যে নরম্যাণ্ডিতে অবতরণের পর থেকে অর্থাৎ ৬ই জুন থেকে তিন মাসের মধ্যে প্রচুর সরবরাহ পাইয়া আসিতেছিলেন—২০ লক্ষের বেশী সৈন্য এবং ৩৫ লক্ষ টন সরবরাহ তীরে নামানো হইয়াছিল। এটা নিশ্চয়ই কম কৃতিত্বের কথা নয় এবং এই বিপুল পরিমাণ সরবরাহ ফ্রান্সের বিখ্যাত রেড বল্ এক্সপ্রেস এবং অন্যান্য যানবাহনযোগে দ্রুত অগ্রসরমান মিত্রবাহিনীকে যোগান দেওয়া হইতেছিল। এই সমস্ত সরবরাহের মধ্যে জ্বালানী ও গোলাবারুদই ছিল প্রধান। কিন্তু এই অভিযানে মিত্রবাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল—হতাহত ও বন্দী নিয়া ২ লক্ষ সৈন্য খোয়া গেল। কিন্তু এই সমস্ত ক্ষতি সত্ত্বেও মিত্রপক্ষের এই সান্ত্বনা ছিল যে, এতদিনে শত্রু হাতের কব্জার মধ্যে আসিয়াছে।

প্যারিসের মুক্তির পর মিত্রপক্ষের চারটি বাহিনী যেন চারটি উদ্যত বর্শাফলকের মত বিপক্ষকে বিদ্ধ করিয়া এবং ১২টি বিভিন্ন সড়ক ধরিয়া ১৯৪০ সালের জার্মান ব্লিজক্রীগের চেয়েও দ্রুততর বেগে—প্রতিদিন ২০ থেকে ৫০ মাইল গতিতে পূর্ব ফ্রান্স ও বেলজিয়মের ভিতর দিয়া আগাইয়া যাইতে লাগিল। ফ্রান্স ও বেলজিয়মের বিভিন্ন নামজাদা শহর ও বন্দর একে একে ইঙ্গ-মার্কিন-কানাডীয় বাহিনীর হাতে আসিতে লাগিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মিত্রসৈন্যেরা এত দ্রুত আসিয়া পড়িল যে, জার্মান সপ্তম আর্মির কমাণ্ডার তাঁর ব্রেকফাস্ট বা প্রাতঃরাশের টেবিলে ধরা পড়িলেন! ১লা সেপ্টেম্বর ডিয়েপ (Dieppe), ৮ই সেপ্টেম্বর ক্যালে (Ostend), ১৮ই সেপ্টেম্বর বলোন (Boulogne) এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর ক্যালে (Calais) বন্দর দখল হইয়া গেল।

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জেনারেল প্যাচের (Patch) সপ্তম বাহিনী দক্ষিণ ফ্রান্সে সাফল্যের সঙ্গে 'অপারেশন ড্রাগুনে'র পর উপরের দিকে ডিজ্ঁ (Dijon) শহরে মার্কিন তৃতীয় বাহিনীর সহিত মিলিত হইল এবং জার্মানীকে পশ্চিম দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ফরাসী বন্দর বর্দো (Bordeaux) সেণ্ট নেজায়ার (St. Nazaire) এবং লরিয়েণ্ট (Lorient)—এই সমস্ত স্থানে জার্মান সৈন্যেরা অত্যন্ত বীরত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করিল! সুতরাং মিত্রবাহিনী অধিকতর সৈন্যক্ষয় এড়াইবার জন্য এই সমস্ত বন্দরের অবরুদ্ধ শত্রুসৈন্যদের পিছনে ফেলিয়া সামনের দিকে আগাইয়া গেল। কিন্তু একান্ত উত্তর-পশ্চিমের ব্রেস্ট বন্দর অত্যন্ত তীব্র লড়াইয়ের পর ১৮ই সেপ্টেম্বর মিত্রপক্ষ জয় করিলেন এবং ৩৬ হাজার জার্মান সৈন্যকে বন্দী করিলেন বটে, কিন্তু সেই বিখ্যাত বন্দরটি এমনভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছিল যে, ওটি মিত্রপক্ষের কোন কাজে আসিল না।

* * *

১৯৪৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর অবস্থা দেখিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক মহলের মনে হইল যে, যুদ্ধ আর বেশী দিন চলিবে না, হিটলারী বাহিনীর দম ফুরাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং রাইন নদী পার হইয়া সোজাসুজি সিগফ্রিড লাইনের উপর আক্রমণের আর দরকার নাই, বরং ১৯৪০ সালে জার্মানবাহিনী যেভাবে বিখ্যাত ম্যাজিনো লাইনকে পাশ কাটাইয়া ফ্রান্সের ভিতর চলিয়া গিয়াছিল, ইঙ্গ মার্কিন বাহিনীও অনুরূপভাবে সিগফ্রিড লাইনের উত্তর প্রান্ত দিয়া পাশ কাটাইয়া জার্মানীর অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িবে। রণশাস্ত্র-বিশারদ মেজর জেনারেল ফুলার লিখিয়াছেন যে, ফ্রান্সে জার্মানীর সপ্তম ও পঞ্চদশ বাহিনীর পতনের পর জেনারেল আইজেনহাওয়ার যুক্তিসঙ্গতভাবেই রাইন নদীর দিকে ছুটিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে উপযুক্ত সরবরাহের টান পড়িল। সুতরাং সমস্তগুলি মিত্রবাহিনীর পক্ষে একযোগে অভিযান চালানো সম্ভব ছিল না—হয় শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে হইত, কিংবা 'সীমাবদ্ধভাবে' পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে হইত। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, এই সময় মিত্রপক্ষে যদি এমন কোন তেজস্বী ও সাহসী সুপ্রীম কমান্ডার থাকিতেন, তবে, তিনি জার্মানবাহিনীর এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়া একটি মাত্র আর্মির সাহায্যে দুই সপ্তাহের মধ্যেই রাইন নদী ও সিগফ্রিড লাইন ঘায়েল করিয়া বার্লিনের দিকে অভিযান চালাইতে পারিতেন।···

পশ্চিম রণাঙ্গনের এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সামরিক মহলে দুইটি প্রস্তাব দেখা দিল। প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলেন জেনারেল মন্টগোমারি, যিনি ইতিমধ্যে তাঁর সামরিক কৃতিত্বের জন্য ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ ফিল্ড মার্শালের পদমর্যাদায় উন্নীত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবটির সুপারিশ করিলেন মার্কিনবাহিনীর জেনারেল ব্রাড্‌লি। প্রথম প্রস্তাবের সারমর্ম ছিল যে, ২১তম আর্মি গ্রুপের নেতা হিসাবে মন্টগোমারি যে অভিযান চালাইবেন, সেই অভিযানে সম্ভব মত সমস্ত সরবরাহ যোগান দিতে হইবে এবং মন্টগোমারির বাহিনী আর্নহেম (Arnhem) ও ডুসেলডর্ফের মধ্যে রাইন নদী পার হইয়া এবং উত্তর জার্মানীর সমতলভূমি দিয়া সোজা বার্লিনের দিকে আক্রমণ চালাইবে। আর সেই সঙ্গে জার্মানীর শ্রমশিল্পের প্রাণকেন্দ্র রুড় অঞ্চলও দখল করিয়া নিবে। বৃটিশ সেনানমণ্ডলীর নেতারা এবং স্বয়ং চার্চিল মন্টগোমারির প্রস্তাব জোরের সঙ্গে সমর্থন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বিকল্প প্রস্তাব ছিল এই যে, জেনারেল ব্রাড্‌লির নেতৃত্বের পরিচালিত ১২নং আর্মি গ্রুপকে যথাসম্ভব সমস্ত সরবরাহ দিতে হইবে এবং এই বাহিনীগুলি ফ্রাঙ্কফুর্টের করিডোরের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইবে এবং 'জার্মানীকে কোমরের দিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিবে' এবং যদি উচ্চতম সামরিক মহল ইচ্ছা করেন, তবে, মধ্য জার্মানীতে পৌঁছিয়া দক্ষিণ দিক থেকে বার্লিন দখল করিয়া নেওয়া হইবে।

অবশ্য প্রথম প্রস্তাবের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বাধা ছিল এন্টোয়ার্প—পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর, যে বন্দর তখনও অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। কিন্তু মন্টগোমারি সেই বাধা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে 'সর্বাত্মক' অভিযান চালাইতে চাহিলেন। রণপণ্ডিত ফুলারের মতে সামরিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়া মন্টগোমারির অভিমতই সঠিক ছিল এবং তাঁর বিশ্বাস ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁর (মন্টির)

পক্ষেই রায় দিবে। কারণ, লালফৌজের আগে যদি মিত্রবাহিনী বার্লিন দখল করিয়া নিতে পারেন, তবে, মহাযুদ্ধের শেষে রাজনৈতিক ফলাফলের দিক দিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষই অধিকতর শক্তিশালী হইতেন।

কিন্তু বৃটিশ সেনাপতি মণ্টগোমারির সঙ্গে সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ারের এই প্রশ্নে গুরুতর মতভেদ দেখা দিল এবং এই মতভেদ মহাযুদ্ধের অন্যতম বিতর্কিত প্রশ্নরূপে যুদ্ধের শেষেও রাজনৈতিক ও সামরিক মহলে দস্তুরমত বিতণ্ডার সৃষ্টি করিল। কারণ, আইজেনহাওয়ার 'ব্রড ফ্রণ্ট' কিংবা 'বিস্তৃত রণাঙ্গনের' পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মণ্টগোমারির মত একটি মাত্র আর্মির দ্বারা আঘাত হানিবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন না। সোজা কথায় Single thrust বা একটিমাত্র রণাঙ্গনের আঘাত ও Broad Front বা বহু রণাঙ্গনের আক্রমণ এই দুই মতবাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। কিন্তু মণ্টির মতে আইকের এই রণনীতির দ্বারা যুদ্ধ মৃদুগতি লড়াইতে পরিণত হইত, কোথাও শক্তির তীব্রতম সমাবেশ ঘটিত না এবং জার্মানরা সেই অবসরে পুনর্গঠনের সুযোগ পাইত এবং পরিণামে মিত্রপক্ষ দীর্ঘস্থায়ী শীতকালীন যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িত।

কিন্তু সুপ্রীম কমাণ্ডার হিসাবে আইজেনহাওয়ার Broad Front Policy বা বহু বিস্তৃত রণাঙ্গনের নীতির পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিলেন। মেজর জেনারেল ফুলার এজন্য আইজেনহাওয়ারকে 'ভীতু' ও 'ব্যক্তিত্বহীন' বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন।

'ব্রড ফ্রণ্ট পলিসি' হিসাবে আইজেনহাওয়ারের পরিকল্পনা ছিল সমগ্র মিত্রবাহিনী গোটা রাইন নদী বরাবর সমাবিষ্ট থাকিবে, যেখানে সম্ভব সেখানে সেতুমুখ স্থাপন করিবে এবং এণ্টোয়ার্প বন্দর দখল ও খোলা না-পর্যন্ত পূর্বদিকে আর অগ্রসর হইয়া যাইবে না। তবে, ইতিমধ্যে ভূমধ্যসাগরের দিক থেকে দক্ষিণ ফ্রান্স হইতে আগত ষষ্ঠ মার্কিন গ্রুপের সঙ্গে হাত মিলানো হইবে এবং উত্তরভাগের তীর থেকে সুইজারল্যাণ্ড পর্যন্ত দীর্ঘ ফ্রণ্টের সম্পূর্ণতা বিধান করা হইবে।

কিন্তু আইজেনহাওয়ারের এই নীতি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক 'টপ সিক্রেট' প্রণেতা র‍্যালফ ইঙ্গারসোল (Ralph Ingersoll) মেজর জেনারেল ফুলারের মতই সমালোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আইজেনহাওয়ার কোন শক্ত গোছের সেনাপতি ছিলেন না, 'তিনি ছিলেন মিলিটারি কনফারেন্সের একজন চতুর চেয়ারম্যান মাত্র!' ইংরাজ ঐতিহাসিক ব্যাসিল কোলিয়ার তাঁর মহাযুদ্ধে ইতিহাসে (পৃষ্ঠা ৪০৭) কিংবা মার্কিন লেখক জন টোল্যাণ্ডও আইজেনহাওয়ারকে সমর্থন করেন নাই। তিনি মণ্টগোমারির অভিমত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, মণ্টি চাহিয়াছিলেন মিত্রবাহিনীর সমস্ত শক্তি সংহত করিয়া রুঢ় অঞ্চলের ভিতর দিয়া উত্তর জার্মানীতে একটি প্রচণ্ড আঘাত হানিতে এবং সেই আঘাতের দ্বারা যুদ্ধ শেষ করিয়া ফেলিতে। 'কিন্তু সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার একজন মিলিটারি স্টেটসম্যান (সামরিক কুটনীতিক) ছিলেন বটে, কিন্তু কমাণ্ডার (রণক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ নায়ক) ছিলেন না।'

কিন্তু আসলে এই প্রশ্নটির সঙ্গে বৃটিশ ও মার্কিন প্রেস্টিজের প্রশ্নও জড়িত ছিল। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে গিয়া যদি বৃটিশ সেনাপতির কৃতিত্বই বেশী প্রমাণিত হইত, তবে মার্কিন মুল্লুকে আইজেনহাওয়ারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইত এবং বৃটিশের

সুনাম হইত কিংবা যদি মিত্রবাহিনীর সমগ্র সরবরাহ ও সহযোগিতা মণ্টগোমারির পিছনে দেওয়া সত্ত্বেও মণ্টি শেষ পর্যন্ত জার্মানীকে কাবু করিতে না পারিতেন, তবে, সুপ্রীম কমাণ্ডার হিসাবে আইজেনহাওয়ারের বুদ্ধি ও বিবেচনা তীব্র সমালোচনার বিষয় হইত।

সুতরাং আপোসরফা হিসাবে আইজেনহাওয়ার স্থির করিলেন যে, মণ্টগোমারি উত্তরদিকে তাঁর মূল আক্রমণ চালাইবেন এবং সরবরাহের অগ্রাধিকারও তিনি পাইবেন। আর ট্যাঙ্ক বিশারদ যোদ্ধা লেঃ জেনারেল প্যাটন তৃতীয় মার্কিন আর্মির সহযোগিতায় দক্ষিণদিকে 'সীমাবদ্ধ আক্রমণ' চালাইবেন। ফলে, মিত্রসৈন্যেরা পূর্বদিকে জার্মান সীমান্তের এক বিস্তৃত রণাঙ্গনে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত সরবরাহের অভাবে রুদ্ধগতি হইলেন। পরবর্তীকালে হিটলার এই অবস্থার পুরা সুযোগ নিলেন।[১]

* * *

আইজেনহাওয়ার মণ্টগোমারির রণনৈতিক বিরোধ সম্পর্কে আর-একজন বিখ্যাত বৃটিশ লেখকও আইকের উদ্দেশ্যে সমালোচনার ভঙ্গীতে লিখিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের সেই সময়টায় একজন দুঃসাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাপতির জবরদস্ত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ২৩শে আগস্ট, ১৯৪৪, যখন আইজেন-হাওয়ারের সঙ্গে মণ্টগোমারির সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হইল, তখন উভয়ের মধ্যে পরিষ্কার মতভেদ দেখা গেল। মণ্টগোমারি সোজাসুজিই বলিলেন :

'Administratively we have not the resources to maintain both Army Groups at full pressure. The only policy is to halt the right and strike with the left, or halt the left and strike with the right. We must decide on one thrust and pull all the maintenance to support that. If we split the maintenance and advance on a broad front we shall be so weak everywhere that we will have no chance of success.'

অর্থাৎ 'প্রশাসনের দিক থেকে আমাদের এত সম্পদ নাই যে, আমার পুরাপুরি দুইটি আর্মি গ্রুপকেই পূর্ণ রণক্রিয়ার প্রস্তুতিতে রাখিতে পারি। সুতরাং এই অবস্থায় একমাত্র নীতি হইতেছে দক্ষিণপার্শ্বকে বন্ধ রাখিয়া বামপার্শ্ব দিয়া আঘাত করা কিংবা বামপার্শ্বকে বন্ধ রাখিয়া দক্ষিণপার্শ্বকে আঘাত করা। আমাদের একটিমাত্র আঘাত বাছিয়া নিতে হইবে এবং সেই আঘাতের সমর্থনে সমস্ত সরবরাহ দিতে হইবে। যদি আমরা এই রক্ষণাবেক্ষণের সরবরাহ ভাগ করিয়া দেখি এবং চওড়া বা বিস্তৃত রণাঙ্গনে অগ্রসর হই, তবে, সমস্ত স্থানেই আমরা এত দুর্বল হইয়া পড়িব যে, কোন স্থানেই আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা থাকিবে না।'[২]

মণ্টগোমারি সেই সঙ্গে আরও বলিলেন যে, চারটি বাহিনীর (দুইটি আর্মি গ্রুপ) উপরেই তাঁর রণক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণভার থাকা উচিত। কিন্তু সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেন হাওয়ার তাঁর এই সমস্ত প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি বিস্তৃত রণাঙ্গনের নীতিতেই বিশ্বাসী এবং সেটাই অনুসরণ করিতে চান।

যদিও মণ্টগোমারির পরিকল্পনা অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ ছিল, তবু এর আসল

অর্থ ছিল এই যে, দ্বিতীয় বৃটিশ ও প্রথম মার্কিন আর্মি যখন রুড়ের দিকে অগ্রসর হইবে, তখন মার্কিন জেনারেল প্যাটনকে থামাইয়া রাখিতে হইবে এবং তাঁর তৃতীয় আর্মিকে পার্শ্বদেশ রক্ষার জন্য কেবল পাহারায় রাখিয়া দিতে হইবে। আইজেনহাওয়ার বলিলেন যে, সামরিক দিক থেকে এটা বাঞ্ছনীয় মনে হইতে পারে (যদিও নিজে তিনি এটা স্বীকার করেন না) কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে জেনারেল প্যাটনকে এভাবে থামাইয়া রাখা অসম্ভব। 'কারণ, মার্কিন জনমত কখনও এটা বরদাস্ত করিবে না এবং জনমতই যুদ্ধ জয় করে।'

মণ্টগোমারি এর জবাবে বলিলেন: 'Victories win wars. Give people victory and they won't care who won it.'

'বিজয়ের দ্বারাই যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে। যুদ্ধে বিজয় লাভ হইলে, কে জয়লাভ করিল, তা নিয়া লোকে মাথা ঘামায় না।'[১]

সুতরাং বুঝা যাইতেছে আইক ও মণ্টির মতামতের পিছনে মার্কিন ও বৃটিশ জনমতের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার প্রভাবও ছিল।

আর-একজন মার্কিন ঐতিহাসিক স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, আইজেনহাওয়ার অত্যন্ত সৎ, ন্যায়বান ও ভদ্র প্রকৃতির ছিলেন বটে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রশ্নের দ্বারা তিনি বিচলিত হইতেন। কারণ, পশ্চিম রণাঙ্গনে তিনি যে সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডার ছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিল আমেরিকান। সুতরাং এই অবস্থায় যদি তিনি বৃটিশ সেনাপতি মণ্টগোমারির প্রতি বেশী পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেন, তবে মার্কিন জনমত সেটা বরদাস্ত করিত না। বিশেষতঃ মণ্টগোমারিকে অধিকাংশ মার্কিন সেনানীবাহিনীর অফিসার ও জনমত পছন্দও করিতেন না। অপরদিকে মার্কিন সেনাপতি প্যাটনকে তাঁরা মণ্টগোমারির চেয়ে কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বা কম দক্ষ মনে করিতেন না। সুতরাং জার্মান সীমান্তে সার (Saar) অভিমুখে প্যাটনের অগ্রগতি বন্ধ রাখিয়া আইজেনহাওয়ার মণ্টগোমারিকে অধিকতর সুযোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এমন কি এই সমস্ত রণনৈতিক প্রশ্নে মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর বড়কর্তা জর্জ মার্শালও মার্কিন সংবাদপত্র ও মার্কিন কংগ্রেসের মতামতকে সমীহ করিয়া চলিতেন।[২]

কিন্তু রণনীতি ঘটিত এই সমস্ত তর্ক-বিতর্ক সত্ত্বেও বেলজিয়ম ও পশ্চিম হল্যাণ্ডে যে ৩।৪ লক্ষ জার্মান সৈন্য ছিল, তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ও তাদেরকে ঘায়েল করার জন্য 'অপারেশন মার্কেট গার্ডেন' নামে একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ রণ-পরিকল্পনা অনুসরণের চেষ্টা হইল। বৃটিশ ও মার্কিন বিমানবাহিনীর দ্বারা এই পরিকল্পনায় কার্যোদ্ধারের চেষ্টা হইল। আমেরিকানরা ইণ্ডহোভেন (Eindhoven) এবং নিজমেজেন (Nijmegen) দখল ও স্থানীয় অঞ্চলের মাস্ ও ওয়াল নদীগুলির ব্রীজ কাড়িয়া নিবে আর বৃটিশ বিমানবাহিনী আরও উত্তরে আর্নহেম (Arnhem) শহরে অবতরণ করিবে এবং দ্বিতীয় বৃটিশবাহিনী লেঃ জেনারেল ডেম্পসির অধীনে দক্ষিণ দিক থেকে আসিয়া এই সমস্ত বিমানবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হইবে এবং এভাবে জার্মানীতে প্রবেশের দরজা খুলিয়া যাইবে। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪, ২০ হাজার বিমানসৈন্য ইংলণ্ডের ঘাঁটি থেকে ১৫ শত ট্রান্সপোর্ট প্লেন ও ৪২৫টি গ্লাইডার দেশে

উড়িয়া আসিয়া হল্যাণ্ডে অবতরণ করিল। এটাই এবারের যুদ্ধের বৃহত্তম বিমান অভিযান বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। ওদিকে আমেরিকান বৈমানিকেরা নিজমেজেনে অবতরণ করিল এবং শত্রুপক্ষের হাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্রীজ রক্ষা করিল। বৃটিশ দ্বিতীয় বাহিনীও ওলন্দাজদের সীমান্ত পার হইয়া আসিয়া আমেরিকানদের সঙ্গে সহযোগিতা করিল।

এই পর্যন্ত মিত্রপক্ষের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিতই হইয়াছিল, কিন্তু গোল বাধিল আর্নহেম (Arnhem) দখল নিয়া। নিম্নবর্তী রাইন নদীর ১০ মাইল উত্তরে এই শহর দখলের চেষ্টা করিল ৮ হাজার বৃটিশ বিমানসৈন্য (যারা 'রেড ডেভিল' নামে পরিচিত ছিল লাল চিহ্নের জন্য) যারা ৯ দিন ৯ রাত্রি ধরিয়া জার্মানদের সঙ্গে জীবন-পণ লড়াই করিয়াছিল। কথা ছিল স্থলপথে জেনারেল ডেম্পসির পদাতিক সৈন্যেরা আসিয়া এদের সঙ্গে যোগ দিবে। কিন্তু জার্মানরা এমন প্রচণ্ড শক্তি দিয়া এদেরকে বাধা দিল যে, মাত্র দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য আগাইয়া যাইতে পারিয়াছিল। ফলে, আর্নহেমের যুদ্ধ নরককুণ্ডে পরিণত হইল এবং বৃটিশ বিমানসৈন্যেরা মারাত্মকরূপে ঘায়েল হইল। অত্যন্ত কদর্য ও প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বিমানযোগে এদেরকে সরবরাহ দেওয়াও সম্ভব ছিল না। মোট ৮ হাজার বিমানসৈন্যের মধ্যে কোন মতে দুই হাজার সৈন্য ত্রাণ পাইয়াছিল।

পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ (যেমন লুই স্নাইডার) আর্নহেমের এই যুদ্ধকে 'বিপর্যয়' বলিয়া বর্ণনা করিলেও মেজর জেনারেল ফুলার মণ্টগোমারির এই অভিযানকে 'সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর', এমন কি ঐতিহাসিক এল আলামিনের চেয়েও কৃতিত্বপূর্ণ 'মহা ব্যর্থতা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন! কারণ, এই অভিযানের উদ্যোক্তা ছিলেন মণ্টগোমারি, যাঁর সৈনাপত্য ও পরিকল্পনা অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ ছিল এবং ফুলারের মতে আর্নহেমের এই যুদ্ধ সাফল্যমণ্ডিত হইলে উত্তর জার্মানীর সমতলভূমি মিত্রবাহিনীর নিকট উন্মুক্ত হইয়া যাইত।[১]

এদিকে ৫ই সেপ্টেম্বর মণ্টগোমারি এণ্টোয়ার্পে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দীর্ঘ ৯ সপ্তাহ তাঁকে অপেক্ষা করিতে হইল শেল্ড নদীর মোহনা খোলার এবং জাহাজের যাতায়াতের জন্য। কারণ, এণ্টোয়ার্পের এই বিখ্যাত বন্দরের অভাবে মিত্রপক্ষের নরম্যাণ্ডি বা শেরবুর্গ বন্দর থেকে ট্রাকযোগে ৩।৪ শত মাইল পার হইয়া সরবরাহ আনিতে হইত। এণ্টোয়ার্প বন্দর খোলার এই বিলম্বের জন্য মার্কিন জেনারেল ওমর ব্রাডলি মণ্টির বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ বক্র কটাক্ষে বলিয়াছেন যে, এই বিলম্বের জন্য মিত্রপক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল।[২]

স্ফীতিমুখের যুদ্ধ

অবশেষে একটা অঘটন ঘটলো। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ১৬ই ডিসেম্বর অতি অকস্মাৎ পশ্চিম দিকের আর্দেনেস অঞ্চলে হিটলার এক দুর্দান্ত পালটা আক্রমণ শুরু করিলেন, যেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে 'ব্যাটল অব দি বালজ' বা স্ফীতিমুখের

১। জে. এফ. সি. ফুলার, পৃষ্ঠা ৩৪২।
২। ওমর ব্রাডলি, পৃষ্ঠা ৪১৭।

যুদ্ধ নামে পরিচিত। অথচ তখন নাৎসী জার্মানী ক্রমশঃ অন্তিম দশার দিকে ঢলিয়া পড়িতেছিল। কারণ, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পশ্চিম দিকে, সোভিয়েত বাহিনী পূর্বদিকে এবং মিত্রপক্ষীয় বাহিনী দক্ষিণে ইতালী থেকে জার্মানীকে ক্রমশঃ ঘিরিয়া ধরিতেছিল। তথাপি হিটলার তাঁর শেষ জুয়ার বাজি ধরার মত পশ্চিম দিকে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে একটা চূড়ান্ত আঘাতের জন্য মরিয়া হইয়া উঠিলেন। যদিও ২৪শে অক্টোবর ঘোরতর যুদ্ধের পর প্রথম জার্মান নগরী কিংবা পুরানো ইম্পিরিয়েল শহর আকেন (সম্রাট শার্লমানের রাজধানী) মিত্রপক্ষের দখলে গিয়াছিল, তবু মার্কিনবাহিনী জার্মানব্যূহ ভেদ করিয়া রাইন নদী তখনও পার হইতে পারেন নাই। কিন্তু পশ্চিম সীমান্তে জার্মান শক্তি একেবারে নড়বড়ে হইয়া গিয়াছিল এবং তথাকথিত দুর্ভেদ্য 'পশ্চিম প্রাচীর' বা সিগফ্রিড লাইন দুর্ভেদ্যও ছিল না, এমন কি সুরক্ষিতও ছিল না। তথাপি হিটলার অত্যন্ত গোপনে এবং তাঁর অধিকাংশ সেনাপতিদের অজ্ঞাতসারে পালটা আক্রমণের এক দুঃসাহসিক প্ল্যান করিলেন। আর্দানেসের যে পাহাড় জঙ্গল অঞ্চল পশ্চিমদিকে জার্মান রণনীতিবিদদের নিকট মৃগয়ার ক্ষেত্রের মত ছিল, এবারও সেই দিকটার উপরেই হিটলারের নজর পড়িল। কেননা, এখানে মন্সচাউ (Monschau) থেকে এক্টারন্যাচ (Echternach) ধরিয়া ৭০ মাইল পর্যন্ত খণ্ড রণাঙ্গনে বা সেক্টরে মিত্রবাহিনীর সমাবেশ খুব পাতলা বা দুর্বল ছিল। এখান দিয়া পালটা আক্রমণপূর্বক মিত্রবাহিনীর ব্যূহ ভেদ করিয়া হিটলারী বাহিনী দুর্বার বেগে আগাইয়া যাইবে। তখন নিদারুণ শীতকাল, সুতরাং মিত্রপক্ষের বিমান আকাশে উড়িতে পারিবে না। অতএব জার্মানবাহিনী সেই সুযোগে খোলা সমতলভূমি দিয়া অগ্রসর হইবে—নামুর ও লীজ দুর্গের মধ্যে মিউজ নদীর ব্রীজগুলি দখল করিয়া নিয়া এবং ব্রুসেলসের (বেলজিয়মের রাজধানী) পাশ কাটাইয়া এণ্টোয়ার্প পর্যন্ত দখল করিয়া নিবে এবং সমগ্র যুদ্ধের মোড় ফিরিয়া যাইবে!

এত বিপর্যয় ও ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও হিটলারের দুঃসাহস ও মানসিক শক্তির কিন্তু কমতি ঘটে নাই, এটাই আশ্চর্য! ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে তিনমাসকাল মিত্রপক্ষ উপযুক্ত সরবরাহের অভাবে জার্মানীর অভ্যন্তরে ঢুকিতে পারেন নাই, সেই সময়টা হিটলার গোপনে একটা প্ল্যান স্থির করিলেন এবং ১১-১২ ডিসেম্বর ফ্রাঙ্কফুর্টের নিকট জিয়েগেনবার্গের ভূগর্ভে হিটলার তাঁর সদর দপ্তরে সেনাপতিদের একটা বৈঠক ডাকিলেন। ২০শে জুলাই তাঁকে বোমার দ্বারা হত্যার যে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল (যে ঘটনায় তিনি দৈবযোগে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন), তারপর থেকে তিনি আরও সাবধান হইয়াছিলেন এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থার এমন কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছিল যে, তাঁর উচ্চতম সেনাপতিরাও আর আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নিয়া তাঁর ভূগর্ভের সদর দপ্তরে যোগ দিতে পারিতেন না। (এমন কি কোন আহার্যও তিনি বিষক্রিয়ার ভয়ে অপরকে দিয়া পরীক্ষা না করাইয়া গ্রহণ করিতেন না।) কিন্তু সেই ভয়াবহ ঘটনার পর হইতে হিটলারের যে 'দৈহিক পতন' ঘটিয়াছিল (যেমন হাত-পা কাঁপিত, মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁকে অত্যন্ত রুগ্ন বা মুমূর্ষু রোগীর মত দেখাইত) সেটা আর কাহারও কাছ থেকে লুকানো সম্ভব ছিল না। বলা বাহুল্য যে পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেড, জেনারেল ব্লুমেনট্রিট, ফিল্ড মার্শাল মডেল জেনারেল ম্যানটুয়েফেল (Manteuffel) এস. এস. জেনারেল

ডায়েট্রিক (Dietribh) প্রভৃতি সেনানীবৃন্দ এই সময় এই ধরনের পালটা-আক্রমণের পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ, তাঁরা বুঝাইতে চাহিলেন যে, জার্মানবাহিনীর সেই আগেকার শক্তি আর নাই, উপরন্তু পশ্চিমে মিত্রবাহিনীর সামরিক শক্তি তুলনায় অনেক বেশী। পূর্ব রণাঙ্গনের সেনানীমণ্ডলীর প্রধান জেনারেল গুডেরিয়ান যখন হিটলারকে আসন্ন সোভিয়েত আক্রমণের গুরুত্ব বুঝাইতে চাহিলেন, তখন হিটলার অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় তাঁকে জবাব দিলেন যে, তিনি ক্লাউসেভিৎস থেকে মলট্‌কে কিংবা শ্লিয়েফেন পর্যন্ত অনেক মিলিটারী শাস্ত্র পড়িয়াছেন এবং পাঁচ বছর ধরিয়া জার্মানবাহিনীকে রণক্ষেত্রে পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, অতএব যুদ্ধবিদ্যা তাঁকে আর বুঝাইতে হইবে না।[১]

অধিকন্তু হিটলার সমবেত সেনাপতিবৃন্দকে 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ' এক রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়া বুঝাইতে চাহিলেন যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ যে ধরনের কোয়ালিশন গঠন করিয়াছে, ইতিহাসে তেমন কোন বিচিত্র পাঁচমেশালি কোয়ালিশন টিকে নাই। উগ্র ক্যাপিটালিস্ট থেকে উগ্র মার্কসবাদী এবং সেই সঙ্গে একটা মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদী (অর্থাৎ আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া ও বৃটেন)—এমন অদ্ভূত কোয়ালিশন হঠাৎ একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িবেই। এবং 'জার্মানী কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না—কখনও না, কখনও না!'[২]

সুতরাং সেনাপতিদের আপত্তি এবং সংশয় সত্ত্বেও ফুরার তাঁর পালটা আক্রমণের সংকল্পে অটল রহিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, সর্বপ্রকার বিপদের ঝুঁকি এবং মিত্রবাহিনী কর্তৃক রুড় অঞ্চলের দিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমি দখলের সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিনি এই আক্রমণ চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেননা, এর দ্বারা দ্বিতীয় ডানকার্কের সৃষ্টি হইতে পারে এবং যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ পালটা আক্রমণ চালাইবার জন্য উপযুক্তসংখ্যক সৈন্যবল কোথা থেকে পাওয়া যাইবে ? অতএই ফুরারের নির্দেশে স্কুল-কলেজ-অফিস-কলকারখানা ইত্যাদি ঝাঁটাইয়া ১৫ থেকে ১৮ বছরের বালক এবং ৫০ থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধদিগকে পর্যন্ত রিক্রুট করা হইল—এভাবে ৫ লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইল। কিন্তু এর ফলে অস্ত্র নির্মাণের ও সমরসম্ভার উৎপাদনের কারখানাগুলিতে দক্ষ শ্রমিকের অভাব ঘটিল। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী আলবার্ট স্পীর (Albert Speer) এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন অফিসে ও কারখানগুলিতে পুরুষদের শূন্যস্থানে মেয়েদের গ্রহণ করা হোক।

* * *

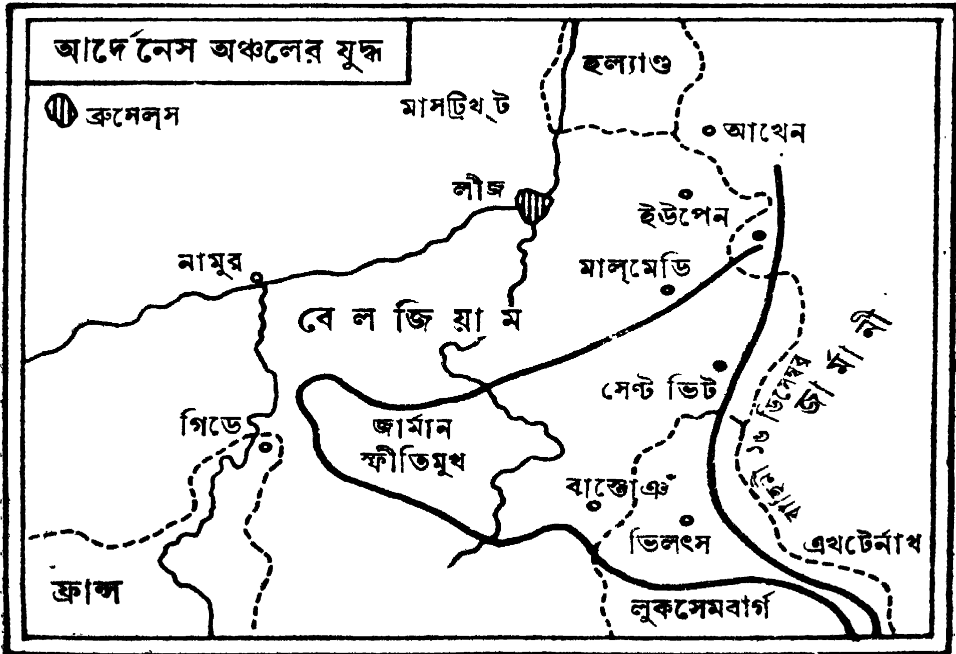
মিত্রবাহিনীর মধ্যভাগে এবং উত্তরাংশে প্রচণ্ডতম আক্রমণের পরিকল্পনা হইল এবং এই মূল আক্রমণের পার্শ্বদেশ রক্ষা করিয়া চলিবে আর একদল জার্মানসৈন্য উত্তর লাক্সেমবুর্গ ও দক্ষিণ-পূর্ব বেলজিয়মের ভিতর দিয়া। এই সমস্ত আক্রমণে ২০ থেকে ২৫ ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করা হইবে।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪ পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল রুণ্ডস্টেড এক নির্দেশনামায় জার্মানবাহিনীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেন—'প্রত্যেকটি সৈন্যের

১। উইলিয়াম শাইরার, পৃষ্ঠা ১২৯৬।
২। ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ১২৯৭।

কর্তব্য হইতেছে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া জার্মানীর পবিত্র ভূমিকে রক্ষা করা। কোন সৈন্য জীবিত থাকা পর্যন্ত জার্মানীর এক ইঞ্চি জমিও যেন ছাড়িয়া দেওয়া না হয়। লড়াই না করিয়া যদি কেহ পশ্চাদপসরণ করে, তবে, তাকে দেশদ্রোহী বলিয়া গণ্য করা হইবে।'…

ফিল্ড-মার্শাল গোয়েরিং এই যুদ্ধের জন্য ৩ হাজার প্লেনের প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু আগের মতই এই প্রতিশ্রুতি ধাপ্পায় পরিণত হইল। কেননা, তিনি হাজার খানেক জঙ্গী বিমানও দিতে পারিয়াছিলেন কিনা, সন্দেহ। হিটলার আর-একজন ধুরন্ধরকে এই পালটা আক্রমণে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইলেন। ইনি হইতেছেন এস. এস. কর্নেল অটো স্কোরজেনি—পাঠকবর্গের স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, এই ধুরন্ধর ব্যক্তি উত্তর ইতালীর পার্বত্য বন্দীনিবাস থেকে মুসোলিনীকে অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। এবার সেই দুঃসাহসিক স্কোরজেনিকে এবং তাঁর দলবলকে আমেরিকান সৈন্যদের ছদ্মবেশে মার্কিন লাইনের পিছনে মিত্রপক্ষীয় নেতাদেরকে হত্যা, সাবোতাজ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য নিয়োগ করা হইল। এই বিষয়ে স্কোরজেনি কিছুটা সাফল্যও অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ সহকর্মীই ধরা পড়িয়া আমেরিকানদের হাতে খতম হইয়াছিল। স্কোরজেনিও ধরা পড়িয়াছিলেন, তবে, শেষ পর্যন্ত কপালগুণে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।…



১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৪ ভোরবেলা রুণ্ডস্টেড আড়াই লক্ষ জার্মান সৈন্য, ১ হাজার ট্যাঙ্ক ও প্রচুর যানবাহনসহ অতি অকস্মাৎ আর্দেনেস অঞ্চলের ৭০ মাইল ফ্রণ্টে মেন্সচাও

এবং একটারনাচের মধ্যে) প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণের দ্বারা এক দুর্দান্ত আক্রমণের উদ্বোধন করিলেন। এই সমস্ত আক্রমণকারী বাহিনীর মধ্যে অন্ততঃ কয়েক ডিভিসন দক্ষ ও পাকা যান্ত্রিক সৈন্য ছিল। মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার মন্তব্য করিয়াছেন যে, একমাত্র পার্লহারবার আক্রমণের বিস্ময়ের সঙ্গেই আর্দেনেসের এই আকস্মিক আক্রমণে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। নিদারুণ ঠাণ্ডা, কুয়াশা, বরফ এবং অত্যন্ত খারাপ রাস্তাঘাট সত্ত্বেও ফন্ রুনডস্টেডের এই ভয়ংকর আক্রমণ মিত্রবাহিনীর মধ্যস্থল বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল—জার্মানরা অগ্রগতি লাভ করিল এবং ৪৫ মাইল দীর্ঘ ও ৬৫ মাইল গভীর এক বিরাট ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইল। মিত্রপক্ষ এজন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তাঁরা যেন কতকটা বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফন রুণ্ডস্টেড প্রায় সম্পূর্ণ ব্যূহভেদের সাফল্যের কিনারায় আসিয়া পেঁছিয়াছিলেন।···

কিন্তু রুণ্ডস্টেডের কপাল মন্দ। মধ্য রণাঙ্গনে বাস্তোন (Bastogne) শহর নিয়া জার্মানদের অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন দেখা দিল। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সড়কের মোড় এই শহরে। মার্কিনবাহিনী এখান থেকে পালটা ট্যাংক আক্রমণ চালাইলেন। আর ফন রুন্ডস্টেড উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়া সাঁড়াশীর চাপ দিতে চাহিলেন। কিন্তু আমেরিকার বাঘা বাঘা ট্যাংকগুলি সড়কে, মাঠে ও অরণ্যের ধারে জার্মান সৈন্যদেরকে যেন হিংস্র থাবা মারিতে লাগিল। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্য মিত্রপক্ষের প্লেন আকাশে উড়িতে পারিতেছিল না। এজন্য জার্মানদের সুবিধাই হইয়াছিল। তিন দিন যুদ্ধের পর ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪, সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ার 'বিচক্ষণ সেনাপতির মত' অত্যন্ত দ্রুত ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারিকে আর্দেনেস স্ফীতিমুখের উত্তর দিকে সমগ্র মিত্রবাহিনীর প্রধান নায়কের এবং লেঃ জেনারেল ওমর ব্রাডলিকে দক্ষিণ দিকের সমস্ত মিত্রসৈন্যের প্রধান কমাণ্ডার পদের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

বলা বাহুল্য যে আক্রান্ত মিত্রপক্ষ বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন এবং মার্কিন-বাহিনী প্রাণপণ শক্তিতে লড়িতে লাগিলেন। কেননা, তাঁরা জানিতেন যে, যদি এখানে তাঁদের পরাজয় বরণ করিতে হয়, তবে, সমগ্র আর্দেনেস অঞ্চল শত্রুর দখলে চলিয়া যাইবে। সুতরাং প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য ঠাণ্ডা ও বরফের মধ্যে মার্কিন সৈন্যদের রক্ত ঝরিতে লাগিল। তথাপি তাঁরা পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই গুরুতর পরিস্থিতির সময় শত্রুপক্ষের দুইজন অফিসার সাদা পতাকা উড়াইয়া বাস্তোন শহরে আসিলেন এবং স্থানীয় মার্কিনবাহিনীর সেনাপতির নিকট আসিয়া 'আত্মসমর্পণ' দাবী করিলেন। মার্কিন সেনাপতি উত্তরে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করিলেন—'Nuts'! জার্মান অফিসারদ্বয় এই শব্দটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এর ব্যাখ্যা চাহিলেন। তখন মার্কিনবাহিনীর কর্নেল হারপার জবাব দিলেন, 'যদি তোমরা "নাটস্" শব্দটার অর্থ না বুঝে থাকো, তবে, এর সোজা ইংরাজী হচ্ছে—'গো টু হেল্' অর্থাৎ তোমরা গোল্লায় যাও।'

জার্মান অফিসারদ্বয় এই তুড়ুক জবাব শুনিয়া ফিরিয়া গেলেন বটে; কিন্তু শাসাইয়া গেলেন যে,—'এটা হচ্ছে যুদ্ধ, অনেক আমেরিকানের প্রাণ যাবে!'

বাস্তোন শহরের স্কোয়ারে আজও এই ঘটনাটির একটি স্মৃতিফলক রহিয়াছে।[১]

১। লুই স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৪৮৬।

* * *

ইতিমধ্যে ২৫শে ডিসেম্বর আবহাওয়া পরিষ্কার হইয়া গেল। সুতরাং মিত্রপক্ষের বিমান বহর, যেগুলি এতদিন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল, সেগুলি শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া উঠিল। মিত্রপক্ষীয় ৫ হাজার বিমান এবং অজস্র কামান জার্মান রণাঙ্গন ও স্ফীতিমুখের দুই পার্শ্ব ধরিয়া বোমা ও গোলা বর্ষণের দ্বারা বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করিতে লাগিল। ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেড তখন বুঝিতে পারিলেন যে, আর জয়ের আশা নাই। সুতরাং তিনি পিছু হটিতে বাধ্য হইলেন। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে বিখ্যাত আর্দেনেস অঞ্চলের স্ফীতিমুখের যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু মিত্রপক্ষ ও জার্মানী, উভয়েরই এই নিদারুণ যুদ্ধে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হইল। হতাহত, বন্দী ও নিখোঁজ নিয়া জার্মানদের নষ্ট হইল ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য, ৬০০ ট্যাঙ্ক ও ১৬০০ বিমান। আর হতাহত ও নিখোঁজসহ ৭৬,৮৯৩ জন মার্কিন সৈন্য নষ্ট হইল।

এই বেপরোয়া হিটলারী আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর জার্মান সামরিক শক্তির আরও অবনতি ঘটিল এবং যদিও মার্কিন পক্ষকেও অনেক রক্তের মূল্য দিতে হইয়াছে, তবু চার্চিলের মতে—

'The Battle of the Bulge was the greatest American battle of the war.'

অর্থাৎ স্ফীতিমুখের যুদ্ধে এই এবারের মহাযুদ্ধে আমেরিকানদের পক্ষে বৃহত্তম যুদ্ধ ছিল।[১]

* * *

কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনের এই স্ফীতিমুখের যুদ্ধ এত গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল কেন? এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, অর্দেনেস অঞ্চলের ৮০ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের মাত্র চারটি ডিভিসন ছিল। রণপণ্ডিত লিডেল হার্ট লিখিয়াছেন যে, হিটলার এখানেই মারাত্মক পালটা আঘাত হানিলেন এবং মিত্রপক্ষকে হতবাক, এমন কি বিমূঢ় করিয়া দিলেন। কিন্তু মিত্রপক্ষ এত অবাক হয়েছিলেন কেন? এর জবাব লিডেল হার্ট নিজেই দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষ আর্দেনেস অঞ্চলে এই প্রকার হিটলারী প্রত্যাক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের প্রদত্ত সংবাদে অবস্থাটা খুব পরিষ্কার বুঝা যাইতেছিল না। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁরা যখন নরম্যাণ্ডিতে অবতরণের পর থেকে ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছেন, তখন জার্মানবাহিনীর পক্ষে সাধ্য নাই কোন পালটা আঘাত হানার। তৃতীয়তঃ 'আক্রমণই আত্মরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়' এই নীতির উপর তাঁরা অন্ধের মত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন এবং চতুর্থতঃ তাঁরা ভাবিয়াছিলেন যে, যদি আদৌ জার্মান পক্ষ কোন আক্রমণ করে, তবে, সেটা ঘটিবে কলোন্ বা রুড়ের শিল্পাঞ্চলের দিকে, যেদিকে তাঁরা নিজেরা অগ্রসর হইয়া যাইতেছেন। পঞ্চমতঃ ৭০ বছরের বৃদ্ধ ফিল্ড-মার্শাল রুণ্ডস্টেডকে পুনরায় ডাকিয়া আনিয়া পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করায় মিত্রপক্ষ জার্মানীর কোন প্রত্যাক্রমন সম্ভাবনাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু আসলে রুণ্ডস্টেড নামে-মাত্র প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি হিটলারের এই পরিকল্পনার সঙ্গে আদৌ একমত ছিলেন না এবং হিটলার এই

১। লুই স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৪৮৭।

বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কোন পরামর্শও করেন নাই। সুতরাং এই পালটা আক্রমণের যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে না রাখিয়া সহকারী সেনাপতিদের উপর অর্পণ করিলেন।

লিডেল হার্ট আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে হিটলারের এই পরিকল্পনা অত্যন্ত "ব্রিলিয়াণ্ট' বা প্রখর বুদ্ধির পরিচায়ক ছিল এবং এর সাফল্যও খুব উজ্জ্বল হইতে পারিত, যদি তাঁর উপযুক্ত সমর-সম্ভার ও সৈন্যশক্তি থাকিত। মিত্রপক্ষের অবস্থা প্রায় বিপর্যয়ের কিনারায় পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু 'আক্রমণই আত্মরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট নীতি' এই তত্ত্বের উপর হিটলারও অত্যধিক বিশ্বাস রাখায় তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।[১]

ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের আবেদন রক্ষায় স্ট্যালিন

১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত ছিল বটে, কিন্তু ডিসেম্বর মাসে থেকে এই অগ্রগতি বন্ধ হইয়া গেল। মিত্রপক্ষ রাইন নদী অতিক্রম করিতে কিংবা সিগফ্রিড লাইন দখল করিতে পারিলেন না—জার্মানীর বাধা দান ও পালটা-আক্রমণের ফলে মিত্রবাহিনী আত্মরক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে বাধ্য হইল। ইতালীতেও মিত্রপক্ষ পো-নদীর উপত্যকায় কদর্য আবহাওয়া, ঠাণ্ডা ও বন্যার জন্য আটকা পড়িয়া গেল। সুতরাং কোন রণাঙ্গনেই ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের অবস্থা সুখকর ছিল না। বরং একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদয় হইল। এই অবস্থায় মিত্রপক্ষের তরফ থেকে সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট আবেদন জানাইতে হইল পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর চাপ হ্রাস করার জন্য।

কিন্তু তখন নাৎসীবাহিনীর অবস্থান ও সৈন্য সংখ্যা কিরূপ ছিল? সোভিয়েতের সূত্রে প্রকাশ যে, ১৯৪৫ সালের আরম্ভে জার্মানীর মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ ডিভিসন এবং ৩২টি ব্রিগেড। এর মধ্যে ১৮৫ ডিভিসন ও ২১ ব্রিগেড ছিল সোভিয়েত জার্মান ফ্রণ্টে, আর ১০৮ ডিভিসন ও ৭ ব্রিগেড ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে ও ইতালীতে। আরও ৩১ ডিভিসন ও ৪ ব্রিগেড ছিল অধিকৃত দেশগুলিতে সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য।[২]

বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকার উইলমটের প্রদত্ত হিসাবের ('স্ট্রাগল ফর ইউরোপ' গ্রন্থে) সঙ্গে উপরে প্রদত্ত হিসাবের সামান্য গরমিল আছে। যেমন, তাঁর হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমী মিত্রপক্ষ ১৯৪৪ সালের শেষভাগে মোট ১০০ ডিভিসন জার্মান সৈন্যের সঙ্গে রণলিপ্ত ছিল—এর মধ্যে ৭৬ ডিভিসন পশ্চিম রণাঙ্গনে এবং ২৪ ডিভিসন ইতালীতে ছিল। আর সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনে ছিল ১৩৩ ডিভিসন জার্মান সৈন্য।...[৩]

মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিমী মিত্রপক্ষের নিকট বারবার আবেদন জানাইয়াছিলেন ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার দ্বারা পূর্ব রণাঙ্গনে

১। লিডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৪৩ এবং ৬৫৯।
২। দি এ্যাণ্টি-হিটলার কোয়ালিশন, ভিক্টর ইস্রায়েলজান, মস্কো, পৃষ্ঠা ৩২৫
৩। হার্বার্ট ফীজ পৃষ্ঠা ৪৭৮।

জার্মানীর সামরিক চাপ হ্রাস করার জন্য। কিন্তু এবার ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া গেল। এবার মার্কিন ও বৃটিশ গভর্নমেন্টই বাধ্য হইলেন সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট আবেদন জানাইতে—পশ্চিম রণাঙ্গনে তাঁদের প্রস্তাবিত আক্রমণের বিরুদ্ধে জার্মানী চাপ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে লালফৌজ কর্তৃক নূতন অভিযান সংগঠনের জন্য।

পশ্চিম রণাঙ্গনের মিত্রপক্ষীয় সুপ্রীম কমাণ্ডার স্বভাবতই জার্মানীর পালটা-আক্রমণের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ২১ ডিসেম্বর তিনি তাঁর সেনানী-মণ্ডলীর প্রধানকে এক চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহিলেন যে, এই মাসে অথবা আগামী মাসে সোভিয়েত রাশিয়া কোন বৃহৎ অভিযান চালাইতে রাজী আছেন কি না? 'এই তথ্য জানিতে পারা আমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বব্যঞ্জক; কেননা, আমিও সেই অবস্থায় সোভিয়েত অভিযানের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া আমার পরিকল্পনা তৈয়ার করিতে পারি। এই সামঞ্জস্য বিধান করার পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব কিনা?'

এই দুই দিন পর ২৩শে ডিসেম্বর স্বয়ং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট স্ট্যালিনের নিকট এক বার্তা পাঠাইয়া জানাইলেন যে, আইজেনহাওয়ার নয়, তিনি নিজেই পশ্চিম ও পূর্ব রণাঙ্গনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব কিনা, সেকথা জানিতে চান এবং এজন্য মস্কোতে একজন পদস্থ প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য আইজেনহাওয়ারকে নির্দেশ দিতে চান। 'জরুরী অবস্থার জন্য' তিনি সত্বর জবাব প্রত্যাশা করেন। অনুরূপ বার্তা প্রধানমন্ত্রী চার্চিলও স্ট্যালিনের নিকট পাঠাইলেন এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের বিপদের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেন।

আর্দেনেস অঞ্চলে জার্মানদের পালটা-আক্রমণের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী অত্যন্ত বেকায়দায় পড়িয়াছিল এবং বৃটেনের সামনে 'দ্বিতীয় ডানকার্কের' আশংকা দেখা দিয়াছিল। অই অবস্থায় সোভিয়েত সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইয়া চার্চিল ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৫, মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট নিম্নলিখিত তারাবার্তা পাঠাইয়াছিলেন:

'The batile in the west is very heavy and, at anytime, large decisions may be called for from the Supreme Command. You know yourself···how very anxious the position is when a very broad front has to be defended after temporary loss of the initiative. It is Genreal Eisenhower's great desire and need to know in out line what you plan to do···(can we) count on a major offensive on the Vistula front, or elsewhere, during Januarp ?···I regard the matter as urgent ?—(চার্চিল, ষষ্ঠ পর্ব, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

চার্চিলের এই জরুরী তারাবর্তার জবাবে মার্শাল স্ট্যালিনও কালবিলম্ব না করিয়া ত্বরিত জবাব দিলেন এবং মস্কোতে আগত বৃটিশ ও মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা করিলেন।

স্ট্যালিনের বক্তব্য এই ছিল যে, 'জার্মানীর বিরুদ্ধে একটি আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। কিন্তু আবহাওয়ার জন্য বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু এই খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাদের মিত্রদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা আমাদের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়াছি। ইতিমধ্যে আবহাওয়ার

অবস্থা যাই হোক না কেন, জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় অর্ধেকের মধ্যে সমগ্র মধ্য রণাঙ্গন ব্যাপিয়া এক প্রকাণ্ড আক্রমণাত্মক রণক্রিয়া শুরু করিব।'

চার্চিল জবাবে জানাইলেন, 'আপনার এই উৎসাহদীপ্ত বার্তার জন্য আমি গভীর-ভাবে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।'[১]

আইজেনহাওয়ারের পক্ষ থেকে এয়ার চীফ মার্শাল টেডার যখন মস্কোতে স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে জার্মানীর চাপ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত সোভিয়েত অভিযানের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, তখন স্ট্যালিন যে জবাব দিয়াছিলেন, তা নিশ্চয়ই স্মরণীয়:

'We have on treaty but we are comrades. It is proper and also sound selfish policy that we should help each other in times of difficulty. It would be foolish of me to stand aside and let the Germans annihilate you ; they would only turn back on me when you were disposed of. Similarly, it is to your interest to do every-thing possible to keep the Germans from annihilating me.'

সহজ কথায়—আমাদের দুই পক্ষের মধ্যে কোন সন্ধিচুক্তি নাই। কিন্তু আমরা কমরেড। আমাদের পরস্পরের বিপদের সময় আমরা পরস্পরকে সাহায্য করিব। এটাই সর্বোৎকৃষ্ট স্বার্থবান নীতি। কিন্তু আপনাদের বিপদের সময় আমি যদি দূরে সরিয়া থাকি, তবে, আমার পক্ষে সেটা বোকামির চূড়ান্ত হইবে। কারণ, জার্মানী কর্তৃক আপনাদেরকে সংহার করার সুযোগ যদি আমি দেই, তাহলে আপনারা শেষ হইয়া যাওয়ার পর শত্রু আমাকে সংহার করিবে। অনুরূপভাবে আপনাদেরও উচিত সর্বপ্রকারে আমাকে সাহায্য করা, যাতে জার্মানরা আমাকে সংহার করিতে না পারে।[২]

স্ট্যালিন মিত্রপক্ষকে আরও আশ্বাস দিলেন, যে সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ এমন-ভাবে পুরোপুরি আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইয়া যাইবেন যাতে জার্মানী পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে কোন সৈন্য সরাইয়া নিতে না পারে।

মার্শাল স্ট্যালিনের কাছ থেকে এই আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর জেনারেল আইজেনহাওয়ার এবং সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর কর্তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্শাল স্ট্যালিন পশ্চিমের মিত্রপক্ষের প্রতি কিভাবে তাঁদের দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য পালন করিয়াছেন এবং প্রাকৃতিক বিঘ্ন সত্ত্বেও ১২ই জানুয়ারী ১৯৪৫, ১৫০ ডিভিসন সৈন্যসহ বাল্টিক থেকে কৃষ্ণ সাগরের তীর পর্যন্ত আক্রমণাত্মক অভিযানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই ঘটনা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভেই লালফৌজ মধ্য-পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া ২০০ মাইল আগাইয়া গেল, আবার সাইলেশিয়ার অভ্যন্তরে ঢুকিল এবং বার্লিনের ১০০ মাইলের মধ্যে পেঁছিল।...

পশ্চিম রণাঙ্গনে নাৎসী পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল এবং হিটলার ব্যস্ত-সমস্ত-

১। চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৪।
২। হার্বার্ট ফীজ, পৃষ্ঠা ৪৮২।

হইয়া পশ্চিম থেকে জার্মান সৈন্যদের একটা বৃহৎ অংশকে পূর্ব রণাঙ্গনের দিকে পাঠাইয়া দিলেন।...

জার্মানীর বিরুদ্ধে বোমারু অভিযান

কিন্তু এই অধ্যায় শেষ করার আগে উপসংহারে উল্লেখ করা দরকার যে, স্থলপথে বা পশ্চিম ইউরোপে ১৯৪৪ সালের জুন মাসের আগে মিত্রপক্ষ দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে ব্যর্থ হওয়ার সোভিয়েত রাশিয়াকে ভরসা দিয়াছিলেন যে, এই ব্যর্থতার 'ক্ষতিপূরণ' স্বারা তাঁরা জার্মানীর উপর সরাসরি প্রচণ্ড বোমারু অভিযান চালাইবেন। অবশ্য এই প্রস্তাবের আগেই ১৯৪২ সালের ২০শে মে রাত্রিবেলা বৃটিশ বিমানবাহিনীর এক হাজারেরও বেশী বিমান ৯০ মিনিট ধরিয়া কলোন শহরের উপর ২ হাজার টন বোমা নিক্ষেপ করিল; তিন দিন পর এসেন শহরে যেখানে ক্রুপসের বিখ্যাত গোলাগুলির কারখানা সেই শ্রমশিল্প অঞ্চলেও অনুরূপ ব্যাপক বোমারু আক্রমণ ঘটিল। কিন্তু ১৯৪২-এ ছিল বোমারু অভিযানের সূত্রপাত মাত্র, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে এই অভিযান দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হইতে লাগিল। জার্মানীর সমস্ত শ্রমশিল্প কারখানা ও শহরগুলির উপর এবং হিটলারের 'ইউরোপীয় দুর্গের' উপর নরওয়ে থেকে শুরু করিয়া দক্ষিণে ইতালী পর্যন্ত বোমারু আক্রমণ ঘটিতে লাগিল। শ্রমশিল্পের শহরগুলি ছাড়াও জার্মানীর বন্দর ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মর্মকেন্দ্রগুলিতে—রেল-জংশন, রেলপথ এবং সেতুসমূহের উপরেও ধ্বংসাত্মক আক্রমণ ঘটিল। একে একে জার্মানীর বড় বড় শহরে—ফ্রাংকফুট, হ্যানোভার, মিউনিক, স্টাটগার্ট, ন্যুরেমবার্গ ও খোদ বার্লিনসহ অন্ততঃ ৫০টি শহরে বোমারু অভিযান অনুষ্ঠিত এবং এই সমস্ত শহর শতকরা ৩০ থেকে ৮০ ভাগ পর্যন্ত ধ্বংস হইল। এই ভয়াবহ বিমান আক্রমণের ফলে ৩ লক্ষেরও বেশী জার্মান নিহত, ৭ লক্ষ ৮০ হাজার আহত এবং ৮০ লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হইল। জার্মান বিমানবাহিনী এত দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ১৯৪৪ সালে মিত্রপক্ষের বোমারু অভিযান কোনক্রমেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না এবং নানা রণাঙ্গনে তাদের যে পরাজয় ঘটিতে লাগিল, তার অন্যতম কারণ মিত্রশক্তির বিমান আধিপত্য। কিন্তু এই সমস্ত অভিযানের ফলে বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতিও হইয়াছিল প্রচুর। যেমন—বৃটিশ পক্ষের মোট ২২ হাজার বিমান নষ্ট এবং ৭৯,২৮১ জন বৈমানিক নিহত হইল। মার্কিন পক্ষের ১৮ হাজার প্লেন নষ্ট এবং ৭৯,৬২৫ জন বৈমানিক প্রাণ হারাইল।

পশ্চিম রণাঙ্গনে সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার এবং খ্যাতনামা বৃটিশ সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারি উভয়েই বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত বিমান অভিযানের জন্যই জার্মানীর বিরুদ্ধে তাঁদের জয়লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল। এমন কি, পশ্চিম রণাঙ্গনের জার্মান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেডও যুদ্ধের পর স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মিত্রপক্ষের বিমান আধিপত্যই জার্মানীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ।[১]

১। লুই স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৪৮৮-৯২।

অষ্টম পর্ব

পঞ্চম অধ্যায়

মাল্টা বৈঠকের বৈশিষ্ট্য : ইঙ্গ-মার্কিন মতান্তর ?

১৯৪৩ সালের শেষভাগে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে তেহরানে তিন বিশ্বনেতা চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিনের বৈঠকের পর গোটা ১৯৪৪ সাল অতিক্রান্ত হইল। তিন প্রধানের মধ্যে আর কোন বৈঠক হইল না। কিন্তু রুজভেল্ট ও চার্চিল উভয়েই অনুভব করিতেছিলেন যে, সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর যে ভাবে বিকাশ হইতেছে, তাতে তিন প্রধানের যথাসম্ভব শীঘ্র আলোচনা ও পরামর্শ-বৈঠকে মিলিত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষভাবে রুজভেল্ট স্ট্যালিনের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হওয়ার জন্য উৎসুক ছিলেন। কিন্তু চতুর্থবার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার জন্য তিনি অপেক্ষমাণ ছিলেন। ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৫, রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর তিনি স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু স্ট্যালিন সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন—চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী। এদিকে রুজভেল্টও কৃষ্ণসাগরের তীরে যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ, তাঁর নিকট এই মর্মে রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল যে, সোভিয়েত কৃষ্ণসাগরের তীর অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন। ফলে, রুজভেল্টের আশংকা হইল যে, এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাঁর সহকর্মীদের এবং জাহাজের কর্মচারী বা মাঝিমাল্লাদের অসুখ করিতে পারে। অধিকন্তু ওয়াশিংটন থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত এই দূর পথের যোগাযোগ ব্যবস্থাও অসুবিধাজনক হইতে পারে, রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর সরকারী কাজকর্ম চালাইবার পক্ষে। সুতরাং তিনি স্ট্যালিনকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন ইতালী বা সিসিলি কিংবা মাল্টা বা সাইপ্রাস—ভুমধ্যসাগরের যে কোন সুন্দর ও মনোরম স্থানে মিলিত হওয়ার জন্য। কিন্তু স্ট্যালিনও ডাক্তারদের পরামর্শের কথা উল্লেখ করিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে যাইতে অসম্মত হইলেন। তখন অগত্যা রুজভেল্টকেই রাজী হইতে হইল কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী ইয়াল্টা বা ক্রিমিয়ায় যাওয়ার জন্য। অবশ্য জাহাজযোগে ভুমধ্যসাগরের মাল্টা পর্যন্ত যাওয়াই তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল ছিল। তিনি নিজেও সমুদ্র ভ্রমণ পছন্দ করিতেন। সুতরাং যুদ্ধজাহাজ 'কুইন্সি' (Quincy) যোগে তাঁর মাল্টা পর্যন্ত যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইল। চার্চিল এই প্রস্তাবে মহা খুশী হইলেন। কারণ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একটি বৃটিশ দ্বীপে অবস্থান করিবেন এবং যে দ্বীপ যুদ্ধের এতবড় ঝড়ঝাপটা সহ্য করিয়াছে, সেখানে তাঁর পদার্পণ ঘটিবে, এই আনন্দে চার্চিল ছেলেমানুষের মত একটা ছড়া পর্যন্ত লিখিয়া ফেলিলেন :

> 'No more let us falter !
> From Malta to Yalta !
> Let no body alter !'[১]

১। চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯৫।

কিন্তু ইয়াল্টায় তিন প্রধানের বৈঠকের আগে স্থির হইল যে, তাঁদের আলোচনার সুবিধার জন্য মাল্টায় উভয় পক্ষের সেনানীমণ্ডলীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে এবং সামরিক বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁদের রিপোর্ট যথাশীঘ্র সম্ভব চার্চিল-রুজভেল্টের নিকট পেশ করা হইবে। সুতরাং ৩০ শে জানুয়ারী মাল্টায় বৃটিশ ও মার্কিন সেনাপতিগণ তাঁদের আলোচনা শুরু করিলেন এবং অধিকাংশ বিষয়েই তাঁরা খুব শীঘ্র একমত হইলেন। চার্চিল-রুজভেল্টকে তাঁরা মাল্টায় আসিবামাত্র রিপোর্ট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

জার্মানীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরাজিত করার জন্য পশ্চিম রণাঙ্গনে নতুন অভিযানের সিদ্ধান্ত হইল। এদিকে সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ার ৫০শে জানুয়ারী মাল্টায় সম্মিলিত সেনানী প্রধানদের জানাইয়া দিলেন যে, রুশ সৈন্য-বাহিনীর অগ্রগতির বিবেচনায় সময়ের প্রশ্নটা এক্ষণে বড় হইয়া উঠিয়াছে। জার্মানীর আক্রমণাত্মক-শক্তি কাবু হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং যথাসম্ভব শীঘ্র উত্তরদিক দিয়া রাইন নদী অতিক্রম করা হইবে এবং সেখানে সর্বাধিক শক্তি প্রয়োগ করা হইবে।

উত্তরদিক দিয়া রাইন নদী পার হওয়া এবং একটিমাত্র রণক্ষেত্রে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ শক্তি সংহত করিয়া জার্মান প্রতিরোধ ভাঙিয়া ফেলা কিংবা 'ব্রড ফ্রন্ট পলিসি' অনুকরণ করা—এই দুই মতবাদ নিয়া মণ্টগোমারি ও আইজেনহাওয়ারের মধ্যে যে বিরোধ ছিল, তারও সানঞ্জস্য বিধান করা হইল। উত্তরে ডাসেলডর্ফ ও রুঢ় অঞ্চলের দিকে এবং দক্ষিণে ফ্রাঙ্কফুর্ট-ক্যাসেল অঞ্চলে—এই দ্বিমুখী আক্রমণ মার্চ মাসে চালানো হইবে উপযুক্ত সৈন্য ও সামরিক শক্তি সহ। মার্চ মাসের আগে রাইন নদী পার হওয়া শক্ত এজন্য যে, তখন নদীতে বরফ জমিয়া যায়।

২রা ফেব্রুয়ারী চার্চিল-রুজভেল্টকে জানানো হইল যে, উভয় পক্ষের সেনানী-মণ্ডলী রাইন নদী পার হওয়া ও পশ্চিম রণাঙ্গনের নূতন আক্রমণ পরিকল্পনা সম্পর্কে একমত হইয়াছেন।[১]

মাল্টার বৈঠকে ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গন সম্পর্কেও পরিবর্তন ঘটানো হইল এবং প্রস্তাব করা হইল যে, ১৫ই মার্চের মধ্যে ৩টি বৃটিশ ও কানাডীয় ডিভিসনকে উত্তর-পশ্চিমে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। অপরদিকে চীন, ভারত-ব্রহ্ম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কেও প্ল্যানের কিছু রদবদল করা হইল। সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর চূড়ান্ত বৈঠকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ডের লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনকে নির্দেশ দেওয়া হইল মালয়া ও মালক্কা প্রণালীর দিকে অভিযানের জন্য। কিন্তু ভারত-বর্মা রণাঙ্গনের মার্কিন সৈন্যেরা চীনের জন্য মজুত থাকিবে। অর্থাৎ মার্কিনবাহিনী যাইবে চীনে ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের রণাঙ্গনের দিকে, আর বৃটিশপক্ষ যাইবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে।

মাল্টায় এই সংক্ষিপ্ত বৈঠকের পর মার্কিন ও বৃটিশ রণনায়কেরা এবং চার্চিল ও রুজভেল্ট বিমানযোগে ইয়াল্টায় গেলেন। কিন্তু রুজভেল্ট গোড়ায় ভাবিয়াছিলেন যে, ইয়াল্টাতে মাত্র ৩৫ জন সহকর্মী সঙ্গে যাইবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, চার্চিল ও রুজভেল্ট উভয়ের ক্ষেত্রেই সংখ্যাটা ১০ গুণ বাড়িয়া গেল। অর্থাৎ সংখ্যাটা ৫০০তে দাঁড়াইয়া গেল! মাল্টা থেকে ১৪০০ মাইল দূরবর্তী ক্রিমিয়ার সাকি বিমান-

১। হার্বার্ট ফীজ, পৃষ্ঠা ৪৯৩।

ঘাঁটির দিকে প্রতি ১০ মিনিট পর পর এক-একখানা ট্রান্সপোর্ট প্লেন ছাড়িতে লাগিল।…

ইয়াল্টা সম্মেলনে রুজভেল্টের স্বাস্থ্য নিয়া অনেক লেখালেখি হইয়াছে। সুতরাং এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যদিও তিনি নিজেকে খুব সুস্থ মনে করিতেছিলেন তথাপি ক্রিমিয়ার সাকি বিমানঘাঁটিতে অবতরণের পর চার্চিলের মতে তাঁকে রুগ্ন ও শীর্ণ দেখাইতেছিল। আর স্ট্যালিনের মতে চার্চিল স্বয়ং ছিলেন "সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধ", অপর পক্ষে স্ট্যালিন নিজেও খুব সুস্থ ও প্রাণবন্ত ছিলেন।[১]

* * *

ইয়াল্টা যাওয়ার পথে রুজভেল্ট ও চার্চিল মাল্টায় এক সংক্ষিপ্ত বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে তাঁরা প্রধানতঃ ইয়াল্টার কর্মসূচী নিয়া আলোচনা করিলেন। তা ছাড়া এমন কয়েকটি বিতর্কিত বিষয়ও তাঁদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, যেগুলির সূত্রপাত হইয়াছিল গত সেপ্টেম্বর মাসের (১৯৪৪) কোয়েবেক সম্মেলনে। এই বিষয়গুলি ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট বিরোধের উদ্রেক করিয়াছিল। চার্চিল আশা করিয়াছিলেন যে, মাল্টাতে রুজভেল্টের সঙ্গে আলোচনার ফলে তাঁরা এমন-একটা 'কমন পলিসি' স্থির করিতে পারিবেন, যার দ্বারা তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে স্ট্যালিনের শক্তিশালী অবস্থানের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াইতে পারিবেন। কিন্তু রুজভেল্ট এই ধরনের কৌশলের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তিনি এমন ধারণারও সৃষ্টি করিতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, যাতে স্ট্যালিনের সন্দেহ হইতে পারে যে, ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ একটা জোট বাঁধিয়াছে। তিনি নিজেকে 'পৃথিবীর একজন সৎ প্রতিবেশী' ('the Good Neighbour of the World') বলিয়া মনে করিতেন, যাঁর কর্তব্য হইতেছে নিরপেক্ষ সালিশের অনুরূপ চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলা এবং যাতে ইঙ্গ-সোভিয়েত প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা তিন প্রধানের মধ্যে অনৈক্য না ঘটে, সেদিকে নজর রাখা। কিন্তু মাল্টার আলোচনা বৈঠকগুলিতে বৃটিশ ডেলিগেশন বিষণ্নচিত্তে দেখিতে পাইলেন যে, আমেরিকানরা যুদ্ধ-পরবর্তী রুশদের মতলব সম্পর্কে যত না সন্দেহ পোষণ করেন, তার চেয়ে বেশী সন্দেহ করেন বৃটিশ মতলব সম্পর্কে। ইয়াল্টাতে তিন প্রধানের বৈঠকে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সেগুলির গভীর তাৎপর্য বুঝিতে হইলে মাল্টা আলোচনার এই পটভূমিকা স্মরণে রাখা দরকার।[২]

প্রসিদ্ধ বৃটিশ সাংবাদিক ও সামরিক গ্রন্থকার মিঃ চেস্টার উইলমট তাঁর বইতে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে রুজভেল্ট এবং সাধারণভাবে আমেরিকানরা সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরোধী ছিলেন। বৃটেনের প্রতি তাঁদের এই বিরোধিতা ও সন্দেহের মূল কারণ ছিল ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত—যখন ১৭৭৬ খৃস্টাব্দে বৃটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আমেরিকানদের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইয়াছিল। সুতরাং রুজভেল্ট এবং তাঁর সমর্থকেরা মনে করিতেন যে, বৃটেন হইতেছে সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক। যদিও বৃটেনের ঔপনিবেশিকতা অন্যান্য শক্তিবর্গের তুলনায় অধিকতর প্রগতিশীল ছিল, তথাপি তাঁরা মনে করিতেন

১। ফীজ, পৃষ্ঠা ৪৯৭।

২। The Struggle for Europe—Chester Wilmot, Fantana Books, 1966, P. 725.

সাম্রাজ্যিক শাসন কখনও ভালো হইতে পারে না এবং প্রত্যেকটি পরাধীন জাতিরই স্বাধীনতা পাওয়া উচিত। রুজভেল্ট অবশ্যই বিপন্ন বৃটেনকে সাহায্য ও উদ্ধার করিতে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। কিন্তু সেই সাহায্য বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষায় বা উদ্ধারে কাজে লাগুক, এটাও তিনি চাহেন নাই। বরং তাঁর অভিপ্রায় ছিল ১৭৭৬ সালের মার্কিন বিপ্লব উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ুক। রুজভেল্ট যে 'অতলান্তিক সনদ' রচনা করিয়াছিলেন, তার মূলেও ছিল তাঁর ঔপনিবেশিক বিরোধিতা। পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্ডেল হালও রুজভেল্টের অনুরূপ মতবাদ পোষণ করিতেন এবং তাঁর স্মৃতিপুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজের প্রশ্নে বৃটেনের সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধ ছিল। বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে স্বায়ত্বশাসন লাভের তত্ত্বকথাও তাঁরা সমর্থন করিতেন না। এই বিষয়ে রুজভেল্টের মনোভাব কিরূপ তীব্র ছিল, সেটা বুঝা যাইবে তাঁর পুত্রের নিকট একটি মন্তব্য থেকে। রুজভেল্ট তাঁর পুত্র ইলিয়টকে (Elliott) একবার বলিয়াছিলেন :

'I' ve tried to make it clear to Winston—and the others—that, while we're their allies and in it to victory by their side, they must never get the idea that we are in it just to help them hang on to the archaie, medieval Empire ideas......Great Britain signed the Atlantic charter. I hope they realise that the United States Government means to make them live up to it.'

অর্থাৎ—'আমি উইনস্টোন চার্চিলকে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্যকে সোজা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে, আমরা তাঁদের মিত্র বটে এবং যুদ্ধজয়ে তাঁদের সঙ্গে আছি বটে, কিন্তু সেজন্য তাঁদের একথা ধরে নেয়া উচিত নয় যে, তাঁদের আদিম, মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্য ধারণার প্রতি আঁকড়ে থাকার জন্য আমরা তাঁদেরকে সাহায্য করছি। গ্রেট বৃটেন অতলান্তিক সনদে স্বাক্ষর দিয়েছে। সুতরাং আমি আশা করি যে, তাঁরা উপলব্ধি করবেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার তাঁদের নিকট সেই চুক্তির আদর্শ রূপায়ণ প্রত্যাশা করেন।'[১]

মিঃ উইলমটের মতে বৃটিশ, ডাচ ও ফরাসী সমস্ত উপনিবেশ সম্পর্কেই রুজভেল্ট এই সুদৃঢ় নীতিতে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু চার্চিল রুজভেল্টের এই আদর্শবাদের বিরোধী ছিলেন। এজন্য বৃটিশ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের প্রশ্ন নিয়া রুজভেল্টের সঙ্গে চার্চিলের মতবিরোধও হইয়াছিল।...

তেহরান বৈঠকের পর (১৯৪৩ নভেম্বর-ডিসেম্বর) চার্চিল ইউরোপের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইলেন। কারণ, সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক শক্তির দিকে তাকাইয়া তাঁর আশঙ্কা হইল যে, রুশ আধিপত্য ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িবে। এজন্যই চার্চিল ভূমধ্যসাগর ও 'বলকান নীতির' উপর এত জোর দিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকানরা চার্চিলের এই নীতির বিরোধিতা করিলেন। ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে মস্কো বৈঠকে স্ট্যালিনের সঙ্গে চার্চিল বলকানের শতকরা ৫০ : ৫০ হারে যে ভাগাভাগির প্রস্তাব করিয়াছিলেন (এবং যে প্রস্তাবের কথা সোভিয়েট ইতিহাসকারেরা অস্বীকার করিয়াছেন) আমেরিকানরা তারও তীব্র প্রতিবাদ করিলে চার্চিল বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র বলকান

১। চেস্টার উইলমট, পৃষ্ঠা ৭২৭।

উপদ্বীপ যাতে সোভিয়েত গ্রাসে না পড়িতে পারে, তার জন্যই তিনি স্ট্যালিনের সঙ্গে একটা বুঝাপড়ায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকানরা এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হন নাই, এমনকি গ্রীক কমিউনিস্টদের দমনের ব্যাপারে চার্চিল যেভাবে বৃটিশ সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাতেও অতলান্তিকের এপারে-ওপারে সমালোচনা ধ্বনিত হইয়াছিল।···

আসলে স্ট্যালিনের প্রতি রুজভেল্টের সপ্রশংস অনুভূতি ছিল এবং তিনি মনে করিতেন যে, যুদ্ধ জয়ের পক্ষে যেমন, তেমনি যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সম্ভাব ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। যখন পশ্চিমী জগতে পোল্যাণ্ড নিয়া স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সমালোচনা হইতেছিল, তখন ১৯৪৪ সালের জুন মাসে ওয়াশিংটনে পোলিশ নেতা মিকালোজ্যাস্কের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে রুজভেল্ট মন্তব্য করিয়াছিলেন—'স্ট্যালিন একজন বাস্তববাদী এবং একথা আমাদের অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ার অভিজ্ঞতা মাত্র বছর দুয়েকের। সুতরাং তার কার্যকলাপ বিচারের সময় সে কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। তবে, একটি বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে, স্ট্যালিন সাম্রাজ্যবাদী নন।'[১]

রুজভেল্ট আরও বিশ্বাস করিতেন যে, বন্ধুতার দ্বারা কূটনীতিই সর্বোৎকৃষ্ট—'Diplomacy by Friendship' এবং এই নীতির দ্বারাই স্ট্যালিন ও রাশিয়ার কাছ থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া যাইবে। কেবল ব্যক্তিগতভাবে রুজভেল্টই নন, তাঁর বড় বড় সামরিক ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতারাও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন। এমন কি, পশ্চিম রণাঙ্গনের সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ার পর্যন্ত বিশ্বাস করিতেন যে, সাধারণ রাশিয়ান ও সাধারণ আমেরিকানদের মধ্যে চরিত্র, আচরণ ও পরস্পরের প্রতি কমরেডসুলভ ভালোবাসার যথেষ্ট মিল আছে। এমন কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মকাল থেকেই দুই দেশের জনগণের মধ্যে প্রীতির ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধুতার সম্পর্ক রহিয়াছে।

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৭৭৬ খৃস্টাব্দে বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণার পর রাশিয়াই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়াছিল।)

আসলে মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর মধ্যে বৃটেন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য লাভের প্রয়োজন সম্পর্কে মার্কিন উচ্চতম সামরিক মহলের (আমেরিকান চীফস্ অব্ স্টাফ) অধিকাংশ যখন একমত ছিলেন এবং রুজভেল্টকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, রাশিয়ার সাহায্য ছাড়া জাপানকে জয় করিতে ১০ লক্ষ মার্কিন সৈন্য হতাহত হইতে পারে, তখন কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে বৃটেনের সাহায্য আদৌ গ্রহণ-করা উচিত কিনা, সেই বিষয়ে রুজভেল্টের সমর্থনকারীদের মনে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। কারণ, এই প্রশ্নেও বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার নীতি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং কার্যক্ষেত্রেও দেখা গেল যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ডের অধিনায়ক লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের অধীনে যারা ছিল, তারা সকলেই ছিল বৃটিশ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনীর লোক।

১। পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৭০২।

সুতরাং ওয়াশিংটনের রণনেতারা ধরিয়া নিলেন যে, জাপানের পরাজয়ের চেয়ে চার্চিল বৃটিশ উপনিবেশগুলি উদ্ধারের জন্যই অনেক বেশী ব্যগ্র ছিলেন। এখানে আরও স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে কোয়েবেক সম্মেলনে চার্চিল যখন হঠাৎ মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটিশ বোমারুবাহিনী ও নৌবহর পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন রুজভেল্ট সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু মার্কিন সেনানায়কদের অনেকেই সেটা গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল যে, বৃটেন এই কৌশলে জাপানী সাম্রাজ্যের একটি অংশ দখল করিয়া নিতে চায়! এজন্য মার্কিন সেনানীমণ্ডলী প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে বৃটিশ সেনাপতিদের মতামতের বা প্রস্তাবের কোন পাত্তা দিতে চাহিলেন না।

ঔপনিবেশিকতার বিরোধীরূপে রুজভেল্ট জাপানী ইজারাভুক্ত দ্বীপগুলি পুনর্দখলের পর মার্কিন নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তিনি ইন্দোচীন ফ্রান্সকে ফেরৎ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে রানী উইলহেলমিনা যখন রুজভেল্টের নিকট প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, জাপানের পতনের পর এই দ্বীপগুলিকে স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে, তখন রুজভেল্ট তাতে রাজী হইলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই প্রস্তাব করিলেন যে, এই প্রতিশ্রুতি পূরণে সহায়তা করার জন্য মার্কিন সৈন্যেরা এই সমস্ত দ্বীপ মুক্ত করিবে।

এই মনোভাব থেকেই মার্কিন সেনানীমণ্ডলী স্থির করিলেন যে, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযানে বৃটেনকে কোন প্রকার সামরিক নিয়ন্ত্রণ অধিকার দেওয়া হইবে না—একমাত্র সুমাত্রা দ্বীপ ছাড়া, যেটা ছিল মালয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রসঙ্গে রুজভেল্ট বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছিলেন—'পৃথিবীর যে কোন অংশে যে কোন পাথুরে জায়গা বা বালির স্তূপ পেলেও বৃটিশরা সেটা লুফে নিবে!'[১]

সুতরাং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় একমাত্র মার্কিন সৈন্যদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই অথবা হতাহতের সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্যই যে রুজভেল্ট স্ট্যালিনের সাহায্য চাহিয়াছিলেন, এমন নয়। তিনি ঔপনিবেশিকতার প্রত্যাবর্তনে বাধা দেওয়ার জন্যও বৃটিশ, ফরাসী বা ডাচদের আগেই মার্কিনবাহিনী কর্তৃক এই সমস্ত দ্বীপ উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন।

জাপানের পরাজয়ের পর জাপানী সৈন্যবাহিনী যখন আত্মসমর্পণে প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন জেনারেল ম্যাকআর্থার 'আত্মসমর্পণের সামঞ্জস্য বিধানের অধিকর্তা'-রূপে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে হুকুম দিলেন যে, তিনি যেন পৃথকভাবে কোন জাপানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ না করেন। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত জাপানী হাইকমাণ্ড নিয়মমাফিকভাবে কোন মার্কিন যুদ্ধজাহাজে কোন মার্কিন সেনাপতির নিকট পরাজয় স্বীকার না করিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বৃটিশরা তাদের আগেকার কলোনীগুলি পর্যন্ত পুনর্দখল করিতে পারিবে না—একন অপমানজনক অবস্থাও বৃটিশকে মানিয়া নিতে হইল!

* * *

যদিও বৃটিশ গ্রন্থকার মিঃ চেস্টার উইলমটের এই সমস্ত বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া ও রুজভেল্টের নীতির প্রতি বিরূপতা আছে এবং যদিও তিনি

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৭৩৬।

প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, স্ট্যালিনের প্রতি রুজভেল্টের দুর্বলতার জন্যই রাশিয়া ইউরোপে—বিশেষভাবে পূর্ব ইউরোপে বাজিমাত করিতে পারিয়াছিল, তথাপি এই বর্ণনা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মকালের কুরস্ক্ অভিযান থেকে সোভিয়েত সামরিকশক্তি ক্রমশঃ অজেয় হইয়া উঠিতেছিল এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে লালফৌজ আপন গতিবেগেই অগ্রসর হইয়া যাইতেছিল। সেই সময় ইউরোপে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, সোভিয়েত রাশিয়াকে কার্যতঃ বাধা দেওয়া সহজ ছিল না। এজন্য রুজভেল্ট স্ট্যালিনের সঙ্গে 'বন্ধুতার কূটনীতি' আন্তরিকভাবেই অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য। বিশেষভাবে জাপানের বিরুদ্ধে তখন সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য অপরিহার্য বলিয়া মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিয়াছিলেন।

আর বৃটিশ, ফরাসী বা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকতার বিরোধীরূপে আমেরিকাকে মিঃ উইলমট যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাও সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। কেননা, ঊনবিংশ শতক থেকেই গোটা দক্ষিণ আমেরিকা, প্রশান্ত মহাসাগর ও ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার মৃগয়ার ক্ষেত্র ছিল! অবশ্য একথা সত্য যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং তাঁর অধিকাংশ সমর্থক, রাজনীতিক ও সামরিক নেতা যে কোন সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার একান্ত বিরোধী ছিলেন এবং ফ্যাসিজমকেও তাঁরা ঘৃণা করিতেন।

অষ্টম পর্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইয়াল্টার ঐতিহাসিক সম্মেলন :
তিন বিশ্বনেতার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

জার্মানীর পতনের মাত্র তিন মাস আগে এবং যখন লালফৌজ বার্লিন থেকে মাত্র ৪০ মাইল দূরে তখন ইয়াল্টাতে চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিন তিন বিশ্বনেতার যে ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তার গুরুত্ব যেমন অসাধারণ ছিল, তেমনি এই সম্মেলন নিয়া মহাযুদ্ধের পর বিশেষভাবে ইঙ্গ-মার্কিন মহলে বিতর্ক ও বিতণ্ডার প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়াছিল। প্রসিদ্ধ মার্কিন ঐতিহাসিক শেরউড বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন নিয়া এত বিতর্ক ও বিরোধের সৃষ্টি হয় নাই। জার্মানী ও জাপানের পূর্ণ পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পর আন্তর্জাতিক জগতে যে তীব্র বিরোধ ও ঠাণ্ডা লড়াই দেখা দিয়াছিল, তার মূলে ছিল ইয়াল্টা বৈঠকের সিদ্ধান্ত এবং বিরোধীপক্ষের এই সমস্ত অভিযোগ ছিল ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বিরুদ্ধে, যিনি সেই সময় অসুস্থ ও রুগ্ন ছিলেন এবং 'রুগ্ন রুজভেল্ট' স্ট্যালিনের কাছে কতকগুলি বিষয়ে 'আত্মসমর্পণ' করিয়াছিলেন। বিরোধী পক্ষের এই সমস্ত প্রচার-কার্যের জবাবে মিঃ শেরউড বলিয়াছেন যে, ইয়াণ্টা সম্মেলনের দলিলপত্র খুঁজিয়া কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় যে, ইয়াল্টা সম্মেলনের আলোচিত গুরুতর প্রশ্নগুলি, 'রুজভেল্ট তাঁর নিজের কব্জার মধ্যেই রাখিতে পারিয়াছিলেন।'

সুতরাং রুজভেল্টের বিরুদ্ধে অতলান্তিকের এপারে-ওপারে যাঁরা এই সমস্ত প্রচার-কার্যকে একটা "উপকথায়" ("myth") পরিণত করিয়াছেন, তাঁরা আসলে ছিলেন উদারতাবাদী রুজভেল্ট ও সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধী।···

১৯৪৫ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা শহরে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, হিটলার-বিরোধী মহাজোটের পক্ষে সেই বৈঠক ছিল অনন্যসাধারণ। কিন্তু ক্রিমিয়া ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত। দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধের ধ্বংসকাণ্ডের জন্য সেখানে এত স্থানাভাব ছিল যে, ইয়াল্টা সম্মেলনে আগত মিত্রপক্ষীয় ডেলিগেশনদের জন্য অসম্ভব সুবন্দোবস্ত করা সত্বেও ১৬ জন মার্কিন কর্নেলকে একটিমাত্র শয়নকক্ষে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। (একমাত্র ইঙ্গ মার্কিন পক্ষের প্রতিনিধি সংখ্যাই ছিল ৭০০। তার উপর সোভিয়েত প্রতিনিধি দল ও অন্যান্য লোকজন।) অবশ্য ভি. আই. পি.দের জন্য রাজসিক ব্যবস্থাই ছিল। জারের আমলের তৈয়ারী লিভাডিয়া প্রাসাদে ছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং সেখান থেকে ১২ মাইল দূরে একটি মনোরম ভিলাতে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন

চার্চিল—রুশ আতিথেয়তার যিনি সর্বদাই প্রশংসা করিতেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে রুজভেল্টকে তাঁর সরকারী কাজকর্ম চালাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কারণ ওয়াশিংটন থেকে ইয়াল্টা ছিল কয়েক হাজার মাইল দূরবর্তী দেশ। অথচ মার্কিন নেভির যোগাযোগের জাহাজটি ইয়াল্টা বন্দর পর্যন্ত আনা সম্ভব ছিল না। কারণ, ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় জার্মানরা যে সমস্ত মাইন পাতিয়া রাখিয়াছিল, ইয়াল্টা তখনও সেই সমস্ত মাইনের ফাঁদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরাপদ ছিল না। সুতরাং রুজভেল্টের লিভাডিয়া প্রাসাদ থেকে ৮০ মাইল দূরে সেবাস্তপোলে অবস্থিত মার্কিন নেভির যোগাযোগ জাহাজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য নূতন লাইন পাতিতে হইয়াছিল। তা ছাড়া ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিনিধিদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার জন্য বহু অর্থব্যয়ে দূরবর্তী মস্কো থেকে সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্র আনিতে হইয়াছিল।

প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী ইয়াল্টাতে পৌঁছিলেন ৩রা ফেব্রুয়ারী, শনিবার এবং মার্শাল স্ট্যালিন তার দলবল নিয়া ইয়াল্টাতে আসিলেন তার পরদিন রবিবার সকালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। অপরাহ্ণ চারটায় স্ট্যালিন ও মলোটাভ্ রুজভেল্টর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং প্রাথমিক শিষ্টাচারের বিনিময়ের পর রুজভেল্ট গল্পচ্ছলে বলিলেন যে, কুইন্সি জাহাজে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পথে তাঁর সেনাপতিরা অনেকবার বাজী ধরিয়াছিলেন যে, আমেরিকানরা আগে ম্যানিলায় পৌঁছিবে কিংবা লালফৌজ আগে বার্লিনে প্রবেশ করিবে? স্ট্যালিন তখন সহাস্যে জবাব দিলেন যে, ম্যানিলার জন্য যাঁরা বাজী ধরিয়াছেন, তাঁরাই জিতিবেন!*

* * *

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জার্মানীর আসন্ন পতনের মুখে ইয়াল্টার শীর্ষ সম্মেলন শুরু হইয়াছিল এবং তখন ১৯৪৫ সালের আরম্ভে জার্মানীর মোট ৩১৩ ডিভিসন ও ৩২ ব্রিগেড সৈন্য ছিল। এর মধ্যে পূর্ব রণাঙ্গনে ছিল ১৮৫ ডিভিসন ও ২১ ব্রিগেড সৈন্য। আর ১০৮ ডিভিসন ও ৭ ব্রিগেড সৈন্য ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে ও ইতালীতে এবং ৩১ ডিভিসন ও ৪ ব্রিগেড সৈন্য ছিল ইউরোপের অন্যান্য অধিকৃত দেশগুলিতে। অর্থাৎ মোট জার্মান বাহিনীর শতকরা ৩৩ ভাগ সৈন্যকে ইঙ্গ মার্কিন পক্ষে রণলিপ্ত রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জার্মান সীমান্তে পৌঁছিয়াও তাঁরা ইয়াল্টা বৈঠকের সময় রাইন নদী পার হইতে পারেন নাই। অপর দিকে লালফৌজ জার্মানীর মধ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য অভিযান চালাইতেছিল। সুতরাং ইয়াল্টা বৈঠকের সময় রাশিয়ার সামরিক অবস্থান খুব অনুকূল ছিল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী লিভাডিয়া প্রাসাদে ত্রিশক্তির শীর্ষ সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হইল। মার্শাল স্ট্যালিন গোড়াতেই তেহরান বৈঠকের অনুরূপ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে সভাপতিরূপে সম্মেলনের বোধন ও পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। পরবর্তীকালে সমালোচকেরা (যেমন, চেস্টার উইলমট) কিন্তু স্ট্যালিনের এই প্রস্তাবকে রুজভেল্টকে "হাত করার" কূটনৈতিক কৌশল বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিলেন:

---

* স্ট্যালিনের একথা কার্যতও ফলিয়া গিয়াছিল। মার্কিন সৈন্যরা ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৫) ম্যানিলায় প্রবেশ করিয়াছিল। আর বার্লিনের পতন হইয়াছিল ২রা মে।

সম্মেলনের আরম্ভেই উভয়পক্ষ তখনকার সামরিক পরিস্থিতি নিয়া আলোচনা করিলেন। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ হইতে বলা হইল যে, আর্দেনেস অঞ্চলে জার্মানীর পালটা আক্রমণের ধাক্কা সামলাইয়া উঠার পর মিত্রবাহিনী ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে সিগফ্রিড লাইন ও রাইন নদী পার হইয়া বার্লিনের দিকে অভিযানের ইচ্ছা রাখেন। ইতিমধ্যে ইঙ্গ- মার্কিন পক্ষের সরবরাহ সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে। ব্রুসেলস্ ইতিপূর্বেই দখল হইয়া গিয়াছে এবং এন্টোয়ার্পের বন্দর মুখ খুলিয়া গিয়াছে। প্রতিদিন ৭০ থেকে ৮০ হাজার টন রণসম্ভার এবং ১২ হাজার টন জ্বালানী তৈল্য সরবরাহ হইতেছে। এই প্রসঙ্গে স্ট্যালিন জানিতে চাহিলেন যে, পদাতিকবাহিনীর সংখ্যায় মিত্রপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব আছে কিনা? চার্চিল উত্তর দিলেন যে, মিত্রপক্ষ জার্মানীর তুলনায় পদাতিক সৈন্যের দিক দিয়া খুব বেশী শ্রেষ্ঠ নয়। তবে, অস্ত্রসম্ভারে মিত্রপক্ষ অধিকতর বলশালী। সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গণে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের আছে ১০ হাজার ট্যাংক এবং বিমানশক্তিতে তারা জার্মানীর তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ—জঙ্গী ও বোমারু মিলাইয়া বিমান সংখ্যা ৮/৯ হাজারের কম নয়। স্ট্যালিন এই জবাবে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, সাম্প্রতিক অভিযানে রণাঙ্গনের প্রধান লক্ষ্যস্থানের দিকে রাশিয়া সৈন্য সংখ্যায় ও অস্ত্রশক্তিতে জার্মানীর তুলনায় অনেক বলশালী। প্লেনের সংখ্যা ৮ থেকে ৯ হাজারের মধ্যে এবং পদাতিকের সংখ্যাও জার্মানীর যেখানে ৮০ ডিভিসন, সোভিয়েতের সেখানে ১০০ ডিভিসন। আর প্রত্যেকটি গোলন্দাজী ডিভিসনে রাশিয়ার আছে ৩০০ থেকে ৪০০ কামান এবং যেখানে ব্যূহভেদ করা হইয়াছিল সেখানে প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ৩০০টি কামান পাতা হইয়াছিল। ফলে, জার্মানরা একেবারে হতভম্ভ হইয়া পড়িয়াছিল। চার্চিল লালফৌজের এই প্রকার শক্তি সমাবেশের জন্য স্ট্যালিনকে সপ্রশংস ধন্যবাদ জানাইলেন। স্ট্যালিন উত্তর দিলেন যে, তিনি মিত্রপক্ষের প্রতি কমরেড-সুলভ কর্তব্য পালন করিয়াছেন মাত্র।[১]

হার্বার্ট ফীজ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে ('চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিন') এই সামরিক আলোচনার উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, পূর্ব এবং পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসরমান মিত্রসৈন্যেরা কোন্ পথ ধরিয়া আসিবে এবং কোন্ স্থানে আসিয়া মিলিত হইবে কিংবা কোন্ পর্যন্ত আসিয়া থামিবে সেই সম্পর্কে কোন পারস্পরিক চুক্তি ও সিদ্ধান্ত হইল না। যুদ্ধের গতিপথে তাদের গন্তব্যস্থল ঠিক হইবে এবং কোথায় ও কতক্ষণ উভয় পক্ষের সৈন্যেরা অবস্থান করিবে, সেই প্রশ্নটিও ফেলিয়া রাখা হইল ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকারীদের উপর।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তেহরান সম্মেলনের মত ইয়াল্টা সম্মেলনেও তিন বিশ্ব-নেতা কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী স্থির করিয়া আলোচনা শুরু করেন নাই। তিন পক্ষের ডেলিগেটরাই তাঁদের প্রয়োজনমত যে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিতেন। তবে শীর্ষ নেতৃবৃন্দের আলোচনায় এটা বুঝা গেল যে, পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে আসন্ন অভিযানের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্ঠা করা হইবে। বৃটেন ও আমেরিকা রাশিয়ার নিকট প্রকাশ করিলেন যে, মার্চ-এপ্রিল মাসে ইঙ্গ মার্কিন মিত্রপক্ষ রাইন নদী অতিক্রম করিয়া যখন খাস জার্মানীর অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাইবে, তখন সোভিয়েত রাশিয়া যেন পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানবাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁদের চাপ অব্যাহত রাখেন।

১। The Teharan, Yalta & Potsdom Conferences—Documents, P. 61-63.

স্ট্যালিন তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন যে, রণনীতি ও রণকৌশলের দিক থেকে তিন পক্ষের মিলিটারি স্টাফের মধ্যে অধিকতর সামঞ্জস্য বিধান করা উচিত।[১]

* * *

ইয়াল্টায় তিন রাষ্ট্রপ্রধানের শীর্ষ সম্মেলনে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত ৬।৭টি প্রশ্ন সব চেয়ে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল যথা—

১. দূর প্রাচ্যের যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যোগদান
২. প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসংঘে রাশিয়ার তিন ভোট দাবী
৩. সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভেটো প্রয়োগের অধিকার
৪. অধিকৃত জার্মানীর উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন
৫. পোল্যাণ্ডের সীমানা ও ভবিষ্যৎ গভর্নমেণ্ট গঠনের প্রশ্ন
৬ মুক্তিপ্রাপ্ত ইউরোপের রাজনৈতিক সমস্যা
৭. ফ্রান্সকে জার্মানীর বিলিব্যবস্থার মধ্যে গ্রহণের প্রশ্ন

ইয়াল্টা সম্মেলনে আলোচিত এবং গৃহীত অনেক সিদ্ধান্ত নিয়াই পরবর্তীকালে রুজভেল্ট-বিরোধী-মহলে অনেক বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু সবচেয়ে বেশী বিরোধ দেখা দিয়াছিল দূরপ্রাচ্যে জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার শর্ত দ্বারা স্ট্যালিনের কতকগুলি রাজনৈতিক দাবী পূরণ সম্পর্কে এর আগে তেহরানের শীর্ষ সম্মেলন কিংবা তারও আগে (অক্টোবর, ১৯৪৩) মস্কোর রাজনৈতিক বৈঠকে স্ট্যালিন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের শর্ত দ্বারা রাজনৈতিক দাবীর কথা তোলেন নাই। কিন্তু ইয়াল্টা বৈঠকে স্ট্যালিন বলিলেন যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে এত ক্ষয়ক্ষতির পর রাশিয়ার জনগণ প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে, আবার নূতন করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কেন ? বিশেষতঃ জাপান তো জার্মানীর মত রাশিয়াকে আক্রমণ ও ক্ষতবিক্ষত করে নাই ? সুতরাং সোভিয়েত জনগণের কাছে কৈফিয়ত দ্বারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কতকগুলি দাবী বিবেচনা করা দরকার এবং সেই দাবীগুলি এই :

ক. বহির্মঙ্গোলিয়ার স্বায়ত্তশাসন মানিয়া লওয়া। অর্থাৎ চীনের সার্বভৌম অধিকারের বাইরে মঙ্গোলিয়ান পিপলস রিপাব্লিক-এর স্বতন্ত্র মর্যাদা ও স্বাধীনতা স্বীকার করা। প্রকৃতপক্ষে গত ২০ বছর ধরিরাই বহির্মঙ্গোলিয়ার এই স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল।

খ. ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান জারের রাশিয়ার কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের দ্বারা যে সমস্ত অঞ্চল কাড়িয়া নিয়াছিল, সেগুলির প্রত্যর্পণ করা। যেমন দীর্ঘ শাখালিন দ্বীপের দক্ষিণ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট দ্বীপগুলি সোভিয়েত রাশিয়াকে ফেরত দেওয়া।

গ. ডাইরেনের বাণিজ্যিক বন্দরকে আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত করা এবং এবং বন্দরে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সুরক্ষিত করা।

ঘ. সুপরিচিত পোর্ট আর্থার নৌঘাঁটি লীজের মারফত সোভিয়েট রাশিয়াকে

১। হার্বার্ট ফীজ, পৃষ্ঠা ৪৯৯-৫০০।

প্রত্যর্পণ একং মাঞ্চুরিয়ার ভিতর দিয়া পীত সাগরের 'গরম জলে' পেঁছিবার জলপথ উন্মুক্তকরণ। ডাইরেন বন্দর এবং পোর্ট আর্থার নৌঘাটির উপর এ জন্য রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। সোভিয়েত রাশিয়ার আয়তন সুবৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও এর সমুদ্রপথ বরফাচ্ছন্ন এবং নিতান্তই ভৌগোলিক সীমাবন্ধতার দ্বারা আবদ্ধ।

ঙ. চাইনীজ ইস্টার্ন রেলপথ এবং সাউথ মাঞ্চুরিয়ান রেলপথ সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক ব্যবহারের অধিকার মানিয়া লওয়া। কিন্তু এর দ্বারা চীনের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করা হইবে না। কেননা, এই দুইটি রেলপথ চীন ও রাশিয়ার যুগ্ম পরিচালনার অধীনে থাকিবে এবং মাঞ্চুরিয়ার উপর চীনের সার্বভৌমত্ব অধিকার স্বীকার করা হইবে। কিন্তু রাশিয়াকে যদি এই রেলপথ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া না হয়, তবে, তার পক্ষে 'গরম জলের' সমুদ্রে পেঁছানো সম্ভব নয়।

চ. কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়াকে ফেরত দিতে হইবে।[১]

কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, এই সমস্ত আলোচনা ও সিন্ধান্ত প্রধানতঃ স্থির হইয়াছিল রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের মধ্যে। এমন কি চীনকে তখন এই সমস্ত আলোচনা ও চুক্তির কথা জানানো হয় নাই এবং চীনের কোন প্রতিনিধিও এই আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু রুজভেল্ট কথা দিয়াছিলেন যে তিনি উপযুক্ত সময়ে বিশেষ দূত মারফৎ এই সমস্ত আলোচনা ও চুক্তির কথা জেনারেল চিয়াং কাইসেককে জানাইয়া দিবেন। কিন্তু তার আগামমুহূর্ত পর্যন্ত চীনের কাছ থেকে এই সমস্ত চুক্তির কথা গোপন রাখা হইয়াছিল। রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর সিন্দুক থেকে যখন এই গোপন দলিল আবিষ্কৃত হইল, তখন রুজভেল্ট-বিরোধীরা খুব হট্টগোলের সৃষ্টি করিলেন এবং চীনের প্রতি মিউনিক চুক্তির অনুরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হইয়াছে, এমন অভিযোগ তুলিলেন। কিন্তু মিউনিক চুক্তির সঙ্গে ইয়াল্টা চুক্তির তুলনা দেওয়া নিতান্তই হাস্যকর। কেননা, মিউনিক চুক্তির দ্বারা হিটলারের আগ্রাসন নীতির নিকট স্বাধীন ও সমৃদ্ধ চেকোশ্লাভ রাষ্ট্রকে বলি দেওয়া হইয়াছিল এবং ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গকে বলশালী করা হইয়াছিল। কিন্তু চিয়াং কাইসেকের চীন ছিল মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জের অন্তর্গত এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। সেই জাপানকে দ্রুত পরাজিত করার উদ্দেশ্যেই শক্তিশালী সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তা ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রুজভেল্টের উপর চাপ দেওয়া হইয়াছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক সহযোগিতার জন্য। কেননা, মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর ধারণা ছিল যে, একমাত্র হোনশু (Honshu) দখল করিতেই আমেরিকার ৫ লক্ষ সৈন্য হতাহত হইবে। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের শক্তিশালী কোয়াণ্টং বাহিনী রহিয়াছে এবং সেখানে জাপানীদের উৎকৃষ্ট কলকারখানাও আছে, যেগুলি থেকে সমরসম্ভার উৎপন্ন হইত। সুতরাং এই আর্মিকে কাবু করিতে হইলে রণদক্ষ সোভিয়েতবাহিনীর সহযোগিতা ছাড়া উপায় নাই। জাপানের খাস ভূমিতে মার্কিন বিমানবহর ধ্বংসাত্মক বোমাবর্ষণ চালাইতে গেলেও মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী স্থলবাহিনীর শক্তি অটুট থাকিয়া যাইতেছে। তখন পর্যন্ত আইও জিমা এবং ওকিনাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ মার্কিনপক্ষের দখলে আসে নাই! ওদিকে পশ্চিম

১। মস্কো থেকে প্রকাশিত তেহেরান, ইয়াল্টা ও পটসড্যাম সংক্রান্ত পুস্তকের ১৪৫ পৃষ্ঠা এবং ডি. এফ ফ্লেমিংয়ের রচিত কোল্ড ওয়ার পুস্তক, ১৯৩ পৃষ্ঠা।

ইউরোপে মিত্রবাহিনী রাইন নদীর ধারে আবদ্ধ ছিল। তারপর এ্যাটম বোমা কিংবা পারমাণবিক বোমাও তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং জাপানের খাস ভূমিতে আক্রমণ চালাইতে কিংবা মাঞ্চুরিয়ায় শক্তিশালী জাপ-বাহিনীকে ধ্বংস করিতে দীর্ঘ সময় লাগিয়া যাইবে। ক্রিমিয়া বা ইয়াল্টা সম্মেলনে ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫, সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর পক্ষ থেকে চার্চিল-রুজভেল্টের নিকট এই মর্মে এক রিপোর্ট দেওয়া হইল যে, জার্মানীর পরাজয়ের পর জাপানকে জয় করিতে ১৮ মাস সময় লাগিয়া যাইবে।[১]

কিন্তু চীনের অজ্ঞাতসারে চীন সম্পর্কে এই ধরনের চুক্তি করিতে স্ট্যালিন ও রুজভেল্ট (চার্চিল এই আলোচনায় গরহাজির ছিলেন) সম্মত হইলেন কেন ? এর প্রধান কারণ এই যে, চিয়াং কাইসেকের চুংকিংয়ে মিত্রপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত গোপন রাখা সম্ভব ছিল না। যদি রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণের সংকেতের কথা চিয়াং কাইসেককে জানাইয়া দেওয়া হইত, তবে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সারা পৃথিবীতে তা জানাজানি হইয়া যাইত। অথচ স্ট্যালিন দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে, জার্মানীর পরাজয়ের ৩।৪ মাস পর তিনি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু জার্মানী থেকে মাঞ্চুরিয়ার দূরত্ব ৬ হাজার মাইল। এই সুদীর্ঘ পথে ৩০ ডিভিসন সৈন্য ও সমরোপকরণ পাঠাইতে দীর্ঘ সময়—অন্ততঃ তিন মাস কাল লাগিয়া যাইবে। সুতরাং চিয়াং কাইসেকের নিকট আগের রুশ পরিকল্পনার কথা জানাইয়া দিলে সমস্ত মাটি হইয়া যাইত। এজন্যই রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন এই গোপনীয়তা অবলম্বনে বাধা দিয়াছিলেন। চার্চিলও এই গোপন আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন না, তবু তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেনের বারণ সত্ত্বেও এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন। কারণ তাঁর আশঙ্কা হইয়াছিল যে, জাপানের বিরুদ্ধে রুজভেল্ট-স্ট্যালিনের চীন সংক্রান্ত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর না দিলে ভবিষ্যতে দূর-প্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হইতে পারে।—(উইলমট, পৃষ্ঠা ৭৪৮)

সোভিয়েত সূত্রে প্রকাশ যে, ইয়াল্টায় স্ট্যালিনের সঙ্গে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের জন্য বৃটিশ রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিকরা রুজভেল্টের নিন্দা করিয়াছেন। শ্রমিক দলনেতা ক্লেমেন্ট এ্যাটলি তো পরবর্তীকালে লিখিয়াছিলেন—'ইয়াল্টায় এটাই ছিল রুজভেল্টের লাইন। আমাদের একের বিরুদ্ধে ওঁরা ছিলেন দুইজন। আমাদের এমন অনেক-কিছু মেনে নিতে হয়েছে, যা আমাদের মানা উচিত ছিল না।…আমি মনে করি না যে, রুজভেল্ট সত্যি সত্যি ইউরোপীয় রাজনীতি বুঝতেন, আমি মনে করি না যে, কোন আমেরিকানই বুঝতেন।'—(ট্রুখানোভস্কি, পৃষ্ঠা ৪১৯)

কিন্তু ইয়াল্টা চুক্তির দ্বারা চীনের সার্বভৌমত্বের প্রতি বাহ্যতঃ যেটুকু ত্রুটি ঘটানো হইয়াছিল, তার পূর্ণ সংশোধন করা হইল আগস্ট মাসে (১৯৪৫) চীন রাশিয়ার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের দ্বারা। এই চুক্তিপত্রের দ্বারা চিয়াং কাইসেকের ন্যাশনালিস্ট গবর্নমেন্টের কর্তৃত্ব ও পূর্ণ মর্যাদা স্বীকার করিয়া নেওয়া হইল এবং চীনের অনুকূলে মাঞ্চুরিয়া পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। কার্যতঃ সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে এই সন্ধি-চুক্তির বলেই চিয়াং কাইসেক উত্তর চীনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র-গুলি দখল করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু চিয়াং চক্রের দুর্নীতি-দুষ্ট-শাসনের জন্য

১। দি এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৩৫২-৫৩।

কুওমিণ্টাং সরকার জনসমর্থন হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং ইয়াল্টা চুক্তির ফলে চিয়াং কাইসেকের লাভ ছাড়া কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ ৪০ বছর ধরিয়া উত্তর চীনে তাঁর কোন প্রভাবও ছিল না। এজন্য সেই সময় তিনি কোন প্রতিবাদও জানান নাই। কিন্তু মাও সে-তুংয়ের কমিউনিস্ট পার্টির উত্তর চীনে যথেস্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। এজন্য তাঁরা উত্তর চীন ও মাঞ্চুরিয়া সংক্রান্ত ইয়াল্টা চুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।[১]

চীনে অবস্থিত আমেরিকার প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়েডমেয়ার, যিনি জেনারেল ম্যাক-আর্থারের সমর্থক ছিলেন, তিনি জর্জ মার্শালকে জানাইয়া দিয়াছিলেন (ইয়াল্টা চুক্তির সময় যে, জাপানকে দ্রুত পরাজিত করার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তা প্রয়োজন। তা ছাড়া মস্কোতে মার্কিন মিলিটারি মিশনের বড় কর্তা জেনারেল জন আর. ডীন (John R. Deane) লিখিয়াছেন যে, মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের শক্তিশালী কোয়াণ্টাং আর্মি পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত জাপান পর্যুদস্ত হইবে না, এমন কি চীনে অবস্থিত জাপানী সৈন্যদের সহোযোগিতায় কোয়াণ্টংবাহিনী একটা নতুন জাপানী রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সোভিয়েত সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন ছিল—যদিও যুদ্ধের পরে দেখা গিয়াছিল যে, কোয়াণ্টাং আর্মিকে যতটা শক্তিশালী মনে করা হইয়াছিল, ততটা শক্তি তার ছিল না।...

মার্কিন গ্রন্থকার শেরউড লিখিয়াছেন যে, রুজভেল্ট স্ট্যালিনের সঙ্গে ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট অলোচনায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, হংকং বন্দর চীনকে ফেরত দেওয়া উচিত। অথবা বন্দরটি ফ্রী পোর্ট হিসাবে আন্তর্জাতিক বন্দরে রূপান্তরিত হওয়া উচিত। কিন্তু দূর-প্রাচ্য ও জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় প্রস্তাবিত যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনার সময় চার্চিল উপস্থিত ছিলেন না, যদিও তিনি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। শেরউডের মতে এটা পরিষ্কার যে, ১৯৪৩ সালের তেহরান কনফারেন্সেরও আগে রুজভেল্ট দূর-প্রাচ্য সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার দাবীগুলির বৈধতা স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। কেননা জাপান ১৯০৪ সালের যুদ্ধে ঐগুলি রাশিয়ার কাছ থেকে কাড়িয়া নিয়াছিল। অতএব রাশিয়ার এগুলি ফেরত পাওয়া উচিত। স্টালিন বলিয়াছিলেন যে, দূর-প্রাচ্যে রুশ সৈন্যবাহিনী প্রেরণের ব্যাপারটা সর্বাধিক গোপনীয়তার মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। অধিকন্তু জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার দাবীগুলি যে পূর্ণ করা হইবে, সেই বিষয়ে স্ট্যালিন কেবল মৌখিক প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিলেন না। তিন বিশ্বনেতা একটি স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রে ঘোষণা করিলেন যে, জাপানের পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়ার এই সমস্ত দাবী নিঃসন্দেহে পূর্ণ করা হইবে।[২]

অর্থাৎ 'বাস্তববাদী' স্ট্যালিন দূর-প্রাচ্যে তাঁর রাজনৈতিক দাবীগুলি আদায়ের জন্য একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া ছাড়িলেন। কিন্তু রুজভেল্টের সমর্থকরা বলিয়াছেন যে, আসলে স্ট্যালিন তাঁর দাবী পুরাপুরি আদায় করিতে পারেন নাই। কারণ, ডাইরেন বা পোর্ট আর্থার বন্দর, কিংবা মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ অথবা খাস মাঞ্চুরিয়া সম্পর্কে স্ট্যালিন আপোসরফাই করিয়াছিলেন এবং তাতে চিয়াং কাইসেকের

১। ডি এফ ফ্লেমিং, পৃষ্ঠা ৯৯৯।
২। রুজভেল্ট এ্যাণ্ড হপকিন্স, শেরউড, পৃষ্ঠা ৮৬৬-৬৭।

বরং সুবিধাই হইয়াছিল তা ছাড়া জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য কেবল মার্কিন সেনানী ও সরকারী মহলই চাপ সৃষ্টি করেন নাই, মার্কিন জনমতও এর অনুকূলে ছিল।[1]

* * *

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার জন্য রুজভেল্ট-চার্চিল কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রস্তাবে স্ট্যালিনের পূর্ণ সমর্থন ছিল এবং ইয়াল্টাতে এই প্রস্তাব নিয়া যে আলোচনা হইয়াছিল, তাতে দেখা যায় যে, গোড়ার দিকে স্টালিন সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে ১৬টি অঙ্গ রাষ্ট্রকেই রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পরে সেই দাবী ত্যাগ করিয়া তিনি লিথুয়ানিয়া, বাইলোরুশিয়া এবং উক্রাইন—এই তিনটি রাষ্ট্রের পৃথক সদস্যপদ দাবী করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রসংঘে রাশিয়ার তিনটি ভোট দানের অধিকার চাহিয়াছিলেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্রগুলির বিরাট অবদান ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য। (এই তিনটির মধ্যেও পরে তিনি লিথুয়ানিয়ার দাবী ত্যাগ করিয়াছিলেন।) কিন্তু মার্কিন জনমত এমন প্রস্তাব সমর্থন করিবে না, অনুমান করিয়া রুজভেল্ট এই প্রস্তাব চাপা দিতে চাহিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, চার্চিল রাশিয়ার এই তিন ভোটের দাবী সমর্থন করিলেন। কারণ, তিনি বৃটিশ ডোমিনিয়ন ও ভারতের সদস্যপদের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে মার্কিন কূটনীতিবিদ জেমস বার্নস (James Byrnes) আমেরিকার পক্ষ থেকে তিনটি সদস্যপদের দাবী উত্থাপন করিলেন এবং স্ট্যালিন সেই দাবী সমর্থন করিলেন। কিন্তু রুজভেল্ট এই সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন স্ট্যালিনও তাঁর দাবী প্রত্যাহার করিয়া নিলেন এবং রুজভেল্ট এজন্য স্ট্যালিনকে সপ্রশংসা ধন্যবাদ দিলেন।[2]

ইয়াল্টাতে রাষ্ট্রসংঘ গঠনের আলোচনা প্রসঙ্গে ভোট ও ভেটো প্রয়োগের অধিকার নিয়া যে বিতর্ক হইয়াছিল, তাতে রুজভেল্টের বিরুদ্ধবাদীরা এই অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, স্ট্যালিনকে রাষ্ট্রসংঘে যোগদানে প্রলুব্ধ করার জন্যই রুজভেল্ট সিকিউরিটি কাউন্সিলে রাশিয়ার ভেটো দানের অধিকার মানিয়া নিয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, সে কথা সোভিয়েত-বিরোধী বৃটিশ গ্রন্থকার মিঃ উইলমট পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

'The basic principle of the veto was never in dispute. None of the Great Powers was prepared to submit itself and its interests unreservedly to the jurisdiction of an international security organisation. All were agreed that there must be "unqualified unanimity of permanent members of the Council on all major decisions relating to the preservation of peace, including all economic and military enforcement measures...'

অর্থাৎ সহজ কথায় ভেটো প্রয়োগের অধিকার সংক্রান্ত মূল নীতি নিয়া বিরোধের কোন প্রশ্নই ছিল না। কারণ, কোন বৃহৎ শক্তিই তার স্বার্থ ও অধিকারকে বিনা শর্তে

১। ডি. এফ. ফ্লেমিং পৃষ্ঠা ১৯৫।
২। শেরউড, পৃষ্ঠা ৮৫৭।

কোন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিষদের এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত করিতে দিতে রাজী ছিলেন না। সকলেই এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে, শান্তিরক্ষা কিংবা অর্থনৈতিক ও সামরিক বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই পূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।[১]

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও এই বিষয়ে একমত ছিলেন। কারণ, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রেসিডেণ্ট উইলসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানিতেন যে, মার্কিন সেনেট কখনও মার্কিন সৈন্যদেরকে কোন রণক্ষেত্রে নিয়োগের অনুমতি দানের অধিকার কোন আন্তর্জাতিক সংঘের হাতে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইবে না। আর চার্চিল তো তাঁর সুবৃহৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের দিকে তাকাইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়াই ফেলিলেন যে, ৪০টি বা ৫০টি জাতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে নাক গলাইতে আসিবে এমন অবস্থা তিনি কখনও মানিয়া নিতে পারিবেন না।[২]

১৯৪৪ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ডাম্বারটন ওকস্ (ওয়াশিংটন) সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার যে খসড়া প্রস্তাব ও পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। ইয়াল্টা সম্মেলনে তার একটা আপোস মীমাংসা হইল। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য স্যানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে (২৫শে এপ্রিল) পর্যন্ত অপেক্ষা করা হইল।

* * *

হিটলারী জার্মানী যাতে ভবিষ্যতে আর মাথা তুলিয়া না দাঁড়াতেই পারে এবং যাতে পুনরায় সামরিকশক্তি সঞ্চয় করিয়া ইউরোপ ও পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ ও সর্বনাশ ঘটাইতে না পারে, ফ্যাসিবিরোধী কোয়ালিশনের তিন বিশ্বনেতা সেই মূলনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন। কিন্তু কিভাবে সেই মূলনীতি কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করা যায়, সে বিষয়ে যেমন কিছু কিছু মতভেদ ছিল, তেমনি বৃটেন, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন রাজনৈতিক বৈঠকে ১৯৪৩ সাল থেকে সেই সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনাও হইয়াছিল এবং এই সমস্ত আলোচনার মূল ভিত্তি ছিল জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও ফ্যাসিজমের উচ্ছেদ। কিন্তু ইয়াল্টার ঐতিহাসিক সম্মেলনে যখন স্বভাবতই আশা করা গিয়াছিল যে, পরাজিত জার্মানীর ভবিষ্যৎ নিয়া চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিনের মধ্যে দীর্ঘ ও বিস্তৃত আলোচনা হইবে, তখন কিন্তু সেই আশাপূর্ণ হইল না এবং জার্মানীর পতনের আগে তার ভবিষ্যৎ বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিংবা বাস্তবতাসম্মত কোন পরিকল্পনা গ্রহণও সহজ ছিল না। তবে, চার্চিল বলিয়াছিলেন যে, পরাজিত জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরের পর মিত্রশক্তির হাতে সর্বময় ক্ষমতা, অধিকার ও কর্তৃত্ব আসিবে এবং তখন মিত্রপক্ষ যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

জঙ্গীবাদী ও ফ্যাসিবাদী জার্মানীর যাতে আর পুনরভ্যুত্থান ঘটিতে না পারে এবং যাতে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী আবার ইউরোপের বিপদের কারণ না হইতে পারে, এ জন্য গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানীকে খণ্ড-বিখণ্ড করা সম্পর্কে প্রায় একমত ছিলেন। এমন কি, মার্কিন ট্রেজারি মন্ত্রী হেনরী মর্গেনথাউ

১। দি স্ট্রাগল ফর ইউরোপ, উইলমট, পৃষ্ঠা, ৭৪০।
২। ঐ পুস্তক, ঐ পৃষ্ঠা।

(Henry Morgenthau) জার্মানীকে টুকরা টুকরা করিয়া একমাত্র কৃষিপ্রধান রাজ্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য "মর্গেনথাউ প্ল্যান" নামে খ্যাত সেই পরিকল্পনা এমন বেপরোয়া ছিল যে, মিত্রপক্ষের নেতারাও সেটা হজম করিতে পারিতেছিলেন না। অবশ্য স্ট্যালিন সহ মিত্রপক্ষের প্রায় সকল নেতাই জার্মানীর জঙ্গীবাদ ও সামরিক শক্তি সম্পর্কে শঙ্কিত ছিলেন এবং এজন্য তাঁরা জার্মানীর বিরুদ্ধে খুব কড়া ও বেপরোয়া ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ ইয়াল্টা সম্মেলনের অধিবেশনে মার্শাল স্ট্যালিন প্রথমেই জার্মানীকে খণ্ডন (dismemberment) করার প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে তেহরান বৈঠকে (১৯৪৩ নভেম্বর-ডিসেম্বর) তাঁদের তিন নেতার মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল এবং পরে ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে মস্কোর বৈঠকে চার্চিলের সঙ্গে তাঁর, অর্থাৎ স্ট্যালিনের এই প্রসঙ্গে মতামত বিনিময় হইয়াছিল। কিন্তু তেহরান বা মস্কো কোন সম্মেলনেই এই প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহাযুদ্ধের পর প্রকাশিত মস্কোর সরকারী ইতিহাসে কিংবা 'বে-সরকারী' পুস্তকগুলিতে দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করা হইয়াছে যে, স্ট্যালিন বা রাশিয়া জার্মানীকে খণ্ড-বিখণ্ড করার কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই। বরং ইয়াল্টাতে তিনি এই ধরনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অনুরূপ প্রস্তাবগুলিকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখিয়াছিলেন। তথাপি তেহরান সম্মেলনে যদিও বা স্ট্যালিন জার্মানীর খণ্ডনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ইয়াল্টা সম্মেলনের সময়ের মধ্যে তাঁর মত পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে কিংবা ১৯৪৪ সালের নভেম্বরে ইউরোপীয়ান এ্যাডভাইসরি কমিশনের সভায় অথবা ১৯৪৫-এর জুলাই মাসে বিখ্যাত পটসডাম সম্মেলনে জার্মানীকে খণ্ড-বিখণ্ড (dismemberment) করার প্রস্তাবে রাশিয়া সায় দেয় নাই।[১]

কিন্তু স্ট্যালিনের এই মত পরিবর্তন যখনই ঘটিয়া থাকুক ইয়াল্টা সম্মেলনে রুজভেল্ট 'ব্যক্তিগতভাবে' জার্মানীকে পাঁচটি বা সাতটি রাজ্যে বিভক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তেহরানে বৃটিশ ডেলিগেশন জার্মানীকে প্রুশিয়াসহ উত্তরে এবং ভিয়েনা সহ দক্ষিণে বিভক্ত করার ইচ্ছুক ছিলেন। ইয়াল্টা সম্মেলনে চার্চিল নীতিগতভাবে জার্মানীকে খণ্ডন করার পক্ষে ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মতে জার্মানীকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা এবং সেই সমস্ত অংশের সীমানা নির্দিষ্ট করা ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত জটিল ও কঠিন ছিল। ইয়াল্টা সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই দুরূহ কার্য নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়। চার্চিল কিঞ্চিৎ বিদ্রূপের সুরে বলিয়াছিলেন যে, ৮০ মিলিয়ন লোকের সমস্যা ৮০ মিনিটে শেষ করা যায় না।

যদিও ইয়াল্টাতে স্ট্যালিন স্বয়ং জার্মানীর খণ্ডন সংক্রান্ত আলোচনার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি রুশপক্ষের দাবী এই যে, তিনি বা সোভিয়েত ডেলিগেশন জার্মানীকে খণ্ডন করার প্রস্তাব তোলেন নাই কিংবা তেমন কোন প্রস্তাব সমর্থনও করেন নাই।[২]

কিন্তু জার্মানীর ভবিষ্যৎ আলোচনা প্রসঙ্গে তিন শীর্ষ নেতা স্থির করিলেন যে,

১। রাশিয়া এ্যাট ওয়ার, আলেকজান্দার ওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৮৭৩।
২। এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন, মস্কো ১৯৭১, পৃষ্ঠা ৩০২।

জার্মানীর বিরুদ্ধে কোন নির্দয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হইবে না কিংবা জার্মান জনগণকেও ধ্বংস করা হইবে না। কিন্তু নাৎসী মতবাদ, পার্টি ও সংগঠন এবং সামরিক সংস্থাগুলির মূলোৎপাটন করা হইবে—নাৎসী সরকার ও জার্মান সেনানী-মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে এবং যুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড দেওয়া হইবে এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানীর উপর দখল ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিবে। মিত্রশক্তি আরও স্থির করিলেন যে, জার্মানীকে তিন অংশে ভাগ করিয়া উহার এক একটি অংশ রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারিতে আনা হইবে। পরে অবশ্য মার্কিন ও বৃটিশ অঞ্চল থেকে একটি অংশ ভাগ করিয়া চতুর্থ শক্তি হিসাবে ফ্রান্সকেও দেওয়ার প্রস্তাব হইল। রাজধানী বৃহত্তর বার্লিনকে ভাগ করিয়া উহার পূর্বাংশ রাশিয়া এবং পশ্চিমাংশ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে দেওয়ার প্রস্তাব সম্পর্কেও মিত্রপক্ষ একমত ছিলেন।···

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারী ইতিহাসে দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করা হইয়াছে যে, স্ট্যালিন বা সোভিয়েত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে জার্মানীকে খণ্ডন করার কোন প্রস্তাব দেওয়া হয় নাই কিংবা স্ট্যালিন উহা সমর্থনও করেন নাই। তথাপি এই বিষয়ে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত বা নিশ্চিত হওয়া কঠিন। কেননা, তেহরান, ইয়াল্টা বা পটসডাম-এর ঐতিহাসিক শীর্ষ সম্মেলনগুলির দলিলপত্র তিন পক্ষের সম্মতিক্রমে রচিত হয় নাই। প্রত্যেকটি ডেলিগেশন আলাদা-আলাদাভাবে কিংবা স্বাধীনভাবে এই সমস্ত অধিবেশনের রিপোর্ট বা রেকর্ড তৈরী করিয়াছিলেন। ১৯৬৯ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত তেহরান, ইয়াল্টা ও পটসডাম সম্মেলনের দলিল সংক্রান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে।

অপর পক্ষে বৃটিশ গ্রন্থকার মিঃ চেষ্টার উইলমট তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইয়াল্টা বৈঠকের কোন বিস্তৃত সরকারী রিপোর্ট রাখা হয় নাই। কিন্তু শীর্ষস্থানীয় মার্কিন নেতাগণ, যাঁরা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্টেটিনিয়াস, জেমস এফ. বার্নস (James F. Byrnes), এ্যাডমিরাল লীহাই (Leahy) এবং হ্যারি হপকিন্স যে সমস্ত বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন সেগুলি পরবর্তী-কালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং মিঃ উইলমট সেগুলি অবলম্বন করিয়াই তাঁর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।[১]

ফলে, বৃটিশ, আমেরিকান ও রুশ—এই তিন পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে সর্বত্র সঙ্গতি নাই। এমন কি, গরমিলও যথেষ্ট আছে। যেমন বৃটিশ ও মার্কিন গ্রন্থকারদের মতে স্ট্যালিন জার্মানীকে খণ্ডন করার প্রস্তাব অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং চার্চিল ও রুজভেল্টের সঙ্গে আলোচনায় নিজেও অনুরূপ প্রস্তাব দিয়াছিলেন। এই সমস্ত পুস্তকে পোল্যাণ্ডের সমস্যা, প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভোট ও ভেটো প্রয়োগের অধিকার ও চীন জাপান ইত্যাদি নিয়াও রাশিয়া এবং স্ট্যালিনকে তীক্ষ্ন সমালোচনা করা হইয়াছে। এমন কি, রুজভেল্টের 'দুর্বলতার' জন্যই যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপে রাশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এমন ইঙ্গিত বিখ্যাত মার্কিন গ্রন্থকার হার্বার্ট ফীজ (Herbert Feis) স্পষ্টরূপেই করিয়াছেন।···

ইয়াল্টায় জার্মানীর ভবিষ্যৎ নিয়া আলোচনা প্রসঙ্গে এঁদের রচনায় প্রকাশ যে,

১। দি স্ট্রাগল্ ফর ইউরোপ, ৭৩৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

রুজভেল্ট দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের আরম্ভে এই বিষয়টি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তার আগেই ১৯৪-এর নভেম্বর মাসে মস্কোর পররাষ্ট্র-মন্ত্রী সম্মেলনে জার্মানীকে পুরাপুরি নিরস্ত্র করার এবং রাশিয়া ও মিত্রশক্তির দেশগুলির ক্ষতিসাধনের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। তারপর তেহরান সম্মেলনে জার্মানীকে পার্টিশান করার প্রস্তাব নিয়া তিন প্রধানের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে নাই। কিন্তু ত্রিশক্তি কর্তৃক জার্মানীকে দখল করার প্রস্তাবে নেতৃবৃন্দ একমত ছিলেন। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যেই স্থির হইয়া গিয়াছিল জার্মানীর কে কোন্ অংশ দখল করিয়া নিবেন এবং রাজধানী বার্লিনকে মিত্রশক্তির যৌথ দায়িত্বের অন্তর্গত করা সম্পর্কেও তাঁরা একমত ছিলেন। ইয়াল্টা বৈঠকে তিন বিশ্বনেতা জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী সম্পর্কে পুনরায় তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করিলেন এবং হিটলারী জার্মানীকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সোভিয়েত, মার্কিন ও বৃটিশ সেনানীমণ্ডলী সেই সর্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর জার্মানীর খণ্ডন ক্ষতিপূরণ আদায়ের পরিমাণ এবং ফ্রান্সকে দখলদারির অংশ দেওয়া সম্পর্কে তিন পক্ষের মধ্যে মতের মিল ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স ও দ্য গল সম্পর্কে রুজভেল্টের মত স্ট্যালিনেরও খুব উচ্চ ধারণা ছিল না এবং ব্যক্তি হিসাবে দ্য গলের প্রতি তিনি প্রসন্নও ছিলে না। জার্মানীকে পরাজিত করার ব্যাপারে ফ্রান্সের তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে বলিয়াও স্ট্যালিন মনে করিতেন না। সুতরাং রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন উভয়েই জার্মানীর কোন দখলীকৃত অংশ ফ্রান্সকে অর্পণ করিতে কিংবা জার্মানীর শাসনভার পরিচালনার জন্য মিত্রপক্ষীয় কন্ট্রোল কমিশনে ফ্রান্সকে সদস্য হিসাবে গ্রহণের জন্য রাজী ছিলেন না। কিন্তু এই প্রশ্নে "চার্চিল ও ইডেন ফ্রান্সের পক্ষে বাঘের মত লড়াই করিয়াছিলেন।"— রুজভেল্টের উপদেষ্টা হপকিন্সের মন্তব্য।[১]

ফ্রান্সের পক্ষে চার্চিলের এই ওকালতির কারণ এই যে, তাঁর বিশ্বাস ছিল যুদ্ধের পর রাশিয়া যে প্রাধান্য অর্জন করিবে, তার ফলে ইউরোপে স্থায়িত্ব ও শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং জার্মানীর পরাজয়ের পর শক্তিশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। বিশেষতঃ রুজভেল্ট যখন বলিলেন যে, যুদ্ধোত্তর ইউরোপ থেকে দুই বছরের মধ্যেই সমস্ত মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হইবে, তখন চার্চিল আরও উদ্বিগ্ন হইলেন এবং একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যে বলিলেন— 'গ্রেট বৃটেন তার একক শক্তিতে ইংলিশ চ্যানেলে প্রবেশ করার পশ্চিমী দুয়ারগুলি রক্ষা করিতে পারিবে না।' সুতরাং চার্চিল অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অধিকৃত জার্মানীতে ফ্রান্সের অংশীদারিত্ব এবং কন্ট্রোল কমিশনে তার তার সদস্যদের জন্য সমর্থন জানাইলেন।[২]

শেষ পর্যন্ত স্ট্যালিন ও রুজভেল্ট উভয়েই যেন অনিচ্ছার সঙ্গে চার্চিলের প্রস্তাব অনুযায়ী ফ্রান্সকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

জার্মানীর দখলে ও নিয়ন্ত্রণে ফ্রান্সকে অন্যান্য মিত্রশক্তির সমমর্যাদায় গ্রহণ করা

১। শেরউড, পৃষ্ঠা ৮৫৮।
২। উইলমট, পৃষ্ঠা ৭৩৯।

হইবে, এই 'শুভ সংবাদ' যখন দ্য গলকে জানানো হইল, তখন তিনি খুশী হইলেন বটে, কিন্তু ইয়াল্টা সম্মেলনে তাঁকে যোগ দিতে আহ্বান না করায় এবং ফ্রান্সকে উপেক্ষা করায় তিনি অভিমানে ক্ষুব্ধ হইলেন। সুতরাং ইয়াল্টা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পথে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যখন তাঁকে আলজিয়ার্সে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন, তখন তিনি তাঁর বিক্ষোভ জানাইবার জন্য সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। এভাবে দ্য গল রুজভেল্টের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা অর্জনের একটা মস্ত বড় সুযোগ হারাইলেন। অবশ্য স্ট্যালিনের নিকট রুজভেল্ট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সকে 'কৃপাপূর্বক' গ্রহণ করা হইয়াছে !...

ইয়াল্টা সম্মেলনে জার্মানীকে খণ্ডন করার প্রস্তাব সম্পর্কে যেমন কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না, তেমনি জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রশ্নটিরও কোন মীমাংসা হইল না। এমন কি জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের শর্তগুলিও প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত হইল এবং তিন পক্ষই মোটামুটি নীতি হিসাবে জার্মানীর খণ্ডন মানিয়া লইলেন। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের উপর ভার দেওয়া হইল। তবে, জার্মানীর আত্মসমর্পণ দাবী করিয়া তিন শীর্ষনেতার সম্মতিক্রমে যে দলিল প্রস্তুত হইল এবং তখনকার মত গোপন রাখা হইল, তাতে ঘোষণা করা হইল :

'The United Kingdom, the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics shall possess supreme authority with respect to Germany. In the exercise of such authority they will take such steps including the complete disarmament, demilitarization and the dismembermnt of Germany as they deem requisite for future peace and security.'

অর্থাৎ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানীর উপর চরম কর্তৃত্ব খাটাইবার অধিকার নিজেদের হাতে বজায় রাখিবে এবং এই চরম ক্ষমতাবলে ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য জার্মানীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, সামরিক শক্তি শূন্য এবং খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্য যে কোন পন্থার প্রয়োজন হইবে শক্তিবর্গ তাহাই অবলম্বন করিবেন।[১]

এই সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যাহা-কিছু করার প্রয়োজন সেই সম্পর্কে বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেনকে সভাপতি এবং লণ্ডনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইনান্ট ও সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত গুসেভকে সদস্যপদে নিয়োগ করিয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হইল।...

জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য মিত্রশক্তির দেশ যেভাবে ধ্বংস করা হইয়াছে, তার জন্য জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে। ইয়াল্টা বৈঠকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন মার্শাল স্ট্যালিন এবং তিনি মোট ২০০০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করার জন্য প্রস্তাব করিলেন। এই ক্ষতিপূরণের শতকরা ৫০ ভাগ পাইবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আর বাকী ৫০ ভাগ মিত্রপক্ষের অন্যান ক্ষতিগ্রস্তগণ।

১। হার্বার্ট ফীজ, পৃষ্ঠা ৫০১।

প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে গিয়া সেদিনের মিত্রশক্তিবর্গ কিভাবে নাজেহাল হইয়াছিলেন, সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া চার্চিল ২000 কোটি ডলার ক্ষতিপূরণের অঙ্কে আপত্তি করিলেন। কারণ, তাঁর মতে এর ফলে জার্মানী নিঃস্ব হইয়া যাইবে এবং তাঁর পক্ষে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া অসম্ভব হইবে। তখন স্ট্যালিন জবাবে বলিলেন যে, হাঙ্গেরী, ফিনল্যান্ড ও রুমানিয়ার সঙ্গে ইতিপূর্বেই যে ধরনের চুক্তি হইয়াছে, সেই অনুসারে জার্মানীর কাছ থেকেও নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে না, টাকার বদলে পণ্যদ্রব্য (in kind) এবং কলকারখানা ইত্যাদি দিলেই চলিবে।

রুজভেল্ট সমর্থনের সুরে বলিলেন যে, স্ট্যালিনের এই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করিয়া আলোচনা চলিতে পারে এবং এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন গঠন করা হইবে এবং এই কমিশন সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করিবেন।

হিটলারী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষতিসাধন সম্পর্কে রাশিয়ার যে বিশেষজ্ঞ কমিশন হিসাব-নিকাশ করিয়াছিলেন, তাতে প্রকাশ যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের অবর্ণনীয় ক্ষতি লোকক্ষয় হইয়াছিল। মোট ২ কোটি লোক প্রাণ হারাইয়াছিল এবং ফ্যাসিস্ট জার্মানী ও তার তাঁবেদারেরা ১,৭১০ শহর সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস করিয়াছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যা ৭০ হাজারের বেশী, ৬০ লক্ষ অট্টালিকা চূর্ণ বা অগ্নিদগ্ধ করা হইয়াছিল এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক গৃহহারা হইয়াছিল। ৩১,৮৫০টি কলকারখানা ধ্বংস হইয়াছিল—৬৫ হাজার কিলোমিটার রেলপথ, ৪,১০০ রেলওয়ে স্টেশন, ৯৮ হাজার কালেকটিভ ফার্ম, ১৮৭৬ স্টেটফার্ম এবং ২৮৯১টি মেসিন এ্যান্ড ট্রাক্টর স্টেশন ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। আর ৭০ লক্ষ ঘোড়া এবং অগণিত গৃহপালিত পশু (মোট সংখ্যা কয়েক কোটি) ধৃত ও জার্মানীতে প্রেরিত হইয়াছিল। জার্মানী ও তার মিত্রদের হাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে প্রত্যক্ষ ক্ষতি হইয়াছিল ডলারের হিসাবে তার মোট মূল্য ছিল ১২ হাজার ৮০০ কোটি। সেই সঙ্গে যদি সামরিক ব্যয় এবং দখলীকৃত এলাকাগুলির অর্থনৈতিক ক্ষতি ধরা যায়, তবে, তার মোট পরিমাণ বোধ হয় আকাশের নক্ষত্রকে ছাড়াইয়া যাইবে—২০০ কোটি ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার মিলিয়ন রুবল !

১৯৫৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখের প্রাভদায় প্রকাশিত প্যারিসের মিত্রপক্ষীয় ক্ষতিপূরণ কমিশনের রিপোর্টে (১৯৪৫) প্রকাশ যে, ইউরোপে জার্মানী ও তার মিত্রদের দ্বারা যে সমস্ত ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল, তার মোট মূল্য ছিল ৫৩,৪০০ মিলিয়ন ডলার। দেশ হিসাবে সেই ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রত্যেকটি দেশের ক্ষতি ১০ লক্ষ ডলারের হিসাবে নিম্নলিখিত রূপ :

ফ্রান্স ২১,১৪৩ ; যুগোশ্লাভিয়া ৯,১৪৫ ; গ্রেট বৃটেন ৬,৩৮৩ ; হল্যান্ড ৪,৪৭২ ; চেকোশ্লভাকিয়া ৪,২০২ ; গ্রীস ২,৫৪৫ ; বেলজিয়ম ২,২৭৮ ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১,২৬৭ ; নরওয়ে ১,২৬০।

অন্যান্য ৯টি দেশের (আলবানিয়া, লাক্সেমবুর্গ, কানাডা, ডেনমার্ক, ভারত, মিশর, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা রিপাব্লিক) ৬৭৯ আর পোল্যান্ডের ক্ষতি হইয়াছিল তার জাতীয় সম্পদের ৩৮ শতাংশ, কিন্তু সোভিয়েতের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ

থেকে পোল্যাণ্ডের ক্ষতিপূরণ করা হইয়াছিল।[১]

মার্কিন ডেলিগেশন মোটামুটি ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্টেটিনিয়াস বলিয়াছিলেন যে, এই প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত।

স্ট্যালিনের মতে ক্ষতিপূরণ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত শত্রুর পরাজয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের অবদানের পরিমাণ হিসাবে এবং কি পরিমাণ ক্ষতি সেই দেশের হইয়াছিল শত্রুর হাতে, তার মানদণ্ডের বিচারে।

অবশ্য ইয়াল্টা সম্মেলনে জার্মানীর খণ্ডন কিংবা ক্ষতিপূরণ সমস্যার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না। তবে, দুইটি বিশেষ কমিশনের হাতে সেই ভার অর্পণ করা হইল।

কিন্তু পরাজিত জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিন বিশ্বনেতা একমত হইয়া প্রকাশ্যে যে ঘোষণা দিলেন, তাতে মূলনীতি হিসাবে জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, ত্রিশক্তি কর্তৃক জার্মানীর দখল ও নিয়ন্ত্রণ এবং ফ্যাসিজম ও জঙ্গীবাদ ইত্যাদি উচ্ছেদের দাবী করা হইল :

'It is our inflexible purpose to destory German militarism and Nazism and to ensure that Germany will never again be able to disturb the peace of the world. We are determined to disarm and disband all German armed forces ; break up for all time the German General Staff that has repeatedly contrived the resurgence of German militarism ; remove or destroy all German military equipment, eliminate or control all German industry that could be used for military production ; bring all war criminals to just and swift punishment and exact reparation in kind for the destruction wrought by the Germans ; wipe out the Nazi Party, Nazi laws, organisation, and institutions, remove all Nazi and miliarist influences from public office and from the cultural and economic life of the German people ; and take in harmony such other measures in Germany as may be necessary to the future peace and safety of the world. It is not our purpose to destroy the people of Germany, but only when Nazism and militarism have been extirpated will there be hope for a decent life for Germans, and a plaee for them in the comity of nations.'[২]

সহজ কথায় এই ঘোষণার মর্ম এই—'আমাদের অনমনীয় উদ্দেশ্য হইতেছে জার্মান সামরিকবাদ ও নাৎসীবাদ ধ্বংস করা এবং ভবিষ্যতে জার্মানী যাতে আর কখনও পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করিতে না পারে, তেমন সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা। সমস্ত জার্মান সশস্ত্রবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ ও নিরস্ত্র করা সম্পর্কে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে জার্মান সেনানীমণ্ডলী বার বার জার্মান সামরিকবাদের পুনরভ্যুত্থানের ফন্দী আঁটিয়াছে, চিরকালের জন্য সেই সেনানীমণ্ডলীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। জার্মানীর সমস্ত

১। দি এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৩৩৫।

২। The Teharan, Yalta & Potsdam Conferences—Documents, P. 134-35.

সামরিক সাজসজ্জা অপসারিত বা ধ্বংস করা হইবে। সামরিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত শ্রমশিল্পের কারখানা ব্যবহারযোগ্য সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন বা নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। সমস্ত যুদ্ধাপরাধিকে অতি দ্রুত উপযুক্ত দণ্ডদানের ব্যবস্থা করা হইবে, জার্মানী যে সমস্ত ধ্বংস সাধন করিয়ছে তার জন্য দ্রব্যমূল্যে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে। নাৎসী পার্টি, নাৎসী আইন, সংগঠন ও সংস্থাগুলিকে উৎপাটন করা হইবে, জার্মানী সরকারী দপ্তর ও জার্মান জনগণের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবন থেকে সমস্ত নাৎসী ও সামরিক প্রভাব অপসারিত করা হইবে এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য জার্মানীতে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন, সেগুলি করা হইবে। কিন্তু জার্মান জনগণকে ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু জার্মানীতে নাৎসীবাদ ও সামরিকবাদের যখন উচ্ছেদ ঘটিবে, একমাত্র তখনই জার্মানদের জন্য পরিচ্ছন্ন জীবনের এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক আসন লাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।'···

তেহরানের চেয়েও ইয়াল্টা সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তিন পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকা পালনের জন্য অনেক বেশী চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্ট্যালিন ও চার্চিলের চেয়ে রুজভেল্টের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছিলেন। সুতরাং বিভিন্ন বৈঠকে বিতর্কিত বিষয়গুলির আলোচনা ও সিদ্ধান্তে চার্চিলের চেয়েও রুজভেল্টের সঙ্গেই স্ট্যালিনের মতের মিল বেশী দেখা গিয়াছিল। জার্মান সমস্যার মত পোল্যাণ্ড নিয়াও গভীর বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ থেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ এবং পোল্যাণ্ডের সমস্যাও নানা কারণে অত্যন্ত জটিল ছিল। ইয়াল্টা বৈঠকে রুজভেল্ট যখন পোল্যাণ্ডের প্রশ্নটি উত্থাপন করিলেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করিলেন যে, তিনি পূর্বদিকের পোল্যাণ্ডের জন্য কার্জন লাইনের সীমানা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। তবে, তাঁর প্রস্তাব এই যে Lwow শহর ও নিকটবর্তী তৈলখনিগুলি পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে রাখার জন্য স্ট্যালিনের সম্মত হওয়া উচিত। অবশ্য তিনি শুধু প্রস্তাব করিতেছেন, কিন্তু এটা গ্রহণের জন্য তিনি কোন জেদ করিতেছেন না। তবে, একথা সত্য যে, যদি তার এই প্রস্তাব মানিয়া লওয়া হয়, তবে, মার্কিন জনমতের উপর উহা খুব প্রভাব বিস্তার করিবে।

প্রেসিডেণ্টের বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতারা আগেই তাঁকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত তৈলখনি পোলিশ অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু রুজভেল্ট মধ্যস্থের ভূমিকার মর্যাদা রক্ষার জন্য (মিঃ উইলমটের মতানুসারে) কেবল সীমানার প্রশ্নে নয়, পোলিশ গভর্নমেণ্ট গঠনের প্রশ্নেও এটাকে কোন গুরুতর বিরোধের বিষয় করিয়া তুলিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

চার্চিলও কার্জন লাইনের সীমানা মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও বলিলেন যে, যদি প্রেসিডেণ্টের লভোভ (Lwow) সংক্রান্ত প্রস্তাবটি স্ট্যালিন মানিয়া লন, তবে, সেই 'মহানুভবতার ইঙ্গিত' বৃটিশ জনমতও 'প্রশংসা করিবে এবং স্বাগত জানাইবে।' তবে, চার্চিল পরিষ্কার ভাষায় এ কথাও জানাইলেন যে, তিনি পোল্যাণ্ডের সীমানার চেয়েও পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য বেশী আগ্রহান্বিত এবং প্রেসিডেণ্টের মত তিনিও ওয়ারশতে 'একটি সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধিস্থানীয় পোলিশ সরকারের প্রতিষ্ঠা' এবং অবাধ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি চান। কারণ,

'পোল্যাণ্ডের জন্যই বৃটেন এত বেশী বিপদের ঝুঁকি নিয়াছিল, অতএব বৃটেনের পক্ষে এটা মর্যাদার প্রশ্ন।'

এর জবাবে ষ্ট্যালিন একটি আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় মন্তব্য করিলেন: 'রুশ জনগণের পক্ষে পোল্যাণ্ড কেবল মর্যাদার প্রশ্ন নয়, রাশিয়ার নিরাপত্তারও প্রশ্ন। অতীতের সমগ্র ইতিহাসে পোল্যাণ্ড হইতেছে এমন একটি করিডোর যার ভিতর দিয়া গত ত্রিশ বছরে জার্মানী দুইবার রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং রাশিয়ার স্বার্থের খাতিরেই আমরা এমন শক্তিশালী ও বলশালী পোল্যাণ্ড চাই, যে পোল্যাণ্ড নিজের শক্তিবলে এই করিডোরের প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে।'

সীমান্তের সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া ষ্ট্যালিন বলিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবশ্যই লভোভ (Lwow) পাইতে হইবে এবং 'কার্জন ও ক্লেমেশ লাইন' ছাড়া অন্য কোন সীমানা সে মানিয়া নিতে পারে না। অতঃপর ষ্ট্যালিন ঘোষণা করিলেন, 'আপনারা আমাদেরকে গভীর লজ্জার মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছেন! হোয়াইট রাশিয়ান এবং উক্রেনীয়ানরা কি বলিবে? তারা বলিবে কার্জন এবং ক্লেমেশ'র মত ব্যক্তিরাও রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষার পক্ষে যতটা নির্ভরযোগ্য, ষ্ট্যালিন ও মলোটোভ ততটা নন। তার চেয়ে আমি বরং চাই যুদ্ধটা আরও কিছুকাল চলুক, যাতে জার্মানীর বিনিময়ে পশ্চিমদিকে আমরা পোল্যাণ্ডকে ক্ষতিপূরণ দিতে পারি। আমি পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমানা নেইসী (Neisse) নদী পর্যন্ত বিস্তার করিবার পক্ষপাতী।'[১]

ষ্ট্যালিন আরও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, কার্জন লাইনের সীমানা রুশদের আবিষ্কার নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের শান্তি সম্মেলনে কার্জন (বৃটেন), ক্লেমেশ (ফ্রান্স) এবং যে সমস্ত মার্কিন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন, তাঁরাই পোল্যাণ্ডের এই সীমানা নির্দেশ করিয়াছিলেন। কোন রুশ প্রতিনিধি সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না।

রুজভেল্ট তখন প্রস্তাব করিলেন যে, লণ্ডনস্থিত পোলিশ সরকারসহ পোল্যাণ্ডের পাঁচটি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া নূতন পোলিশ গবর্নমেণ্ট গঠিত হোক। কিন্তু ষ্ট্যালিন সেই প্রস্তাবেও তেমনভাবে সাড়া দিলেন না, বরং তিনি বলিলেন যে, লণ্ডনের আশ্রয়প্রাপ্ত পোলদিগকে তিনি বিশ্বাস করেন না, একমাত্র লুবলিনে প্রতিষ্ঠিত নূতন পোলিশ গবর্নমেণ্ট ছাড়া। 'আমরা নিয়ম-শৃঙ্খলা চাই, আমরা এমন গবর্নমেণ্ট চাই না, যারা পিছন থেকে আমাদের গুলি মারবে।'

চার্চিলও লুবলিন কমিটিকে নূতন পোলিশ সরকার হিসাবে মানিয়া লইতে রাজী হইলেন না। কারণ, তাঁর মতে এই গবর্নমেণ্ট পোলিশ জাতির এক-তৃতীয়াংশের বেশী প্রতিনিধিস্থানীয় নহেন। পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমানা নেইসী (Neisse) নদী পর্যন্ত প্রসারেরও তিনি বিরোধী, কেননা এর দ্বারা শ্রমশিল্পে সমৃদ্ধ সমগ্র সাইলেশিয়া পোলিশদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে। 'এত বেশী জার্মান খাদ্য পোলিশ হংস উদরসাৎ করিলে সে বদহজমে মারা যাইবে!'

অবশ্য রুজভেল্ট এরপর ষ্ট্যালিনের কাছে আপোস-মীমাংসার সুরে একটি পত্র পাঠাইলেন। যদিও তিনি লুবলিন কমিটির বিরোধী ছিলেন, তথাপি তিনি

১। The struggle for Europe, P. 742-43, and The Teharan, Yalta & Potsdam Conferences, P. 93.

স্ট্যালিনকে এই মর্মে আশ্বাস দিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনও সোভিয়েত স্বার্থের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোন অস্থায়ী পোলিশ সরকারকে কোন প্রকার সমর্থন জানাইবেন না। 'আমি সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হইতে দিব না এবং এই বিষয়ে আমি কৃতসংকল্প।'[১]

এখানে মনে রাখা দরকার যে, পোল্যাণ্ডের সীমানার সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার কেবল নিরাপত্তার প্রশ্নই জড়িত ছিল না, সেই সময় জার্মানীর বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য লালফৌজের পক্ষে পোল্যাণ্ডের পশ্চাদ্ভাগ সামরিক কারণেই নিরাপদ রাখার প্রয়োজন ছিল। এজন্যই দেখা যায় যে, ইয়াল্টা সম্মেলনের কিছু পরেই রাশিয়ার হুকুমে রুমানিয়ার রাজা মিকাইয়েল যখন জেনারেল রাদেস্কুকে পদচ্যুত করিয়া সোভিয়েত পক্ষপাতী পেত্রো গ্রোজাকে (Petru Groza) প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন রুজভেল্ট সেই ব্যাপ্যারের প্রতিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। কারণ, লালফৌজের অগ্রগতির পক্ষে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সরবরাহের লাইন রুমানিয়ার ভিতর দিয়া নিতে হইয়াছিল। ঠিক অনুরূপ কারণই ঘটিয়াছিল পোল্যাণ্ডের বেলা। সুতরাং রুজভেল্ট ও চার্চিলের পক্ষে এই অবস্থাটা উপেক্ষা করাও সম্ভব ছিল না।[২]

পোল্যাণ্ড নিয়া মিত্রপক্ষের মধ্যে প্রায় আগাগোড়াই বিরোধ ও মতভেদ ছিল। পরবর্তীকালে পটসডাম কনফারেন্সে (জুলাই, ১৯৪৫) এবং মহাযুদ্ধের পরেও বহুকাল পর্যন্ত এই মতভেদ ছিল—যদিও যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় এই মতভেদের জন্য সৌভাগ্যবশতঃ হিটলার-বিরোধী জোট ভাঙ্গিয়া যায় নাই। ইয়াল্টা সম্মেলনেও তিন পক্ষের মধ্যে একটা আপোসরফামূলক প্রস্তাব গৃহীত এবং ইস্তাহারের আকারে প্রকাশিত হইল। সেই ইস্তাহারের মর্ম এই যে, লালফৌজের দ্বারা পোল্যাণ্ডের পূর্ণ মুক্তির ফলে একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং বর্তমানের অস্থায়ী পোলিশ গভর্নমেণ্টের ভিত্তি আরও গণতন্ত্রীকরণ করা হইবে—এভাবে জাতীয় ঐক্যের যে পোলিশ সরকার গঠিত হইবে, তাতে পোল্যাণ্ডের ভিতরের এবং বাইরের বা বিদেশের পোলিশ গণতন্ত্রী প্রতিনিধিদিগকে গ্রহণ করা হইবে স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচন এবং গোপন ব্যালটের দ্বারা। একমাত্র গণতন্ত্রবাদী ও নাৎসী-বিরোধী দলগুলিকেই এই সমস্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে। ত্রিশক্তির শীর্ষ নেতাগণ মনে করেন যে, কার্জন লাইনই পোল্যাণ্ডের পূর্ব সীমানারূপে গৃহীত হওয়া উচিত। তবে, এই সীমানা কোন কোন অঞ্চলে পোল্যাণ্ডের অনুকূলে ৫ থেকে ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত অদল-বদলপূর্বক সামঞ্জস্য বিধান করার দরকার হইতে পারে। নেতৃবৃন্দ স্বীকার করিতেছেন যে, উত্তরে ও পশ্চিমে পোল্যাণ্ডকে যথেষ্ট পরিমাণ জমির অধিকার দিতে হইবে এবং পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমানার চূড়ান্ত মীমাংসা স্থগিত থাকিবে আগামী শান্তি সম্মেলন পর্যন্ত।[৩]

ইয়াল্টা সম্মেলনে পোল্যাণ্ড নিয়া যে ধরনের মীমাংসা হইয়াছিল, মুক্তিপ্রাপ্ত বাকী ইউরোপ নিয়াও অনুরূপমত সামঞ্জস্য হইয়াছিল—বিশেষভাবে নতুন গভর্নমেণ্ট

১। উইলমট, পৃষ্ঠা ৭৪৩-৪৪।
২। আলেকজান্দার ওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৮৭১-৭২।
৩। তেহরান, ইয়াল্টা, পটসডাম কনফারেন্সের দলিল, পৃষ্ঠা ১৩৮।

গঠনের প্রশ্নে। এতৎসংক্রান্ত ইস্তাহারে অতলান্তিক সনদের মূল নীতি ও আদর্শের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু পরবর্তীকালে এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়াছিল। কারণ 'স্বাধীন নির্বাচনের' নামে পোল্যাণ্ডে কিংবা মুক্তিপ্রাপ্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে সোভিয়েত-বিরোধী সরকার গঠন করিতে দিতে ষ্ট্যালিন আদৌ রাজী ছিলেন না। অথচ পশ্চিমী শক্তিবর্গ 'গণতন্ত্র' ও অবাধ নির্বাচন' বলিতে উপরের তলার লোকদের, এমন কি যারা নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল, তাদের দ্বারা গবর্নমেণ্ট গঠনের কথা ভাবিয়াছিলেন। পশ্চিমীরা মনে করিয়াছিলেন, কার্জন লাইন পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র গড়িয়া উঠিবে। সুতরাং উভয় পক্ষের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কোন মিল ছিল না।[১]

ফ্যাসিজম ও নাৎসীবাদের উৎপাটনপূর্বক জনগণের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক গবর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইবে বলিয়া ত্রিশক্তির পক্ষ থেকে যে বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছিল, তাতে মুক্তিপ্রাপ্ত ইউরোপ সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংকল্পের কথাও ঘোষিত হইয়াছিল :

'To foster the conditions in which the liberated peoples may exercise these rights, the Three Governments will jointly assist the people in any European liberated state or former Axis satellite state in Europe where in their judgement conditions require (a) to establish conditions of internal peace ; (b) to carry out emergency measures for the relief of distressed people ; (c) to form interim governmental authorities broadly representative of all democratic elements in the population and pledged to the earliest possible establishment through free elections of governments responsible to the will of the people ; and (d) to facilitate where necessary the holding of such elections.'

অর্থাৎ (অতলান্তিক সনদের নীতি অনুযায়ী) মুক্তিপ্রাপ্ত জনগণ যাতে এই সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করিতে পারে সেজন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি, ত্রিশক্তির গবর্নমেণ্ট একত্রে যে কোন মুক্তিপ্রাপ্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র কিংবা ইউরোপে অক্ষশক্তিবর্গের যে কোন প্রাক্তন তাঁবেদার রাষ্ট্রের জনগণকে তাদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী (ক) আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা দিবে ; (খ) দুঃস্থ জনগণকে রিলিফ বা সাহায্য দেওয়ার জন্য জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে ; (গ) জনগণের মধ্য থেকে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রতিনিধিগণকে নিয়া অন্তবর্তীকালীন গবর্নমেণ্ট গঠন করিবে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র অবাধ নির্বাচকের দ্বারা জনগণের ইচ্ছানুবর্তী গবর্নমেণ্টসমূহের প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইবে এবং (ঘ) যেখানে অনুরূপ নির্বাচনের দরকার হইবে, সেখানেই তেমন সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইবে।

কিন্তু পরবর্তীকালের বিরোধের কথা বাদ দিলে ইয়াল্টা সম্মেলন সত্যসত্যই ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। কেননা, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও

১। ডি. এফ. ফ্লেমিং, পৃষ্ঠা ২০৪-০৫।

সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে অধিকতর কূটনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রুজভেল্ট এই সম্মেলনে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তির জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘের ভিত্তিও ইয়াল্টা সম্মেলন থেকেই পাকা হইয়াছিল। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ স্টেটিনিয়াস ইয়াল্টা-সংক্রান্ত তাঁর পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ইয়াল্টা চুক্তির দ্বারা মোটের উপর মার্কিন ও বৃটিশ কুটনীতিরই জয় হইয়াছিল এবং মিত্রপক্ষ রাশিয়ার কাছ থেকে অনেক বেশী কনসেশন আদায় করিয়াছিলেন—সিকিউরিটি কাউন্সিলের ভোট থেকে শুরু করিয়া পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত অন্ততঃ ৬।৭টি প্রধান প্রধান বিষয়ে রাশিয়া পশ্চিমী মিত্রদের সঙ্গে আপোসরফা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইয়াল্টায় 'রুগ্ন রুজভেল্ট' স্ট্যালিনের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, বিরুদ্ধবাদীদের এই অপবাদ রটনার প্রতিবাদে স্বয়ং স্টেটিনিয়াস এবং শেরউড বলিয়াছেন যে, রুজভেল্টের আলোচনার শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ন ও সজীব ছিল। দিনের-পর-দিন ইয়াল্টা বৈঠকের গুরুদায়িত্ব তিনি খুব ধৈর্যের সঙ্গে বহন করিয়াছিলেন। দেহ পঙ্গু (রুজভেল্ট পোলিও রোগে আক্রান্ত ছিলেন) হওয়া সত্ত্বেও চার্চিল স্ট্যালিনের মত শক্তিশালী নেতাদের সঙ্গে এত বড় দায়িত্ব আর কেউ এত কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করিতে পারিতেন না। তিনি সর্বদাই সুবিবেচনা, সহানুভূতি অথচ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তবে, ক্রমাগত সাত দিন ধরিয়া এই গুরুদায়িত্ব বহনের পর তিনি শেষের দিকে স্বভাবতই ক্লান্তি বোধ করিয়াছিলেন।[১]

ইয়াল্টা সম্মেলনের সাফল্যে ইঙ্গ-মার্কিন মহলে খুশীর বান ডাকিয়াছিল—অবশ্য রুজভেল্ট ও সোভিয়েত-বিরোধী মহলে ছাড়া। পশ্চিমের পর্যবেক্ষকগণ স্ট্যালিনের পরিশ্রম ও কর্মনৈপুণ্য দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। কেননা, সম্মেলনের গুরুদায়িত্ব বহনের পরেও তিনি লালফৌজের সুপ্রীম কমাণ্ডার হিসাবে রণক্ষেত্রের সমস্ত দায়িত্ব বহন করিতেছিলেন এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত তিনি সেই গুরুদায়িত্ব পালন করিতেন।

ইয়াল্টা সম্মেলনের শেষে বিখ্যাত মার্কিন গ্রন্থকার উইলিয়াম শাইরার এই সম্মেলনকে 'মানুষের ইতিহাসের এক নতুন দিক্‌চিহ্ন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং রুজভেল্টের উপদেষ্টা হ্যারি হপকিন্স এই সম্মেলনকে 'নবযুগের আরম্ভ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও খুব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিলেন। আর স্ট্যালিনের এই উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছিল ভোজসভায়। ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি যে বৃহৎ ডিনার উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন, তাতে তিনি প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে 'পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সাহসী সরকারী ব্যক্তি' বলিয়া বর্ণনা করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন, যখন বাকী ইউরোপ হিটলারী জার্মানীর কাছে নতি স্বীকার করিতেছিল, তখন তিনি নিঃসঙ্গ ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে একাকী জার্মানশক্তিকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়াছিলেন। উপসংহারে মার্শাল স্ট্যালিন বলিলেন যে, তিনি ইতিহাসে এমন

১। ডি এফ. ফ্লেমিং, পৃষ্ঠা ১৯২।
২। শেরউড, পৃষ্ঠা ৮৬৯-৭০

দৃষ্টান্ত খুব কমই পড়িয়াছেন, যখন একটি-মাত্র লোকের সাহসিকতা সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পক্ষে এত গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। ('The Marshal concluded that he knew of few examples in history where the courage of one man had been so important to the future history of the world.')

চার্চিল উত্তরে বলিলেন যে, মার্শাল স্ট্যালিন হইতেছেন এক অপূর্ব পরাক্রমশালী দেশের এক অপূর্ব পরাক্রমশালী নেতা, যিনি সমগ্র জার্মান সামরিকযন্ত্রের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিয়াছেন, তার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এবং অত্যাচারীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করিয়াছেন। তাঁর বিশ্বাস যুদ্ধের মত শান্তির সময়েও স্ট্যালিন তাঁর দেশকে সাফল্য থেকে সাফল্যের মধ্যে লইয়া যাইবেন।...

অতঃপর মার্শাল স্ট্যালিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের গুণকীর্তন করিয়া বলিলেন যে, চার্চিলের ও তাঁর (স্ট্যালিনের) নিজের দেশ জার্মানীর প্রত্যক্ষ আক্রমণের শিকার হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেমন প্রত্যক্ষভাবে বিপন্ন ছিল না, তথাপি রুজভেল্ট বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া হিটলারের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে জমায়েত করিয়াছেন: এই প্রসঙ্গে তিনি কর্জ ও ইজারা বা "লেণ্ড ও লীজ"-এর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, হিটলার-বিরোধী মহাজোট গঠনের এবং রণক্ষেত্রে সমাবিষ্ট হওয়ার পক্ষে মিত্রপক্ষের নিকট ইহা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট-এর জবাবে বলিলেন যে, তিনি যেন এই ভোজসভায় এক পরিবারের অনুরূপ আবহাওয়া অনুভব করিতেছেন এবং তিন শক্তির মধ্যে সম্পর্ককে তিনি সেভাবেই বিচার করিতেছেন। গত তিন বছরে পৃথিবীতে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং আগামীদিনে আরও পরিবর্তন ঘটিবে। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য হইতেছে এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি নরনারী ও শিশুকে নিরাপত্তা ও কল্যাণের সন্ধান দেওয়া।[১]

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর উইনস্টোন চার্চিল ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫, কমন্সসভায় ইয়াল্টা চুক্তি এবং স্ট্যালিন ও সোভিয়েত নেতাদের প্রচুর প্রশংসা করিয়া মন্তব্য করিলেন যে, পশ্চিমের গণতন্ত্রের সঙ্গে তাঁরা শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবেন, এমন আশাই করিতেছেন।

আর রুজভেল্ট ১লা মার্চ, ১৯৪৫ মার্কিন কংগ্রেসের উভয় পরিষদের যুগ্ম অধিবেশনে ঘোষণা করিলেন—'আমি ক্রিমিয়া সম্মেলন থেকে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি যে, আমরা পৃথিবীর শান্তিরক্ষার পক্ষে অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি।'

* * *

কিন্তু এই সমস্ত 'শান্তির ললিত বাণী' এবং ঐক্যের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও উভয় পক্ষই যার যার এলাকায় ইচ্ছামত সরকার গঠন করিলেন—চার্চিল করিলেন ইতালীতে ও গ্রীসে, আর স্ট্যালিন করিলেন বুলগেরিয়ায় ও রুমানিয়ায়।[২]

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ৮৬৮-৬৯।
২। দি কোল্ড ওয়ার, ডি. এফ. ফ্লেমিং, পৃষ্ঠা ২০৮।

অষ্টম পর্ব

সপ্তম অধ্যায়

শান্তির সন্ধানে জাপান

১৯৪৪ সালে ইউরোপে নাৎসী জার্মানীর পরাজয় যখন আসন্ন হইয়া উঠিল এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে যখন জাপান মার্কিন সামরিকশক্তির হাতে দ্বীপ-থেকে-দ্বীপান্তরের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিতে লাগিল, তখন সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে, বিশেষভাবে জাপানে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। এমন কি, জাপানের রাজনৈতিক অভিজাত মহলে এবং সামরিক মহলেরও কোন কোন অংশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা দেখা দিল এবং ভিতরে ভিতরে শান্তির জন্য একটা চাপা আন্দোলন সৃষ্টি হইল। কিন্তু ফ্যাসিস্ট ও জঙ্গীবাদী কঠোর শাসনের দৌরাত্ম্যে প্রকাশ্যে কেউ শান্তির জন্য আন্দোলন করিতে সাহসী ছিল না। তথাপি বিস্ময়ের কথা এই যে, জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণের এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের নাটকীয় চমক সৃষ্টির পর ১৮ মাসের মধ্যেই টোকিওর কিছু কিছু চিন্তাশীল লোক এই যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কে আশাহত হইলেন। এমন কি, ১৯৪২ সালের মধ্যভাগেই কোন কোন কূটনৈতিক নেতা শান্তিপূর্ণ আপোস-মীমাংসার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। জাপানের তদানীন্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী টোগো শিগেনোরির লিখিত বইতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন :

'As to the Russo-German war, I have mentioned previously that the Japanese Government had in July 1942 declined the German request for joint participation by Japan, and that I had around that time commenced preparations for making peace between the combatants.'

অর্থাৎ 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম সম্পর্কে আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধ করিবার জন্য জার্মানী যে অনুরোধ জানাইয়াছিল, জাপানী গবর্নমেণ্ট তা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সেই সময় আমি যুদ্ধরত দুইপক্ষের (জার্মানী ও রাশিয়া) মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম।'

জাপানী গ্রন্থকার অতঃপর লিখিয়াছেন যে, হিটলার এরপর স্ট্যালিনগ্রাদ ও ককেশাসের দিকে অভিযান করিলেন—উদ্দেশ্য বাকুর তৈলখনি দখল করা এবং পারস্য উপসাগরে পেঁছানো।

'...opening the way to a Junction with Japan (it was reported that the Japanese naval attache in Berlin had presented requests to the Germans on this last point.)'

অর্থাৎ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের সহিত হিটলারী জার্মানীর হাত

মিলাইবার ইচ্ছা ছিল—এমন অনুরোধ জাপানের নৌ-বিভাগ জার্মানীর নিকট করিয়া পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

কিন্তু ফিল্ড মার্শাল পাউলাসের নেতৃত্বে স্ট্যালিনগ্রাদে ২৫ লক্ষ সৈন্যের নিদারুণ বিপর্যয়ের পর সমগ্র জার্মানবাহিনীর পরাজয়ের সূচনা করিল।...[১]

উপরের এই বর্ণনার মধ্যে জার্মান ও জাপানী জঙ্গীবাদীদের গ্রাণ্ড স্ট্র্যাটিজির কথা বাদ দিলেও এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, খোদ তোজোর মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র মন্ত্রী টোগো শিগেনরি ১৯৪২ সালেই রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধাবসানের জন্য চিন্তা করিয়াছিলেন। কারণ টোগো যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন এবং শান্তির জন্য উৎসুক ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তখনকার জাপানে এই ধরনের কূটনীতিকের সংখ্যা সামান্যই ছিল এবং টোগো স্বয়ং তোজোর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

যদিও জার্মানী ও ইতালীর সঙ্গে জাপান মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তথাপি এই মৈত্রী থেকে জাপানের লাভ খুব সামান্যই হইয়াছিল। অবশ্য একথা ঠিক যে, ইউরোপে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক শক্তির অনেকখানিই সেদিকে ব্যস্ত ছিল, তথাপি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধের জন্য টোকিওতে অত্যন্ত উদ্বেগ সৃষ্টি হইয়াছিল। একাধিকবার জাপান প্রস্তাব করিয়াছিল জার্মানীকে রাশিয়ার সঙ্গে একটা বুঝাপড়ায় আসিবার জন্য, কিন্তু হিটলার তাতে কর্ণপাত করেন নাই এবং এমন উপেক্ষাভরে এই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন যে, জাপান এই প্রশ্ন নিয়া জার্মানীকে জোর তাগিদ দিতে পারেন নাই। যদিও জার্মানীর সহিত জাপানের সম্পর্ক ছিল মৈত্রীর, তথাপি সেই সম্পর্ক কখনও অন্তরঙ্গ ছিল না। উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু টেকনিশিয়ান ও সামরিক দ্রব্যের বিনিময় হইয়াছিল মাত্র।[২]

* * *

আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তে জাপানের বিপর্যয় ও প্রশান্ত মহাসাগরের সাইগন দ্বীপের পরাজয় একত্র হইয়া প্রধানমন্ত্রী তোজোর জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল এবং একথাও সত্য যে, তোজোর শত্রুর সংখ্যাও কম ছিল না। এমন কি, তাঁর মন্ত্রিসভার মধ্যেই তাঁর বিরোধীরা ছিলেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর গদি আঁকড়াইয়া থাকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তোজোকে পদত্যাগ করিতে হইল ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে।[৩]

পর্দার আড়ালে অনেক টানা-হেঁচড়ার পর জেনারেল কুনাকি কোইসো (Kuniaki Koiso) প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনি আগে ছিলেন কোরিয়ার গবর্নর জেনারেল এবং এঁর 'বে-সরকারী' সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও নৌমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন মিৎসুমাসা ইয়োনাই, যিনি ছিলেন অক্ষশক্তির বিরোধী। কোইসো ও তাঁর মন্ত্রিসভা হাইকমাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু চীনের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভের পর থেকেই সামরিক ও অসামরিক সরকারী সংগঠনগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্য যে বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটিই পরে সুপ্রীম কাউন্সিলে পরিণত হইল। ৬ জন প্রবীণ সদস্যকে নিয়া

১। The Cause of Japan—by Togo Shigenori P. 558-59.
(১৯৫২ সালে জাপানে প্রকাশিত এবং ১৯৫৬ সালে ইংরাজীতে নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত)
২। A History of Modern Japan Richard Story P. 221-22
৩। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২২৩।

গঠিত এই সুপ্রীম কাউন্সিল 'আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ মন্ত্রিসভা'রূপে কাজ করিত এবং জাপানের স্বদেশের ও বিদেশের নীতি এই কাউন্সিলই নির্ধারণ করিত। তবে, ক্যাবিনেটের অনুমোদন ছাড়া এই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু এই মন্ত্রিসভার দুইজন সদস্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিগেমিটসু এবং নৌ মন্ত্রী মিৎসুমাসা ইয়োনাই আপোসমূলক শান্তিচুক্তির প্রবক্তা ছিলেন। মার্কিন নৌ-অবরোধ এবং মার্কিন বিমানবহরের প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত সামরিক দিক থেকে জাপান খুব কাবু ছিল না। কারণ, অসামরিক প্রতিষ্ঠান ও বস্তুই বেশী ধ্বংস হইয়াছিল। তথাপি বৈদেশিক ও নৌবিভাগের কয়েকজন অফিসার মন্ত্রীদের নির্দেশে খুব গোপনে এমন চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাতে জনমতের চাপে পড়িয়া গবর্নমেন্ট এই যুদ্ধ শেষ করিতে বাধ্য হন। বিশেষতঃ "বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান" এড়াইবার জন্যই যুদ্ধের অবসান ঘটানোর প্রয়োজন—এমন চিন্তা সরকারী নেতাদের মাথায় ছিল। কিন্তু শান্তির শর্ত এবং শান্তি স্থাপনের পটভূমিকা সম্পর্কে সমগ্র অবস্থা পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত এমন প্রস্তাব উত্থাপন করাও কঠিন ছিল এবং সেই কাঠিন্যের বিশেষ কারণ ছিল নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কায়রো থেকে মার্কিন, বৃটিশ ও চীনের তিন শীর্ষ নেতা যে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবীর পুনরুক্তি করিলেন এবং জাপানকে তার অধিকৃত সমস্ত রাজ্য ও উপনিবেশ থেকে বঞ্চিত করার ঘোষণা দিলেন, তাতে জাপানের শাসকমহলের নিকট যুদ্ধের অবসান ঘটানো বিরাট প্রতিবন্ধকতারূপে দেখা দিল। তথাপি ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিগেমিৎসু টোকিওস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতের নিকট প্রস্তাব দিলেন জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে একটা বুঝাপড়া ও শান্তিচুক্তি স্থাপনের জন্য। হিটলারকে জাপানের এই প্রস্তাবের কথা জানানো হইলে হিটলার জবাব দিলেন যে জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া কোন বুঝাপড়ায় আসিতে প্রস্তুত, এমন কোন খবর তাঁর জানা নাই। বিশেষতঃ সোভিয়েত রাশিয়া যখন জয়লাভ করিতেছে, তখন এই ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন করা নিতান্ত বৃথা।[১]

তথাপি সিগেমিৎসু নিরুৎসাহ হইলেন না। জার্মানীর সহিত সোভিয়েত রাশিয়ার কোন আপোষমূলক সন্ধি রচিত হইতে পারে না, একথা জানা সত্ত্বেও সিগেমিদ্সু সুপ্রীম কাউন্সিলের বিবেচনার জন্য একটি দলিল তৈয়ার করিলেন। এই দলিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল দূর প্রাচ্য থেকে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক শক্তিকে ইউরোপের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া এবং জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে একটি পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরে সহায়তা করিয়া একদিকে জার্মানীকে পূর্ণ পরাজয় থেকে রক্ষা করা এবং অন্য দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের অবস্থান সহজ করিয়া তোলা। সিগেমিৎসু তাঁর এই দলিলে চুংকিং (চীন) ও টোকিওর মধ্যে আপোসের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যস্থতারও প্রস্তাব করিলেন এবং এজন্য মস্কোতে একটি বিশেষ প্রতিনিধিকে পাঠাইতে চাহিলেন। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এই বিশেষ দূত মস্কোতে সোভিয়েত রাশিয়ার ভাবভঙ্গি অনুধাবন করিয়া অবস্থা অনুযায়ী যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারিবেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী কোকি হিরোতার (Koki

১। Diplomacy of Aggression, Israeljan & Kutakov, P. 394-95.—(জাপানী ভাষায় প্রকাশিত ঐতিহাসিক দলিল থেকে উদ্ধৃত)

Hirota) নেতৃত্বে একটি বিশেষ মিশন মস্কোতে পাঠাইবার প্রস্তাব হইল। হিরোতা অনেক দিন মস্কোতে জাপানী রাষ্ট্রদূত ছিলেন। সুতরাং সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে তিনি খুব অভিজ্ঞ, এ কথা ধরিয়া লওয়া হইল। দরকার হইলে তিনি মস্কো থেকে বার্লিনে যাইবেন পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের জন্য। কিন্তু এই বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার ভাবভঙ্গীর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। অর্থাৎ নাৎসীদের সঙ্গে রাশিয়া কোন আপোস-মীমাংসায় রাজী ছিলেন না।

রাশিয়ার কাছ থেকে এভাবে বিমুখ হওয়া সত্ত্বেও জাপানী শাসকমহল হাল ছাড়িয়া দিলেন না। তাঁরা তখন তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য কোন তৃতীয় পক্ষের মারফত আপোস-মীমাংসার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিলেন। কারণ, বৃটিশ এবং মার্কিন উভয় সরকারী মহলেই এমন কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ছিল, যারা জাপানের পূর্ণ পরাজয়ের পক্ষপাতী ছিল না, তারা চাহিতেছিল ভবিষ্যতে জাপানকে দিয়া চীনে ও এশিয়ার গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধিতা করার জন্য। এই সময় টোকিওস্থিত প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ গ্রু (Joseph Grew) মার্কিন সরকারের সহকারী পররাষ্ট্র সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ১৯৪৪ সালের শেষ ভাগে। ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৪৩ সাল থেকে তিনি প্রায় ২৫০টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং তিনি জাপানকে তোষণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দূর-প্রাচ্যে মার্কিন নীতি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে জাপানের রাজতন্ত্র ও প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে প্রচারকার্য চালাইলেন। বৃটেনের একটি প্রভাবশালী রক্ষণশীল মহলও জাপান সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন। কারণ, বৃটিশ বণিকমহলের সঙ্গে জাপানের অভিজাত ও ধনিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং টোকিওর শাসকমহল মনে করিলেন যে, জাপানী সৈন্যবাহিনী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে যত বেশী বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে, তত বেশী তাঁদের পক্ষে সমঝোতা সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইবে। এমন কি, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী ক্রমে আরও বেশী শিথিল হইবে। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে জাপানী সৈন্যবাহিনী চীনের কুও মিণ্টাংবাহিনীকে পরাজিত করিয়া মাঞ্চুরিয়া থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত অধিকৃত রাজ্যের সীমা বিস্তার করিল। এর ফলে জাপানী জঙ্গীবাদীরা মনে করিলেন যে, চীনের বিনিময়ে তারা ইঙ্গ-মার্কিনের কাছ থেকে অধিকতর সুবিধা আদায় করিয়া নিতে পারিবেন।

ইতিমধ্যে ১৯৪৫-এর আরম্ভে জার্মানীর সামরিক অবস্থার আরও দ্রুত পতন ঘটিল এবং জার্মানীর পরাজয় ক্রমেই নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অন্যদিকে ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৪৫ মার্কিন সৈন্যরা বোর্নিও দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম আইওজিমার গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপে অবতরণ করিল। ফলে মার্কিন সমরশক্তি জাপানের মর্মস্থলের দিকে হাজার কিলোমিটারেরও বেশী আগাইয়া আসিল। সুতরাং জাপানী শাসকমহলে যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়ার জন্য একটা আন্দোলন দানা বাঁধিতে লাগিল এবং একটি 'পীস্ পার্টি' বা শান্তিস্থাপক দল গঠিত হইল। অনেক অভিজ্ঞ এবং প্রবীণ রাজনীতিক এই দলের সদস্যপদ গ্রহণ করিলেন, যেমন ওয়াকাৎসুমি, ওকাদা এবং কোনোয়ে প্রমুখ প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রিগণ, আর প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রিদ্বয় টোগো এবং সিগেমিৎসু এবং রাজকীয়

মহলের লর্ড প্রীভিসিল কিডো ও রাজদরবারের মন্ত্রী মাৎসুদারিয়া। এই শক্তিশালী দলটি অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করার দাবী তুলিলেন এবং তাঁদের পিছনে সমর্থন জানাইলেন কয়েকজন বিশিষ্ট কূটনীতিক এবং বিদেশস্থ আর্মি ও নেভির কিছু কিছু প্রতিনিধি। এঁরা চাহিলেন একদিকে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার এবং অন্যদিকে কুওমিণ্টাং ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সম্পর্কের বৈপরীত্যের সুযোগ নিতে। জাপানের সম্রাট বিভিন্ন প্রবীণ রাজনীতিকদের মতামত আহ্বান করিলেন। জেনারেল তোজোসহ প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রিগণ এবং রাজকীয় পরিবারের প্রিন্স কোনোয়ে (Konoye) প্রভৃতি সম্রাটকে জানাইলেন যে, যুদ্ধ আরও চলিতে থাকিলে জাপানী কমিউনিস্টদের হাত আরও শক্ত হইবে। যুদ্ধে পরাজয়ের চেয়েও কমিউনিস্ট বিপ্লব অধিকতর ভয়াবহ হইবে। অতএব তাঁরা নিরপেক্ষ সুইডেনের দূত ওয়াইডার বাগের (Widar Bagge) মারফত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কে বৃটিশ মতামত জানিতে চাহিলেন। তাঁরা মনে করিলেন আমেরিকার চেয়েও বৃটেনের সঙ্গে একটা আপোস-মীমাংসায় আসা সহজতর হইবে। এজন্য তাঁরা এতদূর পর্যন্ত প্রস্তাব করিলেন যে, তাইওয়ান ও কোরিয়া ছাড়া তাঁরা অন্যান্য দখলীকৃত সমস্ত অঞ্চল, এমন কি দরকার হইলে মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। মিত্রপক্ষের প্রীতি অর্জন ও শান্তি স্থাপনের পথ সহজতর করার উদ্দেশ্যে জাপান এমন ভঙ্গী দেখাইল যে, তারা জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পর্যন্ত রাজী আছে। এজন্য জাপান থেকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর প্রচারকার্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরের শেষে বার্লিন থেকে সেন্ট্রাল ইকোনোমিক ব্যুরো সুইজারল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত করা হইল। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত ঘটনায় বার্লিনেও কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। কিন্তু মিত্রপক্ষের তরফ থেকে তেমন কিছু অনুকূল সাড়া পাওয়া গেল না।

* * *

১লা এপ্রিল, ১৯৪৫ মার্কিনবাহিনী বিখ্যাত ওকিনাওয়া দ্বীপে আক্রমণ শুরু করিল। জাপানীরা প্রাণপণ শক্তিতে এবং অসাধারণ ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে আক্রমণকারীদের বাধা দিল। ১৩ সপ্তাহ ধরিয়া রক্তস্রাবী যুদ্ধের পর (৩৯ হাজার জাপ সৈন্য হতাহত এবং ১২৫২০ জন মার্কিন সৈন্য নিহত ও নিরুদ্দিষ্ট এবং ৩৬৬৩১ জন আহত হইল।) ওকিনাওয়ার পতন হইল। ফলে, জাপানের আরও সংকট ঘনাইয়া আসিল এবং মার্কিন বিমানবহর জাপানের উপর ভয়ংকর বোমা বর্ষণ করিতে লাগিল। জাপানের অধিকাংশ শহর এই বোমারু অভিযানে বিধ্বস্ত হইল।

৫ই এপ্রিল, ১৯৪৫ কইসো মন্ত্রিসভার যেদিন পতন ঘটিল, সেদিনই সোভিয়েত সরকার ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪১ সালের রুশ-জাপান নিরপেক্ষতার চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এভাবে বাতিলের কারণস্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করিলেন যে, জাপানের শাসকমহল বারবার এই চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন এবং জাপানের মিত্ররা সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে এবং জাপান সেই মিত্রদিগকে সাহায্য করিতেছে। সুতরাং সমগ্র অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে এবং এই প্রকার পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষতার চুক্তি অর্থহীন।

এভাবে জাপানের বিরুদ্ধে একটির-পর-একটি আঘাত আসিতে লাগিল। জাপানী

কূটনৈতিক নেতারা সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের সঙ্গে আপোস-মীমাংসা ঘটাইতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু জাপানের জঙ্গীবাদী মহল ক্রমাগত বাধা দিল। তখন আবার নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্ন উঠিল এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধ বা শান্তি স্থাপনের প্রশ্ন। অবশেষে যুদ্ধের সময়কার শেষ প্রধানমন্ত্রীর পদে যাঁকে নির্বাচন করা হইল, তিনি অতীতে ছিলেন ইম্পিরিয়েল গার্ডের অধিনায়ক এবং সম্রাটের একজন সাহায্যকারী —নাম এ্যাডমিরাল কানতারো সুজুকি, কিন্তু তখন তিনি বৃদ্ধ এবং কালা। তবে, যুদ্ধের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে যাঁকে গ্রহণ করিলেন সেই শিগেনোরি টোগোও ছিলেন যুদ্ধের বিরোধী এবং এই যুদ্ধের প্রশ্নেই তিনি প্রাক্তন তোজো মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করিয়াছিলেন। টোগো সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব সৃষ্টি করিতে চাহিলেন। এমন কি, সুজুকি গবর্নমেণ্ট ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে অধিকৃত দক্ষিণ শাখালিন ও উত্তর কিউরাইল দ্বীপ পর্যন্ত ফেরৎ দিতে চাহিয়াছিলেন। জাপানী ক্রুজারের বদলে সোভিয়েত তৈল পাওয়া যায় কিনা, এমন আজগুবি প্রস্তাব পর্যন্ত উঠিয়াছিল।···

এই সময় ১১ই মে থেকে তিন দিন ধরিয়া জাপানী সমর ও কূটনৈতিক নেতারা যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে গভীর আলোচনা করিলেন বটে, কিন্তু জঙ্গীবাদীদের মতামতই বেশী প্রভাব বিস্তার করিল। সুতরাং টোগোর চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অধিকন্তু জাপানী সমর সচিব কোরোচিকা আনামী 'শান্তির পক্ষপাতী' সন্দেহে ৪০০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলেন। এই ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন কূটনীতিকও ছিলেন।···

জাপানে যাঁরা শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরা নানাভাবে এবং বৈদেশিক কূটনৈতিক দপ্তরের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়া বা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সঙ্গে একটা আপোস-মীমাংসামূলক সন্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুইজারল্যাণ্ডে মার্কিন গোয়েন্দা চক্রের কেন্দ্র এ্যালান ডালাসের সঙ্গেও জাপানীরা যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পর্তুগালের রাজধানী লিসবনেও মার্কিন মিশনের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত শান্তি আলোচনার সবচেয়ে বড় বাধা ছিল দুটি—প্রথমতঃ ফ্যাসিস্টপন্থী জাপানী জঙ্গীবাদীদের প্রবল বাধাদান এবং দ্বিতীয়তঃ মিত্রপক্ষের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী। কিন্তু এই দাবী জাপানের পক্ষে মানিয়া লওয়া কঠিন ছিল এজন্য যে, জাপানীরা সম্রাট বা মিকাডোর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং রাজতন্ত্র সুরক্ষিত রাখার গ্যারাণ্টি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা কোন শান্তিচুক্তিতে রাজী হইতে পারেন নাই।

এভাবে কয়েক মাস ধরিয়া শান্তি চেষ্টার পর জুলাই মাসে পটসডাম কনফারেন্স নিকটবর্তী হইল এবং সেখান থেকে মিত্রশক্তির নেতারা জাপানের প্রতি আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত আহ্বান জানাইলেন।*

* মস্কো থেকে প্রকাশিত 'ডিপ্লোম্যাসি অব আগ্রাসন' পুস্তকে প্রচুর জাপানী ও বৈদেশিক দলিলের যে সমস্ত মূল্যবান রেফারেন্স দেওয়া হইয়াছে, আলোচ্য অধ্যায়টির রচনায় সেগুলির সাহায্য নেওয়া হইয়াছে—অবশ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে।—লেখক।

নবম পর্ব

প্রথম অধ্যায়

ইঙ্গ-মার্কিন বিতর্কে বার্লিন : রাইন নদী অতিক্রম

১৯৪৫ সালের মে মাসে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের উপর যে যবনিকা পড়িল তার আগে পশ্চিম দিক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন-কানাডীয় মিত্রবাহিনীর জার্মানির অভ্যন্তরে অভিযান এবং পূর্বদিকে ওডের নদীর সেতুমুখ থেকে মাত্র ৩০।৪০ মাইল দূরবর্তী বার্লিনের দিকে লালফৌজের অভিযান—এই দুইটিকেই মহাযুদ্ধের শেষ অংক বলা যাইতে পারে। অবশ্য এই শেষ অংকের চূড়ান্ত আঘাত হানিয়াছিল সোভিয়েত বাহিনী খাস বার্লিন শহরে, যেখানে ভূগর্ভের পাতালপুরীর আশ্রয়ে হিটলার তাঁর শেষশয্যা রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রায় একই সময়ে ইতালীর ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর মুসোলিনী চরম দণ্ড লাভ করিয়াছিলেন—ইতালীয় গেরিলা যোদ্ধাদের হাতে।...

পশ্চিম ইউরোপ থেকে মিত্র বাহিনী ১৯৪৪-এর শেষভাগে রাইন নদীর ধারে পেঁাছিয়াছিলেন। কিন্তু আর্দানেস অঞ্চলে ডিসেম্বর মাসে হিটলারের অপ্রত্যাশিত পাল্টা-আক্রমণে মিত্রবাহিনী বিষম জব্দ হইয়াছিল এবং সেই আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে মিত্রবাহিনীর যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তর (Supreme Headquarters of the Allied Expetitionary Forces—সংক্ষেপে SHAEF) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পুরাতন ও প্রসিদ্ধ রেইমস্ (Reims) শহরে। উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের এই অঞ্চলে শতাব্দীর পর-শতাব্দী ধরিয়া অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া গিয়াছে এবং অতীতে ফ্রান্সের রাজন্যবর্গের অভিষেক উৎসব এখানেই অনুষ্ঠিত হইত। সুতরাং মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমাণ্ডারের প্রধান শিবির-অঞ্চলের একটা ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ছিল বৈকি এবং সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে শেষ অভিযানের কাহিনীও যুক্ত হইল। হিটলারী নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার যে গ্রাণ্ড কোয়ালিশন সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই কোয়ালিশনের মধ্যে যুদ্ধের এই শেষ পর্যায়ে মতভেদ এবং বিরোধও কম হয় নাই—যদিও ভাগ্যক্রমে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে কোয়ালিশন ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। কিন্তু এই মতভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়াছিল একদিকে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে এবং অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে রণনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রশ্নে।

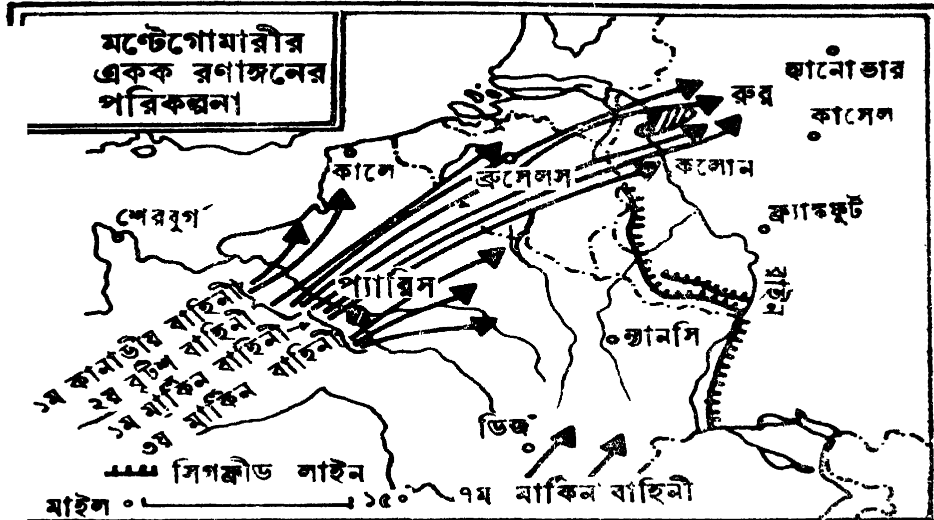
কয়েক মাস আগে পশ্চিম রণাঙ্গনে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির পরিকল্পনার সময় সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর প্রধানদের পক্ষ থেকে একটি মাত্র বাক্যে সুপ্রীম কমাণ্ডারকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল :

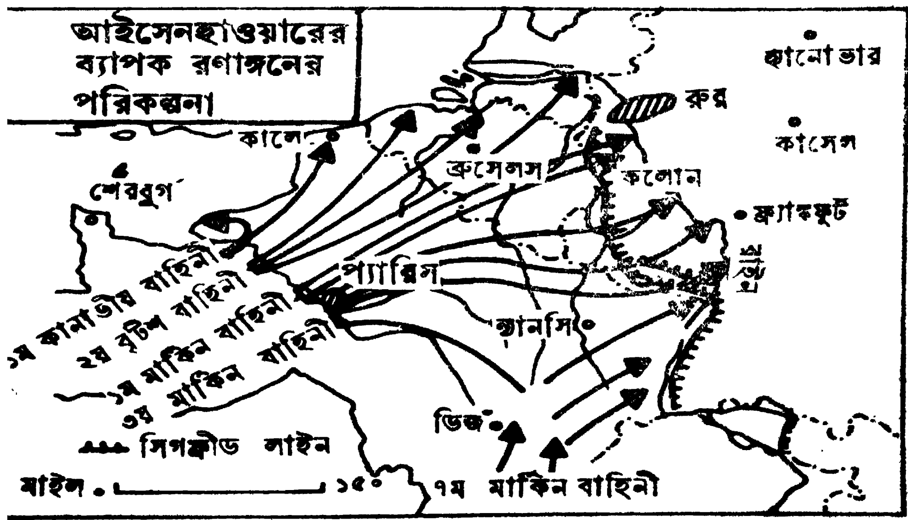
'আপনি ইউরোপীয় মহাদেশে প্রবেশ করবেন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড নেশন্স) অন্যান্যের সহিত একযোগে জার্মানীর মর্মস্থান লক্ষ্য করে ও সশস্ত্র বাহিনীগুলির ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রণক্রিয়া অবলম্বন করবেন।'

এই দায়িত্ব তিনি যথাসম্ভব কৃতিত্বের সঙ্গেই পালন করিয়াছিলেন। তথাপি পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের অনেকের কাছেই আইজেনহাওয়ার সমালোচনার পাত্র হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি রাজনীতি নিয়া মাথা ঘামান নাই, ৫৫ বছর বয়স্ক আইক ইউরোপীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী বৃটিশ সেনাপতিদের মত রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সামরিক রণনীতির অঙ্গীভূত বলে মনে করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি শুধু যুদ্ধজয় চাহিয়াছিলেন এবং রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি রাখিয়া দিয়াছিলেন রাষ্ট্রনেতাদের জন্য। 'যুদ্ধোত্তর জার্মানীর রাজনীতি-সংক্রান্ত কোন নির্দেশ তাঁকে কখনও দেওয়া হয় নাই।' আইক তাঁর প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—'আমার কাজ ছিল খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করা এবং যথাসম্ভব দ্রুত জার্মান আর্মিকে ধ্বংস করা।'—[১]

কিন্তু বার্লিন কে আগে দখল করিবে, ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ কিংবা সোভিয়েত রাশিয়ার সৈন্যদল? এই বিতর্ক উত্থাপন করিলেন বৃটিশ পক্ষ। ৫৮ বছর বয়স্ক বৃটিশ সেনাপতি খ্যাতিমান ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারী এবং ইম্পিরীয়েল জেনারেল স্টাফের প্রধান ফিল্ড মার্শাল স্যার অ্যালান ব্রুক বার্লিন দখলের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং একটি মাত্র বিদ্যুৎগতি আঘাতের দ্বারা (lightning-like single thrust) বার্লিন পর্যন্ত দখল ও যুদ্ধ শেষ করার দাবী জানাইয়া আসিতেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এর পিছনে সেরা মস্তিষ্ক ছিল স্যার উইনষ্টোন চার্চিলের, সেদিনের সারা পৃথিবীতে যাঁর মত কূটনৈতিক রণনীতিবিদ্ আর কেউ ছিলেন না। সুতরাং প্যারিস পুনরায় দখলের পরেই চার্চিলের পৃষ্ঠপোষিত ও প্রশংসিত মণ্টগোমারী ২১তম আর্মি গ্রুপের দ্বারা জার্মানীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য জেনারেল আইজেনহাওয়ারের কাছে দাবী জানাইলেন। আইকের নিকট দাখিল-করা এক স্মারকলিপিতে মণ্টি মন্তব্য করিলেন যে, আইজেনহাওয়ারের প্রস্তাবিত ব্রড ফ্রণ্ট বা একাধিক রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চালাইবার মত উপযুক্ত উপকরণ ও সমর-সম্ভার তখন পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছে নাই। সুতরাং সমস্ত শক্তি দিয়া একটি মাত্র রণাঙ্গনে আক্রমণের দ্বারাই যুদ্ধ শেষ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য উপকরণ জুটিলে অন্যান্য রণাঙ্গনেও আঘাত দেওয়া সম্ভব। কিন্তু মার্কিন মহলের ধারণা মণ্টির প্রস্তাবিত দুইটি আর্মি গ্রুপের ৪০ ডিভিসন সৈন্য নিয়া এই ধরনের আক্রমণের সংকল্প যেন একটা জুয়ার মত। কারণ, চূড়ান্ত জয়ের কোন নিশ্চয়তা নাই এবং এই জয় অর্জিত না হইলে অপূরণীয় ক্ষতি ও বিপর্যয়কর পরিণাম ঘটিতে পারে। অর্থাৎ সুপ্রীম কমাণ্ডারের কাছে এই প্রকার যুদ্ধে সাফল্যের চেয়ে বিপদের ঝুঁকি বেশী মনে হইল এবং সেই ঝুঁকি নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। আইকের রণনীতির মর্ম ছিল আগে আরও সরবরাহের ব্যবস্থা করা—লে হাভর (Le Havre) এবং এণ্টোয়ার্প বন্দর মুক্ত করা এবং তারপর চওড়া রণাঙ্গনে জার্মানীর ভিতর দিয়া আগাইয়া যাওয়া। কিন্তু বার্লিন অভিযানের আগে রাইন নদীর দুরূহ বাধা অতিক্রমপূর্বক রুঢ়ের বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল দখল করা।

১৯৪৪, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যে সমস্ত মত বিনিময় হইল, সেগুলিই এক সপ্তাহ পর আইজেনহাওয়ার তাঁর তিন সেনাপতি মণ্টগোমারী, ব্রাড্‌লি ও ডেভার্সের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া জানাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, বার্লিনও আমাদের লক্ষ্য বটে, সেখানে শত্রুসৈন্যের সমাবেশও সর্বাধিক ঘটিবে। সুতরাং আমাদের সমস্ত





সম্পদ সেদিকেই নিয়োগ করিতে, হইতে পারে। কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, আমাদের রণনীতিকে রুশদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। সুতরাং বিকল্প উদ্দেশ্য ভাবা দরকার। যেমন, উত্তর জার্মানীর বন্দরগুলি আগে দখল করার প্রয়োজন

হইতে পারে বার্লিন যুদ্ধের পার্শ্বদেশ রক্ষা করার জন্য। এমন কি লাইপজিগ-ড্রেসডেন এবং দক্ষিণ জার্মানীর দিকেও অভিযানের প্রয়োজন হইতে পারে।

মার্কিন লেখকদের মতে আইজেনহাওয়ারের 'ব্রড ফ্রন্ট পলিসি' ভুল হোক, আর শুদ্ধই হোক, তিনি ছিলেন পশ্চিম রণাঙ্গনের সুপ্রীম কমান্ডার। সুতরাং তাঁর হুকুম মানিতেই হইবে। কিন্তু আইজেনহাওয়ার এই দিক দিয়া বিষম হতাশা বোধ করিলেন। এদিকে বৃটিশ মহলে সেনাপতি হিসাবে মণ্টির জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি ছিল অসাধারণ। সুতরাং তিন মাসের মধ্যে যুদ্ধ খতম করার যে পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, সুপ্রীম কমান্ডারের নিকট সেটা গৃহীত না হওয়ায় মণ্টি ক্ষুব্ধ হইলেন।

১৯৪৪ সালের শরৎকালে দুই সেনাপতির মধ্যে এই রণনৈতিক বিরোধের আরম্ভ কখনও সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয় নাই। বরং আর্দানেস অঞ্চলে জার্মানীর পালটা-আক্রমণের (ডিসেম্বর ১৯৪৪) ফলে এই বিরোধ যেন বিস্ফোরণের আকার ধারণ করিল। কারণ, এই আকস্মিক হিটলারী আক্রমণে ইঙ্গ-মার্কিন ফ্রন্ট দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। সুতরাং আইক বাধ্য হইলেন উত্তর স্ফীতিমুখের সমস্ত সৈন্য মণ্টগোমারীর নেতৃত্বাধীনে আনিতে। অর্থাৎ জেনারেল ব্রাড্‌লির ১২নং আর্মি গ্রুপের বারো আনাই (১নং ও ৯নং মার্কিনবাহিনী) মণ্টির পরিচালনাধীনে দিতে হইল।

এরপর আরও ঘোরালো অবস্থার উদ্ভব হইল। স্ফীতিমুখের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জার্মানদের পশ্চাতে হটিবার পর মণ্টগোমারী একটি প্রেস কনফারেন্সে এমন ভঙ্গী দেখাইলেন যে, যেন তিনি একক হস্তে আমেরিকানদের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য উত্তর ও পূর্বদিক থেকে মণ্টির পালটা আঘাত খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি মার্কিনদের উদ্ধারকর্তা ছিলেন না। অধিকন্তু তিনি এই সাংবাদিক বৈঠকে বিশিষ্ট মার্কিন সেনাপতি ব্রাড্‌লি, প্যাটন প্রভৃতির নাম একবারও উল্লেখ করিলেন না। অথবা প্রত্যেকটি ইংরেজ সৈন্যের জন্য ৩০ থেকে ৪০ জন মার্কিন সৈন্যকে যে লড়িতে হইয়াছিল কিংবা প্রত্যেকটি বৃটিশ সৈন্যের জন্য ৪০ থেকে ৬০ জন আমেরিকান সৈন্য যে হতাহত হইয়াছিল, সে কথাও মণ্টি উল্লেখ করিলেন না। অথচ স্বয়ং চার্চিল ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের এই গুরুতর অবনতিতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া ১৮ জানুয়ারী ১৯৪৫, কমন্সসভায় যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে উল্লেখ করিলেন যে, আর্দেনেসের প্রায় সমস্ত যুদ্ধটাই করিয়াছেন আমেরিকানরা এবং দুষ্ট লোকদের প্ররোচনায় না-ভুলিবার জন্য তিনি বৃটিশ জনমতকে সাবধান করিয়া দিলেন।—(উপরের উদ্ধৃত সৈন্য সংখ্যাও চার্চিলের দেওয়া।)[১]

বৃটিশ-মার্কিন সম্পর্কের এমন অবনতি আর কখনও ঘটে নাই। 'মণ্টিকে প্রমোশন দাও'—এই মর্মে যে প্রোপাগাণ্ডা শুরু হইয়াছিল তাতে মার্কিন সেনাপতি ব্রাড্‌লি ও প্যাটন উভয়েই আইজেনহাওয়ারকে জানাইলেন যে, যদি ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীকে স্থল বাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার পদে নিয়োগ করা হয়, তবে তাঁরা পদত্যাগ করিবেন। অবস্থা এমন গুরুতর আকার ধারণ করিল যে, সুপ্রীম কমান্ডারের নিকটও তা' অসহ্য মনে হইল। সুতরাং তিনি এর একটা হেস্তনেস্ত করিতে চাহিলেন। তিনি সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর দপ্তরে সমস্ত বিষয়টি পেশ করিয়া মণ্টগোমারীকে অপসারণের কথা চিন্তা করিলেন।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২০৮।

এদিকে মণ্টির সেনানীমণ্ডলীর অধিকর্তা জেনারেল ডি. গুইনগাণ্ড (De Guingand) আসন্ন বিস্ফোরণের কথা জানিতে পারিয়া বিপদ গণিলেন। তিনি দ্রুত আইকের সদর দপ্তরে গিয়া হাজির হইলেন এবং সেখানে স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, আইক এই মর্মে ওয়াশিংটনে এক বার্তা পাঠাইতেছেন যে, 'হয় মণ্টি থাকবে, কিংবা আমি থাকবো।' ('It is either me or Monty')। তখন ডি. গুইনগ্যাণ্ড জেনারেল বেডেল স্মিথের (আইকের সেনানীমণ্ডলীর প্রধান) সহায়তায় ও সহযোগিতায় আইজেনহাওয়ারকে অনুরোধ করিলেন এই বার্তা ২৪ ঘণ্টা দেরী করিয়া পাঠাইতে। আইক শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে রাজী হইলেন।

মণ্টগোমারী সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়ার পর সুপ্রীম কমাণ্ডারের নিকট সৈন্যজনোচিত এক বার্তা পাঠাইলেন :

'আমার অবাধ্য হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই। আমার উপর শতকরা ১০০ ভাগ নির্ভর করতে পারেন।' নীচে স্বাক্ষর দিলেন—'আপনার একান্ত অনুগত ও আজ্ঞাধীন—মণ্টি।'

এই বার্তার পর তখনকার মত বিরোধের অবসান হইল। (যুদ্ধের পর ১৯৬৩ সালে মণ্টি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁর ঐ ধরনের প্রেস কনফারেন্স করা ঠিক হয় নাই। সে সময় বহু মার্কিন সেনাপতি তাঁকে অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন)।

গত জানুয়ারী মাসে মাল্টায় সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর প্রধানদের বৈঠকে রুঢ়ের উত্তর দিক দিয়া মূল আক্রমণ সম্পর্কে আইজেনহাওয়ারের যে পরিকল্পনা অনুমোদিত হইয়াছিল, মণ্টি সেটাকেই বাড়াইয়া বার্লিন পর্যন্ত বিস্তৃত করার জন্যে তাড়া দিতেছিলেন। কারণ, চার্চিল ও ফিল্ড মার্শাল ব্রুকের মত মণ্টগোমারীও বিশ্বাস করিতেন যে, সময় দ্রুত বহিয়া যাইতেছে। যদি রুশদের আগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বার্লিন দখল করিতে না পারে, তবে যুদ্ধজয় রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হইবে। অথচ ওয়াশিংটন থেকে সুপ্রীম কমাণ্ডার রাজনৈতিক পলিসিগত কোন নির্দেশ (যাতে ব্রিটিশ মনোভাব প্রতিফলিত হইতে পারে) পান নি। তিনি যখন রাইন নদী আক্রমণ এবং রুঢ়ের উত্তর দিক দিয়া মণ্টির প্রস্তাবিত অভিযান নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁর বাহ্যত মনে হইয়াছিল যে, রুশদের বার্লিনের সীমানায় পেঁাছিতে আরও কয়েক মাস সময় লাগিবে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, লালফৌজ ইতিমধ্যেই বার্লিনের ৪০ মাইলের মধ্যে পেঁাছিয়া গিয়াছে এবং ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী তখন ২০০ মাইল দূরে !

সুতরাং আইকের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিল—জুকোভ কখন বার্লিন আক্রমণ করিবে ? তিন সেনাপতি কি একযোগে অভিযান করিবে ? জার্মানদের বাধাদানের শক্তি কিরূপ ?—এই সমস্ত গুরুতর প্রশ্নের কোন উত্তর আইকের জানা ছিল না। অথচ তাঁর রণ-পরিকল্পনার জন্য এগুলি জানা নিতান্তই অপরিহার্য ছিল।

কিন্তু আসল সত্য এই ছিল যে, আইজেনহাওয়ার রুশদের পরিকল্পনার কিছুই জানিতেন না। তাঁর সদর দপ্তরের সঙ্গে মস্কোর ইঙ্গ-মার্কিন মিশনের কোন প্রত্যক্ষ রেডিও যোগাযোগও ছিল না। লণ্ডন থেকে বি. বি. সি. যে রুশ সামরিক ইস্তাহার

প্রচার করিত একমাত্র সেটুকুই ছিল সংবাদ জানার উৎস। অথচ রুশেরা যখন বার্লিনের এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে তখন আইকের কি উচিত হইবে বার্লিনে অভিযান করা?

রাইন নদী অতিক্রম

কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন মহলের এই সমস্ত উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনার আগে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, পশ্চিম দিক থেকে রাইন নদী অতিক্রম করার পর মিত্রপক্ষীয় বিরাট সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত দ্রুত জার্মানীর অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাইয়াছিল। কারণ, জার্মানী তখন পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিক দিয়া আক্রান্ত ও বিপন্ন এবং এই দুই দিকের আক্রমণ ঠেকাইবার কোন সাধ্য জার্মানীর ছিল না। তবু ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম ও শেষ ভাগে হিটলার জার্মান জনগণের উদ্দেশ্যে দুইটি শেষ রেডিও বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু এই বক্তৃতায়ও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গোঁ এবং গোয়ার্তুমি ফুটিয়া উঠিল। নববর্ষের বক্তৃতায় তিনি জার্মান জনগণকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন যে, যারা ভীরু, যারা পরাজয়বাদী, জার্মান জাতি এই জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে তাদেরকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা হইবে। তবে, '১৯৪৬ সালের আগে জার্মানীর জয় ছাড়া এই যুদ্ধ শেষ হইবে না। কারণ, জার্মানী কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না।' অতঃপর হিটলার মিত্রপক্ষকে তীব্র আক্রমণ করিয়া বলিলেন যে, বলশেভিক, ইহুদী এবং গণতন্ত্রীরা জার্মানীকে দাসজাতিতে পরিণত করিতে, জার্মানীর যুবশক্তিকে কলুষিত করিতে এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীকে উপবাসে রাখিয়া মারিয়া ফেলিতে চায়। যুদ্ধে পরাজয় ঘটিলে জার্মান জাতির অস্তিত্ব, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির এই পরিণাম ঘটিবে।

২০শে জানুয়ারীর (১৯৪৫) দ্বিতীয় বক্তৃতায় নাৎসী নায়কের ক্ষমতা লাভের ১৩তম বার্ষিকী উপলক্ষে হিটলার শেষ পর্যন্ত আর নিজের সামরিক দম্ভের উপর ভরসা রাখিতে পারিলেন না। তিনি একেবারে করুণাময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, যেন প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলিলেন:

'Almighty God will not abandon the man who throughout life wanted nothing but to preserve his people from a fate they did not deserve.'

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিশ্চয়ই সেই মানুষটিকে ত্যাগ করিবেন না, যে মানুষটি তার জাতির জনগণকে এমন এক পরিণাম থেকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল, যে পরিণাম তাদের প্রাপ্য ছিল না।'

ঈশ্বরের নিকট এই করুণ প্রার্থনার পরেই হিটলার তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে বলিলেন, 'আমি আশা করি প্রত্যেকটি জার্মান তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কর্তব্য পালন করিবে। আমি প্রত্যাশা করি সমস্ত জার্মান স্ত্রীলোক ও যুবতী চরমতম ফ্যানাটিসিজম বা গোঁড়ামির দ্বারা এই যুদ্ধ সমর্থন করিবে। যে কেহ আমাদের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করিবে, তাকেই ঘৃণা ও অপমানজনক মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।'[১]

১। স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৫০১

কিন্তু হিটলারের বক্তৃতায় সেই আগের উত্তেজনা, বলিষ্ঠতা এবং দৃঢ়তা ও আত্ম-বিশ্বাস ছিল না। কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক দিয়া অবস্থা মারাত্মক হইয়া উঠিতেছিল। জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ—এই তিন মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনী বহু বাধা অতিক্রমপূর্বক শেষ 'প্রাকৃতিক বিঘ্ন' রাইন নদী পার হইয়া আসিল। উত্তর ভাগে ১নং কানাডীয় বাহিনী, ২নং বৃটিশ বাহিনী এবং ৩নং মার্কিন বাহিনী ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর অধীনে, মধ্যভাগে ১২নং মার্কিন আর্মিগ্রুপ জেনারেল ওমর ব্রাডলির অধীনে এবং দক্ষিণভাগে ৬নং আর্মিগ্রুপ (মার্কিন ও ফরাসী বাহিনীসহ) লেঃ জেনারেল জ্যাকব এল. ডেভার্সের (Jacob L. Devers) নেতৃত্বে যে অভিযান চালাইল তাতে আর্দানেসে জার্মান প্রত্যাক্রমণের ব্যর্থতার পর রাইনের পশ্চিম তীরে জার্মানীর আর বাধা দেওয়ার শক্তি রহিল না। তথাপি ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম-ভাগে বরফে, কাদায় ও জলে এবং অত্যন্ত বিরূপ প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে নিজমেজেনের (Nijmegen) দক্ষিণ-পূর্বে মিত্রবাহিনীর আক্রমণ এক ভয়ংকর রক্তস্রাবী যুদ্ধে পরিণত হইল। জার্মানরা রাইনের সেতুগুলি উড়াইয়া দিয়া পিছু হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল—২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫। রাইন নদীর অন্যান্য অংশেও জার্মানরা প্রতিরোধের চেষ্টা করিল এবং কোথাও কোথাও ড্যামু বা বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া বন্যার জল সৃষ্টি করিল। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও ১৩ই মার্চের মধ্যে রাইন নদীর পশ্চিম তীরের সমগ্র উত্তর অংশ মিত্রবাহিনীর হাতে গেল। মধ্য অংশেও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটিল। ৭ই মার্চ কলোন দখল হইয়া গেল এবং জার্মান সৈন্যেরা হোহেনজোলার্ন ব্রীজ ভাঙিয়া দিয়া পিছনে হটিয়া গেল।

কিন্তু সামরিক ইতিহাসে ভাগ্যের সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল ৭ই মার্চ, ১৯৪৫। রাইন নদীর এই মধ্যস্থলে প্রাকৃতিক বিঘ্ন ছিল সবচেয়ে প্রচণ্ড। কারণ, পূর্বতীর থেকে যে খাড়া পাহাড় উঠিয়াগিয়াছে, তা ছিল যেমন দুর্লঙ্ঘ্য তেমনি জার্মানরা অতি সহজেই সেখান থেকে আত্মরক্ষার লড়াই চালাইতে পারিত। এজন্য ১৮০৫ সালে নেপোলিয়নের পর আর কোন যোদ্ধা নদীর এই অংশ সাফল্যের সঙ্গে পার হইতে পারে নাই। কিন্তু মিত্রপক্ষের ভাগ্য সেদিন যেন দৈবক্রমেই খুলিয়া গেল। একজন জার্মান ক্যাপ্টেনকে রাইন নদীর রেমাজেনে অবস্থিত এই লুডেনডর্ফ ব্রীজটি বিকেল বেলা চারটার সময় উড়াইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ঠিক সাড়ে-তিনটার সময় বিস্ফোরক চার্জ করাও হইল। কিন্তু সেই বিস্ফোরণ এত দুর্বল ছিল যে, ব্রীজটির বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ৩-৫০ মিনিটের সময় সার্জেন্ট আলেকজান্দার ড্রাবিকের নেতৃত্বে এই প্লাটুন সৈন্যের ছোট্ট একটি দল সেখানে আসিয়া হাজির হইল। তারা উল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে সেতু পার হইতে লাগিল। জার্মানরা গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং তখন আর-একবার বিস্ফোরণ ঘটিল। এবার সেতুটির কিছু ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়িল না। এরপর মার্কিন সামরিক ইঞ্জিনীয়াররা আসিয়া হাজির হইলেন এবং অতি দ্রুত সেতুটির এমন মেরামত করিলেন যে, ট্রাক, ট্যাংক, ট্রেন ইত্যাদি সমস্ত ভারী দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি পাঠাইবার উপযুক্ত হইল এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ হাজার সৈন্য পার হইয়া গেল। আর সেই সঙ্গে আরও ২টি অস্থায়ী ব্রীজ তৈরী হইল। অবশ্য জার্মান

বোমারু বিমান পরে তীব্র পালটা আক্রমণ চালাইয়াছিল। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য তারা কৃতকার্য হইতে পারিল না।

রাইন নদী তীরের রেমাজন সেতুর এই 'ঐতিহাসিক ঘটনা' পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর দ্রুত পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি স্বয়ং হিটলার এবং গোয়েরিংও নাকি একথা স্বীকার করিয়াছিলেন।[১]

এমন অদৃষ্টপূর্বভাবে রাইন নদীর রুদ্ধদ্বার খুলিয়া যাইবে এবং রেমাজনের সেতু দিয়া দলে দলে মার্কিন ও মিত্রসৈন্য জার্মানীর অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ার সুযোগ পাইবে, এমন সৌভাগ্য আগে মিত্রপক্ষের সেনাপতিরা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ওপেন-হাইম ব্রীজের উপর দিয়াও জেনারেল প্যাটনের সৈন্যেরা রাইন নদী পার হওয়ার অনুরূপ সুযোগ পাইয়াছিলেন। স্বয়ং আইজেনহাওয়ার মন্তব্য করিয়াছেন—'এটা ছিল মহাযুদ্ধের অন্যতম শুভ মুহূর্ত। জার্মানীর মর্মস্থলে প্রবেশ করার চিরন্তন প্রতিরক্ষার বাধা এভাবে বিদীর্ণ হয়ে যাবে, এমন কথা আগে ভাবা যায় নি।'

জার্মানীর এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী মনে করিয়া হিটলার ৪ জন অফিসারকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত এবং গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। কিন্তু যে ক্যাপ্টেন (ব্রাটকে) আসলে দায়ী ছিলেন, তিনি কিন্তু ত্রাণ পাইয়া গেলেন। কেননা, ভাগ্যক্রমে তিনি আগেই আমেরিকানদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন।...

জার্মানদের পক্ষে এরপর আরও বিস্ময়ের কারণ ঘটিল। কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই ৭৫ হাজার মার্কিন সামরিক ইঞ্জিনীয়ার ৬২টি সেতু, ১১টি পাকা হাইওয়ে এবং ৫টি রেলওয়ে ব্রীজ রাইন নদীর উপর দিয়া তৈরী করিলেন। আর উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ২৫ মার্চ ১৯৪৫ তারিখের মধ্যে ৭টি মিত্রবাহিনী বিপুলতম ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রসম্ভার লইয়া সমগ্র রাইন নদীর ৫০০ মাইল পার হইয়া গেল।

৭০টি জার্মান ডিভিসন ওদের সম্মুখীন হইয়াছিল বটে, কিন্তু এরা নামেমাত্র ডিভিসন ছিল, আর রণশক্তি ও নৈতিকশক্তি বলিতে এদের সামান্যই ছিল। কার্যতঃ রাইন নদী পার হওয়ার সাতদিনের মধ্যেই পশ্চিমে জার্মানীর প্রতিরোধশক্তি ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে ক্রুদ্ধ হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি প্রবীণ যোদ্ধা ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেডকে পদচ্যুত করিলেন এবং ইতালীয় রণাঙ্গনের ফিল্ড মার্শাল কেসেলরিংকে তাঁর জায়গায় নিযুক্ত করিলেন।—[২]

জার্মান লাইনের পিছনে মিত্রপক্ষের প্রচুর বিমানবাহী সৈন্য নামিয়া পড়িল এবং রাইন নদীর বাধা অতিক্রম করার পর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের দ্বারা সার ও রুঢ় অঞ্চলের শিল্পসমৃদ্ধ এলাকাগুলিকে বাকী জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হইল। ১৯৪৫, মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোমারুগুলি এই সুবৃহৎ এবং প্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চলের উপর অন্ততঃ ৪২ হাজার বার হানা দিল। তারপর শুরু হইল রুঢ় অঞ্চলের বিরুদ্ধে বেষ্টন নীতি ও আক্রমণ। একথা সর্বজনবিদিত যে, রুঢ় অঞ্চলই ছিল জার্মানীর শ্রমশিল্পের মর্মকেন্দ্র এবং জার্মান সমরশক্তির মূল উৎস। ভুবনবিখ্যাত ক্রুপ, থাইডেন, ডর্টমুণ্ড, ডুইসবার্গ ইত্যাদি নামকরা বিরাট কলকারখানা কিংবা শ্রমশিল্পের শহরগুলি ধ্বংস হইতে লাগিল। তবু হিটলার মরীয়া হইয়া হুকুম দিলেন রুঢ় অঞ্চলের এক-একটি

১। স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৫০৬।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫০৭।

কারখানাকে এক-একটি দুর্গে পরিণত করার জন্য। জার্মান সৈন্যেরা প্রাণপণ শক্তিতে বাধাও দিল, কিন্তু লেঃ জেনারেল সিম্পসনের নবম মার্কিন বাহিনী এবং লেঃ জেনারেল হড্জের (Hodges) ১নং মার্কিন আর্মি রুড়কে ঘিরিয়া ধরিয়া সংহারকার্য চালাইতে লাগিল। ৩রা মার্চ, ১৯৪৫, সুপ্রীম কমান্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার জার্মান সৈন্য ও জনগণের উদ্দেশ্যে আর একবার আবেদন জানাইলেন আত্মসমর্পণের জন্য। কেননা, এই অবস্থায় জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ চালানো বৃথা লোকক্ষয় ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু হিটলার ও তাঁর চেলা-চামুন্ডারা এবং গেস্টাপো ও এস. এস. সংগঠনগুলি এমন বজ্রমুষ্ঠি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল যে, জয়ের কোন আশা নাই জানিয়াও তারা যুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে ১লা এপ্রিল, ১৯৪৫, ৯নং ও ১নং মার্কিন বাহিনীর দুই অংশ সাঁড়াশীর দুই বাহুর মত লিপস্টাড্ (Lippstadt) শহরে আসিয়া মিলিত হইল এবং রুড় অঞ্চলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ফিল্ড মার্শাল ভালথার মডেলের নাৎসী সৈন্যেরা ৮০ মাইল ব্যাসার্ধের এক সুবৃহৎ চক্রব্যূহের মধ্যে আটকা পড়িল এবং ২রা থেকে ১৮ই এপ্রিল পর্যন্ত দুই সপ্তাহের মধ্যে রুড়ের সুবিখ্যাত শিল্পাঞ্চল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। অজস্র জার্মান সৈন্য এই প্রতিরক্ষার যুদ্ধে মারা পড়িল এবং চার্চিলের মতে মিত্রপক্ষের হাতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার সৈন্য বন্দী হইল। ফিল্ড মার্শাল মডেল হিটলারের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়া হতাশ ও বিষণ্ণচিত্তে ২১ এপ্রিল, ১৯৪৫, ডুইসবার্গের নিকটবর্তী এক জঙ্গলে আত্মহত্যা করিলেন।

* * *

রাইন নদীর বাধা অতিক্রান্ত এবং সিগফ্রীড লাইন ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইনের মত ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ার পর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর নিকট জার্মানীর অভ্যন্তর ভাগের শহরগুলির দ্রুত পতন হইতে লাগিল। বিশেষত পূর্বদিক থেকে সোভিয়েত বাহিনীর দুর্দান্ত অভিযানের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জার্মান সৈন্যবাহিনীর শক্তি আরও বৃদ্ধি করার জন্য অনেকগুলি জার্মান ডিভিসনকে পূর্ব রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করা হইল। এর ফলে পশ্চিমে মিত্রবাহিনীর পক্ষে আরও সুবিধা হইল এবং বৃটিশ মহল থেকে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করা হইল বার্লিন অভিযানের জন্য। অর্থাৎ রুশদের আগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কর্তৃক বার্লিন দখলের জন্য। কিন্তু মার্শাল জুকোভের সৈন্যেরা ইতিমধ্যেই বার্লিনের ৩০/৪০ মাইলের মধ্যে পেঁাছিয়া গিয়াছিল। সুতরাং আইজেনহাওয়ার বার্লিন দখলের জন্য রুশদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিতে রাজী ছিলেন না। কারণ এতে দুই পক্ষেরই বিব্রত ও বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অর্থাৎ অগ্রসরমান দুই মিত্রপক্ষের গতিশীল বাহিনীগুলির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটিতে পারিত। ১৯৩৯ সালে পোলান্ডে পূর্বদিক থেকে অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে জার্মান বাহিনীর এই ধরনের একটা সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছিল।

তা ছাড়া আইকের মাথার উপর তখন খাঁড়ার মত ঝুলিতেছিল 'National Redoubt' কিংবা 'জাতীয় পার্বত্য আশ্রয়ের' এক চাঞ্চল্যকর গুপ্ত খবর। মিউনিকের দক্ষিণে ব্যাভেরিয়ার আলপাইন অঞ্চলে পশ্চিম অস্ট্রিয়া ও উত্তর ইতালীর এলাকায় প্রায় ২০ হাজার বর্গমাইলব্যাপী এই পার্বত্য দুর্গই হইবে হিটলার ও তাঁর নাৎসী বাহিনীর

শেষ আশ্রয়। এই 'ঈগল পাখির' নীড়ের মর্মকেন্দ্র হইতেছে বার্সেটগ্যাডেন। সেখানে প্রতিরক্ষার সমস্ত প্রকার সামরিক ব্যবস্থা নাকি একেবারে নিখুঁত করিয়া রাখা হইয়াছে।

আইকের সদর দপ্তরে এই শেষ পার্বত্য আশ্রয়ের একটি মানচিত্রও তৈরী করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং মিত্রবাহিনীর একাধিক গোয়েন্দা বিভাগ থেকে যে সমস্ত সংবাদ আসিতেছিল তাতে এমন ধারণার সৃষ্টি হইল যে, হিটলার দুই বছর পর্যন্ত প্রতিরক্ষার যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

২১শে এবং ২৫শে মার্চ ১৯৪৫, মিত্রপক্ষীয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কাছ থেকে আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তরে দক্ষিণ জার্মানীতে হিটলারের শেষ পার্বত্য আশ্রয় সম্পর্কে আরও যে সমস্ত চাঞ্চল্যকর খবর আসিল, তাতে মার্কিন সুপ্রীম কমাণ্ডারের নিকট বার্লিনের সামরিক গুরুত্ব আরও কমিয়া গেল। সুতরাং এই শেষ জার্মান রণপরিকল্পনায় বাধা দেওয়ার জন্য জেনারেল ওমর ব্রাডলি প্রস্তাব করিলেন উত্তর জার্মানী দিয়া অভিযানের বদলে জার্মানীকে সেণ্ট্রাল বা মধ্যভাগ দিয়া আক্রমণ এবং দ্বিখণ্ডিতকরণ। কারণ, জার্মানী দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেলে নাৎসী বাহিনী আর দক্ষিণ-দিকের প্রস্তাবিত পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় নিতে পারিবে না। এদিকে ওয়াশিংটনে মার্কিন উচ্চতর সামরিক কর্তৃপক্ষ জেনারেল মার্শালের (যাঁকে আইক খুব ভক্তি করতেন) কাছ থেকে যে সমস্ত খবর ও নির্দেশ আইকের নিকট পৌঁছিল, তাতেও দক্ষিণ দিকে হিটলারের শেষ আশ্রয় সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া গেল। এই অবস্থায় পূর্বদিক থেকে অগ্রসরমান সোভিয়েট বাহিনীর রণ-পরিকল্পনা এবং দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির সীমারেখা কোথায় টানা হইবে, সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা আইকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আইক তিনটি তারবার্তার খসড়া প্রস্তুত করিলেন এবং সেই তিনটির মধ্যে একটি তারবার্তা ছিল 'ঐতিহাসিক' ও অভূতপূর্ব। কারণ, জেনারেল আইজেনহাওয়ার এই তারবার্তাটি সোজাসুজি মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট পাঠাইলেন রুশ রণপরিকল্পনা জানিবার জন্য।

অন্য যে দুইটি তারবার্তা মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল মার্শাল এবং বৃটিশ সেনাপতি মণ্টগোমারীর নিকট পাঠানো হইল, তাতে রুশবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলাইবার প্রস্তাব এবং অন্যান্য রণনৈতিক কথা আইক বলিলেন বটে, কিন্তু এই সমস্ত বার্তায় বার্লিনের কোন উল্লেখ করা হইল না।

আইজেনহাওয়ার মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট প্রেরিত বার্তায় নিজের পরিকল্পনার কথা জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, রুশবাহিনীর সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর পক্ষে হাত মিলাইবার সবচেয়ে ভালো এলাকা হইতেছে—এরফুর্ট-লাইপজিগ-ড্রেসডেন। কারণ, ওদিকেই জার্মান সরকারী দপ্তরগুলি অপসারিত হইতেছে। অপরপক্ষে দক্ষিণ জার্মানীর পার্বত্য অঞ্চলেও জার্মানরা শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং এই অঞ্চলে বাধা দেওয়ার জন্য মিত্রবাহিনীগুলির দ্বিতীয় মিলনক্ষেত্র হইতেছে রিজেন্সবার্গ লিঞ্জ (Regensburg Linz) অঞ্চল।

রুশদের সঙ্গে সামরিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের অধিকার সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ারের ছিল এবং স্ট্যালিনও ছিলেন সোভিয়েট বাহিনীর সুপ্রীম

কমাণ্ডার। সুতরাং আইক লণ্ডন বা ওয়াশিংটনের বড়কর্তাদের কাছে আগেই তাঁর তারবার্তার কথা জানাইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। অবশ্য এই সমস্ত তারবার্তার কপি লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু লণ্ডনে চার্চিল আইকের তারবার্তার কপি পাইয়া যেন তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। দীর্ঘ তিন বছরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যে এই প্রথম চার্চিল আমেরিকানদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। (৩০শে মার্চ তখন রুজভেল্ট অসুস্থ) বিশেষতঃ ২৭শে মার্চ মণ্টগোমারী তাঁকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁর বাহিনী এলবে (Elbe) নদীর দিকে এবং সেখান থেকে অটোভান সড়ক (বার্লিনকে ঘিরিয়া আংটির মত তৈরী ফেরো কংক্রিটের উৎকৃষ্টতম সড়ক) ধরিয়া বার্লিন দখলের অভিযান চালাইবেন। কিন্তু আইকের তারবার্তায় এই সমস্ত কিছুই ছিল না।

এই সময় বৃটিশের পক্ষে আর-একটা ক্ষোভের কারণও ঘটিল। কারণ, মণ্টগোমারী ফিল্ড মার্শাল ব্রুককে জানাইলেন যে, মার্কিন নবম বাহিনীকে তাঁর কমাণ্ড থেকে সরাইয়া নিয়া মার্কিন জেনারেল ব্রাডলির ১২নং আর্মি গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত করা হইতেছে এবং এই সমস্ত বাহিনী মধ্য জার্মানী দিয়া লাইপজিগ-ড্রেসডেনের দিকে অভিযান করিবে। কিন্তু 'মণ্টির মতে এটা মারাত্মক ভুল।'[১]

উত্তর জার্মানী দিয়া বার্লিন অভিমুখে আক্রমণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় বৃটিশপক্ষ রুষ্ট হইলেন। ২৯শে মার্চ ব্রুক ওয়াশিংটনে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন—মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট সরাসরি বার্তা পাঠাইবার কোন এক্তিয়ার আইজেন-হাওয়ারের নাই। সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর মারফৎ যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত ছিল।

জর্জ মার্শাল বৃটিশ পক্ষের বিরক্তি এবং উত্তর জার্মানী দিয়া বার্লিনের দিকে প্রস্তাবিত অভিযানের কথা আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া দিলেন। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপার নিয়া বৃটিশ-মার্কিন বিরোধ ক্রমশ অত্যন্ত প্রবল হইল। তবে উভয় পক্ষই একটা আপোস-মীমাংসা ও জোড়াতালি দিতে চাহিলেন। মিত্রপক্ষের প্রধানদের নিকট আরোও ক্ষোভের কারণ এই ছিল যে, আইক-সংক্রান্ত ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটিতেছিল, যখন, বৃটিশ, মার্কিন ও রুশ—এই তিন পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক আদৌ ভালো যাইতেছিল না। অধিকন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও অসুস্থ ছিলেন। অপর পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল স্ট্যালিনের যুদ্ধ-পরবর্তী মতলব সম্পর্কে সন্দেহ-ব্যাতিকগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ফলে, পশ্চিম দিকে অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর জয়গুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখিলেন না। সেই সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট রাশিয়ার আচরণ আরও ক্ষোভের কারণ হইয়া উঠিল। কারণ, স্ট্যালিন অভিযোগ করিলেন যে, পশ্চিম জার্মানীর মুক্ত বন্দীশালাগুলি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত রুশ বন্দীদের উপর দুর্ব্যবহার করা হইতেছে।

অপর দিকে পশ্চিমী মিত্রদের পক্ষ থেকে স্ট্যালিনের নিকট অভিযোগ করা হইল যে, মিত্রবাহিনীর বোমারুগুলিকে তৈল নেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য কারণে রুশ বাহিনীর পিছনে অবতরণ করার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, কার্যক্ষেত্রে তা পালিত হইতেছে না।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২২৭।

অধিকন্তু ইতালীতে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়াও স্ট্যালিনের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তাদের তীব্র ক্ষোভের কারণ ঘটিল। কারণ, স্ট্যালিন এই মর্মে গুরুতর অভিযোগ করিলেন যে, ইতালীতে জার্মান সৈন্যেরা ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য গোপনে আলোচনা চালাইতেছে এবং এই সমস্ত চলিতেছে সোভিয়েত পক্ষের অজ্ঞাতসারে। অধিকন্তু এই সমস্ত জার্মান বাহিনীকে (৩ ডিভিসন) পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠাইবারও মতলব করা হইয়াছে।

অর্থাৎ সোজা কথায় স্ট্যালিন মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে "বিশ্বাসঘাতকতার" এবং হিটলারের সঙ্গে "পৃথক সন্ধি" করার গুরুতর অভিযোগ তুলিলেন।

বলা বাহুল্য যে, চার্চিল এবং রুজভেল্ট উভয়েই স্ট্যালিনের এই 'মিথ্যা' সন্দেহের ও "ভিত্তিহীন" অভিযোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। তথাপি রুজভেল্ট তাঁর প্রেরিত বার্তায় যথাসম্ভব সংযম ও শিষ্টাচার রক্ষার চেষ্টা করিলেন। কারণ, তিনি মিত্রপক্ষের মধ্যে ঐক্য রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।—[১]

মিত্রপক্ষের মধ্যে এই ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থার যখন উদ্ভব হইয়াছিল, তখন স্ট্যালিনের নিকট সোজাসুজি প্রেরিত আইজেনহাওয়ারের বার্তা নিয়া স্বভাবতই তীব্র বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হইল। কারণ, চার্চিল ও বৃটিশ পক্ষের নিকট বার্লিনের রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম ছিল। কিন্তু আইক তাঁর সামরিক পরিকল্পনার দ্বারা সেটাই নষ্ট করিয়া দিতেছেন। অথচ রাজনৈতিক ব্যাপারে স্ট্যালিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার কোন এক্তিয়ার আইজেনহাওয়ারের ছিল না। সুতরাং ২৯শে মার্চ রাত্রে চার্চিল জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নিকট জরুরী টেলিফোন করিলেন। তবে, চতুর চার্চিল আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক অব্যাহত রাখার জন্য আইকের সঙ্গে আলোচনায় স্ট্যালিনের নিকট আইকের প্রেরিত বার্তার কথা চাপিয়া গেলেন, কিন্তু কৌশলে মণ্টির প্রস্তাবিত বার্লিন অভিযানের উপর খুব জোর দিলেন! কিন্তু আইক দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন যে, বার্লিনের আর-কোন সামরিক গুরুত্ব নাই।

রেইমসের সদর দপ্তরে বসিয়া আইজেনহাওয়ার বৃটিশ প্রতিবাদের জন্য অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন এবং ৩০শে মার্চ সকালে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে এই মর্মে জবাব পাঠাইলেন যে, লাইপজিগ-ড্রেসডেন ও মধ্য জার্মানীর ভিতর দিয়া অভিযান চালানো হইবে এবং দক্ষিণ দিকে জার্মানীর পার্বত্য আশ্রয় লাভে বাধা দেওয়া হইবে। দানিয়ুব নদী উপত্যকায় রুশ বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলাইবার চেষ্টা করা হইবে। তবে, পরিবর্তিত অবস্থায় এগুলিরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

কিন্তু এই সমস্ত জবাবে বার্লিনের কোন উল্লেখ ছিল না। বরং সুপ্রীম কমাণ্ডার ওয়াশিংটনে অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন যে, বৃটিশ পক্ষ রাইন ও জার্মানী অভিমুখে অভিযানে পদে পদে বাধা দিয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়াই যাইবেন।...

এদিকে চার্চিল আবার আইজেনহাওয়ারের নিকট প্রেরিত একটি বার্তায় স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, রুশ সৈন্যবাহিনী নিশ্চয়ই অস্ট্রিয়া ও ভিয়েনা দখল করিয়া নিবে।

১। চেস্টার উইলমট—পৃষ্ঠা ৭৮৬-৮৭।

সেইসঙ্গে বার্লিনও তাদের দখলে গেলে সামরিক ও রাজনৈতিক ফলাফল গুরুতর হইবে।[১]

মস্কোতে বৃটিশ ও মার্কিন মিলিটারি মিশনের (জেনারেল ডীন্) প্রধানগণ আইজেনহাওয়ারের প্রেরিত বার্তা স্ট্যালিনের হাতে দিলেন এবং স্ট্যালিন আইকের রণনৈতিক পরিকল্পনার তারিফ করিলেন। কিন্তু নিজেদের পরিকল্পনার কথা কিছু বলিলেন না।…

২৮শে মার্চের টেলিগ্রামের জবাবে স্ট্যালিন রাত্রি ৮টার সময় পালটা এক টেলিগ্রামে আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁর রণ-পরিকল্পনা তিনি সমর্থন করিতেছেন, লাইপজিগ-ড্রেসডেন এলাকাতেই লালফৌজের সঙ্গে হাত মিলানো উচিত। সোভিয়েত বাহিনীরও প্রধান আক্রমণ ওদিকেই ঘটিবে এবং আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে তিনিও একমত যে, বার্লিনের আর আগের মত সামরিক গুরুত্ব নাই। সেজন্য সেখানে দ্বিতীয় সারির সৈন্য পাঠানো হইবে। আর মে মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগে লালফৌজের আক্রমণ শুরু হইতে পারে।…

আইজেনহাওয়ারের নিকট প্রেরিত স্ট্যালিনের তারবার্তার কপি পাইয়া চার্চিলের সন্দেহ আরও গভীর হইল। তিনি আইজেনহাওয়ারের নিকট প্রেরিত পুনরায় একটি তারবার্তায় জানাইয়া দিলেন যে, মস্কোর মতে বার্লিনের সামরিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার যে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিতে হইবে রাজনৈতিক গুরুত্বের বিচারে। সুতরাং বার্লিনে আমাদের আগে প্রবেশ করা দরকার। কারণ, 'যত পূর্বে রাশিয়ানদের সঙ্গে হাত মেলানো যায় ততই ভালো,—"that we should shake hands with the Russians as far to the east as possible…"

অর্থাৎ চার্চিলের মতে সোভিয়েত রাশিয়াকে মধ্য ইউরোপ থেকে যত দূরে রাখা যায়, ততই পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু এই রাজনৈতিক মতামতের গুরুত্ব নিয়া আইজেনহাওয়ার মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। কার, রাশিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব রাখার প্রয়োজন ছিল।

বার্লিন কেন ইঙ্গ-মার্কিন দখলে গেল না?

জেনারেল আইজেনহাওয়ার কর্তৃক সরাসরি মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট তারবার্তা পাঠাইবার জন্য আইকের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারী মহলে সমালোচন হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, বিদেশী গভর্নমেণ্টের সঙ্গে এভাবে আলোচনা করার অধিকার তাঁর ছিল না। তেমনি লালফৌজের আগেই বার্লিন দখলের অভিযান না করার জন্যও তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হইয়াছে। বিশেষত যুদ্ধের পরবর্তীকালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবহাওয়ায় আইজেনহাওয়ার, রুজভেল্ট প্রভৃতির বিরুদ্ধে অতলান্তিকের এপারে-ওপারে সমালোচনার সুর আরও তীব্র হইয়াছিল। তাঁদের মতে চার্চিলের রণনীতিই সঠিক ছিল। যদি রুজভেল্ট ও মার্কিন সেনানীমণ্ডলী চার্চিলের রণনীতি অনুমোদন এবং অনুসরণ করিতেন, তবে, বলকান ও পূর্ব ইউরোপ যেমন সোভিয়েত কিংবা কমিউনিস্ট দখলদারিতে যাইত না, তেমনি জার্মানী ও বার্লিন নিয়াও এত বিভ্রাট দেখা দিত না।

১। কর্নেলিয়াস রায়ান—পৃষ্ঠা ২৩৬।

১। The Last Battle – Cornelius Ryun, P. 244-46.

কিন্তু যাঁরা এই সমালোচনা ক্রমশ উচ্চ পর্দায় চড়াইয়াছেন, তাঁরা গোড়াকার আসল অবস্থাটাই ভুলিয়া গিয়াছেন, কিংবা উপেক্ষা করিয়াছেন। কারণ, হিটলারী জার্মানীর মারাত্মক সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল রাশিয়া। যে রাশিয়ার ৫ লক্ষ বর্গ মাইল ভূমি জার্মানরা দখল করিয়া নিয়াছিল এবং অপরিমিত লোকক্ষয় ও ধ্বংসলীলা বিস্তার করিয়াছিল। রাশিয়াতে যে পরিমাণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তার কোন তুলনা নাই। পশ্চিমের সামরিক লেখকদের পুস্তকেই এবং যে সমস্ত লেখক সোভিয়েত-বিরোধী তাঁদের লেখাতেই—যেমন, চেস্টার উইলমট, ক্যাপ্টেন হ্যারি বুচার প্রভৃতি স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে মোট ৩২০ ডিভিসন জার্মান সৈন্যর মধ্যে একমাত্র পূর্ব রণাঙ্গনেই ২০৬ ডিভিসন জার্মান সৈন্য লালফৌজের বিরুদ্ধে রণলিপ্ত ছিল। আর বাকী ডিভিসনগুলি ছিল ইউরোপের অন্যান্য অংশে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সময়েও ১৫৭ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। আর ৫০ ডিভিসন ছিল জানুয়ারী মাসে বৃটেনের বিপরীত দিকে, এবং এর মধ্যে আবার ২৬ ডিভিসন ছিল 'অতলান্তিক প্রাচীর' পাহারা দেওয়ার জন্য। পশ্চিমের সামরিক গোয়েন্দাদের ধারণা ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে ১৯৯ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। আর ১৩৭ ডিভিসনের মধ্যে ৫১ ডিভিসন ছিল ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসেও মাত্র ৫২ ডিভিসন ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে, যেগুলি নামেমাত্র ডিভিসন ছিল। এমন কি, ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে পর্যন্ত ১৬৩ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে—অর্থাৎ জার্মানীর মোট স্থল-সৈন্যের অর্ধেকই ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। আর পশ্চিম রণাঙ্গনে ৭৬ ডিভিসন এবং ইতালীতে ২৪ ডিভিসন। সুতরা এই সংখ্যাগুলির দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, জার্মান সমরশক্তির বিরুদ্ধে আসল লড়াই চালাইতেছিল লালফৌজ এবং ইউরোপীয় মহাদেশের যুদ্ধের আসল মর্মকথাও ছিল এখানে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করিয়া কেবল গল্প বা উপকথা রচনা করিলেই চলিবে না। জার্মানীর বিশাল সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য একদিকে সোভিয়েত শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে, অন্যদিকে আবার বলকান বা পূর্ব ইউরোপে তাদের বিজয়ী সৈন্যদের প্রবেশ রুদ্ধ করা হইবে—এমন অবাস্তব অবস্থা তো চলিতে পারে না। 'চাচিল এই শতাব্দীর সবচেয়ে চতুর এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রাজনৈতিক রণনীতিবিদ্ ছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তাঁর সামরিক রণনীতি অনির্ভরযোগ্য এবং বিপজ্জনক ছিল'—একথা লিখিয়াছেন আমেরিকার বিখ্যাত চিন্তাশীল রাজনীতিক গ্রন্থকার মিঃ ডি. এফ. ফ্লেমিং।

বার্লিন দখলে প্রশ্ন নিয়া এই কারণেই বৃটেনের সঙ্গে আমেরিকান সেনানীদের তীব্র মতভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়াছিল। কারণ চার্চিল তখনই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, "মুক্ত দুনিয়ার পক্ষে রাশিয়া সবচেয়ে মারাত্মক বিপদরূপে দেখা দিয়াছে।"

কিন্তু চার্চিল বা বৃটিশ সেনানীমণ্ডলী কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্লিন দখলের প্রশ্ন তখন বাস্তবতা-সম্মত ছিল না। কারণ, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদলের কাছ থেকে বার্লিন তখন ৩০০ মাইল দূরে। আর জুকোভের অধীন রুশ সৈন্যেরা ছিল বার্লিনের মাত্র ৩০

মাইল দূরে ওডের নদীর সেতুমুখ থেকে। ১০ লক্ষ সোভিয়েত সৈন্য বার্লিন আক্রমণের জন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং আইজেনহাওয়ার যদি সেই সময় বার্লিন জয়ের জন্য আগাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতেন, তবে, খুব সম্ভবত মার্শাল জুকোভ আগেই সেখানে পৌঁছিয়া যাইতেন এবং সেই অবস্থাটা মার্কিন অধিনায়কদের পক্ষে খুব অসুবিধাজনক ও লজ্জার বিষয় হইয়া পড়িত। যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়াও লওয়া যায় যে, পশ্চিমের মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা ওডের নদী পার হইতে পারিবেন, তথাপি সেই অবস্থায় তাঁদের খাল বিল নদী এবং জলা ও জংলা জায়গায় ৫০ মাইল অতিক্রম করিতে হইত। সেজন্যই আইজনহাওয়ারের প্রশ্নের জবাবে জেনারেল ওমর ব্রাড্‌লি বলিয়াছিলেন যে, এই অঞ্চল জয় করিয়া বার্লিনে অগ্রসর হইতে ১ লক্ষ মিত্রপক্ষীয় সৈন্য হতাহত হইবে। আইজেনহাওয়ার স্বভাবতই এই প্রকার বিপদের ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ, এর দ্বারা শত্রুসৈন্য সংহারের যে আসল দায়িত্ব সুপ্রীম কমাণ্ডার হিসাব তাঁর উপর অর্পিত হইয়াছিল, সেটাও পালন করা কঠিন হইত।

এই সমস্ত ছাড়াও আর একটি গুরুতর প্রশ্ন ছিল, যে প্রশ্নটিকে সমালোচকগণ বাহ্যত উপেক্ষা করিতেছেন। পরাজিত জার্মানীকে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। (পরবর্তীকালে ফ্রান্সকেও এই অংশীদারীতে গ্রহণ করা হইয়াছিল।) ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে ইউরোপীয়ান অ্যাড্‌ভাইসরি কমিশনের বৈঠকে স্থির করা হইয়াছিল তিন প্রধান শক্তির মধ্যে পরাজিত জার্মানীর কে কোন্ এলাকা দখল করিবেন। সোভিয়েত রাশিয়ার জন্য স্বভাবতই জার্মানীর পূর্বাংশ (বার্লিন সহ) নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই পরিকল্পনাও রাশিয়ার রচিত ছিল না, ছিল বৃটিশ পক্ষের। তিন প্রধান শক্তির মধ্যে জার্মানীর দখলীকৃত অঞ্চল সম্পর্কে এই চুক্তি ইয়াল্টার শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদিত হইয়াছিল। সোভিয়েত দখলীকৃত এলাকার মধ্যে ছিল বার্লিন, পশ্চিম দিকের ইঙ্গ-মার্কিন দখলীকৃত লাইন থেকে যে বার্লিনের দূরত্ব ছিল ১১০ মাইল। তবে বার্লিন সম্পর্কে এই বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, ইহা মিত্রশক্তিদের যৌথ দখলদারিতে একটি স্বতন্ত্র এলাকারূপে পরিচালিত হইবে। এই ভাগ-বাঁটোয়ারায় আমেরিকানদেরও সম্মতি ছিল। এমন কি, ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত রাশিয়া যে জার্মানীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দখলে রাখার প্রস্তাবেই সন্তুষ্ট ছিল, সেটাও রাশিয়ার উদারতা বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। কারণ, তখন একমাত্র ইতালীতে ছাড়া ইউরোপের কোথাও পশ্চিমী মিত্রশক্তির কোন পাত্তা ছিল না।

সুতরাং আইজেনহাওয়ার যদি বার্লিন দখল করিয়া নিতেও পারিতেন, তথাপি ভাগ-বাঁটোয়ারার চুক্তি অনুসারে জার্মানীর সেই পূর্বাংশ ছাড়িয়া দিয়া আসিতে হইত। সুতরাং এই অবস্থায় জার্মানীর রাজধানীর দিকে অভিযান করা আইজেনহাওয়ারের মতে বোকামি বা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইত।[১]

হিটলার-বিরোধী কোয়াশিনের তিন প্রধান শক্তি যে আগে থেকেই পরাজিত জার্মানীর ভাগ-বাঁটোয়ারা এবং অধিকৃত এলাকাগুলির মোটামুটি একটা সীমারেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেটা তাঁদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল। কেন না, মিত্রশক্তিবর্গ যদি জার্মানী ও বার্লিন দখলের জন্য নিজেদের

১। Cold War—P. 168. and After Victory—W. L. Newman P. 132.

মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করিয়া দিত, তবে, গুরুতর জটিলতা ও বিপদের কারণ ঘটিত। মিঃ ডি. এফ. ফ্লেমিংয়ের মতে যদি মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে কেউ বার্লিন দখলের অধিকারী ছিল, তবে, সেই অধিকার ছিল একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার। কারণ, হিটলারী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য সে একাই সবচেয়ে বেশী বুকের রক্ত ঢালিয়াছিল। সুতরাং বার্লিনে দখলে তার অধিকারকে কোন মতেই অস্বীকার করা চলিত না।

উইনস্টোন চার্চিল চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু অতিরিক্ত বুদ্ধি খাটাইয়া পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে গিয়া তিনি ও তাঁর সমর্থকগণ এত বেশী বিলম্ব করিয়াছিলেন যে, তখন মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত লালফৌজের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার কোন সুযোগ ছিল না।

* * *

অবশ্য ১৯৪৪ সালের শরৎকালেই ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ বার্লিন দখলের প্রশ্নটি নিয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। এমন কি, মণ্টগোমারীর সঙ্গে মার্কিন পক্ষের মত বিরোধের সময় আইজেনহাওয়ার ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, তাঁর নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, যদি শক্তি ও সম্পদে কুলায় তবে, বার্লিন দখলের কথাও নিশ্চয়ই ভাবিতে হইবে।

কিন্তু এটা ছিল মণ্টিকে স্তোকবাক্য দেওয়ার মত। কেননা, ১লা এবং ২রা এপ্রিল রুজভেল্ট ও আইজেনহাওয়ারের নিকট চার্চিলের পর পর তারবার্তা সত্ত্বেও বার্লিন অভিযান অনুমোদিত হয় নাই। কারণ, মিত্রবাহিনী তখন বার্লিন আক্রমণ ও দখলের জন্য প্রস্তুত ছিল না। রুজভেল্টের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ও পরামর্শদাতা হ্যারি হপকিন লিখিয়াছেন—'যদি আমাদের শক্তি থাকিত, তবে আমরা বার্লিন দখল করিতাম। কেননা, আমাদের সৈন্যবাহিনীর জয়গৌরব তার দ্বারা বৃদ্ধি পাইত।'[১]

সুতরাং চার্চিল ও বৃটিশ পক্ষের দুর্ভাগ্য এই যে, বার্লিনের দিকে প্রস্তাবিত অভিযানে রুজভেল্ট ও আইজেনহাওয়ারের তেমন কোন সম্মতি ও উৎসাহ ছিল না। কেন না, মূলগতভাবে এটা রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মিত্র পক্ষের বাহিনীগুলির মধ্যে বার্লিনে আগে কে পেঁাছিবে সেই প্রশ্নটা এক্ষণে রণনীতির চেয়ে কুটনৈতিক গুরুত্ব বেশী অর্জন করিল এবং লালফৌজেরও অনেকে ধরিয়াই লইলেন যে, বার্লিন তাঁরাই আগে দখল করিবেন। এজন্য রুশ বাহিনীর মধ্যে অনেকেই বার্লিন অভিযানে যাত্রা করার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। তাঁদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, ইয়াল্টাতে রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের মধ্যে আগেই এই বিষয়ে একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে এবং জেনারেল আইজেনহাওয়ার এজন্যই বার্লিনের বদলে দক্ষিণ জার্মানীর দিকে অভিযানের সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু স্ট্যাটিনিয়াস এর প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, ইয়াল্টাতে স্ট্যালিন রুজভেল্টের মধ্যে এমন কোন চুক্তি হইয়াছে বলিয়া তাঁর জানা নাই। (হপকিন্সও এমন গুজবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।) তবে, আসল সত্য এই যে, রুশদের আগে আমেরিকানরা বার্লিন দখল করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ভয়ঙ্কর বিরোধ দেখা দিত এবং সেকথা রুজভেল্ট জানিতেন।[২]

১। রবার্ট ই শেরউড—পৃষ্ঠা ৮৮৪।
২। আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ—পৃষ্ঠা ৮০৫।

নবম পর্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যু

পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকে জার্মানী যখন আক্রান্ত এবং মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা যখন ভিতরের দিকে অগ্রসরমান এবং লালফৌজ যখন খোদ বার্লিন অভিযানে প্রস্তুত (১৬ই এপ্রিল) মহাযুদ্ধের ঠিক সেই মুহূর্তে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। হিটলারী জার্মানীর পতন ও মিত্রপক্ষের চরম জয়লাভের সুনিশ্চয়তা তিনি দেখিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাত্র সামান্য কয়েকদিনের জন্য তিনি জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক মুহূর্তটা প্রত্যক্ষ করিয়া যাইতে পারিলেন না। ১০ই এপ্রিল ১৯৪৫, তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু কেবল আমেরিকা, বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার নয়, পৃথিবীর সর্বত্র মিত্রপক্ষীয় মহলে গভীর শোক উদ্রেক করিল। কেননা, ফ্যাসিবিরোধী গ্রাণ্ড কোয়ালিশনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান নায়ক এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একত্রে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য ইউনাইটেড নেশন্স সংগঠনের প্রধানতম উদ্যোক্তা।

কিন্তু তাঁর মৃত্যু আকস্মিক হইলেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেননা, যুদ্ধ-সংক্রান্ত অসংখ্য কার্যাবলীর অসম্ভব চাপে তাঁর স্বাস্থ্য অনেক দিন আগেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং অসুস্থদেহ নিয়াই তিনি একমাত্র মনের জোরে ইয়াল্টার ঐতিহাসিক শীর্ষ সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে) যোগ দিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সেই সম্মেলনে পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে মধ্যস্থের মত এবং সেদিক থেকে থেকে তিনি তিন পক্ষেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

কিন্তু তিনি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাহাজযোগে মাল্টায় চার্চিলের সঙ্গে মিলিয়াছিলেন এবং পরে বিমানযোগে ইয়াল্টায় (ক্রিমিয়া) স্ট্যালিনের সঙ্গে বৈঠকে একত্র হইয়াছিলেন, তখন স্বয়ং চার্চিল ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া উদ্বেগ বোধ করিয়াছিলেন। একমাত্র মানসিক শক্তি এবং মহৎ কর্তব্যবোধের দ্বারাই তিনি সেই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের সাফল্যজনক পরিণতি ঘটাইতে পারিয়াছিলেন। অনেক দিন ধরিয়াই তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং মৃত্যুর ৯ মাস আগে তিনি বলিয়াছিলেন—

All that is within me cries out to go back to my home on the Hudson River'

'হাডসন নদীর তীরে আমার স্বগৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য আমার অন্তরাত্মা কাঁদছে।'

অবশেষে সেই নদীতীরে তাঁর স্বগৃহে তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রাণহীন দেহে।...

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেণ্ট ফ্রাংকলিন ডিল্যানো রুজভেল্ট ৬৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমেরিকার ঐতিহাসিক সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া (দুই বারের বেশী প্রেসিডেণ্ট হওয়ার নিয়ম নাই) তিনি চতুর্থবারের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং এই নির্বাচনের তিন মাসের মধ্যেই তাঁর জীবনদীপ নিভিয়া গেল। যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই সময় হোয়াইট হাউসে যাতায়াত করিতেন, তাঁরা কিন্তু উদ্বেগের সঙ্গে প্রেসিডেণ্টে স্বাস্থ্য লক্ষ্য করিতেন এবং বলাবলি করিতেন যে, হয় রাষ্ট্রপতি গুরুতর অসুস্থ কিংবা শীঘ্রই তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করা হইবে।

জর্জিয়ার ওয়ারম্ স্প্রীংস অঞ্চলের একটি পাহাড়ের মাথায় "লিটল হোয়াইট হাউস" নামে ৬ কামরার যে পার্বত্যনিবাস ছিল, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সেখানে গেলেন তাঁর দীর্ঘ প্রত্যাশিত বিশ্রাম লাভের জন্য। ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৫, যখন মধ্যাহ্নের সময় তিনি একটি আরামকেদারায় বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন এবং একজন মহিলা শিল্পী তাঁর প্রতিকৃতি অংকিত করিতেছিলেন, তখন বেলা ১টার সময় রুজভেল্ট তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন যে, আর কিন্তু মাত্র ১৫ মিনিট সময় আছে। মিস্ ডিল্যানো নাম্নী একজন আত্মীয়া মহিলা যখন ফুলদানিতে ফুল সাজাইতেছিলেন এবং রুজভেল্ট একটি সিগারেট ধরাইয়াছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি বাঁ হাত দিয়া কপালের শিরা চাপিয়া ধরিলেন এবং অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, আমার ভয়ংকর মাথা ধরেছে' (I have a terrific headache), বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত এবং মাথা ঝুলিয়া পড়িল এবং তিনি জ্ঞান হারাইলেন। তাঁর এই বাক্যটিই ছিল তাঁর জীবনের শেষ কথা। তখন বেলা ১টা ১৫ মিঃ—যে ১৫ মিনিটের কথা তিনি আগেই বলিয়াছিলেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নৌবিভাগের ডাক্তার কমাণ্ডার হাওয়ার্ড ব্রুয়েন (Bruenn) আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রুজভেল্টকে বহন করিয়া তাঁর বেডরুমে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁর খুব শ্বাসকষ্ট হইতেছিল, তাঁর নাড়ীর গতি ছিল ১০৪ এবং তাঁর রক্তের চাপ ৩০০-এর উপরে উঠিয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বলিলেন প্রেসিডেণ্ট মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটনে খবর গেল মিসেস রুজভেল্টের (হোয়াইট হাউজে) নিকট এবং অন্য ডাক্তাররাও আসিলেন। কিন্তু ওয়াশিংটনের সময় অনুযায়ী বেলা ৪টা ৩৫ মিনিটের সময় রুজভেল্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।—[১]

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ১২ বছর ধরিয়া রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং আন্তর্জাতিক জগতের বহু সংকটজনক সমস্যার মধ্যে প্রেসিডেণ্টের দুরূহ কর্তব্য পালন করিয়াছেন। তাঁর সাহস, তাঁর সুমিষ্ট স্বভাব এবং তাঁর উজ্জ্বল আনন্দময় ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন ও আব্রাহাম লিংকনের মত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রেসিডেণ্টের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা যেমন তাঁর ছিল তেমনি রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জগতে তাঁর বিরোধীর সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কারণ, ১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরম আর্থিক দুর্গতির সময় তিনি যখন রাষ্ট্রতরণীর হাল ধরিয়াছিলেন, তখন তাঁকে অত্যন্ত সাহসের

১। The Last Hundred Days—John Toland, P, 412-13.

সঙ্গে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দিতে হইয়াছিল এবং সেই অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে আমেরিকাকে উদ্ধার করার জন্য তিনি এমন কতকগুলি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন যার জন্য তাঁর বিরোধীপক্ষ এবং ধনিকমহলের একাংশ তাঁকে কমিউনিস্ট পক্ষপাতী বলিয়া সন্দেহ করিতেন। জর্জ ওয়াশিংটন ও লিংকনের পর এত শত্রুতার বিরুদ্ধেও আর কোন প্রেসিডেণ্টকে লড়িতে হয় নাই। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবিশ্বাস্য রকমের চাপ তাঁকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। অথচ জীবনব্যাপী তাঁকে পোলিও রোগের যন্ত্রণা বহন করিতে হইয়াছিল এবং তিনি বীরের মত এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। গণতন্ত্রের ও স্বাধীনতার মহান আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল গভীর নিষ্ঠা, সর্বোপরি তিনি ছিলেন বাস্তববাদী—কাজের লোক এবং কাজের মধ্য দিয়াই তিনি তাঁর নীতি ও আদর্শকে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁর ত্রুটি ছিল না, দুর্বলতা ছিল না, এমন নয়। কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটি ও দুর্বলতাকে ছাড়াইয়া তিনি মানবতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ফ্যাসিজম ও হিটলার-বিরোধিতার মূলেও ছিল তাঁর এই মানবতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শবোধ। তিনি ও তাঁর একান্ত অনুরক্ত সহকর্মিগণ এজন্য প্রায় গোড়া থেকেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে অস্ত্রধারণ করিতেই হইবে এবং তাঁর এই কার্য সহজ হইয়া গেল জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণের জন্য। তারপর থেকে আমেরিকার সর্বসাধারণ মানুষ রুজভেল্টের পিছনে দাঁড়াইল। জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১২ই এপ্রিল আচম্বিতে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হওয়ায় অনেকেই গোড়ার দিকে তা বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। কিন্তু পরে যখন তাঁরা বুঝিতে পারিলেন যে, সত্য সত্যই রুজভেল্ট আর বাঁচিয়া নাই, তখন অসংখ্য মানুষ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তাঁর এই মৃত্যু সম্পর্কে সমর বিভাগ থেকে একটি অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল:

Army-Navy Casualty List Washington, April 13—Following are the latest casualties in the military services, including next-kin.

Army-Navy Dead—Roosevelt, Franklin D, Commander in Chief, wife Mrs. Anna Eleanor Roosevelt, the White House.

মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতির মৃত্যু-সংক্রান্ত এই বিজ্ঞপ্তি সামরিক ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মিসেস রুজভেল্ট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, তাঁর স্বামী "সৈনিকের মত মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।"

হোয়াইট হাউসে অবিলম্বেই মন্ত্রিসভার জরুরী অধিবেশন ডাকা হইল এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্টরূপে শপথ গ্রহণ করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন তিনি পরলোকগত প্রেসিডেণ্টের নীতি ও পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন—যদিও এই আকস্মিক গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না এবং শেষ পর্যন্ত রুজভেল্টের আদর্শ ও নীতির প্রতিও তিনি নিষ্ঠা রাখিতে পারিলেন না।

অপরাহ্নে এই মৃত্যু সংবাদের প্রচারে গোটা আমেরিকা সেদিন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁর শোকযাত্রায় ওয়াশিংটনে অসংখ্য লোক যোগ দিয়াছিলেন।

* * *

১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৫, শুক্রবার সকালে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই মৃত্যুসংবাদ পাইলেন এবং গভীর শোকে অভিভূত হইলেন। তিনি তাঁর যুদ্ধের বইতে লিখিয়াছেন যে, তিনি যেন এই অপ্রত্যাশিত সংবাদের দ্বারা 'একটা গুরুতর দৈহিক আঘাত পাইলেন।' যুদ্ধের ভয়ংকর দিনগুলিতে তাঁর সহায়তা, সাহায্য ও অন্তরঙ্গতা স্মরণ করিয়া চার্চিলের মনে হইল এই ক্ষতি অপূরণীয়—বিশেষতঃ ইতিহাসের এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে। তিনি মিসেস রুজভেল্টের (যাঁকে তিনি ধৈর্যশীলা ও মহিয়সী মহিলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন) কাছে এবং হ্যারি হপকিন্স ও নূতন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কাছে গভীর সমবেদনাপূর্ণ বার্তা পাঠাইলেন এবং যুদ্ধে চরম জয়ের আশা ব্যক্ত করিলেন।

চার্চিলের প্রস্তাব অনুযায়ী সেদিন কমন্সসভার অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে স্থগিত রাখা হইল। চার্চিল নিজেই বলিয়াছেন যে, কোন 'বিদেশী রাষ্ট্রনায়কের' মৃত্যুতে কমন্সসভার অধিবেশন স্থগিত রাখা এক অভূতপূর্ব ঘটনা।[১]

মস্কোতেও কালো রঙের বর্ডার দেওয়া পতাকা উত্তোলিত হইল এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনে সদস্যগণ দণ্ডায়মান-পূর্বক শোকনম্রচিত্তে রুজভেল্টের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। রাশিয়ার সমস্ত সংবাদপত্রে রুজভেল্টের জন্য গভীর বিয়োগবেদনা প্রকাশ করা হইল।

চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে শোকবার্তার বিনিময় হইল এবং নূতন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট স্ট্যালিন, সোভিয়েত সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন এবং রুজভেল্টকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতারূপে বর্ণনা করিলেন—যে রাষ্ট্রনেতা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতে চাহিয়াছিলেন। স্ট্যালিন তাঁর বার্তায় বৃহৎ শক্তিবর্গের পারস্পরিক সহযোগিতার উপরেও জোর দিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়াতে কেবল সরকারী-স্তরে নয়, জনসাধারণের মধ্যেও শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। প্রত্যক্ষদর্শী মিঃ আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ লিখিয়াছেন যে, ইয়াল্টা সম্মেলনেই রুজভেল্ট পীড়িত ছিলেন এবং তাঁকে খুব শীর্ণ দেখাইতেছিল। মস্কোর মেট্রোপোল হোটেলের বয়স্কা পরিচারিকা শ্রীমতী ফেনয়া ইয়াল্টাতেও রুজভেল্টের ব্যক্তিগত 'চেম্বারমেড্' ছিলেন। তিনি মস্কোতে ফিরিয়া আসিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিয়াছিলেন—'এত মিষ্টস্বভাব, এত দয়ালু মানুষ, কিন্তু ভয়ংকর পীড়িত ছিলেন।'

কেবল ফেনায়া নয়, সেদিনের রাশিয়ার হাজার হাজার নারী রুজভেল্টের মৃত্যু-সংবাদে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অক্ষ শক্তিবর্গের মনেও রুজভেল্টের এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। জাপানের প্রধানমন্ত্রী অ্যাডমিরাল সুজুকি আমেরিকার জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁদের নেতার মৃত্যুতে 'গভীর সমবেদনা' প্রকাশ করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন—'এই নেতার জন্যই আমেরিকানরা আজ এই সুবিধাজনক অবস্থানে পেঁছিয়াছে।'

অপর পক্ষে জার্মান রেডিওতে ঘোষণা করা হইল—'ইতিহাসে রুজভেল্টের নাম এই বলিয়া চিহ্নিত থাকিবে যে, ইনি সেই ব্যক্তি যাঁর প্ররোচনায় বর্তমান যুদ্ধ দ্বিতীয়

১। চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১২।

মহাযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টরূপে তাঁর বৃহত্তম শত্রু বলশেভিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে ক্ষমতায় আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[১]

ফ্রান্সে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে গীর্জায় প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হইল। জেনারেল দ্য গল স্বয়ং প্যারিসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।…

হিটলারী শিবিরে উল্লাস

হিটলারী শিবিরে এক অদ্ভুত পাগলামির দৃশ্যের অবতারণা হইল। যদিও সমগ্র জার্মানী এবং রাজধানী খাস বার্লিন শত্রুর আক্রমণের মুখে বিপন্ন, তথাপি হিটলার এবং তাঁর একান্ত ভক্ত কয়েকজন অনুচর বিশেষভাবে গোয়েবেলস্ তখনও এই বলিয়া নিজেদেরকে আশ্বাস দিতেছিলেন যে, শেষ মুহূর্তে এমন একটা 'মিরাক্যাল' বা অঘটন ঘটিবে, যার ফলে জার্মানী রক্ষা পাইয়া যাইবে।

হিটলার বিগত নভেম্বর মাসেই (১৯৪৪) পূর্ব প্রুশিয়ায় তাঁর র‍্যাস্তেনবুর্গের সদর দপ্তর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কারণ, বিজয়ী লালফৌজ আগাইয়া আসিতেছিল। তারপর থেকে তিনি বার্লিনেই অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম রণাঙ্গণে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে আর্দেনেস অঞ্চলে পালটা আক্রমণ চালাইবার জন্য তিনি জিয়েগেনবার্গে (Ziegenberg) তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্দেনেসের এই বেপরোয়া অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি ১৬ই জানুয়ারী আবার বার্লিনে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানে চ্যান্সেলার বা মন্ত্রিভবনের ৫০ ফুট ভুগর্ভের নিম্নে যে বিখ্যাত (বা কুখ্যাত ?) বাঙ্কার বা আশ্রয়শালা নির্মিত হইয়াছিল বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, সেখানে তিনি আশ্রয় নিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এদিকে মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে মন্ত্রিভবনের বিশাল মার্বেল হল ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এখানে তিনি তাঁর পাত্রমিত্র নিয়া অবস্থান করিতেছিলেন বার্লিন ও জার্মানীর বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের আক্রমণ রোধ ও সৈন্যবাহিনী পরিচালনার জন্য। যদিও হিটলারের দৈহিক শক্তি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তবু সেই অবস্থাতেও তাঁর মানসিক শক্তি অটুট ছিল এবং তিনি নিজে ও তাঁর পাত্রমিত্রেরা বিশ্বাস করিতেন যে, শেষ মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটিবেই।…

হিটলার যে সমস্ত সামরিক গ্রন্থ ও ইতিহাস পড়িতে ভালোবাসিতেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল মনীষী কার্লাইল রচিত ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের ইতিহাস। এপ্রিল মাসের এক সন্ধ্যায় গোয়েবেলস সেই ইতিহাস থেকে একটা অধ্যায় হিটলারকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। সাত বছর যুদ্ধ চালাইয়া ফ্রেডেরিক দি গ্রেট তখন পরাজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে অন্ধকার পর্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তখন রাজা ফ্রেডেরিক তাঁর মন্ত্রি-বর্গকে বলিলেন—যদি ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যুদ্ধের গতির পরিবর্তন না হয়, যদি সেই গতি ভালোর দিকে না যায়, তবে তিনি রণে ক্ষান্ত দিবেন এবং বিষপানপূর্বক জীবনের অবসান ঘটাইবেন। এই অধ্যায়টিই গোয়েবলস্ তাঁর প্রভুকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে এবং সেই অধ্যায়ের এক জায়গায় ছিল—'বীর

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪১৩।

রাজা, আর-একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার ভাগ্যসূর্য মেঘমুক্ত হইয়া শীঘ্রই পূর্ণ দীপ্তি নিয়া দেখা দিবে। সেই লক্ষণ ইতিমধ্যেই প্রকাশমান। ১২ই ফেব্রুয়ারী জারিনা (রানী বা সম্রাজ্ঞী) মারা গেলেন এবং ব্রান্ডেনবুর্গ রাজবংশের মিরাক্যাল ঘটিয়া গেল।'

অর্থাৎ ফ্রেডেরিক জয়লাভ করিলেন। ইতিহাসের এই অংশ শুনিতে শুনিতে হিটলারের চোখে জল আসিল।[১]

এদিকে আর-একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৩, হিটলারের একটা ঠিকুজি তৈয়ার হইয়াছিল। ঐদিন তিনি ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন। আর-একটা ঠিকুজি কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক ৯ই নভেম্বর, ১৯১৮ তারিখে তৈয়ারি হইয়াছিল ভেইমার রিপাব্লিকের ভাগ্য সম্পর্কে। এই দুই ঠিকুজিতেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবে এবং ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত জয়লাভ ঘটিবে। কিন্তু, তারপর কতকগুলি পরাজয় ঘটিবে এবং সর্বাপেক্ষা বিষম পরাজয় ঘটিবে ১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে—বিশেষতঃ এপ্রিল মাসের প্রথম অর্ধভাগে। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগে সামরিক সাফল্য ঘটিবে। তারপর আগস্ট মাস পর্যন্ত একটা অচল অবস্থা দেখা দিবে এবং সেই সঙ্গেই শান্তি। কিন্তু পরবর্তী তিন বছর জার্মানীর খুব খারাপ অবস্থা যাইবে। কিন্তু ১৯৪৮ সালে জার্মানী আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে।[২]

একদিকে কার্লাইল এবং অন্যদিকে ঠিকুজির ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রচারবিশারদ গোয়েবেলস ৬ই এপ্রিল তারিখে সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী আবেদনে বলিলেন—'ফুরার ঘোষণা করেছেন যে, এই বছরেই আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিবে। সত্যকার প্রতিভার লক্ষণ হচ্ছে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী আগেই জানতে পারা। একমাত্র ফুরারই সেই পরিবর্তনের মুহূর্তটি জানেন। ভাগ্যদেবতা তেমন এক ব্যক্তিকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন, একমাত্র তিনিই জানেন কখন সেই মিরাক্যাল বা দৈবঘটনা ঘটবে।'...

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর ১২ এপ্রিল রাত্রে যখন মার্কিন সৈন্যেরা ডেসাউ-বার্লিন-অটোভ্যান সড়ক দিয়া আগাইতেছিল এবং অগ্রসরমান লালফৌজের কামান-গর্জন বার্লিন থেকে শুনা যাইতেছিল, তখনও গোয়েবেলস দৈবঘটনার প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং একজন অফিসার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার জারিনা কে হবেন? তখন গোয়েবেলস জবাব দিলেন—'জানি না বটে, তবে, ভাগ্যে যে কোন ব্যাপার ঘটতে পারে।'...

সেদিন রাত্রে বার্লিনের উপর মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণের পর যখন সাইরেনে মোক্ষধ্বনি ('অল ক্লিয়ার') বাজিয়া উঠিল, তখন প্রচার মন্ত্রিভবনের ভূগর্ভ আশ্রয় থেকে প্রেস সেক্রেটারি রুডলফ সেমলার একটি টেলিফোন-বার্তা পাইলেন। সরকারী জার্মান নিউজ এজেন্সির একজন অফিসরে টেলিফোনে বলিলেন—

'হ্যালো, শুনুন, একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছে। রুজভেল্ট মারা গেছেন!'

'তুমি কি ঠাট্টা করছো?'

'না, এই মাত্র রয়টারের খবর এলো—রুজভেল্ট আজ দ্বিপ্রহরে মারা গেছেন

১। শাইরার, পৃষ্ঠা ১০১৬।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০১৭।

তখনই খবরটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং একজন চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'এই সেই দৈবঘটনা যার অপেক্ষায় আমরা ছিলুম।'

কয়েকজন অফিসার তাড়াহুড়া করিয়া গোয়েবেলসের দপ্তরে গিয়া হাজির হইলেন। গোয়েবেলসের গাড়ি মাত্র তখনি দপ্তরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল, আর মিত্রপক্ষের বোমাবর্ষণের জন্য তখন একটি হোটেল ও মন্ত্রিভবনের অট্টালিকা জ্বলিতেছিল। অগ্নিশিখায় সেই অঞ্চলটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল. গোয়েবেলসকে দেখিতে পাইয়া একজন রিপোর্টার বলিয়া উঠিলেন—'মন্ত্রি মহাশয় রুজভেল্ট মারা গেছেন।'

গোয়েবেলস খবরটা শুনিয়া গাড়ি থেকে লাফাইয়া পড়িলেন এবং যে কয়েকজন অফিসার সেখানে একত্র হইয়াছিলেন, তাঁরা উত্তেজিতভাবে মন্ত্রিমহোদয়কে ঘিরিয়া ধরিয়াছিলেন। গোয়েবেলস আবেগজড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'আমাদের সব চেয়ে ভালো শ্যাম্পেন নিয়ে এসো, আর এসো আমরা ফুরারের সঙ্গে কথা বলি।'

গোয়েবেলস তাঁর দপ্তরে ঢুকিবামাত্র প্রেস সেক্রেটারি সেমলার আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, গোয়েবেলসের দিকে চেঁচাইয়া খবরটা বলিলেন।

আর গোয়েবেলস মন্তব্য করিলেন—'এবার ইতিহাসের মোড় ঘুরেছে।'

তারপর অবিশ্বাসেরসুরে বলিলেন—'খবরটা কি সত্যি?'

গোয়েবেলস তখন হিটলারকে টেলিফোন করিলেন, আর জনাদশেক লোক গোয়েবেলসের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং গোয়েবেলস অত্যন্ত উত্তেজিতকণ্ঠে টেলিফোনে হিটলারকে বলিলেন—'আমার ফুরার, আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। রুজভেল্ট মারা গেছে। রাশিনক্ষত্রেই লেখা ছিল এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের বরাত খুলে যাবে। আজ শুক্রবার, ১৩ই এপ্রিল। মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত, ভাগ্য আপনার সবচেয়ে বড় শত্রুকে নিপাত করেছে। ভগবান আমাদের ত্যাগ করেন নি। দু'বার আপনাকে বর্বর হত্যাকারীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। ১৯৩৯ এবং ১৯৪৪ সালে শত্রুরা আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল। আর আজ আমাদের সব চেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু খতম হয়েছে। এটাই সেই মিরাক্যাল বা দৈবঘটনা।'

হিটলার টেলিফোনে এই সমস্ত শুনিলেন এবং বলিলেন যে, এখন যে কোন ঘটনাই ঘটতে পারে। ট্রুম্যান রুজভেল্টের তুলনায় অনেক বেশী মডারেট হতে পারেন।'

গোয়েবেলস এত উল্লসিত হইলেন যে, প্রেস সেক্রেটারী সেমলারের মনে হইল যুদ্ধ যেন শেষ হইয়া গিয়াছে! এমন কি হিটলারের অর্থমন্ত্রী অভিজাত বংশের বিখ্যাত কাউণ্ট Schwerin Von Krosigk পর্যন্ত এই ঘটনার মধ্যে 'ইতিহাসের দেবদূতের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন' এবং গোয়েবেলকে অভিনন্দন জানাইয়া লিখিতভাবে মন্তব্য করিলেন—

"রুজভেল্টের মৃত্যুর মধ্যে ভগবানের ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে।"—[১]

ইউরোপীয় যুদ্ধের যবনিকা পড়ার আর বেশী দিন বাকী ছিল না। কিন্তু তার আগে বার্লিনে হিটলারী সাঙ্গোপাঙ্গোদের মধ্যে যেন চূড়ান্ত পাগলামির অভিনয় হইয়া গেল।...

অবশ্য গোয়েবেলসের টেলিফোনের জবাবে হিটলারের প্রতিক্রিয়ার কোন লিখিত দলিল পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু হিটলারও যে রুজভেল্টের মৃত্যুকে ভাগ্যদেবতার

১। The Last Hundred Days, John Toland, P. 417-16.

ইঙ্গিত ও দৈবঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বার্লিনে 'বলশেভিকদের আক্রমণ যে রক্তের বন্যায় ডুবিয়া যাইবে' এমন আশা তিনি প্রকাশ করিলেন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে এবং এই বিবৃতিই ছিল জার্মান জনগণ ও প্রতিরক্ষাকারী বাহিনীর উদ্দেশে তাঁর শেষ আহ্বান। এই আহ্বানের উপসংহারে তিনি বলিলেন—'এই সন্ধিক্ষণে ভাগ্যদেবতা পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বকালের সবচেয়ে বড় যুদ্ধাপরাধী রুজভেল্টকে অপসারণ করিয়াছেন। সুতরাং এখন থেকেই এই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া যাইবে।'[১]

যুদ্ধের মোড় অবশ্য অনেক আগেই ঘুরিয়াছিল। কিন্তু সেটা হিটলার ও নাৎসী জার্মানীর ধ্বংসের মধ্যে।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪৪২।

নবম পর্ব
তৃতীয় অধ্যায়
বার্লিন দখলের অভিযান

যদিও জার্মানীর ইতিহাস-বিখ্যাত রাজধানী বার্লিন শহর দখলের অভিযান শুরু হইয়াছিল এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে, তথাপি লালফৌজ পশ্চিম রণাঙ্গনে বিব্রত মিত্র-পক্ষীয় বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য অত্যন্ত কদর্য আবহাওয়া ও ঠাণ্ডা উপেক্ষা করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করিয়াছিল জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে। সোভিয়েত বাহিনীর কৃতিত্ব এই যে, ১০ই জানুয়ারী তারিখে 'অসময়ে' (অর্থাৎ সেই সময় আক্রমণের জন্য সোভিয়েত সমর কর্তৃপক্ষ তেমন প্রস্তুত ছিলেন না) জার্মানীর বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু হইয়াছিল, চার মাস পর বার্লিন দখলের আগে সেটা আর শেষ হইল না।

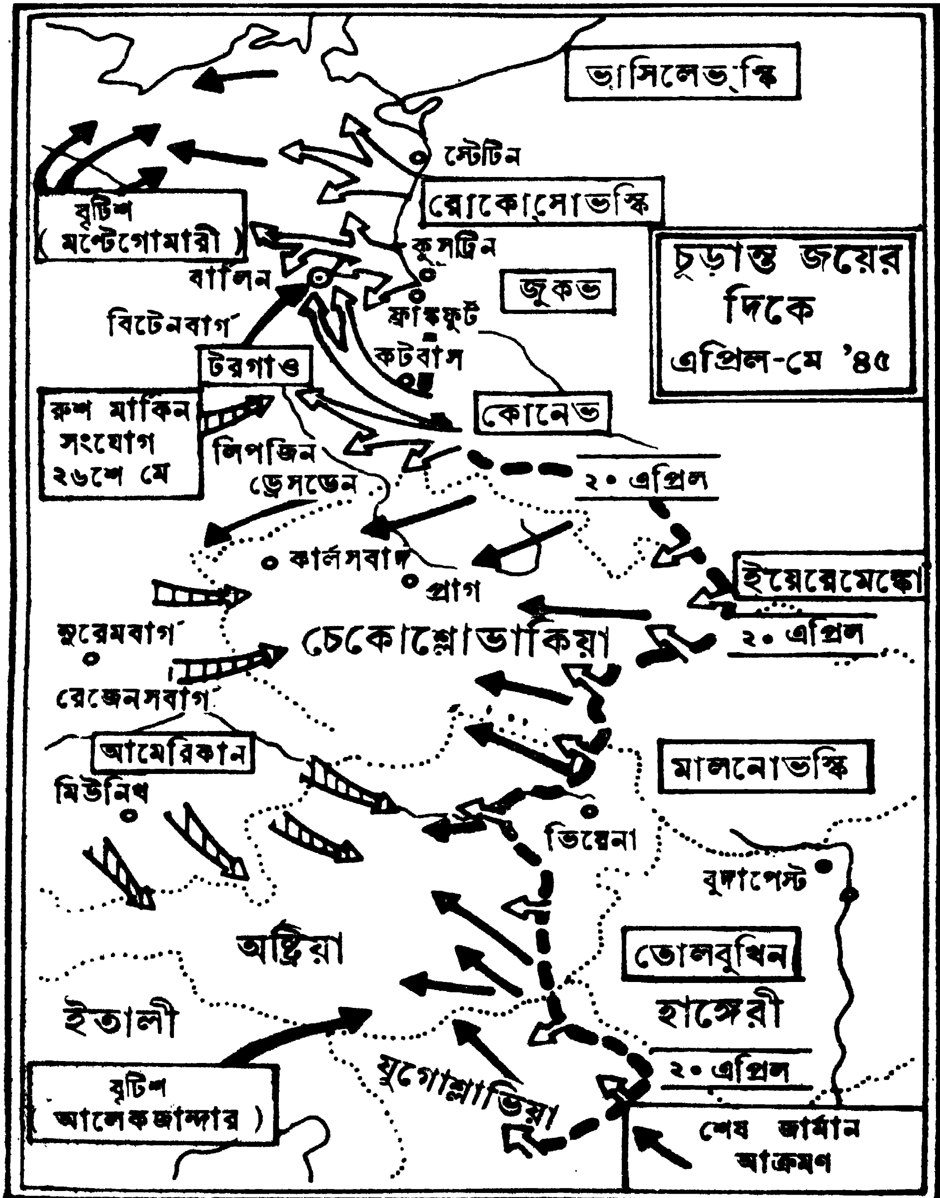
ভিশ্চুলা থেকে ওডের নদী অভিমুখে সোভিয়েত বাহিনীর এই অভিযান জার্মানীর নিকট কিছুটা অপ্রত্যাশিত ছিল। অবশ্য এই দুই নদীর মধ্যে মধ্যে তারা ৭টি প্রতিরক্ষার লাইন গড়িয়া তুলিয়াছিল। কারণ, ওয়ারশ থেকে বার্লিন অভিমুখে রুশ আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল বটে কিন্তু জার্মানী মনে করিয়াছিল 'মধ্য রণাঙ্গনের' এই অভিযানের আগে কোরল্যাণ্ডে (বাল্টিক অঞ্চলের অন্তর্গত) আটকা-পড়া ৩০ ডিভিসন জার্মান সৈন্যকে খতম না করিয়া সোভিয়েত বাহিনী এই দিকে অগ্রসর হইবে না। এমন কি, তার আগে হাঙ্গেরীকে জার্মানীর কবলমুক্ত না করিয়া ছাড়িবে না। কিন্তু তার আগেই ১নং বেলোরুশিয়ান এবং ১নং উক্রাইনীয়ান ফ্রণ্টের (ফ্রণ্ট অর্থে আর্মি গ্রুপ—৩ থেকে ৮টি পর্যন্ত বাহিনী নিয়া গঠিত ১৬৩ ডিভিসন সৈন্য কিংবা মোট ২২ লক্ষ লোক ও বহু সহস্র ট্যাংক, কামান ও বিমান নিয়া জয়যাত্রা শুরু করিল। ওয়ারশ-বার্লিন ছিল এই অভিযানের মুখ্যপথ এবং শত্রুর তুলনায় তখন লালফৌজ সব দিক দিয়াই অধিকতর শক্তিশালী ছিল। যেমন—সৈন্যসংখ্যা ৫·৫ গুণ, কামান ৭·৮ গুণ, ট্যাঙ্ক ৫·৭ গুণ এবং বিমান ১৭·৬ গুণ বেশী। —(সোভিয়েত সরকারী ইতিহাসের মতে)।

১৮ই জানুয়ারির মধ্যে এই বিপুল অভিযানের রূপরেখা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল :

১. জেনারেল কোনেভ দক্ষিণ পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া শিল্পসমৃদ্ধ সাইলেশিয়া অভিমুখে।
২. জেনারেল জুকোভ মধ্য পোল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া জার্মানীর মর্মস্থলের দিকে।
৩. জেনারেল রকোসোভোস্কি উত্তর পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া ডানজিগ অভিমুখে।
৪. দক্ষিণে চতুর্থ উক্রাইনীয়ান ফ্রণ্টের জেনারেল পেট্রোভ কার্পেথিয়ান পর্বতের দিকে এবং উত্তর দিকে—
৫. জেনারেল চেরনিয়াচোভস্কি তৃতীয় বেলোরুশিয়ান ফ্রণ্টের অধিনায়করূপে পূর্ব প্রুশিয়ার ভিতরের দিকে।

এই পাঁচটি ফ্রণ্ট বা আর্মিগ্রুপ জার্মানী অভিমুখে যেন দুর্বারগতিতে অগ্রসর

হইতেছিল। ২১শে জানুয়ারীর মধ্যে জুকোভ ১৯৩৮ সালের জার্মান সীমানা অতিক্রম



করিয়া পোজনানের জার্মান দুর্গ ঘিরিয়া ফেলিল এবং ওডের নদীতীরস্থ ফ্রাঙ্কফুর্টের অভিমুখে জার্মানীর ব্রান্ডেনবুর্গ প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অবস্থার মধ্যে

হিটলার তাঁর ক্ষমতালাভের দ্বাদশ বার্ষিকী উপলক্ষে যে বক্তৃতা দিলেন, মনে হইল তা গোরস্থানের ভাষণ। কেননা, তখন মাত্র একটি প্রতিবন্ধক বাকী ছিল—ওডের নদী এবং লালফৌজ কর্তৃক এই নদী পার হওয়ার পরেই জার্মানী খতম।...

বার্লিনে নিদারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হইল। হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী ভীড় করিতে লাগিল। বহু প্রকার গাড়িতে পলায়মান জনতা—স্ত্রীলোক, শিশু বৃদ্ধ এবং বন্দীশালা থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দী ও দাস-শ্রমিকের দল। বার্লিনকে নিরাপদ মনে করিয়া এই জনতা রাজধানী অভিমুখে ছুটিল। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে, তুষারদংশনে এবং মিত্রপক্ষীয় বিমানের ভয়াবহ বোমাবর্ষণে অজস্র নর-নারী প্রাণ হারাইল। মাইলের-পর-মাইল আগুনে জ্বলিয়া গেল এবং পূর্বদিক থেকে উদ্বাস্তু স্রোত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইল। আক্রান্ত প্রুশিয়ার বিখ্যাত ট্যানেনবার্গ (প্রথম মহাযুদ্ধের) থেকে জার্মানী কর্তৃক হিণ্ডেনবুর্গ ও তাঁর দেহাবশেষ বার্লিনে অপসারিত হইল। আর জার্মান সামরিক ভাষ্যকার জেনারেল ডিটমার রেডিওযোগে ঘোষণা করিলেন—'পূর্ব-রণাঙ্গনের অবস্থা অবিশ্বাস্য রকমের গুরুতর।'[1]

কিন্তু এই চরম দুর্গতি এবং বিষম বিপদ সত্ত্বেও জার্মান সৈন্যেরা অপরিসীম বীরত্বের সঙ্গে রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। দলে দলে এবং হাজারে হাজারে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তবু 'বর্বর বলশেভিকদের' হাতে ধরা দিতে চাহে নাই। কারণ, তারা একথা বুঝিয়াছিল যে, রাশিয়াতে তারা যে ভয়ংকর অত্যাচার করিয়াছে এবং রুশ যুদ্ধবন্দীদের যেভাবে হত্যা করিয়াছে, তাতে রুশদের হাতে ধরা পড়িলে জার্মানদের আর রক্ষা নাই। অতএব তারা যুদ্ধ করিয়াছে।

আর—এদিকে পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রবাহিনীও পশ্চিম ও দক্ষিণ জার্মানীর দিকে ধাবমান। কিন্তু দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভেরিয়া পার্বত্য অঞ্চলের নিরাপদ দুর্গে দুর্ধর্ষ নাৎসীবাহিনীর শেষ 'জাতীয় প্রতিরক্ষার আশ্রয়, (ন্যাশনাল রিডাউট) গড়িয়া উঠিবে—এটা ছিল নিতান্তই সাজানো গুজব এবং গোয়েবলসের অতি কৌশলপূর্ণ প্রোপাগাণ্ডার সাফল্য। অবশ্য কিছু কিছু সরকারী দপ্তর দক্ষিণদিকে অপসারিত হইয়াছিল এবং কিছু কিছু নাৎসী নেতাও সেদিকে পালাইয়াছিলেন। কিন্তু হিটলার বার্লিন ছাড়িয়া এক-পা নড়িতে রাজী ছিলেন না।

* * *

১৯৪৫ সালের বসন্তকালে কেবল সোভিয়েত বাহিনীই নয়, মিত্রবাহিনীও জার্মানীর অভ্যন্তরে রণক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল। লালফৌজ যখন বার্লিন থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে তখন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী হ্যামবুর্গ-উইটেনবার্গ-ম্যাগডেবার্গ রণক্ষেত্রের লাইন ধরিয়া এপ্রিলের মধ্যভাগে এলবে নদীতীরে পৌঁছিল। সেখান থেকে তাদের অগ্রগতি ন্যুরেমবার্গ এবং স্টার্গাটের দিকে। বার্লিন থেকে তখন মিত্রবাহিনীর দূরত্ব ছিল ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার। কিন্তু তার আগে মস্কোতে একটি ছোট—কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় ঘটনার অবতারণা হইয়াছিল।

* * *

কিন্তু এই ঘটনা বলার আগে মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত বছর ১৯৪৫ সাল সম্পর্কে উল্লেখ

১। আলেকজান্দার ওয়ার্থ, ৮৫১-৫৩

করা দরকার যে হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের আগে যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মাত্র ২৫টি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল, সেখানে যুদ্ধ জয়ের জন্য ১৯৪৫ সালে ৪১টি দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্বোপরি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক আদর্শের মতবৈষম্য থাকা সত্ত্বেও 'সাধারণ শত্রু' ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক মহাজোট বা গ্রেট কোয়ালিশনের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ সালের প্রারম্ভে ইউরোপের রণনৈতিক পরিস্থিতি রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অনুকূল ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখা দরকার যে, জার্মানীর অবস্থা বা পজিশন খুব খারাপ হওয়া সত্ত্বেও, তখনও তার সৈন্যশক্তি প্রচুর ছিল। জার্মান আর্মিতে তখন ৭৪ লক্ষ ৭৬ হাজার লোক ছিল। এরমধ্যে ৫৩ লক্ষ ৪৩ হাজার সৈন্য ছিল প্রত্যক্ষরূপে রণাঙ্গনের কাজে এবং সেই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে ৩১ লক্ষ ছিল পূর্ব রণাঙ্গণে। আর তাদের অস্ত্রের সংখ্যা ছিল ২৮৫০০ কামান ও মর্টার, ৩৯৫০ ট্যাঙ্ক ও গান্, এবং ১৯৬০টি ছিল বিমান। অবশ্য ১৯৪৪ সালের তুলনায় এটা কম ছিল। কারণ, ইতিমধ্যে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও ফিনল্যান্ড রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হইয়াছিল।

অপরপক্ষে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে ১৯৪৪ সালের মতই সোভিয়েত বাহিনীতে ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৫৬ হাজার সৈন্য ছিল। এর মধ্যে রণাঙ্গনে ছিল ৬০ লক্ষ। কামান ও মর্টার ছিল ৯১ হাজার ৪ শত, রকেট নিক্ষেপকারী ছিল ২৯৯৩, ১১ হাজার ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান ও ১৪ হাজার ৫ শত বিমান (লেলিনগ্রাদ ও দক্ষিণ-পূর্ব) বুলগেরিয়া ছাড়া)। পোলিশ, চেক, রুমানীয় ও বুলগেরিয়ান সৈন্যেরাও (মোট ২৯ ডিভিসন ৫ ব্রিগেড) লালফৌজের সঙ্গে একত্রে লড়িয়াছিল এবং তাদের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৫ শত এবং সমরসম্ভারের মধ্যে ছিল ৫ হাজার ২ শত কামান ও ২ শত ট্যাঙ্ক। একটি ফরাসী বিমান ইউনিটও সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল।[১]

পশ্চিমের মিত্রপক্ষের তখন ৮৭টি পুরো ডিভিসন সৈন্য, ৬ হাজার ৫ শত ট্যাঙ্ক ও ১০ হাজারের বেশী রণবিমান। আর বিপরীত দিকে জার্মানীর ছিল ৭৪টি নিম্ন-মানের ডিভিসন ও ৩ ব্রিগেড সৈন্য, ১ হাজার ৬ শত ট্যাঙ্ক ও 'আঘাতকারী কামান' এবং ১,৭৫০টি রণবিমান। অর্থাৎ পশ্চিমের মিত্রপক্ষ সৈন্যসংখ্যায় ও মারাত্মক অস্ত্র-শক্তিতে জার্মান বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশী বলশালী ছিল। ইতালীতে ও বলকানেও মিত্রপক্ষের শক্তি বেশী ছাড়া কম ছিল না। কিন্তু তবু তাদের দ্রুতগতি জয় হইল না। অন্যদিকে সোভিয়েত বাহিনী সমগ্র রণাঙ্গন ব্যাপিয়া অর্থাৎ ভিশ্চুলা নদীর মুখ থেকে ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া) পর্যন্ত আঘাত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু আসল আক্রমণের পথ ছিল ওয়ারশ থেকে বার্লিন। সুতরাং জার্মানীও বার্লিনের প্রবেশ-পথে বাধা দেওয়ার জন্য পরপর ৭টি প্রতিরক্ষার লাইন তৈরী করিয়াছিল। ভিশ্চুলা ও ওডের নদীর মধ্যবর্তী পোলিশ ভূমির মধ্য দিয়া ৫০০ কিলোমিটার গভীর আত্মরক্ষার

১। Great Patriotic War of the Soviet Union—Moscow. P. 350-52

ব্যূহ তৈরী হইয়াছিল এবং পুরাতন জার্মান-পোলিশ সীমান্তে ওডের নদী বরাবর জার্মানদের বাধাদান বেশ প্রচণ্ড ছিল।[১]

* * *

রাইন নদী পার হওয়ার পর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী আর জার্মানীর কাছ থেকে তেমন বাধার সম্মুখীন হইল না। সুতরাং তারাও জার্মানীর অভ্যন্তরে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বার্লিনের দখল নিয়া মিত্রপক্ষীয় মহলে যে বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল, তা আগেই বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ভিয়েনা ও বার্লিন লালফৌজের দখলে গেলে রণনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়া সোভিয়েত রাশিয়া ইউরোপে অজেয় হইয়া উঠিবে, বৃটিশপক্ষ এবং বিশেষভাবে চার্চিল এই আশংকায় ইঙ্গ-মার্কিন সৈনাপত্যের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যদিও পশ্চিম রণাঙ্গনে মার্কিন সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার বার্লিনের রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব স্বীকার করিতে তেমন রাজী ছিলেন না, তবু লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনের সরকারী মহলে লালফৌজের আগে বার্লিনে পেঁছিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল।

এই সময় মস্কোতে সেই নাটকীয় ঘটনাটির অবতারণা হইল, যে কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে।···

সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আইভান কোনভের বার্লিন যুদ্ধ সংক্রান্ত স্মৃতি-কথায় দেখা যায়—

১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল সুপ্রীম কমাণ্ডার-ইন-চীফ মার্শাল স্ট্যালিন হঠাৎ ১নং বেলোরুশিয়ান ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতি মার্শাল জুকোভ এবং ১নং উক্রাইনীয়ান ফ্রন্টের অধিনায়ক মার্শাল আইভান কোনেভকে মস্কোর সদর দপ্তরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ক্রেমলিনে স্ট্যালিনের সুবৃহৎ পাঠকক্ষে কনফারেন্সের জন্য একটি সুদীর্ঘ টেবিল ছিল এবং প্রাচীরগাত্রে ছিল অতীত রাশিয়ার জাতীয় বীর সেনানী সুভোরোভ ও কুটোজোভের প্রতিকৃতি। রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির বিশিষ্ট সদস্য—সেনানীমণ্ডলীর প্রধান এ. আই. আন্তানোভ এবং অপারেশন কমাণ্ডের প্রধান এস. এম. স্তেমেঙ্কো (Shtemenko) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। স্ট্যালিন জুকোভ ও কোনেভকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—

'পরিস্থিতি কি দাঁড়াচ্ছে সে বিষয়ে আপনারা কিছু খবর রাখেন?'

জুকোভ ও কোনেভ জবাব দিলেন যে, তাঁরা তাঁদের প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী খবর রাখেন।

স্ট্যালিন তখন স্তেমেঙ্কোর দিকে তাকাইলেন এবং টেলিগ্রামটি পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। স্তেমেঙ্কো যে তারবার্তা পড়িয়া শুনাইলেন তার মর্ম এই:

'—the U. S.-British Command was staging an operation to capture Berlin with the aim of taking the city before the Soviet Army could do it. The main forces were being organised under the command of Field Marshal Montgomery. The direction of the main attack was being planned north of the Ruhr, via the shortest road between Berlin and the main British forces.'

১। পূর্বোধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৫০।

'সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বার্লিন অধিকার ও শহর দখল করার আগেই মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যাপত্য বার্লিন দখলের উদ্দেশ্যে রণক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছে। ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর অধীনে প্রধান সৈন্যদল সংগঠিত হইতেছে। বার্লিন ও প্রধান বৃটিশ বাহিনীগুলির মধ্যে সংক্ষিপ্ততম রাস্তা ধরিয়া এবং রুঢ়ের শিল্পাঞ্চলের উত্তর দিক দিয়া এই মূল আক্রমণ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা চলিতেছে।'[১]

টেলিগ্রামের মধ্যে মিত্রপক্ষের অন্যান্য প্রস্তুতির কথাও ছিল। সুতরাং স্তেমেস্কোর পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ট্যালিন জুকোভ ও কোনেভকে জিজ্ঞাসা করিলেন:

'তা হলে বার্লিন কারা দখল করছে?—আমরা না মিত্রপক্ষীয়রা?'

মার্শাল কোনেভই আগে জবাব দিলেন এবং বলিলেন—'আমরাই আগে বার্লিন দখল করবো এবং মিত্রপক্ষের আগেই করবো।'

স্ট্যালিন একটু মৃদু হাসিয়া মন্তব্য করিলেন—'তা হলে আপনারা তেমন লোক? …কিন্তু আপনি আপনার সৈন্যদলকে কিভাবে পুনর্গঠন করবেন? কারণ, আপনার আসল সৈন্যবাহিনী তো রয়েছে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে। অতএব আপনাকে পুনর্গঠনের জন্য অনেক কিছু করতে হবে।'

'কমরেড স্ট্যালিন, আপনি এ-নিয়ে কোন দুর্ভাবনা করবেন না। যথা সময়ে বার্লিনের দিকে অভিযানের জন্য আমরা সমস্ত প্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিব।'—জবাব দিলেন মার্শাল কোনেভ।

আর জুকোভ বলিলেন যে, তাঁর সৈন্যেরা বার্লিন দখলের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ১নং বেলোরুশিয়ান ফ্রণ্ট সৈন্যবলে ও অস্ত্রবলে সুসজ্জিত হইয়া সংক্ষিপ্ততম পথে বার্লিন অভিযানের জন্য তৈয়ার হইয়া রহিয়াছে।

স্ট্যালিন তখন বলিলেন—'আচ্ছা বেশ, দু'জনে আপনাদের পরিকল্পনা সদর দপ্তরে বসে দু-একদিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলুন এবং সদর দপ্তরের অনুমোদিত পরিকল্পনা নিয়ে নিজ নিজ রণাঙ্গনে ফিরে যান।'

স্ট্যালিনের সঙ্গে এই আলোচনার ফলে বুঝা গেল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বার্লিন অভিযান করিতে হইবে। ১নং বেলোরুশিয়ান ফ্রণ্টের অধিনায়ক জুকোভ সোজাসুজি এবং ১নং উক্রাইনীয়ান ফ্রণ্টের প্রধান সেনাপতি কোনেভ দক্ষিণ দিকে কটবাস (Kottbus) অঞ্চল হইয়া বার্লিন আক্রমণ করিবেন।

উভয় ফ্রণ্টের সৈন্যেরাই মধ্যভাগে ড্রেসডেনের দিকে আক্রমণ চালাইয়া এলবে নদীতীরে পৌঁছিবে।[২]

এখানে আর-একটি তাৎপর্যব্যঞ্জক ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। স্ট্যালিন যখন দুই প্রধান নায়কের সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন এবং আক্রমণের গতিপথ নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন তখন তিনি একটি পেন্সিল দিয়া মানচিত্রের উপর ১নং বেলোরুশিয়ান ও ১নং উক্রাইনীয়ান ফ্রণ্টের অগ্রগতির সীমারেখা টানিয়া দিতেছিলেন। কিন্তু বার্লিনের ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে লুব্বেন (Lubben) শহরের দিকে আসিয়া তিনি তাঁর পেন্সিলের লাইন টানা হঠাৎ থামাইয়া দিলেন।

এই লাইন টানার পর স্ট্যালিন নিঃশব্দ রহিলেন। কিন্তু পরে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন—

'Who gets in first, let him take Berlin.'

অর্থাৎ যিনি আগে ঢুকিতে পারিবেন, তিনিই বার্লিন দখল করুন।[১]

বার্লিন দখলের জন্য লালফৌজের সাধারণ সৈন্য থেকে শুরু করিয়া অফিসারদের মধ্যে পর্যন্ত গভীর ঔৎসুক্য ও উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল। এমন কি কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন যে, বার্লিন আক্রমণ ও দখল করার বিষয়ে তিন মার্শালের—জুকোভ, কোনেভ এবং রকোসোভোস্কির মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব পর্যন্ত দেখা দিয়াছিল। স্ট্যালিন তাঁর সদর দপ্তরের মানচিত্রের উপর লাইন টানিয়া অত্যন্ত কৌশলে এই প্রতিযোগিতার উস্কানি দিয়াছিলেন।

২নং বেলোরুশিয়ান ফ্রণ্টের অধিনায়ক মার্শাল কে. কে. রকোসোভস্কি ৬ই এপ্রিল তারিখ স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। তাঁকে ভার দেওয়া হইয়াছিল সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের উত্তর দিক দিয়া বার্লিন দখলে সহযোগিতা করার জন্য।

বার্লিন অভিযানের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল 'ভিশ্চুলা' নদী এবং 'সেণ্টার' বা মধ্য রণাঙ্গনের দুইটি জার্মান আর্মি গ্রুপকে ধ্বংস করিয়া বার্লিন দখল করা এবং সেই সঙ্গে এলবে নদীতে পৌঁছিয়া ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সহিত মিলিত হওয়া। ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ করার এইটাই ছিল চূড়ান্ত পরিকল্পনা।

বার্লিনের দিকে যখন অভিযান চলিতে থাকিবে তখন চেকোশ্লভাকিয়া আক্রমণ করাও সোভিয়েত বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল। এবং এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল চেকোশ্লভাকিয়া থেকে যাতে জার্মান বাহিনী বার্লিনের দিকে অপসারিত হইতে না পারে, তেমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা।

লালফৌজ কর্তৃক বার্লিন দখলের অভিযানে নাৎসী জার্মানী সর্বস্ব পণ করিয়া বাধা দিবে এবং পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রবাহিনীকে তেমন কোন প্রতিরোধ করা হইবে না, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত বিষয় পূর্বেই বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং বার্লিন বেষ্টন ও জার্মানীকে আক্রমণের জন্য সোভিয়েত হাইকমাণ্ড যে সামরিক শক্তির সমাবেশ করিলেন, তেমন শক্তি অন্য রণক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। জুকোভ, কোনেভ এবং রকোসোভস্কি—এই তিন মার্শালের নেতৃত্বে তিনটি সম্মিলিত ফ্রণ্টের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াইল ২৫ লক্ষ, কামান ও মর্টার ৪২ হাজার, ট্যাঙ্ক ৬২৬০, রণবিমান ৭৫০০ এবং রকেট-নিক্ষেপক ১ হাজারের বেশী। আর আসল রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে ২৫০টি কামান। অর্থাৎ জার্মান বাহিনীর তুলনায় সোভিয়েত বাহিনী রণক্ষেত্রের সৈন্যশক্তিতে এবং অস্ত্রশক্তিতে দ্বিগুণ থেকে চারগুণ বেশী বলশালী ছিল।

এই ঐতিহাসিক আক্রমণের তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছিল ১৬ এপ্রিল শেষ রাত্রি—কুস্ট্রিন থেকে ওডের নদী পার হইয়া এই আক্রমণের বোধন করা হইবে।

* * *

কিন্তু একমাত্র বার্লিন শহর দখলের জন্য ১০ লক্ষ সৈন্য, ১০ হাজার ৪ শত ফিল্ডগান এবং অন্যান্য অস্ত্র ও সমরসম্ভারের সমাবেশ কি প্রয়োজনের তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত ছিল

১। Great Patriotic War of the Soviet Union—P. 377.

না এবং ফলে অতিরিক্ত সৈন্যক্ষয় কি হইয়াছিল না ?—এই প্রশ্ন সোভিয়েত মহল থেকে উঠিয়াছিল।[১]

এই প্রশ্নের জবাবে বার্লিন যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি লেঃ জেনারেল কে. এফ. টেলেগিন তাঁর এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, হাঁ কথাটা আংশিক সত্য, পুরাপুরি নয়। কুস্ট্রিন-বার্লিন মধ্য রণাঙ্গনের সংক্ষিপ্ততম পথে ১নং বেলোরুশিয়ান এবং ১নং উক্রাইনীয়ান ফ্রন্টের (আর্মি গ্রুপ) পারস্পরিক সহযোগিতায় বার্লিনের যুদ্ধ হয়তো আরও কম সৈন্য ও কম অস্ত্রশক্তির সহযোগিতায় জয় করা যাইত। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, জার্মান হাইকমান্ড তাঁদের সর্বশক্তি বার্লিন প্রতিরক্ষার যুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁরা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, ওডের নদীর যুদ্ধেই বার্লিনের ভাগ্য চূড়ান্তরূপে নির্ণীত হইয়া যাইবে। এজন্য বার্লিন রক্ষাকারী ৯নং আর্মির অধিকাংশকেই ওডের রণাঙ্গনের দিকে পাঠানো হইয়াছিল। বার্লিনের উত্তর দিক থেকে মার্শাল জুকোভের সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বদেশে আক্রমণের পরিকল্পনার জন্য কিছু মজুত সৈন্যও জমায়েত করিয়া রাখা হইয়াছিল। জার্মানীও ১০ লক্ষ সৈন্য ১০ হাজার কামান ও মর্টার, প্রায় দেড় হাজার ট্যাংক এবং তিন হাজার রণবিমান সমাবেশ করিয়াছিল। অধিকন্তু বার্লিনের প্রতিরক্ষার জন্য প্রচণ্ড আয়োজন করা হইয়াছিল। এমন কি, পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সৈন্য সরাইয়া আনিয়া পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল এবং পশ্চিমের ঘাঁটি ও শহরগুলি থেকে জার্মান সৈন্যেরা স্বেচ্ছায় ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছিল। ১১ এপ্রিলের মধ্যেই মার্কিন বাহিনীর অগ্রবর্তী দল ম্যাগডেবুর্গে হাজির হইয়াছিল। এলবে নদীর বিস্তৃত রণাঙ্গনেও তারা পৌঁছিয়াছিল। এমন কি ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিমান-সৈন্যেরা বার্লিনের সন্নিহিত অঞ্চলে অবতরণ করিয়া লালফৌজের আগেই বার্লিন শহর দখল করিয়া নিবে—সোভিয়েত কমান্ডের নিকট এই মর্মে রিপোর্ট পৌঁছিয়াছিল। মার্কিন বিমানবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি জেনারেল গ্যাভিন সোভিয়েত সেনাপতি লেঃ জেনারেল টেলেগিনের নিকট এক সময় মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রুশরা এক আশ্চর্য জাতি। ভিশ্চুলা থেকে ওডের নদী পর্যন্ত তাঁরা যেভাবে যুদ্ধ চালাইয়া আসিয়াছেন, তাতে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের ধারণা হইয়াছিল যে, মে মাসের মাঝামাঝির আগে সোভিয়েত সৈন্যেরা বার্লিনের দিকে অভিযান করিতে পারিবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য তার আগেই তাঁরা বার্লিন দখল করিয়া নিয়াছিলেন।[২]

১১ই এপ্রিল সোভিয়েত সর্বাধিনায়ক মার্শাল স্ট্যালিন মার্শাল জুকোভের দপ্তরে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন :

'হিটলার বার্লিন এলাকায় মাকড়শার জাল বুনিতেছে। উদ্দেশ্য হইতেছে রাশিয়া ও মিত্রপক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা। এই জাল ছিন্ন করার জন্য সোভিয়েত বাহিনীকে বার্লিন দখল করিতে হইবে।…আমরা এটা করিতে পারি এবং আমাদের অবশ্যই এটা করিতে হইবে।'

অর্থাৎ মার্শাল স্ট্যালিন যথাসম্ভব দ্রুত বার্লিন দখলের জন্য মার্শাল জুকোভ এবং মার্শাল কোনেভকে তাগিদ দিলেন।[৩]

---

* * *

উচ্চতম সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল ১২ থেকে ১৫ দিনের যুদ্ধে বার্লিন শহর দখল করা। হিটলারও রাজধানী রক্ষা করার জন্য শহরের প্রবেশপথে গভীরতর ব্যূহ তৈয়ার করিলেন এবং ওডের নদী ও স্প্রী নদী বরাবর প্রচুর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ এবং উত্তর—সমস্ত দিক দিয়াই বার্লিনকে দুর্ভেদ্য করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হইল না। হিটলারের পক্ষে আর-একটা ভরসার কারণ এই ছিল যে, বার্লিনের চারিদিকে প্রাকৃতিক বিঘ্নও প্রচুর ছিল—জঙ্গল, জলাভূমি, নদী ও ক্যানেল বা খাল ইত্যাদি ছিল। আর রাজনৈতিক দিক দিয়া চেষ্টা ছিল 'সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিমের মিত্রপক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো।' সৌভাগ্যক্রমে হিটলার ও তাঁর দলবলের সেই আশা পূর্ণ হইল না। মার্শাল কাইটেল নুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে তাঁর সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সাল থেকেই হিটলার রাশিয়া ও ইঙ্গ-মার্কিনের মধ্যে বিচ্ছেদের আশায় ছিলেন।

কিন্তু মিত্রপক্ষের মধ্যে যেমন বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হইল না তেমনি বার্লিনের প্রবেপপথ থেকে শুরু করিয়া রাস্তায় রাস্তায় যে অজস্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হইয়াছিল, লালফৌজের ভয়াবহ আক্রমণের বন্যাবেগে সেগুলি যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। ১৬ই এপ্রিল রাত্রি ৪টায় মার্শাল জুকোভের বাহিনী কুস্ট্রিন থেকে অভূতপূর্ব গোলাগুলি বর্ষণের দ্বারা বার্লিনের দিকে অভিযানের বোধন করিলেন। প্রচণ্ড আলোকের বন্যায় (১৪৩টি ফ্লাড লাইট) জার্মান সৈন্যদের চোখ যেন ধাঁধিয়া গেল এবং হাজার হাজার কামানের অগ্নি উদ্গিরণে শত্রুসৈন্যেরা একবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল। ১৭ই এপ্রিল জার্মানদের দ্বিতীয় আত্মরক্ষার ব্যূহ বিদ্ধ হইল এবং তৃতীয়ের দিকে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। ১৮ই এপ্রিল স্প্রী (Spree) নদী অতিক্রান্ত হইল এবং ২০শে এপ্রিল জোসেন্ (Zossen) বা জার্মান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের প্রতিরক্ষার লাইন ভাঙ্গিয়া গেল। অভিযানের ষষ্ঠ দিনে ওডের-নেইসী নদী বরাবর ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গন বিদীর্ণ হইল। ২১শে এপ্রিল সন্ধ্যায় রুশ সৈন্যেরা বালিনের শহরতলীতে প্রবেশ করিল এবং ২২শে এপ্রিল বার্লিনের বহির্ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গেল এবং অপরাহ্নে বালিনের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল—যদিও স্ট্যালিনগ্রাদের অনুরূপ নয়।

বার্লিন দুর্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং যে ১২ নং জার্মান আর্মি মার্কিন বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য গঠিত হইয়াছিল, তাদের নিয়োগ করা হইল অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে। ক্রমে বার্লিন তিনটি সম্মিলিত ফ্রন্টের অর্থাৎ জুকোভ, কোনেভ ও রকোসোভস্কির দ্বারা বেষ্টিত হইতে লাগিল।

বার্লিনে বিপর্যয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইল এবং দলে দলে নরনারী সেই আতঙ্কের শিকার হইল। এদিকে জল, কয়লা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি বন্ধ হইয়া গেল। ত্রাসগ্রস্ত হিটলারের চেলারা এবং একদা যাঁদের দোর্দণ্ড প্রতাপে জার্মানী ও অধিকৃত ইউরোপ কাঁপিত, হিটলারের সেই দুর্দান্ত চেলারা—হিমলার, গোয়েরিং প্রভৃতি বার্লিন থেকে চম্পট দিল। বোমার ও কামানের গোলাবর্ষণে বার্লিন নগরী তখন মাইলের-পর-মাইল অগ্নিশিখায় জ্বলিতেছিল। মিত্রপক্ষ ৬৫ হাজার টন বোমা বর্ষণ করিয়াছিল, আর সোভিয়েত পক্ষ ৪০ হাজার টন গোলা নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সেই অবস্থায়ও জার্মান

সৈন্যেরা রাস্তায় রাস্তায় বাধা দিতেছিল। এমন কি প্রত্যেকটি গৃহকে যেন তারা সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করিয়াছিল। অবশ্য রাস্তার যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যদেরও প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল,—স্ট্যালিনগ্রাদেই তার প্রমাণ। মার্শাল জুকোভ বার্লিন যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং রণনীতি ও রণক্রিয়া সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, বার্লিন যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সুপ্রীম কমাণ্ডার-ইন-চীফ মার্শাল স্ট্যালিন অত্যন্ত দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই রণপ্রস্তুতির পরিচালনা করিয়াছিলেন।[১]

বার্লিন যুদ্ধে উভয় পক্ষেই প্রচুর সৈন্য হতাহত হইয়াছিল। কেননা, গোয়েবেলসের দপ্তর 'বলশেভিক বর্বরতা' এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে জার্মান সৈন্য ও জনগণের চিত্তে প্রচণ্ড উত্তেজনা ও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। ফলে, রুশদের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া ভালো—এই মনোভাবের দ্বারা জার্মানরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এদিকে ৯ই মার্চ ১৯৪৫, হিটলারের কড়া হুকুম ছিল 'শেষ সৈন্যটিকেও প্রাণ দিয়া রাজধানী রক্ষা করিতে হইবে।' এবং এই কাজে যারা ব্যর্থ হইবে কিংবা পশ্চাতে হটিতে চাহিবে তাদেরকে গুলি করিয়া মারা হইবে। সুতরাং বার্লিনের জন্য জার্মানদের মৃত্যুপণ যুদ্ধ না করিয়া উপায় ছিল না।

শেষের কয় মাসের এই মর্মান্তিক অবস্থা সম্পর্কে লেঃ জেনারেল কে. এফ. টেলেগিন লিখিয়াছেন ঃ

'The history of the last months of the Nazi dictatorship is a bloody chronicle of the tragedy of thousands of German families, of the officers and men who had been shot or tortured "for disobedience" "for loss of the German spirit" for desertain and for attempts to surrender.···Special S. S. groups had orders to shoot on the spot any person who left his position without orders or tried to surrender. "Any person, whether private or officer, who will retreat will be shot on the spot' such was Hitler's order."—[২]

সোজা কথায় এর মর্ম হইতেছে যে কোন জার্মান সৈন্য রাজধানী রক্ষার এই যুদ্ধে হুকুম পালন করিতে ব্যর্থ হইবে, কিংবা পালনের চেস্টা না করিবে, অথবা পশ্চাদপসরণ করিবে, তাকেই তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া হত্যা করা হইবে। হিটলারী ডিক্টেটরির শেষ কয়েক মাসে হাজার হাজার জার্মান পরিবার এভাবে ভয়ংকর ট্র্যাজেডির সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

হিটলারের আদশে ও গোয়েবেলসের প্রচারকার্য মিলিয়া বার্লিনের জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল—যদিও তখন সোভিয়েত সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বার্লিনের আত্মরক্ষার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং এই যুদ্ধ জার্মানীর প্রায় আত্মহত্যার সমান ছিল। কারণ, লালফৌজের ২৫ লক্ষ সৈন্য তখন জার্মানীকে তিন দিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল এবং পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রবাহিনী পশ্চিম ও দক্ষিণ জার্মানীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়ার ফলে জার্মানী উত্তরে ও দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন এবং বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ২৫শে এপ্রিল এলবে নদীতীরের

১। Great Patriotic War of the Soviet Union, P. 376, 382.

২। The Gread March of Liberation. P. 270-71.

টোরগাউ (Torgau) শহরের নিকট রুশ ও মার্কিন সৈন্যদল পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইলেন। জার্মানীর অভ্যন্তরে মিত্রবাহিনীর পরস্পরের মধ্যে এই হাত মিলানো ইউরোপে এক নতুন ইতিহাসের অধ্যায় খুলিয়া দিল। কেননা, হিটলারের ঘোষিত 'হাজার বছরের রাইখে'র অন্তিম দশা ঘনাইয়া আসিল এবং ইউরোপীয় মানচিত্রের ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুতর পরিবর্তন ডাকিয়া আনিল।

কিন্তু জার্মানী ও বার্লিনের বিরুদ্ধে যখন এই চূড়ান্ত যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন নাৎসী মহানায়ক হিটলার এবং তাঁর দলবল কি করিতেছিলেন ? সেই অদ্ভুত ট্র্যাজিক ও রোমহর্ষক কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে বিধৃত হইয়াছে।

নবম পর্ব

চতুর্থ অধ্যায়

ভূগর্ভের অন্তিম আশ্রয়ে হিটলার

২০শে নভেম্বর, ১৯৪৪, হিটলার পূর্ব প্রুশিয়ার রাস্তেনবুর্গের সদর দপ্তর শেষ বারের জন্য ত্যাগ করিয়া বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য হিটলার এত কাল যে সদর দপ্তরে ছিলেন, সোভিয়েত বাহিনীর ঐতিহাসিক জয় ও অগ্রগতির জন্য রাস্তেনবুর্গের সেই বিখ্যাত সদর দপ্তর পরিত্যক্ত হইল। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব রণাঙ্গনের এই ভয়াবহ যুদ্ধের আরম্ভের পর হিটলার কদাচিৎ বার্লিনে আসার সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু ২০শে নভেম্বর রাস্তেনবুর্গের আস্তানা ত্যাগ করিয়া তিনি বার্লিনে আসার পর পশ্চিম দিকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে আর্দেনেস অঞ্চলে যে বেপরোয়া পালটা আক্রমণ তিনি চালাইয়াছিলেন, সে জন্য ১০ই ডিসেম্বর বার্লিন ত্যাগ করিয়া তিনি পশ্চিমের সদর দপ্তর জিয়েগেনবার্গে (Ziegenberg) কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পালটা আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৫, আবার বার্লিনে ফিরিয়া আসিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বার্লিনেই ছিলেন। কিন্তু পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে মিত্র পক্ষের প্রবল আক্রমণের জন্য হিটলারের পক্ষে বার্লিনের মন্ত্রিভবনে বা চ্যান্সেলারিতে অবস্থান করা আর সম্ভব ছিল না। কারণ, রাইখ চ্যান্সেলারির সেই বিখ্যাত ভবন মিত্রপক্ষীয় (প্রধানতঃ ইঙ্গ-মার্কিন বোমারু) বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং হিটলার ও তাঁর দলবল পুরাতন চ্যান্সেলারি ও বাগানের ৫০ ফুট মাটির নীচে বিশেষভাবে নির্মিত ভূগর্ভের বৃহৎ বাংকারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বাংকারে জার্মান রণপ্রভুর দৈনন্দিন জীবনযাপন ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মোটামুটি সব ব্যবস্থাই ছিল। অবশ্য এই বাংকারে আরাম ও বিলাসিতার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ৫০ ফুট মাটির নীচে হিটলার যেন পাতালপুরীর কংক্রীটের আশ্রয়ে এক ধরনের "আত্মগোপনে"র মত অবস্থান করিতেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, বোমা ও গোলাবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই হিটলার ও তাঁর স্টাফ এভাবে ভূগর্ভের নিরাপদ আশ্রয় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিলেন। বার্লিনের যুদ্ধ এবং হিটলারের অন্তিম আশ্রয়ের জন্য এই বাংকার সারা পৃথিবীতে "খ্যাতি" অর্জন করিয়াছিল। এই বৃহৎ বাংকার প্রধানতঃ দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশে ছিল ১২টি রুম বা কক্ষ। হিটলার দুর্দান্ত ও নৃশংস হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনযাত্রা সহজ ও অনাড়ম্বর ছিল। কোন প্রকার নেশা তাঁর ছিল না এবং তিনি নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করিতেন। বাংকারে এজন্য বিশেষভাবে নিরামিষ রান্নাঘর ছিল। এছাড়া দ্বিতীয় অংশে, অর্থাৎ ফুরারের নিজস্ব বাংকারে ১৮টি কক্ষ ছিল। কিন্তু কক্ষগুলি আয়তনে খুব ছোট ছিল এবং যাতায়াতের পথ ছিল সংকীর্ণ। তবে বাংকার থেকে জরুরী অবস্থায় পলায়নের বা বহির্গমনের জন্য একটা গোপন সুড়ঙ্গপথের ব্যবস্থাও ছিল। হিটলার ছাড়া গোয়েবেলস, বোরম্যান প্রভৃতি পদস্থ নাৎসী নেতাদের জন্য সরকারী ভবনগুলির নীচে

আরও কয়েকটি বাংকার ছিল এবং যুদ্ধের শেষের দিনগুলিতে এই সমস্ত বাংকারে আড্ডা ও আলোচনা সভা বসিত। জড্‌ল, কাইটেল প্রভৃতি শীর্ষ রণনায়কেরা তাঁদের সদর দপ্তর জোসেন (Zossen) বা পটসড্যাম থেকে এই সমস্ত আলোচনা-সভায় যোগ দিতেন। আর আসিতেন আর্মি জেনারেল স্টাফের নূতন অধিনায়ক জেনারেল হ্যান্স ক্রেবস্। কারণ, ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী অধিনায়কদের মত জেনারেল গুডেরিয়ানের সঙ্গেও হিটলারের তীব্র মত-বিরোধ ও ঝগড়া হইয়াছিল। ৩০শে মার্চ হিটলার-প্রস্তাবিত রণনীতি নিয়া জেনারেল গুডেরিয়ান ও হিটলারের মধ্যে ঝগড়ার এক "হিংস্র দৃশ্যের" অবতারণা হইয়াছিল এবং এই ঝগড়ার শেষে হিটলার গুডেরিয়ানকে পরামর্শ দিলেন তাঁর "দুর্বল হার্টের" জন্য অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিতে। সুতরাং গুডেরিয়ানের বদলে জেনারেল ক্রেবস্ সেনানীমণ্ডলীর নূতন নায়ক নিযুক্ত হইলেন। এককালে অবশ্য তিনি মস্কোর জার্মান দূতাবাসে "মিলিটারি অ্যাটাশে" ছিলেন। সেনাপতি হিসাবে তিনি দক্ষ ছিলেন বটে, তবে, হিটলারের বশংবদ ছিলেন।

* * *

হিটলার তাঁর এই পাতালপুরীর আশ্রয়ে তাঁর পাত্রমিত্র নিয়া রোজ দরবার করিতেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা ঐতিহাসিক এইচ. আর. ট্রেভর রোপার "হিটলারের শেষের দিনগুলি" (দি লাস্ট ডেইজ অব হিটলার) নামে মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যে মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাতে হিটলারের বাংকারের ঘটনাবলীর অত্যন্ত নিপুণ ও প্রামাণিক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে বইটি সর্বত্র শিক্ষিত মহলে সমাদৃত। মিঃ ট্রেভর রোপার বলিতেছেন যে, হিটলার ও নাৎসী রাষ্ট্র সম্পর্কে কতকগুলি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। হিটলারের শেষের দিনগুলির ঘাত-প্রতিঘাত বুঝিতে হইলে এই ভুল ধারণাগুলির সংশোধন হওয়া দরকার। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, হিটলার কাহারও হাতের "দাবার বড়ে" ছিলেন না এবং "নাৎসী রাষ্ট্র কোন তাৎপর্যব্যঞ্জক অর্থেই টোটেলিট্যারিয়ান বা সর্বগ্রাসী ছিল না" এবং এই রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকরাও "গবর্নমেন্ট" ছিলেন না। কিন্তু এটা ছিল একটা কোর্ট বা রাজদরবারের মত—যে দরবারের প্রশাসন ক্ষমতা ছিল নগণ্য। কিন্তু চক্রান্তবাজিতে এর ক্ষমতা ছিল অপরিমিত—প্রাচ্য দেশের যে কোন স্বেচ্ছাচারী সুলতানের মত। অবশ্য একটা রাইখ ক্যাবিনেট ছিল। কিন্তু এই মন্ত্রিসভাও ছিল নামে মাত্র। কারণ কোনদিন কার্যতঃ এর কোন অধিবেশন বা বৈঠক বসে নাই। নাৎসী সংবিধানের পণ্ডিত নামে পরিচিত মিঃ ল্যামার্স (Lammers) নুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি একদা মন্ত্রিসভার সদস্যদের একত্রে একটা বীয়ার পানসভায় মিলাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিটলার তা জানিতে পারিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন এবং মন্তব্য করিলেন যে, 'এরূপ পরীক্ষা বিপজ্জনক।'

১৯৪৪ সালের শীতকালে কিংবা ১৯৪৫ সালের বসন্তকালে অভিশপ্ত বার্লিন শহর থেকে যে কণ্ঠস্বর শুনা যাইত, সেটাই ছিল নাৎসী পার্টির আসল মনের কথা—হয় বিশ্বব্যাপী শক্তির অধিকারী কিংবা ধ্বংস। (World power or Ruin)। এর জন্য তাদের দরকার রাশিয়া বা শ্লাভ জাতিকে সংহার করা এবং পূর্ব ইউরোপকে উপনিবেশ পরিণত করা। নাৎসীবাদের পক্ষে এটা ছিল অপরিহার্য। ফ্রান্স বা

বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল গতানুগতিক—সাধারণ রাজ্যজয়ের যুদ্ধ কিংবা রাশিয়াকে সংহার করার পরিপূরক যুদ্ধমাত্র। কিন্তু নাৎসীদের কাছে সোভিয়েত রাশিয়ার "অস্তিত্বই ছিল অপরাধজনক"। সুতরাং দণ্ডযোগ্য বা সংহারযোগ্য।…পশ্চিমদিকের যুদ্ধ ছিল কূটনৈতিক এবং সীমাবদ্ধ লক্ষ্যের যুদ্ধ। অতএব কিছু আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন সেই সমস্ত যুদ্ধে মানা হইত। কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গণের যুদ্ধ ছিল "ক্রুসেড" বা ধর্মযুদ্ধের মত—মতাদর্শের সংগ্রাম, যে সংগ্রামে, সমস্ত নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। মূলগতভাবেই নাৎসীবাদ রুশবিরোধী ছিল :

'As Russia's crime was its existence, so its judgment was extermination. The war in the west was a traditional war, a war of diplomatic aims and limited objectives, in which some residue of international convention was regarded; the war in east was a "crusade" a "war of ideologies" in which all conventions were ignored. It is essential that we remember the basic anti-Russian significance of Nazism !'[১]

মিঃ ট্রেভর রোপার হিটলারী চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, হিটলারী মতে প্রকৃতি হইতেছে নিষ্ঠুর। সুতরাং তাঁর পক্ষেও নিষ্ঠুর হইতে কোন বাধা নাই—১৯৩৪ সালে ইহুদী ও শ্লাভদের সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য। অতএব তিনি স্থির করিলেন বিন্দুমাত্র করুণা না দেখাইয়া সংহারপর্ব চালাইতে হইবে! তিনি ছিলেন রক্তপিপাসু এবং আগাগোড়া যুদ্ধ পরিচালনার সময় তিনি এই রক্তপিপাসার অনবরত পরিচয় দিয়াছেন। "হত্যার জন্যই হত্যার" একটা দৈহিক ও মানসিক আনন্দ তিনি উপভোগ করিতেন। এমন কি যে-সমস্ত জেনারেল রক্তপাতে ও কঠোরতায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা পর্যন্ত হিটলারী নির্মমতার দৃষ্টান্তে গভীরভাবে আহত হইতেন। কেবল পরের দেশে নয়, নিজের দেশেও সৈন্য ও লোকদের রক্তপাতেও তিনি উল্লাসবোধ করিতেন। কারণ, "এই সমস্ত রক্তপাত ছিল ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব অর্জনের বীজ বপন স্বরূপ।" হিটলার যেন এক নরমাংসাশী অপদেবতার মত ছিলেন এবং তাঁর এই ভয়ংকর রক্তের তৃষ্ণা কোনদিন পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করে নাই এবং তাঁর ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষাও কোন দিন পূর্ণ চরিতার্থ হয় নাই এবং তাঁর প্রায় শেষের দিনের নির্দেশগুলিও ছিল হত্যা করার কিংবা বধ করার কলঙ্কে লিপ্ত। প্রাচীনকালের "বীরদের" মত নরবলিসহ তাঁকে গোর দেওয়া হোক, এটাই যেন ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। তাঁর নিজের দেহ পোড়াইয়া ভস্মীভূত করার আদেশও ছিল তাঁর সেই "ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের যুক্তিসঙ্গত উপসংহার মাত্র।"[২]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নরমেধযজ্ঞের কথা মনে রাখিলে মিঃ ট্রেভর রোপারের এই মন্তব্য নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত মনে হইবে না। কারণ, বার্লিনের ভূগর্ভের অন্তিম আশ্রয়েও তিনি পাশবিক নিষ্ঠুরতার অনেক বর্বর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন এবং গোটা জার্মান জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন।

* * *

২০শে এপ্রিল ছিল হিটলারের ৫৬তম জন্মদিন। তাঁর ইচ্ছা ছিল দক্ষিণ দিকে

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ১৩।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯।

ওবেরস্যালজবার্গে এই জন্মদিন পালন করার এবং সেখান থেকে বারবারোসার পৌরাণিক কাহিনীমণ্ডিত পার্বত্য দুর্গ থেকে তৃতীয় রাইখের শেষ আত্মরক্ষার যুদ্ধ পরিচালনা করার। এজন্য ১০ দিন আগেই ব্যাসেটসগ্যাডেনে তিনি তাঁর ভৃত্য ও গৃহস্থালির লোকেদের পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাঁর বার্গহোফের মনোরম ভিলাটিকে সাজাইবার জন্য। ট্রাকের-পর-ট্রাক ভর্তি করিয়া সরকারী স্টাফ ও দপ্তরখানা এবং দলিলপত্র ইত্যাদি দক্ষিণ দিকে পাঠানো হইল। বার্লিনের আসন্ন পতনের আশংকায় ভীত সরকারী কর্মচারীরাও সেদিকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। (এজন্যই পশ্চিম দিক থেকে অগ্রগামী ইঙ্গ-মার্কিন সৈনাপত্যমহলে গোপন রিপোর্ট পেঁাছিয়াছিল যে, দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল থেকেই হিটলারী জার্মানী তার শেষ প্রতিরক্ষার সংগ্রাম চালাইবে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের মিত্রপক্ষীয় সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ারও সেই রিপোর্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বার্লিনের সামরিক গুরুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন, যার জন্য পশ্চিমের মিত্রপক্ষীয় মহলে প্রচুর ক্ষোভ ও বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল।) কিন্তু হিটলারের অদৃষ্টে আলপাইনের সেই মনোরম নিবাস দেখার সুযোগ আর ঘটিল না। কেননা, যে দশদিন আগে তিনি তাঁর ভৃত্য ও সরকারী কর্মচারীদের সেই পার্বত্য নিবাসে পাঠাইয়াছিলেন, সেই কয়েকদিনের মধ্যেই একটার-পর-একটা বিপর্যয় ঘটিতে লাগিল। এত দ্রুত জার্মানী ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল যে, হিটলার তা অনুমান করিতে পারেন নাই। কার্যতঃ জার্মানী দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। মার্কিন ও রুশ বাহিনী এলবে নদীতীরে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইবার জন্য দ্রুত আগাইয়া আসিতেছিল। রুশেরা ইতিমধ্যেই ওডের এবং নেইসী নদী তটবর্তী এলাকায় পেঁাছিয়া গিয়াছিল এবং ড্রেনডেন ও বার্লিন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। আর উত্তর দিকে বৃটিশ বাহিনী ব্রেমেন বা হ্যাম্বুর্গ বন্দরের শহরগুলিতে পেঁাছিয়া জার্মানীকে অধিকৃত ডেনমার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। দক্ষিণ দিকে ফরাসী সৈন্যেরা উত্তর দানিয়ুবে এবং রুশ সৈন্যেরা ১৩ এপ্রিল ভিয়েনায় পেঁাছিয়া গেল। নাৎসী পার্টির রাজধানী ন্যুরেমবার্গ অবরুদ্ধ হইল এবং মার্কিন সপ্তম বাহিনীর একাংশ নাৎসী আন্দোলনের জন্মভূমি মিউনিকের দিকে ধাবমান হইল। ইতালীতে ফিল্ড মার্শাল আলেকজান্দারের সৈন্যেরা বলোগনা কাড়িয়া লইল এবং পো নদীর উপত্যকায় প্রবেশ করিল। মার্কিন জেনারেল প্যাটন ব্যাভেরিয়া ও রাইখের মর্মস্থল ভেদ করিয়া দক্ষিণে আল্পসের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তখন খোদ রাজধানী বার্লিন থেকে সোভিয়েত বাহিনীর বৃহৎ কামানগুলির গোলাবর্ষণের শব্দ শুনা যাইতেছিল।

এই অবস্থার মধ্যে হিটলার যখন তাঁর জন্মদিন অনুষ্ঠানের কথা ভাবিতেছিলেন, তখন তাঁর পণ্ডিতম্মন্য অর্থমন্ত্রী কাউন্ট সেভেরিন ভন ক্রোসিগ (Schwerin Von Krosigk) বলশেভিকদের অগ্রগতির সংবাদ শুনিবামাত্র বার্লিন ছাড়িয়া উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন এবং ২৩ এপ্রিল ডায়েরিতে মন্তব্য করিলেন—'আমাদের জাতির ভাগ্যে ঘোরতর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।'

কিন্তু এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সত্ত্বেও হিটলার যেন নিশ্চিন্ত এবং তাঁর ধারণা বার্লিনের প্রবেশপথে সোভিয়েত বাহিনী নিশ্চয়ই চূর্ণ হইবে এবং তাঁর বশংবদ ভক্তেরাও—যেমন, হিমলার, গোয়েরিং, গোয়েবলস, ডোয়েনিৎস, কাইটেল, জড্‌ল,

বোরম্যান, রিবেনট্রপ প্রভৃতি তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাইতে আসিয়া তাঁকে নানা স্তোকবাক্য শুনাইলেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই আন্তরিক ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হিটলারকে তোয়াজ করা এবং পরস্পরকে ল্যাং মারিয়া সম্ভব হইলে আরও ক্ষমতার আসন দখল করা।···

তবু সেদিনের সামরিক নেতাদের বৈঠকে রাইখের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা নিয়া উদ্বেগ দেখা দিল এবং নেতারা হিটলারকে পরামর্শ দিলেন অবিলম্বে বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। কারণ, এর পরে আর বিচ্ছিন্ন জার্মানীর স্থলপথ দিয়া দক্ষিণ অংশে যাওয়া সম্ভব হইবে না। আর রুশ সৈন্যেরা যেভাবে বার্লিন শহরকে ঘিরিয়া ধরিতেছে, তাতে এই অবরুদ্ধ শহর থেকে পলায়নের আর কোন উপায় থাকিবে না। সুতরাং বড় বড় নাৎসী নেতারা হিটলারকে অনুরোধ করিলেন বার্লিন ত্যাগ করার জন্য। কিন্তু হিটলার দৃঢ়তার সহিত অস্বীকৃত হইলেন। বরং তিনি জার্মানীর বিচ্ছিন্ন দুই অংশে—উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি পৃথক কমাণ্ড গঠন করিতে চাহিলেন। উত্তর অংশের নেতৃত্বে থাকিবেন গ্রাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস এবং দক্ষিণ অংশে ফিল্ড মার্শাল কেসেলরিং। এই দুই জনের প্রতিই হিটলারের গভীর আস্থা ছিল। কিন্তু হিটলার তখনও জানিতেন না যে, তাঁর প্রিয় ফিল্ড মার্শাল ততক্ষণে ইতালীতে জয়লাভের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সুতরাং হিটলারের এই সমস্ত পরিকল্পনা মুখে ও কাগজপত্রেই রহিয়া গেল।

বৈঠকের শেষে সেই রাতেই অনেক রথী-মহারথীই বার্লিনের বাঙ্কার ছাড়িয়া লরী ট্রাক প্লেন ও অন্যান্য যানবাহনের কনভয় যোগে ওবারস্যালজবার্গের দিকে পলায়ন করিলেন। এই পলায়িত বীরপুরুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম হিমলার ও গোয়েরিং, যে দুই নেতা হিটলারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে পরিচিত ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, গোয়েরিং পলায়নের আগে অনেক ট্রাক ভর্তি করিয়া তাঁর বিশাল ঐশ্বর্যপূর্ণ কারিনহল জমিদারি থেকে অনেক মূল্যবান লুণ্ঠিত মাল লইয়া গেলেন। তবে, হিমার ও গোয়েরিং উভয়েই এই মনোভাব নিয়া বার্লিন ত্যাগ করিলেন যে, তাঁদের প্রিয়তম ফুরার শীঘ্রই মারা পড়িবেন, সুতরাং রাইখের সর্বময়ক্ষমতা তাঁদের হাতেই বর্তাইবে।

অন্যান্য যে সমস্ত সেনাপতি ও অফিসারেরা পলায়ন করিলেন, তাঁরা অন্ততঃ এই ভাবিয়া সান্ত্বনা পাইলেন যে, আর অনবরত হিটলারের গালাগালি শুনিতে ও অসম্মান বহন করিতে হইবে না। কেননা, শেষের দিকে যতই পরাজয় ঘটিতেছিল ততই হিটলারের মেজাজ বিগড়াইতেই ছিল। বিশেষভাবে বিমান বাহিনীর ব্যর্থতার জন্য হিটলার চিৎকার করিয়া বলিতেছিলেন—'দু-একজন অফিসারকে গুলি করিয়া মারো, কিংবা বিমানবাহিনীর গোটা স্টাফকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও।'

কিন্তু ততক্ষণে বিমানবাহিনীর বড় কর্তা হেরমন গোয়েরিং বার্লিন থেকে চম্পট দিয়াছেন।[১]

হিটলার ভূগর্ভের বাঙ্কার ত্যাগ করিয়া বার্লিন ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এর অন্যতম কারণ এই ছিল যে, তিনি নিজেকে রণবিশারদ বলিয়া মনে করিতেন।

১। ট্রেভর-রোপার, পৃষ্ঠা ১১৮।

সুতরাং বার্লিন থেকে রুশ বাহিনীকে হটাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিলেন। তিনি বার্লিন রক্ষার জন্য একটা রণপরিকল্পনাও স্থির করিলেন এবং বিভিন্ন সেনাপতির উপর পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে আক্রমণ চালাইয়া রুশদেরকে হটাইয়া দেওয়ার জন্য হুকুম দিলেন। এই সমস্ত পরিকল্পিত আক্রমণের মধ্যে তিনি মানচিত্রের দিকে তাকাইয়া 'স্টেইনার' (Steiner) 'স্টেইনার' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেন। অর্থাৎ এস. এস: জেনারেল স্টেইনারকে তিনি তাঁর সৈন্যদল সহ রুশদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এই যে, স্টেইনারের অধীনে কোন শিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যদল ছিল না। তিনি সেনাবিভাগের বড় কর্তা জেনারেল ক্রেবসকে সে কথা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু হিটলার সেই সমস্ত কথা কানে তুলিতেই চাহিলেন না। তিনি এক দীর্ঘ জোরালো বক্তৃতায় স্টেইনারকে বলিলেন—'তুমি দেখে নিও স্টেইনার, রুশ সৈন্যেরা বার্লির প্রবেশের ফটকে বৃহত্তম পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হবে।'

যদিও বার্লিন রক্ষার আর কোন আশা ছিল না, তবু হিটলার সেই সমস্ত যুক্তি অগ্রাহ্য করিলেন এবং স্টেইনারের "মাথার বিনিময়ে" এই হুকুম কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন।[১]

গত কয়েক দিন হিটলার নিজেই বার্লিন শহরের বিভিন্ন ব্যাটেলিয়ানকে পরিচালনা করিতেছিলেন এবং ২১ এপ্রিল বার্লিনের দক্ষিণ শহরতলীতে রুশদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ও সর্বাত্মক আক্রমণের আদেশ দিলেন। প্রত্যেকটি সৈন্য, প্রত্যেকটি ট্যাঙ্ক এবং প্রত্যেকটি প্লেন এই আক্রমণে নিয়োগ করিতে হইবে। কেবল স্টেইনার নয়, গোয়েরিংয়ের বিমান-বাহিনীর প্রধান জেনারেল কোলার (Koller) ও অন্যান্য অফিসারদেরকেও হুকুম দেওয়া হইল যদি কেউ পিছনে হটে কিংবা লড়াইতে বিমুখ হয়, তবে ৫ ঘণ্টার মধ্যে তার প্রাণ হনন করা হইবে। কোলারকে তাঁর মাথা বাজি রাখিয়া শেষ সৈন্যটিকে পর্যন্ত রণক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইবে।

সারা দিন ধরিয়া হিটলার আশা করিয়া রহিলেন স্টেইনারের পালটা-আক্রমণের সংবাদের জন্য। কিন্তু কার্যতঃ কোন আক্রমণই ঘটিল না। কারণ, একমাত্র হিটলারের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ছাড়া এই সমস্ত সৈন্যের কোন পাত্তাই ছিল না। বাস্তবতার সঙ্গে হিটলারের যে কোন সম্পর্ক ছিল না এই ঘটনাই তাঁর সুস্পষ্ট প্রমাণ। পরদিন বেলা ৩টা পর্যন্ত তিনি টেলিফোনের কাছে বসিয়া রহিলেন বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার জন্য। কিন্তু কোন খবর পাওয়া গেল না।[২]

সে দিন, অর্থাৎ ২২ এপ্রিল অপরাহ্নে সামরিক নেতাদের আলোচনা-বৈঠকে এতদিনের অবরুদ্ধ ঝড় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং হিটলারের শেষের দিনগুলির ইতিহাসের সেটাই যেন ছিল চূড়ান্ত ও ভাগ্য নিয়ামক :

'Then came the storm, which made the conferance of 22nd April famous and decisive in the History of Hitler's last day.'...[৩]

সেই ঝড়ের দৃশ্য সেদিন যে সমস্ত সামরিক অফিসার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তাঁদের সহকারীরা যে দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিলেন, তাঁদের বর্ণনা থেকে দেখা যায়

১। উইলিয়াম শাইয়ার, পৃষ্ঠা ১০২১।
২। ট্রেভর-রোপার, পৃষ্ঠা ১২৪।
৩। **The Last Battle—Ryan, P. 402-3.**

যে, হিটলার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, গলার স্বর সপ্তমে চড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন—'সকলেই তাঁকে ত্যাগ করিয়াছে।' আর্মি'র উদ্দেশ্যে গালাগালি করিলেন, সকলকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মুণ্ডপাত করিলেন এবং চারিদিকে কেবল বিশ্বাস ঘাতকতা, ব্যর্থতা, দুর্নীতি এবং মিথ্যাচার দেখিতে পাইলেন। তারপর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে এই প্রথম তিনি স্বীকার করিলেন যে, তাঁর মিশন বা ব্রত ব্যর্থ হইয়াছে, কিছুই আর বাকী নাই। তৃতীয় রাইখ ব্যর্থতায় পরিণত এবং এই রাইখের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু বরণ ছাড়া আর কিছু করার নাই। সমস্ত সন্দেহ সংশয় তাঁর পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তিনি বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে যাইবেন না। যাঁদের তেমন ইচ্ছা আছে, তাঁরা চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তিনি বার্লিনেই থাকিবেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করিবেন।

হিটলারের এই প্রকার বিস্ফোরণে বিক্ষুব্ধ ও বিস্মিত সেনাপতিরা এবং রাজনৈতিক নেতারা প্রতিবাদ করিলেন এবং বলিলেন এখনও সব শেষ হইয়া যায় নাই। ফিল্ড মার্শাল শোয়েরনারের (Schoerner) আর্মি'গ্রুপ চেকোশ্লভাকিয়াতে এবং ফিল্ড মার্শাল কেসেলরিংয়ের অধিকাংশ সৈন্য ইতালীতে এখনও অটুট আছে। সুতরাং হিটলারের উচিত আর বিলম্ব না করিয়া বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া যাওয়া।

হিমলার, ডোয়েনিৎস এবং রিবেন্ট্রপ তাঁদের সহকারীদের কাছ থেকে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়া ফুরারকে অনুরোধ জানাইলেন ওবারস্যালজবার্গে চলিয়া যাওয়ার জন্য। কিন্তু হিটলার তাঁর সংকল্পে অবিচলিত রহিলেন এবং তাঁর নির্দেশে বার্লিন রেডিও থেকে ঘোষণা করা হইল যে, ফুরার বার্লিন ত্যাগ করিবেন না। তিনি ও গোয়েবেলস বার্লিনেই অবস্থান করিবেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বার্লিন রক্ষার জন্য লড়াই চালাইবেন।…

এই নাটকীয় ঘোষণার পর হিটলার গোয়েবেলস ও তাঁর পত্নীকে তাঁদের বোমা-বিধ্বস্ত আবাস ত্যাগ করিয়া ফুরারের বাংকারে আসিয়া থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। কারণ, গোয়েবেলস দম্পতিও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁরা এবং তাঁদের ৬টি শিশুসন্তান বার্লিনেই অবস্থান করিবেন এবং ফুরার-শূন্য জার্মানীতে তাঁরাও বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন না, তাঁরাও মৃত্যুবরণ করিবেন। তাঁদের সন্তানদের বিষপ্রয়োগে মারিয়া ফেলা হইবে—এমন নিদারুণ সংকল্পের কথা কোন শিক্ষিত দায়িত্বশীল বাবা-মার মুখ থেকে কদাচিৎ শুনা গিয়াছে। কিন্তু গোয়েবেলস দম্পতি সেই সংকল্পের কথাই ব্যক্ত করিলেন।

এইভাবে হিটলারের সেই পাতালপুরীর নাট্যমঞ্চে যেন একটির-পর-একটি অংক চূড়ান্ত যবনিকা পতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল এবং তারই প্রস্তুতি স্বরূপ হিটলারের নির্দেশে কিছু বাছাই-করা দলিলপত্র পোড়াইয়া ফেলা হইল। তারপর তাঁর দুই শীর্ষ সামরিক নেতা কাইটেল ও জডলকে তিনি বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণে চলিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু তাঁরা অস্বীকৃত হইলেন। তখন হিটলার কাইটেলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—'আপনি আমার হুকুম মানিতে বাধ্য। সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান কাইটেল হিটলারের প্রতি কুকুরের মত অনুরক্ত ছিলেন এবং কোনদিন তিনি হিটলারকে অমান্য করা দূরের কথা, হিটলারের জঘন্যতম অপরাধমূলক নির্দেশ-

গুলিও তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করিয়াছেন। সুতরাং কাইটেল আর কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। রণক্রিয়ার প্রধান জড্‌ল যদিও গোঁড়া হিটলারভক্ত ছিলেন, তথাপি তিনি একবারে অন্ধ ছিলেন না। তিনি এই প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু হিটলার তাঁর প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, তিনি নিজে বার্লিন রক্ষা করার যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন। কারণ, অন্যেরা যখন ব্যর্থ হইয়াছে, তখন তিনি নিজে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। তবে, তিনিও যদি ব্যর্থ হন, তা হলে শেষ মুহূর্তে তিনি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিবেন। অবশ্য তিনি স্বীকার করিলেন যে, তাঁর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তথাপি তিনি জীবিত বা মৃত অবস্থায় শত্রুর হাতে ধরা দিবেন না। তখন জড্‌ল ও কাইটেল প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁরা পশ্চিম দিক থেকে সৈন্যবাহিনী ফিরাইয়া আনিবেন এবং সমগ্র পশ্চিম জার্মানী তাঁরা বৃটিশ ও আমেরিকানদের হাতে তুলিয়া দিবেন এবং এভাবে অন্ততঃ বার্লিনকে রুশদের হাত থেকে রক্ষা করা যাইবে। সম্ভবতঃ এই সমস্ত ঘটনার জন্যই সোভিয়েত পুস্তকাদিতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, জার্মানবাহিনী পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে তেমন বাধা দেয় নাই।

কাইটেল ও জড্‌ল আরও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, তাঁরা সকলেই যদি বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণে চলিয়া যান, তবে, জেনারেল স্টাফের সহযোগিতা ছাড়া তিনি বার্লিনের যুদ্ধ চালাইবেন কিভাবে? সুতরাং সুপ্রীম কমাণ্ডারের নিকট তাঁরা হুকুমের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছেন। হিটলার জবাব দিলেন যে, তাঁর পক্ষে আর হুকুম দেওয়ার কিছু নাই। কারণ, সমগ্র জার্মানী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আর কিছু করিবার নাই। সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। তবু যদি তাঁরা হুকুম নিতে চান, তবে, তাঁরা রাইখ মার্শালের কাছ থেকে আদেশ নিতে পারেন। এর জবাবে কাইটেল ও জড্‌ল বলিলেন যে, একজন জার্মান সৈন্যও রাইখ মার্শালের (গোয়েরিং) অধীনে যুদ্ধ করিতে রাজী হইবে না।

এর জবাবে হিটলার যা বলিলেন তার তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। কারণ, হিটলার বলিলেন যে, এক্ষণে যুদ্ধ করার আর প্রশ্ন উঠে না। কারণ, যুদ্ধ করিবার মত আর-কিছু নাই। আর যদি পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধাবিরতির আলোচনা করিতে হয়, তবে, তার উপযুক্ত পাত্র হইতেছে গোয়েরিং। সে এই সমস্ত বিষয়ে আমার চেয়ে ভালো আলোচনা চালাইতে পারিবে।'[১]

এরপর হিটলার কাইটেলের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন কি ভাবে বার্লিনকে উদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি প্রস্তাব করিলেন জেনারেল ভেংকের (Wenck) যে ১২নং আর্মি বার্লিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে এলবে নদীর ধারে রহিয়াছে, তাদের উচিত অবিলম্বে সেখানকার রণক্রিয়া ত্যাগ করিয়া পটসডামের দিকে অভিযান করা এবং বার্লিন, চ্যান্সেলারি ও ফুরারকে উদ্ধার করা।

কিন্তু এই সমস্ত প্রস্তাবও বাস্তবে কোন কাজে আসিল না। কিন্তু হিটলার বার্লিন ত্যাগে অস্বীকৃত হওয়ার ফলে কাইটেল ও জড্‌লকে বাধ্য হইয়াই হাই কমাণ্ডের কিছু স্টাফসহ বার্লিনের পশ্চিম শহরতলীতে একটা দপ্তর খুলিতে হইল। কিন্তু সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত এই দপ্তর উত্তর প্রান্তবর্তী ডেনমার্ক

১। ট্রেভার-রোপার, পৃষ্ঠা ১২৭

সীমানায় ফ্লেন্সবুর্গে অপসারিত হইয়াছিল। অবশ্য জেনারেল ক্রেবস্ হিটলারের সামরিক পরামর্শদাতা হিসাবে বাংকারেই রহিয়া গেলেন।

* * *

হিমলার তখন বার্লিনের উত্তর-পশ্চিমে হোহেনলাইচেন শহরে অবস্থান করিতেছিলেন। সদর দপ্তরের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী এস. এস. অফিসার হেরমান ফেগেলিনের (Hermann Fegelein) মুখ থেকে টেলেফোনযোগে যখন তিনি বাংকারের এই সমস্ত ঘটনাবলী শুনিতেছিলেন তখন তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন—'বার্লিনে সকলেই পাগল হয়ে গেছে! আমি আর কি করতে পারি?'

কেউ কেউ তাঁকে বার্লিনে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি গেলেন না। কারণ, তখন তিনি এস. এস. জেনারেল শোলেনবার্গের উস্কানিতে সুইডেনের কাউণ্ট বার্নাডোটের (রেডক্রসের বড় কর্তা) সঙ্গে পশ্চিমদিকে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। অবশ্য হিমলার হিটলারের বাংকারে টেলিফোন করিয়া তাঁকে বার্লিন ত্যাগের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এদিকে হিমলারের যুদ্ধবন্দী বিভাগের প্রধান গটলোব বার্গার (Gottlob Berger) পশ্চিম জার্মানীতে আটক কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দী—বৃটিশ, ফরাসী ও আমেরিকান এবং প্রাক্তন জার্মান সেনাপতি হ্যালডার, অর্থনীতিবিদ্ শাকট ও অস্ট্রিয়ার প্রাক্তন চ্যান্সেলার শুসনিগ প্রভৃতির স্থানান্তরিতকরণ সম্পর্কে যখন হিটলারের মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তখন রিপোর্ট পাওয়া গেল যে, অস্ট্রিয়া ও ব্যাভেরিয়াতে বিচ্ছিন্নতার দাবিতে বিদ্রোহের মত দেখা দিয়াছে, তখন হিটলার পুনরায় ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন এবং তাঁর হাত-পায়ের কাঁপুনি সত্ত্বেও চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'সবাইকে গুলি করে মারো!'

তবে এই চিৎকার বন্দীদের উদ্দেশ্যে কিংবা বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে তা স্পষ্ট বুঝা গেল না। সেদিন রাত্রি ১টার সময় রুশ গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়াই বাংকারের অধিকাংশ কর্মী ও সহকারী, এমন কি হিটলারের বিশ্বাসভাজন ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ মোরেল পর্যন্ত ওবারস্যালজবার্গের দিকে পলায়ন করিলেন। অবশ্য মার্টিন বোরম্যান এবং আরও কয়েকজন থাকিয়া গেলেন। কিন্তু বিমানবাহিনীর জেনারেল কোলার রাত্রি সাড়ে-তিনটায় সময় বাংকার ত্যাগ করিয়া বিমানযোগে মিউনিক চলিয়া গেলেন এবং সেখান থেকে দুপুরের দিকে (২৩ এপ্রিল) ওবারস্যালজবার্গে পৌঁছিলেন এবং রাইখ-মার্শাল গোয়েরিংকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। সমস্ত কাহিনী শুনিয়া গোয়েরিং অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

গোয়েরিং ও হিমলার কর্তৃক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা

গোয়েরিং তাঁর সহকারী ও পরামর্শদাতাদের সঙ্গে এক আলোচনা বৈঠকে বসিলেন। তাঁর পক্ষে ক্ষমতা দখলের সময় আসিয়াছে এবং এরূপ একটা সুযোগের জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁকে সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। কেননা, তাঁর "মারাত্মক শত্রু" মার্টিন বোরম্যানের কোন ফাঁদে গিয়া তিনি না পড়েন। এবং বোরম্যান সম্পর্কে তাঁর এই ভীতি যে ভিত্তিহীন ছিল না, সেটা পরে প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে গোয়েরিং দ্বিধায় পড়িলেন। তাঁর পরামর্শদাতাদের নিকট তিনি বলিলেন—'যদি এই সময় আমি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করি, তবে আমি বিশ্বাসঘাতক

রূপে চিহ্নিত হইতে পারি। আবার কোন কিছু না করিয়াই যদি আমি চুপচাপ থাকি, তবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিতে পারে যে, জাতির এই ভয়ংকর দুর্বিপাকের সময় আমি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইয়াছি।'

তথাপি এ কথা সত্য যে, ১৯৪১ সালের ২৯শে জুন হিটলার এই মর্মে এক ডিক্রি জারি করিয়াছিলেন যে, যদি হিটলার মারা যান, তবে, গোয়েরিং হইবেন তাঁর উত্তরাধিকারী কিংবা হিটলার যদি কোন কারণে অক্ষম হইয়া পড়েন, তবে গোয়েরিং তাঁর ডেপুটি হিসাবে কাজ করিবেন। সুতরাং গোয়েরিং এই প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আইন-বিশেষজ্ঞ হ্যান্স ল্যামার্সের (যিনি তখন বার্সেটসগ্যাডেনে) মতামত আহ্বান করিলেন। মিঃ ল্যামার্স এই মর্মে অভিমত জ্ঞাপন করিলেন যে, ১৯৪১ সালের সেই ডিক্রির তখনও আইনগত সত্তা পুরাপুরি বজায় আছে। কারণ, নূতন কোন আদেশের দ্বারা এই ডিক্রি বাতিল করা হয় নাই। সকলেই এই বিষয়ে একমত হইলেন যে, হিটলার বার্লিনে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া সামরিক কম্যান্ড ও গবর্নমেণ্ট পরিচালনা উভয় দিক থেকেই অক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং আইন অনুসারে গোয়েরিংয়ের কর্তব্য হইতেছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করা। অতএব সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা করিয়া এবং 'ঘরে-বাইরে সমস্ত প্রকার ক্ষমতা লাভ' সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া তাঁর সহকারীগণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একটি টেলিগ্রামের খসড়া রচনা করিলেন। কারণ, গোয়েরিংয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল ক্ষমতা লাভের পরেই তিনি পশ্চিমের যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনা আরম্ভ করিবেন। এমন কি, প্রয়োজন হইলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উড়িয়া যাইবেন! কিন্তু আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে দেখা করার সময় কি পোশাক পরিয়া যাইবেন—সে কথা নিয়া তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। এদিকে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে তখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। একমাত্র বেতারবার্তা পাঠানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। গোয়েরিংয়ের সেই ঐতিহাসিক বার্তাটি অত্যন্ত সুরচিত ছিল:

'My Fuehrer !—In view of your decision to remain at your post iu the fortress of Berlin, do you agree that I take over at once the total leadership of the Reich, with full freedom of action at home and abroad, as your deputy, in accordance with your decree of 29 June 1941 ? If no reply is received by ten o'clock tonight, I shall take it for granted that you have lost your freedom of action, and shall consider the conditions of your decree as fulfilled, and shall act for the best interests of our country and our people. You know what I feel for you in this gravest hour of my life. Words fail me to express myself. May God protect you, speed you quickly here in spite of all. Your loyal—Hermann Goering.'[১]

এর সহজ মর্ম:

আমার ফুরার! বার্লিনের দুর্গে আপনার অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি মনে করেন যে, আপনার ২৯ জুন ১৯৪১ তারিখের ডিক্রি অনুযায়ী আপনার সহকারী

১। উইলিয়াম শাইরার, পৃষ্ঠা ১০২৫-২৬ এবং ট্রেভর-রোপার, পৃষ্ঠা ১০৬।

হিসাবে ঘরে এবং বাইরে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করার অধিকারসহ আমার পক্ষে অবিলম্বেই উচিত রাইখের সম্পূর্ণ নেতৃত্বভার গ্রহণ করা ? আজ রাত্রি ১০টায় মধ্যে যদি আমি কোন উত্তর না পাই, তবে আমি একথাই নিশ্চিত হিসাবে ধরিয়া নিব যে, আপনি আপনার স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা হারাইয়াছেন এবং আপনার ডিক্রির শর্তগুলিও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং আমার দেশের ও জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থের জন্যই আমি কাজ করিয়া যাইব। আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি আপনার জন্য কিরূপ অনুভব করছি তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন এবং সব কিছু সত্ত্বেও আপনি যেন যথাসম্ভব শীঘ্র এখানে আসিতে পারেন। ইতি,

আপনার বিশ্বস্ত—
হেরমন গোয়েরিং

গোয়েরিংয়ের এই টেলিগ্রামের উপযুক্ত ভাষ্য ও ব্যাখ্যা কাইটেল, রিবেন্ট্রপ এবং কর্নেল নিকোলাস ফন বিলোকেও (হিটলারের বিমানবাহিনীর সহকারী) পাঠানো হইল। কিন্তু এই টেলিগ্রামের ফলাফল অত্যন্ত গুরুতর হইল।···

ঐদিন সন্ধ্যায় বার্লিন থেকে কয়েক শত মাইল দূরে হিটলারের আর-একজন 'বিশ্বস্ত' ও শীর্ষস্থানীয় সহকর্মী হাইনরিখ হিমলার বাল্টিক সমুদ্রের লুয়েবেক শহরের সুইডিশ দূতাবাসে (কনসুলেট) কাউন্ট বার্নাডোটের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন। এস.এস. জেনারেল ভাল্টার শেলেনবার্গও হিমলারের সঙ্গে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। গোয়েরিং তবু হিটলারের উত্তরাধিকারীরূপে ক্ষমতা দখল করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিমলার ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, তিনি ক্ষমতায় আসিয়া গিয়াছেন ! বার্লিনের পাতালপুরীতে বাংকারের অভ্যন্তরে যে সমস্ত গুরুতর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, শেলেনবুর্গ এবং কাউন্ট বার্নাডোট সেই সমস্ত কিছুই জানিতেন না, কিন্তু হিমলার সমস্তই অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁর গত কয়েকদিনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সবই কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি কাউন্ট বার্নাডোটকে বুঝাইতেছিলেন যে, ফুয়ারের বৃহৎ জীবনের অবসান আসন্ন। দুই-একদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হইবে। সুতরাং হিমলার বার্নাডোটকে অনুরোধ করিলেন তিনি যেন জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া দেন যে, জার্মানী পশ্চিমদিকে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু পূর্বদিকে জার্মানী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেই ইচ্ছুক, যতক্ষণ না পশ্চিমী শক্তিবর্গ নিজেরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনের দায়িত্ব নিতেছেন।

এস. এস. বাহিনীর প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী নাৎসী নেতা হিমলার কত নীরেট মস্তিষ্কের লোক কিংবা বোকা ছিলেন বার্নাডোটের নিকট তাঁর এই বক্তব্যেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। হিমলার আরও বুঝাইলেন যে, বার্লিনের পতন ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং হিটলার মারা যাইবেন। সুতরাং আগে তিনি বার্নাডোটকে যে কথা দিতে পারেন নাই এখন সে কথা দিতেছেন। কারণ, পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতএব সুইডিস সরকারের মারফৎ তিনি জার্মানীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিতেছেন। তখন বার্নাডোট হিমলারকে অনুরোধ করিলেন তাঁর এই আত্মসমর্পণের প্রস্তাব লিখিতভাবে দাখিল করার জন্য। হিমলারও তৎক্ষণাৎ মোমবাতির আলোকে তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখিয়া দিলেন। ভূগর্ভের একটি কক্ষে মোমবাতির আলোকে এই পত্র

রচনা করিতে হইল এজন্য যে, তখন বৃটিশ বিমানবহর বোমাবর্ষণ করিতেছিল এবং লুয়েবেক শহরের বিদ্যুৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থাতেই হিমলার আত্মসমর্পণের চিঠিতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।···

বলাবাহুল্য যে, হিমলার এবং গোয়েরিং উভয়েই "অসময়ে কাঁচাকাজ" করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কারণ হিটলার যদিও তাঁর ভূগর্ভে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন এবং যদিও ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যার মধ্যে সোভিয়েত বাহিনীর সৈন্যেরা বার্লিনকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তথাপি অতি শীর্ণ ও সামান্য বেতারব্যবস্থার যোগে হিটলার তাঁর সৈন্যবাহিনী ও মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন এবং তিনি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও প্রেস্টিজের দ্বারা তিনি এখনও জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তার পদেই আছেন। সুতরাং তাঁর অনুচরদের মধ্যে যিনি যতই ক্ষমতাশালী বা খ্যাতিমান হইয়া থাকুন না কেন, বিশ্বাসঘাতকতা বা দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়ার শক্তি এখনও তাঁর অব্যাহত আছে। এবং সেটা তিনি প্রমাণ করিয়াও ছাড়িয়াছিলেন।

সেই রাত্রে যখন গোয়েরিং ওবারস্যালজবার্গে তাঁর টেলিগ্রামের উত্তর পাওয়ার জন্য প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং হিমলার লুয়েবেক শহরে কাউন্ট বার্নাডোটের নিকট জার্মানীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিতেছিলেন, তখন হিটলারের বাংকারে আর-একটি চমকপ্রদ এবং অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হইল। অস্ত্রসজ্জা ও গোলাবারুদের মন্ত্রী আলবার্ট স্পীর (Albert Speer) যে কোন ভাবেই হউক, সেই অবরুদ্ধ নগরীতে ভূগর্ভের বাংকারে আসিয়া হাজির হইলেন হিটলারে সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্য। স্থপতি-শিল্পী হিসাবে তিনি যেমন দিপ্তীমান ও প্রতিভাধর ছিলেন, তেমনি অস্ত্রসজ্জার মন্ত্রী হিসাবে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। সুতরাং নিয়মমাফিক নাৎসী নেতা না হওয়া সত্বেও উচ্চতম মহলে তিনি সমাদৃত ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও অনুগত ছিলেন। কিন্তু এ হেন ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত হিটলারের প্রতি বিগড়াইলেন, কিন্তু কেন? জার্মানীর পতনের মুখে সেই ঘটনাটা নিতান্ত উল্লেখযোগ্য।···

আলবার্ট স্পীর তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক বিখ্যাত বইতে নাৎসী পার্টি ও হিটলারী রাজত্বের অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সমস্ত তথ্যে প্রকাশ যে, জার্মানীর পরাজয় যতই আসন্ন হইয়া উঠিল, হিটলার ততই তাঁর পুরাতন সহকর্মীদের মধ্যে একমাত্র গোঁড়া ভক্তদের সাহচর্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ রহিলেন। রাতের-পর-রাত তিনি একমাত্র গোয়েবেলস্, বরার্ট লে (জার্মান লেবার ফ্রন্টের অধিকর্তা) এবং বোরম্যানের সঙ্গে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা পরামর্শে কাটাইতেন। সেই মন্ত্রণাকক্ষে আর কাহারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। তাঁদের এই আচরণ সন্দেহজনক ছিল এবং তাঁদের ভাবভঙ্গীতে বুঝা গেল যে, জাতির ভাগ্যের চেয়েও নিজেদের ভাগ্যকে তাঁরা বড় করিয়া দেখিতেন। তাঁরা জার্মানীর ভাগ্য সম্পর্কে স্থির করিলেন—

'We will leave nothing but a desert to the Americans, English and Russians.'—'আমরা আমেরিকান, ইংরেজ ও রুশদের জন্য একমাত্র মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যাইব না।'[১]

১। Inside the Third Reich—Albert Speer. First Sphere Books edition, 1971, P. 570.

প্রথমে ব্যাপারটা ছিল কেবল মৌখিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে হিটলার স্বয়ং জাতির অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য হুকুমনামা জারি করিলেন। কারণ তাঁর মতে পরাজিত জাতির বাঁচিয়া থাকার অধিকার নাই। তিনি স্পীরের নিকটও মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, যদি যুদ্ধে পরাজয় ঘটে, তবে জার্মান জাতিও ধ্বংস হইবে। তাদের আদিম জীবনযাত্রা বাঁচাইয়া রাখার দরকার নাই। এজন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানা এবং বড় বড় সমস্ত সেতু ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি হুকুম জারি করিলেন।

[মার্কিন ঐতিহাসিক শাইরারও তাঁর পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ১৯44 সালের আগস্ট মাসে নাৎসী পার্টির প্রশাসনিক অফিসারদের (gauleitcr) কাছে এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—'যদি জার্মান জনগণ এই যুদ্ধে পরাজিত হয় তবে, প্রমাণিত হইবে যে, জাতি হিসাবে তারা অত্যন্ত দুর্বল এবং তাদের ভাগ্যে একমাত্র ধ্বংসই লেখা আছে।'—পৃষ্ঠা ১৩১০।

'দি লাস্ট হানড্রেড ডেইজ' (পৃষ্ঠা ৫৩৬) জন টোল্যান্ড লিখিয়াছেন যে, হিটলার তাঁর বাংকারে এপ্রিল মাসে একজন সেনাপতির নিকট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, তাঁর নেতৃত্বে যদি জার্মান জাতি এই চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে তাদের বাঁচিয়া থাকার অধিকার থাকিবে না। বরং পূর্বদিকের জাতি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিবে এবং জার্মান জনগণের পতন মানিয়া লওয়া ছাড়া আর কিছু করিবার থাকিবে না।]

শত্রুকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করিলে জার্মান জাতির পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করাও সম্ভব হইবে না এবং হিটলারের মৃত্যুর সঙ্গে জার্মানীরও মৃত্যু ঘটিবে। এমন একটা ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আলবার্ট স্পীর এই সর্বনাশা হুকুম বানচাল করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন এবং সম্ভাব্য যে সমস্ত অধিনায়ক বা নায়কদের হাত দিয়া এই সর্বাত্মক ধ্বংসকার্য বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব স্পীর অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিয়া এই আদেশ বানচাল করার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি গভীর বিপদের ঝুঁকি নিয়া হিটলারকেও একটি স্মারকলিপিতে এই আদেশের বিপর্যয়কর দিকটা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।

আলবার্ট স্পীর এই সময় যেন একটা মানসিক যন্ত্রণায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, হিটলার বাঁচিয়া থাকিতে এই যুদ্ধ শেষ করা যাইবে না। অথচ জার্মানী ধ্বংস হইয়া যাইবে। সুতরাং তিনি হিটলারকে সংহার করার সংকল্প করিলেন। হিটলারের বাংকারের বায়ু চলাচল করার রন্ধ্রপথ দিয়া তিনি বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশ করাইয়া হিটলার এবং তাঁর সামরিক নেতাদের একযোগে হত্যা করার পরিকল্পনা করিলেন। এই উদ্দেশ্য নিয়া তিনি একদিন বাংকারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি বিস্ময়ে হতবাক হইলেন। কেননা, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বায়ু চলাচল করার সেই রন্ধ্রের উপর ইতিমধ্যে দশফুট উঁচু একটা চিমনি বসানো হইয়াছে। আর সশস্ত্র প্রহরীরা সারাক্ষণ সেখানে পাহারা দিতেছে এবং রাত্রিবেলা প্রভৃত সার্চ লাইটের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং হিটলারকে হত্যার এই শেষ পরিকল্পনাও নষ্ট হইয়া গেল।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, ঐ পৃষ্ঠা ৫৭৭।

২৩ শে এপ্রিল সন্ধ্যায় আলবার্ট স্পীর হিটলারের বাংকারে আসিয়া হাজির হইলেন এবং সেখানে অবশিষ্ট নেতাদের মধ্যে দেখা পাইলেন বোরম্যান, গোয়েবেলস, রিবেন্ট্রপ, ক্রেবস, ফর্ন বিলো এবং হিটলারের সহকারীবৃন্দ ও তাঁর প্রণয়িনী ইভা ব্রাউনকে। স্পীর অত্যন্ত সাহস ও সরলতার সঙ্গে হিটলারের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে, বার্লিনকে পোড়ামাটির নীতির দ্বারা ধ্বংস করার যে আদেশ তিনি দিয়াছিলেন, জার্মান জাতির অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে গত কয়েক দিন বহু চেষ্টার পর সেই আদেশ স্পীর অকেজো করিয়া দিয়াছেন।

স্পীর ভাবিয়াছিলেন যে, হিটলারের আদেশ অমান্য করার অপরাধে নিশ্চয়ই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হইবে। এমন কি তাঁর প্রাণদণ্ড হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই সমস্ত কিছুই ঘটিল না। হিটলার অত্যন্ত মন দিয়া স্পীরের বক্তব্য শুনিলেন এবং বাহ্যতঃ মনে হইল স্পীরের আন্তরিকতায় তাঁর হৃদয় "গভীরভাবে স্পর্শ" করিয়াছিল। যে রক্তপিপাসায় হিটলার কাতর ছিলেন এবং নির্বিকার চিত্তে খ্যাত-অখ্যাত অজস্র মানুষের রক্তপাত ঘটাইয়াছেন, সেই হিটলার আলবার্ট স্পীরের বেলা অত্যন্ত শান্তভাব ধারণ করিলেন। বোধ হয় তরুণ বয়স্ক (বয়স ৪০ বছর) স্পীরের শিল্পপ্রতিভার প্রতি হিটলারের গভীর অনুরাগ ছিল এবং অস্ত্রসজ্জার মন্ত্রী হিসাবে তাঁর দক্ষতার প্রতিও হিটলারের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। সুতরাং স্পীরের বেলা হিটলারের আচরণের বিস্ময়কর ব্যতিক্রম দেখা গেল। বাংকারে ৮ ঘণ্টা কাটাইবার পর স্পীর ভোর রাত্রি ৪টার সময় বোমাবিধ্বস্ত এবং আক্রান্ত বার্লিন ত্যাগ করিলেন।

* * *

হিটলারের পার্শ্বচর এবং নাৎসী পার্টির বড় বড় নেতাদের মধ্যে লোভ, ঈর্ষা এবং ক্ষমতা দখলের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রবল ছিল। একমাত্র গোয়েবেলস ছাড়া এঁদের অনেকের মধ্যেই বিদ্যাবুদ্ধির কোন প্রাখর্যও ছিল না। গোয়েরিং, হিমলার ও মার্টিন বোরম্যান হিটলারের শূন্য স্থানে জার্মানীর ভাগ্যনিয়ামকের আসনে বসিবার জন্য ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সুতরাং হিটলারের শেষের দিনগুলিতে এঁদের কার্যকলাপ চক্রান্ত-প্রবণ হইয়া উঠিল।

মার্টিন বোরম্যান চার বছর ধরিয়া অপেক্ষমাণ ছিলেন গোয়েরিংকে ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু কোন উপযুক্ত সুযোগ পাই নাই। এবার সেই সুযোগ আসিল। কিন্তু এদিকে সময় খুব সংকীর্ণ। কারণ, হিটলার যে কোন দিন মারা যাইতে পারেন। কিন্তু ইতিপূর্বেই আইনগত যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাতে হিটলারের পর গোয়েরিংয়েরই ক্ষমতা লাভ করার কথা। সুতরাং এই আইনগত অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন না ঘটানো যায়, তবে গোয়েরিংই হইবেন হিটলারের উত্তরাধিকারী এবং বোরম্যানের কপালে আর কোনদিন ক্ষমতা জুটিবে না। কিন্তু এতদিন পর তাঁর সুযোগ আসিয়াছে। গোয়েরিং তাঁর টেলিগ্রামের দ্বারা বোরম্যানের ফাঁদে পা দিয়াছেন। কেননা, কাইটেল ও জড্ল ইতিমধ্যে বাংকার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং এখনও যে দুই তিনজন আছেন, তাঁরা কেউ গোয়েরিংকে বাঁচাইবার জন্য মাথা ঘামাইবেন না। সুতরাং বোরম্যানের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ ছিল হিটলারের কানভাঙানি দেওয়ার। বোরম্যান প্রথমেই হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন গোয়েরিংয়ের টেলিগ্রামের সেই অংশটির উপর যেখানে রাত্রি ১০টার মধ্যে জবাব পাওয়ার দাবি ছিল। তিনি পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন যে,

গোয়েরিংয়ের এটা চরমপত্র বা 'আলটিমেটাম্'। সেই বোরম্যান হিটলারকে আরও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ৬ মাস আগেই গোয়েরিং সম্পর্কে এই সন্দেহ করা হইয়াছিল যে, তিনি ভিতরে ভিতরে মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, গোয়েরিং সেই চেষ্টা চালাইবার জন্যই ক্ষমতা দখল করিতে চাহিতেছেন। এবার সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হিটলারের গভীর সন্দেহ আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। বিগত ২০শে জুলাইয়ের ভয়াবহ হত্যা-চক্রান্তের কথা তিনি আদৌ ভুলেন নাই। সুতরাং গোয়েরিংয়ের নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়া জানাইয়া দেওয়া হইল যে, হিটলার এখনও সমস্ত ক্ষমতা খাটাইবার অধিকার ও সামর্থ্য রাখেন, অতএব স্বাধীনভাবে কোন চেষ্টা (যুদ্ধবিরতির) চালানো নিষিদ্ধ করা হইল।

তখন পর্যন্ত আলবার্ট স্পীর বাংকারেই ছিলেন। হিটলার তাঁর সামনেই গোয়েরিংয়ের বিরুদ্ধে তীব্র রোষ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, গোয়েরিং অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ও নেশাগ্রস্ত এবং তাঁর কাজকর্মেও তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন।

একথা বলার পরেই হিটলার কিছুটা শান্ত হইলেন এবং বলিলেন—'গোয়েরিং যদি আত্মসমর্পণের কথা চালাতে চান, তবে, চালাতে পারেন। এখানে একমাত্র ব্যক্তির কথাই বড় নয়।

এই মন্তব্যের পরেই হিটলারের মেজাজ আবার বিগড়াইয়া গেল এবং বোরম্যানের প্ররোচনায় এই মর্মে এক টেলিগ্রাম গোয়েরিংকে পাঠানো হইল যে, গোয়েরিং নাৎসী পার্টি এবং ফুয়ারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এর একমাত্র শাস্তি হইতেছে মৃত্যুদণ্ড। তবে, নাৎসী পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রতি তিনি দীর্ঘকাল সেবা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁকে এই শর্তে ক্ষমা করা যাইতে পারে, যদি তিনি অবিলম্বে তাঁর সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দেন। হিটলার দাবী করিলেন—এর জবাবে গোয়েরিংকে অবিলম্বে উত্তর দিতে হইবে 'হাঁ কিংবা না'।

কিন্তু বোরম্যান এই সুযোগে তাঁর ধূর্ত বুদ্ধি খাটাইয়া ওবারস্যালজবার্গে অবস্থিত এস. এস. বাহিনীর নেতাদেরকে আর-একখানা টেলিগ্রামে জানাইয়া দিলেন গুরুতর দেশদ্রোহিতার অপরাধে গোয়েরিং এবং কোলার ও ল্যামর্সসহ তাঁর সমস্ত পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জন্য। সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর দলবলসহ গোয়েরিংকে গ্রেপ্তার এবং তাঁদের স্ব স্ব গৃহে আটক করা হইল। হিটলারের পর যিনি অদ্বিতীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং জার্মানীর ইতিহাসে যিনি একমাত্র 'রাইখ মার্শাল' ছিলেন, যাঁর বিলাসিতা, দাম্ভিকতা এবং ঐশ্বর্য ছিল অপরিমিত, যিনি সমগ্র জার্মান বিমানবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাঁকে এভাবে চূড়ান্ত অপমানের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হইল।

পরদিন বার্লিনে ঘোষণা করা হইল যে, স্বাস্থ্যের কারণে গোয়েরিং তাঁর সমস্ত পদে ইস্তফা দিয়াছেন। অর্থাৎ বোরম্যানেরই জয় হইল এবং আবার হিটলারের উত্তরাধিকারীর প্রশ্নটি দেখা দিল।[১]

২৪শে এপ্রিল সোভিয়েত বাহিনী বার্লিন ঘিরিয়া ফেলিল এবং বাংকার অবরুদ্ধ হইল। এই সময় বার্লিনবাসীদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য রটনা করা হইল যে, জেনারেল

১। ট্রেভর রোপার। পৃষ্ঠা ১৪৪-৪৫।

ভেঙ্কের (Wenck) বাহিনী পশ্চিম দিক থেকে আগাইয়া আসিতেছে বার্লিনকে উদ্ধারের জন্য। কিন্তু এই সমস্তই ছিল মিথ্যা গুজব মাত্র। হিটলার তাঁর অবরুদ্ধ বাঙ্কারে যে অবস্থার মধ্যে ছিলেন, তাতে বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণাও ছিল সামান্য। ইতিমধ্যে হিমলারের বদলে কর্নেল-জেনারেল হেইনরিসিকে (Heinrici) নিয়োগ করা হইল এবং রেডিও-টেলিফোনের যে সামান্য যোগাযোগ জেনারেল স্টাফের সঙ্গে ছিল, সেই সূত্র ধরিয়া হিটলার পাগলের মত খোঁজ নিতে লাগলেন—হেইনরিসি, ভেংক প্রভৃতি কোথায় ? কাইটেলই বা কি করিতেছেন ? কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া গেল না। কেননা, সৈন্যবাহিনীগুলি কার্যত ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল এবং পারস্পরিক যোগাযোগ নষ্ট হইয়া বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। এদিকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে চ্যান্সেলারি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই দুর্যোগের মধ্যে রাত্রিবেলা প্রচার দপ্তর থেকে হিটলারের বাঙ্কারে খবর পেঁাছিল যে, হিমলার কাউন্ট বার্নাডোটের মারফৎ পশ্চিমের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালাইতেছেন। বৃটিশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রয়টারের মারফৎ এই খবর বিদেশী সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছিল।...

হিটলারের পাতালপুরীর আস্তানায় এই সময় শেষ যে দুই ব্যক্তি সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন জার্মানীর সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্না মহিলা পাইলট (টেস্ট পাইলট)—নাম হান্না রিৎস্ (Hanna Reitsch) এবং অপরজন হইতেছেন মিউনিক থেকে আগত সেনাপতি রিটার ফন গ্রীম (Ritter von Greim)। ২৬শে এপ্রিল সন্ধ্যায় জীবন বিপন্ন করিয়া হান্না রিৎস কোনমতে বার্লিনের বাঙ্কারের পেঁাছিলেন বটে, কিন্তু যে বিমানে তাঁরা আসিয়াছিলেন, রুশদের গুলিবর্ষণে সেটি ঘায়েল হইয়াছিল এবং জেনারেল গ্রীমের একটি পা চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁর পায়ে যখন অস্ত্রোপচার করা এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইতেছিল, তখন হিটলার সেখানে আসিয়া হাজির হইলেন এবং গ্রীমকে জানাইয়া দিলেন যে, গোয়েরিং তাঁর প্রতি এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এজন্য তাঁকে গ্রেপ্তার এবং সমস্ত পদ থেকে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং তাঁর শূন্যপদে জেনারেল গ্রীমকে সমগ্র বিমানবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করা হইল। এমন কি তাঁকে মার্শাল পদবীতে উন্নীত করা হইল। বলা বাহুল্য, আহত গ্রীম হতবাক হইলেন। কেননা, এই আদেশ তাঁকে বেতারবার্তা যোগেও জানাইয়া দেওয়া যাইত, তা' হলে এভাবে শত্রুর গুলিতে তাঁকে আহত হইতে হইত না! কিংবা বাঙ্কারে শুইয়া থাকিয়া তিনটি মূল্যবান দিবসও নষ্ট করিতে হইত না! কিন্তু জার্মানীর রণপ্রভু হিটলার চাহিয়াছিলেন তাঁকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁর মনের কথা জানাইয়া দিতে। অতএব গোয়েরিংয়ের টেলিগ্রামটি তিনি বিমানবাহিনীর নূতন সেনাপতিকে পড়িয়া শুনাইলেন এবং ক্রুদ্ধ উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—'গোয়েরিং এত বড় কাপুরুষ যে, আমাকে না জানাইয়া শত্রুর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।'

হঠাৎ তাঁর মুখের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল এবং তাঁর হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। হিটলার চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'এত বড় স্পর্ধা আমাকে সে চরমপত্র পাঠাইয়াছে!'

'An ultimatum! A crash ultimatum! Nothing now remains! nothing is spared me! no loyalty is kept, no honour observed;

there is no bitterness, no betrayal that has not been heaped upon me ; and now this ! It is the end. No injury has been left undone.'

(অথাৎ সহজ কথায় হিটলারের বক্তব্য ছিল এই যে, এমন কোন অসম্মান, এমন কোন বিশ্বাসঘাতকতা, এবং এমন কোন ক্ষতি নাই, যা' তাঁর প্রতি করা হয় নাই ! অতএব এখানেই শেষ) ।

এইসব কথা বলিতে বলিতে হিটলারের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে বার্লিনের উদ্ধারের জন্য হিটলারের প্রত্যাশিত পশ্চিম দিক থেকে জেনারেল ভেঙ্কের অধীন ১২নং আর্মি, কিংবা উত্তর দিক থেকে জেনারেল হেইনরিচির অধীন ভিশ্চুলা আর্মিগ্রুপ কিংবা দক্ষিণ দিক থেকে জেনারেল বুশের (Busse) অধীন ৯নং বাহিনীর কোন সৈন্যদলই আগাইয়া আসিল না বা আসিতে পারিল না। কারণ এই সমস্ত সৈন্যবাহিনীর কোনই শক্তি ছিল না এবং সেগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। হিটলার তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনায় এই সমস্ত প্রত্যাক্রমণের স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন। অথচ ২৮শে তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও তাদের কোন খবর পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছিল না।

২৬শে এপ্রিল রাত্রি থেকে রুশ কামানের গোলা সোজাসুজি চ্যান্সেলারির উপর আসিয়া পড়িতেছিল এবং বাঙ্কার সহ সমগ্র এলাকা যেন কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আর বাঙ্কারের অভ্যন্তরে যাঁরা ছিলেন তাদেরকে কেন্দ্র করিয়া যেন পাগলামির দৃশ্যের অবতারণা হইল। নাচ, হল্লা ও মদ্যপান ইত্যাদির মত্ততা দেখা দিল। অর্থাৎ জীবনের এক বেপরোয়া রূপের উদ্ঘাটন হইল—প্রত্যক্ষদর্শী মহিলা পাইলট হান্না রিৎস-এর বর্ণনা অনুসারে।

সেই অবস্থায়ও জেনারেল গ্রীম এবং হান্না রিৎস হিটলারকে অনুরোধ করিলেন বার্লিন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে। কিন্তু হিটলার আগের মতই অস্বীকৃত হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, রুশরা বার্লিন দখল করিয়া নিলে তিনি এবং ইভা ব্রাউন একত্রে আত্মহত্যা করিবেন এবং তাঁদের দেহ আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হইবে—এই ব্যবস্থা তিনি পাকা করিয়া রাখিয়াছেন। তখন হান্না রিৎস এবং জেনারেল গ্রীমও বাঙ্কারে অবস্থানের এবং হিটলারের সঙ্গে মৃত্যুবরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হিটলার তাঁদেরকে এক শিশি করিয়া বিষ দিলেন সংকটজনক অবস্থায় ব্যবহারের জন্য।

ইতিমধ্যে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিল এবং রুশরা বার্লিনের অভ্যন্তরে আরও আগাইয়া আসিতে লাগিল। ২৮শে এপ্রিল তারিখটি বাঙ্কারের বাসিন্দাদের পক্ষে নিদারুণ হইয়া উঠিল। কারণ, ঐদিন রাত্রে বি. বি. সি.-র সংবাদে প্রচারিত হইল যে, হিমলার সুইডিশ সরকারের মাধ্যমে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সংবাদ যেন বাঙ্কারের অভ্যন্তরে বজ্রপাত ঘটাইল এবং প্রায় সকলেই হিমলারের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হিটলার এই সংবাদে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কেননা হিমলারকে তিনি সবচেয়ে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেন। অথচ তাঁর এই নীচতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ? গোয়েরিং তবু হিটলারের কাছে অনুমতি চাহিয়াছিলেন সরকারী ক্ষমতা লাভের জন্য। কিন্তু হিমলার ততটুকু নিয়মকানুনের জন্য পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নাই। হিটলারের অজ্ঞাতসারে আত্মসমর্পণের চক্রান্ত করিয়াছেন। হিটলারের এখন সন্দেহ হইল সকলেই

তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। অন্যথা বার্লিনকে উদ্ধারের জন্য কোন সৈন্যবাহিনী আগাইয়া আসিল না কেন? হিটলার ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন। হিমলারের এই বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার বলিয়া তাঁর কাছে প্রতিভাত হইল। সুতরাং ২৮-২৯শে রাত্রিবেলা হিমলারকে পদচ্যুত এবং তাঁর উত্তরাধিকারের দাবি বাতিল করিয়া তিনি দলিলপত্র স্বাক্ষর করিলেন।

এদিকে হিমলারের ঘটনায় হিটলারের সন্দিগ্ধ মন আরও সন্দেহাতুর হইয়া উঠিল। হেরমন ফেগেলিন (Fegelein) ছিলেন হিটলারের দরবারে হিমলারের প্রতিনিধি। হিটলারের সন্দেহ হইল যে, ফেগেলিনও নিশ্চয়ই হিমলারের প্রস্তাবিত আত্মসমর্পণের চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত আছে। অন্যথা হিটলারের কাছে অনুমতি না নিয়াই সে বাংকার থেকে এবং তার দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে পালাইতে চাহিয়াছে কেন? কার্যতঃ সে ২৬শে তারিখে নিঃশব্দে বাংকার থেকে সরিয়া পড়িয়াছিল। পরদিন অপরাহ্নে হিটলারের সেটা নজরে আসিল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি এস. এস. বাহিনীর একটি দলকে পাঠাইয়া দিলেন ফেগেলিনকে ধরিয়া আনার জন্য। প্রকাশ যে, গেস্টাপোর অধিকর্তা মুয়েলারের নিকট সে স্বীকার করিয়াছিল যে, হিমলার ও বার্নাডোটের মধ্যে সাক্ষাতের কথা সে জানিত। ফেগেলিনকে গ্রেপ্তার এবং পদচ্যুত করা হইল। হিটলারের প্রণয়িনী ইভা ব্রাউনের ভগ্নীকে সে বিবাহ করিয়াছিল। সুতরাং তার আশা ছিল ইভা ব্রাউন নিশ্চয়ই হিটলারের প্রতিহিংসা থেকে তাঁর ভগ্নীপতিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু ইভা কোন চেষ্টাই করিল না। বরং হান্না রিৎসের কাছে কাঁদো কাঁদো সুরে সে বলিল 'আহা বেচারা অ্যাডলফ! সকলেই তাঁকে ত্যাগ করিয়াছে। সকলেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। বরং ১০ হাজার লোকের প্রাণ যাউক, সেও ভালো, তবু জার্মানী তাঁকে (হিটলারকে) যেন না হারায়।'

হিটলারের রক্তপিপাসা জাগিয়া উঠিল। ফুরারের হুকুমে সশস্ত্র প্রহরীরা ফেগেলিনকে বাংকারের বাইরে চ্যান্সেলারির বাগানে নিয়া গেল এবং সেখানে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল।...

এদিকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হিটলার জেনারেল গ্রীমের কক্ষে আসিলেন এবং তাঁকে তাঁর শেষ হুকুম দিলেন—

প্রথমতঃ জার্মান বিমানবহরের সাহায্যে চ্যান্সেলারি আক্রমণকারী রুশসৈন্যদের ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষণ করিয়া ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ হিমলারের মত জঘন্য বিশ্বাসঘাতককে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করিতে হইবে। হিটলার চিৎকার করিয়া বলিলেন—'একজন বিশ্বাসঘাতককে নিশ্চয়ই আমার শূন্যপদে বসিতে দেওয়া হইবে না। সেই ব্যবস্থা তোমাকে অবশ্যই পাকা করিতে হইবে।'

জেনারেল গ্রীম (Greim) এবং হান্না রিৎস (Reitsch) বার্লিনের ভূগর্ভের আশ্রয়ে থেকে রুশ আক্রমণের গুরুতর বিপদ মাথায় নিয়া বিমানযোগে যাত্রা করিলেন। ইভা ব্রাউন তাঁর বোন মিসেস ফেগেলিনের কাছে একখানা চিঠি লিখিয়া হান্না রিৎসের হাতে দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু চিঠিটা এত বাজে ছিল যে. রিৎসের নিকট তা অপাঠ্য মনে হইয়াছিল। কিন্তু ইভা যখন সেই চিঠি লিখিতেছিল, তখন ইভার ভগ্নীপতি ফেগেলিনের মৃতদেহ চ্যান্সেলারির বাগানে গোরে দেওয়া হইতেছিল!

নবম পর্ব

পঞ্চম অধ্যায়

মুসোলিনীর চরমদণ্ড : উপপত্নীসহ নিহত

হিটলার যখন বার্লিনের ভূগর্ভে তাঁর অন্তিম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিক থেকে জার্মানী যখন ক্রমশঃ চূড়ান্ত পতনের মুখে পড়িতেছিল, তখন তাঁর মিতা ও সমরসঙ্গী এবং ইউরোপে ফ্যাসিজমের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা মুসোলিনী কি অবস্থায় ছিলেন ? একথা আগেই উল্লেখ (ষষ্ঠ পর্ব, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিটলারের নির্দেশে স্কোরজিন (Skorzeny) কর্তৃক বন্দী মুসোলিনীর (১৯৪৩, ২৫ শে জুলাই ইতালীর রাজা কর্তৃক পদচ্যুত) উদ্ধারের পর উত্তর ইতালীর লেক গারডা অঞ্চলে একটি নতুন ফ্যাসিস্ট রিপাব্লিকান গবর্নমেণ্ট স্থাপন করিয়াছিলেন। রোম থেকে ৫০০ মাইল দূরে স্যালো নামক ক্ষুদ্র শহরে এই সরকারের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এজন্য এই নতুন সরকার 'স্যালো রিপাব্লিক' নামে পরিচিত ছিল। আসলে এটা কোন স্বাধীন ও সার্বভৌম গবর্নমেণ্ট ছিল না এবং মুসোলিনী নিজেকে এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান বলে ঘোষণা করিলেও এর বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ও শাসনকার্য চালাইবার ক্ষমতা ছিল না। এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে নাৎসী জার্মানীর কবলিত এবং হিটলার ও তাঁর প্রতিনিধিদের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত— যদিও স্যালো রিপাব্লিকের তথাকথিত কয়েকজন মন্ত্রীও ছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসোলিনী এস. এস. জার্মান গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। যিনি বিশ বছর ধরিয়া ইতালীর ভাগ্যবিধাতা এবং আন্তর্জাতিক জগতের একজন নেতা ছিলেন, তাঁর পক্ষে এই অবস্থা বরদাস্ত করা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। অথচ মুসোলিনীর পক্ষে স্বাধীনভাবে কিছু করারও উপায় ছিল না। মুসোলিনী তখন নিতান্তই হতাশ ও ভগ্নস্বাস্থ্য। তবু, নাৎসী জার্মানদের অসম্মানজনক ও অসহনীয় কবল থেকে তিনি ত্রাণ পাইতে চাহিলেন।

১৯৪৪ সালের শেষভাগে ইতালীতে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি শুরু হইল এবং জার্মানদের গোথিক লাইন নামে প্রতিরক্ষার ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গেল এবং উত্তর ইতালী ক্রমশঃ বিপদের মুখে পড়িল। জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাসিস্টরা একত্রে বাধাদানের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু বাস্তবে তেমন-কিছু ঘটিল না। তখন ১৯৪৫ সালের আরম্ভে ইতালীয় ফ্রন্টে মিত্রপক্ষের নতুন অভিযানের ফলে ইতালীর জার্মান নায়কেরা যুদ্ধাবসানের কথা ভাবিতে লাগিলেন। কারণ, তখন ইউরোপের সর্বত্রই ফ্যাসিস্ট নেতাদের অধিকাংশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে আর জয়লাভের আশা নাই। কিন্তু বলশেভিক রাশিয়ার ভয়ে তাঁরা ভীত ছিলেন এবং এজন্য নানা সূত্র ধরিয়া বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষের নিকট যুদ্ধবিরতি বা আত্মসমর্পণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। গোয়েরিং, হিমলার, রিবেন্ট্রপ এবং কালটেনব্রুনার প্রমুখ বাঘা বাঘা নাৎসী নেতারা সুইডেন, মাদ্রিদ ও সুইজারল্যাণ্ডে তাঁদের প্রতিনিধি বা অনুচরদের পাঠাইয়া কিংবা নিরপেক্ষ দূত মারফৎ শান্তি স্থাপনের জন্য আলোচনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিশেষভাবে ইউরোপ নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সংস্থান সুবিধাজনক বলিয়া এবং সেখানে

মার্কিন গোয়েন্দা শিরোমণি অ্যালান ডালাসের প্রধান দপ্তর প্রতিষ্ঠিত থাকায় পশ্চিমী মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধাবসানের চেষ্টা চলিতে লাগিল। মুসোলিনীও এই সুযোগে জার্মান হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কারণ, উত্তর ইতালী ছিল অত্যন্ত শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল এবং তখন পর্যন্ত মিত্রপক্ষের অধিকারের বাইরে। কিন্তু ইতালীর ফ্যাসিস্ট-বিরোধী দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা কিংবা পার্টিজান গেরিলারা ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। এঁদের মধ্যে কমিউনিস্টরা ছিলেন বিশেষ শক্তিশালী এবং ৬টি অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট দল এমনভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল যে, তাঁরা শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিলেন ইতালীয় জার্মান ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে। পার্টিজানদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজারে দাঁড়াইল এবং এদের সঙ্গে বহু স্ত্রীলোক বা মহিলারাও যোগ দিয়াছিলেন। নাৎসী ফ্যাসিস্টদের যুদ্ধযাত্রায় বাধা দেওয়ার জন্য তাঁরা উত্তর ইতালীর বড় বড় শিল্প-কলকারখানাগুলিতে এবং রেলওয়েতে ধর্মঘট বাধাইয়া দিলেন। আর সেই সঙ্গে হানাদারি গুপ্ত আক্রমণ ও সাবোটাজ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ফলে, ইতালীয়-জার্মান ফ্যাসিস্টরা পার্টিজানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভয়াবহ ও বর্বর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে লাগিল। এখানে শত শত 'লিডিস্'-এর সৃষ্টি হইল এবং একটি গ্রাম থেকেই ১৪০০ লোককে হত্যা করা হইয়াছিল।[১]

উত্তর ইতালীর কলকারখানা ও শিল্পোৎপাদনের গুরুত্বের জন্য এই অঞ্চলটা কমিউনিস্টদের দখলে গেলে পশ্চিমী শক্তিগুলির রাজনৈতিক ভবিষ্যতের পক্ষে বিপদের কারণ ঘটেবে। সুতরাং এই পরিণতি নিবারণের জন্য হয়তো ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ ফ্যাসিস্ট-দের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় রাজী হইতে পারেন, এমন চিন্তা ঢুকিল নাৎসী নেতাদের মাথায়। এমন কি কিছুকালের জন্য হিটলার এবং সেই সঙ্গে মুসোলিনীর মস্তিষ্কেও এই কল্পনার ঢেউ খেলিয়া গেল। আর ভ্যাটিকান বা খৃস্টান ধর্মগুরু পোপের দপ্তরেও ফ্যাসিস্ট যুদ্ধের ধ্বংস ও ত্রাস এবং রক্তপাত ও বিপ্লব থেকে উত্তর ইতালীকে রক্ষা করার জন্যে উদ্বেগ দেখা দিল।...[২]

কিন্তু জার্মানদের পক্ষ থেকে এই সমস্ত শান্তি প্রচেষ্টায় মিত্রপক্ষ তেমন কিছু সাড়া দিলেন না এবং সোভিয়েত রাশিয়া উত্তর ইতালীর জার্মান নায়কদের এই সমস্ত প্রচেষ্টা সন্দেহের চোখে দেখিলেন এবং চার্চিলের নিকট আপত্তি জানাইলেন। বিশেষভাবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর পর এই আপত্তি আরও তীব্র হইল—যদিও মুসোলিনীর মনে রুজভেল্টের মৃত্যু সংবাদ কিছুটা আশার সঞ্চার করিয়াছিল এবং অন্যান্য ফ্যাসিস্ট-দের মত তাঁরও মনে হইয়াছিল যে, অতঃপর সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তি-বর্গের বিচ্ছেদও ঘটিতে পারে। অবশ্য ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিপর্যয়কর অবস্থার জন্যই এই সমস্ত রঙীন কল্পনা তাদের পক্ষে সান্ত্বনা স্বরূপ ছিল।...

এদিকে মুসোলিনীর সঙ্গে জার্মানদের বিশেষ বনিবনা হইতেছিল না। উত্তর ইতালীর স্যালো রিপাব্লিকে জার্মানীর নূতন দূত রুডলফ র‍্যান (Rudolf Rahn) অত্যন্ত ধূর্ত কূটনৈতিক ছিলেন এবং তিনি মুসোলিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখিলেন। অধিকন্তু এস. এস. বাহিনীর কমাণ্ডার জেনারেল উলফ (Wolff) সামরিক প্রতিনিধি হিসাবে মুসোলিনীর শান্তি প্রচেষ্টা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক

ছিলেন। মার্শাল গ্রাৎসিয়ানীকে মুসোলিনী পছন্দ করিতেন না। কিন্তু হিটলার তাঁকে মুসোলিনীর নতুন সরকারের সমরসচিব ও সেনানীমণ্ডলীর প্রধানের পদে নিয়োগ করিতে বাধ্য করিলেন।[১] অনুরূপভাবে গুইডো বুফারিনি (Guido Buffarini) স্যালো রিপাবলিকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যদিও বুফারিনি একজন পাকা রাজনীতিক ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, তবু মুসোলিনী তাঁর নিয়োগ বাতিল করিয়া দিলেন। কিন্তু কি কারণে তাঁকে বরখাস্ত করা হইল, তা স্পষ্ট বুঝা গেল না। সুতরাং জার্মান মহল মুসোলিনীর উপর খুব অসন্তুষ্ট হইলেন এবং জার্মানীর সঙ্গে মুসোলিনীর দৈনন্দিন সম্পর্ক খুব খারাপ হইতে লাগিল।[২]

* * *

মুসোলিনী হিটলারী গ্রাস থেকে নিজেকে উদ্ধার করার কথা ভাবিতে লাগিলেন এবং কিভাবে একটা 'ইতালীয় রাজনৈতিক মীমাংসার' দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায়, সেই চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরিতে লাগিল। হিটলারের কাছ থেকে তিনি ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইতে চাহিলেন এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে একটা আপোস মীমাংসায় আসিবার জন্য মিলানের আর্ক বিশপের মারফৎ "রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে" লিখিতভাবে একটি আবেদন পাঠাইলেন। এই আবেদনে তিনি উত্তর ইতালীকে ধ্বংস, রক্তপাত ও কমিউনিস্ট বিপ্লব থেকে রক্ষা করার, এমন কি রিপাব্লিকান ফ্যাসিস্ট পার্টি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত করিলেন। কিন্তু ৬ই এপ্রিল (১৯৪৫) পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও তিনি তাঁর আত্মসমর্পণের প্রস্তাবের কোন জবাব পাইলেন না। অধিকন্তু ঐ দিনই তিনি ইতালীয়-জার্মান বাহিনীর পক্ষ থেকে সুইজারল্যাণ্ডে যুদ্ধ বিরতির আলোচনার সংবাদ শুনিতে পাইলেন। অবশ্য এই সংবাদ মিথ্যা ছিল না এবং এই শান্তি প্রচেষ্টার নাম ছিল "অপারেশন সানরাইজ"। মুসোলিনী এই সংবাদে হতভম্ব হইলেন এবং জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ডাকিয়া আনিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে চাহিলেন। কিন্তু ডঃ রুডলফ র‍্যান জানিয়াও না-জানার ভান করিলেন এবং সামরিক প্রতিনিধি উলফকে ডুচের বিরক্তি ও অসন্তোষ সম্পর্কে সাবধান করিয়াদিলেন।[৩]

এখানে পাঠকবর্গকে আর-একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, মুসোলিনীর অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় ছিল। উত্তর ইতালীর লেক গারডার পশ্চিম তীরে যে ছোট্ট স্যালো শহরে তাঁর "গবর্নমেণ্ট" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেটা সম্পূর্ণ রূপেই জার্মানদের কবলিত ছিল এবং লেক গারডা, লেক কমো, স্যালো ইত্যাদি জায়গাগুলি ছিল সুইজারল্যাণ্ড, আল্পস, বিখ্যাত ব্রেনার গিরিবর্ত্ম, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি সন্নিহিত সীমান্ত অঞ্চলে, ১৯৪৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ইতালীর আত্মসমর্পণ এবং ১৩ই অক্টোবর ইতালী কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরেই ইতালী উত্তরে ও দক্ষিণে ভাগ হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ দিকটা ছিল মিত্রপক্ষের দখলে। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জুন মিত্রবাহিনী রোম দখল করিয়া নিয়াছিল। অর্থাৎ জার্মানরা রোম ছাড়িয়া উত্তর ইতালীতে চলিয়া গিয়াছিল। তারপর থেকেই উত্তর ইতালীতে বাকী ইতালীয় ফ্যাসিস্ট ও জার্মানদের বিরুদ্ধে পার্টিজান ও গেরিলা বাহিনী সংগঠিত হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারাই বিখ্যাত মিলান শহর সহ সারা উত্তর ইতালী ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

১। ডুচে—রিচার্ড কোলিয়েরে, পৃষ্ঠা ২৮০।
২। দি লাস্ট ডেইজ অব মুসোলিনীর, পৃষ্ঠা ২৭৯।
৩। দি লাস্ট হাণ্ড্রেড ডেইজ, পৃষ্ঠা ৫৩০।

এই অবস্থার মধ্যে মুসোলিনী স্যালো শহরে জার্মানদের আশ্রয়ে "স্বাধীন" সরকার গঠন করিলেন। কিন্তু তখন তিনি দেহে ও মনে ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ কার্যতঃ তখন তিনি ফুয়ারের ইতালীয় এজেণ্টে পরিণত হইয়াছিলেন এবং তাঁরই চাপে পড়িয়া ভেরোনা জেলে তাঁর জামাতা কাউণ্ট চিয়ানো (প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী) ও অন্যান্যের বিচার প্রহসন ও প্রাণহনন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অথচ কন্যা এড্ডাকে তিনি ভালোবাসিতেন। কিন্তু এই ভালোবাসার জোরেও তিনি তাঁর জামাতাকে বিশ্বাস-ঘাতকতার অভিযোগ থেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না এবং কার্যতঃ কন্যার কাছে মুখ দেখাইতেও সাহস পাইতেছিলেন না। মন্দভাগিনী কাউণ্টেস এড্ডা শোকে-দুঃখে-ক্ষোভে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পিতা মুসোলিনীকে আত্মহত্যার জন্য বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মুসোলিনীর স্ত্রী জার্মান পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁর জামাতা কাউণ্ট চিয়ানোর উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁর প্রাণদণ্ড সমর্থন করিয়াছিলেন!

অধিকন্তু এই সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল কমন্সসভার এক বক্তৃতায় তীব্রকণ্ঠে মন্তব্য করিলেন যে, নিজের জামাতার রক্তে হাত কলঙ্কিত করিয়া মুসোলিনী আবার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা দিতেছে!

চার্চিলের এই মন্তব্য মুসোলিনীকে গভীরভাবে আহত করিয়াছিল। সুতরাং তিনি এক যাজকের কাছে প্রার্থনা করিলেন তাঁর "আত্মার শান্তির জন্য" এবং "ভগবানের সঙ্গে তার আত্মার সংযোগ বিধানের চেষ্টা করার জন্য।"

কিন্তু ভগবানের দরবারে মুসোলিনীর শান্তি প্রার্থনার কি দশা হইয়াছিল, তা জানার সুযোগ ছিল না। তবে ১১ই এপ্রিল, ১৯৪৫, এটা জানা গেল যে, পশ্চিমীদের নিকট তাঁর যুদ্ধ বিরতির বা শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। সুইজারল্যাণ্ডে ডালেসের দপ্তর থেকে ভ্যাটিকানের মারফৎ মুসোলিনীকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, একমাত্র নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া মিত্রপক্ষের নিকট আর কিছু গ্রহণযোগ্য নহে।

* * *

লেক গারডা ও স্যালো থেকে মুসোলিনী এবার তাঁর গবর্নমেণ্ট মিলানে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন এবং ১৬ই এপ্রিল সকালে তাঁর 'মন্ত্রিসভার' নিকট সে কথা ঘোষণা করিলেন। অবশ্য তার আগে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি শেষ যুদ্ধ চালাইয়া মরিতেই হয়, তবে, তিনি স্বদেশের ভূমিতেই মরিতে চান এবং উত্তর দিকে ভালটেলিনাতে তিনি তাঁর শেষ যুদ্ধ করিতে চান। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাবে বাধা দিলেন মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী। কারণ, তাঁর মতে জার্মানীর সম্মতি ছাড়া এমন কার্য করা উচিত নয়। আর বাধা দিলেন ইতালীতে জার্মানীর সামরিক প্রতিনিধি এস. এস. জেনারেল উলফ। অধিকন্তু উলফ মুসোলিনীকে যুদ্ধবিরতির কোন আলোচনা চালাইতেও নিষেধ করিলেন। কারণ, এটা মানিয়া নিলে মুসোলিনীর স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিতে হয়, যেটা ছিল জার্মানীর স্বার্থের একান্ত বিরোধী। এদিকে জেনারেল উলফ ইতালী সম্পর্কে আলোচনার জন্য বার্লিনে আহূত হইলেন।...

কিন্তু ডুচে মিলানে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করলেন এই যুদ্ধের একটা "ইতালীয় মীমাংসা" করিতেই হইবে। সুতরাং মিলানে

১। ডুচে—রিচার্ড কোলিয়র, পৃষ্ঠা ৩০৩।

গিয়া তিনি পার্টিজানদের কমিটির সঙ্গে অথবা পশ্চিমীদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির আলোচনা করিবেন কিংবা শেষ পর্যন্ত ভলটেরিনাতে গিয়া জীবনের শেষ সংগ্রাম চালাইবেন।

আগেই বলা হইয়াছে মুসোলিনী হিটলারের কাছ থেকে দূরে সরিয়া যাইতে চাহিতেছিলেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি যেন মাকড়শার জালে আটকা পড়িয়াছেন। অপর পক্ষে হিটলারও ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে ইতালীতে মুসোলিনীর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই মুসোলিনীর সম্পর্কে মোহমুক্ত হইতেছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে গোপন আলোচনা প্রসঙ্গে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর "অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব" সম্ভবতঃ ভুল হইয়াছিল। 'স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইতালীর সঙ্গে আমাদের মিত্রতা আমাদের শত্রুদের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হইয়াছিল। আমাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি এই যুদ্ধে আমরা হারিয়া যাই, তবে, বুঝিতে হইবে সেই পরাজয়ের জন্য ইতালীর সঙ্গে মিত্রতা কম দায়ী ছিল না। ইতালী আমাদের সবচেয়ে বেশী উপকারে আসিতে পারিত, যদি সে সংঘর্ষে যোগদান না করিত।' কিন্তু তবু হিটলার এখনও ইতালীর জন্য যেন একটা "সহজাত প্রেরণা" বলেই বন্ধুতা অনুভব করেন। কিন্তু 'আমি নিজেকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করি এজন্য যে, আমি যুক্তির কথা মানি নাই—যার জন্য ইতালীর সঙ্গে বন্ধুতায় আমাকে নির্মম করিয়া তুলিয়াছিল।'[১]

কিন্তু মুসোলিনীর সঙ্গে এই "নির্মম বন্ধুতার বা পাশবিক মিত্রতার" (কোন কোন লেখক যেমন—এফ. ডব্লিউ. ডিকিন এই ক্ষেত্রে "ব্রুটাল ফ্রেন্ডশিপ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন) আয়ুও শেষ হইয়া আসিতেছিল। ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটায় মুসোলিনী জার্মান নিরাপত্তা বাহিনীর পাহারায় ৫টি মোটরগাড়ী এবং একটি মালভর্তি ট্রাকের কনভয় যোগে মিলানের দিকে রওনা হইলেন এবং রাত্রি ৯টায় মিলানের নগররক্ষীর দপ্তর বা আবাসই ছিল মুসোলিনীর শেষ কর্তৃত্বের আশ্রয়স্থল এবং এখানে তিনি মিলানের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিলেন।

কার্ডিনাল সুস্টারের (Schuster) নধ্যস্থতায় মিলানে আর্কবিশপের প্রাসাদে মুসোলিনীর সঙ্গে পার্টিজান বাহিনীর ন্যাশনাল কমিটি অব্ লিবারেশন-এর প্রতিনিধিদের দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। মুসোলিনীর দিকে তাকাইয়া কার্ডিনালের মনে হইল যে, 'এক নিদারুণ বিপর্যয়ে মুসোলিনী যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন।' তবু কার্ডিনাল তাঁকে একটু চাঙ্গা করিতে চাহিলেন এবং বলিলেন যে, ইতালীকে আর অনাবশ্যক ধ্বংসের মধ্যে ট্যানিয়া না নিয়া তাঁর উচিত আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু জবাবে মুসোলিনী বলিলেন যে, তিনি ৩০০০ কালোকুর্তা সৈন্যসহ ভালটেলিনাতে গিয়া শেষ যুদ্ধ চালাইবেন। কিন্তু কার্ডিনাল তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ডুচের মনে যেন কোন মোহ না থাকে, তিন হাজার দূরের কথা, তিনশত কালোকুর্তাও তিনি পাইবেন কিনা সন্দেহ। মুসোলিনী জবাব দিলেন যে, তাঁর কোন মোহ নাই, তবে তিনশতের চেয়ে কিছু বেশী পেতে পারেন।

ইতিমধ্যে মুসেলিনীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনার জন্য লিবারেশন কমিটির তিনজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি আসিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ মার্শাল

১। দি ল্যাস্ট্ হানড্রেড ডেইজ, পৃষ্ঠা ৫৩০।

গ্রাৎসিয়ানি মুসোলিনীর দুইজন মন্ত্রীসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। কার্ডিনালের প্রস্তাব অনুসারে তাঁরা সকলে একটি বড় গোলটেবিলের চারদিকে আসন গ্রহণ করিলেন। মুসোলিনী যেন কিছুটা অধৈর্যের সঙ্গে লিবারেশন কমিটির সদস্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনাদের প্রস্তাব কি?'

পার্টিজানদের মুখপাত্র মারাজ্জা (Marazza) জবাব দিলেন—'আমাদের প্রস্তাব খুব ছোট্ট এবং সুনির্দিষ্ট। আমরা শুধু আপনার আত্মসমর্পণের দাবি করতে ও গ্রহণ করতে এসেছি।'

মুসোলিনী বাধা দিয়া বলিলেন—'আমি কিন্তু সেজন্য আসি নি। আমার সঙ্গে কথা ছিল আমরা একত্রে মিলে শর্তাদি সম্পর্কে আলোচনা করবো। আমি এসেছিলাম আমার লোকজন, তাদের পরিবারবর্গ ও ফ্যাসিস্ট মিলিশিয়ার রক্ষাকবচ দাবি করার জন্য। তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে সেটাও আমার জানা দরকার। আমার সরকারের কর্মচারীদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই গ্যারেণ্টি দিতে হবে এবং আমার সৈন্যেরা যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে, তাদেরকে যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা দিতে হবে।'

তখন একজন পার্টিজান প্রতিনিধি বলিলেন—'এগুলি বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। সেই আলোচনা করার অধিকার আমাদের আছে।'

ভুচে তখন বলিলেন—'বেশ কথা, তবে, আমরা একটা মীমাংসার শর্তে পেঁছুতে পারি।'

তখন মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি হঠাৎ যেন লাফাইয়া উঠিলেন—'না, না, ভুচে। আপনি তা করতে পারেন না। জার্মানদের প্রতি আমাদের বাধ্যবাধকতা আছে। তাদের সম্মতি ও পরামর্শ ছাড়া আমরা এভাবে আত্মসমর্পণের কোন চুক্তিপত্রে সই দিতে পারি না। কর্তব্যের ও আত্মমর্যাদার নিয়মকানুনগুলি আমরা ভুলিতে পারি না।'

তখন পার্টিজান প্রতিনিধিরা বলিলেন, জার্মানদের কিন্তু তেমন-কিছু নিয়ম-কানুনের বালাই নেই। গত চারদিন ধরে আমরা তাদের আত্মসমর্পণের শর্ত নিয়ে আলোচনা করছি! যে কোন মুহূর্তে তাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।'

মুসোলিনী তখন ব্যথিত ও ক্ষুব্ধচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—'আগে আমি জার্মান কন্সালের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করিতে চাই এবং বলিতে চাই যে, জার্মানী ইতালীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

এই কথা বলিয়া মুসোলিনী সেই কক্ষ থেকে বাহির হইয়া গেলেন। সেইদিন সন্ধ্যা ৮টার সময় মুসোলিনী ফ্যাসিস্ট মিলিসিয়ার ইউনিফর্ম পরিয়া অবিলম্বে মিলান ত্যাগ করিয়া কোমো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি, জার্মান সশস্ত্র প্রহরী এবং ১০ গাড়ী বোঝাই লোকজন।

মুসোলিনীর এক মন্ত্রী আরেক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' উত্তরে সেই ভদ্রলোক বলিলেন, 'ঈশ্বর জানেন, বোধ হয় যমপুরীতে।'

নিয়তির অনতিক্রম্য বন্ধনের মত ক্লারা পেতাচ্চিও (মুসোলিনীর উপপত্নী) আর একটি গাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলেন।

* * *

কোমো হ্রদের ৫ মাইল দক্ষিণে সুবিধাবাদী মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী মুসোলিনীর

দলবল ছাড়িয়া জার্মান এস. এস. সীমান্ত বাহিনীর সদরে আসিয়া আশ্রয় নিলেন। আর মুসোলিনী কোমোতে পৌঁছিয়া তাঁর স্ত্রীকে এই মর্মে এক বার্তা পাঠাইলেন যে, তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং "বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায়" পৌঁছিয়াছেন। সুতরাং তাঁর স্ত্রী যেন তাঁর অনিচ্ছাকৃত সমস্ত অপরাধের জন্য তাঁকে ক্ষমা করেন। আর সেই সঙ্গে মুসোলিনী তাঁর স্ত্রীকে (ডোনা র‍্যাচেলি) পরামর্শ দিলেন বাচ্চা দুইটি সহ অবিলম্বে সুইজারল্যাণ্ডে চলিয়া যাইতে এবং সেখানে গিয়া নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করিতে।...

২৬শে এপ্রিল ভোর হওয়ার আগেই মুসোলিনী তাঁর ক্ষুদ্র একটি দলসহ কোমো হ্রদের পশ্চিম তীর ধরিয়া রওনা হইলেন এবং কোমো থেকে ২৫ মাইল দূরে একজন স্থানীয় ফ্যাসিস্ট অফিসারের গৃহে আশ্রয় নিলেন তাঁর পার্টি-সেক্রেটারি প্যাভোলিনীর ৩ হাজার কালোকুর্তা সৈন্যসহ আগমনের অপেক্ষায়। মুসোলিনী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চি দুইটি বর্মাবৃত গাড়ী এবং কয়েক কোম্পানী রিপাব্লিকান সৈন্যসহ আসিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু এত বড় কনভয় সহ সেখানে অপেক্ষা করা বিপজ্জনক। সুতরাং তিনি অন্য রাস্তায় গাড়ীগুলিকে ঘুরাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে তাঁর প্রণয়িনীসহ একটি পৃথক গাড়ীতে চড়িয়া পশ্চিম দিকে সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা অভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁর জার্মান প্রহরী এস. এস. লেঃ বারজার (Birzer) এবং বাকী কনভয় তাঁর পিছু পিছু অনুসরণ করিল। রাস্তায় একটি ছোট্ট হোটেলে অবস্থানকালে মুসোলিনী রেডিও যোগে প্রচারিত এই মর্মে একটি বার্তা শুনিতে পাইলেন যে, বৃটিশ বাহিনীর লেঃ জেনারেল মার্ক ক্লার্ক ক্রমাগত জয়াভিযানে আগাইয়া আসিতেছেন এবং উত্তর ইতালীর সর্বত্র পার্টিজানদের অভ্যুত্থান ঘটিতেছে।...

মুসোলিনী সেখান থেকে সন্ধ্যাবেলাই ভ্যালটেলিনার দিকে রওনা হইতে চাহিলেন। কিন্তু জার্মান নিরাপত্তা রক্ষী লেঃ বারজার বাধা দিলেন এবং বলিলেন যে, পার্টিজানরা নিশ্চয়ই রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। তা ছাড়া তাঁর দলবলের লোকজনেরাও ক্লান্ত। সুতরাং সেই রাতে সেই স্থানীয় হোটেলে অপেক্ষা করাই ভালো। পরদিন ভোরবেলা বরং রওনা হওয়া যাইবে। মুসোলিনী রাজী হইলেন।

* * *

কার্যতঃ তখন বাকী ইতালীয় ফ্যাসিস্টরা ও জার্মানেরা উত্তর দিকে সীমান্ত অঞ্চল দিয়া পরিত্রাণের পথ খুঁজিতেছিল। পার্টিজান ও গেরিলা বাহিনীর সৈন্যেরা এজন্য যথাসম্ভব সর্বত্র সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কোমো হ্রদ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টিজানদের ছিল আধিপত্য। তাঁদের নেতা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশজাত কাউন্ট পিয়ের লুইগি বেলোনি ডেলা স্টেল—সংক্ষেপে বেলোনি নামে পরিচিত। ২২ বছরের সুশিক্ষিত ও সুশ্রী যুবক। জার্মানদের হাতে এর পিতা নিহত হইয়াছিলেন। এর সহকারী ছিলেন ২০ বছরের যুবক আরবানো ল্যাজারো, কিন্তু এঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। এমন কি কমিউনিস্টও ছিলেন না। কিন্তু একান্তরূপে জার্মান ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী ছিলেন। বেলোনি মধ্যরাত্রে লেকের রাস্তায় ডাঙ্গোর দক্ষিণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলেন। এদিকে ফ্যাসিস্ট পার্টির সেক্রেটারি আলেকজান্দারো প্যাভোলিনী মুসোলিনীর হোটেলে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং বিরস বদনে ডুচেকে বলিলেন যে, কালোকুর্তা সৈন্যদের

অধিকাংশই কোমো এলাকায় পার্টিজানদের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মুসোলিনী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভ্যালটেলিনাতে তাঁর প্রস্তাবিত লড়াইয়ের জন্য কত জন কালোকুর্তাকে তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন? প্যাভোলিনী কিছুটা দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গে জবাব দিলেন ১২ জন!

এই জবাব থেকেই বোঝা যাইবে পরিস্থিতি কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছিল। তপাপি মুসোলিনী ভোরবেলা লেকের রাস্তায় জার্মান কনভয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন সীমান্ত পার হইয়া ইতালী পরিত্যাগের জন্য। এই জার্মান কনভয়তে ২৮টি ট্রাক ভর্তি জার্মান সৈন্য, একটি বর্মাবৃত গাড়ী জার্মান অধিনায়কের জন্য, আর ১০টি যানবাহন ছিল অ-সামরিক লোকজনে ভর্তি। কিন্তু কনভয়তে নানা ধরনের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ছিল। মুসোলিনী নিরাপত্তার খাতিরে আর্মাড' কারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চি এবং তাঁর ভাই ও পরিবারের লোকেরাও স্পেনে যাওয়ার জন্য কনভয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু এই যাত্রাপথেই শুরু হইল ইতালীয় বিয়োগান্ত নাটকের হীরো মুসোলিনীর শেষ অঙ্ক। কাউণ্ট বেলেনির পার্টিজান সৈন্যেরা কনভয়ের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু জার্মান কনভয় সামরিক দিক থেকে এত বলশালী ছিল যে, কাউণ্ট বেলেনির সাধ্য ছিল না প্রকাশ্য যুদ্ধের দ্বারা তাদের গতিরোধ করার। সুতরাং বেলেনি চাতুর্য-নীতি অবলম্বন করিলেন এবং এমন ভঙ্গী দেখাইলেক যেন সারা অঞ্চল জুড়িয়া পার্টিজান সৈন্য ও সমরশক্তির প্রচুর দাপট রহিয়াছে। বেলেনি ও তাঁর অনুচরেরা আগে থেকেই পথে নানা রকমের রোডব্লক (প্রতিবন্ধক) সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং জার্মান কনভয়ের গতি রুদ্ধ হইল এবং বেলেনি আসিয়া জার্মান অধিনায়ক ক্যাপ্টেন অটো কিসনাটকে (Kisnatt) নানাভাবে জেরা করিতে লাগিলেন। জেরার মুখে কিসনাট্ স্বীকার করিলেন যে, তাঁর দলে কিছু ইতালীয়ান আছে। কিন্তু তাদের জন্য তাঁর কোন দায়িত্ব নাই। তখন বেলেনি আরও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর এই শর্তে জার্মান কনভয়কে অগ্রসর হইতে দিলেন যে, তাদের দলের সমস্ত ইতালীয়ানকে তাঁর হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বেলেনির কানে কানে বলিল যে, মুসোলিনী এই দলে রহিয়াছে। তাঁকে যেন ছাড়িয়া দেওয়া না হয়। 'মুসোলিনী এই দলে?'—একথাটা যেন বেলেনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং তিনি ল্যাজারোকে তদন্ত করিতে বলিলেন। ল্যাজারোও কথাটা তেমন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তখন নেগ্রি নামক পার্টিজানদের সাহায্যকারী এক ব্যক্তি আসিয়া ল্যাজারোকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল যে, 'সেই বেজম্মাটা এখানেই আছে!'

ল্যাজারো উত্তর দিল—'তুমি কি স্বপ্ন দেখছ?'

নেগ্রি তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল—'না, না, অবিশ্বাসের কারণ নেই। লোকটা মুসোলিনীই বটে, আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি।

'কোথায়?'

'এখানে একটা ট্রাকের মধ্যে। জার্মানদের ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে।'

ল্যাজারোর তখনও বিশ্বাস হইতেছিল না। সুতরাং বলিলেন যে, তোমার নিশ্চয় ভুল হয়েছে।

নেগ্রি জবাব দিল, 'না, তার ভুল হয় নাই, জার্মানদের দলিলপত্র পরীক্ষা করায়

সময় একটা ট্রাকে কম্বল মুড়ি দেওয়া একটি লোককে আমি দেখেছি। তার পরিধানে লম্বা কোট, সেই কোটের কলারে তার কান পর্যন্ত ঢাকা এবং তার মাথায় জার্মান হেলমেট বা শিরস্ত্রাণ, সেই শিরস্ত্রাণ দিয়া তার মুখ পর্যন্ত ঢাকা। আমি তার দলিল-পত্র দেখতে চেয়েছিলাম, তখন ট্রাকের জার্মানরা আমাকে বাধা দিল এবং বোঝাল লোকটি মাতাল।...'

তখন ল্যাজারো নিজে আগাইয়া গেলেন এবং নেগ্রির বর্ণিত ট্রাকে গিয়া ছদ্মবেশ-ধারী লোকটির শিরস্ত্রাণ টান দিয়া খুলিয়া ফেলিলেন—দেখা দিল একটা মস্ত টাকমাথা, তার চোখ থেকে সানগ্লাস খুলিয়া নিলেন এবং লম্বা কোটের কলারটা নামাইয়া দিলেন—দেখা গেল মূর্তিমান মুসোলিনী স্বয়ং তাঁর দুই হাঁটুর মধ্যে একটা একটা 'মেসিন পিস্তল, চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া আছেন, পিস্তলের বাঁটটা তাঁর চিবুকের কাছ পর্যন্ত।

ল্যাজারো মুসোলিনীর পিস্তলটা কাড়িয়া নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আরও অস্ত্র আছে কি না? মুসোলিনী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর কোটের বোতাম খুলিয়া ফেলিয়া আর একটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ল্যাজারোর হাতে দিলেন। মুসোলিনীকে ভীত দেখাইতেছিল না, কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছিল।

দুই-চারজন করিয়া একটি ছোট্ট জনতাও সেখানে জমায়েত হইতেছিল,—স্থানটি কোমো হ্রদের ডঙ্গো শহর। ল্যাজারো তখন অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন:

'ইতালীর জনগণের নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।'

২৮শে এপ্রিল মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রথমে ডোঙ্গোর টাউন হলে লইয়া যাওয়া হইল।

ক্লারা পেতাচ্চি এবং তথাকথিত স্পেনীয় পাশপোর্টধারী অন্যান্যকেও গ্রেপ্তার করা হইল। এর আগেই বেলিনিকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বেলিনি মুসোলিনীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি এই এলাকার কমান্ডার এবং তিনি কথা দিতেছেন যে, মুসোলিনীর কোন অনিষ্ট হইবে না। মুসোলিনী শুধু ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন—'আপনাকে ধন্যবাদ'।

ল্যাজারো মুসোলিনীর চামড়ার প্রকাণ্ড পোর্টফোলিও ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস তল্লাশি করিয়া কিছু গোপনীয় দলিলপত্র, ভেরোনা জেলের কাগজপত্র, হিটলারের কাছে লেখা চিঠিসমূহ এবং ১৬০টি স্বর্ণমুদ্রা ও ৫ লক্ষ লিরার (ইতালীয় টাকা) কয়েকটি চেক পাইলেন।

ইতিমধ্যে 'মুসোলিনীর সরকারের' অন্যান্য সদস্যরাও ধৃত হইয়াছিলেন।

বেলেনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, মুসোলিনীকে এখানে রাখা বিপজ্জনক। কেননা, জার্মানরা তাঁকে আর-একবার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারে। কিংবা শহরের লোকেরা তাঁকে খুন করিতে পারে। সুতরাং সেই রাত্রির জন্য মুসোলিনীকে কোন নিরাপদ গোপন স্থানে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। পাহাড়ের উপর তিন মাইল দূরে সীমান্ত প্রহরীদের ব্যারাকে এবং সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত একটি গ্রামে—যেখানে সাধারণতঃ পার্টিজানেরা আত্মগোপন করিয়া থাকে।

* * *

শেষ পর্যন্ত মুসোলিনী ও তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চিকে সীমান্তবর্তী গ্রামের একটা গোপন আবাসে নেওয়া হইল। বেলেনি আগাগোড়া খুব ভদ্র আচরণ

করিতেছিলেন এবং ম্যুসোলিনী ও পেতাচ্চি উভয়ের অন্যুরোধে পরস্পরকে একত্র মিলিত হইতে দিলেন। বেলোনিকে সহান্যুভূতিসম্পন্ন দেখিতে পাইয়া পেতাচ্চি কি ভাবে ম্যুসোলিনীর প্রেমে পড়িয়াছিলেন, সেই গল্প বলিলেন। ম্যুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হইয়াছিল ১৯২৬ সালে, তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর এবং ম্যুসোলিনীর বয়স দ্বিগ্যুণেরও বেশী। কিন্তু দেখাইত সতেজ য্যুবকের মত—ম্যুসোলিনীর সাহস, দ্যৃঢ়তা এবং তাঁর কঠোর প্যুর্যুষোচিত ব্যক্তিত্ব পেতাচ্চিকে ম্যুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল। অবশ্য ম্যুসোলিনীর অনেক প্রেমিকা ও উপপত্নী ছিল। কিন্তু সেজন্য তাঁর কোন ঈর্ষা ছিল না। বরং পরবর্তীকালে ম্যুসোলিনীর প্রেমিকাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর কাছে সাহায্যের জন্যও আসিত। পেতাচ্চি বিনাদ্বিধায় তাদেরকে সাহায্য দিতেন। কারণ, তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে, ম্যুসোলিনীর হৃদয়ের উপর একমাত্র তাঁরই আধিপত্য ছিল।···

পেতাচ্চি কথা প্রসঙ্গে এক সময় বেলোনিকে অন্যুরোধ করিলেন যে, ম্যুসোলিনীকে মিত্রপক্ষের হাতে সমর্পণ করা হোক। বেলোনি উত্তরে বলিলেন যে মিত্রপক্ষের সঙ্গে এই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই। এটা সম্প্যূর্ণর্যুপেই ইতালীর ব্যাপার।

এরপর ক্লারা পেতাচ্চি হঠাৎ একসময় কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—'আমি ব্যুঝেছি আপনারা তাঁকে গ্যুলি করে মারবেন।' এই কথা বলার পর কম্পিত হস্তে চোখের জল ম্যুছিয়া পেতাচ্চি বেলোনিকে অন্যুরোধ করিলেন—

'You must promise that if Mussolini is shot I can be near him until the last moment and that I shall be shot with him. Is that too much to ask ?···I want to die with him.'—[1]

'আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, ম্যুসোলিনীকে যদি গ্যুলি করে মারা হয়, তবে শেষ ম্যুহ্যুর্ত পর্যন্ত আমাকে তাঁর কাছে থাকতে দেওয়া হবে এবং তাঁর সঙ্গে আমাকেও গ্যুলি করা হবে। এমন অন্যুরোধ করা কি আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি ?···আমি তাঁর সঙ্গেই মরতে চাই।'

বেলোনি ম্যুসোলিনীর প্রণয়িনীর এই গভীর আবেগের জন্য বিচলিত হইলেন এবং বলিলেন—'আমি শপথ করে বলছি যে, ম্যুসোলিনীকে গ্যুলি করার ইচ্ছা আমার নেই।'···

সেই রাতেই বেলিনি এবং আরও দ্যুইজন পার্টিজান কোমো হ্রদ থেকে ১৪ মাইল দ্যুরে ম্যুসোলিনী ও ক্লারা পেতাচ্চিকে সঙ্গে নিয়া গাড়ীতে রওনা হইলেন একটি গ্রামের দিকে এবং সেখান থেকে ব্যৃষ্টির মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া পাহাড়ের উপর এক চাষী দম্পতির তিন তলা সাদা বাড়ীতে পৌঁছিলেন। মারিয়া দম্পতির অবশ্যই জানিতেন না আশ্রয়প্রার্থী এই দম্পতি কারা, অথচ চেহারা দেখিয়া তাঁদের সন্দেহ হইল প্যুর্যুষটি যেন ম্যুসোলিনীর মত দেখিতে। কিন্তু এই সামান্য চাষীর ঘরে ম্যুসোলিনী ?—এও কি সম্ভব ? স্যুতরাং তাঁরা ধরিয়া নিলেন প্যুর্যুষটি একজন জার্মান বন্দী। তবে, এই স্যুন্দরী স্ত্রীলোকটি কে ? সেকথা তাঁরা ব্যুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তাঁদের দ্যুইজনের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন শয়ন কক্ষ দেওয়া হইল। ম্যুসোলিনী এবং ক্লারা শয়ন কক্ষ দেখিয়া খ্যুব খ্যুশী হইলেন এবং অতিরিক্ত আর-একটি বালিশ চাহিয়া

১। দি লাস্ট হাণ্ড্রেড ডেইজ, প্যৃষ্ঠা ৫৬৩।

নিলেন। মুসোলিনী নাকি দুইটি বালিশ ছাড়া ঘুমাইতে পারিতেন না। দুইজন সশস্ত্র প্রহরী তাঁদের জন্য মোতায়েন করা হইল।

*　　*　　*

এদিকে মিলানে পার্টিজানদের সদর দপ্তরে স্থির হইল মুসোলিনীকে মিলানে ফিরাইয়া আনা হইবে এবং ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পামিরো তোগলিয়াত্তি গোপনে হুকুম পাঠাইলেন সোজাসুজি মুসোলিনী এবং তাঁর রক্ষিতাকে মৃত্যুদণ্ড দান ও হনন করার জন্য। এই আদেশ কার্যকর করায় জন্য কর্নেল ভ্যালেরিওকে ভার দেওয়া হইল। ভ্যালেরিও একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে লড়িয়াছিলেন। ২৮শে এপ্রিল ভোরবেলা তিনি রওনা হইয়া গেলেন ১৫ জন সশস্ত্র পার্টিজান সৈন্যসহ।

বেলিনির সঙ্গে যখন কর্নেল ভ্যালেরিওর দেখা হইল, তখন বন্দীদেরকে মিলানে পাঠানো নিয়া মতবিরোধ হইল। কারণ, এঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বেলেনির সদর দপ্তর এলাকায়। তখন ভ্যালেরিও কঠোরস্বরে বলিলেন জাতীয় মুক্তি কমিটির সদর দপ্তর সর্বসম্মতিক্রমে নির্দেশ দিয়াছেন মুসোলিনী ও তাঁর রক্ষিতাকে অবিলম্বে হনন করার জন্য এবং এই আদেশ কার্যকার করার ভার দেওয়া হইয়াছে ভ্যালেরিওর উপর। 'আমি এসেছি এদেরকে গুলি করে মারার জন্য।'

অপরাহ্ণ ৪টায় সময় কর্নেল ভ্যালেরিও ও তাঁর সঙ্গীরা মুসোলিনী ও তাঁর রক্ষিতাকে কৃষক দম্পতি মারিয়াদের গ্রাম্য গৃহ থেকে বাহির করিয়া নিয়া আসিলেন। ভালেরিও মুসোলিনীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। তাঁরা একটি ভিলার লোহার গেটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সামনে যেন কোন বিপদের আশংকা করা হইতেছে এমন ভঙ্গী দেখাইয়া মুসোলিনী ও ক্লারাকে চুপি চুপি গাড়ী থেকে নামিতে এবং গেটের কাছে লুকাইতে বলিলেন। মুসোলিনী ব্যাপারটা আন্দাজ করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং শঙ্কিতচিত্তে গেটের কাছে গেলেন এবং ক্লারাও তাঁকে অনুসরণ করিলেন। তখন চারিদিকে যেন অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভ্যালেরিও চীৎকার করিয়া উঠিলেন:

'স্বাধীনতাকামী স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যাদের সদর দপ্তরের নির্দেশক্রমে ইতালীর জনগণের প্রতি আমি ন্যায় বিচার করিতে বাধ্য।'

মুসোলিনী স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু ক্লারা তাঁর কোমলবাহু দিয়া মুসোলিনীর কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিলেন এবং চেঁচাইয়া বলিলেন—'না, তাঁকে মারিতে দেওয়া হবে না।'

ভ্যালেরিও আদেশ দিলেন—'যদি আপনিও মরতে না চান, তবে, কাছ থেকে সরে যান।'

কিন্তু ক্লারা পেতাচ্চি ডুচের ডানদিকে স্থান নিলেন। ভ্যালেরিও ১০ ফুট দূরে দাঁড়াইয়া পাঁচবার গুলি করিলেন। মুসোলিনী মাটির উপর পড়িয়া গেলেন। তাঁর উপপত্নী পেতাচ্চিকেও অনুরূপভাবে গুলি করিয়া মারা হইল। মেজেগ্রা গ্রামের প্রান্তে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিল। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন ফ্যাসিস্ট বন্দীকে এবং 'মুসোলিনীর সরকারের' ১৫ জন সদস্যকে ডোঙ্গোতে গুলি করিয়া হত্যা করা হইল। ১৯৪৪ সালের ১২ই আগস্ট মিলানের পিয়াজো লরোটোতে জার্মানেরা ১৫ জন ইতালীয়ানকে হত্যা

করিয়াছিল একটি জার্মান লরীর উপর বোমা নিক্ষেপের জন্য। এই হত্যাকাণ্ডগুলি ঘটিল তারই প্রতিশোধস্বরূপ।—[১]

* * *

ইতালীতে মিত্রপক্ষের সদর দপ্তর থেকে মিলানের পার্টিজান সদর দপ্তরকে অনুরোধ করা হইয়াছিল ধৃত মুসোলিনীকে মিত্রপক্ষের হাতে অর্পণের জন্য। কিন্তু মিলানের কমিউনিস্ট সদর দপ্তর এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া এক টেলিগ্রামে জানাইয়া দিল যে, গণ-আদালতের বিচারে মুসোলিনীর প্রাণদণ্ড বিধান এবং তা কার্যকর করা হইয়াছে।

২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৫, ভোরবেলা একটি লরীযোগে ২৩টি মৃতদেহ মিলানে আনা হইল এবং মিলানের প্রকাশ্যস্থানে পিয়াজো লরেটোতে মৃতদেহগুলি লরী থেকে খালাস করা এবং সাজাইয়া রাখা হইল। ক্রমে সেখানে ভীড় জমিতে লাগিল এবং মুসোলিনী ও ক্লারা পেতাচ্চির মৃতদেহের জঘন্যতম অসম্মান ঘটিল। কসাইয়ের দোকানের মাংস ঝুলাইবার হুক দিয়া মুসোলিনী ও ক্লারার মৃতদেহ ঝুলাইয়া রাখা হইল—তাঁদের মাথা নীচের দিকে ও পা দুইটি উপরের দিকে ঝুলিয়া রহিল, ক্লারার স্কার্ট নীচ থেকে মাথার দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। একজন মহিলা সেটা তুলিয়া ধরিয়া বেল্ট দিয়া দুই পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু উল্লাসমত্ত উত্তেজিত জনতা ইতালীর "সর্বসময় প্রভুর" মৃতদেহের উপর থু থু নিক্ষেপ করিতে, জুতা দিয়া লাথি মারিতে ও অন্যান্যভাবে অপমান করিতে লাগিল। আর-একজন মহিলা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মুসোলিনীব মৃতদেহের উপর পাঁচবার গুলি নিক্ষেপ করিলেন তাঁর পাঁচটি পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। কিন্তু এর চেয়েও অসম্মান ঘটিল মুসোলিনীর মৃতদেহের—ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। একদা যে মুসোলিনী সুইমিং পুলে স্নান করিতে নামিলে যুবতী নারীরা উম্মত্তের মত তাঁকে ঘিরিয়া ধরিত, সেই মুসোলিনীর মুখের উপর স্ত্রলোকেরা স্কার্ট তুলিয়া 'দেহজল' নিঃসৃত করিল?—[২]

২৩ বছর আগে যে মুসোলিনী রোম নগরীতে মার্চ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং ফ্যাসিজমের ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ৬২ বছর বয়সে তাঁর সেই নাটকীয় হিংস্র জীবনের ভয়াবহ অবসান ঘটিল। জেনারেল আইজেনহাওয়ার এই সংবাদ শুনিয়া মন্তব্য করিলেন—'হা ভগবান, কি কলঙ্কজনক মৃত্যু!'···

মুসোলিনীকে এভাবে খুন করার জন্য চার্চিল ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। বিশেষভাবে একজন মহিলাকে হত্যা করার জন্য তিনি সমগ্র ব্যাপারটাকে "কাপুরুষতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা" বলিয়া নিন্দা করিলেন এবং নিজেই প্রশ্ন তুলিলেন এই মহিলা কি যুদ্ধাপরাধী ছিলেন?—[৩]

কিন্তু ইতিহাসে মুসোলিনীর মত অত্যাচারী ডিক্টেটরদের এই পরিণামই ঘটিয়া থাকে। চার্চিল এই ব্যাপারে যত ক্ষোভই করিয়া থাকুন না কেন, মুসোলিনীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় ইতালীর জনগণ সর্বত্র উল্লাস প্রকাশ করিলেন।

১। দি লাস্ট ডেইজ অব মুসোলিনী, পৃষ্ঠা ৩২৭।
২। ডুচে—রিচার্ড কলিয়ার, পৃষ্ঠা ৩৭১।
৩। চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬০।

নবম পর্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিটলারের আত্মহত্যা : ইভা ব্রাউনের সহমরণ

৫ এপ্রিল, ১৯৪৫, ইভা ব্রাউন বার্লিনে আসিলেন হিটলারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। কিন্তু কে এই ইভা ব্রাউন, যাকে আগের অধ্যায়ে হিটলারের প্রণয়িনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও ১২ বছরের অধিককাল ধরিয়া ইভা হিটলারের প্রণয়িনী ছিলেন, তবু জার্মানীর খুব কম লোকই তাঁর নাম জানিতেন এবং তার চেয়েও কম লোক হিটলারের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানিতেন। কারণ, ইভা সর্বদা আড়ালেই থাকিতেন এবং হিটলার তাঁকে প্রকাশ্যে আনিতেন না, কিংবা প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে দিতেন না। এবং পাঠকবর্গ জানিয়া হতাশ হইবেন যে, তিনি কোন ইতিহাসের নায়িকা ছিলেন না কিংবা যুদ্ধ ও বিপ্লবের দিনে যেমন বীর পুরুষদের নামের সঙ্গে সময় সময় খুব নাম-করা সুন্দরী এবং বুদ্ধিতে ও হাস্যে-লাস্যে উজ্জ্বল কোন কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলার কথা শুনা যায়, ইভা ব্রাউন আদৌ সেই জাতের মেয়ে ছিলেন না। তাঁর কোন "গ্লামার" ছিল না। কিন্তু তিনি সুশ্রী ও দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল সবল সুঠাম এবং কেশ ছিল চম্পকবর্ণ। তথাপি জার্মানীর এতবড় রণপ্রভুর সঙ্গিনী হওয়ার মত যোগ্যতা বা গুণাবলীও তাঁর ছিল না। হিটলার ছিলেন তাঁর চেয়ে ২৩ বছরের বড়। তবু আশ্চর্য এই যে, ইভা ও হিটলার পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং ইভা ব্রাউনের মত একটি সাধারণ মেয়ে হিটলারের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে সহমরণ যাত্রার সময় পর্যন্ত সর্বত্র পরিচিত লাভ করিলেন এবং ইতিহাসে একটা স্থান করিয়াও লইলেন।

ইভা ব্রাউনের জন্ম ব্যাভেরিয়ার একটি নিম্নবিত্ত সাধারণ পরিবারে : তাঁর পিতা ছিলেন একজন স্কুল মাস্টার। কিন্তু তাঁর বাবা ও মা গোড়ার দিকে হিটলারের সঙ্গে তাঁর "অবৈধ সম্পর্কের„ ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। হোক না হিটলার জার্মানীর সর্বময় প্রভু, তবু তাঁর সঙ্গে এই ধরনের অবৈধ সম্পর্ক আপত্তিকর। মিউনিকের হেনরিক হফম্যান (Heinrich Hoffmann) ১৯২২ সাল থেকে হিটলারের প্রধান ফটোগ্রাফার ছিলেন এবং ইভা ব্রাউন তাঁর সেই স্টুডিওতে কাজ করিতেন ফটোগ্রাফার হফম্যানই একদিন ফুরারের সঙ্গে ইভার পরিচয় করাইয়া দেন এবং ফুরার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এর আগে হিটলার গেলি রাউবল নাম্নী তাঁর ভাগ্নীর সঙ্গে "বিষম -প্রেমে" পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ বিচ্ছেদ ও অন্যান্য কারণে সেই মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়াছিল এবং এই ঘটনারই দুই-এক বছর পরে ইভা ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের পরিচয় ঘটিয়াছিল।—[১]

ইভা যদিও হিটলারের আলপাইন পার্বত্য নিবাসের মনোরম ভিলাতে বাস-করিতেন, তবু দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইত না। কারণ, হিটলারের ছিল

১। উইলিয়াম শাইরার—পৃষ্ঠা ১০১৯।

অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবন। এই ধরণের দীর্ঘ বিচ্ছেদ মাঝে মাঝে ইভার কাছে অসহ্য মনে হইতে। সুতরাং তিনিও হিটলারের আগেকার প্রণয়িনীর মত দুইবার আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অবশ্য ক্রমে ক্রমে এই দীর্ঘ বিচ্ছেদ তাঁর গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। মাসের-পর-মাস যুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলিতে হিটলার থাকিতেন তাঁর বিভিন্ন রণশিবিরে সেনাপতি, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যস্ত। সুতরাং এই সমস্ত শিবিরে বা সদর দপ্তরে তার যাতায়াত ছিল নিষিদ্ধ। সুতরাং নিরুপায় ইভা ব্রাউন ওবারস্যালজবার্গের বের্গহোফ্ ভিলাতে সস্তা ও চটকদার উপন্যাস পড়িয়া কিংবা বাজে ফিল্ম দেখিয়া কিংবা সাঁতার কাটিয়া ও স্কী খেলিয়া দিন কাটাইতেন। কোন কোন সময় নৃত্যও করিতেন। কিন্তু হিটলার সেটা পছন্দ করিতেন না। বার্লিনে পর্যন্ত তাঁকে কদাচিৎ আসিতে দেওয়া হইত। সুতরাং তাঁর দীর্ঘ বিরহের দিনগুলি ছিল বিষণ্ণ। হিটলারের মোটর গাড়ীর চালক এরিক কেম্পকা (Erich Kempka) বলিতেন যে, জার্মানীতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে অসুখী স্ত্রীলোক। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় হিটলারের প্রতিক্ষায় কাটাইয়া দিয়াছেন। ফিল্ড মার্শাল কাইটেল ন্যুরেমবার্গের আদালতে বলিয়াছিলেন যে, ইভা ব্রাউন ছিলেন পরিচ্ছন্ন, মিষ্টি স্বভাবের স্ত্রীলোক। তার পা দুটি খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু তিনি সর্বদাই আড়ালে থাকিতেন, কদাচিৎ তাঁকে বাইরে দেখা যাইত।

সুতরাং মর্যাদার দিক থেকে ব্রাউন হিটলারের পত্নীও ছিলেন না, উপপত্নীও ছিলেন না—ছিলেন দুর্লভ মুহূর্তের সঙ্গিনী।[১] ইভা কিন্তু হিটলারকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালোবাসিতেন এবং তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিলেন। হিটলারের ব্যক্তিত্বের দ্বারা ইভা একেবারে আচ্ছন্ন ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে হিটলারের একজন নামজাদা মন্ত্রী আলবার্ট স্পীর লিখিয়াছিলেন যে, পুরাতন পার্টি সহচরদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সময় ইভা ব্রাউনকে উপস্থিত দেখা যাইত বটে, কিন্তু যে মুহূর্তে রাইখের পদস্থ সম্মানভাজন ব্যক্তিগণ, যেমন—ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রভৃতি দেখা করিতে আসিতেন, ইভা ব্রাউনকে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে হইত। এমন কি গোয়েরিং এবং তাঁর পত্নী যখন আসিতেন, তখনও ইভাকে তাঁর ঘরের মধ্যে অবস্থান করিতে হইত। অর্থাৎ হিটলার তাঁকে খুব সংকীর্ণ সামাজিক গণ্ডীর বাইরে গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন না। হিটলারের শয়ন কক্ষের পাশের ঘরে যেন তাঁকে আটক বন্দীর মত থাকিতে হইত। ইভা এত ভয় পাউতেন যে, সাহস করিয়া ঘরের বাইরে একটু বেড়াইতে যাইতেও পারিতেন না, হিটলার তাঁর মনোভাবের প্রতি সামান্যই সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন। এমন কি, তাঁর উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াই হিটলার একদিন নারীজাতি সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন ঃ

'একজন প্রখর বুদ্ধিমান লোক কি কোন আদিম বোকা মেয়েমানুষকে গ্রহণ করিতে পারে ? ভেবে দেখুন সমস্ত কিছুর উপরে যদি কোন স্ত্রীলোক আমার কাজ-কর্মে হস্তক্ষেপ করতো ! আমার অবসর সময়ে আমি শান্তি চাই···কিন্তু বিয়ে করা কখনও আমার পোষাবে না। যদি আমার একগাদা ছেলেমেয়ে থাকতো, তা' হলে আমার কি সমস্যা দাঁড়াতো, তা-ও চিন্তা করে দেখুন।'···

'আমি অবিবাহিত, এজন্য বহু নারী আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। আমার

১। পূর্বোধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৩২০

আন্দোলনের দিনগুলিতে অবশ্য এর খুব উপযোগিতা ছিল। এ যেন সিনেমার কোন অভিনেতার বিয়ে করার মত। যে সমস্ত মেয়ে আগে তাঁকে পুজো করতো, বিয়ের পর থেকেই তাদের সেই আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে থাকতো। আগের মত সে আর তাদের কাছে উপাস্য দেবতার মত থাকত না।'

আলবার্ট স্পীর বলিতেছেন—'হিটলার বিশ্বাস করিতেন যে, স্ত্রীলোকদের কাছে তাঁর খুব যৌন আবেদন আছে। কিন্তু তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না যে, তাঁর এই আবেদন চ্যান্সেলর হিসাবে কিংবা এ্যাডলফ হিটলার হিসাবে। মহিলাদের উপস্থিতিতেই তিনি রূঢ়ভাবে মন্তব্য করিতেন যে, তিনি তাঁর চারিপাশে খুব রসিকা ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক পছন্দ করেন না।'

ইভা ব্রাউনের রাজনীতিতে কোন আগ্রহ ছিল না এবং হিটলারের উপর তিনি কোন প্রভাব খাটাইতেও চাহিতেন না। কোন কোন সময় তরুণ সৈন্যদের সঙ্গে তিনি গভীর আগ্রহে নৃত্য করিতেন বটে, কিন্তু তিনি কোন মতেই আধুনিক পম্পাদুর (১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের উপপত্নী, প্রভাব প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক বুদ্ধিতে যিনি অসাধারণ ছিলেন) ছিলেন না। সেদিক থেকে ইতিহাসে তাঁর কোন স্থান ছিল না।—[১]

আমাদের দেশে এবং পশ্চিমেরও কোন কোন মহলে এককালে প্রচলিত ছিল যে, হিটলার "ব্রহ্মচারী" গোছের মানুষ ছিলেন। তাঁর যেমন কোন নেশা ছিল না, তেমনি কোন নারীর সঙ্গে তার কোন দৈহিক সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু এই ধারণা ভুল। মহাযুদ্ধের পর পশ্চিমের পত্র-পত্রিকায় ইভা ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের দৈহিক কিংবা যৌন সম্পর্কের কথা স্বীকার করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, জীবনের শেষ মুহূর্তে ইভার সঙ্গে বিবাহের কয়েক বছর আগেই এই দৈহিক সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ অবৈধ সংসর্গ ছিল।

* * *

হিটলারের নির্দেশগুলি ডোয়েনিৎস, শোয়েরনার ও কেসেলরিং এই তিন সামরিক পুরুষকে স্ব স্ব দপ্তরে পেঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ২৮শে এপ্রিল রিটার ফন গ্রীম ও মহিলা পাইলট রিৎস যখন বাংকার থেকে বার্লিন ত্যাগ করিয়া আকাশ পথে উড়িয়া গেলেন, তখন রুশ গোলন্দাজি আক্রমণে সেই বিমানটি 'পাখীর পালকের মত হেলিতেছিল, দুলিতেছিল।' তাঁরা ২০ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেলেন রুশ আক্রমণ এড়াইবার জন্য এবং তাঁরা নীচে তাকাইয়া দেখিলেন রাজধানী বার্লিন যেন আগুনের সমুদ্রে জ্বলিতেছে।···

বার্লিনের পূর্বদিকে জার্মানদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া রুশ সৈন্যরা দুর্বার গতিতে আগাইয়া যাইতে লাগিল এবং ফুরারের ভূগর্ভের আশ্রয়ের উপর লালফৌজের গোলাগুলি ও বোমা পড়িতে লাগিল। তখন জার্মানীর ধ্বংস এবং নিজের আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দেহে-মনে বিধ্বস্ত হিটলার ঘোষণা করিলেন "ইভা ব্রাউন" বার্লিনে আসিয়াছেন আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। যে নারী দীর্ঘকাল বিধ্বস্ত বন্ধুত্বের পর আমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের সংকল্প করিয়াছেন, তাঁকে আমি যথারীতি বিবাহ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। কারণ, তিনি আমার স্ত্রী

১। Inside the Third Reich—Albert Speer P. 144-146.

হিসাবেই সহমরণে যাইতে প্রস্তুত। সুতরাং আমরা দুইজনেই চাই আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের দুইজনের দেহ যেন দাহ এবং ভস্মীভূত করা হয়।' 'হিটলার আরও বলিলেন যে, তিনি চান না, তাঁর দেহ জীবিত বা মৃত অবস্থায় শত্রুর হাতে পড়ুক।

যুদ্ধের অস্বাভাবিক ও বিপজ্জনক অবস্থার জন্য ২৮শে এপ্রিল রাত্রি ১টা থেকে ৩টার মধ্যে (ইংরাজী মতে ২৯শে এপ্রিল) হিটলার অত্যন্ত সাধারণ ও সরল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইভা ব্রাউনকে বিবাহ করিলেন। গোয়েবেলস্ ভাল্টার ভাগনার (Walter Wagner) নামে একজন সরকারী প্রশাসককে এই অভিনব বিবাহে "পৌরোহিত্য" করার জন্য ডাকিয়া আনিলেন এবং সেই বেচারা অকস্মাৎ এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। তিনি ছাড়া এই বিবাহের আরও সাক্ষী ছিলেন গোয়েবেলস এবং বোরম্যান। বাঙ্কারের প্রাইভেট অংশে একটি ছোট্ট ম্যাপরুমে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। বর ও কনে উভয়েই দিব্য করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তাঁরা সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ আর্যবংশ সম্ভূত এবং বিবাহ বাতিল হইয়া যাওয়ার মত তাঁদের কোন বংশগত রোগ নেই, তাঁরা স্বেচ্ছায় পরস্পরকে বিবাহের সম্মতি দিতেছেন। অতঃপর তাঁরা রেজিস্টারে নাম স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু কনে তাঁর নাম স্বাক্ষর করিতে গিয়া প্রথমে লিখিলেন "ইভা ব্রাউন" কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুল সংশোধনপূর্বক 'বি' অক্ষরটি কাটিয়া দিয়া লিখিলেন "ইভা হিটলার,,—জন্মগত পদবী ব্রাউন।

এতদিনে ইভা ব্রাউন জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া হিটলারের পত্নী হিসাবে আইনগত স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করিলেন। এখন থেকে তিনি হইলেন "ফ্রাউ হিটলার।" এই সংক্ষিপ্ত বিবাহ অনুষ্ঠানের পর বিবাহ উপলক্ষে একটি ভোজের ব্যবস্থা হইল এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন বোরম্যান, গোয়েবেলস ও ফ্রাউ (মিসেস) গোয়েবেলস, হিটলারের দুইজন মহিলা সেক্রেটারি ও নিরামিষ রাঁধুনী এবং পরে আসিয়া যোগ দিলেন জেনারেল ক্রেবব, জেনারেল বার্গডারফ প্রভৃতি। অতিথিরা আনুষ্ঠানিকভাবে শ্যাম্পেন পান করিলেন এবং কিছুক্ষণের জন্য জার্মানীর ভয়াবহ অবস্থার কথা ভুলিয়া গিয়া পুরানো দিনের কিছু আনন্দের কথা নিয়ে আলোচনা করিলেন যে, ন্যাশনাল সোসিয়েলিজম শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁর পুরাতন বন্ধুরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ নাই। অতিথিদির কেহ কেহ এই সময় অশ্রুসিক্ত চোখে নিঃশব্দে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন হিটলারও পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন এবং তাঁর একজন সেক্রেটারি ফ্রাউ গার্টরুড জঙকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হিটলার তাঁর নিকট তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র বা উইল ডিক্টেট্ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি দুইটি দলিল তৈয়ার করিলেন—একটি ব্যক্তিগত এবং অপরটি রাজনৈতিক। এই দলিলে মিথ্যা, অর্ধমিথ্যা, অপপ্রচার, নাৎসী মতবাদের গুণগান, ইতিহাসের বিকৃতি ইত্যাদি ঘটাইলেন এবং নিজের ব্যর্থতার জন্য অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইলেন। তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তিনি তাঁর "শেষ আবেদন" রাখিয়া গেলেন।...

রাজনৈতিক দলিলের দুইটি অংশ ছিল। প্রথমটি সাধারণ রকমের এবং দ্বিতীয়টি সুনির্দিষ্ট ধরনের।

রাজনৈতিক দলিলের গোড়াতেই তিনি যুদ্ধের জন্য সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করিলেন : 'একথা সত্য নয় যে, আমি কিংবা জার্মানীতে অপর কেহ ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ

চাহিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে প্ররোচনা দিয়াছিলেন কিংবা এই যুদ্ধ চাহিয়াছিলেন একমাত্র সেই সমস্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ, যাঁরা ইহুদীবংশ সম্ভূত কিংবা যাঁরা ইহুদীদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কাজ করিতেছিলেন। নিরস্ত্রীকরণের জন্য আমার সর্বপ্রকার প্রস্তাবের পর ভবিষ্যৎ বংশধরগণ নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে যুদ্ধের দায়িত্ব চাপাইয়া দিতে পারিবেন না।…শতাব্দীর-পর-শতাব্দী চলিয়া যাইবে, আমাদের শহরগুলি ধ্বংসস্তূপ ও স্মৃতিস্তম্ভ হইতে সেই সমস্ত লোকের প্রতি ঘৃণা সর্বদাই নতুন করিয়া দেখা দিবে, যারা শেষ পর্যন্ত এর জন্য দায়ী ছিল। আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ ও সেই মতবাদের সাহায্যকারী যারা তাদেরকে এজন্য আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

অতঃপর হিটলার পোলিশ-জার্মান যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ গবর্নমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বলিলেন যে, যুদ্ধের তিন দিন আগেও তিনি পোলিশ-জার্মান সমস্যার একট যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের শাসকচক্র এই যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন একদিকে বাণিজ্যিক কারণে এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ইহুদী-বাদের প্রোপাগাণ্ডার চাপে।

যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বোমাবিধ্বস্ত শহরগুলিতে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য এবং তাঁর নিজ হাতে ইহুদীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য সমস্ত দায়িত্ব তিনি ইহুদীদের ঘাড়েই চাপাইয়া দিলেন। তারপর তিনি বর্ণনা করিলেন কেন তিনি বার্লিনে অবস্থানের জন্যই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঃ

'After six years of war, which inspite of all setbacks will one day go down in history as the most glorious and heroic manifestation of the struggle for exietence of a natian, I can not forsake the city that is the Capital of this State…I wish to share my fate with that which millions of others have also taken upon themselves by staying in the town…

I have therefore decided to remain in Berlin and then to choose death voluntarily…I die with a joyful heart in the knowledge of the immeasurable deeds and achievements of our peasants and workers and of a contribution unique in history of our youth which bears my name.'[১]

অর্থাৎ—'সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ৬ বছর ধরিয়া সংগ্রামের পর এই যুদ্ধ একটা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হিসাবে নিশ্চয়ই একদিন ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবান্বিত এবং সাহসিকতাপূর্ণ বলিয়া চিহ্নিত হইবে। যে শহর এই রাষ্ট্রের রাজধানী তাকে আমি ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না।…যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ লোক এই শহরে অবস্থান করিয়া নিজেদের ভাগ্যকে জড়াইয়াছেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে সেই একই ভাগ্যের অংশীদার হইতে চাই।…

সুতরাং আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি বার্লিনে অবস্থানের এবং সেখানে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের…আমি অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে মৃত্যু বরণ করিতেছি। কারণ, আমি জানি যে, আমাদের কৃষকেরা এবং শ্রমিকেরা অপরিমেয় কর্ম সম্পাদন ও উদ্‌যাপন করিয়া

১। Shirer, P. 1336.

গিয়াছেন এবং আমার নামের সঙ্গে যুক্ত যুববাহিনীর ইতিহাসে অপূর্ব অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।'

দলিলের শেষের দিকে তিনি জার্মানদেরকে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন এবং ভরসা দিলেন যে, জার্মান সৈন্যদের এবং তাঁর নিজের ত্যাগ স্বীকারের ফলে যে বীজ বপন করা হইল, তাতেই একদিন জাতীয় সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের এবং একটা সত্যকার ঐক্যবন্ধ জাতির পুনর্জন্ম ঘটিবে।

বর্তমান যুদ্ধে জাতির এই বিপর্যয়ের জন্য হিটলার আর্মি এবং তার অফিসার বাহিনীকে দায়ী ও নিন্দা করিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য এই উপদেশ দিলেন যে, কোন ভূমি বা স্থান ত্যাগ করার চেয়ে মৃত্যুবরণ বরং বাঞ্ছনীয়।...

এই রাজনৈতিক টেস্টামেন্টের দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের তুলনায় আরও বেশী কঠোর এবং নিন্দাত্মক ছিল। এই বিবৃতির গোড়াতেই বলা হইল ঃ

'আমার মৃত্যুর আগে আমি পার্টি থেকে প্রাক্তন রাইখ মার্শাল হেরমান গোয়েরিংকে বিতাড়িত করছি এবং ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর রাইখস্ট্যাগে আমার বক্তৃতায় এবং ১৯৪১ সালের ২৯ জুন আমার এক ডিক্রির দ্বারা গোয়েরিংয়ের হাতে যে সমস্ত অধিকার অর্পণ করিয়াছিলাম, সেগুলি প্রত্যাহার করিয়া নিতেছি। তাঁর শূন্যস্থানে আমি গ্রান্ড অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎসকে রাইখের প্রেসিডেন্ট এবং সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সুপ্রীম কমান্ডার পদে নিয়োগ করিতেছি।'

গোয়েরিংয়ের পর হিমলারের পালা। কারণ, হিমলারও যে, পশ্চিমের মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই সংবাদও ইতিমধ্যে হিটলারের নিকট পৌঁছিয়াছিল। অতএব হিমলারকেও অনুরূপভাবে পদচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত করা হইল। যেহেতু রাজনীতিকরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, আর্মি (স্থলবাহিনী) তাঁর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে, এস. এস. বাহিনী তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সুতরাং সেই অবস্থায় একমাত্র নৌবাহিনীর নায়ক তাঁর উত্তরাধিকার পাইবেন। যদিও নেভি বা নৌবাহিনীর কার্যকলাপ সর্বদাই খুব উচ্চস্তরের ছিল না। তথাপি অন্তত তাঁরা নাৎসীবাদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ভবিষ্যতে জার্মান আর্মি অফিসারেরা যেন নেভির মত সম্মানার্হ হইতে পারেন।...'

অর্থাৎ হিটলারের পর কে ?—উত্তরাধিকারের এই জটিল প্রশ্নটির এভাবে মীমাংসা করা হইল—নৌঅধিনায়কের হাতে ক্ষমতা অর্পণের দ্বারা। তাঁর ইচ্ছাপত্রে বা টেস্টামেন্টে আবার ঘোষণা করা হইল ঃ

'আমার মৃত্যুর আগে আমি হেইনরিখ হিমলারকে পার্টি থেকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে, এস. এস. রাইখ ফুরারের এবং অন্যান্য সমস্ত দপ্তর থেকে বিতাড়িত করছি। তাঁর পরিবর্তে পার্টি-প্রশাসক কার্ল হ্যাঙ্কেকে (Karl Hanke) রাইখফুরার এস. এস. এবং জার্মান পুলিশের প্রধান পদে এবং পার্টি প্রশাসক পল গিজলারকে (Paul Giesler) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করছি।

'গোয়েরিং ও হিমলার আমার অজ্ঞাতসারে এবং আমার বিনা অনুমতিতে শত্রুর সঙ্গে গোপনে আলোচনা করিয়াছেন, রাষ্ট্রের ক্ষমতা অবৈধভাবে দখলের চেষ্টা করিয়াছেন —কেবল ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় নাই, আমাদের দেশ এবং আমাদের সমগ্র জনগণের প্রতিও অপরিমিত কলঙ্কের কারণ ঘটানো হইয়াছে।'

এভাবে বিশ্বাসঘাতকদের ব্যবস্থা করিয়া এবং তাদের স্থানে নতুন উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিয়া হিটলার তাঁর অবর্তমানে একটি নূতন গবর্নমেণ্টও গঠন করিয়া গেলেন। জার্মান জাতি যাতে এই যুদ্ধ সর্বাত্মকভাবে চালাইয়া যাইতে পারেন, সেজন্য সম্মানার্হ লোকদের দ্বারা একটি গবর্নমেণ্ট গঠন করা হইল এবং ১৯টি ক্যাবিনেট পদে তিনি তাঁর নিজস্ব লোকদের মনোনীত করিলেন। যদিও নিয়মানুসারে এই দায়িত্ব বর্তানো উচিত ছিল পরবর্তী গবর্নমেণ্টের উপর, তথাপি হিটলার পছন্দসই লোক নিয়োগ করিয়া গেলেন। ডোয়েনিৎকে রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট, সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডার, যুদ্ধমন্ত্রী ও নৌ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করা ছাড়াও হিটলার তাঁর অন্যান্য গোঁড়া ভক্তদেরকেও নূতন ক্ষমতার পদে নিয়োগ করিলেন। যেমন, গোয়েবেলসকে করা হইল রাইখের চ্যান্সেলর, মার্টিন বোরম্যানকে পার্টি চ্যান্সেলর, অস্ট্রিয়ার কুইসলিং ও হল্যাণ্ডের পীড়নকারী সেইস-ইনকোয়ার্টকে (Seyss-Inqart) পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করা হইল হইল। অর্থাৎ একদা হিটলার যে রিবেন্ট্রপকে জার্মানীর দ্বিতীয় বিসমার্ক (রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের পর) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাঁর সেই প্রিয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীকেও জীর্ণ-বস্ত্রের মত ত্যাগ করা হইল। আর ফিল্ড মার্শাল শোয়েরনারকে সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করা হইল। কারণ, হিটলারের তখনও আশা ছিল যে, শোয়েরনার হয়তো বোহেমিয়ার প্রতিরক্ষার যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করিতে পারিবেন। রিবেন্ট্রপের মত আলবার্ট স্পীরকেও (অস্ত্রসজ্জার মন্ত্রী) নূতন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হইল।

উইলের মধ্যে হিটলার তাঁর শেষ নির্দেশ দিয়া গেলেন যে, যাঁদের উপর রাইখের নূতন ভার অর্পণ করা হইল, তারা সর্বতোভাবে নাৎসী প্রশাসন, নাৎসী যুদ্ধ এবং নাৎসীবাদকে রক্ষা করিবেনই। 'সর্বোপরি তাঁরা অত্যন্ত কঠোরতাবে রক্ষা করিবেন জাতি সংক্রান্ত আইগুলিকে (racial laws) এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রতিহত করিবেন সারা দুনিয়ার জাতিসমূহের বিষদানকারী আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদকে।'

মৃত্যুর আগেও হিটলারের জাতিবিদ্বেষ কি ভয়ংকর ছিল, উইলের এই কথাগুলি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

উপরের বর্ণিত এই রাজনৈতিক উইলের পর হিটলারের ব্যক্তিগত উইল তেমন কিছু চমকপ্রদ ছিল না। এই উইলের দ্বারা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি পার্টিকে এবং পার্টি না থাকিলে রাষ্ট্রকে দান করার নির্দেশ দিলেন। যদি রাষ্ট্রও না থাকে, তা' হলে কি হইবে, সে কথা আর তিনি উল্লেখ করিলেন না। যে সমস্ত চিত্রকলা তাঁর সংগ্রহশালায় ছিল, সেগুলির দ্বারা তিনি তাঁর জন্মভূমি লিঞ্জ (দানিয়ুব নদী তীরস্থ) শহরে একটি পিকচার গ্যালারি স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন এবং উইলের একজিকিউটার হিসাবে নিযুক্ত করিলেন মার্টিন বোরম্যানকে। ইভা ব্রাউনের মাকে এবং হিটলারের ব্যক্তিগত কর্মচারী ও সহকারীদিগকে হিটলারের সম্পত্তি থেকে দান করার অধিকারও মার্টিন বোরম্যানকে দেওয়া হইল।

উইলের উপসংহারে হিটলার পুনরায় ঘোষণা করিলেন যে, আত্মসমর্পণ বা পরাজয়ের লজ্জা এড়াইবার জন্য তিনি ও তাঁর স্ত্রী স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিতেছেন। ১২ বছর ধরিয়া তিনি যেখানে রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা করিয়াছেন, সেখানেই যেন অবিলম্বে তাঁদের দুইজনের মৃতদেহ দাহ করা হয়।

ভোর রাত্রি ৪টার সময় দলিলগুলি প্রস্তুত এবং স্বাক্ষরিত হইল। প্রত্যেকটি দলিলের তিনটি করিয়া কপি প্রস্তুত হইল। কারণ, এগুলি জার্মানীর নিকট এত মূল্যবান ছিল যে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যেন এগুলি থেকে বঞ্চিত না হয়। দলিলের সাক্ষী রহিলেন গোয়েবেলস, বোরম্যান, ক্রেবস এবং বার্গডোরফ।

দলিল স্বাক্ষরের পর হিটলার বিশ্রাম করিতে গেলেন।[১]

কিন্তু বোরম্যান ও গোয়েবেলসের বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। কারণ, বোরম্যান অত্যন্ত ক্ষমতালোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক ছিলেন। তিনি এই সুযোগে তাঁর মতলব হাসিল করিতে চাহিলেন। আর গোয়েবেলস্ হিটলারের প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে, ফুরারের মৃত্যুর পর তিনি আর বাঁচিয়া থাকিতে চাহিলেন না। সুতরাং দুইজনে দুই ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেন।

বোরম্যান বার্সেটস্‌গ্যাডেনে আগেই নির্দেশ পাঠাইয়া গোয়েরিং ও তাঁর দলবলকে এস. এস. বাহিনীর দ্বারা গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। এক্ষণে আর-একটি রেডিও-বার্তা পাঠাইয়া তিনি এস. এস. সদর দপ্তরকে হুকুম দিলেন '২৩শে এপ্রিলের বিশ্বাসঘাতক-দিগকে'—অর্থাৎ গোয়েরিং এবং তাঁর বিমানবাহিনীর স্ট্যাফকে খতম করার জন্য।

কিন্তু সদর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি বোরম্যানের এই ধরনের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিলেন না। সুতরাং গোয়েরিং ঘাতকের হাত থেকে বাঁচিয়া গেলেন এবং বোরম্যানের মতলব ফাঁসিয়া গেল।

অপরদিকে গোয়েবেলস এবং তাঁর পত্নী আগেই স্থির করিয়াছিলেন যে, হিটলার-শূন্য জার্মানীতে তাঁরা বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন না। সুতরাং হিটলারের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি ফুরারের রাজনৈতিক উইলের সঙ্গে একটি নিজস্ব পরিশিষ্ট জুড়িয়া দিলেন এবং তাতে ঘোষণা করিলেন যে, জীবনে তিনি কোন দিন ফুরারের একটি আদেশও অমান্য করেন নাই। এবার তিনি ফুরারের শেষ আদেশ অমান্য করিতে কিন্তু বাধ্য হইলেন। কেননা, ফুরারের মৃত্যুর পর তাঁর এবং তাঁর পরিবারের আর বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং তাঁরাও বার্লিনের ভূগর্ভে থাকিয়া মৃত্যুবরণ করিবেন। ভোর সাড়ে-পাঁচটার সময় ডঃ গোয়েবেলস তাঁর এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিলেন।...

২৯শে এপ্রিল বেলা ৮টার সময় তিনজন বিশেষ দূত মারফত রুশ লাইন ভেদ করিয়া হিটলারের এই মূল্যবান দলিলগুলি ফিল্ড মার্শাল শোয়েরনার এবং গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎসের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। দুপুরবেলা এই তিন জন বিশেষ দূত ভয়ংকর বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়া তাঁদের গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হইয়া গেলেন। বলাবাহুল্য যে, সোভিয়েত বেষ্টনী ভেদ করিয়া তাঁদের এই দুর্গম যাত্রা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল।

হিটলার শেষ মুহূর্তে ২৯শে এপ্রিল রাত্রে সামরিক হাইকমাণ্ডের প্রধান ফিল্ড মার্শাল কাইটেলের নিকট একটি পত্র পাঠাইবার সংকল্প করিলেন। তখন সম্মিলিত জেনারেল স্টাফের সদর দপ্তর ছিল Schleswing-Holstein বা শেলসভিগ হলস্টেইন প্রদেশের প্লোয়েন (ploen) শহরে। হিটলারের নির্দেশে কর্নেল ফন বিলো (Below) কাইটেলের দপ্তরে এই চিঠি ডেলিভারি দেওয়ার জন্য বার্লিনের সেই বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যেও রওনা হইয়া গেলেন। এই শেষ চিঠিতেও হিটলার যথারীতি বিশ্বাসঘাতকতার

১। ট্রেভর রোপার, পৃষ্ঠা ১৪১-৪৩।

অভিযোগ করিলেন। সেনাপতি ও পদস্থ ব্যক্তিদের নিন্দা করিলেন, কিন্তু সাধারণ জার্মান সৈন্য ও জনগণের অপরিমিত ত্যাগস্বীকারের উচ্চ প্রশংসা করিলেন। চিঠির উপসংহারে তিনি তাঁর "মেইন ক্যাম্পফের" (আত্মজীবনী) বর্ণিত জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পুনরাবৃত্তি করিয়া লিখিলেন :

'এই যুদ্ধে জার্মান জনগণ যে অদ্ভুত ত্যাগস্বীকার করিয়াছে, তাতে আমি বিশ্বাস করি না যে, এই ত্যাগস্বীকার বৃথা গিয়াছে। বরং এখনও আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত জার্মান জনগণের জন্য পূর্বদিকে ভূমি দখল করা।'—[১]

অর্থাৎ হিটলার তাঁর জীবনের সর্বাত্মক সর্বনাশের মুখে দাঁড়াইয়াও পররাজ্য গ্রাস এবং সোভিয়েতের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিতে পারিলেন না !

* * *

কাইটেলের উদ্দেশ্যে লেখা হিটলারের শেষ চিঠি নিয়া কর্নেল ফন বিলো যখন বার্লিনের বাংকার থেকে রওনা হইয়া গেলেন, হিটলার তার আগেই জীবনের অন্তিম মুহূর্তের জন্য তৈরী হইতেছিলেন। কিন্তু সেদিন ২৯শে এপ্রিল অপরাহ্ণে হিটলারের নিকট আর-একটা ভয়ংকর দুঃসংবাদ পেঁাছিল। তাঁর এতদিনের সহযোদ্ধা ও মিত্র এবং ইটালীর প্রাক্তন ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর বেনিটো মুসোলিনী তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চিসহ উত্তর ইটালীর পার্টিজান যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়িয়া নিহত হইয়াছেন। (পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। হিটলার সম্ভবতঃ মুসোলিনীর নিধন হওয়ার বিস্তৃত সংবাদ জানিতেন না। কিন্তু যতটুকু জানিলেন, ততটুকুই তাঁর আত্মনাশের ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অপরাহ্ণে তিনি তাঁর প্রিয় আলশেসিয়ান কুকুর ব্লণ্ডিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিলেন। অবশ্য তিনি নিজ হাতে এই কাজ করেন নাই। তাঁর এক সার্জেনকে দিয়া বিষপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। বাংকারের অন্য দুইটি কুকুরকেও গুলি করিয়া মারা হইল।

তারপর হিটলার তাঁর দুই মহিলা সেক্রেটারিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্য তাঁদের দুইজনকে দুই বিষের বড়ি দিলেন। অবশ্য ফুরার বিষণ্ণচিত্তে মন্তব্য করিলেন যে, বিদায়লগ্নে তিনি এর চেয়ে কোন ভালো উপহার দিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদেরকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিলেন যে, তাঁর জেনারেলদের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছেন।

ক্রমেই হিটলারের জীবনের শেষ সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। তিনি তাঁর সেক্রেটারি গার্টরুড জুঙকে তাঁর অবশিষ্ট দলিলপত্র পোড়াইয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন এবং সেই সঙ্গে এই নির্দেশ দিলেন যে, পরবর্তী আদেশ না-পাওয়া পর্যন্ত বাংকারের কেউ যেন ঘুমাইতে না যান। স্বভাবতঃই সকলে ভাবিলেন যে, এবার তিনি শেষ বিদায় নিবেন, কিন্তু ৩০শে এপ্রিল রাত্রি আড়াইটার আগে তেমন কিছু ঘটিল না। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিয়াছেন যে, ফুরার ঐ সময় তাঁর প্রাইভেট কক্ষ থেকে সাধারণ ভোজনাগারের দিকে গেলেন। সেখানে তখন জনা-কুড়ি লোক, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিটলারের পার্শ্বচর ও মহিলা, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হিটলার করমর্দন করিলেন এবং অস্পষ্ট-স্বরে কিছু বলিলেন। তাঁর চোখ তখন বাষ্পার্দ্র ছিল। ফ্রাউ জুঙের মতে 'হিটলারের

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৯৫।

চোখ তখন বাঙ্কারের প্রাচীর ভেদ করিয়া বহুদূরে তাকাইয়াছিল'। এরপর হিটলার পুনরায় তাঁর কক্ষে চলিয়া গেলেন।

তখন আচম্বিতে এক তাজ্জব দৃশ্যের অবতারণা হইল! বাঙ্কারের পাতালপুরীর ক্যান্টিনে বাকী লোকগুলি জড়ো হইয়া উদ্দাম নৃত্যে জুড়িয়া দিল। তারা যেন মরীয়া হইয়া উঠিল, কেননা যে কোন মুহূর্তে তারা রুশদের হাতে পড়িয়া খুন হইতে পারে। এদিকে হিটলারের বজ্রমুষ্টি শাসনও আর নাই। সুতরাং তারা যা খুশী তাই করিতে পারে। এক সময় সেই উদ্দাম উল্লাস এত বাড়িয়া উঠিল যে, ফুরারের কক্ষ থেকে সেই উল্লাস কমাইবার নির্দেশ আসিল। কিন্তু সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য হইল এবং সারারাত্রি ধরিয়া তারা নাচিতে লাগিল।—[১]

এদিকে বার্লিনেরও মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। কারণ, পরদিন রুশ সৈন্যরা চ্যান্সেলারির মাত্র কয়েক মহল্লা দূরে আসিয়া পেঁছিল। কিন্তু এই অবস্থায়ও কিছু কিছু সেনাপতি বাঙ্কারে আসিয়া সামরিক রিপোর্ট দিলেন—যদিও রিপোর্ট দেওয়ার কিছুই ছিল না। কারণ, বার্লিন রক্ষার আর কোন উপায়ও ছিল না। হিটলার নির্বিকার-চিত্তে এই বিপর্যয়কর অবস্থার কথা শুনিলেন এবং অন্তিম লগ্নের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বেলা প্রায় ২টায় সময় তিনি তাঁর লাঞ্চ খাইলেন। কিন্তু তাঁর সদ্য বিবাহিতা ইভার কোন ক্ষুধা ছিল না। সুতরাং হিটলার যথারীতি তাঁর দুই সেক্রেটারি ও পাচিকার সঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ আহার গ্রহণ করিলেন। কোন কথাবার্তা তিনি বলিলেন না।

বেলা আড়াইটা নাগাদ হিটলারের এস. এস. এ্যাডজুটান্ট চ্যান্সেলারির গ্যারেজের ভারপাপ্ত কর্মচারী ও হিটলারের ব্যক্তিগত সোফার এরিক কেম্পকাকে নির্দেশ পাঠাইলেন চ্যান্সেলারির বাগানে ২০০ লিটার পেট্রোল পাঠাইবার জন্য। এরিক কেম্পকা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—এই নিদারুন সময়ে এত পেট্রোল পাওয়া যাইবে না। কিন্তু হুকুম আসিল যেভাবেই হোক যোগাড় করিতেই হইবে। তখন ১৮০ লিটার পেট্রোল সংগৃহীত হইল এবং বাঙ্কারের জরুরী নির্গমন পথে এই পেট্রোল রাখা হইল। যখন হিটলারের চিতাগ্নির আয়োজন করা হইতেছিল, তখন তিনি তাঁর শেষ আহার গ্রহণ করিয়া ইভা ব্রাউনকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠতম পার্শ্বচরদের কাছ থেকে শেষ বিদায় দিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ গোয়েবেলস, জেনারেল ক্রেবস্ এবং বার্গডফ, আর সেক্রেটারিগণ ও পাচিক্য। কিন্তু সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা শ্রীমতী গোয়েবেলস সেই সময় উপস্থিত ছিলেন না। তিনিও ইভার মত স্বামীর সঙ্গে একত্রে মৃত্যু বরণের জন্য কৃতসংকল্প ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ৬টি নিষ্পাপ শিশু সন্তানকেও সেই সঙ্গে হত্যা করিতে হইবে, এই চিন্তায় তিনি বিচলিত ছিলেন। গত ৬ দিন যাবৎ তাঁর এই শিশু সন্তানেরা বাঙ্কারের পাতাল পুরীতে আনন্দে খেলা করিতেছিল। অবোধ শিশুরা জানিতে পারিল না তাদের অদৃষ্টে কি পরিণতি অপেক্ষা করিতেছে। কয়েকদিন আগে তিনি কাউন্টেস হান্না রিৎসের কাছে বলিয়াছিলেন—'হান্না, যদি আমি সন্তানদের জন্য দুর্বলতায় ভেঙ্গে পড়ি, তবে, তুমি আমাকে সেই চরম মুহূর্তে সাহায্য করো। তারা তৃতীয় রাইখের এবং ফুরারের। সুতরাং তারাই যদি না থাকে, তবে, আমার সন্তানদেরও আরও বেঁচে থাকার দরকার নাই।'

১। শাইরার-পৃষ্ঠা ১০৪৪।

মিসেস গোয়েবেলস তাঁর একলা ঘরে নিজেকে সামলাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন।

কিন্তু হিটলার ও ইভার এই সমস্ত সমস্যা ছিল না। তাদের একমাত্র কাজ ছিল নিজেদের জীবন নাশ। সুতরাং সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়া তাঁরা নিজেদের ঘরে চলিয়া গেলেন। কক্ষের বাইরে যাতায়াতের পথে ছিলেন ডঃ গোয়েবেলস, ব্যেরম্যান এবং আরও কয়েকজন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা একটি রিভলভারের গুলির আওয়াজ শুনিলেন এবং আর একটি গুলির শব্দের জন্য অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু সেই শব্দ আর পাওয়া গেল না। সুতরাং খানিকটা সময় পর তাঁরা ফুরারের আবাসকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁরা দেখিলেন সোফার উপর ফুরারের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। তিনি তাঁর নিজের মুখে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁর পাশেই ইভার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। আর মেঝের উপরে দুইটি রিভলভার পড়িয়া আছে। ইভা তাঁর রিভালবার ব্যবহার করেন নাই। তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

তখন সময় অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিট সোমবার, ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৫। এ্যাডলফ হিটলারের ৫৬ তম জন্ম দিবসের ১০ দিন পর এবং তৃতীয় রাইখের ভাগ্যবিধাতা হওয়ার ১২ বছর ৩ মাস পর।

(পরবর্তীকালে রাশিয়ানরা কিন্তু প্রচার করিয়াছিলেন যে, হিটলার নিজ হাতে গুলি করিয়া 'বীরের মত' আত্মহত্যা করেন নাই। এই কাহিনী মিথ্যা। তিনিও বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। অবশ্য এই বিতর্কের কোন চুড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই।)

বাঙ্কারে হিটলারের কর্মচারীরা চ্যান্সেলারির বাগানে হিটলার ও ইভার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গেলেন। হিটলারের মুখ চুর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এজন্য একটি কম্বলে তাঁর মৃতদেহ ঢাকিয়া নেওয়া হইয়াছিল। চ্যান্সেলারির বাগানের তখন রুশদের গোলা আসিয়া পড়িতেছিল এবং সেই গোলা বর্ষণের শব্দ ছাড়া এত বড় 'ঐতিহাসিক' মৃত্যুর জন্য আর কোন সাড়া-শব্দ ছিল না। গোলাবর্ষণের একফাঁকে বিরতির সময় হিটলার ও ইভার দেহে পেট্রোল ঢালিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল এবং সেই প্রজ্বলিত শিখা উর্ধ্বে উঠিতে লাগিল। জরুরী প্রবেশ পথের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া গোয়েবেলস এবং বোরম্যান শবানুগামীদের ভুমিকায় এ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ডান হাত উর্ধ্বে তুলিয়া নাৎসী কায়দায় স্যালুইট বা অভিবাদন জানাইলেন।

তখনও লালফৌজের গোলায় চ্যান্সেলারির বাগান বিধ্বস্ত হইতেছিল এবং হিটলার ও ইভার দেহ আগুনে পুড়িয়া ভষ্মীভুত হইতেছিল।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন যে দৃশ্যটা বীভৎস ছিল![1]

আর চার্চিল মন্তব্য করিয়াছেন যে, রুশ কামান গর্জন ক্রমশঃ প্রবল-থেকে-প্রবলতর হইয়া হিটলারের চিতাবহ্নিকে এবং সেই সঙ্গে তৃতীয় রাইখের পরিণামকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছিল।—[2]

১। ট্রেভর-রোপার—পৃষ্ঠা ২০৪।
২। চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ—৪৬৪।

নবম পর্ব

সপ্তম অধ্যায়

লালফৌজের দখলে বার্লিন

খাস বার্লিন নগরী দখলের যুদ্ধ মাত্র ৭ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালের ২৬শে এপ্রিল থেকে ২রা মে-র মধ্যে বার্লিন নগরী লালফৌজ কর্তৃক বেষ্টিত এবং জার্মানবাহিনী ধ্বংস হইল। উত্তর, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মার্শাল জুকোভ, মার্শাল রোকোসোভস্কি এবং মার্শাল কোনেভ বিশাল সৈন্যবাহিনী (মোট সৈন্যসংখ্যা ২৫ লক্ষ) ও প্রভূত অস্ত্রসম্ভার (জার্মানীর তুলনায় কয়েক গুণ বেশী) নিয়া জার্মানীকে তিনদিক দিয়া বেষ্টন করিল এবং ২৬শে এপ্রিল থেকে বার্লিনের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে যে বেষ্টনী সৃষ্টি হইল নাৎসী বাহিনী কিছুতেই সেই বেষ্ঠনী ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিল না এবং ২রা মে-র মধ্যে তারা খতম হইয়া গেল। লালফৌজ বার্লিন দখল করিয়া নিল।

কিন্তু এখানে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের তরফ থেকে এই মর্মে একটা অভিযোগ উঠিয়াছিল যে, স্ট্যালিন বা রাশিয়া মিত্রপক্ষীয় হাইকমাণ্ডের সঙ্গে চাতুরী খেলিয়াছেন। কারণ, সোভিয়েত সুপ্রীম কমাণ্ডার-ইন্-চীপ ১লা এপ্রিল ১৯৪৫, মিত্রপক্ষীয় হাই কমাণ্ডকে জানাইয়াছিলেন যে, মে মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগের আগে তাঁরা বার্লিনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিতে পারিবেন না—অবশ্য যদি ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের পক্ষে "অন্য কোন অবস্থা" দেখা না দেয়।

একথা সত্য যে, এত বড় অভিযান সংগঠিত করার জন্য মে মাসের প্রথম অর্ধ-ভাগ কাটিয়া যাইত এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটিও অনুরূপ পরিকল্পনা করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিস্থিতি অনুরূপ ধারণ করিল। মিত্রপক্ষের তরফ থেকে চার্চিল বার্লিন দখলের জন্য মতলব আঁটিলেন এবং গোড়া থেকেই তিনি ফন্দিবাজী করিতে-ছিলেন। সুতরাং স্ট্যালিনকেও তাঁর আগেকার সিদ্ধান্ত পালটাইতে হইল।

ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই ঃ ইয়াল্টা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর মিত্রপক্ষীয় তিন শক্তি—বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া জার্মানীতে তিনটি দখলীকৃত এলাকা স্থাপন করিবেন এবং একথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ জার্মানীর পূর্বাংশ অধিকার করিবেন। কিন্তু জার্মানীর পতনের মুখে চার্চিল বিগড়াইলেন। তাঁর চিরকালের কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ যেন মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। তাঁর ইতিহাস পুস্তকে (ষষ্ঠ খণ্ডে) তিনি লিখিয়াছেন যে, পূর্ব রণাঙ্গণের যুদ্ধে জার্মানীর সমরশক্তি ধ্বংস হইয়া যাওয়ার ফলে 'কমিউনিস্ট রাশিয়া ও পশ্চিমের গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে।' সুতরাং পশ্চিমী শক্তিবর্গের উচিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা। যথা—

১. সোভিয়েত রাশিয়া মুক্ত দুনিয়ার (ফ্রী ওয়ার্ল্ড) পক্ষে মারাত্মক বিপদরূপে দেখা দিয়াছে।

২. সোভিয়েতের আরও সম্মুখদিকে আগাইয়া যাওয়ার বিরুদ্ধে অবিলম্বেই একটি নতুন রণাঙ্গন খুলিতে হইবে।

৩. এই রণাঙ্গন ইউরোপের যত পূর্বদিকে সম্ভব, ততদূরে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

তখন প্রেসিডেণ্ড রুজভেল্ট বাঁচিয়া ছিলেন। ১লা এপ্রিল, ১৯৪৫, চার্চিল রুজভেল্টকে এই মর্মে এক তারবার্তা পাঠাইলেন 'রুশরা নিঃসন্দেহে গোটা অস্ট্রিয়া দখল করিয়া নিবে এবং ভিয়েতনামে প্রবেশ করিবে।' এরপর যদি তারা বার্লিনও দখল করিয়া নেয়, তবে, ভবিষ্যতের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপত্তির সৃষ্টি হইবে। সুতরাং রাজনৈতিক দিক থেকে আমি মনে করি যে, জার্মানীর যত পূর্বে সম্ভব আমাদের আগাইগা যাইতে হইবে এবং বার্লিনও আমাদের দখল করিয়া নিতে হইবে। সামরিক দিক থেকেও এটাই হইবে সারবান নীতি।'

কিন্তু চার্চিলের এই সমস্ত প্রস্তাব মার্কিন সরকারী মহল কিংবা পশ্চিম রণাঙ্গণের মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ার গ্রহণ করিলেন না, এবং তিনি লালফৌজ ও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সম্ভাবের সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাহিলেন। কারণ, সেটাই ছিল প্রেসিডেণ্টের নীতি। অপর পক্ষে রুজভেল্টের প্রধান পরামর্শদাতা হ্যারি হপকিন্স মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'যদি সম্ভব হইত, তবে আমরা বার্লিন দখল করিয়া নিতাম এবং আমাদের সৈন্যবাহিনীর পক্ষে সেটা একটা বড় জয় হইত।'[১]

চার্চিল তাঁর বইতে আরও লিখিলেন যে, তিনি লর্ড মণ্টগোমারীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে. ধৃত জার্মান অস্ত্রশস্ত্র যেন সাবধানে রাখা হয়। কেন না, ইতালী ও ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়িতে হইতে পারে। অধিকন্তু কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে "মুক্ত দুনিয়ার" পক্ষ থেকে নতুন অভিযানের জন্য জার্মানদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিতেও হইতে পারে।

পাঠকবর্গের মনে রাখা দরকার, তখনও জার্মানী সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ করে নাই। কিন্তু হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের অন্যতম অংশীদার সাম্রাজ্যবাদী ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষী চার্চিলের মনোভাব কিরূপ জঘন্য ছিল।

কিন্তু স্ট্যালিনের উপরে টেক্কা মারা চার্চিলের পক্ষেও সহজ ছিল না। তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ পূর্বাহ্ণেই এই সমস্ত অনুমান করিয়াছিলেন এবং মিত্রপক্ষীয় প্রতিক্রিয়াশীল মহলের মতলব সম্পর্কেও সন্দেহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বার্লিন সম্পর্কে তাঁদের মতলব ব্যর্থ করার জন্য সোভিয়েত হাইকমাণ্ড মে মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগের জন্য অপেক্ষা না করিয়া এপ্রিল মাসের মধ্যভাগেই বার্লিনের দিকে অভিযান করিতে বাধ্য হইলেন—যদিও তখন পর্যন্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ছিল না।[২]

* * *

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বার্লিন রক্ষার জন্য জার্মানরা মরিয়া হইয়া লড়াই করিয়াছিল এবং অপরিমেয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিল। মার্শাল আইভ্যান কোনেভ লিখিয়াছেন—বার্লিনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ীগুলি অবরোধ যুদ্ধের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। পার্শ্বদেশ রক্ষার জন্য ৪ মিটার পুরু দেওয়াল তৈরী হইয়াছিল, যেগুলি আবার ট্যাঙ্কমারা প্রতিবন্ধকে পরিণত হইয়াছিল। বিশেষভাবে বার্লিনের মধ্যভাগে কংক্রীটের তৈরী অত্যন্ত শক্ত শেলটার বা আশ্রয় নির্মিত হইয়াছিল

১। রবার্ট ই শেরউড—পৃষ্ঠা ৮৮৪।
২। দি গ্রেট মার্চ অব্ লিবারেশন—(জেঃ জেনারেল টেলিগিন) পৃষ্ঠা ২২৬।

এবং বিশেষ ধরনের এমন সমস্ত বাঙ্কার তৈরী হইয়াছিল যেগুলিকে অনায়াসে বিমান, ট্যাঙ্ক ও পদাতিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাইত। প্রতিরক্ষার জন্য বার্লিনের শহর সীমানার মধ্যে প্রায় ৪০০ বাঙ্কার নির্মিত হইয়াছিল এবং কোন কোন বাঙ্কার ৬ তলা পর্যন্ত উঁচু ছিল, এই সমস্ত প্রত্যেকটি বাঙ্কারে ৩০০ থেকে হাজার সৈন্য বাধা দিয়াছিল।[১]

২৭ এপ্রিল বার্লিন শহরের কেন্দ্রস্থলে যুদ্ধ শুরু হইল এবং শত্রুসৈন্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে, আর উত্তর থেকে দক্ষিণে ২ থেকে ৫ কিলোমিটারের সংকীর্ণ একফালি জমির মধ্যে আটকা পড়িল। ২৮শে এপ্রিল যে সমস্ত আহত জার্মান সৈন্য ও অফিসার এবং হাজার হাজার স্ত্রীলোক ও শিশু প্রাণভয়ে শহরের ফ্রিডরিশ স্ট্রাসি রেলস্টেশনের ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়াছিল হিটলারের আদেশে এস. এস. বাহিনী সেই পাতালপুরীর আশ্রয় জলপ্লাবনের দ্বারা ডুবাইয়া দিল! হিটলারেরর নৃশংসতার যে সীমা ছিল না, এটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।...

৩০শে এপ্রিল ভোরবেলা থেকে রাইখস্ট্যাগ দখলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া এই হিংস্র যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। প্রত্যেকটি মেঝে ও প্রত্যেকটি কক্ষে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ হইল। জি. কে. জ্যাগিটোভ, এ. এফ. লিসিমেঙ্কো, ডি. এন. ম্যাকোভ এবং এস. পি. মিনিন—কমিউনিস্ট পার্টির এই কয়েকজন সদস্য এই আক্রমণে নেতৃত্ব দিলেন এবং সাব-মেসিনগান ও হাতবোমা হাতে নিয় তাঁরা শত্রুর ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া ছাদে গিয়া উঠিলেন এবং লাল পতকা উড়াইয়া দিলেন।

আর ১লা মে ভোরবেলা ৭৫৬তম রেজিমেণ্টের দুই জন স্কাউট এস. এ. ইয়েগোরোভ এবং এম. ভি. কাণ্টারিয়া সোভিয়েত রণ-পতাকা (battle banner) উড্ডীন করিলেন রাইখস্ট্যাগের সম্মুখভাগের উপরিস্থিত ত্রিকোণ স্থানটিতে—রাইখস্ট্যাগ দখলের এই যুদ্ধের সময় আর-একদল সোভিয়েত সৈন্য গিয়া পেঁ'ছিল ইম্পিরিয়েল চ্যান্সেলারিতে। এই চূড়ান্ত জয়ের পর বার্লিন দখলের যুদ্ধ শেষ হইল ২রা মে।

হিটলারের "হাজার বছরের রাইখের" উপর সেই "বর্বর বলশেভিকদের" লাল পতাকা উড্ডীন হইল, যাদেরকে সমূলে সংহার করার জন্য হিটলার ও তাঁর নাৎসী সৈন্যবাহিনী চার বছর ধরিয়া মানুষের ইতিহাসের হিংস্রতম যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। সেই রাইখস্ট্যাগ, সেই চ্যান্সেলারি এবং সেই বার্লিন নগরীর সুবিখ্যাত রাজপথ উণ্টর-ডেন-লিন্ডেন ও টিয়ারগার্টেনসহ প্রায় ১০০ বর্গমাইল এলাকা ধরিয়া আগুন ও ধ্বংস পরিব্যাপ্ত হইল—যে বার্লিন নগরীকে হিটলারের "অজেয় বাহিনী" পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য তার আগেই হিটলার চরম পরাজয় ও চূড়ান্ত অসম্মানের মধ্যে গোটা জার্মান জাতিকে ফেলিয়া রাখিয়া ভূগর্ভের নিরাপদ আশ্রয়ে প্রণয়িনীসহ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এর চেয়ে ইতিহাসের প্রচণ্ড বিদ্রূপ আর কি হইতে পারে?

যদিও বার্লিনের যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যান্য ভয়াবহ রণক্ষেত্রের মতই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে, তথাপি বার্লিন বিজয়ী বীর মার্শাল জুকোভ স্বয়ং কিন্তু এই যুদ্ধকে লেনিনগ্রাদ, মস্কো বা স্ট্যালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধের অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রেই জুকোভ অসাধারণ

১। Secrets of the Second World War—P. 226.

রণদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং অনন্যসাধারণ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। তবে ওডের নদী তীর থেকে রাত্রিবেলা এই ধরনের যুদ্ধকে তিনি এক নতুন টেকনিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ক্রমাগত ৬ রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই।[১]

কিন্তু জুকোভের এই মতামত সত্ত্বেও মহাযুদ্ধের সোভিয়েত সরকারী ইতিহাসে বার্লিনের যুদ্ধকে অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সরকারী ইতিহাসের মতে এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ মিলিয়া ৩৫ লক্ষ লোক জড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ৫০ হাজার কামান ও মর্টার, ৮০০০ ট্যাংক ও মোবাইল গান্ এবং ৯ হাজারের বেশী বিমান নিয়োগ করা হইয়াছিল। বার্লিনের এই যুদ্ধে লালফৌজ ৭০টি জার্মান পদাতিক ডিভিসন ১২টি বর্মাবৃত এবং ১১টি মোটরায়িত ডিভিসন ধ্বংস করিয়াছিল। ৮ই মে জার্মানীর সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের আগে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার জার্মান সৈন্য, ১৫০০ ট্যাংক, ৪০০০-এর বেশী বিমান এবং ১০ হাজার কামান রুশদের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। বার্লিনের বিরুদ্ধে এই রণক্রিয়ায় কেবল মার্শাল জুকোভের অধীন ১নং বেলোরুশিয়ান ফ্রন্টই যোগ দেয় নাই, ১নং উক্রাইনিয়ান এবং ২নং বেলোরুশিয়ান ফ্রন্টও যোগ দিয়াছিল। কিন্তু এই রণক্রিয়ার অস্ত্রসম্ভারে রুশবাহিনী জার্মানদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী শক্তিশালী ছিল। তথাপি জার্মানরা নাৎসী প্রোপাগাণ্ডার প্ররোচনায় পড়িয়া মরিয়া হইয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়াছিল। ১৬ই এপ্রিল থেকে ৮ই মের মধ্যে জার্মানরা রুশ বাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষতি করিয়াছিল। বার্লিন যুদ্ধে রুশ পক্ষে হতাহত ও নিখোঁজ মিলিয়া ৩ লক্ষ ৫ হাজার সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল—ওডের ও নেইসী নদীর ব্যূহ ভেদ করিতে গিয়া এবং বার্লিন শহরের অভ্যন্তরের যুদ্ধে এই সমস্ত ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল। ২ হাজার ট্যাংক, ১২ শত কামান ও ৫২৭টি বিমান নষ্ট হইয়াছিল। একমাত্র বার্লিনের যুদ্ধে যখন রাশিয়ার এই ক্ষতি হইয়াছিল, তখন সারা ১৯৪৫ সালে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের ক্ষতি হইয়াছিল মাত্র ২ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্য। একমাত্র রাইখস্ট্যাগ দখলের যুদ্ধেই রুশ পক্ষের কয়েক হাজার না হইলেও কয়েক শত সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

মার্শাল জুকোভের মতে বার্লিনের রণক্রিয়ায় ৫ লক্ষ জার্মান সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এর মধ্যে ৩ লক্ষ সৈন্য বন্দী হইয়াছিল। ১ লক্ষ ৫০ হাজার নিহত হইয়াছিল এবং বাকী সৈন্যেরা পালাইয়া গিয়াছিল। ওডের নদীর যুদ্ধেই জার্মানরা তাদের সমস্ত বিমান বিধ্বংসী কামান নিয়োগ করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং বার্লিনকে বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা জার্মানদের ছিল না।—[২]

সস্ত্রীক হিটলারের আত্মহত্যার পর তৃতীয় রাইখের পরিচালনার কিছু কিছু দায়িত্ব মার্টিন বোরম্যান ও গোয়েবলসের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। ফুরার তাঁর শেষ "ইচ্ছাপত্রে" গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎসকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই নির্দেশপত্র তখনও বিশেষ বার্তাবাহী মারফৎ ডোয়েনিৎসের নিকট পেঁাছানো সম্ভব ছিল না। বোরম্যান নিজেই ছিলেন ক্ষমতালোভী। সুতরাং চূড়ান্ত ক্ষমতা ডোয়েনিৎসের হাতে তুলিয়া দিতে তিনি তখনও কিছুটা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন।

১। Alexander Werth—P. 890.

২। ঐ পুস্তক, ঐ পৃষ্ঠা।

তথাপি কোন উপায় ছিল না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত রেডিওযোগে নিম্নলিখিত বার্তা তিনি পাঠাইলেন ঃ

'গ্রান্ড এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস! প্রাক্তন রাইখ মার্শাল গোয়েরিংয়ের বদলে ফুরার আপনাকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছেন। লিখিত আদেশ নিয়া বার্তাবাহী আপনার কাছে পেঁছিুবার পথে। আপনি অবিলম্বে অবস্থা অনুযায়ী যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।'

লক্ষ্য করার এই যে, এই বার্তার মধ্যে কোথাও হিটলারে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হইল না। ডোয়েটিৎস তখন ছিলেন উত্তর দিকের সমস্ত জার্মান বাহিনীর অধিনায়কত্বে এবং তিনি কোনেদিন ভাবেন নাই যে, তিনি হিটলারের উত্তরাধিকারী হইবেন। সে সময় তাঁর সদর দপ্তর ছিল শ্লেসভিগের (Schelswig) প্লোয়েন শহরে এবং তাঁর ধারণা ছিল যে, হিমলার হইবেন হিটলারের উত্তরাধিকারী। সুতরাং বোরম্যান প্রেরিত রেডিওবার্তা পড়িয়া তিনি কিছুটা হতবুদ্ধি হইলেন। কিন্তু জীবনে তিনি কোন দিন হিটলারের অবাধ্য হন নাই। সুতরাং এ্যাডলফ হিটলার তখনও বাঁচিয়া আছেন, এই বিশ্বাসে তিনি ফুরারের উদ্দেশ্যেই এই মর্মে এক বার্তা পাঠাইলেন যে, তাঁর প্রতি তিনি শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং যদি ভাগ্যবশে তিনি ফুরারের উত্তরাধিকারীরূপে রাইখ পরিচালনার দায়িত্ব পাইয়া থাকেন, তবে তিনি যথাসম্ভব বার্লিন থেকে তাঁকে উদ্ধারের এবং জার্মান জনগনের এই অভুতপূর্ব বীবরত্বপূর্ণ যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেন।...

সেই রাত্রে গোয়েবেলস ও বোরম্যানের মাথায় আর-একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। তাঁরা বার্লিনে রুশ পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালাইবার কথা চিন্তা করিলেন। জেনারেল ক্রেবস, যিনি আর্মি জেনারেল স্টাফের প্রধান ছিলেন, তিনি একদা মস্কোতে জার্মান দূতাবাসে ছিলেন এবং সোভিয়েত নেতাদের পরিচিত ছিলেন। তিনি রুশ ভাষাও জানিতেন। সুতরাং তাঁরা ক্রেবসকে রুশ শিবিরে পাঠাইয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনা যেমন চালাইতে চাহিলেন, তেমনি ডোয়েনিৎসের গবর্নমেন্টে যোগদানের জন্য যাতায়াতের নিরাপত্তার প্রস্তাবও করিলেন। যদি রুশ পক্ষ এটা মানিয়া লন, তবে বিনিময়ে তাঁরা বার্লিন শহরকে রুশদের হাতে সমর্পণ করিবেন।

সুতরা ৩০শে এপ্রিল মধ্যরাত্রির পর (ইংরাজী মতে ১লা মে) জেনারেল ক্রেবস সোভিয়েত সেনাপতি জেনারেল চুইকোভের দপ্তরে গেলেন একজন অফিসারসহ সাদা পতাকা উড়াইয়া এবং অবিচলিতকণ্ঠে যেভাবে কথাবার্তা শুরু করিলেন, নিঃসন্দেহে তা অভিনব ঃ

'ক্রেবস্‌—আজ ১লা মে, আমাদের দু'দেশের পক্ষেই মহাছুটির দিন!'

(ইউরোপে ১লা মে তারিখটি আন্তর্জাতিক শ্রমদিবসরূপে পালিত হইয়া থাকে।)

চুইকোভ—'আমাদের দেশে অবশ্যই আজ মহাছুটির দিন। তবে, আপনাদের ওখানে অবস্থা কি রকম, বলা বড় কঠিন।'[১]

যে জার্মান সৈন্য ও সেনাপতিরা রাশিয়ার অভ্যন্তরে অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়াছে, তাদের পক্ষ থেকে রুশ পক্ষের সেনাপতি চুইকোভের সঙ্গে এভাবে যুদ্ধবিরতির কথা-বার্তা আরম্ভ করা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া

১। উইলিয়ম শাইরার, পৃষ্ঠা ১০৩৮।

আলোচনা করা সত্ত্বেও ক্রেবস্ সুবিধা করিতে পারিলেন না। কারণ, সোভিয়েত পক্ষ ফুয়ারের বাংকার ও সমগ্র বার্লিনের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করিলেন।···

ক্রেবসের প্রত্যাবর্তনে দেরী দেখিয়া বোরম্যান ও গোয়েবেলস অত্যন্ত অস্থির বোধ করিতেছিলেন। বিশেষতঃ গোয়েবেলসের তখন সপরিবারে আত্মহত্যার সময় নিকটবর্তী হইতেছিল। সুতরাং বার্লিনের অবরুদ্ধ বাংকার থেকে গোয়েবেলস অপরাহ্ণ ৩-১৫ মিনিটের (১লা মে) সময় শেষ শেষ রেডিও বার্তা এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎসের নিকট পাঠাইলেন এবং তাঁকে "খুব গোপনে" জানাইয়া দিলেন যে, 'ফুয়ার গতকল্য অপরাহ্ণ সাড়ে-তিনটায় মারা গিয়েছেন এবং ১৯শে এপ্রিলের টেস্টামেণ্টের দ্বারা আপনাকে রাইখের প্রেসিডেণ্টের পদে নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও সংবাদপত্রের নিকট এই ঘোষণা প্রকাশ করিবেন।'

এই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পর গোয়েবেলস দম্পতী ১লা মে সন্ধ্যায় আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ফুয়ারের কুকুরগুলিকে যে ডাক্তার বিষযোগে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই চিকিৎসকই গোয়েবেলসের ৬টি নিরাপদ শিশু সন্তানকে (বয়স ১২, ১১, ৯, ৭, ৫ এবং ৩) বিষপ্রয়োগে নিধন করিলেন। সেই শিশুরা তখন নিশ্চিন্তমনে বাংকারের প্রাঙ্গনে খেলা করিতেছিল। তারপর গোয়েবেলস দম্পতি বাংকারের বাকী লোকজনদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী গোয়েবেলসের নির্দেশ-ক্রমে বাংকারের বাগানে এস. এস. বাহিনীর একজন সান্ত্রী পিছন দিক থেকে মাথায় গুলি করিয়া গোয়েবেলস দম্পতিকে হত্যা করিলেন। অতঃপর মৃতদেহগুলির উপর পেট্রোল ঢালিয়া দিয়া এগুলিকে দাহ করার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু দাহ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই রুশ সৈন্যেরা বাংকার দখল করিয়া নিল এবং হিটলারের ভুবনবিখ্যাত প্রচারমন্ত্রী গোয়েবেলসের ও তাঁর পরিবারের দগ্ধ দেহাবশেষ তাদের হাতে ধরা পড়িল, যাদের সাবাড় করা সম্পর্কে গোয়েবেলস চার বছর ধরিয়া এত ক্রুর প্রোপাগ্যান্ডা চালাইয়াছিলেন।···

১লা মে রাত্রিবেলা ফুয়ারের বাংকারে যখন আগুন ধরিয়া গেল তখন বাকী ৫।৬ শত (অধিকাংশই এস. এস. বাহিনীর) লোক সেই ভুগর্ভ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করিল। মার্টিন বোরম্যান তখন 'চাঁচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অনুসারে বাংকার থেকে মুক্ত হইয়া পালাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হিটলারে ড্রাইভার কেম্পকার বিবৃতি অনুসারে দেখা যায় যে, বোরম্যান রুশদের নিক্ষিপ্ত গোলায় গুরুতর আহত হইয়া রাস্তার একটি সেতুর নীচে মরিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পর বোরম্যান সম্পর্কে দীর্ঘকাল এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, তিনি পালাইয়া দক্ষিণ আমেরিকার চলিয়া গিয়াছিলেন।)

এদিকে জেনারেল ক্রেবসও চুইকোভের সঙ্গে আলোচনায় ব্যর্থ হইয়া অপরাহ্ণে বাংকারে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি ও জেনারেল বার্গডোর্ফ (হিটলারের পার্শ্বচর) পালাইবার চেষ্টা না করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।···

এভাবে হিটলারী জার্মানীর নেতৃত্ব হত্যায়, আত্মহত্যায়, অপমৃত্যুতে, পলায়নে, পরাজয়ে এবং হতাশায় ও বিদ্বেষে ছত্রভঙ্গ হইল এবং ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু তখনও সরকারীভাবে মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বাকী ছিল।

যুদ্ধ, চিরকালই নিষ্ঠুর, নির্মম এবং বর্বর। তবু, যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্বের মধ্যে যদি কিছুটা আদর্শ, নীতিবোধ এবং ন্যায়ধর্ম থাকে, তবে বিজিত দেশের উপর অত্যাচার ও অনাচারের মাত্রা অনেকটা কম হইয়া থাকে। কিন্তু ফ্যাসিস্ট যুদ্ধযাত্রায় নীতি ও নিয়মকানুনের বালাই-মাত্র ছিল না। ফলে হিটলারী ফ্যাসিস্টচক্র পোলাণ্ডে সোভিয়েত রাশিয়ায় এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে (অন্যান্য দেশেও বটে) যে অমানুষিক এবং জঘন্যতম অপরাধ ও অত্যাচার করিয়াছিল ইতিহাসে তার কোন তুলনা ছিল না। লালফৌজকে এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছিল। সুতরা ১৯৪৫ সালে পতনোম্মুখ জার্মান ভূমিতে লালফৌজের প্রবেশের আগে সোভিয়েত নেতৃত্বকে এই দিকটা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইয়াছিল। সোভিয়েত বাহিনীর অন্যতম খ্যাতিমান এবং প্রতিভাবান সেনাপতি মার্শাল রকোসোভস্কি লিখিয়াছেন যে, তাঁর ফ্রণ্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিলিটারি কাউন্সিল উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার অধিকৃত এলাকাগুলিতে নাৎসী সৈন্যদের ভয়াবহ অত্যাচারের জন্য লালফৌজের সৈন্যেরা স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ এবং প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মুখ ছিল। কিন্তু এই ক্রোধ ও ঘৃণা যাতে সমগ্র জার্মান জাতির বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ ও প্রতিশোধে পরিণত না-হয়, সেদিকে নজর দিতে হইবে। সুতরাং আমাদের প্রচার করিতে হইল যে, 'আমাদের যুদ্ধ হিটলারের আর্মির বিরুদ্ধে, জার্মানীর সমস্ত অ-সামরিক জনগণের বিরুদ্ধে নয়। এবং যখন আমাদের সৈন্যেরা জার্মানীর সীমান্ত অতিক্রম করিল, তখন ফ্রণ্টের মিলিটারি কাউন্সিল সৈন্য ও সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে এক অভিনন্দন-বাণীতে এই নির্দেশনামা জারী করিলেন যে, জার্মানীতেও আমরা মুক্তিফৌজ হিসাবে প্রবেশ করিতেছি। রেড আর্মি জার্মানীতে আসিয়াছে জার্মান জনগণকে নাৎসী চক্রান্ত ও বিষদুষ্ট প্রোপাগান্ডা থেকে উদ্ধারের জন্য। সুতরাং মিলিটারি কাউন্সিল সমস্ত সেনাপতি ও সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইতেছেন সোভিয়েত বাহিনীর উচ্চতম শৃঙ্খলা ও মর্যাদা রক্ষা করার জন্য।'[১]

রকোসোভস্কি অতঃপর লিখিয়াছেন যে, আমাদের সৈন্যদের নিকট এই 'মুক্তি মিশনের' (Mission of liberation) উদ্দেশ্য অনবরত প্রচার ও ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল এবং 'আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে, আমাদের সৈন্যেরা জার্মান ভূমিতে সত্যকার মানবিক দয়া ও উদরতা দেখাইয়াছিলেন।'

অবশ্য মস্কোর খাস সদর দপ্তর হইতেও সৈন্য ও সেনাপতিদের উপর এই মর্মে এক নির্দেশ আসিল যে, জার্মান জনগণের সঙ্গে মানবিক আচরণ করিতে হইবে। এবং ওডের ও নেইসী নদীর পশ্চিমে জার্মানদের দ্বারা পরিচালিত সরকারের প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে।[২]

এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সোভিয়েত সাহিত্যিক ইলিয়া এরেনবুর্গ এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখক জার্মানদের পাশবিকতার বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যে নিদারুণ উত্তেজনাপূর্ণ প্রোপাগান্ডা চালাইয়া আসিতেছিলেন, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশে ১৪ই এপ্রিল থেকে তা'ও বন্ধ

১। A Soldier's Duty—Rokossovosky. Moscow, 1970, P. 288.
২। গ্রেট প্যাট্রিয়টিক ওয়ার অবু দে সোভিয়েত ইউনিয়ন—পৃষ্ঠা ৩৮৩।

করিয়া দেওয়া হইল এবং এরেনবুর্গের এই সমস্ত লেখা নিয়া তীব্র বিতর্কেরও সৃষ্টি হইয়াছিল।

বলাৎকারের কাহিনী

কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর মর্যাদা, নৈতিক মান এবং উচ্চতম শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যত উপদেশ ও নির্দেশই দেওয়া হইয়া থাকুক না কেন, জার্মান ভূমিতে প্রবেশের প্রথম উত্তেজনায় রুশ সৈন্যদের অনেকের সেই সমস্ত উপদেশ ও নির্দেশ ভুলিয়া গেলেন এবং জার্মান সৈন্যরা রাশিয়াতে ও অন্যত্র যে সমস্ত ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছিল, সেগুলি তাঁরা স্মরণ করিলেন। ফলে, জার্মান ভূমিতে আক্রমণের গোড়ার দিকে তাঁরা কোন কোন এলাকার ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি, এমন কি গোটা শহর পর্যন্ত জ্বালাইয়া দিলেন ও লুটপাট করিলেন। আর বহু নারীর উপর বলাৎকার এবং অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।—এই সমস্ত কথা লিখিয়াছেন স্বয়ং আলেকজান্দার ওয়ার্থ, রুশ-জার্মান যুদ্ধে যাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল অপরিসীম এবং যাঁর পুস্তক নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক।[১]

মিঃ ওয়ার্থের নিকট একজন রাশিয়ান মেজর স্বীকার করিয়াছেন যে, অনেক জার্মান স্ত্রীলোকের উপর রুশ সৈন্যেরা বলাৎকার করিয়াছিল ঠিকই, তবে একথাও সত্য যে, জার্মান মেয়েদের অনেকেই ধরিয়া লইয়াছিল যে, 'এবার রুশদের পালা', সুতরাং বাধা দিয়া কোন লাভ নাই! বরং তারা যেন এজন্য প্রস্তুতই ছিল। প্রায় চার বছর ধরিয়া রেড আর্মির লোকেরা যৌন ক্ষুধায় কাতর ছিল। অবশ্য অফিসারদের, বিশেষভাবে ফিল্ড-অফিসারদের তেমন কোন অসুবিধা ছিল না। কেন না, তাঁদের হাতের কাছেই কোন 'ফিল্ড-ওয়াইফ'—যেমন সেক্রেটারি, টাইপিস্ট বা নার্স ইত্যাদি সহজলভ্য ছিল। কিন্তু সাধারণ সৈন্যদের তেমন সুযোগ ছিল না।...

এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে আমাদের যৌন উপবাসী সৈন্যেরা ৬০।৭০ বছরের বৃদ্ধাদের উপরেও বলাৎকার করিয়াছে। এ বিষয়ে কাজাক ও অন্যান্য এশিয়াটিক্ সৈন্যদের রেকর্ডই সবচেয়ে খারাপ।[২]

পরে এই সমস্ত বিষয় নিয়া মিঃ আলেকজান্দার ওয়ার্থ যখন মার্শাল শোকোলোভস্কির মত পদস্থ সামরিক নেতার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি জবাব দিয়াছিলেন—"হাঁ, অনেক নোংরা জিনিস ঘটেছিল। কিন্তু আপনারা কি আশা করেন? আপনি নিশ্চয়ই জানেন জার্মানরা রুশ যুদ্ধবন্দীদের উপর কি কাণ্ড করেছিল, কি ভাবে আমাদের দেশকে ধ্বংস ও লুঠ এবং লোকজনকে হত্যা ও মেয়েদের উপর বলাৎকার করেছিল? মৈদানেক কিংবা আউশেভিৎস বন্দীশিবিরগুলি কি আপনি দেখেছেন? আমাদের প্রত্যেকটি সৈন্যের ডজন ডজন কমরেড মারা পড়েছে। সুতরাং তাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে জার্মানদের সঙ্গে কিছু হিসাব-নিকাশ মিটাবার দরকার ছিল। অতএব জয়লাভের প্রথম উল্লাসে আমাদের সৈন্যরা কিছু কিছু জার্মান নারীর জীবন উত্যক্ত করে তোলার মধ্যে কিছুটা আত্মতৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিল। তবে, এখন (অর্থাৎ

১। Russia At War (1941—1945)—Alexander Werth, Pan Books Ltd. 1966, London—P, 863.

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৬৩।

জনুন, ১৯৪৫) আর সেই অবস্থা নেই এবং একথাও সত্য যে, জার্মান স্ত্রীলোকদের সকলেই অক্ষতযোনী কুমারী ছিল না।"[১]

* * *

পশ্চিমের আরও কোন কোন লেখক অধিকৃত বার্লিন ও জার্মানীতে এবং অন্যত্র রুশসৈন্যদের উচ্ছৃংখল আচরণ ও অনাচারের কথা বিশেষ জোরের সঙ্গেই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ*দের লেখার মধ্যে অতিরঞ্জনের বিশেষ সম্ভাবনা। কেননা, এ*রা প্রায় সকলেই সোভিয়েত-বিরোধী এবং বার্লিন লালফৌজের দখলে যাওয়ায় এদের ক্ষোভেরও সীমা ছিল না। সুতরাং বিজয়ী সোভিয়েত রাশিয়ার মর্যাদা ক্ষুন্ন করার জন্য এ*রা বেশ কৌশলে নিন্দা রটনা করিয়াছেন। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট লেখক কর্নেলিয়াস রায়ান তাঁর একটি জনপ্রিয় সামরিক গ্রন্থের গোড়াতেই লিখিয়াছেন ঃ

'প্রায় ছয় বছর যুদ্ধের পর বার্লিন মূলতঃ নারীপ্রধান শহরে পরিণত হইয়াছিল এবং এই শহরের উপর যৌন আক্রমণের আশংকা কালোছায়া বিস্তার করিয়া রহিল।'

অর্থাৎ লেখক কৌশলে সোভিয়েতের সুনাম হ্রাস করার জন্য বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, বার্লিনের উপর লালফৌজের আক্রমণ যেন "যৌন আক্রমণের" সমান বিপজ্জনক ছিল।

অতঃপর মিঃ রায়ান উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধারম্ভের সময় বার্লিনের লোক সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ২১ হাজার। কিন্তু যুদ্ধের জন্য সেই সংখ্যা কমিতে কমিতে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইল ২৭ লক্ষে এবং এর মধ্যে ২০ লক্ষই ছিল স্ত্রীলোক। অপর পক্ষ পূর্বদিকে থেকে দলে দলে—মোট প্রায় ৫ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী সোভিয়েত অধিকৃত এলাকাগুলি থেকে বার্লিনের দিকে পালাইয়া আসিতেছিল এবং তাদের অধিকাংশই বার্লিন ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে ছুটিতেছিল। এই সমস্ত উদ্বাস্তু নরনারী সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ভয়াবহ কাহিনী ও গুজব প্রচার করিতে লাগিল এবং সেই সমস্ত গুজব মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িলে বার্লিনে ত্রাসের সৃষ্টি হইল।[২]

অবশ্য রুশ সৈন্য সম্পর্কে এই ত্রাস সৃষ্টির জন্য তিনি রাশিয়াতে এবং বিভিন্ন বন্দীনিবাসে জার্মানদের ভয়াবহ অত্যাচারকেও দায়ী করিয়াছেন। মিঃ রায়ান লিখিয়াছেন ঃ

'Their terror of the Russians was often intensified by a certain guilty knowledge. Some Germans, at least, knew all about the way German troops had behaved on Soviet soil, and about the terrible and secret atrocities committed by the Third Reich in concentration Camps. Over Berlin, as the Russians drew closer, hang a nightmarish fear unlike that experienced by any city since the razing of Caithage.[৩]

সোভিয়েত-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মিঃ রায়ান জার্মানদের ভয়াবহ অত্যাচার, এবং রুশদের উপর তার প্রতিক্রিয়ার কথা কিংবা "জার্মানদের অপরাধ বোধের" কথা গোপন

করিতে পারেন নাই। তবু তিনি তাঁর পুস্তকের বহু জায়গায় রুশ সৈন্য কর্তৃক জার্মান নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বহু কাহিনী (৪৫৩ থেকে ৪৬৩ পৃষ্ঠা) বর্ণনা করিয়াছেন এবং পুস্তকের একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় নিজেই প্রশ্ন করিয়াছেন—কত নারীর উপর বলাৎকার করা হইয়াছিল এবং নিজেই জবাব দিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট সংখ্যা কেউ বলিতে পারে না। ডাক্তারদের মতে ২০ হাজারও হইতে পারে, আবার এক লক্ষও হইতে পারে।

মিঃ রায়ান তাঁর ঘটনাবলীর বর্ণনায় আত্মপক্ষ সমর্থনে ৪৬৩ পৃষ্ঠার পদাটীকায় সোভিয়েত মতামত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁর মতে সোভিয়েত ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেন যে, বার্লিনের পতনের সময় রুশ সৈন্যেরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলিয়া গিয়াছিল এবং বলাৎকার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ওডের নদী পর্যন্ত সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রগতির পথে যে সমস্ত বন্দীশিবির মুক্ত করা হইয়াছিল, প্রাক্তন যুদ্ধ-বন্দীরা তাদের উপর অত্যাচারের বদলা নিয়াছিল। সামরিক বাহিনীর পত্রিকা "রেড স্টার"-এর সম্পাদক স্বয়ং গ্রন্থকারের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের সৈন্যেরা শতকরা ১০০ ভাগ ভদ্রলোক হইতে পারেন নাই স্বাভাবিক কারণেই। কারণ আমরা এত বেশী অত্যাচার দেখিয়াছিলাম যে, তা অবর্ণনীয়। সোভিয়েতের অপর একজন সাময়িকপত্র সম্পাদক বলিয়াছেন যে, জার্মানরা রাশিয়াতে যে বর্বরতা করিয়াছিল, তার তুলনায় আমরা কিছুই করি নাই! যুগোশ্লাভিয়ায় লালফৌজের সৈন্যদের অত্যাচার নিয়া যুগোশ্লাভ মিলিটারি প্রতিনিধি মিলোভান জিলাস (Milovan Djilas) স্ট্যালিনের নিকট অভিযোগ করিলে স্ট্যালিন নাকি জবাব দিয়াছিলেন: 'আপনারা এটা কেন বুঝতে পারেন না যে, যদি কোন সৈন্যকে হাজার হাজার কিলোমিটার রক্ত ও আগুনের ভিতর দিয়া যেতে হয়, তবে, সে কোন স্ত্রীলোক নিয়া মজা করবে, এটা এমন কি গুরুতর ব্যাপার?'

অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর-একজন জগদ্বিখ্যাত সামরিক গ্রন্থকার উইলিয়ম শাইরার তাঁর 'এন্ড অব্ এ বার্লিন ডাইরি' নামক পুস্তকে এই বিষয় নিয়া তেমন-কিছু গুরুত্ব আরোপ করেন নাই—যদিও তিনি ওয়াশিংটনে, নিউইয়র্কে, লন্ডনে এবং প্যারিসে রুশসৈন্যদের বলাৎকারের অনেক গল্প শুনিয়াছিলেন। পরে তিনি ইউরোপে গিয়া নিজে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, বুদাপেস্টে বেশ-কিছু-সংখ্যক খারাপ কাজ ঘটিয়াছিল। কিন্তু বার্লিনে তেমন-কিছু গুরুতর ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তবে যে কোন দেশেই সৈন্যেরা যুদ্ধ জয় করিলে কিছু কিছু বলাৎকার ঘটিয়া থাকে। 'আমাদের নিজেদের (অর্থাৎ আমেরিকার) সৈন্যেরাও কোন কোন সময় তেমন কাজ করিয়াছে।' কিন্তু জার্মানরা সোভিয়েত রাশিয়াতে যে ভয়াবহ কান্ড করিয়াছে, রুশ সৈন্যদের পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাওয়া কঠিন। ক্রমাগত দুই তিন বছর ধরিয়া যারা রণক্ষেত্রে লড়াই করিয়াছে এবং বহু জীবনের মূল্যে যারা বার্লিন দখল করিয়াছে তাদের সম্পর্কে এ কথা মনে রাখিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, রুশসৈন্যদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বলাৎকারের সংখ্যা সাধারণ গড়পড়তা হিসাবে উর্ধ্বে ছিল না।

মিঃ শাইরার অতঃপর লিখিয়াছেন যে, তাঁর সঙ্গে মাত্র একজন জার্মান স্ত্রীলোকের

সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং সে নিজেই বলাৎকারের কথা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তার জন্য সে খুব দুঃখিত বলিয়া মনে হইল না।[১]

এই সমস্ত মন্তব্য থেকে বুঝা যাইতেছে যে, যাঁরা ঘোরতর সোভিয়েত-বিরোধী তাঁরাই লালফৌজের বিরুদ্ধে বেশী নিন্দা রটনার চেষ্টা করিয়াছেন।

* * *

বার্লিন ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। শহরে খাদ্য, বিদ্যুৎ, উত্তাপ, জল ও গ্যাস এবং রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি কিছুই ছিল না। অপর পক্ষে মৃত মানুষ ও মৃত পশুর দুর্গন্ধে আবহাওয়া ভারী ছিল। উপযুক্ত চিকিৎসা-ব্যবস্থারও অত্যন্ত অভাব ছিল। কিন্তু সেই শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও সোভিয়েত মিলিটারি কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব জার্মান নাগরিকদের জন্য খাদ্য ও সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[২]

* * *

বৃটিশ সামরিক লেখক ও গ্রন্থকার মেজর জেনারেল স্যার চার্লস গাইন (Charles Gwynn) বার্লিন যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাপতি ও সৈন্যদের রণকৌশল ও রণনীতির উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, ওডের নদীতীর থেকে মার্শাল জুকোভ যেরূপ দ্রুতগতিতে বার্লিনের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তা' বিস্ময়কর। ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে জুকোভ ও মার্শাল কোনিয়েভ পটসডামের উত্তর-পশ্চিমে পরস্পরের সহিত হাত মিলাইলেন এবং বার্লিনকে সম্পূর্ণ ঘিরিয়া ফেলিলেন। মিত্রপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েত বাহিনীর পূর্বে-পশ্চিমে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। উত্তর দিকে মার্শাল রকোসোভস্কিও দ্রুত জয়লাভের দ্বারা আগাইয়া যাইতেছিলেন এবং পলায়মান জার্মান সৈন্যেরা রুশদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে জেনারেল মন্টগোমারীর অফিসারদের কাছে গিয়া আত্মসমর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু বৃটিশপক্ষ রাজী হইলেন না।···

বার্লিন যুদ্ধে মার্শাল জুকোভের অধীন রেড আর্মি মার্শাল কোনিয়েভের সহযোগিতায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ২রা মে মার্শাল স্ট্যালিন মস্কো থেকে প্রচারিত এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করিলেন—'জার্মানীর রাজধানী ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মর্মকেন্দ্র এবং জার্মান আক্রমণের উৎস বার্লিনের সম্পূর্ণ পতন ঘটিয়াছে। বার্লিন দুর্গের জার্মান অধিনায়ক ও গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল উইডলিং (Weidling) তাঁর স্টাফসহ অপরাহ্ণ ৩টায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। রাত্রি ৯টার মধ্যে আমাদের সৈন্যেরা বার্লিনে ৭০ হাজার জার্মান সৈন্যকে বন্দী করিয়াছেন। তার আগেই আরও লক্ষাধিক সৈন্য বার্লিন যুদ্ধে ধরা পড়িয়াছে।' ···মার্শাল স্ট্যালিন ও মার্শাল জুকোভের কাছে এটা ব্যক্তিগত জয়ের মত। কিন্তু রাশিয়ার জনগণের কাছে, যাদের দেশ ধ্বংস এবং অজস্র পরিবার নিশ্চিহ্ন বা বন্দী হইয়াছিল, তাদের কাছে বার্লিনের এই পতন আরও অনেক বেশী গুরুত্বব্যঞ্জক ছিল।[৩]

কিন্তু বার্লিনের এই চূড়ান্ত যুদ্ধে সামরিক ও অ-সামরিক কত লোক বিনষ্ট হইয়াছিল?—মার্কিন গ্রন্থকার কর্নেলিয়াস রায়ান বলিয়াছেন যে, এর সঠিক জবাব দেওয়া কঠিন। কারণ, যুদ্ধাবসানের বিশ বছর পরেও ধ্বংসস্তূপ, বাগান ও পার্কের

১। End of a Berlin Diary—William L. Shirer, P. 139.
২। দি গ্রেট মার্চ অব লিবারেশন, পৃষ্ঠা ২৭২৭।
৩। The Second Great War—Vol. IX P. 3722.

ভূগর্ভ থেকে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইতেছে। তবে, সমস্ত সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব মিলাইয়া মনে হয় যে, বার্লিনের যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ সিভিলিয়ান বা অ-সামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছিল। অন্ততঃ ২০ হাজার লোক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা পড়িয়াছিল। প্রায় ৬ হাজার লোক আত্মহত্যা করিয়াছিল। বাকীরা গোলাগুলির বর্ষণে সোজা নিহত কিংবা রাস্তার লড়াইতে আহত হইয়া মারা পড়িয়াছিল। শেষের দিনগুলিতে বার্লিন থেকে যারা পালাইয়া গিয়াছিল, কিংবা জার্মানীর অন্যত্র মারা পড়িয়াছিল তাদের সঠিক সংখ্যা পাওয়াও কঠিন। একমাত্র বোমাবর্ষণেই ৫২ হাজার লোক নিহত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান। যদি এই সংখ্যা ঠিক হইয়া থাকে, তবে, অসামরিক নিহতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশী। কিন্তু বার্লিনের যুদ্ধে জার্মানীর সামরিক হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় করা আরও কঠিন। কারণ এই সংখ্যাটি জার্মানীর যুদ্ধের সমগ্র হতাহতের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তবে বার্লিন যুদ্ধে জুকোভ ও কোনিয়েভের মিলিত বাহিনীর নিহতের সংখ্যা অন্ততঃ ১ লক্ষ।—[১]

কিন্তু সোভিয়েত পক্ষের মতে বার্লিন যুদ্ধে তিন ফ্রন্টের (জুকোভ, কোনিয়েভ ও রকোসোভস্কি) একত্রে মোট ৩,০৪,৮৮৫ জন সৈন্য হতাহত ও নিখোঁজ হইয়াছিল—নিখোঁজ হইয়াছিল তারা, যারা, বাড়ীঘরের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়াছিল কিংবা নদী পার হইতে গিয়া ডুবিয়া মরিয়াছিল। জার্মানরা রুশদের ২,১৫৬ ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্কের স্বয়ংচালিত কামান জখম বা ধ্বংস করিয়াছিল। ১,২২০টি কামান ও মর্টার চূর্ণ এবং ৫২৭টি বিমান খতম করিয়াছিল।

অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ এবং প্রভূত রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে লালফৌজের সৈন্যরা দগ্ধ বার্লিন নগরীতে অনেক মনুষ্যত্বেরও পরিচয় দিয়াছিলেন। একটি চারতলা জ্বলন্ত অট্টালিকার মধ্যে শিশুদের আর্তক্রন্দন শুনিতে পাইয়া কয়েকজন রুশসৈন্য তাঁদের জীবন বিপন্ন করিয়া সেই শিশুদেরকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।[২]

অর্থাৎ যে বার্লিনে ফ্যাসিস্টরা মনুষ্যত্বের চরম সমাধি ঘটাইয়াছিল, সেখানে বিজয়ী লালফৌজ মানবতার ও জীবনের নতুন প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

১। The Last Battle, P, 490.
২। The Great March of Liberation, P. 272-73.

নবম পর্ব

অষ্টম অধ্যায়

জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

একমাত্র ১৯৪৫ সালের কয়েক মাসেই সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর ১০ লক্ষেরও অধিক সৈন্য নিহত হইল। লালফৌজ ৯৮ ডিভিসন শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিল এবং বন্দী করিল ৬ ডিভিসন, যখন যুদ্ধবিরতি ঘটিল তখন আরও ৯৩ ডিভিসন সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল। প্রবল পরাক্রমশালী নাৎসীবাহিনীর সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ এভাবে নষ্ট হইয়া গেল; নাৎসী জার্মানীর বিশাল সামরিক সংগঠন, গবর্নমেণ্ট এবং পার্টি অচল অবস্থায় পড়িল।

হিটলারের উত্তরাধিকারী ডোয়েনিৎস সরকার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এড়াইবার এবং পশ্চিমদিকে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট যত বেশী সম্ভব জার্মান সৈন্যের আত্মসমর্পণ ঘটাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যর্থ হইল।

উত্তর ইতালীতে ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৫, জার্মানবাহিনী আত্মসমর্পণ করিল। অন্যান্য রণাঙ্গনের আগেই শত্রুবাহিনী এখানে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল উত্তর ইতালীর পার্টিজান ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মুক্তিকামী জনগণের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য—যাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন কমিউনিস্টরা।[১]

চার্চিলের বিবরণীতে প্রকাশ যে, উত্তর ইতালীতে এপ্রিল মাসে জার্মান বাহিনীর অবস্থান খুব খারাপ হইয়া পড়িল এবং ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর—বিশেষভাবে ফিল্ড মার্শাল আলেকজান্ডারের বৃটিশ সৈন্যদলের জয়যাত্রা শুরু হইল। ২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৫, বলোগনার (Bologna) পতন হইল এবং পো নদীর যুদ্ধে জার্মানীর বিপর্যয় ঘটিল। তখন উত্তর ইতালীর জার্মান সৈন্যেরা যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মিত্রপক্ষ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করিলেন। জার্মানবাহিনীর পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি তাতে সাড়া দিলেন এবং ২৯শে এপ্রিল তারিখ বৃটিশ সদর দপ্তরে ইঙ্গ-মার্কিন ও সোভিয়েত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জার্মান পক্ষ নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিলেন। প্রায় ১০ লক্ষ জার্মান সৈন্য ধরা পড়িল এবং ইতালীর যুদ্ধে শেষ হইয়া গেল। (চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড)।

*　　　*　　　*

১লা মে, জার্মানীর হ্যাম্বুর্গ রেডিও থেকে অর্ধসত্য ও অর্ধমিথ্যা মিশানো এই মর্মে একটি বিবৃতি প্রচার করা হইল যে, 'আমাদের ফুরার এ্যাডলফ হিটলার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বলশেভিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আজ অপরাহ্নে রাইখ চ্যান্সেলারির সামরিক সদর দপ্তরে জার্মানীর জন্য জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। (অথচ হিটলার কিন্তু আগের দিন ৩০শে এপ্রিল তাঁর ভূগর্ভের বাঙ্কারে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এ কথাটি হ্যাম্বুর্গ রেডিওতে গোপন করা হইল।)

১। Great Patriotic War of the Soviet Union, P. 392.

এরপর এ্যাডমিরাল ডায়েনিৎস জার্মান নরনারী এবং সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্য ঘোষণা করিলেন—'আমাদের ফুরার এ্যাডলফ হিটলার তাঁর জীবনদান করেছেন। জার্মান জনগণ গভীরতম শোকে ও শ্রদ্ধায় তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা নত করেছেন…ফুরার আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারীপদে নিয়োগ করে গেছেন। যে বিপুল দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এলো, সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়ে আমি জার্মান জাতির এই সন্ধিক্ষণে তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করছি।…'

ঐ দিনই জার্মান সশস্ত্রবাহিনীর উদ্দেশ্যে এক নির্দেশনামায় এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস আবার ঘোষণা করিলেন ঃ

'ফুরার আমাকে রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক ও সুপ্রীম কমাণ্ডারের পদে নিয়োগ করেছেন। আমি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে কৃতসংকল্প। যতদিন পর্যন্ত বলশেভিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ আমাকে বাধা দেবেন, ততদিন তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও আমি বাধ্য। ফুরারের নিকট আপনাদের প্রত্যেকের যে শপথ ছিল, ফুরারের নিযুক্ত তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে এখন থেকে সেই শপথ সোজাসুজি ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর বর্তাবে।'

'জার্মান সৈনিকবৃন্দ, আপনাদের কর্তব্য পালন করুন! আমাদের জাতির অস্তিত্ব এখন বিপন্ন।'

এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস পরাজয়ের সেই অন্ধকারেও সোভিয়েত-বিদ্বেষ ভুলিতে পারেন নাই এবং তখনও তিনি অন্যান্য জার্মান নেতাদের মতই মিত্রপক্ষ ও রাশিয়ার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিলেন। ২রা মে, ১৯৪১, ডোয়েনিৎস তাঁর তথাকথিত গবর্নমেন্ট ও সদর দপ্তর প্লোন (Plon) থেকে জার্মান-ডেনমার্ক সীমান্তবর্তী পুরাতন শহর ফ্লেন্সবুর্গে স্থানান্তরিত করিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চার্চিল ও বৃটিশ পক্ষ ফ্লেন্সবুর্গে এই নাৎসী 'গবর্নমেন্টকে' কয়েক দিনের জন্য পৃষ্ঠপোষকতাও করিয়াছিলেন। কারণ, যুদ্ধ যতই সরকারীভাবে সমাপ্তির দিকে যাইতেছিল রাশিয়ার প্রতি চার্চিলের বিরূপতাও ততই প্রকাশ পাইতেছিল। সোভিয়েত পক্ষ স্বভাবতই এজন্য খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই ক্ষোভ একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। কেননা, নাৎসী নেতাদের মত মিত্রপক্ষের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীও জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই জয়লাভে অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিলেন এবং ইউরোপের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সত্বেও মিত্রপক্ষের দিক থেকে জার্মানীর সঙ্গে পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের কোন অনুকূল অবস্থা ছিল না। কেননা, ১৯৪৫ সালের বসন্তকালে রুজভেল্টের সঙ্গে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের যে সমস্ত "গোপন চিঠির" বিনিময় হইয়াছিল, তাতে আইনেজহাওয়ার লিখিয়াছিলেন যে পশ্চিমের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনী অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং রাশিয়াকে বাদ দিয়া জার্মানীর সঙ্গে পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রশ্ন উঠে না। ওদিকে বৃটিশ পক্ষের জেনারেল মণ্টগোমারীও আইজেনহাওয়ারের অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। (মণ্টগোমারীর স্মৃতিকথার ৩৮০ পৃষ্ঠার এর স্বীকৃতি আছে)। তারপর আমেরিকার পক্ষে আর-একটি গুরুতর প্রশ্ন ছিল। কেননা, জাপানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ তখনও বাকী ছিল এবং সেই যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল।[১]

১। The Anti-Hitler Coalition—P. 377.

২রা মে, ১৯৪৫, ডোয়েনিৎস তাঁর নূতন দপ্তর থেকে এ্যাডমিরাল ফ্রাইডবুর্গকে (Friedeburg) ফিল্ড মার্শাল বার্নার্ড মণ্টগোমারীর নিকট যুদ্ধ বিরতির আলোচনার জন্য পাঠাইলেন এবং এই মর্মে এক প্রস্তাব পেশ করিলেন যে, পশ্চিম দিকে জার্মানী আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু পূর্ব দিকে যথারীতি যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া হইবে।

মণ্টগোমারী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অধিকন্তু সমস্ত ফ্রণ্টে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করিলেন। তবে, ৪ঠা মে তারিখে একটি চুক্তি অনুসারে নেদারল্যাণ্ডস, উত্তর-পশ্চিম জার্মানী, শ্লেসভিস, হলস্টিন এবং ডেনমার্কের জার্মান সৈন্যেরা বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করিল এবং ব্যাভেরিয়ায় দিকেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিল।

অতঃপর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের যবনিকাপাত আরও ঘনাইয়া আসিল। ৭ইমে, ১৯৪৫ রাত্রি ২টা ৪১ মিনিটের সময় ডোয়েনিৎস সরকার প্রেরিত জার্মান প্রতিনিধিগণ মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধাবসানের এক প্রাথমিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিলেন। পশ্চিমের সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ারের রেইমস্ (ফ্রান্স) শহরস্থিত সদর কার্যালয়ে একটি সাধারণ কালো রঙের টেবিলের একপাশে সামরিক ইউনিফর্ম পরিহিত তিনজন জার্মান প্রতিনিধি নাৎসী নৌবহরের প্রধান সেনাপতি এ্যাডমিরাল ফ্রাইডবুর্গ জার্মান জেনারেল স্টাফের প্রধান ফিল্ড মার্শাল আলফ্রেড জড্ল (হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সহযোগীদের অন্যমত) এবং তাঁর সহকারী মেজর-জেনারেল উইলহেলম অক্সেনিয়াস (Oxenius) আসন গ্রহণ করিলেন।

আর মিত্রপক্ষের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন বৃটেনের লেঃ জেনারেল স্যার ফ্রেডরিক মরগ্যান, ফ্রান্সের জেনারেল ফ্রাঁকর সেভেজ (Francois Sevez), মিত্র নৌবহরের প্রধান এ্যাডমিরাল স্যার এইচ. এম. বারোঘ (Burrough), আইজেনহাওয়ারের প্রতিনিধি লেঃ জেনারেল বেডেল স্মিথ, মার্কিন বিমান বহরের জেনারেল কার্ল স্পাজ (Carl Spaatz) এবং সোভিয়েত পক্ষের লেঃ জেনারেল আইভ্যান চেরমিয়েভ এবং জেনারেল আইভ্যান সুশলাপ্যারোভ।

কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুষ্ঠানে আইজেনহাওয়ার স্বয়ং কিংবা তাঁর ডেপুটি এয়ার চীফ মার্শাল স্যার আর্থার টেডার উপস্থিত ছিলেন না। তাঁরা তখন অন্য একটি অফিসে ছিলেন।

বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই চতুঃশক্তির পক্ষ থেকে চারটি পৃথক দলিল তৈরী হয়েছিল এবং দলিল চারটি চার মিনিটের মধ্যে সাক্ষরিত হইয়া গেল। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ দলিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সোজা ভাষায় লেখা ছিল :

'আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণ জার্মান হাইকমাণ্ডের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া এতদ্দ্বারা মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডার এবং সেই একই সঙ্গে সোভিয়েত হাই কমাণ্ডের নিকট জল, স্থল ও বিমানবাহিনী সহ (যারা এই মুহূর্তে জার্মানীর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রহিয়াছে) নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করিতেছি।'

দলিল স্বাক্ষরের পর ফিল্ড মার্শাল আলফ্রেড জড্ল জার্মানদের পক্ষ থেকে কিছু বলিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন এবং লেঃ জেনারেল বেডেল স্মিথ মাথা নাড়িয়া অনুমতি দিলে জড্ল প্রায় কান্নার সুরে বলিলেন।

'এই দলিল স্বাক্ষরের দ্বারা জার্মান জনগণ ও সশস্ত্রবাহিনী, ভালো হোক বা মন্দ হোক, বিজয়ী পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। পাঁচ বছরের অধিক কাল যে যুদ্ধ চলিয়াছিল, সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষ সম্ভবত পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতির তুলনায় যেমন বেশী অভীষ্ট সাধন করিয়াছে, তেমন বেশী দুঃখভোগও করিয়াছে। এই মুহূর্তে আমি শুধু এই আশাই করিতে পারি যে, বিজয়ীপক্ষ তাদের সঙ্গে উদারভাবে ব্যবহার করিবেন।'

কিন্তু মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিরা জার্মান প্রতিনিধিদের এই করুণ আবেদনে সম্পূর্ণ নিঃশব্দ রহিলেন। সম্ভবত কিছুক্ষণ আগে তাঁরা জার্মান বন্দীনিবাসগুলির যে-সমস্ত বীভৎসতা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা চুপ করিয়া রহিলেন।

অতঃপর জার্মান প্রতিনিধিগণকে সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ারের কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেখানে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, বার্লিনে সোভিয়েত হাইকমাণ্ডের নিকট গিয়া জার্মান প্রতিনিধিগণকে যথারীতি আত্মসমর্পণ এবং দলিলে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

জডস অভিবাদন করিয়া সঙ্গীদের সহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সেদিন রাত্রেই জোয়েনিৎসের পক্ষ থেকে সমস্ত সশস্ত্রবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করা হইল।[১]

কিন্তু ৭ই মে গভীর রাতে রেইমসে যে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেই সংবাদ মস্কোতে প্রকাশিত হইল না। কারণ, তখনও বার্লিনের প্রধান অনুষ্ঠান বাকী ছিল এবং রেইমসের অনুষ্ঠান ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের মাত্র—যদিও পশ্চিমের নিকট ওটাই প্রধান ছিল। ৮ই মে রাত্রি ১২টার একটু আগে সোভিয়েত রাশিয়া ও সমগ্র মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত এবং অনুমোদিত (ratified) হইল। ৯ই মে সকালে মস্কো বেতার থেকে নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি প্রচারিত হইল :

বার্লিনের উপকণ্ঠে একটি প্রাক্তন মিলিটারি টেকনিক্যাল কলেজ ভবনে জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের ঐতিহাসিক ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চারটি রাষ্ট্রের—সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা হলটির শোভাবর্ধন করিতেছিল। রাত্রি বারোটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে মার্শাল জুকোভ, বৃটিশ সুপ্রীম কমাণ্ডের মার্শাল টেডার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল কার্ল স্পাজ (Spaatz), এবং ফরাসী প্রতিনিধি জেনারেল দ্য লাত্রে দ্য টার্সিনি প্রভৃতি উপস্থিত হইলেন। তাঁদের সকলের প্রতি সাদর সম্বর্ধনা জানাইয়া মার্শাল জুকোভ বলেন যে, 'মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিগণ জার্মানীর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, এখন কাজ আরম্ভ করা হোক এবং জার্মান প্রতিনিধিদের আহ্বান করা হোক'।

এরপর জার্মান হাইকমাণ্ডের ফিল্ড মার্শাল কাইটেল, অ্যাডমিরাল ফ্রেডবুর্গ, কর্নেল জেনারেল স্টাম্ফ—অর্থাৎ স্থল, জল ও বিমানবাহিনীর নায়কগণ সেই কক্ষে প্রবেশ করেন এবং সম্পূর্ণ নীরবে আসন গ্রহণ করেন।

১। স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৫৪০-৪১।

মার্শাল জুকোভ পুনরায় বলেন—"মহাশয়গণ, বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের সময় আসন্ন। আমি জার্মান হাইকমাণ্ডের প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তাঁরা কি উক্ত চুক্তিপত্র পাইয়াছেন এবং তা পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন? তাঁরা কি এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত। ফিল্ড মার্শাল টেডারও অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

ফিল্ড মার্শাল কাইটেল জার্মানদের পক্ষ থেকে অতি নিম্নস্বরে জবাব দেন—'হাঁ, আমি সম্মত'—এই বলিয়া তিনি মার্শাল জুকোভের হাতে গ্রাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি দলিল অর্পণ করেন। এই দলিলে জার্মান প্রতিনিধিদেরকে সোভিয়েত এবং মিত্রবাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডের নিকট জার্মানীর পক্ষ থেকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল।

আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন সম্পন্ন হইলে মার্শাল জুকোভ প্রস্তাব করেন—'জার্মান হাইকম্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা এখন টেবিলে আসিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে পারেন।'

জার্মান প্রতিনিধিরা একে একে আসিয়া চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। এদিকে ক্যামেরাগুলি তাঁদের ছবি লইতে থাকে। রাত্রি পৌনে-একটার সময় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে মার্শাল জুকোভ ঘোষণা করেন—'জার্মান প্রতিনিধিদল এখন যাইতে পারেন।'

বার্লিনে জার্মান প্রতিনিধিদল কর্তৃক এই আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের পর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল।

'আধুনিক ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটা জাতির সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও সেনাপতি-মণ্ডলী প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হইল।'—এই মন্তব্য করিয়াছেন মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, রুশ পক্ষ এই আত্মসমর্পণের একটি বিস্তৃত ডকুমেণ্টারি ফিল্ম তৈয়ার করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে জেনারেল আইজেন-হাওয়ার যখন মস্কো পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন যে, উক্ত ফিল্মে তাঁর সদর দপ্তর রেইমসে জার্মানদের প্রথম আত্মসমর্পণের ঘটনা কিছুই দেখানো হয় নাই।

অর্থাৎ ইউরোপে পশ্চিমের বিজয় দিবস (V. E. Day) হইল একদিন আগে এবং পূর্বের বা সোভিয়েতের বিজয় দিবস হইল একদিন পর। যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং মিত্রপক্ষের দুই তরফের মধ্যে নানা প্রশ্ন (যেমন, বন্দীশালা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো) নিয়া মনোমালিন্য দেখা দিল, তখন বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের সামান্য তারিখটাও মতান্তরের অন্যতম বিষয় ছিল।

ইউরোপের সর্বত্র জার্মান সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল এবং ৯ই মে থেকে ১৭ই মে-র মধ্যে একমাত্র লালফৌজের নিকটই মোট ১৩ লক্ষ, ৯০ হাজার ৯৭৮ জন জার্মান সৈন্য ও অফিসার এবং ১০১ জন জেনারেল আত্মসমর্পণ করিলেন। আর ওদিকে পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট তো জার্মানদের আত্মসমর্পণের ধুম পড়িয়া গেল। কেননা, বলশেভিক রাশিয়ার তুলনায় ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকেই তারা বেশী 'আপন" বলিয়া মনে করিয়াছিল। ১২ বছর ধরিয়া একচ্ছত্র নাৎসী রাজত্ব ও প্রোপাগাণ্ডার ফলে "বলশেভিক" শব্দটাই যেন জার্মানদের নিকট আতঙ্কের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল!

কিন্তু হিটলারী জার্মানীর পতন এবং ইউরোপে যুদ্ধাবসানের জন্য সর্বত্র জনগণের মধ্যে আনন্দের বান ডাকিলেও চার্চিল মনে মনে খুব প্রসন্ন ছিলেন না। কারণ, বার্লিন, ভিয়েনা ও প্রাগ যে তিনটি কেন্দ্রবিন্দুকে তিনি ইউরোপীয় ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করিতেন এবং এই মর্মকেন্দ্রগুলি যাতে সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ার দখলে চলিয়া না যায়, তার জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং তাঁর মৃত্যুর পর



চতুঃশক্তির দখলে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানী

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কাছে পর্যন্ত আবেদন জানাইয়াছিলেন। সেই কেন্দ্রগুলির একটিও ইঙ্গ-মার্কিনের দখলে আসিল না। ১৩ই এপ্রিল সোভিয়েত বাহিনী ভিয়েনা দখল করিয়া নিল এবং ২রা মে লালফৌজের হাতে বার্লিনের পতন ঘটিল। আর মে মাসের গোড়ার দিকে চেকোশ্লভাকিয়ার পশ্চিম সীমান্তের দিকে অগ্রসরমান জেনারেল প্যাটনের মার্কিন বাহিনী, যাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রাগ দখল করা, তাঁরাও থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কেননা, সোভিয়েত হাইকমাণ্ড জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে স্মরণ

করাইয়া দিলেন যে, পশ্চিম চেক সীমান্তে ইতিপূর্বেই সোভিয়েত ও মার্কিন বাহিনীর অগ্রগতির যে সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তা লংঘন করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। জেনারেল আইজেনহাওয়ার মানুষ হিসাবে খুব ভদ্র ছিলেন এবং সৈনিক হিসাবে রাজনীতি নিয়া মাথা ঘামাইতেন না। সুতরাং সোভিয়েত হাইকমান্ডের অনুরোধে তিনি সাড়া দিলেন। অথচ ফিল্ড মার্শাল শোয়েরনারের (Schoerner) অধীনে প্রচুর অস্ত্রসম্ভার সহ প্রায় ৯ লক্ষ জার্মান সৈন্য চেকোশ্লভাকিয়া দখল করিয়া রাখিয়াছিল—যদিও এই দখলদারির বিরুদ্ধে পার্টিজানরা লড়াই চালাইতেছিলেন। খাস জার্মানীর পতন একান্ত সন্নিকট হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলের জার্মানরা আত্মসমর্পণে অস্বীকৃত ছিল। সুতরাং ৬ই মে তারিখ থেকে সোভিয়েত বাহিনীর তীব্র আক্রমণ শুরু হইল এবং ১০-১১ই মে তারিখের মধ্যে চেকোশ্লাভাকিয়ার জার্মান সমরশক্তি চূর্ণ হইল। ৭ লক্ষ ৮০ হাজার নাৎসী সৈন্য ও অফিসার এবং ৩৫ জন জেনারেল বেষ্টিত হইয়া ধরা পড়িল। ৯ই মে প্রাগ লালফৌজের দখলে গেল, যদিও প্রভূত প্রাণের বিনিময়ে—১ লক্ষ ৪০ হাজার সোভিয়েত সৈন্য ও অফিসার নিহত হইলেন। কিন্তু বলকান ও পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরজা খুলিয়া গেল।

সুতরাং ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের যেভাবে অবসান হইল, তাতে চার্চিল এবং বৃটেনে ও আমেরিকায় চার্চিলপন্থীদের মহলে তেমন আনন্দের বান ডাকিবার কথা ছিল না। বিশেষতঃ আমেরিকার নিকট তখনও জাপানের সমস্যা ছিল।

৮-৯ই মে, ১৯৪৫, রাত্রি ১২-১ মিনিটের সময় ইউরোপীয় রণক্ষেত্রের কামান গর্জন স্তব্ধ হইল। ৫ বছর ৮ মাস ৭ দিন ধরিয়া ভয়াবহ রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর যে যুদ্ধের শেষ হইল, তার ফলে ইউরোপে এবং মিত্রপক্ষের সমস্ত দেশে অগণিত নরনারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বিশেষভাবে মস্কো, লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনে তো বটেই, একমাত্র জাপান ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র অগণিত মানুষ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল এবং আনন্দ-উৎসবে মত্ত হইল। অনেক ক্ষেত্রে নর-নারীর মধ্যে সামাজিক নিয়ম-কানুনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল এবং আলিঙ্গন ও চুম্বনে রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা হইল। ১৯১৪-১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর লণ্ডনের রাস্তায় আনন্দমত্ত নর-নারীর যে মিলন দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল, আমাদের দেশের পরলোকগত বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সেই দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে তিনি তখন লন্ডনে ছিলেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সেই অভিনব অভিজ্ঞতার এক নাটকীয় বর্ণনা দিয়াছিলেন, যে বর্ণনা পাঠকদের চিত্তে গভীর কৌতুক ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। কেননা, আমাদের দেশের সামাজিক প্রথায় প্রকাশ্য রাস্তায় এই ধরনের ঘটনা তখনও সম্ভব ছিল না এবং আজও সম্ভব নয়।…

মার্শাল স্ট্যালিন, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মিত্রপক্ষের এই তিন শীর্ষ নেতা পরস্পরের প্রতি অভিনন্দনজ্ঞাপক তারবার্তা বিনিময় করিলেন এবং প্রত্যেকেই মিত্রবাহিনীর সৈন্য ও জনগণের বীরত্ব, ত্যাগস্বীকার ও রণনৈপুণ্যের উচ্চ প্রশংসা করিলেন। অধিকৃত ইউরোপের মুক্তি এবং ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্য বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা যেমন এই সমস্ত অভিনন্দনবার্তায় উল্লেখ করা হইল, তেমনি আগামী দিনের

পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার জন্য এই তিন শক্তির মধ্যে বন্ধুতাপূর্ণ সম্পর্কের যে প্রয়োজন সে কথার উপরও জোর দেওয়া হইল। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁর বার্তায় সংক্ষেপে বলিলেন :

'We fully appreciate the magnificient contribution made by the mighty Soviet Union to the cause of civilization and liberty.'

আর স্ট্যালিনের বার্তায় সংক্ষেপে বলা হইল :

'The joint of the Soviet, U. S. and British Armed Forces against the German invaders, which has culminated in the latter's complete rout and defeat, will go down in history as a model military alliance between our peoples.'[১]

অর্থাৎ ট্রুম্যান স্ট্যালিনের উদ্দেশ্যে লিখিলেন যে, সভ্যতা ও স্বাধীনতার আদর্শ রক্ষায় মহাপরাক্রমশালী সোভিয়েত রাশিয়া যে অপূর্ব অবদান রাখিয়াছেন আমরা তা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করি।

আর স্টালিন লিখিলেন ট্রুম্যানের উদ্দেশ্যে :

জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ সশস্ত্র বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে জার্মানীর যে পূর্ণ পরাজয় ঘটিয়াছে, আমাদের তিন দেশের জনগণের সামাজিক মৈত্রীর আদর্শ হিসাবে ইতিহাসে তা চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিলের অভিনন্দনবার্তায় স্ট্যালিন ও লালফৌজের অকৃত্রিম প্রশংসার পর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লেখা হইয়াছিল :

'It is my firm belief that on the friendship and understaning between the British and Russian peoples depends the future of mankind.'

অর্থাৎ আমার একান্ত বিশ্বাস যে, বৃটিশ ও রুশ জনগণের পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং বোঝাপড়ার উপরই মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।[২]

(দুর্ভাগ্যক্রমে তিন বিশ্বনেতার এই পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সদিচ্ছাপূর্ণ অভিনন্দন-বার্তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা প্রকাশ সত্ত্বেও মহাযুদ্ধ অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহামৈত্রীরও অবসান হইল এবং বিভেদ ও বিরোধ দেখা দিতে লাগিল)।

* * *

মস্কোতে সোভিয়েত সভাপতিমণ্ডলীর এক ডিক্রি অনুসারে ৯ই মে বিজয় দিবস হিসাবে ঘোষিত হইল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। লালফৌজের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জানানো হইল জনগণের পক্ষ থেকে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকেও বিজয়ী সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্দেশ্যে অভিনন্দনবার্তা আসিল। সর্বাপেক্ষা বেশী উন্মাদনার সৃষ্টি হইল রাজধানী মস্কোতে। সেখানে হাজার হাজার নর-নারী রাস্তায় ভিড় জমাইতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা এক হাজার কামান থেকে লালফৌজ ও নৌ-বাহিনীর উদ্দেশ্যে ৩০ বার তোপধ্বনির দ্বারা অভিবাদন জানানো

১। Correspondence, P, 230-31.

২। চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৭।

হইল। ১৯৪১-৪৫-এর স্বদেশাত্মক যুদ্ধে জার্মানীকে পরাজিত করার জন্য এক বিশেষ পদক ও মেডেল তৈয়ারী হইল এবং ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্যকে সেই পদক উপহারের দ্বারা সম্মানিত করা হইল। ২৪শে মে, ১৯৪৫, সোভিয়েত গবর্নমেণ্ট ক্রেমলিন প্রাসাদে এক বিরাট ভোজ উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন রেড আর্মির সেনাপতিদের সম্মানের জন্য এবং এই উৎসবে কমিউনিস্ট পার্টির নায়কবৃন্দ থেকে শুরু করিয়া সোভিয়েত সমাজের সর্বস্তরের—সাহিত্যিক ও শিল্পীদের এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিনিধিদের পর্যন্ত আপ্যায়িত করা হইল। আর এক মাস পর ২৪শে জুন তারিখে রেড স্কোয়ারে ঐতিহাসিক জয়লাভের জন্য যে প্যারেড অনুষ্ঠিত হইল, তাতে সৈন্য ও অফিসারগণ পতাকা সহ মার্চ করিলেন এবং পরাজিত জার্মান বাহিনীর দুইশত রণপতাকা লেনিনের স্মৃতিসৌধের পাদদেশে নিক্ষেপ করিলেন।

এদিকে ৮ই মে, ১৯৪৫ বিজয় দিবস উপলক্ষে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার যুদ্ধে যোগদানকারী সমস্ত জাতির সৈন্যদের বীরত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য প্রশংসা জানাইলেন এবং বলিলেন, এই জয় কোন একটা বিশেষ দেশের নয়—প্রকৃতপক্ষে মিত্রপক্ষের প্রত্যেকটি নর-নারীই এই যুদ্ধজয়ে সহায়তা করিয়াছেন। যাঁরা এই মহান কর্তব্য পালনের জন্য মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, জেনারেল আইজেনহাওয়ার তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন কলিলেন।

* * *

হিটলারের উত্তরাধিকারীরূপে গ্রাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস ফ্লেন্সবুর্গে যে "গবর্নমেণ্ট" স্থাপন করিয়াছিলেন, মিত্র শক্তিবর্গ কখনও সেই গবর্নমেণ্টকে স্বীকৃতি দেন নাই। ২৩শে মে তারিখ মিত্রশক্তির সুপ্রীম কমাণ্ডারের এক আদেশবলে সেই গবর্নমেণ্টের উচ্ছেদ ঘটানো হইল এবং ডোয়েনিৎস ও তাঁর সরকারের সমস্ত সদস্য ও জার্মান হাইকমাণ্ডের নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করা হইল। যখন মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা অ্যাডমিরাল ফ্রাইড্‌বুর্গকে (যিনি রেইমস ও বার্লিনে জার্মানীর আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন) গ্রেপ্তারের জন্যে তাঁর আবাসে হানা দিল, তখন তিনি তাঁর কিছু জামাকাপড় সংগ্রহের নাম করিয়া বাথরুমে ঢুকিলেন এবং ভিতর থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন—ফ্রাইডবুর্গ সেখানে বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন।

বড় বড় নাৎসী নেতা ও সামরিক চাঁইদের গ্রেপ্তার করা হইল। অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস ছাড়াও কয়েকজন নামজাদা ফিল্ড মার্শালকে গ্রেপ্তার করা হইল, যথা—হিটলারের 'সারমেয় সদৃশ ভক্ত' উইলহেলম কাইটেল, ফন্ ক্লাইস্ট (যিনি ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন), পশ্চিম রণাঙ্গনের শেষ জার্মান সেনাপতি আলবার্ট কেসেলরি (যিনি পূর্বে ইতালীতে ছিলেন), ফার্ডিনাণ্ড ফন্ শোয়েরনার, সিগমুণ্ড উইলহেলম লিস্ট প্রভৃতি। "প্যারিসের জল্লাদ" নামে কুখ্যাত এস. এস. জেনারেল কার্ল ওবার্গ এবং বড় বড় নাৎসী রাজনৈতিক নেতারাও ধৃত হইলেন। জার্মান লেবর ফ্রণ্টের নেতা (দাস-শ্রমিক সংগ্রহে যিনি ওস্তাদ ছিলেন) ডঃ রবার্ট লে, কুখ্যাত ইহুদী হত্যাকারী জুলিয়াস স্ট্রেইচার, পোলাণ্ডের অত্যাচারী গবর্নর হ্যান্স ফ্রাঙ্ক, নাৎসী তাত্ত্বিক দার্শনিক আলফ্রেড রোজেনবার্গ, কূটনীতিবিদ ফন্ প্যাপেন এবং আরও ছোট-বড় অনেক নেতা ধরা পড়িলেন। ওঁদের সঙ্গে জেলে প্রেরিত হইলেন

উইলিয়াম জয়েস, যিনি লর্ড 'Haw Haw' নামে নাৎসী রেডিওর প্রচারকরূপে পরিচিত ছিলেন। (তিনি জাতিতে ইংরাজ ছিলেন, তিনি ধৃত হইয়া লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং দেশদ্রোহিতার অপরাধে লণ্ডনের এক কারাগারে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল।[১]

নাৎসী জার্মানীর ইতিহাসে হিটলারেয় পরেই যে দুই ব্যক্তি অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে ক্ষমতা জাহির করিয়া আসিতেছিলেন, সেই গোয়েরিং ও হিমলারের অদৃষ্টেও দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল। ৮ই মে, ১৯৪৫, অস্ট্রিয়ার একটি শহরে রাইখ মার্শাল গোয়েরিং নিজেই আত্মসমর্পণ করিবেন। লুফৎভাপে বা জার্মান বিমানবাহিনীর একচ্ছত্র অধিপতি জাঁদরেল গোয়েরিং মার্কিন বাহিনীর নিকট ধরা দিলেন এবং ধরা পড়ার পরেই তিনি উপযুক্ত খাদ্য ও মর্যাদার দাবি করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্চস্বরে হিটলারকে "একজন সংকীর্ণচিত্ত অজ্ঞ লোক" বলিয়া নিন্দা করিলেন এবং রিবেণ্ট্রপের উদ্দেশ্যে গালাগালি দিয়া বলিলেন—'ওটা একটা নির্ভেজাল বদমাশ বা স্কাউণ্ড্রেল।' তিনি আমেরিকানদের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য আরও বলিলেন যে, তিনি নিজ হাতে জার্মান রাষ্ট্রের দায়িত্বগ্রহণ করিয়া মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া ফুয়ার তাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত কথায় "চিঁড়া ভিজিল না।" তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া নুরেমবার্গের আদালতে বিচারের অপেক্ষায় রাখা হইল।

ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খুনী এবং সবচেয়ে নৃশংস গণ-হত্যাকারী গেস্টাপো (রাজনৈতিক পুলিশ) গুণ্ডা বাহিনীর সর্বোচ্চ সর্দার এবং ইহুদীদের সংহারকারী ও লিডিস্ (চেকোশ্লভাকিয়া) গ্রামের নিশ্চিহ্নকারী হাইনরিখ হিমলার ২০শে মে, ১৯৪৫, মিত্রপক্ষের হাতে ধরা পড়িলেন। সারা জার্মানীর লোক এই ব্যক্তিটিকে যমের মত ভয় করিত। বার্সেটসগ্যাডেনের নিকট একটি গোলাবাড়ীতে এই ব্যক্তিটির লুকানো যে ১০ লক্ষ ডলার ছিল, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের অনুসন্ধানের ফলে সেই বিপুল পরিমাণ মুদ্রাও ধরা পড়িয়াছিল। অথচ বাইরে হিমলার এমন ভড়ং দেখাইতেন যে, তিনি একজন অতি সহজ-সরল, সাধু প্রকৃতির লোক—মদ, স্ত্রীলোক ও তাম্রকূট স্পর্শও করেন না। অথচ তাঁর দুইটি রক্ষিতা ছিল। মাত্র ১৯ বছর বয়সে সে একজন বেশ্যার সঙ্গে বাস করিত। এই বেশ্যাটির নাম ছিল ফ্রাইডা ভাগনার (Frieda Wagner) এবং সে আবার হিমলারের চেয়ে সাত বছরের বড় ছিল। কিন্তু একদিন এই গণিকাটিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন হত্যার অভিযোগে হিমলারকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে সে আদালত থেকে মুক্তি লাভ করে। এরপর হিমলার তার চেয়ে ৭ বছরের বড় একজন নার্সকে বিবাহ করে এবং তাঁর টাকা দিয়া মিউনিকের নিকট একটি মুর্গীর কারবার খোলে। কিন্তু এই কারবার ফেল পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহও ব্যর্থ হয়। এদিকে তাঁর একজন ব্যক্তিগত মহিলা সেক্রেটারি ছিল। হিমলার তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতাই শুরু করিলেন যে, সেক্রেটারি মহোদয়া দুইবার গর্ভবতী হইলেন—একটি ছেলে ও একটি মেয়ে তিনি প্রসব করিলেন। হিমলারের কিন্তু তখনও বৈধ স্ত্রী বর্তমান ছিল।[২]

১। এণ্ড অব্ এ বার্লিন ডায়েরী—শাইরার, পৃষ্ঠা ৩৪১।
২। দি লাস্ট হাণ্ড্রেড ডেইজ, জন টোল্যাণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৫।

এহেন ভণ্ড ও অসৎ প্রকৃতির লোক হিমলার কার্যত হিটলারের পরেই জার্মানীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। কিন্তু জার্মানীর পতনের পর হিমলার শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে আত্মগোপন করিলেন—গোঁফ কামাইয়া ফেলিলেন এবং ডান দিকের চোখের উপর এক পোঁচ কালো কালির রঙ লাগাইলেন। তিনি সিভিলিয়ানের বা অ-সামরিক ব্যক্তির পোশাকে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যখন হ্যাম্বুর্গের নিকট একটি সেতু পার হইতেছিলেন, তখন বৃটিশ সৈন্যেরা তাঁকে ধরিয়া ফেলে। তিনি তাঁর গ্রেপ্তারি এড়াইবার জন্য জাল কাগজপত্র দেখাইলেন। তাতে তাঁর পরিচয় লেখা ছিল নিৎজিঙ্গার (Nitzinger)—জার্মান সিকিউরিটি পুলিশের একজন পদচ্যুত ব্যক্তি। কিন্তু গ্রেপ্তারকারীরা তাতে ভুলিলেন না। তাঁর দেহ তল্লাশী করা হইল এবং একজন ডাক্তার ডাকিয়া যখন তাঁর মুখ খুলিবার চেষ্টা হইল, তখন গেস্টাপো সর্দার তাঁর মুখের মধ্যে লুকানো নীলরংয়ের বিষের ছোট্ট শিশিটি দাঁত দিয়া ভাঙ্গিয়া খাইয়া ফেলিলেন। হিমলার দুই মিনিটের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। "গণ-হত্যাকারীর" জীবনের এটাই বোধ হয় ছিল সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন কাজ,—মন্তব্য করিয়াছেন মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার। পাইনের জঙ্গলের মধ্যে তাঁর মৃতদেহ একটা গর্তের মধ্যে গোর দেওয়া হইল এবং তাঁর এই বিদঘুটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে একজন গোরা সৈন্য বলিয়া উঠিলেন:

'Let the worm go to the worms'!

অর্থাৎ 'ঘৃণ্য কীটকে কীটের দলেই যেতে দাও!'

* * *

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ফলে জার্মান রাষ্ট্র ও গবর্নমেণ্টের সমস্ত ক্ষমতা বিজয়ীপক্ষ বা দখলকারী শক্তিবর্গের হাতে চলিয়া গেল এবং ৫ই জুন, ১৯৪৫ জার্মানীর পরাজয়ের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স—এই চতুঃশক্তি জার্মানীর সরকার ও হাইকমাণ্ডের এবং জার্মানীর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অঞ্চল ও পৌর এলাকার সর্বপ্রকার ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিলেন। জার্মানীর সমস্ত স্থল-বাহিনী ও নৌ-বাহিনীকে নিরস্ত্র করার নির্দেশ দেওয়া হইল এবং সমগ্র জার্মানীকে ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে নিরস্ত্র করার অধিকারও মিত্রপক্ষ নিজেদের হাতে রাখিলেন। জার্মানীর হাতে মিত্রপক্ষের যে সমস্ত যুদ্ধবন্দী ছিল, তাদের সকলকে ফেরত দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। প্রধান নাৎসী নেতাদেরকে এবং যাদের যুদ্ধাপরাধী বলিয়া সন্দেহ হইল, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হইল।

মিত্রপক্ষের মধ্যে চুক্তি অনুসারে সমগ্র জার্মানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্স—এই চার শক্তির মধ্যে বিভক্ত হইল। নিখিল জার্মানীর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার একটি কণ্ট্রোল কাউন্সিলের হাতে অর্পণ করা হইল এবং কাউন্সিল দখলদার বার্লিনের চারজন প্রধান সেনাপতিকে নিয়া গঠিত হইল। কিন্তু কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হওয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু জার্মানীর রাজধানী বার্লিন সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইল। কারণ, বার্লিন ছিল পূর্ব জার্মানীর সোভিয়েত অধিকৃত এলাকার মধ্যে। অথচ চতুঃশক্তির কণ্ট্রোল কাউন্সিলের

সদর দপ্তরও প্রতিষ্ঠিত হইল বার্লিনে। সুতরাং বৃহত্তর বার্লিনও দখলদার চতুঃশক্তির মধ্যে চারটি সেক্টরে কিংবা খণ্ডাংশে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেকটি খণ্ডাংশ এক-একজন কমাণ্ডারের পরিচালনাধীনে আনা হইল। এই চারটি অংশের সাধারণ সমস্যাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি 'Inter-Allied Kommandatura' (এই শব্দটি রাশিয়ান) গঠিত হইল। কিন্তু সাধারণভাবে এই 'কম্যাণ্ডাটুরা' কণ্ট্রোল কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। বলা বাহুল্য যে, নাৎসী পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হইল।

কিন্তু খাস জার্মানী রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার ফলে উহার বিস্তীর্ণ অংশ এবং শহর জনপদ ইত্যাদি ভয়াবহরূপে ধ্বংস হইয়াছিল। পলায়মান জার্মান সৈন্যেরা হিটলারের নির্দেশে বহুস্থানে পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। ফলে খাদ্য ও জীবনধারণের দৈনন্দিন বস্তু এবং যানবাহন ইত্যাদির প্রচণ্ড অভাব ঘটিল। জনসাধারণের দুর্গতি ও দুর্ভোগের কোন সীমা ছিল না। তথাপি মিত্রপক্ষ এই অবস্থায় জার্মান জনগণকে খাদ্য ও সাহায্য দেওয়ার জন্য যথাপ্রাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

সোভিয়েত অধিকৃত জার্মানীর পূর্বাংশে এবং পূর্ব বার্লিনের বড় বড় রাস্তায় ও রাস্তার মোড়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি জানাইয়া দিলেন :

'Hitlers come and go,
But the German people and German state go on—STALIN'
অর্থাৎ 'হিটলারেরা যায় এবং আসে।
কিন্তু জার্মান জাতি ও রাষ্ট্র চিরকাল থাকিবে—ইতি স্ট্যালিন।'

নোটিশে জার্মান স্টেট বা রাষ্ট্র শব্দটি উল্লেখ থাকায় অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, একটি কেন্দ্রীয় জার্মান সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নাই। তবে, পূর্ব জার্মানীর কোন কোন অংশে সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে জার্মান তরুণ-তরুণীদের বেশ "ভাব" হইয়াছিল এবং রুশেরা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহায়তা দানেরও চেষ্টা করিতেন।[১]

* * *

অধিকৃত জার্মানীতে "গুপ্তধনে"রও সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। মার্কিন বাহিনীর বিশিষ্ট সেনাপতি জেনারেল প্যাটন যখন ফ্রাংকফুর্ট অন্ মেইন অঞ্চলের দিকে অভিযান করিয়াছিলেন, তখন ৭৫ মাইল উত্তর-পূর্বে (বিমানপথে) অকস্মাৎ দুইটি জার্মান স্ত্রীলোকের কথাবার্তা থেকে মার্কার্স (Merker) লবণখনির নিকট এই গুপ্তধনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। এই খবর অনুসারে খনির ভুগর্ভে জার্মান সরকারের লুকানো ২০ কোটি ডলার মূল্যের স্বর্ণভাণ্ডার (অর্থাৎ জার্মানীর মজুত সোনার একটা মোটা অংশ) আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে পাওয়া গিয়াছিল ২৭৫ কোটি রাইখমার্ক, ডলারের হিসাবে যার মূল্য ছিল ৮ কোটি ৪০ লক্ষ। এই বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদ ছাড়াও খনিগর্ভের ২১০০ ফুট নীচে একটি ভল্টের মধ্যে বার্লিনের একটি নামকরা মিউজিয়মের প্রচুর চিত্রকলা পাওয়া গিয়াছিল, যার মূল্য ছিল অপরিসীম।[২]

১। আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৮৮৪।
২। দি লাস্ট হাণ্ড্রেড ডেইজ, পৃষ্ঠা ৪০২।

এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মার্কিন ঐতিহাসিক উইলিয়ম শাইরারের মতে হিটলার-গোয়েরিং নাৎসীচক্র অধিকৃত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এত ধনসম্পদ স্বর্ণ খাদ্য এবং কলকারখানা-জাত উৎপন্ন দ্রব্য ও চিত্রকলা ইত্যাদি লুণ্ঠনপূর্বক জার্মানীতে আনিয়াছিলেন যে, কোন মুদ্রার অঙ্কেই তার সুনির্দিষ্ট হিসাব (হাজার হাজার কোটি ডলারের) করা সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন ব্যাংক থেকে "ক্রেডিট্" হিসাবেও অজস্র মুদ্রা আদায় করা হইয়াছিল। অধিকন্তু দখলদার সৈন্য-বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষতিপূরণের নাম করিয়া এক-একটা দেশকে শোষণপূর্বক প্রায় রক্তশূন্য করা হইয়াছিল। অর্থাৎ জার্মান লুঠের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না।[১]

সুতরাং নাৎসী জার্মানীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণ ইউরোপকে যে অধিকতর সর্বনাশ থেকে রক্ষা করিয়াছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

১। শাইরার, পৃষ্ঠা ১১২২-২৩।

নবম পর্ব

নবম অধ্যায়

স্ট্যালিনের নেতৃত্ব ও জুকোভের সৈন্যাপত্য

[১৯৮৫ সালে নাৎসী-ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে মহাবিজয়ের ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত।
রুশ ভাষায় জুকোভের আসল উচ্চারণ ঝুকোভ। কিন্তু বাংলায় আমরা মহাযুদ্ধের ইতিহাসে বরাবর জুকোভ বলেই উল্লেখ করেছি। যেমন, বাংলায় বিখ্যাত নীপার নদী রুশ ভাষায় আসল উচ্চারণ দনীপার।]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে মহাবিজয়ের ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে পূর্ব ও পশ্চিমের বহু দেশে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জয়লাভকে স্মরণ করা হচ্ছে। এবং, এই জয়লাভে নাৎসী জার্মানীর হিংস্রশক্তিকে সম্পূর্ণ পরাজিত করার সবচেয়ে বড় গৌরব সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার। কিন্তু পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গ সোভিয়েত রাশিয়ার কৃতিত্বকে খাটো করার জন্য ইতিহাসের অনেক বিকৃতি ঘটিয়েছেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে উত্তর আফ্রিকার এস. আলামিনের যুদ্ধ, ভূমধ্য সাগরীয় অভিযান, ১৯৪৪ সালের জুন মাসে ফ্রান্সে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি ইত্যাদি —মিত্রপক্ষের এই ধরনের কয়েকটি রণক্রিয়ায় জার্মানীর পতনের আসল কারণ।

একথা নিঃসন্দেহ যে, সোভিয়েত রাশিয়ার অভূতপূর্ব ত্যাগস্বীকার, অতুলনীয় যুদ্ধ ও বীরত্ব এবং মার্কসবাদ-লেলিনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রণনীতি ও রণক্রিয়াই (যার সূত্রপাত করে দিয়েছিলেন সোভিয়েত বিপ্লবের গুরু স্বয়ং লেলিন) হিটলারী জার্মানীর শক্তিকে চুরমার করে দিয়েছিল এবং জার্মানীকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল। এমন কি মার্কিন সামরিক শক্তির অত্যন্ত গোপনে এ্যাটম্ বোমার নির্মাণ এবং ৬ই ও ৯ই আগস্ট (১৯৪৫) হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর বর্বর পারমাণবিক বোমা বর্ষণের দ্বারা লক্ষ লক্ষ জাপানীর প্রাণহনন ও ধ্বংস সাধনেরও কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা, হিটলারী শক্তির বিরুদ্ধে স্ট্যালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিলের যে গ্রেট্ কোয়ালিশন সৃষ্টি হয়েছিল, সেই মহাজোটের অংশীদাররূপে সোভিয়েত রাশিয়াই বার্লিন জয়ের তিন মাস পরে উত্তর চীনের মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থিত জাপানের আসল সামরিক শক্তি কোয়ান্টাং আর্মিকে পযুর্দস্ত করে দিয়েছিল— স্ট্যালিন এই সম্পর্কে আগেই রুজভেল্টকে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু রুজভেল্টের মৃত্যুর পর সোভিয়েত-বিদ্বেষী ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট পদে আরোহণ করেই বিজয়ী সোভিয়েত শক্তিকে জব্দ করার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির শুরু করলেন। পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার ও হিরোসিমায় তার পরীক্ষার আসল কূটনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়াকে জব্দ করা—যে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রভাব সহজে দূর পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত হয়েছিল এবং তখনও সেই প্রভাব প্রসারমান। এটা ধনতান্ত্রিক শক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের পক্ষে অসহ্য।

কিন্তু ইতিহাসের জটিল তথ্য সন্ধানের গহন অরণ্যে প্রবেশ না করে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই যে, নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার মহাবিজয় সম্পর্কে যে দুটি নাম অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে, তাঁদের একজন স্ট্যালিন এবং অপরজন জুকোভ। বলা বাহুল্য যে, আরও বহু নাম ও বহু সেনাপতি ও মার্শাল এবং

অসামরিক ব্যক্তি নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভে অমরকীর্তি অর্জন করেছেন। বিশ্বের ২ কোটি লোকের মৃত্যু এবং গ্রাম ও শহরগুলির অজস্র ক্ষয়ক্ষতি সাধন এখানে উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু ১৯৪১ সালের জুন মাস থেকে ১৯৪৫ সালের মে মাস পর্যন্ত যে দুইজন নেতার নাম আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, তাঁদের একজন হচ্ছেন মার্শাল জে. ভি. স্ট্যালিন এবং অপরজন মার্শাল জি. জুকোভ। কিন্তু রুশ উচ্চারণে জুকোভের আসল নাম হচ্ছে গর্গি ঝুকভ্। কিন্তু ঝুকভ্ আমাদের দেশে যুদ্ধের গোড়া থেকেই বাংলা সংবাদপত্রে জুকোভ নামে পরিচিত ও সর্বজনখ্যাত। ১৮৯৬ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। সুতরাং বিজয়া দিবসে তাঁর বয়স ছিল ৪৮ বছর। তাঁর পিতা ছিলেন একজন চর্মকার। অর্থাৎ সাধারণ ঘরের ছেলে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ থেকেই তাঁর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং একজন অপরাজেয় সামরিক পুরুষরূপে তিনি খ্যাতিমান।

সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বনামধন্য লেখক কনস্তানতিন সিমোনভ বলেছেন—'ইতিহাসখ্যাত পুরুষ হিসেবে ঝুকভের নাম দেশের মানুষের মনে লেনিনগ্রাদ আর মস্কোর রক্ষাকর্তা হিসেবে চিহ্নিত। যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে আরও সামরিক নেতার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরলেও ঝুকভই দেশের ভালোবাসার পাত্র হয়ে রয়েছেন। যে ভালোবাসা অর্জিত হয়েছে আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃখজনক মুহূর্তে আর তাই সে ভালোবাসা সবচেয়ে তীব্র।'

১৯৪১ সাল নাগাদ তিনি লালফৌজের সেনানীমণ্ডলীর প্রধান হয়েছিলেন এবং তারপর থেকে কেবল মস্কো বা লেনিনগ্রাদের রক্ষাকর্তারূপেই নয়, হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রায় প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক যুদ্ধেই জুকোভের সৈনাপত্যে ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও পরামর্শ ছিল উল্লেখযোগ্য। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, স্ট্যালিনগ্রাদ, উক্রাইন, কুরস্ক (বা কুস্কর্ক), বাইলোরুশীয়া, বার্লিন ইত্যাদির অবিস্মরণীয় যুদ্ধগুলিতে জুকোভের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। জুকোভই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি চারবার সর্বোচ্চ সোভিয়েত সম্মান—'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' খেতাব এবং দেশের ও বিদেশের বহু সম্মান লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৭ সালে মার্শাল জুকোভ নয়াদিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে একটি আন্তরিকতাপূর্ণ সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলেন।[১]

১৯৪১ সালের ২২শে জুন নাৎসী জার্মানী উত্তরমেরু সমুদ্রের কাছে ব্যারেণ্টস্ সাগর থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত ৪ হাজার ৫ শত কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গনে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ রণদক্ষ সৈন্য নিয়া ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মাইলের হিসাবে ৪,৫০০ কিলোমিটারে ২,৮৫০ মাইল। অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার মাইলের কাছাকাছি।

১৯৪১ সালের ৩০শে জুন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো স্ট্যালিনকে

১। ১৯৬২ সালে বর্তমান প্রবন্ধ লেখক ভারতীয় শান্তি ডেলিগেশনের সদস্যরূপে মস্কোর একটি বিখ্যাত হোটেলে লাঞ্চ খাওয়ার পর দৈবাৎ মার্শাল জুকোভের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেছিলেন। সেই সময় ভারতের প্রতি তাঁর অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসামূলক মনোভাব দেখে ভারতীয় প্রতিনিধিরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। জুকোভের চেহারা ছিল প্রতিভার আলোকে দীপ্ত, উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। সেই চেহারা আজও ভুলিনি।

পুরোভাগে রেখে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধ বা সিভিল ওয়ার এবং বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপের সময় লেনিন যে ধরনের শ্রমিক-কৃষক প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন করেছিলেন, এই রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটিও সেই আদর্শেই গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির হাতে সর্বপ্রকার ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল এবং কমিটির নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত সকলেই মানিতে বাধ্য ছিলেন। অবশ্য পার্টির পোলিটব্যুরো ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি সামরিক পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করে দেখতেন। পার্টি ও সামরিক কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ ছিল সর্বত্র। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রায় ১০ হাজার প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। জুলাই ও আগস্ট মাসে হাইকমাণ্ড ও সুপ্রীম হাইকমাণ্ডের একটি স্টাভ্‌কা বা কর্মপরিষদ গঠিত হয়েছিল এবং একমাত্র বিশিষ্ট নেতারাই এই পরিষদ বা স্টাভ্‌কার সদস্য ছিলেন। যুদ্ধের সময় স্ট্যালিন পাঁচটি সর্বোচ্চ সরকারী পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সুপ্রীম কমাণ্ডার-ইন-চীফ কিংবা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক। কমিউনিস্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

যদিও অবিশ্বাস্য, তবু একথা সত্য যে, যুদ্ধের সময় স্ট্যালিন প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। অবশ্য তিনি সেনানীমণ্ডলীর প্রতিদিনকার রিপোর্ট না দেখে কিম্বা তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কখনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন না।

কিন্তু গোড়ার দিকে বিভিন্ন রণাঙ্গণের সেনাপতিদের চেষ্টা সত্ত্বেও পরিস্থিতি খুব প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে এবং শত্রুর শ্রেষ্ঠতর শক্তির চাপে সোভিয়েত সৈন্যেরা ক্রমশঃ পিছু হটে যাচ্ছিল। এর একটা মুখ্য কারণ ছিল এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার দ্বারাই সৈন্য ও সেনাপতিরা চালিত হয়েছিলেন এবং নাৎসী জার্মানীর এই ধরনের যান্ত্রিক যুদ্ধ ও সর্বাত্মক আক্রমণ তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। তা'ছাড়া স্ট্যালিন নিজেও কিছু ভুল-ত্রুটির জন্য দায়ী ছিলেন। কারণ, নাৎসী জার্মানীর আক্রমণের পরেও স্ট্যালিনের আশা ছিল যে, তিনি যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে কিংবা বিলম্বিত করতে পারবেন। এজন্য সেই সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পক্ষে নিদারুণ অসুবিধা ঘটিয়েছিল—বিশেষভাবে সীমান্তের নিকটবর্তী মিলিটারি জেলাগুলিতে পূর্ণ সমর-সমাবেশ ঘটাইবার দিক থেকে। এজন্য গোড়ার দিকে পরাজিত লালফৌজকে প্রচণ্ড দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হতে এবং পশ্চাতে হটতে হয়েছিল। সীমান্তের সামরিক জেলাগুলিকে এই পরাজয়ের জন্য গোয়েবেলসের প্রচার দপ্তর প্রোপাগাণ্ডার বান ডাকিয়ে বার বার ঘোষণা করেছিল যে, সোভিয়েত রাশিয়ার পতন আসন্ন। পশ্চিমের প্রচার মাধ্যমগুলিতেও এর প্রতিধ্বনি শুনা গিয়েছিল। অপারেশন বার্বারোসা (Barbarossa) অনুযায়ী হিটলারী হাইকমাণ্ড অবশ্য চেয়েছিল লালফৌজকে সীমান্ত এলাকাতেই ঘেরাও করে সংহার করতে। কিন্তু কার্যতঃ এটা সম্ভব হয় নাই। যার পরিণাম শেষ পর্যন্ত হিটলারী বাহিনীর পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎগতি যুদ্ধ ও যান্ত্রিক যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি ঘটিয়ে হিটলারী

বাহিনী যেভাবে প্রায় সমস্ত ইউরোপ দখল করে নিয়েছিল এবং প্রুশিয়ান সামরিক ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা নিয়ে অস্ত্রবলে ও লোকবলে শ্রেষ্ঠতর শক্তিসহ সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করেছিল। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ সেই তুলনায় উপযুক্তভাবে প্রস্তুতে ছিলেন না। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ এবং বে-সামরিক গোয়েন্দাগণ কিংবা লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের সরকারী মহল থেকে, এমন কি চার্চিল এবং রুজভেল্টের পক্ষ থেকেও স্বয়ং স্ট্যালিন ও সোভিয়েত সরকারকে আসন্ন হিটলারী আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া সত্বেও স্ট্যালিন এগুলি বিশ্বাস করতে চাহেন নি। প্রথমতঃ, সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি ছিল শান্তির স্বপক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়তঃ, সোভিয়েত বিপ্লবের পর থেকে পশ্চিমী শক্তিবর্গ রাশিয়াকে জব্দ, হতমান ও দুর্বল করার জন্য যত প্রকারে সম্ভব হীন কৌশল অবলম্বন করেছিল এবং এই কৌশলই চেম্বারলেন-দালাদিয়েরের কুখ্যাত তোষণনীতি ও মিউনিক চুক্তির বিশ্বাসঘাতকের রূপ গ্রহণ করেছিল। সুতরাং স্ট্যালিন ও সোভিয়েত সরকার যদি সদ্য অতীতের এই সমস্ত ভয়াবহ ঘটনাবলী স্মরণ করে লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনের কিংবা বিভিন্ন বে-সরকারী গোয়েন্দা-সূত্রের সংবাদের উপর তেমন গুরুত্ব না দিয়ে থাকেন, তবে, স্ট্যালিনকে তার জন্য খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ হিটলারী জার্মানীর সঙ্গে ঘটনাচক্রে অনাক্রমণ চুক্তি (যে চুক্তির উদ্যোক্তা ছিলেন হিটলার ও রিবেনট্রপ) স্বাক্ষরে বাধ্য হওয়ার পর স্ট্যালিন শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলেন যে, এভাবে এক তরফা চুক্তি ভঙ্গ করে হিটলার হয়তো রাশিয়া আক্রমণ করবেন না। এজন্যই দেখা যায় যে, পরবর্তীকালে হিটলার-বিরোধী মহাজোট গঠিত হওয়ার পর ক্রেমলিনে এক বৈঠকে স্ট্যালিন মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ন্যূনতম নৈতিক মানদণ্ডও হিটলারের জার্মানী রক্ষা করে নাই। এই মানদণ্ড ছাড়া সভ্য পৃথিবীর কাজ চলতে পারে না।

তবু স্ট্যালিন কিন্তু হিটলারকে মূর্খ, পাগল কিংবা বোকা মনে করতেন না। বরং স্ট্যালিনের মতে হিটলার খুব চতুর এবং সাংগঠনিক বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। যেভাবে তিনি সমগ্র জার্মানীকে করায়ত্ত করেছিলেন, সেটা তাঁর দক্ষতারই পরিচায়ক। কিন্তু মানুষের-সঙ্গে-মানুষের সম্পর্কের ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁর ধ্যান-ধারণা ছিল আদিম বর্বর যুগের মত! হিটলারী আমলে জার্মানীর শ্রমিক শ্রেণীও সম্পূর্ণ বিপরীত পথে (মার্কসীয় বিচারে) চলে গিয়েছিল। সুতরাং এই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও কিছু আশা করার ছিল না।

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রথম দিকে সোভিয়েত জেনারেল যদি প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়েই রণক্ষেত্রে চালিত হয়েছিলেন, যদিও তত্ত্বগতভাবে তাঁরা আধুনিকতম রণনীতি ও ও রণকৌশল সম্পর্কে অবগত ছিলেন, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁরা পুরাতন পন্থাতেই অনুকরণ করেছিলেন। ডেপুটি সুপ্রীম কমাণ্ডার মার্শাল জুকোভ নিজেই স্বীকার করেছেন:

…"it will be only fair to say that many of the ranking operators of the Defence Commissariet and the General Staff relied too much on the experience of World War I. In theory, of course, most of the commanders of the tactical and strategic echelon, including the

general staff leadership, were aware of the changes that had occurred since then in the nature and methods of warfare. But in fact they had prepared themselves to fight along the old lines....'

এই সম্পর্কে মার্শাল জুকোভ অবশ্য জেনারেল পদের প্রাক্তন প্রধান বা চীফ হিসাবে নিজের ত্রুটি ও দায়িত্বও স্বীকার করেছেন। ১৯৮৫ সালে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত মার্শাল জুকোভের এই আত্মজীবনী সোভিয়েত-জার্মান সংগ্রামের দিক থেকে সবচেয়ে প্রামাণিক। বইটি মস্কো থেকে প্রকাশিত।

স্ট্যালিন সম্পর্কেও তিনি উল্লেখ করেছেন যে,—

'Last but not least, a conspicuous rore was played by the fact that right up to the last moment—to the moment when the Nazis attacked the Soviet Union—Stalin kept dinging to the hope that he would still manage to delay the outbreak of war.

অথচ স্ট্যালিন কিন্তু নাৎসী জার্মানীকে কখনও বিশ্বাস করতেন না এবং যুদ্ধের কিছুকাল আগেও তরুণ সেনাশিক্ষার্থীদের এক সভায় তিনি তাঁদেরকে সতর্ক করেও দিয়েছিলেন এবং ১৯৩৯ সালে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, স্ট্যালিনের দিকে থেকে তার মূলগত উদ্দেশ্য ছিল দম ফেলার জন্য সময় নেওয়া এবং প্রতিরক্ষার জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়া। তিনি ইঙ্গ-ফরাসী তোষণ-নীতি সম্পর্কেও সম্পূর্ণরূপেই সচেতন ছিলেন এবং বলেছিলেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স প্রভৃতি হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য তো করেন নাই, বরং নাৎসী শক্তিকে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সর্বতোভাবে উস্কানি ও সহায়তা দিচ্ছেন।

কিন্তু এই সমস্ত জানা সত্ত্বেও স্ট্যালিন কিছু কিছু ভুল করেছিলেন। কারণ, কোন মানুষই সম্পূর্ণরূপে ভুলের ঊর্ধ্বে নন। স্ট্যালিনও শেষ পর্যন্ত প্রকারান্তরে তাঁর এই সমস্ত ভুল-ত্রুটির কথা স্বীকার করেছিলেন।

কিন্তু সুপ্রীম কমাণ্ডার-ইন-চীফ হিসাবে তাঁর দক্ষতা, তীক্ষ্ণতা, পরিশ্রম ও যুদ্ধ পরিচালনা এবং দূরদৃষ্টির কোন তুলনা ছিল না। চার্চিল ও রুজভেল্টও স্ট্যালিন ও সোভিয়েত বাহিনীর এই বিস্ময়কর কৃতিত্বকে স্বীকার করেছেন। তবে স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের পরেই সোভিয়েত রাশিয়া সব দিক থেকে সামলে উঠতে পেরেছিল এবং আধুনিকতম যুদ্ধের সম্পূর্ণ উপদেষ্টা হয়ে উঠেছিল।

সোভিয়েত রাশিয়া কিন্তু মহাযুদ্ধ বিজয়ে মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্য ও অবদানকে অস্বীকার করেনি এবং স্ট্যালিন ও সোভিয়েত জনগণ সর্বদাই সেগুলির সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা, ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গনে, উত্তর আফ্রিকার ঘাঁটিগুলিতে অবরোধ ও জয়লাভ, সিসিলি দ্বীপ অধিকার ও ইতালীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির সাফল্যজনক আক্রমণ অভিযান নিশ্চয়ই মহাযুদ্ধ জয়ে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই সমস্ত যুদ্ধ মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও জার্মান সমর শক্তির বিরুদ্ধে কখনও প্রত্যক্ষ আঘাত হানতে পারেনি। এমন কি, কর্জ ও ইজারা আইন অনুসারে সোভিয়েত রাশিয়াকে মার্কিন "গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার" থেকে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল, যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় তার প্রয়োজন কম ছিল না।

কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার নিজস্ব উৎপাদনের হিসাবে সেই সহায়তা শতকরা ৫ ভাগের বেশী ছিল না। কিন্তু মহাযুদ্ধের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমী লেখকেরা ঐতিহাসিক যুদ্ধ জয়ের আসল কারণরূপে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে ইতিহাসের নিদারুণ বিকৃতি ঘটিয়েছেন। আর দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি তো চার্চিল-রুজভেল্টের সরকারি মহলের সোভিয়েত বিরোধীরা ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছিলেন। যখন দেখা গেল যে, সোভিয়েত রাশিয়া একাই জার্মানীকে সাবাড় করে বিজয়ী লাল ফৌজই ইংলিশ চ্যানেলের তীর পর্যন্ত পেঁছুতে পারে তখন লাল জুজুর আতংকে অস্থির হয়ে গ্রীষ্মে মিত্রবাহিনীর অবতরণ ঘটানো হয়েছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক সত্যের দিক থেকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সঙ্গে নাৎসী শক্তির চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্পর্ক সামান্যই ছিল।

১৯৪৫ সালে বার্লিনের ভূগর্ভে হিটলার প্রণয়িণী ইভা ব্রাউনের সঙ্গে আত্মহত্যা করার আগেই ইতালীতে মুসোলিনীর (যিনি ছিলেন ইউরোপে ফ্যাসিজমের জনক) বিপর্যয় এবং পার্টিজানদের হাতে ধৃত ও প্রণয়িনীসহ নিহত হওয়ার খবর পেয়েছিলেন। এভাবে নাৎসী বর্বরেরা একে-একে অনেকেই অপঘাতে মৃত্যুবরণে বাধ্য হয়েছিল।

নাৎসী জার্মানী পশ্চিম ইউরোপে সহজ জয়লাভের ফলে নিজেদের শক্তির উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। তারা জাতিবিদ্বেষ ও জাতি-দম্ভের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং বলশেভিক বর্বরদের সম্পর্কে অন্ধবিদ্বেষ ছিল। ফলে অপর দেশের অভ্যন্তরে আক্রমণাত্মক অন্যায় যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁরা রাজনীতি ও মতাদর্শের কথা মোটেই বিবেচনা করে নি। কিন্তু রাজনীতি বিবর্জিত রণনীতি যে, এইরূপে চলতে পারে না, এই বোধ তাদের ছিল না।

অপর পক্ষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়নের আসল শক্তির উৎস তারা আদৌ অনুধাবন করতে পারে নি। সরকার, পার্টি ও জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বদেশপ্রেমের মহান যুদ্ধে যেন ব্রত উৎযাপনের মত নাৎসী আক্রমণের মুখে লেনিনের রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য ইতিহাসের অতুলনীয় সংগ্রাম করেছিল।

১৯৪১-১৯৪২ সালে মস্কোর রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর প্রথম নিদারুণ পরাজয়ই হিটলারী রণশক্তির অপরাজেয়তার কল্প-কাহিনীর ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং ব্লিজক্রীগের পরিকল্পনাকে কবরে পাঠিয়েছিল। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় তিন বছর ধরে (১৯৪১-১৯৪৪) সোভিয়েত রাশিয়া একাই নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ করেছিল। রাশিয়ার প্রত্যেকটি পরিবার থেকেই একজন করে মৃত্যুবরণ করেছিল। এই অবিশ্বাস্য মূল্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে যে মহাবিজয় অর্জন করেছিল, তারই ফলে পৃথিবীতে ৩০০ বছরের পুরানো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে। এবং ১০০টির বেশী দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আজ আমরা পৃথিবীকে একবিংশ শতকের এক নতুন যুগ ও নতুন সভ্যতার সম্মুখীন হতে চলেছি—অবশ্য যদি ইতিমধ্যে প্রলয়ংকর পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাতে মনুষ্য জাতির ধ্বংস না হয়।

নবম পর্ব

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা : স্যানফ্রানসিস্কোর সম্মেলন

ইউরোপে যখন প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন থেকেই মিত্রশক্তির নেতারা মহাযুদ্ধের শেষে ভবিষ্যৎ বিশ্বশান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতেছিলেন। ১৯৪৩ সালের ১৯শে থেকে ৩০শে অক্টোবর পর্যন্ত মস্কোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী সম্মেলনের ভবিষ্যৎ শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে বিস্তৃত আলোচনার পর যে সাত দফা চুক্তি সম্বলিত ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল, তাতে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রস্তাব ছিল এবং এই ইস্তাহারে চীনের রাষ্ট্রদূতও স্বাক্ষর দিয়াছিলেন। সুতরাং কার্যত এটি ছিল চতুঃশক্তির ঘোষণাপত্র।[১]

মিত্রশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এই প্রস্তাব অনুযায়ী ২১শে আগস্ট থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস্ ভবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাতে পুনরায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি "বিশ্ব সংগঠন" গড়িয়া তোলা এবং একটি সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনসহ চার দফা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ডাম্বারটন ওকসের এই সমস্ত প্রস্তাব অনুযায়ীই ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাঠামো তৈয়ারির সূত্রপাত হইয়াছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়াল্টাতে (ক্রিমিয়া) তিন বিশ্বনেতা মার্শাল স্ট্যালিন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যে ঐতিহাসিক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন, সেই বৈঠকে মহাযুদ্ধের শেষে অবিলম্বেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বস্তি রক্ষার জন্য একটি সংগঠন স্থাপনের কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হইয়াছিল। কেননা, তখন জার্মানীর আসন্ন পরাজয় ও পতন সম্পর্কে আর কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই প্রকার মহাবিপর্যয়ের যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটিতে পারে, সেজন্য তিন বিশ্বনেতাই অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন। সুতরাং ইয়াল্টা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হইল যে, ডাম্বারটন ওকসের প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী ২৫শে এপ্রিল, ১৯৫৫, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত স্যানফ্রানসিস্কোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইবে এবং সেখানে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি চার্টার বা সনদ রচিত হইবে। এই বিষয়ে চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন একমত ছিলেন এবং যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তান্বিত ছিলেন। তাঁরা একথাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের তিন বৃহৎ শক্তির মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা না থাকিলে আগামী দিনের পৃথিবীতে শান্তি ও স্বস্তি রক্ষা করা

১। Historic Documents of World II. P. 92.

যাইবে না। চার্চিল সেই সময় এমন মনোভাবও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে পারস্পরিক ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। আর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫, লিখিয়াছিলেন—'আমরা তিন রাষ্ট্র যেমন যুদ্ধের সময় সহযোগিতা করিতে পারিয়াছি, তেমন শান্তির সময়েও সহযোগিতা করিতে পারিব।'[১]

ইয়াল্টা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫শে এপ্রিল, ১৯৪৫ স্যানফ্রানসিস্কো শহরে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হইল, কূটনীতির ইতিহাসে সেটা ছিল অন্যতম বৃহত্তম সম্মেলন এবং সেই ২৫শে এপ্রিল তারিখটিও ছিল গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক। কারণ, ওই দিন জার্মানীর অভ্যন্তরে এলবে নদীর ধারে টোরগাউতে সোভিয়েত ও ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছিলেন। সেই সময় মিত্রপক্ষের অনেকের নিকট এই মিলন এবং স্যানফ্রানসিস্কোর সম্মেলন ভবিষ্যতের শান্তি রক্ষার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের ঐক্য ও সহযোগিতার প্রতীকরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। সম্মেলন ভবনে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অর্ধনমিত করা হইয়াছিল এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টই যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশী আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং স্ট্যালিন তথা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাতেও কোন সন্দেহ নাই।

সেই সময় স্যানফ্রানসিস্কো ছিল আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধযাত্রার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। সুতরাং এই কর্মব্যস্ত ও জনাকীর্ণ শহরে ৪৬টি (পরে আরও ৪টি) জাতির হাজার হাজার প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও কর্মচারী যখন আসিয়া হাজির হইলেন প্লেন ও ট্রেনযোগে তখন এতগুলি লোকের জন্য আতিথেয়তার প্রশ্নটাও সহজ ছিল না। অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, বলিভিয়া ও "ভারত" (অবশ্যই বৃটিশ সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি) থেকে শুরু করিয়া যুগোশ্লাভিয়া পর্যন্ত ৪৬টি জাতি (পরে বেলোরুশিয়া, উক্রাইন এবং ডেনমার্ক ও আর্জেণ্টিনা—এই চারটি দেশের প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়েছিলেন) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হিসাবে সম্মেলনে যোগ দিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জেনেভাতে যে লীগ অব নেশন্স গঠিত হইয়াছিল এবং যদিও সেই সংগঠনেরও উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর শান্তি রক্ষা, তবু শেষ পর্যন্ত সেটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল এবং তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসন পশ্চিম ইউরোপীয় কূটনৈতিক নেতাদের চালবাজিতে বিরক্ত ও হতাশ হইয়াছিলেন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে কখনও যোগ দেন নাই)। সেই ব্যর্থতার ইতিহাস থেকে এবারের মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ও মিত্রপক্ষের নেতারা সাবধান হইয়াছিলেন। সেবার লীগ অব নেশন্স বা বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল মহাযুদ্ধের অবসানের পর এবং সেই সময় মিত্রপক্ষীয় নেতারা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে পরাজিত জার্মানীকে একটা শান্তিসন্ধি মারফৎ কত বেশী জব্দ করা যায়, যেন সেদিকেই বেশী মনোযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এবার তার বিপরীত দৃশ্য দেখা গেল। এবার জার্মানী বা ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের চূড়ান্ত পরাজয় কিংবা যুদ্ধাবসানের অনেক আগে থেকেই এমন কি বলা যাইতে পারে যে, ১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট চার্চিল-রুজভেল্ট ঘোষিত

১। প্যাট্রিয়টিক ওয়ার অব দি সোভিয়েত ইউনিয়ন, পৃষ্ঠা ৩১৬।

অতলান্তিক সনদের অনুচ্ছেদগুলির মধ্যেই ভাবী পৃথিবীর শান্তি রক্ষার বীজ উপ্ত করা হইয়াছিল এবং ১৯৪৩ সালের মস্কোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক থেকে শুরু করিয়া ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ইয়াল্টাতে মিত্রপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন পর্যন্ত বারবার প্রশ্নটি নিয়া আলোচনা করা হইয়াছিল। সুতরাং প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তিন প্রধান নেতা রুজভেল্ট-চার্চিল-স্ট্যালিন অনেক বেশী বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারি ইউনাইটেড নেশন্স বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণায় যে সমস্ত রাষ্ট্র স্বাক্ষর দিয়াছিলেন, কিংবা পরে যারা এই ঘোষণার শর্ত মানিয়া লইয়া ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, তারা সকলেই স্যানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু প্রথমে মহাযুদ্ধের তুলনায় এবারের মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। কেননা, এবারের মহাযুদ্ধে পৃথিবীর একমাত্র সোসিয়েলিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাধান্য ছিল। ফলে, হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যোগদানকারী মিত্রপুঞ্জের শাসকমহলে যারা প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিল, তারা নানা ছুতোয় ও কৌশলে রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণের সুযোগ খুঁজিত। স্যানফ্রানসিস্কো সম্মেলনেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যে ৪২টি রাষ্ট্র বৃহৎ চতুঃশক্তি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে ১৯টি ছিল লাতিন আমেরিকার দেশ এবং ৫টি ছিল বৃটিশ ডোমিনিয়ন। সুতরাং জাতিপুঞ্জের বা রাষ্ট্রসংঘের সংগঠনে বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেজরিটি সুনিশ্চিত হইল। এই দেশগুলি ছাড়া তথাকথিত নিরপেক্ষ দেশ, যেমন—আয়ার, আইসল্যাণ্ড, পর্তুগাল ও সুইডেন আমন্ত্রিত হইল এবং ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও শ্যামও বাদ গেল না—যদি তখন পর্যন্ত এগুলির সকলেই সম্পূর্ণরূপে ফ্যাসিস্ট রাহুমুক্ত ছিল না। অপর পক্ষে আলবানিয়া, পোল্যাণ্ড ও মঙ্গোলিয়ান প্রজাতন্ত্রকে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ আমন্ত্রণ জানাইতে অস্বীকৃত হইলেন। কেননা, এই রাষ্ট্রগুলিকে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনও কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেন নাই। প্রাক্তন শত্রুরাষ্ট্র ইতালী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং ফিনল্যাণ্ডকেও সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই। ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃক স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির প্রশ্নে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমন্ত্রিত ৪২টি রাষ্ট্রের সকলের সঙ্গেই সোভিয়েত রাশিয়ারও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। তবু রাশিয়া এদের উপস্থিতি মনিয়া লইয়াছিল। কিন্তু আর্জেন্টিনার প্রশ্নে সোভিয়েত প্রতিনিধি মলোটভ তীব্র আপত্তি জানাইলেন। কারণ, যুদ্ধের সময় আর্জেন্টিনা সরকার শত্রুপক্ষকে সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাঁর সমর্থকগণ আর্জেন্টিনাকে গ্রহণের জন্য জিদ করিলেন। সুতরাং ৩০শে এপ্রিল আর্জেন্টিনাকে সম্মেলনে যোগদার জন্য আহ্বান জানানো হইল। যে পাঁচটি বৃটিশ ডোমিনিয়ন সম্মেলনে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রিত হইল, সেগুলি নিশ্চয়ই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু তারা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, এই যুক্তিতে সম্মেলনে আহূত হইল।

অপর পক্ষে ইয়াল্টাতে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে স্ট্যালিন রুজভেল্টের নিকট ১৬টি অতিরিক্ত ভোটের দাবি জানাইয়াছিলেন। কেননা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৬টি প্রজাতন্ত্র বা স্বাধীন অঙ্গরাজ্য নিয়া গঠিত। সুতরাং এদের প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত। এর জবাবে

রুজভেল্ট বলিলেন যে, তাঁরও অতিরিক্ত ৪৮টি ভোটের দরকার। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪৮টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়া গঠিত। সুতরাং তাঁরও অনুরূপ-সংখ্যক ভোট চাই। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, রুজভেল্টের কাছ থেকে তুড়ুক জবাব পাইয়া স্ট্যালিন একেবারে চুপ করিয়া যান। তিনি আর ১৬টি ভোটের নামগন্ধও করিলেন না। তবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ২টি রিপাব্লিককে—উক্রাইন ও বেলোরুশিয়াকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। চার্চিল ও রুজভেল্ট ইয়াল্টাতেই স্ট্যালিনের এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলেন।

(আসলে পাঁচটি বৃটিশ ডোমিনিয়নের ভোটাধিকার লাভের জন্যই চার্চিল স্ট্যালিনের প্রস্তাব মানিয়া নিয়াছিলেন।)

সুতরাং স্যানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়ার ২টি অতিরিক্ত সদস্যপদের দাবি মঞ্জুর হইল। কিন্তু সোভিয়েত প্রভাবিত পোল্যাণ্ডকে কিছুতেই গ্রহণ করা হইল না।

* * *

অধিবেশনের প্রথম দিনে বৃহৎ চতুঃশক্তির অর্থাৎ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ আগামী দিনের পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যে গড়িয়া তোলা দরকার, এই তথ্যের উপর বিশেষ জোর দিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের প্রয়োজন সোভিয়েত প্রতিনিধির বক্তৃতায় সেই দিকটা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ইডেন তাঁর বক্তৃতায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, যদি ভবিষ্যতে শান্তি রক্ষা করিতে না পারা যায় এবং আর-একটি বিশ্বযুদ্ধ লাগে, তবে সমগ্র মনুষ্যসভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

সাধারণত ডাম্বারটন ওকসের গৃহীত প্রস্তাবাবলীর উপর ভিত্তি করিয়াই সম্মেলনের মূল কর্মসূচী অনুসৃত হইতেছিল বটে, কিন্তু সেই বৈঠক আসলে সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র চারটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে। সুতরাং এবারের বৃহত্তর সম্মেলনে ছোট ছোট শক্তির পক্ষ থেকে কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে যেমন বিতর্কের অনুষ্ঠান হইল, তেমনি কোন কোন প্রস্তাবের সংশোধনেরও চেষ্টা হইল। এই সমস্ত বিতর্কের উদ্যোক্তা ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ ইভাট্। তিনি প্রস্তাবিত সিকিউরিটি কাউন্সিলের সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে, এই পরিষদের হাতে এত ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে সমগ্র সংগঠনের উপর পরিষদের (কাউন্সিলের) ডিক্টেটরি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বৃটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ফ্রান্স এই পঞ্চশক্তিই সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য। এঁরা ছাড়া জেনারেল এসেম্বলি কর্তৃক আরও ৬টি জাতির প্রতিনিধি সদস্যপদে নির্বাচিত হইবেন—প্রত্যেকে দুই বছরের জন্য। অর্থাৎ স্থায়ী ও অস্থায়ী সহ সিকিউরিটি কাউন্সিল মোট ১১ জন সদস্য নিয়া গঠিত হইবে। কিন্তু সম্মেলনে দিনের পর-দিন গভীর বিতর্ক চলিল সিকিউরিটি কাউন্সিলের ভোটদানের অধিকার ও পদ্ধতি নিয়া এবং যুদ্ধ নিবারণের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের মূলনীতি ও সনদ বা চার্টার রচনা নিয়া। সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রেই

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী পাঁচ সদস্যকে একমত হইতে হইবে, অন্যথা সেই সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব বাতিল হইয়া যাইবে। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই ভিটো প্রয়োগের অধিকার নিয়া ছোট ছোট শক্তিসমূহ তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভিটো প্রয়োগের অধিকার মানিয়া লওয়া হইল। কেননা বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া শান্তিরক্ষা করা কিংবা কোন বিরোধের মীমাংসা করা যে সম্ভব নয়—এই বাস্তব সত্যটা সম্মেলনে স্বীকার করিয়া নেওয়া হইল। সেই সঙ্গে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে এটাও স্থির হইল যে, 'সিকিউরিটি কাউন্সিল কোন বিরোধের আলোচনা উত্থাপনে কোন একটি মাত্র রাষ্ট্র বাধা দিয়া রাখিতে পারবে না।'[১]

আগামীদিনের পৃথিবীকে যুদ্ধ, আগ্রাসন বা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে রক্ষা করার জন্য সম্মেলনে উপস্থিত ছোট-বড় কোন দেশের প্রতিনিধিরই আগ্রহের অভাব ছিল না এবং বহু তর্ক-বিতর্ক ও সংশোধনের পর ডাম্বারটন ওকসের গৃহীত প্রস্তাব বা মূলনীতির উপর সনদ রচনায়ও কোন বাধা রহিল না।

২৬শে জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেন্ড ট্রুম্যান অধিবেশনের উপসংহার বক্তৃতায় বলিলেন:

'এই সনদ কোন একটি মাত্র জাতির কিংবা ছোট বড় কোন জাতিগোষ্ঠীর রচিত নয়। এই সনদ রচনা সম্ভব হইয়াছে পরস্পরের দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে এবং অপরের মতামত ও স্বার্থের প্রতি সহনশীলতার গুণে। এর দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, সাধারণ মানুষের মত জাতিসমূহও তাঁদের মত-বৈষম্য প্রকাশ করিতে, সেগুলির মুখোমুখি দাঁড়াতে এবং মীমাংসার জন্য এক একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি খুঁজিয়া পাইতে পারেন। গণতন্ত্রের এটাই সারবস্তু এবং ভবিষ্যৎ শান্তি রক্ষারও এটাই মূলমন্ত্র।'

পৃথিবীর জনগণের পাঁচভাগের মধ্যে চারভাগের প্রতিনিধি তুল্য মোট ৫০টি জাতি ভবিষ্যৎ মনুষ্যজাতির বহু সমস্যার মীমাংসায় একত্র একাজ করিতে সম্মত হইলেন এবং ৫০টি জাতির প্রতিনিধিরা এই নূতন সনদে বা চার্টারে স্বাক্ষর দিলেন। চূড়ান্তভাবে গৃহীত সনদের মুখবন্ধে (ফিল্ড মার্শাল স্মার্টসের রচিত) ঘোষণা করা হইল:

'We the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war…to reaffirm faith in fundamental human rights…to establish conditions under which justice can be maintained…to promote social progress and better standards of life in larger freedom to practise tolerance and live together in peace with one another, as good neighbours to unite our strength to maintain international peace and security have resolved to combine our efforts to accomplish these aims.…'[২]

এই সনদের বলে যে আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তার সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমান সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করা হইবে এবং এই সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্র হইতেছেন

১। পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩২০।
২। The Second Great War—Vol. 9. P. 3935.

তাঁরা (অন্ততঃ আপাতত সাময়িকভাবে) যাঁরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তাঁরা সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করিবেন, অন্য কোন রাষ্ট্রকে ভীতিপ্রদর্শন কিংবা বলপ্রয়োগ থেকে ক্ষান্ত থাকিবেন। যদি এই আন্তর্জাতিক সংগঠন সনদের গৃহীত মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কোন রাষ্ট্রের (সদস্য হোক বা নাই হোক) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়, তবে, সদস্য রাষ্ট্রগণ সর্বতোভাবে সংগঠনকে সাহায্য দিবেন।

এই বিশ্ব সংগঠনের পাঁচটি প্রধান অঙ্গ বা সেক্রেটারিয়েট থাকিবে এবং সনদ অনুযায়ী প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট কর্তব্য থাকিবে। সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র নিয়া একটি জেনারেল এসেম্বলি গঠিত হইবে এবং সেখানে যে কোন সদস্য যে কোন বিষয় নিয়া (চার্টারের বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী) আলোচনা উত্থাপন করিতে পারিবেন। আর সিকিউরিটি কাউন্সিল আগ্রাসন বা যুদ্ধ নিবারণের জন্য সাময়িক সহায়তা পাইবেন এবং এই সাহায্য দেওয়ার জন্য একটি মিলিটারি স্টাফ কমিটি গঠিত হইবে। তবে আগ্রাসন বা যুদ্ধ নিবারণের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যসহ ৭ জন সদস্যকেই একমত হইতে হইবে।

সনদের নিয়মানুযায়ী ১৫ জন সদস্য নিয়া একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ও গঠিত হইল এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুশীলন ও রিপোর্ট করার জন্য একটি সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনোমিক কাউন্সিল গঠিত হইল। পৃথিবীব্যাপী জনগণের পূর্ণ জীবিকার ব্যবস্থা ও জীবনের মান-উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়াই এই সমস্ত সংস্থা গঠিত হইল।

এগুলি ছাড়াও প্রথম মহাযুদ্ধের জের স্বরূপ যে-সমস্ত ভূমিখণ্ড, অঞ্চল ও দ্বীপপুঞ্জ পরাধীন কিংবা লীগের ম্যাণ্ডেট্ অনুযায়ী ইজারাভুক্ত ছিল—বিশেষত প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের পরিচালনাধীন ছিল, সেই সমস্ত দ্বীপ ও এলাকা নূতন করিয়া বিলিব্যবস্থার প্রশ্ন উঠিল। কারণ, জাপানের দখলদারি বা ইজারা থেকে এই সমস্ত অঞ্চল ও দ্বীপগুলিকে মুক্তি দেওয়া হইবে, এই নীতি আগেই মিত্রপক্ষের তরফ থেকে ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু সদ্য গৃহীত রাষ্ট্রসঙ্ঘের চার্টার অনুযায়ী এগুলির বিলি-ব্যবস্থা করিতে গিয়া দেখা গেল যে, সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রসমূহ এই বিষয়ে খুব উৎসাহী নন। অথচ সনদ অনুযায়ী সকলের সমান অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা ঘোষিত হইয়াছিল। এদিক দিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার বিবেকবুদ্ধি ও নীতি পরিষ্কার ছিল। কারণ, তাঁরা সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার বিরোধী ছিলেন। পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও উপনিবেশের বিরোধী ছিলেন এবং যদিও তাঁর উত্তরাধিকারী প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মুখে অনুরূপ কথা বলিতেন, তথাপি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার বিপুল ঔপনিবেশিক স্বার্থের (গুয়াম, ফিলিপিন্স ইত্যাদি) কথা মার্কিন প্রতিনিধিরা ভুলিতে পারিলেন না। বিশেষত মার্শাল, ম্যারিয়ানা ও ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য দ্বীপ, যেগুলি জাপানের শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছিল, সেগুলির বিষয়ে মার্কিন নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠিল। এছাড়া বৃটিশ ও ওলন্দাজদের সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের প্রশ্ন তো ছিলই।[১]

১। Momoirs by Harry S. Truman, P. 305.

সুতরাং এই সমস্ত দ্বীপ, ভুখণ্ড ও অঞ্চল সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী মিত্রবর্গের মতভেদ দেখা দিল এবং রাষ্ট্রসংঘের ট্রাস্টিশিপ বা অছিগিরির অধীন আনয়নের প্রশ্নে বিতণ্ডার সৃষ্টি হইল। অবশেষে উভয় পক্ষের মতামতের মধ্যে আপোসরফা হিসাবে স্থির হইল যে, ট্রাস্টি-এলাকাভুক্ত অঞ্চলগুলির জনগণকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের প্রশ্নে সহায়তা দেওয়া হইবে এবং ধাপে ধাপে স্বাধীনতা বা স্বাধিকার অর্জনের সুযোগ দেওয়া হইবে।

সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্যানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে গৃহীত রাষ্ট্র-সঙ্ঘের (ইউ. এন.) সনদের সমস্ত জাতির সমান অধিকার, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করা এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার সুমহৎ ঘোষণা প্রচারিত হইল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলেই যে ইউনাইটেড নেশন্স অর্গেনাইজেশন (ইউ. এন. ও.) গঠিত হইতে পারিয়াছিল এবং রাজনৈতিক ফলাফলের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার এটি অন্যতম ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[১]

১১১টি অনুচ্ছেদে পূর্ণ এই দীর্ঘ দলিলে স্বাক্ষর দিয়া বিজয়ীপক্ষের নেতা ও সমর্থকগণ মনে করিলেন যে, আগামী দিনের পৃথিবী যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাইল। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ দাঁড়াইয়া উঠিয়া এই দলিলের প্রতি সর্বসম্মত সমর্থন জানাইলেন।[২]

১। অ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৩৮৭-৮৯।
২। দি সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ার, ৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৩-৯৪।

দশম পর্ব

প্রথম অধ্যায়

মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে মতবিরোধ :

হপকিন্সের পুনরায় মস্কোযাত্রা

পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে মিত্রশক্তি কর্তৃক আক্রমণের ফলে জার্মানী যখন গভীর সংকটে পড়িল, তখন সেনাপতিদেরকে চাঙ্গা করিয়া তোলার জন্য ৩১শে আগস্ট, ১৯৪৪, হিটলার তাঁর সদর দপ্তরে বলিয়াছিলেন :

'একটা সময় আসিবে যখন মিত্রশক্তিদের মধ্যে বিরোধ এমন প্রচণ্ড হইবে যে, তাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিবে। ইতিহাসে দেখা যায় যে, সমস্ত কোয়ালিশনই কিছুদিন আগে কিংবা পরে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুতরাং ধৈর্য ধরিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত।...'

এর তিন মাস পর পশ্চিম রণাঙ্গনে পালটা আক্রমণের (আর্দেনেসের যুদ্ধ) আগে ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪, হিটলার পুনরায় তাঁর সেনাপতিদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া বলিলেন :

'ইতিহাসে আমাদের শত্রুদের মত এমন বিচিত্র পাঁচমিশালি এবং নানা উদ্দেশ্য নিয়া গঠিত কোয়ালিশন আর কখনও দেখা যায় নি। একদিকে অতি-ধনিক রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে অতি-মার্কসবাদী রাষ্ট্র। একদিকে একটা মুমূর্ষু সাম্রাজ্য বৃটেন, অন্য দিকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভের জন্য একটা কলোনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই কোয়ালিশনের প্রত্যেকটি অংশীদারের রয়েছে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের অভিলাষ...আমেরিকা চাইছে ইংলণ্ডের উত্তরাধিকার লাভের জন্য, ইংলণ্ড চাইছে তার উপনিবেশগুলি ও ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য...এদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে।'[১]

হিটলার যতই দুশমন হোন এবং এই কথাগুলি যে উদ্দেশ্যেই বলিয়া থাকুন না কেন, তাঁর মন্তব্যের মধ্যে কিন্তু গভীর সত্য নিহিত ছিল। কারণ, মহাযুদ্ধ যতই শেষ হইয়া আসিতেছিল, ততই সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন—এই ঐতিহাসিক কোয়ালিশনের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিতেছিল এবং এই তিন পক্ষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন মিল ছিল না—একমাত্র নাৎসী জার্মানীকে পরাজিত করা ছাড়া। কিন্তু যখন এই তিনপক্ষের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ও ভাঙ্গন দেখা দিল, তখন হিটলার মুসোলিনী গতায়ু এবং ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গ চূর্ণ। ভাগ্যক্রমে মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে মহামৈত্রী শেষ হইয়া যায় নাই। এর জন্য সর্বাধিক প্রশংসা প্রাপ্য বোধ হয় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ধৈর্য ও উদারতার এবং স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর মিত্রজনোচিত মনোভাবের দৃঢ়তার। যদিও ইয়াল্টা সম্মেলনে স্ট্যালিন চার্চিলকে 'পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী সরকারী পুরুষ' বলিয়া উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি

১। উইলিয়াম শাইরার পৃষ্ঠা ১২৯১ এবং ১২৯৭।

স্ট্যালিন কিন্তু রুজভেল্টের প্রতিই বেশী অনুরাগসম্পন্ন ছিলেন এবং তিনি যথার্থই অনুমান করিয়াছিলেন যে, মহাযুদ্ধের শেষে এমন সমস্ত কঠিন সমস্যা দেখা দিবে, যার জন্য তিন বৃহৎ শক্তির যুদ্ধের সময়কার মতই ঐক্য ও সহযোগিতার দরকার হইবে। কিন্তু যুদ্ধের অন্তিম লগ্নেই ঐক্যের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিল—বিশেষভাবে রুজভেল্টের মৃত্যুর পর।

মার্কিন সামরিক লেখকগণ ইয়াল্টা চুক্তির প্রতি স্ট্যালিনের 'বিশ্বাসঘাতকতা'র বহু অভিযোগ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও অনুমান এই যে, সোভিয়েত পলিটব্যুরোর চরমবাদী নেতাদের বিপ্লবী তত্ত্বের চাপের ফলেই স্ট্যালিনের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল—যদিও এর "বোধগম্য কোন প্রমাণ নেই"। তবে, ইয়াল্টার পর সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি পরিবর্তনের অন্য কারণও থাকিতে পারে। যুদ্ধের পর ইউরোপে মার্কিন সৈন্যেরা দুই বছরের বেশী অবস্থান করিবে না, রুজভেল্টের এই মন্তব্যের তাৎপর্য হয়তো স্ট্যালিন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ঃ ইয়াল্টার পর রুশরা পোল্যাণ্ডে যে তীব্র ও তিক্ত শত্রুতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তার জন্য স্ট্যালিন হয়তো সেখানে কিংবা পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে আর কোন "চান্স" না নিতে হয়, সেজন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তাঁর কঠোরতার মূলে এই সমস্ত কারণও থাকিতে পারে।[১]

অপর দিকে ফ্যাসিস্ট জার্মানীর আক্রমণের ফলে সোভিয়েত রাশিয়া চার বছর ধরিয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ সালে নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকটে পড়িয়াছিল। কৃষিকার্য ও কলকারখানার উৎপাদন কার্য থেকে অধিকাংশ পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছিল। সুতরাং দেশের সমস্ত কৃষিকার্য একমাত্র মেয়েদের চালাইতে হইয়াছিল —এই রেকর্ডের গৌরব একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার। অধিকন্তু যুদ্ধের সময় কলকারখানার শ্রমিকদের শতকরা ৫১ ভাগ ছিল স্ত্রীলোক। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও জনগণের অভাব-অনটনের সীমা ছিল না। বিশেষভাবে খাদ্যের অভাবে তাদের অধিকাংশই ক্ষুধার্ত ছিল। সুতরাং স্বভাবতই যুদ্ধের পর এই ভয়াবহ ক্ষতির জন্য সমস্ত দেশের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত নেতারা মিত্র আমেরিকার কাছ থেকে ঋণের আকারে সাহায্যের প্রত্যাশা করিতেছিলেন। কিন্তু মার্চ ও এপ্রিল মাসে (যখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিতেছিল) মার্কিন সরকারী মহল থেকে এই বিষয়ে বাধা আসিল এবং ঠিক এই সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হঠাৎ মারা গেলেন—১২ই এপ্রিল, ১৯৪৫। রুজভেল্টের মৃত্যুতে সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণ ও নেতৃবৃন্দ কেবল গভীরভাবে শোকাহত হইলেন না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিতও হইলেন। কেননা, রাশিয়ার প্রতি রুজভেল্টের যে সদিচ্ছা ছিল এবং তিনি যে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখিতে উৎসুক ছিলেন, সে বিষয়ে রুশ জনগণও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কিন্তু রুজভেল্টের মৃত্যুর পর মার্কিন মিত্রতার নীতি অব্যাহত থাকিবে কিনা, সেই বিষয়ে রাশিয়ার মনে সংশয় ও শংকা দেখা দিল এবং সেই শংকা একেবারে হাতে হাতে ফলিয়া গেল। কেননা রুজভেল্টের শূন্যপদে ভাইস-প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যখন প্রেসিডেন্টের গদীতে অভিষিক্ত হইলেন, তখন তিনি তাঁর "সোভিয়েত নীতির শোধন" করিলেন ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেণ্ড ও বীজ বা কর্জ ও ইজারা আইন অনুযায়ী সাহায্য দেওয়া বন্ধ করার দ্বারা। স্বভাবতই স্ট্যালিন এতে

১। আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৮৭৬-৮৭।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কি, কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থার যিনি মার্কিন বড়কর্তা ছিলেন, সেই স্টেটিনিয়াস পর্যন্ত এটাকে 'অসময়োচিত' এবং 'অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন।[১]

অবশ্য যুদ্ধে জয়লাভের দ্বারা রুশদের মধ্যে জাতীয় গর্বও বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করিত যে, তারা একাই জার্মানীকে হারাইয়া দিতে ও ইউরোপ দখল করিয়া নিতে পারিত (যদিও স্ট্যালিন তা' কখনও মনে করিতেন না)। এজন্য বার্লিনে মিত্রপক্ষের উপস্থিতি ও অবস্থান অনেক রুশ সৈন্যের অপছন্দের কারণ ছিল। এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার নিয়াও দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়াছিল।

অবশ্য উচ্চতর স্তরে সেনাপতিবৃন্দের মহলে সদ্ভাব ও সৌজন্যবোধের কোন অভাব ছিল না। যেমন, মার্শাল জুকোভ, জেনারেল আইজেনহাওয়ার ও ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীকে "অর্ডার অব ভিক্টোরি" উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং পালটা বৃটিশ পক্ষ থেকে মণ্টগোমারী জুকোভকে জি. সি. বি, রকসোভোস্কিকে কে. সি. বি, শকোলোভস্কিকে ও. বি. ই এবং অন্যান্যকেও অনুরূপ উপাধির দ্বারা সম্মানিত করিলেন। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও আছে। যেমন, মার্শাল টিটো। টিটো আদ্রিয়াতিক উপসাগরের কূলে ট্রিস্ট্ (Trieste) বন্দর দখলের চেষ্টা করিলে ভূমধ্য-সাগরীয় প্রধান বৃটিশ সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল আলেকজাণ্ডার চার্চিলের নির্দেশে যুগোশ্লাভদের প্রতি যে "উদ্ধৃত" ও "অসম্মানজনক" ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাতে সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলি তাঁর তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। গ্রীস্মে বৃটিশ দমননীতিও (স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টিজানদের বিরুদ্ধে) রুশ সংবাদপত্রগুলির উষ্মার কারণ হইয়াছিল। উত্তর ইতালীতে কমিউনিস্ট-পার্টি-নেতা নেন্নি (Nenni) এবং তোগলিয়াত্তিকে (Togliatti) বৃটিশ পক্ষ সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত নানা ঘটনা নিয়া পশ্চিমের মিত্রপক্ষ ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে বিধোধ লাগিয়াই ছিল

* * *

কিন্তু বিরোধের আরও গুরুতর কারণ ঘটিয়াছে। যখন বার্লিন ও হিটলারী জার্মানীর পতনে সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রীবাদী মহলে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছিল এবং বিশেষভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি জনগণের প্রীতিপূর্ণ মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তখন লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া-শীল মহল সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি চাপ সৃষ্টির কৌশল খুঁজিতেছিলেন। ১৯৪৫-এর এপ্রিল-মে মাসে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে গিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যবাহিনী জার্মানীর সেই সমস্ত অঞ্চলে ঢুকিয়া পড়িল। সে অঞ্চলগুলি রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিঅনুসারে সোভিয়েত অধিকৃত এলাকারূপে বিবেচিত হওয়ার কথা এই এলাকাগুলির মধ্যে ছিল লাইপজিগ, এরফুট, প্লাউয়েন ও ম্যাগডেবুর্গ। সামরিক প্রয়োজনে এবং রণক্রিয়ার জন্য মিত্রবাহিনীর এই সমস্ত অঞ্চলে প্রবেশে রাশিয়ার আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই সামরিক প্রয়োজনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খাটাইবার জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে প্রস্তাবিত সোভিয়েত

১। ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৭৭।

অধিকৃত এলাকা থেকে সরাইয়া দিতে টালবাহানা করিতে লাগিলেন। কারণ, চার্চিল তাঁর "বলকান রণনীতি" খাটাইতে ইতিপূর্বেই ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং তারপর বার্লিন, প্রাগ ও ভিয়েনা দখল করিতেও পারিলেন না—এগুলি সব লালফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। সুতরাং ক্ষুব্ধ চার্চিল সোভিয়েত রাশিয়াকে একটা আপোস মীমাংসায় বাধ্য করার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী মারফৎ চাপ সৃষ্টি করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন—'আমাদের হাতে এমন কতকগুলি লাভজনক অস্ত্র আছে, যেগুলির দ্বারা আমরা (রাশিয়ার সহিত) একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় পেঁছুতে পারি। যেমন, প্রথমত পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত জার্মানীতে আমাদের প্রস্তাবিত দখলীকৃত এলাকার আমরা ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যবাহিনীকে বর্তমান অবস্থান থেকে প্রত্যাহার করিয়া নিতে পারি না। তারপর আমাদের দেখিতে হইবে জার্মানীতে রুশ অধিকৃত এলাকার চরিত্র কি, কিংবা দানিয়ুব উপত্যকায় রুশ নিয়ন্ত্রণ বা রুশীকৃত অঞ্চলগুলি, বিশেষভাবে অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও বলকানে রাশিয়া কি মূর্তি ধারণ করে, সেটাও আমাদের দেখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, আমরা বাল্টিক সাগর বা কৃষ্ণসাগর দিয়া রাশিয়ার বহির্গমন সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিতে পারি।'[১]

৬ই মে তারিখ চার্চিল তাঁর এই সমস্ত মতামত প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকেও লিখিয়া পাঠাইলেন। "যুগোশ্লোভিয়া, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়াতে এবং ডেনমার্কসহ লুবেক পর্যন্ত আমাদের ইঙ্গ-মার্কিনবাহিনী যে "পজিশন" দখল করিয়া আছে, সেগুলি আমাদের কঠোরভাবে অব্যাহত রাখা উচিত।"

একই সময়ে জেনারেল ইসমেকে (Ismay) নির্দেশ দিলেন যে, সম্মিলিত সেনানী-মণ্ডলীর প্রধানগণ যেন ইউরোপের মিত্রবাহিনীর সেনাপতিদিগকে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যদল প্রত্যাহার না করার জন্য উপদেশ দেন।

কিন্তু চার্চিল এখানেই থামিয়া থাকিলেন না। যখন মিত্রবাহিনী জার্মানীকে চারিদিকে থেকে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া জর্জর করিতেছিলেন এবং হিটলারের শেষ-সৈন্যদলের "দফা নিকাশ" করিতেছিল, তখন তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি মণ্টগোমারীকে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন যে, 'জার্মান অস্ত্রশস্ত্র যেন এমনভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় যাতে সোভিয়েতের অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আমরা ওই সমস্ত অস্ত্র সহজেই তাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারি।'[২]

এদিকে পোল্যাণ্ড নিয়া রাশিয়া ত' পশ্চিমীদের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ চলিতেছিল এবং এই বিরোধ কঠোর রূপ ধারণ করিল ১৯৪৫-এর গ্রীষ্মকালের প্রথম ভাগে, যখন লণ্ডনে আশ্রয়প্রাপ্ত পোলিশদের গুপ্ত এজেণ্টরা এবং জনগণের একাংশ রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরেই গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালাইল এবং লুবলিন গবর্নমেণ্টের (সোভিয়েত সমর্থিত) প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। তখন সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ পোলিশ সন্ত্রাসবাদী দলের (যারা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কাজ করিত) ১২-১৬ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করিলেন। স্বভাবতই চার্চিল এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ২৮শে এপ্রিল এই বিষয়ে স্ট্যালিনকে এক পত্র দিলেন।

১। উইনস্টোন চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৯।
২। প্রভেদা, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৫৪।

কিন্তু স্টালিন নরম হওয়ায় পাত্র ছিলেন না। তিনি ৪ঠা মে চার্চিলকে এক জবাবে জানাইয়া দিলেন যে, ধৃত পোলিশ সদস্যরা লালফৌজের বিরুদ্ধে সাবোতাজ ও সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্য দায়ী। অতএব এদেরকে আদালতে অভিযুক্ত এবং বিচার করা হইবে।

আদালতে এদের ধৃত নেতা ওকুলিসকি (Okulicki) স্বীকার করিলেন যে, সোভিয়েত সরকারকে অবিশ্বাস করিয়া তাঁরা ভুল করিয়াছিলেন। তবে, মনে রাখিতে হইবে জারের রাশিয়া ১২৩ বছর ধরিয়া পোল্যাণ্ডে অত্যাচার করিয়াছে। তথাপি লণ্ডনস্থিত পোলিশ সরকারকে তাঁদের বিশ্বাস করা উচিত হয় নাই এবং এই সরকারের পাল্লায় পড়িয়াই তাঁরা পোল্যাণ্ডে আত্মগোপন পূর্বক রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত আত্মস্বীকৃতির ফলে রুশেরা মনে করিলেন যে, লণ্ডনস্থিত পোলিশ সরকারের আসল চেহারা চার্চিলের নিকট উদঘাটিত হইয়াছিল। এজন্য স্টালিন খুশী হইয়াছিলেন। ফলে, ধৃত ও অভিযুক্ত পোলিশদের লঘুদণ্ড দেওয়া হইল, এমন কি, নেতৃস্থানীয় ওকুলিসকিকে প্রাণদণ্ডের বদলে মাত্র ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হইল।

* * *

হ্যারি এস. ট্রুম্যান হোয়াইট হাউসে নতুন গদীয়ান হইলেন। কিন্তু তিনি যখন সেনেটর ছিলেন, তখন থেকেই সোভিয়েত-বিরোধী ছিলেন। এখন অবশ্য রুজভেল্টের শূন্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ায় তাঁর দারিত্ব শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী এই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া তিনি গোড়াতেই এক কাণ্ড বাধাইলেন। জার্মানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রুজভেল্ট প্রবর্তিত বিখ্যাত লেণ্ড লীজ অনুযায়ী রাশিয়াসহ মিত্রশক্তিবর্গকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিলেন—একথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিজস্ব বক্তব্য নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য এবং সেই বক্তব্য অত্যন্ত কৌতূললকর। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, বৈদেশিক অর্থনীতির নিয়ামক বা প্রধান লিও ক্রোলে (Crowley) এবং অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী যোসেফ গ্রু (Grew) ৮ই মে তারিখে তাঁর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, লেণ্ড-লীজ সম্পর্কে একটি নতুন দলিল প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট অনুমোদন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাক্ষর দিয়া যান নাই। তাঁরা বলিলেন যে জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর লেণ্ড-লীজ কমাইয়া দেওয়া উচিত। 'তাঁরা আমাকে এই নতুন দলিল স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। আমিও হাত বাড়াইয়া কলমটা নিলাম এবং দলিলটি না-পড়িয়াই স্বাক্ষর-করিয়া দিলাম!'

ট্রুম্যান স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দলিল স্বাক্ষরের পর যেন একটা ঝড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই দলিলে স্বাক্ষরের দ্বারা কার্যত সমস্ত সরবরাহ পাঠানো বন্ধ হইয়া গেল। বৃটেনেও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া মনে করিল যে, এই আদেশ বিশেষভাবে তাদের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য। প্রচুর খাদ্য, অস্ত্র, জামা-কাপড় এই সরবরাহের ফলে রাশিয়া পাইতেছিল। কিন্তু সেখানে যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়িল এবং রুশেরা এই কার্যকে "অমিত্রজনোচিত" বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। যে সমস্ত জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ছিল এই

নতুন আদেশের ফলে সেগুলি মাল খালাস করার জন্য আমেরিকার বন্দরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। 'আমরা যেন অনিচ্ছাকৃতভাবে স্ট্যালিনের হাতে বিরোধের একটা অস্ত্র তুলিয়া দিলাম।'[১]

ফলে, শেষ পর্যন্ত ট্রুম্যান এই আদের বাতিল করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এত বড় ক্ষমতাবান এবং দায়িত্বশীল প্রেসিডেন্ট এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল না-পড়িয়াই সই করিয়া দিলেন, এটা কি একটা তাজ্জব ব্যাপার নয়? অথচ তিনি নিজেই বলিতেছেন যে, ইয়াল্টাতে রুশদের সঙ্গে আমাদের এই মর্মে একটা চুক্তি হইয়াছিল যে, জার্মানীর পরাজয়ের তিন মাস পরেই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে এবং এই সময় মার্কিন জনমতও রাশিয়ার খুব অনুকূলে ছিল। কারণ, রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারা বহু আমেরিকান প্রাণও বাঁচাইয়া দিয়াছিল। অপর পক্ষে চীনে তখন দশ লক্ষাধিক জাপানী সৈন্য ছিল এবং তারা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে প্রস্তুত ছিল। 'সুতরাং আমরা জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে যুদ্ধে নামাইতে খুব ব্যগ্র ছিলাম। কেননা, রাশিয়ার সহিত চীনের সীমান্তের যোগ রহিয়াছে, আর ইউরোপের সঙ্গে রহিয়াছে রেলপথের যোগাযোগ। অন্যদিকে জাপান ডাইরেন থেকে শুরু করিয়া হংকং পর্যন্ত চীনের সমস্ত সমুদ্র-বন্দর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছিল।'

অবএব জাপানী যুদ্ধের কথা মনে রাখিয়া ট্রুম্যান মার্কিন সরকারী নীতির নূতন ব্যাখ্যা করিয়া এই আশ্বাস দিলেন যে, আগেকার সমস্ত চুক্তি ও শর্তানুসারে রাশিয়াকে সমস্ত সরবরাহ যোগান দেওয়া হইবে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলও উদ্বিগ্ন হইয়া ব্যক্তিগতভাবে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন এবং রাশিয়ার মত বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও নেদারল্যান্ডসকেও সরবরাহের আশ্বাস দেওয়া হইল।

কর্জ ও ইজারা আইন অনুসারে মিত্রপক্ষীয় শক্তিগুলিকে সাহায্যদান প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অসামান্য প্রতিভার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন:

'The story of Land-Lease is a monument to the genius of Franklin Roosevelt. A President could no more get the Congress to make an outright loan of forty-two billion dollars to foreign countries, even to win a war, than he could fly to the moon, but Roosevelt accomlished the same thing through the idea of Land-Lease.'

অর্থাৎ কর্জ ও ইজারার কাহিনী ফ্রাংকলিন রুজভেল্টের অসামান্য প্রতিভার স্মৃতিস্তম্ভের মত। এমন কি কেন যুদ্ধজয়ের জন্যও কংগ্রেসকে দিয়া সোজাসুজি চার হাজার দুইশত কোটি ডলার মঞ্জুর করানোর চেয়ে বরং চাঁদে উড়িয়া যাওয়া সহজ ছিল। কিন্তু কর্জ ও ইজারার ব্যবস্থার মারফত রুজভেল্ট সেই অসাধ্য সাধন করিলেন।[২]

ট্রুম্যান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধের শেষে ইউরোপে বহু জটিল

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৬২।
২। 1945—Year of Dicision, Truman, P. 254-55.

সমস্যা দেখা দিল। গোড়ার দিকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া দখল নিয়া চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল এবং উভয় স্থানেই বৃহৎ সমস্যা দেখা দিল কণ্ট্রোল মেসিনারি বা উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন এবং মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদিগকে স্ব স্ব নির্দিষ্ট এলাকায় (zone) প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া সম্পর্কে। অবশ্য এ জন্য ইউরোপীয় এ্যাডভাইসরি কমিশন গঠিত হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গের স্ব স্ব দখলদারি এলাকা নির্দিষ্ট হওয়ার পর বৃটিশ, মার্কিন, ফরাসী ও সোভিয়েত—এই চতুঃশক্তির প্রধান সেনাপতিদেরকে নিয়া সমগ্র জার্মানীর পরিচালনার জন্য একটি কণ্ট্রোল কাউন্সিল গঠিত হইবে।...

১১ই মে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে এই মর্মে টেলিগ্রাম করিলেন—'আমাদের সৈন্যদিগকে যেন অগ্রগতির চরম সীমানা পর্যন্ত অবস্থান করিতে দেওয়া হয়।' যদিও চার্চিল দখলীকৃত এলাকা সম্পর্কে একমত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাগিদ দিতে লাগিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাশিয়ানরা পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মিত্র সৈন্যদের পজিশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা উচিত হইবে না।'

কিন্তু ট্রুম্যান এক জবাবে চার্চিলকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁরা দখলীকৃত এলাকা ভালো করা সম্পর্কে আগে যে সমস্ত কথা দিয়াছেন, সে কথা এখন খেলাপ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ গুরুতর সামরিক প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে।

চার্চিল ও ট্রুম্যানের মধ্যে এই সমস্ত বিষয় নিয়া কয়েকটি বার্তা-বিনিময় হইল। এবং প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের একটি তারের জবাবে স্ট্যালিন জানাইয়া দিলেন (১৮ই মে যে, অস্ট্রিয়া ও ভিয়েনা সম্পর্কে চার্চিল ও রুজভেল্টের সঙ্গে কথা অনুসারে "ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিশনের" সিদ্ধান্তই মানিয়া লওয়া হইবে।...

১৬ই মে তারিখে চার্চিল ও জেনারেল আইজেনহাওয়ারের মধ্যে যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছিল, তাতে দেখা যায় যে, চার্চিল মিত্রপক্ষকে সমগ্র জার্মানীর দায়িত্ব নিতে নিষেধ করিতেছেন। মিত্রপক্ষের কেবল এইটুকুই দেখা উচিত যে, জার্মান যেন আর একটা যুদ্ধ বাধাইতে না পারে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী-কিছু করা ঠিক হইবে না। জার্মানদের ভাগ্য জার্মানীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত এবং যে সমস্ত জার্মান সেনাপতি মিত্রপক্ষের হাতে আটক আছেন, তাঁদেরকে জার্মানী শাসনের জন্য নিযুক্ত করা উচিত।

৪ঠা জুন চার্চিল পুনরায় ট্রুম্যানকে তাগিদ দিলেন যে, আমেরিকান সৈন্যদেরকে যেন দখলীকৃত এলাকায় প্রত্যাহার করিয়া আনা না হয়। কারণ, অন্যথা সোভিয়েত সামরিক শক্তি পশ্চিম ইউরোপের মর্মকেন্দ্রে আসিয়া প্রবেশ করিবে এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে লৌহ যবনিকার সৃষ্টি হইবে।

* * *

সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলের কমিউনিজম ও সোভিয়েত-বিরোধিতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু প্রেসেডেণ্ট রুজভেল্টের গোঁড়ামি ছিল না। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার কত বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সদ্ভাব ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বার্থ রক্ষা কঠিন হইবে। এজন্য রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পরেই সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দিলেন এবং

রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। তারপর থেকেই কিংবা তৃতীয় দশক থেকেই সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক সহৃদয়তাপূর্ণ ছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও গভীর হইল। হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে রুজভেল্ট-স্ট্যালিন-চার্চিল মহাজোট বা গ্রেট কোয়ালিশন ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনা করিল এবং তেহরান ও ইয়াল্টার শীর্ষ সম্মেলনগুলিতে তিন শক্তির মৈত্রী ও সহযোগিতা ঘনিষ্ঠতর হইল এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য "ইউনাইটেড নেশন্স অর্গেনাইজেশন"-এর ভিত্তি স্থাপিত হইল এবং রুজভেল্ট বিশ্বাস করিতেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সময় যে সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার জন্য সেই সম্পর্ক গাঢ়তর হইবে। কিন্তু যুদ্ধের চূড়ান্ত জয় বা জার্মানীর আত্মসমর্পণের পূর্বেই রুজভেল্ট মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ফলে, লন্ডনের এবং ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী যেন একটা "সুযোগ" পাইয়া গেলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধান ছিলেন তাঁরা —যেমন, আর্থার ভ্যানডেনবুর্গ, জন ফস্টার ডালেস, জেমস এ ফরেস্টার (নৌসচিব) প্রভৃতি সরকারী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি "কঠোর নীতি" অবলম্বনের জন্য চাপ দিলেন।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেণ্ট ট্রুমান সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত যে, হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পরেই তিনি (তখন তিনি সেনেটর) প্রকাশ্যে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রাশিয়া ও জার্মানী পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংস হোক এটাই তাঁরা দেখিতে চান। সুতরাং ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্ট পদে বৃত হওয়ার পরই এতদিনকার রুজভেল্টের নীতির পুনর্মূল্যায়ন করিতে চাহিলেন। ২৩শে এপ্রিল এজন্য তিনি হোয়াইট হাউজে বিশিষ্ট মার্কিন নেতাদের একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন সোভিয়েত সম্পর্কে মার্কিন নীতি নির্ধারণের জন্য। ওয়াশিংটনের অনেক দায়িত্বশীল শীর্ষস্থানী নেতা এই বৈঠকে যোগ দিলেন। যেমন—পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টেটিনিয়াস, সমরসচিব স্টিমসন, নৌ-সচিব ফরেস্টার, এ্যাডমিরাল কিং, এ্যাডমিরাল লীহাই, জেনারেল মার্শাল, জেনারেল ডীন, রাষ্ট্রদূত হ্যারিম্যান এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশিষ্ট কয়েকজন অফিসার। নতুন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক এবং দুই গবর্নমেণ্টের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে, সে বিষয়ে তাঁদের মতামত আহ্বান করিলেন। বিশেষভাবে পোল্যাণ্ড সম্পর্কেই তাঁদের মাথাব্যথা বেশী ছিল। কিন্তু উপস্থিত সকলেই সোভিয়েত বিরোধী ছিলেন না। যেমন, সমরসচিব স্টিমসন বলিলেন—'এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের ধীরে-সুস্থেই চলা উচিত এবং সম্পর্ক যাতে ছিন্ন না হয়, তেমন নীতিই অনুসরণ করা উচিত। রুশরা তাঁদের যুদ্ধের দায়িত্ব এবং সামরিক অভিযান অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চালাইয়াছেন। সুতরাং এই একটি ঘটনা (পোল্যাণ্ড) উপলক্ষে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গন-ধরা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে। কিন্তু নৌ-সচিব ফরেস্টার সোভিয়েতের প্রতি মার্কিন নীতির পুনর্মূল্যায়নের উপর জোর দিলেন। এ্যাডমিরাল লীহাই স্টিমসনের মতামত সমর্থন করিলেন। কিন্তু হ্যারিম্যান ফরেস্টারের মতামতের প্রতি সমর্থন জানাইলেন। সভার শেষে স্বয়ং ট্রুম্যান রাশিয়ার প্রতি 'শক্তনীতি' অনুসরণের পক্ষে মত দিলেন।[১]

১। দি অ্যাণ্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৩৭৩।

এদিকে অতলান্তিকের ওপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং তাঁর সমর্থকরা জার্মান সামরিক শক্তির বিনষ্টি এবং সোভিয়েত রাশিয়ার জয়লাভের জন্য শঙ্কিত হইলেন। চার্চিল আন্তর্জাতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া নতুন রণনীতি ও রাজনৈতিক নীতি "বাস্তবতার" ভিত্তিতে বিচাপূর্বক ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির উদ্দেশ্যে সাত দফা নীতির কথা ঘোষণা করিলেন। যথা—

১. সোভিয়েত রাশিয়া মুক্ত দুনিয়ার পক্ষে ভীষণ বিপদস্বরূপ দেখা দিয়াছে।

২. তার অগ্রগতির পথ রোধ করার জন্য অবশ্যই অবিলম্বে একটি নতুন ফ্রন্ট খুলিতে হইবে।

৩. ইউরোপে এই নতুন ফ্রন্ট যতটা সম্ভব পূর্বদিকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৪. ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যবাহিনীর পক্ষে বার্লিনই হইতেছে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।

৫. চেকোশ্লভাকিয়ার মুক্তিবিধানে এবং প্রাগে মার্কিন সৈন্যের প্রবেশ ফলাফলের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইবে।

৬. ভিয়েনা ও অস্ট্রিয়াকে অবশ্যই পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে হইবে। অন্ততঃ সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত সমান অধিকারের ভিত্তিতে।···

৭. গণতান্ত্রিক শক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনীগুলি বিলুপ্ত হওয়ার আগে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে সমস্ত প্রধান সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে এবং এই মীমাংসার আগে অধিকৃত জার্মানীর কোন অংশ কিংবা টোটালিটারিয়ান্ অত্যাচার থেকে মুক্ত কোন এলাকা পশ্চিমী মিত্রবর্গ কর্তৃক ছাড়িয়া দেওয়া চলিবে না।[১]

বলা বাহুল্য যে, এই নীতিগুলি যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ঘাড়ে চাপাইবারও চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েতের সহযোগিতা ও শান্তিরক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া রুজভেল্ট এগুলি অনুমোদনে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু রুজভেল্টের মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের "শক্তনীতির" সুযোগ নিতে চাহিলেন চার্চিল।

* * *

৫ই জুন বার্লিনে চতুঃশক্তির সেনাপতিরা জার্মানীর পরাজয় সম্পর্কে একটি ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর দিলেন। সেনাপতিদের এই বৈঠকে রুশ-পক্ষ যাঁর যাঁর অধিকৃত এলাকায় সৈন্য সরাইয়া নিতে অনুরোধ জানাইলেন। অন্যথা কণ্ট্রোল কাউন্সিলের কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি হইবে বলিয়া তাঁরা আশংকা প্রকাশ করিলেন।

এদিকে ট্রুম্যান চার্চিলের মতামত ও অনুরোধ মানিতে রাজী হইলেন না। কারণ, তাঁর মতে জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে রুজভেল্ট চার্চিল-স্ট্যালিনের আগেকার চুক্তি মান্য করিয়াই চলিতে হইবে। 'অন্যান্য সমস্যার মীমাংসার দাবিতে এই বিষয় নিয়া রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়া ঠিক হইবে না।'

অপর পক্ষে জেনারেল আইজেনহাওয়ারও রুশ অধিকৃত এলাকায় মার্কিন সৈন্যের অবস্থান বজায় রাখিতে রাজী হইলেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে জার্মানীর পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য চার্চিল চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এই বিষয়ে মার্কিন শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে তেমন কোন সমর্থন পাওয়া গেল না। বরং স্ট্যালিনের প্রস্তাব

১। উইনস্টোন চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০০।

অনুসারে স্থির হইল যে, ১লা জুলাই থেকে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদিগকে স্ব স্ব নির্ধারিত এলাকায় প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হইবে। অবশ্য ট্রুম্যান আগে স্থির করিয়াছিলেন যে, রুশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে ২১শে জুন মিত্র সৈন্যদেরকে সরাইয়া আনা হইবে এবং চার্চিলও ট্রুম্যানের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু স্ট্যালিন জানাইলেন যে, ওই তারিখের মধ্যে সোভিয়েত সেনাপতি মার্শাল জুকোভ বার্লিনে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। সুতরাং ১লা জুলাই থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব গৃহীত হইল।[১]

* * *

জার্মানীর পতন এবং ইউরোপের মুক্তির পর যে সমস্ত জটিল সমস্যা দেখা দিল তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান স্বভাবতই বিব্রত বোধ করিলেন। এজন্য তিনি মে মাসের শেষের দিকে হ্যারি হপকিন্সের সহিত পরামর্শ এবং তাঁর সাহায্য গ্রহণে উৎসুক হইলেন—যদিও তিনি রুজভেল্টের মৃত্যুর পর সরকারী পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন। এদিকে তাঁর স্বাস্থ্যও আগের মতই অত্যন্ত খারাপ ছিল। কিন্তু ট্রুম্যান জানিতেন যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন এবং যুদ্ধসংক্রান্ত নানাপ্রশ্নে হপকিন্সের প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল এবং সেই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। সুতরাং যুদ্ধ শেষের এই জটিল পরিস্থিতিতে স্ট্যালিনের মনোভাব কি, তা জানিবার জন্য তিনি হপকিন্সকে মস্কো যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। অবশ্য ট্রুম্যানের সঙ্গে হপকিন্সের আগেই ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল এবং অতীতে একসঙ্গে কিছু কাজও করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ থাকা সত্ত্বেও ট্রুম্যানের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ট্রুম্যান ও হপকিন্সের গভীর দেশপ্রেম এবং তাঁর আত্মত্যাগ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অধিকন্তু ট্রুম্যান উপলব্ধি করিলেন যে, রাশিয়া সম্পর্কে তিনি যতই "শক্তিনীতির" কথা ভাবিয়া থাকুন না কেন, পরলোকগত রুজভেল্টের যে নীতি এতদিন ধরিয়া আমেরিকায় এবং আমেরিকার বাহিরের পৃথিবীতে জনসমর্থন লাভ করিয়া আসিতেছিল, সেই নীতি সহসা পরিত্যক্ত হইলে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়া যাইতে পারে। সুতরাং সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক যাতে সহসা ভাঙ্গিয়া না যায় এবং আগেকার মত সদ্ভাব বজায় থাকে, সেই লক্ষ্য নিয়াই ট্রুম্যান স্ট্যালিনের মতামত জানিবার জন্য হপকিন্সকে মস্কো পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। কারণ, তিনি একথাও জানিতেন যে, এই বিষয়ে হপকিন্সের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহই নাই।...

আশ্চর্য লোক এই হপকিন্স। নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর জুলাই মাসের শেষে হ্যারি হপকিন্স (তখনও পীড়িত) ওয়াশিংটন থেকে লণ্ডন এবং লণ্ডন থেকে অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে একটি বিমানে চড়িয়া উত্তরতম রাশিয়াতে পৌঁছিয়াছিলেন এবং সেখান থেকে মস্কো। মস্কোতে স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং আলোচনা ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছিল। এমন কি বলা যাইতে পারে যে, ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েতের যে মহাজোট গড়িয়া উঠিয়াছিল, তার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল হপকিন্সের এই দুঃসাহসিক মস্কো যাত্রা থেকে। কারণ, রাশিয়ার সেই ঘোরতর দুর্দিনেও তিনি রাশিয়ার আত্মরক্ষা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট অনুকূল রিপোর্ট দিয়াছিলেন।

১। ট্রুম্যান, পৃষ্ঠা, ৩০৬-৩৯।

এবার আর যুদ্ধ ছিল না। সুতরাং অসুস্থ হপকিন্সের সঙ্গিনী ও সহযাত্রী হইলেন তাঁর স্ত্রী। ২৩শে মে তিনি ওয়াশিংটন ত্যাগ করিলেন এবং ২৫শে মে সন্ধ্যায় মস্কোতে পৌঁছিলেন। পরদিন রাত্রি ৮টায় ক্রেমলিনে তিনি স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। প্রারম্ভিক শিষ্টাচার বিনিময়ের পর হপকিন্স স্ট্যালিনকে বলিলেন যে, ইয়াল্টা সম্মেলন থেকে ফেরার পথে অসুস্থ ও রুগ্ন রুজভেল্ট স্ট্যালিনের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য সোভিয়েত-মার্কিন-সহযোগিতার উপর জোর দিয়াছিলেন। তাঁর আশা ছিল যে, যুদ্ধান্তে তিনি বার্লিনে আবার স্ট্যালিনের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তাঁর সেই আশা পূর্ণ হইতে পারিল না। কিন্তু রুজভেল্টের নীতির প্রতি মার্কিন জনগণের যেমন আস্থা ছিল, তেমনি যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার অদ্ভুত সাফল্যের জন্য রাশিয়ার প্রতিও তাঁদের মনোভাব আগের মতই অত্যন্ত অনুকূল। অবশ্য আমেরিকায় একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আছে যারা রুজভেল্ট ও রাশিয়ার বিরোধী।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের প্রতিনিধিরূপে তিনি স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন রুশ-মার্কিন মৌলিক সম্পর্ক আলোচনার জন্য, যে সম্পর্কের ইদানীং অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, রুজভেল্টের সমর্থকদের সহযোগিতা ছাড়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পক্ষে রুশ-মার্কিন সহযোগিতার নীতি সার্থক করাও সম্ভব নয়।—[১]

এই আলোচনা বৈঠকে সেদিন সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন, স্ট্যালিন, মলোটোভ, প্যাভ্‌লোভ (দোভাষী) এবং হপকিন্স, হ্যারিমান ও বোলেন (Bohlen—দোভাষী)।

* * *

এখানে হপকিন্সের মস্কো মিশন এবং স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর বিস্তৃত আলোচনার বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক। ২৬শে মে তারিখ থেকে ৬ই জুন পর্যন্ত ক্রেমলিনে পর পর ৬ বার যে সমস্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাতে প্রধানতঃ আলোচিত হইয়াছিল—১. পোলিশ সমস্যা ২. কর্জ ও ইজারার প্রশ্ন ৩. আর্জেণ্টিনা (স্যানফ্রানসিস্কো সম্মেলন) ৪. জার্মান নৌবহর ও বাণিজ্য বহরের ভাগ বাঁটোয়ারা ৫. বার্লিনে (পটসডাম) শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব ৬. জার্মানীর জন্য কণ্ট্রোল কাউন্সিল এবং ৭. প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ এবং চীন-মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্ক।

এই সমস্ত সমস্যার আলোচনায় হপকিন্স ও স্ট্যালিন রুশ-মার্কিন মতবৈষম্যের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধানের এবং আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন পোল্যাণ্ড সম্পর্কে স্ট্যালিন বলিয়াছিলেন, পোল্যাণ্ড সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ার কারণ চার্চিল ও বৃটিশ রক্ষণশীলেরা রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কোন পোল্যাণ্ড চাহেন না। বরং আগের মত রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা "স্বাস্থ্যরক্ষার বেষ্টনী" সৃষ্টি করিয়া রাখিতে চান।

কর্জ-ইজারা সাহায্যের প্রসঙ্গে হপকিন্স স্ট্যালিনকে বলিয়াছিলেন যে, এই সাহায্যদানের জন্যই রাশিয়া জয়লাভ করিয়াছে, একথা সত্য নয়। রুশ সৈন্যদের অপূর্ব লড়াইয়ের জন্যই রাশিয়া জয়ী হইয়াছে এবং সরকারী মহলে আইনগত কিছু

১। রবার্ট ই শেরউড্, পৃষ্ঠা ৮৮৯

ভুল-ভ্রান্তির জন্য যে সরবরাহ প্রেরণ বন্ধ হইয়াছে সেটা আবার শুরু করা হইবে। হপকিন্সের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে স্ট্যালিনের তখনও ধারণা ছিল যে বার্লিনের যুদ্ধ ও পতন সত্ত্বেও হিটলার, ব্যোরমার, গোয়েবেলস এবং ক্রেবস্ জীবিত আছেন এবং তাঁরা পলাইয়া গিয়াছেন।

স্ট্যালিন হপকিন্সের নিকট আমেরিকার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া যেমন প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষ জয়ী হইতে পারিতেন না, তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও আমেরিকার যোগদান ছাড়া জার্মানীর পরাজয় হইত না।···

স্ট্যালিন হপকিন্সের নিকট কথা দিলেন যে, ৮ই আগস্ট সোভিয়েত বাহিনী মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিবে এবং ট্রুম্যানের প্রস্তাব অনুসারে বার্লিনে (পটসডামে) জুলাই মাসের মধ্যভাগে বৃটিশ-মার্কিন-সোভিয়েত শীর্ষবৈঠকের অনুষ্ঠান হইবে। আসলে এই বৈঠকের প্রস্তাব পাকা করার জন্যই হপকিন্সের মস্কো আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

জার্মানীকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে যে কন্ট্রোল গঠিত হইয়াছিল, তাতে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিরূপে মার্শাল জুকোভকে নিযুক্ত করা হইল—স্ট্যালিন একথা হপকিন্সকে জানাইয়া দিলেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিলেন যে, এই বিষয়ে ইয়াল্টা চুক্তি পুরাপুরি মানিয়া চলা হইবে এবং জেনারেল চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে সমগ্র চীনের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমন নীতিই অনুসরণ করা হইবে। কিন্তু জাপানী সমরবাদকে ধ্বংস করার জন্য তিনি জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবির উপর জোর দিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিলেন যে, জাপানী সমরশক্তি যদি ধ্বংস করা না হয়, তবে, অনতি-দূর-ভবিষ্যতেই জাপান পুনরায় প্রতিশোধাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে।···[১]

* * *

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গেই পরাজিত জার্মানীকে নিয়া যে অজস্র সমস্যা দেখা দিয়াছে, হপকিন্স স্ট্যালিনের নিকট সে কথাও উল্লেখ করিলেন এবং তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, কিছু দিন আগে তিনি (স্ট্যালিন) একটা বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি জার্মানীকে খণ্ডনের (dismemberment) পক্ষপাতী নন। কিন্তু তেহরান ও ইয়াল্টার শীর্ষসম্মেলনে স্ট্যালিন জার্মানী সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাঁর অধুনাতন বক্তৃতা কিন্তু সেগুলির বিপরীত। জবাবে স্ট্যালিন তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, ইয়াল্টা বৈঠকে জার্মানী সম্পর্কে তাঁর সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন বলিয়াছিলেন যে, যখন আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, একমাত্র তখনই শেষ পন্থা হিসাবে জার্মানীকে খণ্ডন করা হইবে। অবশ্য এই আলোচনা হইয়াছিল লণ্ডনে এবং সেখানে তখন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ উইনাণ্টও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও ইডেনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তোলেন নাই। সুতরাং স্ট্যালিনের ধারণা হইয়াছিল যে, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই জার্মানীকে খণ্ডনের বিরোধী। হপকিন্স এর জবাবে স্ট্যালিনকে বুঝাইলেন যে, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রশ্নটিকে খোলা রাখিয়াছেন। তিন

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৯২।

প্রধানের আগামী বৈঠকে নিশ্চয়ই এই বিষয়টি আলোচিত হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে স্ট্যালিনের এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীকে খণ্ডনের বিরোধী। বরং অবস্থাটা বিপরীত হইতে পারে। তিন মিত্রশক্তি আগামী শীর্ষ বৈঠকে জার্মানীর সমস্যা ও খণ্ডনের বিষয় নিয়া নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছিবেন—এই আশা ব্যক্ত করিলেন হপকিন্স। যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মার্শাল স্ট্যালিন বলিলেন যে, তিনি ঠিক সুনির্দিষ্টভাবে অবগত নন। তবে, তাঁর ধারণা রাশিয়ার হাতে প্রায় ২৫ লক্ষ যুদ্ধবন্দী আছে। এর মধ্যে ১৭ লক্ষ জার্মান আর বাকী সব রুমেনিয়, ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় প্রভৃতি।[১]

* * *

হপকিন্সের মস্কো পরিদর্শন ও স্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনা মোটামুটি সার্থক হইয়াছিল এবং তখনকার মত রুশ-মার্কিন সমঝোতার পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল। কারণ, মোটামুটি এই আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়াই জুলাই মাসের মধ্যভাগে পটসডাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১২ই জুন হপকিন্স ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরদিন তিনি সকালে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে প্রাতঃরাশের টেবিলে যোগ দিলেন এবং ট্রুম্যান তাঁকে মস্কোর সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাইলেন এবং পটসডামের আসন্ন সম্মেলনে যোগদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হপকিন্স নানা কারণে রাজী হইতে পারিলেন না।

হপকিন্সের এই সমস্ত কূটনৈতিক সাফল্য ও রুজভেল্টের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য অনেকেই তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন এবং সমালোচকেরা তাঁকে "হোয়াইট হাউজের রাসপুটিন" বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। কিন্তু সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কে ইতিহাসে তিনি রুজিভেল্টের পরেই স্মরণীয় কীর্তি করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সমর-সচিব হেনরি স্টিমসন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ডেল হালের সহযোগিতাও উল্লেখযোগ্য ছিল।

১। শেরউড, পৃষ্ঠা ৯০৪-৫।

দশম পর্ব
দ্বিতীয় অধ্যায়

পটসডাম সম্মেলন—(১)

ইউরোপীয় কূটনৈতিক পটভূমিকায়

মিত্রপক্ষের তিন শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে পটসডাম কিংবা বার্লিন সম্মেলন সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। ১৭ই জুলাই থেকে ২রা আগস্ট, ১৯৪৫ পর্যন্ত এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং অজস্র সমস্যা নিয়ে আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক হার্বার্ট ফীজ তাঁর পটসডাম সম্মেলন সংক্রান্ত পুস্তকে (পৃষ্ঠা ১৩৬) লিখিয়াছেন যে, এই সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল ১৬ই জুলাই। কিন্তু স্ট্যালিন 'মৃদু হৃদরোগে' আক্রান্ত হওয়ায় সম্মেলন একদিনের জন্য পিছাইয়া গিয়াছিল। স্ট্যালিন এজন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে দেখা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তাঁর চিকিৎসকরা তাঁকে আকাশপথে উড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁর 'লাংসের দুর্বলতার জন্য'। 'কিন্তু আসলে তিনি হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন।'

মহাযুদ্ধের কূটনৈতিক ইতিহাসে পটসডাম সম্মেলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, অন্যান্য বহু প্রশ্নের মধ্যে এই সম্মেলনে জার্মানী, পোল্যান্ড, পূর্ব ইউরোপ, জাপান ও এ্যাটম্ বোমা এবং জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব ইত্যাদি প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল।...

রাজধানী বার্লিনের অনতিদূরে (মাইল ২০।২৫ দূরে) পটসডাম কেবল অভিজাত শহর নয়, জার্মান সামরিক শক্তির অন্যতম উৎসস্বরূপ। অর্থাৎ ইম্পিরীয়েল জার্মানীর কাইজারের আমল থেকে তার খ্যাতি। এই শহরের বিখ্যাত সিসিলিয়েনহোফ প্রাসাদে (Cecilienhof Palace) সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রধানগণ যে আলোচনা সভায় মিলিত হইয়াছিলেন, তার। দূরপ্রসারী ফলাফল মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল পর্যন্ত প্রতিফলিত হইয়াছিল।*

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাইজার (জার্মান সম্রাট) দ্বিতীয় উইলহেলম তাঁর সিংহাসনে উত্তরাধিকারী যুবরাজ বা ক্রাউন প্রিন্সের জন্য এই সিসিলিয়েনহোফ প্রাসাদ তৈরী করিয়াছিলেন ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ সালে। কাইজারের রাজদরবারের একজন খ্যাতনামা স্থপতি-শিল্পী ইংলণ্ডের পল্লীভবনের (ইংলিশ কান্ট্রি হাউজ) কায়দায় বা স্টাইলে এই নয়নলোভন এবং ঐশ্বর্যশালী আরামদায়ক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন আজিকার তুলনায় জিনিসপত্রের দাম ছিল অত্যন্ত সস্তা, তখন, এই প্রাসাদ নির্মাণে ও সজ্জীকরণে খরচ পড়িয়াছিল ৮০ লক্ষ স্বর্ণ মার্ক। এই প্রাসাদে ১৭৬টি কক্ষ বা রুম আছে এবং এর প্রত্যেকটির অভ্যন্তর

---

* ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে গ্রন্থকার কর্তৃক দ্বিতীয়বার জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা জি ডি. আর. পরিভ্রমণের সময় পটসডামের সেই বিখ্যাত সম্মেলন-স্থান সস্ত্রীক পরিদর্শনের সুযোগ হইয়াছিল। —লেখক।

ভাগই রাজকীয় সাজসজ্জায় ও বর্ণাঢ্য সুষমায় অপূর্ব ছিল। যুবরাজ উইলহেলম ফন হোহেনজোলার্নের বসবাসের জন্য এই পল্লী প্রাসাদপুরীর উদ্বোধন হইয়াছিল ১৯১৭ সালের শরৎকালে—যখন মহাযুদ্ধের ফলে সাধারণ প্রজাপুঞ্জের কষ্টের সীমা ছিল না। ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর পটসডামের এই রাজপ্রাসাদকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৬ সালে পুনরায় সম্রাট পরিবার বা রাজবংশের সম্পত্তিগুলি এক বিশেষ আইন বলে হোহেনজোলার্ন পরিবারের হাতে ফেরৎ দেওয়া হইল। একদিন প্রিন্স বা যুবরাজের পরিবারবর্গ ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে এই সুরম্য প্রাসাদ থেকে যাবতীয় মূল্যবান এবং অস্থাবর সম্পত্তি ও দ্রব্যাদিসহ পশ্চিম জার্মানীতে চলিয়া যান।[১]

সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর যুদ্ধবাজ শক্তির শেষ "রাজকীয় প্রতিনিধি" যে সেসিলিয়েনহোফ প্রাসাদে এতদিন সাড়ম্বরে বাস করিতেছিলেন, বার্লিনের পতনের পর সেই প্রাসাদেরই কক্ষে পরাজিত জার্মানীর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য বিজয়ী শক্তিবর্গের তিন প্রতিনিধির ঐতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা ছিল নাৎসীবাদ ও সামরিকবাদের আত্মসমর্পণের প্রতীকের মত।...

পটসডাম সম্মেলন সরকারী দলিলপত্রে অনেক সময় বার্লিন কনফারেন্স নামেও অভিহিত হইয়াছে। প্রাসাদের লাল কার্পেটপাতা সুবৃহৎ কক্ষে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একটি বৃহৎ গোল টেবিলের উপর তিন প্রধান মিত্রশক্তির তিনটি রাষ্ট্রীয় পতাকা একটি শ্বেত পাথরের স্ট্যাণ্ডে সজ্জিত ছিল। এই পতাকাগুলি যেভাবে সজ্জিত ছিল, তিন প্রধানের নেতারা স্ব স্ব ডেলিগেশনের নায়করূপে গোল টেবিলের চারপাশে সেভাবেই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। টেবিলের ডানপাশে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন সোভিয়েত নেতা জে. ভি. স্ট্যালিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভি. এম. মলোটোভ। বাঁ দিকে ছিলেন বৃটিশ ডেলিগেশনের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেন—১৭ই জুলাই থেকে ২৫শে জুলাই পর্যন্ত মোট ৯টি অধিবেশনে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় রক্ষণশীল দল পরাজিত হইয়াছিল (যদিও চার্চিল এবং স্ট্যালিন উভয়েই জয়ের আশা করিয়াছিলেন)। সুতরাং চার্চিলের বদলে নেতারূপে যোগ দিলেন শ্রমিক দলভুক্ত প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেভিন। তাঁরা ২৮শে জুলাই থেকে ২রা আগস্ট পর্যন্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য সম্মেলনের গোড়া থেকেই শ্রমিক দলনেতা এ্যাটলি বিরোধী পক্ষের নায়করূপে চার্চিলের সঙ্গে "পর্যবেক্ষক" হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান প্রবেশ পথের বিপরীত দিকে টেবিলের সামনে বসিয়াছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেলিগেশনের নায়ক প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী বার্নস্। এঁরা ছিলেন স্ট্যালিনের ডান দিকে।

এর আগে ইয়াল্টাতে তিন প্রধানের (স্ট্যালিন, চার্চিল ও রুজভেল্ট) চুক্তি অনুসারে ফ্রান্সকেও জার্মানীর অংশবিশেষ দখল ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সেই চুক্তি অনুসারে ফরাসী সরকারের প্রতিনিধিরূপে মরিস ডিজে (Maurice Dejean) এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলনের রিপোর্টিং সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তথ্য এই যে, পরবর্তীকালে যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টরূপে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, সেই

১। জি. ডি. আর. কর্তৃক প্রকাশিত পটসডাম সংক্রান্ত পুস্তিকা থেকে।

পরলোকগত (আততায়ীর গুলিতে নিহত) জন এফ. কেনেডি এবং বিখ্যাত সোভিয়েত লেখক বোরিস পলেভয় স্পেশাল রিপোর্টার হিসাবে পটসডামে উপস্থিত ছিলেন। সময় সময় ৫০ জন পর্যন্ত বৈদেশিক সাংবাদিক এই সম্মেলনের রিপোর্ট করার জন্য উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁরা অবস্থান করিতেন উপরের দ্বিতল কক্ষের অর্কেস্ট্রা রুমে।

তখন সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। সুতরাং ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যে বাসস্থানের খুব অসুবিধা ছিল। এজন্য কনফারেন্সের প্রতিনিধিদল বার্লিন-পটসডামের মধ্যবর্তী ১২ মাইল দূরে ব্যাবেলসবার্গের কয়েক'টি ভিলাতে বাস করিতেন। কিন্তু স্থানীয় হেভেল নদীর উপর অবস্থিত সমস্ত সেতু ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এজন্য সোভিয়েত বাহিনীর ইঞ্জিনীয়াররা এই সম্মেলনের জন্য তাড়াহুড়া করিয়া পণ্টুন ব্রীজ তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন বিভিন্ন ডেলিগেশনের সোসিলিয়েনহোফ প্রাসাদে যাতায়াতের জন্য…

পটসডাম সম্মেলনে যোগদানের জন্য মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের ওয়াশিংটন-বার্লিন যাতায়াতের জন্য কী বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, সেকথা ট্রুম্যান তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে (২১তম অধ্যায়) অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে বর্ণনা করিয়াছিলেন। (বোধ হয় প্রেসিডেণ্ট হিসাবে নূতন অভিজ্ঞতার জন্যই তিনি এত উল্লসিত হইয়াছিলেন।) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট যখন ওয়াশিংটনের বাইরে যান, তখন সাধারণ অবস্থাতেই তাঁর নিরাপত্তা ও কাজকর্মের জন্য বিশেষ ধরনের অনেক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য—বিশেষভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় আমেরিকার বাইরে যান, তখন তাঁর গমনপথ ও গন্তব্যস্থলের জন্য এমন সমস্ত ব্যাপক ও অদ্ভুত ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে যে, তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। ট্রুম্যান স্বয়ং লিখিয়াছেন ঃ

'It is hard to picture all that is involved in getting a President off to a conference such as the one I was about to attend in Potsdam. The fact that this was to be a meeting with heads of other governments called for extraodinary planning of transportation, housing, prctection and security, communications protocol and staffs.'

প্রেসিডেণ্ট যেখানেই যান কিংবা যেখানেই থাকুন না কেন, হোয়াইট হাউজের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। বহু সরকারী কর্মচারী ও অফিসারের কর্মব্যস্ততা তুঙ্গে উঠিয়া থাকে। পটসডাম সম্মেলনের জন্য ক্যাবিনেট অফিসার ও রাষ্ট্রদূতবৃন্দ, সেনানীমণ্ডলীর প্রধানগণ, হোয়াইট হাউজের স্টাফ এবং পররাষ্ট্র, আর্মি, নৌভি ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণ, ট্রেজারি ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীগণ প্রমুখ সকলকেই অংশ গ্রহণ করতে হইয়াছিল। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, সম্মেলনের স্থায়িত্বকালের জন্য একটি ছোটখাটো "হোয়াইট হাউজ" গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল। গোয়েন্দা বিভাগের কিংবা সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা সমস্ত রাস্তা, যানবাহন এবং প্রেসিডেণ্টের অবাসস্থল ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। লণ্ডন, মস্কো এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে যাতে অবিচ্ছিন্নভাবে এবং অবিলম্বে দ্রুততম যোগাযোগ ও বার্তা আদান-প্রদান ঘটানো যাইতে পারে, তেমন

বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। অধিকন্তু প্রেসিডেন্টের সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার যাতে বিন্দুমাত্র বিঘ্নও না ঘটিতে পারে, তেমন নিখুঁত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। জার্মানীর রুশ অধিকৃত এলাকায় এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল।[১]

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং তাঁর দলবল দুইখানা যুদ্ধজাহাজে আমেরিকা থেকে অতলান্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া ইউরোপের এন্টোয়ার্প বন্দরে পৌঁছিলেন ৩৩৮৭ মাইল অতিক্রমণের পর। বলা বাহুল্য যে, প্রেসিডেন্টের বৃহৎ রণতরী "আগস্টা"তে বহির্পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের এবং সম্মেলন সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনার সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল। তাঁর এই সমুদ্র পাড়ি দিয়া এন্ট্রোয়াপে পৌঁছিতে ৯ দিন সময় লাগিয়াছিল। (সমুদ্রযাত্রার কিছু পথ ইউরোপের নিকটবর্তী এলাকায় মাইনের ভয়ে খুব ধীরগতিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল) সেখান থেকে তিনি বিমানযোগে বার্লিন ও পটসডাম পৌঁছিলেন। বিভিন্ন ডেলিগেশনের অবস্থানের সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্বে ব্যাবেলসবার্গ শহরে। সোভিয়েত বাহিনী এবং নিরাপত্তা রক্ষীদলের পক্ষ থেকে শীর্ষনেতা ও তাঁদের সহকর্মীদের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত প্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছিল। আমন্ত্রক হিসাবে এজন্য সোভিয়েত রাশিয়াকে গভীর দায়িত্ব বহন করিতে হইয়াছিল। শীর্ষনেতা ও তাঁদের সহকর্মীদের জন্য ইয়াল্টা সম্মেলনের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

* * *

১৭ই জুলাই, ১৯৪৫, অপরাহ্ণে সিসিলিয়েনহোফ প্রাসাদে পটসডাম সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইল। স্ট্যালিনের প্রস্তাবক্রমে ও চার্চিলের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি মার্কিন প্রতিনিধি-মণ্ডলীর পক্ষ থেকে যে কর্মসূচী পেশ করিলেন, তার মর্ম এই—

১. প্রাক্তন শত্রু রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তিসন্ধির খসড়া রচনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের একটি কাউন্সিল গঠন।

২. জার্মানী সম্পর্কে মিত্রপক্ষের পলিসি নির্ধারণের জন্য মূলনীতি স্থিরীকরণ।

৩. মুক্তিপ্রাপ্ত ইউরোপ সম্পর্কে ইয়াল্টা সম্মেলনের ঘোষণা কার্যক্ষেত্রে রূপায়ণ।

৪. ইতালীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির শর্ত সহজতর করণ এবং ইতালীকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সংগঠনের সদস্যরূপে গ্রহণ।

সোভিয়েত ডেলিগেশনের পক্ষ থেকে—

১. জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাব করা হইল।

২. জার্মানীর প্রাক্তন তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন।

৩. সিরিয়া ও লেবানন সমস্যার এবং

৪. ফ্রাঙ্কোর স্পেন ও অন্যান্য প্রশ্নের মীমাংসার দাবি করা হইল।

বৃটিশ ডেলিগেশন তাঁদের কর্মসূচীতে পোল্যান্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার সমস্যার মীমাংসা দাবি করিলেন।

১। ট্রুম্যান—প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৭-৬৮।

এই সমস্ত কর্মসূচীর সংশ্লিষ্ট বহু প্রশ্ন নিয়া পটসডাম সম্মেলনে বহু তর্কবিতর্ক ও বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল। তবে, অধিবেশনের গোড়াতেই মার্কিন প্রস্তাব অনুযায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের যে কাউন্সিল গঠিত হইল, সেই কাজটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর অন্যতম। কেননা, যুদ্ধের শেষে ইউরোপীয় মহাদেশে অনেক জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছিল এবং এজন্য শান্তিসন্ধির খসড়া রচনার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। প্রধান পঞ্চশক্তি—সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়া যে কাউন্সিল গঠিত হইল, তার উপর দায়িত্ব দেওয়া হইল ইতালী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তিসন্ধির খসড়া রচনা ও রাষ্ট্রসঙ্ঘে তা পেশ করার জন্য। যদি জার্মানীর জন্য কোন উপযুক্ত গবর্নমেণ্ট গঠিত হয়, তবে সেই গবর্নমেণ্টের জন্যও শান্তিসন্ধির একটা খসড়া রচনার প্রস্তাব করা হইল।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এই কাউন্সিল যুদ্ধোত্তর ইউরোপের অনেক সমস্যা মীমাংসার পক্ষে খুব সহায়ক হইয়াছিল। অবশ্য এই কাউন্সিল গঠনের আগে "ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিটি"র কার্যকলাপও বিবেচনা করা হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত এই কমিটি অনেক মূল্যবান কাজ করিয়াছিল—যেমন, ১২টি চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরী করা হইয়াছিল, জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তাব রচনা করিয়াছিল এবং জার্মানীতে ও অস্ট্রিয়ার মিত্রপক্ষের দখলদারির এলাকা নির্দিষ্ট করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে মিত্রপক্ষের তরফ থেকে এই দুই দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খাটাইবার জন্যও একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছিল।

ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিটির এই সমস্ত কাজ মিত্রপক্ষের নেতাদের নিকট সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। অতঃপর বার্লিন ও ভিয়েনার জন্য নতুন কাউন্সিল ও কমিশন গঠিত হওয়ায় ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইল।

* * *

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পটসডাম সবচেয়ে দীর্ঘ কূটনৈতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং যদিও তিন প্রধান শক্তি মধ্যে বাহ্যতঃ একটা ঐক্যের রূপ রাখা হইয়াছিল, তথাপি বিরোধ ও মতান্তর হইয়াছিল যথেষ্ট এবং এই দীর্ঘতম সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ও ছিল অনেক রকমের। সম্মেলনের শেষে ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী যে দীর্ঘ ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই দলিলটি ১৫টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। যথা—১. মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনা, ২. পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের কাউন্সিল গঠন, ৩. জার্মানী, ৪. জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ, ৫. জার্মানীর নৌবহর ও বাণিজ্যবহর, ৬. কোনিসবার্গ, ৭. যুদ্ধাপরাধীদের প্রশ্ন, ৮. অস্ট্রিয়া, ৯. পোল্যাণ্ড, ১০. শান্তি-সন্ধিগুলির খসড়া এবং ইউ. এন. ও.'র সদস্যপদ, ১১. ট্রাস্টিশিপ বা অছিগিরির অধীন ভূখণ্ডসমূহ, ১২. রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরীর মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পদ্ধতির সংশোধন, ১৩. জার্মান বাসিন্দাদের অপসারণ, ১৪. সম্মেলনের মিত্রপক্ষীয় সেনানীমণ্ডলীর প্রধানগণের আলোচ্য সামরিক সমস্যাসমূহ এবং ১৫. প্রতিনিধি-মণ্ডলীর তালিকা।

পটসডাম সম্মেলনের মোট ১৩টি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হইয়াছিল এবং উপরে বর্ণিত বিষয়গুলির দীর্ঘ তালিকা ছাড়াও কতকগুলি কমিটি ও সাবকমিটিতে আরও বহু

বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ জাপানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে দীর্ঘ ইস্তাহারে কিছু উল্লেখ ছিল না। কারণ, সোভিয়েত রাশিয়া তখনও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল না। এবং সামরিক গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে পরমাণবিক বোমা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও ছিল না।

সম্মেলনে জার্মানীর সমস্যা স্বভাবতঃই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বার্লিনে ৫ই জুনের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী পরাজিত জার্মানীর শাসন ও পরিচালনা কিংবা বিলি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত সর্বময়ক্ষমতা দখলকারী চার শক্তির হাতে অর্পিত হইল। কিন্তু এই চূড়ান্ত ক্ষমতা সত্ত্বেও অধিকৃত জার্মানী মিত্রশক্তিবর্গের কাহারও রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল না। কিন্তু জার্মানী চতুঃশক্তির দখলদারির মধ্যে বিভক্ত হইল এবং সোভিয়েত দখলীকৃত এলাকা থেকে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হইল।

যদিও লালফৌজের হাতে বার্লিনের পরাজয় ও পতন ঘটিয়াছিল, তথাপি শহরতলীসহ বৃহত্তর বার্লিনও চতুঃশক্তির দখলে গেল এবং দখলদারি শক্তিগুলির মধ্যে বার্লিন পূর্বে ও পশ্চিমে বিভক্ত হইল। অবশ্য বার্লিন একান্তরূপে পূর্ব জার্মানীর (বর্তমান জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা জি. ডি. আর.) ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিম জার্মানীর সীমানা থেকে তার দূরত্ব ছিল ১১০ মাইল। কিন্তু জার্মানীর শাসন ও পরিচালনার জন্য চতুঃশক্তির সেনাপতিদেরকে নিয়া যে কন্ট্রোল কাউন্সিল গঠিত হইয়াছিল, তার সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইল বার্লিনে এবং মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যরাও পশ্চিম বার্লিনে ঘাঁটি স্থাপন করিল, যেমন—পূর্ব বার্লিনে লালফৌজের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইল। জার্মানীকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকার হিটলারী ও নাৎসী সংগঠন, নানা প্রকার নামধারী আধাসামরিক সংস্থা, গেস্টাপো ও অন্যান্য গোয়েন্দাচক্র, মিলিটারী স্কুল, নাৎসী পার্টি এবং জেনারল স্টাফ বা সেনানীমণ্ডলী ও সামরিক সংস্থা প্রভৃতি বাতিল ও বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। সম্মেলনের শেষ প্রচারিত ইস্তাহারে আরও বলা হইল যে, জার্মানী থেকে সামরিকবাদ ও নাৎসীবাদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ ঘটানো হইবে এবং ভবিষ্যতে আর কোনদিন জার্মানী যাতে কোন প্রতিবেশীকে আক্রমণ ও পৃথিবীব্যাপী শান্তি নষ্ট করিতে না পরে তার জন্য যে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। তবে, জার্মানীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টিগুলিকে সভাসমিতি করার অধিকার দেওয়া হইবে; কিন্তু মনোপলি, ট্রাস্ট, সিন্ডিকেট ইত্যাদির মারফৎ যে অর্থনৈতিক শক্তি এতদিন কেন্দ্রীভূত ছিল সেগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।[১]

কিন্তু জার্মানীকে চতুঃশক্তি দখলদারিতে পরিণত করার প্রস্তাব সত্ত্বেও প্রকাশিত ইস্তাহারে কিন্তু জার্মানীর পার্টিশনের বা বিভক্তকরণের কোন উল্লেখ ছিল না।

There was no mention of any partition of Germany, but the communiqe stated that, for the present, no central German Government would be formed. There would, however, be certain central German administrative departments, acting under the guidance of the Allied Control Council.—[২]

১। দি এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৪০৪-৪০৫।

২। Alexander Werth. P. 912.

অর্থাৎ জার্মানীকে বিভক্তকরণের যেমন উল্লেখ ছিল না, তেমনি কোন কেন্দ্রীয় জার্মান সরকার গঠনের প্রশ্নও ছিল না। তবে, মিত্রশক্তিবর্গের কণ্ট্রোল কাউন্সিলের অধীনে জার্মানীর কিছু কিছু কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগ বজায় রাখার কথা হইয়াছিল।

কিন্তু জার্মানীকে খণ্ডন করা না-করা সম্পর্কে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে নানা বৈঠকে নানা ধরনের প্রস্তাব ও বিতর্ক হইয়াছিল এবং মিত্রশক্তির শীর্ষনেতারা চার্চিল, রুজভেল্ট (পরবর্তীকালে ট্রুম্যান) ও স্ট্যালিন নিজেদের মধ্যে সর্বসম্মত কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এজন্য যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা পুস্তকে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত-সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। মহাযুদ্ধের সময় স্ট্যালিন তাঁর একাধিক বিবৃতিতে এবং তারপর পটসডাম সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নাৎসীবাদকে নিশ্চয়ই ধ্বংস করিতে হইবে; কিন্তু জার্মান জাতিকে নয়। জার্মান জাতির অখণ্ডতা রক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তেহরান সম্মেলনের (১৯৪৩ সালের ২৮শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর) প্রস্তাব অনুযায়ী জার্মানকে পাঁচটি অংশে বিভক্ত করার পরিকল্পনা হইয়াছিল। এই পাঁচটি অংশ ছাড়াও হ্যামবুর্গ ও কিয়েল-খাল অঞ্চলকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বা চতুঃশক্তির শাসনাধীনে আনার এবং অনুরূপভাবে রুঢ় ও সার অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব হইয়াছিল। এছাড়া ১৯৪৪ সালে ইঙ্গ-মার্কিন কুইবেক কনফারেন্সে মার্কিন ট্রেজারি সচিব হেনরি মর্গেনথো (Morgenthau—জুনিয়ার) জার্মানীকে দুই অংশে ভাগ করিয়া পশ্চিমাংশে আর-একটি পৃথক আন্তর্জাতিক এলাকা সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এছাড়া সার সহ রাইন নদীর বাঁ দিকের অঞ্চল ফ্রান্সকে দেওয়ার এবং কলকারখানা ধ্বংস করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল "নখদন্তহীন" জার্মানীর খণ্ডিত অংশগুলিকে কৃষি-প্রধান এলাকায় পরিণত করা। অবশ্য স্ট্যালিনের মত রুজভেল্টও এই উদ্ভট পরিকল্পনা বাতিল করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে চার্চিলও জার্মানীকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া এবং কয়েকটি অংশ নিয়া একটি "দানিয়ুব ফেডারেশন" গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। স্ট্যালিন এই সমস্ত প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু পটসডাম সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান জার্মানীকে উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিভক্ত করার প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভিয়েনাকে রাজধানীর মর্যাদা দিয়া দক্ষিণ জার্মান স্টেট্ গড়ার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তা ছিল যুদ্ধোত্তর স্বাধীন অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্বের বিরোধী। ট্রুম্যানও শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পটসডাম সম্মেলনের পর ২রা আগস্ট, ১৯৪৫, ট্রুম্যান-স্ট্যালিন এ্যাটলি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ইস্তাহারে জার্মানীকে পার্টিশান বা বিভক্ত করার কোন প্রস্তাব ছিল না।

তথাপি কার্যতঃ জার্মানী খণ্ডিত বা পার্টিশান হইল কি ভাবে? এর মূল রহিয়াছে, জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবির মধ্যে। ইয়াল্টাতে ত্রিশক্তির শীর্ষ সম্মেলন সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে স্ট্যালিন ২০ হাজার মিলিয়ন ডলার (বা দুই হাজার কোটি ডলার) ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়ের দাবি তুলিয়াছিলেন। এই বিশ হাজার মিলিয়ন ডলারের অর্ধেক পাইবেন মিত্রশক্তি এবং বাকী অর্ধেক বা শতকরা ৫০ ভাগ পাইবে সোভিয়েত রাশিয়া এবং সোভিয়েত রাশিয়ার অংশ থেকেই

পোল্যাণ্ডের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। (পোল্যাণ্ডের ধ্বংস ছিল অবর্ণনীয় এবং জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বেশী। অতএব ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্যতাও তার ছিল অনেক বেশী।) যদিও ক্ষতিপূরণ অংকের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন বৃটিশ ও মার্কিন মহল এবং বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ অংকের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমেরিকার ঘাড়ে এই দায়-দায়িত্ব বর্তাইয়াছিল জার্মানীকে সহায়তা দান করিতে গিয়া, তথাপি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইয়াল্টা বৈঠকে ক্ষতিপূরণের মূলনীতি মানিয়া নিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে বিবেচনার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু পটসডাম বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও মার্কিন প্রতিনিধিগণ জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ হাজার কোটি ডলার আদায়ের এই অংককে "সম্পূর্ণ অবাস্তব" বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। এই প্রস্তাব নিয়া বহু তর্ক-বিতর্কের শেষে স্থির হইল যে, দখলদার চতুঃশক্তি তাঁদের নিজ নিজ অধিকৃত এলাকা (zone) থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ কলকারখানার যন্ত্রপাতি, চলতি উৎপন্ন দ্রব্য এবং অন্যান্য মালপত্র অপসারণ করিতে পারিবেন। আর বিদেশে, যেমন—বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড এবং পূর্ব অস্ট্রিয়াতে জার্মানী যে সমস্ত মূলধন (সম্পত্তি) নিয়োগ করিয়াছিল, সেগুলি থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন। পশ্চিমী মিত্রপক্ষীয়রাও তাঁদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ অনুরূপভাবে আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ একদিক দিয়া লাভবান ছিলেন, তাঁদের হাতে জার্মানীর প্রচুর সোনা ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু রাশিয়া এই সোনার কোন অংশ দাবী করে নাই। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়াতে হিটলারের জার্মানী যে সীমাহীন ধ্বংসকার্য চালাইয়াছিল, সেই ভয়াবহ ক্ষতির কথা বিবেচনা করিয়া সোভিয়েত গবর্নমেণ্ট পশ্চিমীদের অধিকৃত এলাকা থেকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন মহল থেকে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তোলা হইল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমী এলাকা থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ কলকারখানার যন্ত্রপাতির শতকরা ১৫ ভাগ পাইবে। কিন্তু এর পরিবর্তে সোভিয়েত অধিকৃত এলাকা থেকে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য বস্তু দিতে হইবে। কারণ, পশ্চিমাংশে খাদ্যদ্রব্যের অত্যন্ত অভাব ছিল। জার্মানীর কাছ থেকে এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রসঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানীর বিখ্যাত রুড় অঞ্চলের শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার উপর অন্যান্য পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দাবি বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিলেন।[১]

চতুঃশক্তির মধ্যে ক্ষতিপূরণের এই বণ্টনব্যবস্থা থেকেই মূলতঃ প্রত্যেকটি দখলিকৃত এলাকা স্বতন্ত্র অংশে পরিণত হইয়াছিল এবং জার্মানী চতুঃশক্তির মধ্যে খণ্ডিত হইল। চার্চিল স্ট্যালিনের প্রস্তাব অনুসারে এই খণ্ডনের ভিত্তি ধরা হইল জার্মানীর ১৯৩৭ সালের ভৌগোলিক সীমানা। ফলে, পশ্চিম থেকে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্বদিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং পূর্ব জার্মানী ও পূর্ব ইউরোপের উপর তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটিল। পরবর্তীকালের ঠাণ্ডা-যুদ্ধের মূল উৎসও ছিল এখানে।...

পটসডাম সম্মেলনে সোভিয়েত ডেলিগেশনের প্রস্তাব অনুসারে জার্মানীর নৌবহর

১। দি এ্যাণ্টি হিটলার কোয়ালিশন—পৃষ্ঠা ৪০৬-৭।

ও বাণিজ্যবহরগুলি বণ্টনেরও একটা সুব্যবস্থা হইল। অর্থাৎ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সমভাবে বণ্টনের প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং জার্মান সাবমেরিণগুলির অধিকাংশই ডুবাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইল।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের আন্তর্জাতিক আদালতে (নুরেমবার্গ) অভিযুক্ত ও বিচার করার সম্পর্কে। এই বিষয়ে তিন প্রধান শক্তিই একমত হইয়া ঘোষণা করিলেন এবং স্থির হইল যে, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, তারিখের মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করা হইবে।

কোনিসবার্গ এবং পূর্ব প্রুশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন জানাইলেন।

কিন্তু পোল্যাণ্ড ও পূর্ব ইউরোপ নিয়া পশ্চিমী মিত্রপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধ পটসডাম সম্মেলনে তীব্র উত্তাপের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বিষয়ে ইঙ্গ-মার্কিন মহল "কঠোর নীতি" অনুসরণ করিলেন এবং স্পষ্ট বলিলেন যে ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব ইউরোপীয় গবর্নমেণ্টগুলির পুনর্গঠন না হইলে এই সমস্ত সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হইবে না এবং তাদের সঙ্গে কোন শান্তিসন্ধিও স্বাক্ষরিত হইবে না। বিগত ইয়াল্টা বৈঠকে তিন প্রধানের পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ইউরোপে গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি হাতে-কলমে প্রয়োগ করিতে হইবে। অথচ ইতিমধ্যে এই সমস্ত দেশে "জনগণের ইচ্ছানুযায়ী" নূতন গবর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল এবং উপরের তলার যে সমস্ত লোক নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল, তারা অপসারিত হইয়াছিল! অথচ স্ট্যালিন কিন্তু অনেকটা আন্তরিকতার সঙ্গেই পশ্চিমের মিত্রপক্ষীয় নেতাদের সঙ্গে গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ইতালীকে স্বকৃতি দিতে ও রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদে গ্রহণ করিতে মিত্রপক্ষের উৎসাহের কোন অভাব ছিল না। তবে, অন্যের বেলা এই আপত্তি কেন?

আসলে মুশকিল বাধিল গণতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য নিয়া। অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত ইউরোপে গণতন্ত্র ও অবাধ নির্বাচন অর্থে পশ্চিমীরা "বুর্জোয়া গণতন্ত্র" এবং এবং সেই গণতন্ত্রের সমর্থক নির্বাচকমণ্ডলীর কথা ধরিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ক্যাপিটালিস্ট-ঘেঁষা এই গণতন্ত্রের পক্ষে স্বভাবতই সোভিয়েতের বিরোধী হওয়ার কথা। কিন্তু স্ট্যালিন গণতন্ত্র অর্থে নাৎসীবিরোধী এবং সোভিয়েতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন জনগণের গবর্নমেন্টের কথা ভাবিয়াছিলেন। অথচ পশ্চিমী মিত্রপক্ষ ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, "কার্জন লাইন" (পোল্যাণ্ড) ও বেসারাবিয়ার সীমানা (রুমানিয়া) পর্যন্ত পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদী গণতন্ত্র ও অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হইবে—পরবর্তীকালে ৫ই মার্চ, ১৯৪৭, নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকার এই মন্তব্যই ছিল সমীচীন।[১]

পটসডাম বৈঠকে এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়া উভয় শিবিরের প্রতিনিধিদের মধ্যে বহু বাগবিতণ্ডার পর স্থির হইল যে, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তিসন্ধি স্বাক্ষরিত এবং তাদেরকে রাষ্ট্রসংঘে গ্রহণ করা হইবে।

অপরদিকে পটসডাম কনফারেন্সের আগেই সোভিয়েত রাশিয়া পোল্যাণ্ডের

১। দি কোল্ড ওয়ার—১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৫।

পশ্চিম সীমানা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। রাশিয়া পোল্যাণ্ডের যে সমস্ত ভূমি দখল করিয়া নিয়াছিল (পূর্বদিকে) তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্মানী থেকে পোল্যাণ্ডকে উপযুক্ত পরিমাণ জমি দেওয়া হইবে। যেমন—পূর্ব প্রুশিয়ার তিন-চতুর্থাংশ, সাইলেশিয়ার (শ্রমসমৃদ্ধ অঞ্চল) বাকী অংশ, পোমেরামিয়া এবং ব্রাণ্ডেনবুর্গের এক টুকরো—অর্থাৎ নেইসী ও ওডের নদী পর্যন্ত সমস্ত জমি এবং ওডের নদীর অপর তীরস্থ স্টেটিন শহর পর্যন্ত। এই সমস্ত মূল্যবান জার্মান ভূমি পোল্যাণ্ডে শাসনাধীনে অর্পিত হইল এবং পূর্ব ইউরোপের যে ৯০ লক্ষ জার্মান বাসিন্দা ছিল, তাদের মধ্যে ২০ লক্ষ ছাড়া বাকী সকলেই পলায়নপর জার্মানবাহিনীর সঙ্গে পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল।[১]

বাকী জার্মান বাসিন্দাগণকে "মানবতাবোধ ও শৃঙ্খলার সঙ্গে" অপসারণের প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই সমস্ত জার্মানদের বাসভূমি ছিল পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীতে।

"জাতীয় ঐক্যের অস্থায়ী পোলিশ সারকার" গঠিত হইয়াছিল ২৮শে জুন ১৯৪৫ এবং মিত্রপক্ষের দিক থেকে এই ব্যবস্থা স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না। সুতরাং ৫ই জুলাই বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের গবর্নমেণ্ট এই নূতন সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন। ফলে, বৃটেন ও আমেরিকার পৃষ্ঠপোষিত লণ্ডনের "দেশান্তরিত" পোলিশ সরকার বাতিল হইয়া গেল। অর্থাৎ যে পোল্যাণ্ড নিয়া ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইয়াছিল, সেই পোল্যাণ্ডর "নবতম সংস্করণ" নিয়া মহাযুদ্ধের অবসান হইল এবং নূতন পোল্যাণ্ড "সোভিয়েতের বন্ধুরূপে" প্রতিষ্ঠিত হইল।

* * *

ইতিমধ্যে বৃটেনে নতুন সাধারণ নিবার্চন অনুষ্ঠিত হইল। চার্চিলের রক্ষণশীল দল পরাজিত ও শ্রমিকদল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হইল। (একথা গোড়াতেই উল্লেখ করা হইয়াছে।) চার্চিলের পরাজয়ে যদিও সোভিয়েত রাশিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল এবং ২৮শে জুলাই থেকে চার্চিল পটসডাম সম্মেলন থেকে বাদ গেলেন, তবু রুশ প্রতিনিধিরা শ্রমিক নেতাদের নিয়া যেন ছুঁচো-গেলার অবস্থায় পড়িলেন। কারণ, প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেভিন রক্ষণশীল দলের চেয়েও রুশ বিরোধিতায় বেশী উৎসাহ দেখাইলেন। এ্যাটলি ও বেভিন জার্মানী, পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন সীমানা নিয়া তীব্র বিরোধিতা করিলেন।···

ইতিমধ্যে আমেরিকার যুগান্তকারী অ্যাটমু বোমা পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং সেই সংবাদ অত্যন্ত "অস্পষ্টভাবে" স্ট্যালিনকে দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্ট্যালিন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইলেন। পটসডাম সম্মেলনে পারমাণবিক বোমার কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং জাপানের প্রতি চরমপত্র নিয়া পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৪০।

দশম পর্ব

তৃতীয় অধ্যায়

পটসডাম—২ এ্যাটম বোমার পটভূমিকায়

আগের অধ্যায়ে পটসডাম (বার্লিন) সম্মেলন সম্পর্কে প্রধানতঃ ইউরোপীয় কূটনৈতিক পটভূমিকায় একটি সাধারণ রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে এবং মোটামুটি মিত্র-পক্ষীয় তিন শীর্ষ নেতার মধ্যে আপোসরফামূলক প্রস্তাবগুলির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বাহ্যতঃ আপোসমূলক প্রস্তাবগুলির অন্তরালে তিন পক্ষের মধ্যে—বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার যে মতবিরোধ ঘটিয়াছিল এবং এ্যাটম বোমার সাফল্যজনক পরীক্ষার পর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্শ-দাতাগণ রাশিয়ার প্রতি যে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, মহাযুদ্ধের ইতিহাসে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি মহাযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক জগতে ১৯৫০—১৯৬০-এর দশকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের যে নিদারুণ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সংঘর্ষ হইয়াছিল, তারও মূল ছিল এখানে—বিশেষভাবে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে। সুতরাং কোন কোন ঐতিহাসিক এর নাম দিয়াছেন "এ্যাটোমিক ডিপ্লোম্যাসি" বা পারমাণবিক কূটনীতি, যে কূটনীতি ভিতরে ভিতরে পটসডাম সম্মেলনের উপর গভীর প্রস্তাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ প্রায় একজোট হইয়া রাশিয়াকে কোণঠাসা করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। এই পারমাণবিক কূটনীতির সামরিক লক্ষ্য কেবল জাপান ছিল না, ছিল সোভিয়েত রাশিয়াও। সুতরাং ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সবিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। এখানে স্মরণীয় যে, ট্রুম্যান ব্যক্তিগতভাবে কখনো সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, বরং অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ১৯৪১ সালে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যখন কর্জ-ইজারা আইন অনুসানে সোভিয়েতকে সাহায্যদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন সেনেটর ট্রুম্যান মন্তব্য করিয়াছিলেন—'যদি আমরা দেখি যে, যুদ্ধে জার্মানী জয়লাভ করছে, তা' হলে আমাদের উচিত হবে রাশিয়াকে সাহায্য দেওয়া। অপরপক্ষে যদি দেখা যায় যে, রাশিয়া জয়লাভ করছে, তাহলে আমাদের উচিত হবে জার্মানীকে সাহায্য দেওয়া এবং এভাবে দু'পক্ষকে কাটাকাটি করে মরতে দেওয়া উচিত।' সুতরাং এহেন ট্রুম্যান যখন রুজভেল্টের মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্টের গদীতে আসীন হইলেন, তখন রুশ-মার্কিন সম্পর্কের যে অবনতি ঘটিবে, সেটা আর আশ্চর্য কি ?···

রুশ-মার্কিন সম্পর্কের এই অবস্থা সম্পর্কে একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ—ডঃ গ্যার আলপেরোভিৎস (Gar Alperovitx) তাঁর পুস্তকে পারমাণবিক কূটনীতির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও তাঁর উপদেষ্টাগণ পটসডাম সম্মেলনে তিন রকম কূটনৈতিক রণনীতি অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। যথা—

ক. অবিলম্বেই রাশিয়ার প্রতি শক্তি প্রদর্শন বা "শো ডাউন"।

খ. বিলম্বিত শক্তি প্রদর্শন।

গ. শেষ পর্যন্ত স্ট্যালিনের মুখোমুখি হওয়ার বা কনফনট্রেশনের রণনীতি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত।

পটসডাম সম্মেলনে আমেরিকার পক্ষ থেকে এই তিন প্রকার কূটনীতির রণকৌশলই দেখা গিয়াছিল এবং এই সমস্তই ঘটিয়াছিল এ্যাটম বোমার পরীক্ষা ও বিস্ফোরণের পটভূমিকায়।

* * *

অবশ্য হারবার্ট ফীজের মত (Herbert Feis) বিখ্যাত মার্কিন বিশেষজ্ঞ (সোভিয়েত বিরোধী) বলিয়াছিলেন যে, ট্রুম্যান পরলোকগত রুজভেল্টের নীতির প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে চাহেন নাই। কিন্তু ডঃ আলপেরোভিৎস তাঁর পুস্তকে এই মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন এবং পটসডাম সংক্রান্ত দলিলপত্র ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পারমাণবিক শক্তি পরীক্ষার পটভূমিকায় প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান রুজভেল্টের নীতির বদলে রাশিয়ার প্রতি কঠোর নীতি অনুসরণ করিতে এবং ইউরোপে সোভিয়েত প্রভাব হ্রাস বা দূর করিতে চাহিয়াছিলেন রুজভেল্টের মৃত্যুর (১২ই এপ্রিল ১৯৪৫) মাত্র ১১ দিন পরে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এক "শক্তিশালী" মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির প্রয়োগ করিতে চাহিলেন এবং ২৩শে এপ্রিল ট্রুম্যান নবগঠিত পোলিশ সরকারের (সোভিয়েত পক্ষপাতী) পুনর্গঠন দাবি করিয়া সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভকে কর্কশ ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, রুশরা যদি এই বিষয়ে সহযোগিতা করিতে না চায়, তবে তারা গোল্লায় যাউক! জবাবে মলোটোভ মন্তব্য করিয়াছিলেন 'আমার জীবনে আমার সঙ্গে কেউ কখনও এমনভাবে কথা বলেন নি।'

ট্রুম্যান ফোড়ন কাটিলেন—'আপনাদের চুক্তি আপনারা পালন করুন, তা' হলে আর এই ধরনের কথা শুনিতে হবে না।'—

অথচ ইয়াল্টা বৈঠকে চার্চিল-রুজভেল্ট "সোভিয়েতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন" পোলিশ সরকার গঠনের মূলনীতি মানিয়া লইয়াছিলেন এবং পটসডাম বৈঠকে স্ট্যালিন আপোস-মীমাংসার উদ্দেশ্যে মধ্যপন্থা অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং যুগোশ্লাভিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনি ওয়ারশ'র (পোল্যাণ্ড) মন্ত্রিসভার প্রতি চারজন মন্ত্রী পিছু একজন করিয়া নূতন মন্ত্রী গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ট্রুম্যান সোভিয়েত পক্ষপাতী পোলদের শক্তিবৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। ট্রুম্যানের এই মনোভাব দেখিয়া চার্চিল পর্যন্ত অবাক হইয়াছিলেন—যদিও তিনি মনে মনে ট্রুম্যানের তারিফ করিলেন। আসলে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে রাশিয়ার কর্তৃত্ব বিস্তার নীতির বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড নিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের এই বাধা দান ছিল একটা প্রতীকী বা "সিম্বলে"র মত। রুজভেল্টের মৃত্যুর পর কিভাবে মার্কিন নীতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, মস্কোস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আভেরেল হ্যারিম্যান পর্যন্ত ট্রুম্যানকে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁর বিশ্বাস রাশিয়া ডবল নীতি অনুসরণ করিতেছে—একদিকে ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গে সহযোগিতা, কিন্তু অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তার। তাঁর বিশ্বাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "ইউরোপে বর্বরতার আক্রমণের সম্মুখীন।"

যেখানে দায়িত্বশীল এবং অভিজ্ঞ মার্কিন কূটনীতিকদের মনোভাব এই, সেখানে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নবাগত প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের পক্ষে কঠোর নীতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়া খুব অভিনব ছিল না। কিন্তু একটা প্রশ্ন বিবেচনার ছিল স্যানফ্রান্সিসকোতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ গ্রহণ সম্মেলনের তারিখ ছিল ২৫শে এপ্রিল। যদি এই সময় রাশিয়ার প্রতি কঠোর নীতি অনুসৃত হয়, তা হলে সোভিয়েত সরকারের অসহযোগিতার ফলে সেই ঐতিহাসিক সম্মেলন পণ্ড হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু অপর পক্ষে হ্যারিম্যানের যুক্তি ছিল এই যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ারও আমেরিকার কাছে ঠেকা আছে। কারণ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকার কাছ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার ৬০০ কোটি ডলার ঋণের দরকার হইতে পারে।...

ট্রুম্যান পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে প্রায় আনাড়ি ছিলেন বলিলে অতিরঞ্জিত করা হইবে না। ফলে, অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ সিগ্রু (Crew) ছিলেন তাঁর একজন পরামর্শদাতা এবং গ্রু ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল ও সোভিয়েত বিরোধী। (রুজভেল্টের পক্ষপাতী পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্টেটিনিয়াস সেই সময় ওয়াশিংটনের বাইরে ছিলেন এবং তাঁর কার্যকালও শেষ হইয়া আসিয়াছিল।) ট্রুম্যান এই সমস্ত ব্যক্তির পরামর্শে স্থির করিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার এ পর্যন্ত একতরফা নীতি চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং এই সম্পর্ককে নূতন ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে। কিন্তু তখন আর একটি প্রশ্ন দেখা দিল। জাপানের বিরুদ্ধে তখনও যুদ্ধ শেষ নাই এবং এই যুদ্ধে রাশিয়ার সহযোগিতা দরকার। সুতরাং "কঠোর নীতি" অনুসরণ করিলে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে কোন সাহায্য নাও দিতে পারে। কিন্তু এপ্রিলের মধ্যভাগে মার্কিন সেনানীমণ্ডলী দেখিলেন যে, জাপানী সমুদ্রের উপর মার্কিন নৌ-আধিপত্য এতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, চীন বা মাঞ্চুরিয়া থেকে জাপানী সৈন্যবাহিনীকে খাস জাপানে অপসারণ করা সম্ভব নয়। অতএব রুশ সাহায্য না পাইলেও ক্ষতি নাই এবং তাঁদের পরামর্শ ক্রমে জয়েণ্ট চীফস্ অব স্টাফ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে, খাস জাপানী ভূমি আক্রমণের জন্য রাশিয়ার সহযোগিতার দরকার নাই। সুতরাং ট্রুম্যান শক্ত হইলেন এবং স্যানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে ওয়ারশ' সরকারকে মানিয়া নিতে অস্বীকৃত হইলেন। এমনকি, বর্তমান ওয়ারশ' সরকারের ভিত্তিতে পোলিশ গবর্নমেণ্টের পুনর্গঠনেও মার্কিন সরকার রাজী ছিলেন না। সুতরাং ১০ই মে স্ট্যালিন ট্রুম্যানকে জানাইয়া দিলেন যে, এই অবস্থায় পোলিশ সমস্যার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়!

অতএব "অবিলম্বে শক্তি প্রদর্শনের" ট্রুম্যানীয় নীতি ব্যর্থ হইল। কারণ, স্ট্যালিন নত বা নরম হইলেন না।

এই সময় ১৪ মে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন ট্রুম্যানকে জানাইলেন যে, তিন প্রধানের বৈঠক ছাড়া পোলিশ সমস্যার কোন মীমাংসা হইবে না। অপরপক্ষে বৃটিশ ইম্পিরীয়েল জেনারেল স্টাফের প্রধান জেনারেল ইজমে (Ismay) জার্মানীর রুশ অধিকৃত এলাকা থেকে মিত্রসৈন্য অপসারণ না-করার সমালোচনা করিলেন। কেননা, এর দ্বারা মিত্রপক্ষের মধ্যে স্বীকৃত চুক্তির অমর্যাদা করা হইতেছিল এবং এই বিষয়ে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল আইজেনহাওয়ারও অনুরূপ অভিমত পোষণ করিতেন। তথাপি ২৩শে এপ্রিলের (১৯৪৫) পর ট্রুম্যান ও চার্চিল যেন একজোট হইয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ

করিতে উদ্যত হইলন এবং যদিও হার্বার্ট ফীজ লিখিয়াছেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে রুজভেল্টের সমস্ত চুক্তি ট্রুম্যান যত্নের সঙ্গে পালন করিয়াছিলেন, তথাপি এ কথা সত্য নয়—অন্ততঃ ডঃ আলপেরোভিৎসের এই অভিমত। তিনি তাঁর বইতে ট্রুম্যানের ২৭শে এপ্রিল তারিখের বার্তা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অস্ট্রিয়ায় ও ভিয়েনায় দখলীকৃত এলাকাগুলি এবং অস্ট্রিয়ার পরিচালনা সম্পর্কে একটি সুমীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত জার্মানীর সোভিয়েত এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ করিতে ট্রুম্যান অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।[১]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরসচিব স্টিমসন রক্ষণশীল হইলেও অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি পোল্যাণ্ড, মধ্য ইউরোপ এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি সম্পর্কে রুশনীতির সারবত্তা উপলব্ধি করিলেন এবং "অবিলম্বেই শক্তি প্রদর্শনের" ট্রুম্যানীয় নীতির বিরোধিতা করিলেন। পর পর দুটি মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা গিয়াছিল যে, ইউরোপীয় শান্তির উপর আমেরিকার নিরাপত্তাও নির্ভরশীল। সুতরাং স্টিমসনের মতে বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা কিংবা ইউরোপের স্থায়িত্ব বিধান করিতে হইলে রুশ-মার্কিন সহযোগিতা প্রয়োজন।

সমরসচিব হিসাবে মার্কিন মহলে স্টিমসনের "পজিশনের" গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কারণ, পারমাণবিক বোমার গোপনীয়তার সমস্ত খবর ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর মতে আর চার মাসের মধ্যেই এ্যাটম বোমার পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে এবং এই বোমা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। সুতরাং জুলাই মাসের প্রথম ভাগে এই বোমার পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত তিনি ট্রুম্যানকে অপেক্ষা করিতে এবং তিন প্রধানের বৈঠক স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিলেন। বিশেষতঃ ইউরোপে তখন মিত্রপক্ষের ৩০ লক্ষ সৈন্য ছিল এবং গ্রীষ্মকালের শেষে মাসে ৫০ হাজারের বেশী সৈন্য অপসারিত হইবে না। অতএব "বিলম্বিত শক্তি প্রদর্শনের" নীতিতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। স্টিমসনের এই সমস্ত মতামতের ফল ফলিল। কারণ, চার্চিলের একটি তারের জবাবে ট্রুম্যান ১৪ই মে জানাইলেন যে, তিন শীর্ষ নেতার বৈঠক প্রয়োজন বটে, কিন্তু আগামী দুইমাস তিনি এত ব্যস্ত থাকিবেন যে, ওয়াশিংটনের বাইরে যাইতে পারিবেন না। অর্থাৎ জুলাই মাসের প্রথম ভাগের আগে নয়। কারণ, ঐ সময় পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা হওয়ার কথা।

সুতরাং ট্রুম্যানের তিন নম্বর নীতি—অর্থাৎ স্ট্যালিনের মুখোমুখি হওয়ার বা "কনফ্রনটেনশনের" নীতি ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত হইল। এটাই ছিল ট্রুম্যানের পক্ষে ১৯৪৫ সালের বসন্তকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।[২]

এই পরিস্থিতির মধ্যেই রুশ ও বৃটিশ মনোভাব বুঝিবার জন্য ট্রুম্যান হপকিন্সকে মস্কোতে এবং জোসেফ ডেভিসকে (মস্কোর প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত) লণ্ডনে পাঠাইবার মতলব করিলেন। কিন্তু এই দুই মিশনের ব্যবস্থা "অত্যন্ত গোপনে" অনুষ্ঠিত হইল। এমন কি পররাষ্ট্র দপ্তরের কাউকে পর্যন্ত জানানো হইল না—এক মাস পর যাত্রার ঠিক পূর্বাহ্ণে ছাড়া।

'This unusual secrecy is further indirect evidence of the relation-

১। এ্যাটোমিক ডিপ্লোম্যাসি পৃষ্ঠা ৪৫, পাদটীকা।

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ৬৮।

ship of the trips to the secret atomic project ; it would have been in conceivable, except in extraordinary circumstances, for Truman to send Hopkins to discuss the most important outstanding diplomatic question without consulting, or at least notifying, the Secretary of State'.—১

সহজ কথায়, অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা না করিয়া কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে না জানাইয়া এভাবে হপকিন্সকে পাঠানো এবং সেজন্য অভূতপূর্ব গোপনীয়তার অবলম্বন —এর দ্বারাই গোপনীয় পারমাণবিক প্রকল্পের সঙ্গে এই মস্কো যাত্রার অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কারণ, সাধারণ অবস্থায় এ কথা কল্পনা করাও যাইত না।

হপকিন্সের মস্কো যাত্রার সাফল্যের কিংবা পোল্যাণ্ড ইত্যাদি সমস্যার আপোস মীমাংসার কথা আগের অধ্যায়েই বর্ণনা করা হইয়াছে। আসলে সমরসচিব স্টিমসনের নীতিও এই মীমাংসা চেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং সেই মীমাংসার সূত্র ছিল চার রকম। যথা—

১. পারমাণবিক পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ট্যালিনের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার নীতি স্থগিত রাখা।

২. পোল্যাণ্ড সম্পর্কে রাশিয়ার অধিকাংশ প্রস্তাব মানিয়া লওয়া।

৩. চার্চিলের নীতি ও ব্যক্তিত্ব থেকে মার্কিন নীতিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং মধ্য ইউরোপ সম্পর্কে রাশিয়ার সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসা।

আপোস-মীমাংসার বাহ্যিক মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ ট্রুম্যান সোভিয়েত সরকারকে ১০০ কোটি ডলার ঋণদানেরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে এ্যাটম্ বোমার পরীক্ষা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত দূর-প্রাচ্য বা জাপান সম্পর্কেও "বিলম্বিত রণনীতি"র কৌশল অবলম্বিত হইল।

এদিকে ট্রুম্যান স্ট্যালিনের নিকট ১৫ই জুলাই থেকে পটসডাম সম্মেলন আরম্ভ করার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং যদিও চার্চিল চাহিয়াছিলেন জুন মাসের মাঝামাঝি তারিখ, তথাপি ট্রুম্যান তাতে রাজী হইলেন না। কারণ, জুলাই মাসের আগে পারমাণবিক পরীক্ষা শেষ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সেই সময় স্ট্যালিন অবশ্য এই সমস্ত গোপন রহস্যের কথা জানিতেন না। সুতরাং পটসডাম সম্মেলন সম্পর্কে ট্রুম্যানের প্রস্তাবিত তারিখই মানিয়া লওয়া হইল।

কিন্তু পটসডাম সম্মেলনের আগেই ২৮শে মে তারিখে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের পক্ষ থেকে হপকিন্স ও হ্যারিম্যান স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া চীন, মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া সম্পর্কে এই আশ্বাস আদায় করিলেন যে, চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বেই চীনের ঐক্য ও সংহতি মানিয়া লওয়া হইবে। তাঁর মতে চীনে এমন কোন কমিউনিস্ট নেতা নাই, যিনি চীনের ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা রাখেন। স্ট্যালিন আরও বলিলেন যে, চীনের বিরুদ্ধে তাঁর কোন ভূমিগত দাবি নাই এবং সিনকিয়াং ও মাঞ্চুরিয়া সম্পর্কে চীনের সার্বভৌমত্বই স্বীকার করা হইবে। রুশসৈন্যেরা মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিলে চিয়াং কাইসেকের প্রতিনিধিরা তাঁদের সঙ্গে অনুগমন করিতে পারিবেন। চীনে

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, (আলপেরোভিৎসা), পৃষ্ঠা ৭১।

আমেরিকার "খোলা দরজার" নীতি মানিয়া লওয়া হইবে এবং কোরিয়ার জন্য ট্রাস্টিশিপ গঠন করা হইবে।[১]

চীন সম্পর্কে স্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য ট্রুম্যান চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্র টি. ভি. সুংকে (Soong) জুলাই মাস আরম্ভ হওয়ার আগেই মস্কোতে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। আর জুলাই মাসে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পর ট্রুম্যান মনে করিলেন যে, পূর্বদিকে জাপান আর পশ্চিমে ইউরোপের সমস্ত সমস্যার মীমাংসা সহজতর হইবে। সুতরাং ট্রুম্যানের বিলম্বিত রণনীতির আসল ভিত্তি ছিল পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাফল্য। অবশ্য ট্রুম্যান আগেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রণক্ষেত্রে এ্যাটম বোমার পরীক্ষা না-হওয়া পর্যন্ত স্ট্যালিনের কাছে কোন গুপ্ত কথা ফাঁস করা হইবে না এবং এই বিষয়ে চার্চিলও একমত ছিলেন।

* * *

চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিন এতদিন পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যে নীতি ইয়াল্টা পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেটাকে পালটে দেওয়ার মনস্থ করিয়া প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান "কর্কশ ভাষায় রচিত" একটি দলিলের খসড়া নিয়া পটসডাম যাত্রা করিয়াছিলেন। এর ফলে গোড়ার দিকে বৃটিশ ডেলিগেশন পটসডামে মার্কিন মনোভাব নিয়া বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়াছিলেন, যতক্ষণ না তাঁরা জানিতে পারিয়াছিলেন অ্যাটম বোমার কথা, কারণ, সম্মেলনে উত্থাপিত প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান প্রস্তাবই আমেরিকার পক্ষ থেকে স্থগিত রাখার চেষ্টা হইতেছিল। ট্রুম্যান ১৫ই জুলাই অপরাহ্নে পটসডামে পেঁছিয়াছিলেন এবং পরদিন ১৬ই জুলাই নিউ মেক্সিকোর আলামোগোরডো থেকে প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাফল্যের সংবাদ সাংকেতিক ভাষায় পেঁছিল মার্কিন সমরসচিব স্টিমসনের কাছে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ জানাইলেন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বার্নসকে (Byrnes)। যদিও এই প্রাথমিক সংবাদ খুব সুনির্দিষ্ট রকমের ছিল না, তবু দুই মার্কিন রাষ্ট্রনেতাই গভীর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আসল সংবাদ পাওয়া গেল পরদিন ১৭ই জুলাই পটসডাম সম্মেলন আরম্ভের দিন।

চার্চিল তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'১৭ই জুলাই সেই বিশ্বকম্পনকারী সংবাদ এলো। অপরাহ্নে মার্কিন সমরসচিব স্টিমসন আমার বাস ভবনে এলেন এবং আমার সম্মুখে একটি কাগজের শীট মেলে ধরলেন, যার মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় লেখা ছিল—

'Babies satifactorily born' অর্থাৎ শিশুরা সন্তোষজনক ভাবেই জন্ম গ্রহণ করেছে। স্টিমসনের ভাবভঙ্গী দেখে আমার মনে হল যে, অসাধারণ কিছু ঘটে গেছে। তিনি ব্যাখ্যা করে আমাকে বুঝালেন যে মেক্সিকোর মরুভূমিতে পরীক্ষা সফল হয়েছে—'The atomic bomb is a reality' অর্থাৎ পারমাণবিক বোমা যখন বাস্তব সত্য।

'যদিও কিছু কিছু টুকরো খবর আমরা আগেই জানতাম, তথাপি চূড়ান্ত পরীক্ষায় তারিখ আমাদের জানা ছিল না। এক্ষণে বুঝতে পারছি—শিশুরা সন্তোষজনক ভাবেই জন্মেছে।'[২]

১। মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের রিপোর্ট থেকে (এ্যাটমিক ডিপ্লোম্যাসি, পৃষ্ঠা, ১০২)।
২। চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫১-৫২।

পরদিন প্লেনযোগে আরও বিস্তৃত খবর আসিল। মানুষের ইতিহাসের এই প্রথম এবং ভয়ঙ্করতম বিস্ফোরণ সম্পর্কে বলা হইল যে, ৫০ মাইল দূর থেকে এই বিস্ফোরণের শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং ২৫০ মাইল দূর থেকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।...

তৃতীয় কিস্তির রিপোর্ট পারমাণবিক প্রকল্পের ড়াইরেক্টর জেনারেল লেসলি গ্রোভস যে বিস্তৃত তথ্য জানাইলেন, তার সার কথা এই যে, নিউ মেক্সিকোর আলামোগোর্ডোর বিমানঘাঁটির এক দূরবর্তী অংশে পারমাণবিক বোমার পুরোপুরি পরীক্ষা করা হইয়াছে ঃ

'For the first time in history there was a nuclear explosion···The test was successful beyond the most optimistic expectations of any one···I estimate the energy generated to be in excess of the equivalent of 15,000 to 20,000 tons of T N T ; and this is a conservative estimate···

The feeling of the entire assembly was···profound awe···'

অর্থাৎ 'ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিল। যারা চরমতম আশাবাদী ছিলেন, তাঁদের প্রত্যাশাকেও এই পরীক্ষা ছাড়াইয়া গেল। আমার হিসাবে যে শক্তি এই বোমা বিস্ফোরণে উদগত হইয়াছিল, তাহা ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টন টি-এন-টি বা অতি বিস্ফোরককেও ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং এই হিসাবও ন্যূনতম পরিমাণে ধরা হইয়াছে। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এর ভীষণতার হতবাক হইয়া গিয়াছিলেন।'[১]

২১শে জুলাইয়ের এই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই পটসডাম সম্মেলনের মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া ঘুরিয়া গেল এবং স্টিমসনের মতে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যেন এক নতুন আত্মবিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলেন এবং তিনি এমন-এক-শক্তির অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন, যার দ্বারা তাঁর কুটনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা সহজ হইবে। এর প্রমাণ এই যে, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর ট্রুম্যান সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে স্ট্যালিন কর্তৃক উত্থাপিত বলকান সমস্যার জবাবে সাফ ঘোষণা করিলেন যে, এই সমস্ত তাঁবেদার রাষ্ট্রের গবর্নমেণ্টগুলির গঠনের পরিবর্তন করা না হইলে মার্কিন সরকার এই সমস্ত গবর্নমেণ্ট মানিয়া লইবেন না···এই বিষয়ে তিনি নিশ্চয়ই সোভিয়েত রাশিয়া সঙ্গে একমত হইবেন না। বরং তিনি অন্য কোন বিষয় নিয়া আলোচনা করিতে রাজী আছেন।

চার্চিল পর্যন্ত ট্রুম্যানের এই নূতন ভঙ্গী ও আত্মবিশ্বাস দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। স্টিমসন বলিয়াছেন যে, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর ট্রুম্যান যেন এক "পরিবর্তিত মানুষে" পরিণত হইয়াছিলেন।[২]

* * *

বলা বাহুল্য যে, ট্রুম্যানের চেয়ে চার্চিলের আনন্দ কম ছিল না। বিশেষভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা নিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ যে দুশ্চিন্তায় ছিলেন, এই ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কারের ফলে তাঁরা সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাইলেন। ট্রুম্যানের সঙ্গে চার্চিল অবিলম্বেই পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হইলেন। এতদিন পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন

১। এ্যাটোমিক ডিপ্লোম্যাসি, পৃষ্ঠা ১৫০।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৫১।

পক্ষের ধারণা ছিল যে, জাপানকে হারাইতে গেল ক্রমাগত বোমাবর্ষণ এবং প্রচুর সৈন্যসহ জাপানী দ্বীপ আক্রমণ করিতে হইবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অজস্র প্রাণবলির দরকার হইবে। কেননা, সাম্প্রতিক কালের (এপ্রিল ১৯৪৫) ওকিনাওয়া দ্বীপ দখলের যুদ্ধে যে তীব্র ও তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাতে দেখা গিয়াছে যে, হাজার হাজার জাপানী সৈন্য এবং তাদের সেনাপতিরা পর্যন্ত হারিকিরি করিবে, তবু হার মানিবে না কিংবা যুদ্ধেও ক্ষান্ত দিবে না। এই মৃত্যুপণ লড়াইয়ের ভয়ঙ্কর বাধা অতিক্রম করিয়া যদি জাপানের প্রতি ইঞ্চি জমি দখল করিতে হয়, তবে, চার্চিলের মতে আমেরিকার ১০ লক্ষ সৈন্য এবং বৃটেনের তার অর্ধেক বা ৫ লক্ষ সৈন্য বলি দিতে হইবে। কিন্তু এই অভূতপূর্ব প্রাণ হননের আর দরকার হইবে না। বিভীষিকাপূর্ণ দুঃস্বপ্ন যেন কাটিয়া গেল—যেন একটা "মিরাক্যাল" অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। পারমাণবিক বোমার একটি বা দুইটি ভয়ংকর আঘাতেই সমগ্র জাপানী যুদ্ধ খতম্ হইয়া যাইবে, আর রাশিয়ারও সহযোগিতা বা সাহায্যের দরকার হইবে না। আমেরিকা নিশ্চয়ই আর রুশ সাহায্যের ভরসায় থাকিবে না।

ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের আগে যাতে সোভিয়েত রাশিয়া চীনের বা মাঞ্চুরিয়ার কিংবা জাপানের কোন অংশ দখল করিয়া নিতে না পারে কিংবা আগেই আক্রমণ করিতে না পারে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নেতারা তেমন জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। স্বরং ট্রুম্যান মনে করিলেন এতদিন পর রুজভেল্টের রাশিয়া-সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তনের শক্তি তিনি অর্জন করিয়াছেন এবং পটসডাম বৈঠকে ২৪শে জুলাইয়ের পর কোন সমস্যা নিয়া আপোস-মীমাংসার জন্য রাশিয়ার উপর আর চাপ দেওয়ারও দরকার নাই। কিন্তু স্ট্যালিনও নরম হইলেন না এবং বলকান সমস্যার কোন মার্কিনী ফয়সালাও হইল না। তখন ২৪শে জুলাই ট্রুম্যান সমর-সচিব স্টিমসনকে বলিলেন যে, তিনি কনফারেন্স বন্ধ করিয়া দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে রাজী আছেন। আর এদিকে উল্লসিত চার্চিল অনুভব করিলেন যে, তাঁরা "অপ্রতিরোধ্য শক্তি"র অধিকারী হইয়াছেন। সুতরাং বলকান নিয়া তিনি আগে স্ট্যালিনের সঙ্গে যে ভাগাভাগির চুক্তি করিয়াছিলেন, তিনি নিজের সেই চুক্তি নিজেই ভঙ্গ করিতে উৎসুক হইলেন। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সময় চার্চিলের বলকান নীতির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এবার ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া গেল এবং ট্রুম্যান চার্চিলের দলে আসিলেন। আর লর্ড এ্যালান ব্রুকের মতে চার্চিল এতদূর পর্যন্ত মনে করিলেন যে, সমস্ত রুশ শিল্পকেন্দ্র ও জনগণকে সাবাড় করার এবং স্ট্যালিনের উপর ডিক্টেটরি করার শক্তি তাঁর হাতের মুঠোয় আসিয়া গিয়াছে!

কিন্তু আমেরিকার পারমাণবিক বিজ্ঞানীরা জাপানের বিরুদ্ধে এর ব্যবহার নিষেধ করিয়াছিলেন এবং সোভিয়েত রাশিয়াকে এই বোমার অস্তিত্ব জানাইবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। কারণ, অন্যথা আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতা বিপন্ন হইতে পারে।

এমন কি পটসডামে জেনারেল আইজেনহাওয়ারও পর্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। কারণ, তাঁর মতে জাপান ইতিমধ্যেই পরাজিত হইয়াছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত নয় এভাবে বিশ্বজনমতকে গভীরভাবে আহত করা।[১]

১। এ্যাটোমিক ডিপ্লোম্যাসি—পৃষ্ঠা—১৫৪-৫৫।

* * *

তখন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিল চার্চিল ও ট্রুম্যানের কাছে—স্ট্যালিনকে আদৌ এই নতুন অস্ত্র এ্যাটম্ বোমার সংবাদ দেওয়া হইবে কিনা এবং দেওয়া হইলে কতটুকু দেওয়া হইবে ? অথবা সমগ্র ব্যাপারটাই স্ট্যালিনের কাছ থেকে গোপন করা হইবে ? যদি তাঁকে সংবাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, তবে লিখিতভাবে দেওয়া হইবে কিংবা মৌখিকভাবে ? চার্চিল লিখিয়াছেন যে, তিনি ও ট্রুম্যান এই সিদ্ধান্তে পেঁাছিয়াছিলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যের আর কোন প্রয়োজন নাই। বিগত ইয়াল্টা বৈঠকে তাঁদের অবস্থান ছিল দুর্বল এবং রাশিয়া ছিল শক্তিশালী। সুতরাং ইয়ল্টাতে রাশিয়া আমেরিকানদের কাছ থেকে যথেষ্ট সুবিধা আদায় করিয়া নিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পটসডাম বৈঠকে ইঙ্গ-মার্কিন-পক্ষের অবস্থানই ছিল অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং রাশিয়াকে আর আগের মত খাতির না করিলেও চলিবে। তথাপি চার্চিল মনে করেন যে, হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া ছিল এক বিরাট শক্তিশালী মিত্রপক্ষ। সুতরাং এই নূতন অস্ত্রের কথা সম্পূর্ণ চাপিয়া যাওয়া ঠিক হইবে না, তবে, বিস্তৃত কোন খবরও দেওয়া হইবে না। ট্রুম্যান ও চার্চিল পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থির করিলে যে কোনও একটি বৈঠকের শেষে ট্রুম্যান কথায় কথায় স্ট্যালিনকে এই নূতন অস্ত্রের কথা বলিবেন বটে, তবে পরমাণবিক বোমা সম্পর্কে কোন তথ্য দিবেন না। কিন্তু একথা বলা হইবে যে, একটা নতুন ধরনের অসাধারণ শক্তিশালী বোমা প্রস্তুত হইয়াছে, যার ফলে জাপানের পক্ষ থেকে যুদ্ধ চালাইবার শক্তি চূড়ান্তরূপে ব্যাহত হইবে।[১]

ট্রুম্যান চার্চিলের সঙ্গে একমত হইলেন এবং ২৪শে জুলাই, ১৯৪৫, যখন তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কনফারেন্স বন্ধ করিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিতে রাজী ছিলেন, সেই সময় একটি বৈঠকের শেষে তিনি কথায় কথায় স্ট্যালিনকে বলিলেন যে, তাঁরা একটি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নূতন অস্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন। তবে তিনি 'নিউক্লিয়ার' বা 'এ্যাটোমিক'—এই দুইটি শব্দের একটিও ব্যবহার করেন নাই। চার্চিল অবশ্য অদূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে এবং গভীর আগ্রহভরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি (চার্চিল) পরে বলিয়াছেন যে, তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ট্রুম্যানের বক্তব্যের আসল তাৎপর্য স্ট্যালিন বুঝিতে পারেন নাই—

'Churchill was sure that Stalin had no idea of what he was being told.'

ট্রুম্যান স্ট্যালিনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর মুহূর্তেই চার্চিলের কাছে আসিয়া গর্বভাবে মন্তব্য করিলেন, 'স্ট্যালিন কোন প্রশ্ন করেন নাই।'[২]

অর্থাৎ চার্চিল ও ট্রুম্যান চাতুর্যনীতি অবলম্বন করিলেন। তাঁরা তাদের সময় সঙ্গী ও মিত্র স্ট্যালিনের কাছ থেকে সমস্ত কিছু গোপন করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এমন অভিযোগ যাতে না উঠে, এজন্য কৌশলপূর্বক একটা "অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নূতন অস্ত্র সম্পর্কে" ইঙ্গিত দিলেন বটে, কিন্তু অস্ত্রটা যে এ্যাটম্ বোমা সেই আসল কথাটাই

১। চার্চিল ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৪।
২। এ্যাটোমিক ডিপ্লোম্যাসি—পৃষ্ঠা ১০৬।

চাপিয়া গেলেন। পটসডামে ট্রুম্যান ও চার্চিল রাশিয়ার প্রতি বিরূপ মনোবৃত্তি নিয়াই স্ট্যালিনের কাছ থেকে পারমাণবিক অস্ত্রের কথা গোপন করিয়া রাখিলেন। অন্যথা এমন আচরণের অর্থ কি এবং উদ্দেশ্যই বা কি ?

* * *

পারমাণবিক শক্তি করায়ত্ত হওয়ার পর ট্রুম্যান সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কড়া নীতি অবলম্বন করিলেন এবং রুঢ়ের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল কিংবা রাশিয়ার ক্ষতিপূরণ দাবী অথবা বলকান বা পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ কিংবা ভবিষ্যৎ জার্মানীর সামরিক পুনরভ্যুত্থান, অথবা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় রাশিয়ার সহযোগিতা ইত্যাদি কোন বৃহৎ প্রশ্নেই ট্রুম্যান রাশিয়াকে কোন 'কনসেশন' দিতে কিংবা কোন আপোস-মীমাংসা করিতে রাজী ছিলেন না। যদি মীমাংসা করিতে হয়, তবে আমেরিকার দাবী অনুসারেই করিতে হইবে। অথবা সমস্যাগুলির ভবিষ্যৎ বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখিতে হইবে—অন্যথা তিনি সম্মেলন বন্ধ রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে প্রস্তুত আছেন! ট্রুম্যান বারবার এই ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

পটসডাম সম্মেলনে পারমাণবিক কূটনীতির এই পরোক্ষ বা অন্তরালবর্তী প্রভাব সত্ত্বেও সোভিয়েত পক্ষ কিন্তু তাঁদের পত্র-পত্রিকায় পটসডামের সাফল্য সম্পর্কে উচ্চাশা প্রকাশ করিলেন। অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাও দাবী করিলেন যে, পটসডামে আমেরিকাই সাফল্য অর্জন করিয়াছে!

আসলে পটসডামে একমাত্র সেই সমস্ত বিষয়েরই মীমাংসা হইয়াছিল যেগুলি সম্পর্কে মূলনীতিঘটিত কোন বিরোধ ছিল না। যেমন, যুদ্ধোত্তর জার্মানী সম্পর্কে মূল রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে বিতর্কিত অনেক প্রশ্নেরই কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই।

* * *

এদিকে স্ট্যালিন পটসডাম বৈঠকে মিত্রপক্ষের শীর্ষ নেতৃদ্বয়কে জানাইলেন যে, মস্কোস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূতের মারফৎ জাপানের সম্রাটের পক্ষ থেকে সোভিয়েত সরকারের নিকট শান্তি প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই প্রস্তাবে জাপানের পক্ষ থেকে বলা হইয়াছে যে, তাঁরা "নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে" রাজী নন, তবে অন্য কোন শর্তে আপোস-মীমাংসা করিতে রাজী আছেন। কিন্তু স্ট্যালিন ইতিমধ্যেই এই ধরনের অস্পষ্ট প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন।...

জাপানী শান্তি প্রস্তাবের এই পটভূমিকায় ট্রুম্যান ও চার্চিলের মধ্যে জাপানের নূতনতম পরিস্থিতি নিয়া আলোচনা ও পরামর্শ হইল এবং ইঙ্গ-মার্কিন নেতারা উপলব্ধি করিলেন যে, জাপানের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় জঙ্গীবাদী একটি গোষ্ঠী এখনও জাপানে ক্ষমতা দখল করিয়া আছে। এরা ছাড়া আর বাকী সকলেই এই আত্মঘাতী যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। সুতরাং স্থির হইল জাপানের উদ্দেশ্যে একটি চরমপত্র দেওয়া হইবে এবং সেটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইবে। এই চরমপত্রে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবী করা হইবে। ইঙ্গ-মার্কিন মহলের এই পরামর্শ অনুসারে অবিলম্বে যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়া এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী জানাইয়া ২৬শে জুলাই জাপানের উদ্দেশ্যে একটি চরমপত্র প্রচার করা হইল। আশ্চর্য এই যে, পটসডাম থেকেই এই চরমপত্র প্রচার করা হইল বটে, কিন্তু তার আগে স্ট্যালিনকে একবার

জিজ্ঞাসা করাও হইল না। অবশ্য অজুহাত স্বরূপ পরে একথা বলা হইয়াছিল যে, রাশিয়া তো তখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল না।

১৩ দফা শর্ত সম্বলিত এই চরমপত্র ঘোষণা করা হইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, রিপাব্লিক চীনের জাতীয় সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এবং এই চরমপত্রে জাপানী গবর্নমেন্ট ও জাপানের সৈন্যবাহিনীদিগকে অবিলম্বে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানানো হইল।

২৬শে জুলাই, ১৯৪৫, তারিখে প্রচারিত এই গুরুত্বপূর্ণ চরমপত্রের মর্ম ছিল এই :

১. আমরা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও বৃটেনের তিন রাষ্ট্রনায়ক) আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরূপে ঘোষণা করিতে চাই যে, যুদ্ধ শেষ করার জন্য জাপানকে একবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং চীনের জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর বহুগুণ শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং এই বর্ধিত শক্তি লইয়া আমরা জাপানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। সমগ্র মিত্রশক্তি সামরিক বল ও সুদৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে, যতক্ষণ না জাপান রণে ক্ষান্ত দেয়।

৩. জাপানের জনগণ যেন জার্মানীর দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ রাখে। কেননা, সারা পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের বিরুদ্ধে নির্বোধের মত শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালাইতে গিয়া জার্মানী শেষ হইয়া গেল।

এই দৃষ্টান্তের পরেও জাপান যদি জার্মানীর মত নিজ বাসভূমে প্রতিরোধ চালাইতে চায়, তবে জার্মানীর মত জাপানেরও কলকারখানা, ভূমি ও জনগণের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং সৈন্যবাহিনী চূর্ণ হইবে।

৪. জাপানের পক্ষে এখন চিন্তা করার সময় আসিয়াছে যে, মুষ্টিমেয় জঙ্গীবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তারা জাপানী সাম্রাজ্যকে যেভাবে ধ্বংসের মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে, সেই যুদ্ধ তারা চালাইবে কিংবা যুক্তির পথ ধরিবে।

৫. নীচে আমাদের শর্তগুলি উল্লেখ করিতেছি। এই সমস্ত শর্ত থেকে আমরা বিচ্যুত হইব না এবং এগুলির কোন বিকল্পও নাই। আর আমরা বিলম্বও সহ্য করিব না।

৬. জাপানের জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করিয়া যারা পৃথিবী জয় করার দুরাকাংক্ষায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, সেই সমস্ত লোকের কর্তৃত্ব ও প্রভাব নিশ্চিতরূপেই চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ, এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, দায়িত্বজ্ঞানহীন জঙ্গীবাদ যতক্ষণ পৃথিবী থেকে দূর না হইতেছে, ততক্ষণ জনগণের জন্য শান্তি নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে।

৭. যতক্ষণ পর্যন্ত জাপানের যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা ধ্বংস না-হইতেছে এবং যতক্ষণ নূতন নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত না-হইতেছে, ততক্ষণ মিত্র শক্তিবর্গ জাপানের অভ্যন্তরে কেন্দ্রস্থলগুলি দখল করিয়া রাখিবে এই সমস্ত মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।

৮. কাইরো থেকে প্রদত্ত ঘোষণার শর্তগুলি কার্যক্ষেত্রে পালন করা হইবে এবং জাপানের সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র হেনেশু, হোক্কাইডু, কিয়ুসু, শিকোকিউ এবং

অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে আমাদের বিবেচনা অনুসারে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে।

৯. জাপানের সৈন্যবাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হইবে এবং তাদেরকে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে শান্তিপূর্ণ ও ফলপ্রসূ জীবন যাপনের জন্য।

১০. জাপানের জনগণকে আমরা নিশ্চয়ই দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে চাই না, কিংবা জাতি হিসাবেও তাদেরকে ধ্বংস করিতে চাই না। কিন্তু যারা আমাদের বন্দীদের উপর নিষ্ঠুরতা করিয়াছে, তাদেরকে এবং যুদ্ধ-অপরাধীদেরকে যথোপযুক্ত বিচার ও দণ্ড দেওয়া হইবে। ধর্ম, চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

১১. যে সমস্ত শ্রমশিল্প জাপানের অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজন, সেগুলি বজায় রাখা হইবে। কিন্তু যুদ্ধের উপকরণ ও অস্ত্রাদি তৈয়ারির কারখানা রাখিতে দেওয়া হইবে না। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও দ্রব্যমূল্যে আদায় করা হইবে।

১২. এই সমস্ত উদ্দেশ্য যখন পূর্ণ হইবে, তখন মিত্রপক্ষের দখলদার বাহিনীগুলি প্রত্যাহার করা হইবে এবং জাপানী জনগণের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী শান্তিকামী দায়িত্বশীল গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে দেওয়া হইবে।

১৩. আমরা এক্ষণে জাপানের গবর্নমেণ্টকে তাদের সমস্ত সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ঘোষণা করার জন্য আহ্বান জানাইতেছি এবং তাদের সদিচ্ছা প্রমাণের জন্য দাবী করিতেছি। এর বিকল্প হইতেছে জাপানের সম্পূর্ণ এবং সর্বাত্মক ধ্বংস।...

কিন্তু জাপানের সামরিক শাসকেরা এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলেন। সুতরাং পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন বিমানবাহিনী হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের সিদ্ধান্ত করিলেন।[১]

পটসডাম সম্মেলনে পারমাণবিক কুটনীতি ও রণনীতির এই সমস্ত ফলাফল ভাবী ইতিহাসের পক্ষেও গুরুতর ছিল। কেননা, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা ও সদ্ভাব রক্ষা করিয়া পৃথিবীর শান্তি সুনিশ্চিত করার যে উদার ও মানবিকনীতি রুজভেল্ট অনুসরণ করিতেছিলেন, ট্রুম্যানের এ্যাটম্ বোমা তার অবসান ঘটাইল এবং পটসডাম সম্মেলনে তার ভূমিকা রচিত হইল।

১। চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৬-৫৭।

দশম পর্ব

চতুর্থ অধ্যায়

পতনের মুখে জাপান

হিটলারী জার্মানীর পতনের পর জাপানেরও আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছিল—যদিও টোকিওর সংবাদপত্রগুলিতে তখনও জাপানের বীরত্ব ও জয়গৌরবের গাথা প্রচারিত হইতেছিল। কিন্তু রাস্তার লোকেরা এবং শহরবাসীরা দেখিতেছিল যে, তাদের দেশের জনপদ ও নগরগুলি শত্রুপক্ষের নিদারুণ বোমাবর্ষণে একে-একে ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল এবং দলে-দলে লোক শহর ছাড়িয়া দূরবর্তী গ্রামদেশে পলায়ন করিতেছিল। আর চাষীরা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় চাউল মজুত করিতেছিল এবং শহরবাসীরা ক্রমশ উপবাসের মুখে পড়িতেছিল···

জাপানীরা এত দ্রুত এত বিশাল সাম্রাজ্য দখল করিয়াছিল যে, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে আমেরিকার পালটা অভিযান শুরু হওয়ার পর জাপান আর তাল সামলাইতে পারিতেছিল না। অতিরিক্ত ভোজন করিলে যেমন ঔদরিক পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয়; জাপানেরও প্রায় সেই দশা হইয়াছিল। ১৯৪৫-এর প্রথম ভাগ থেকে তার আর যুদ্ধ চালাইবার কিংবা চার হাজার মাইল দীর্ঘ পেরিমিটার বা পরিসীমা পাহারা দেওয়ার ক্ষমতা অব্যাহত থাকিতেছিল না। কারণ, আকাশপথে ও সমুদ্রপথে মার্কিন সামরিক শক্তির ক্রমাগত প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে জাপান একে একে তার ঘাঁটিগুলি ও অধিকৃত দ্বীপসমূহ হারাইতেছিল এবং আকাশ ও সমুদ্রপথের যোগাযোগ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

রণশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন লীডেল হার্বার্ট বলিয়াছেন যে, সমুদ্র ও আকাশ, এই দুই পথের আক্রমণই জাপানের পতনের অন্যতম মূল কারণ। কারণ, মূলতঃ জাপানী সাম্রাজ্য ছিল 'সামুদ্রিক সাম্রাজ্য' (সী এম্পায়ার)—বৃটিশ সাম্রাজ্যের চেয়েও সে বেশী নির্ভরশীল ছিল বৈদেশিক সরবরাহের উপর। কিন্তু তার বাণিজ্যিক নৌবহরের শক্তি বৃটেনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশেরও কম ছিল। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধারম্ভের সময় বৃটেনের বাণিজ্যিক নৌবহরে জাহাজের সংখ্যা যখন ছিল প্রায় ৯,৫০০ কিংবা ২ কোটি ১০ লক্ষ টনের, তখন জাপানের বাণিজ্যপোত ছিল মোট ৬০ লক্ষ টনের। অথচ দুই বছর সময় হাতে পাইয়াও জাপান তার সমুদ্রপথের নৌবহর ও বাণিজ্যবহর রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা—যেমন, কনভয় প্রথা এবং পাহারাদার বিমানবাহী জাহাজের শক্তি উপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলে নাই। অথচ যুদ্ধ চালাইবার জন্য জাপানকে বিদেশ থেকে পেট্রোল, আকরিক লোহা, বক্সাইট, কোক কয়লা, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, এলুমিনিয়াম, এবং টিন, কোবাল্ট, দস্তা, ফসফেট, গ্রাফাইট, পটাশ, কার্পাস, লবণ ও রবার আমদানি করিতে হইত। এগুলি ছাড়া তাদের খাদ্যদ্রব্যেরও একটা বড় অংশ সমুদ্র পারবর্তী দেশগুলি থেকে আনিতে হইত। কিন্তু সমুদ্র পথের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারির অভাবে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপান মার্কিন প্লেন, টর্পেডো ও সাবমেরিনের সহজ শিকারে পরিণত হইল। কিন্তু তার জাহাজী শক্তি

যখন প্রচণ্ড রকমে ক্ষয় পাইয়া গেল, তখন সে প্রাণপণে চেষ্টা করিল এই জাহাজী ক্ষতিপূরণের জন্য। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপানের যে ৮০ লক্ষ টনের জাহাজী শক্তি নষ্ট হইয়াছিল, তার ৬০ ভাগ শক্তি নষ্ট হইয়াছিল একমাত্র মার্কিন সাবমেরিনের দ্বারা।[১]

মিত্রশক্তি কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টির ফলে সমুদ্র পথের যোগাযোগ বিপর্যস্ত হইয়া গেল। দক্ষিণ চীন সমুদ্র থেকে জাপানী কনভয় অদৃশ্য হইয়া গেল এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে টোকিও যাওয়ার সেই বিখ্যাত জলপথে সিঙ্গাপুরের ঘাঁটি আর কোন কাজে লাগিল না। অবশ্য জাপানের সৈন্যশক্তি তখন প্রায় অটুট ছিল—মোট ৬০ লক্ষ সৈন্যের অধিকাংশই ছিল জাপানী দ্বীপে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপে ও দ্বীপপুঞ্জে আরও প্রচুর জাপানী সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। মার্কিন বাহিনী এই সমস্ত দ্বীপকে এড়াইয়া কিংবা এগুলির পাশ কাটাইয়া খাস জাপানের নিকটবর্তী দ্বীপগুলির দিকে আগাইয়া যাইতেছিল সংক্ষিপ্ততম পথে আক্রমণের আশায়। ফলে, বিভিন্ন দ্বীপে, যেমন—নিউগিনি ও সালোমোন দ্বীপপুঞ্জে ১ লক্ষ, ক্যারোলাইনস্ দ্বীপে ৮৩ হাজার, পলায়ুস দ্বীপে ৩০ হাজার, মার্শাল দ্বীপে ১৫ হাজার, মার্কাস ও ওয়েক দ্বীপে ১০ হাজার এবং নায়রু দ্বীপে ৪ হাজার জাপানী সৈন্য আটকা পড়িয়াছিল এবং তারা উদ্ধারলাভের আশায় দিন গণিতেছিল। কিন্তু এই উদ্ধারলাভ তাদের অদৃষ্টে আর ঘটিল না। কারণ, জাপানী নৌ ও বিমান শক্তি ততদিনে প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। যুদ্ধের শেষদিকে জাপানী সৈন্যসংখ্যা এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। যেমন, মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার বলিয়াছেন, মোট জাপানী সৈন্য-সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ (উপরে উদ্ধৃত)। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন চীন ও জাপান ইত্যাদি সহ ৪০ লক্ষাধিক। বিখ্যাত মার্কিন লেখক হার্বার্ট ফীজ বলিয়াছেন জাপানের হোম আর্মিতে বা স্বদেশের সৈন্যবাহিনীতে ১৫ লক্ষাধিক। ইংরাজ লেখক বসিল কোলিয়ারের মতে ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে প্রধান প্রধান সংগঠনের মোট জাপানী সৈন্য ছিল ১০১ ডিভিসন এবং বিমান সৈন্য ৩১ ডিভিসন। আর মস্কো থেকে প্রকাশিত (১৯৭০ সালে) একটি নূতন গ্রন্থে "সক্রিয়" জাপানী সৈন্যের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ৭০ লক্ষ এবং ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের ১৮ লক্ষ। আর স্যার জন হ্যামারটন সম্পাদিত গ্রন্থে (নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৩৩) বলা হইয়াছে যে, জাপানের বাইরে অধিকৃত দেশ বা স্থানগুলিতে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ জাপানী স্থল ও নৌ-সৈন্যের মোট সংখ্যা ছিল ৩৪ লক্ষ, যাদের দেশে ফিরিয়া যাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না এবং খাস জাপানের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ। স্বয়ং মার্কিন সমরসচিব স্টিমসন অনুমান করিয়াছিলেন যে, ৫০ লক্ষ জাপানী সৈন্য তখনও অপরাজিত ছিল এবং এর মধ্যে চীনের মূল ভূখণ্ডে ছিল ২০ লক্ষ।

বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকগণের পুস্তকে জাপানী সৈন্য সংখ্যার এই তারতম্য সত্ত্বেও একটি কথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জাপানী নৌ ও বিমান-বল প্রচণ্ডভাবে ক্ষয়

১। History of the Second World War—Liddle Hart, P. 682-83.

পাওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যায়ে জাপানের মোট "সক্রিয়" সৈন্যসংখ্যা বোধ হয় ৭০ লক্ষের কম ছিল না।

* * *

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খ্যাতিমান মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থার তাঁর স্মৃতি-পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ৬ই এপ্রিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন সৈন্যবাহিনীগুলির পুনর্গঠন করা হইল। ম্যাক-আর্থারকে দেওয়া হইল সমস্ত স্থলবাহিনীর অধিনায়কত্ব এবং এ্যাডমিরাল নিমিৎস (Nimitz) নিযুক্ত হইলেন সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবাহিনী প্রধান নায়কের পদে। আর জেনারেল এইচ্. এইচ. আর্নল্ড ভার পাইলেন ২০নং বিমান বাহিনীর—কার্যতঃ "অর্ধেক পৃথিবীর দূরত্ব" বা ওয়াশিংটন থেকে তিনি এই রণনৈতিক বিমান কমাণ্ড চালাইতেন। তখন থেকে তিনটি পৃথক বিমান বাহিনী গঠিত হইল প্রশান্ত মহাসাগরের একই অঞ্চলে রণক্রিয়ার জন্য। অথচ উচিত ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের এই সমস্ত রণক্রিয়ার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ সৈনাপত্য গঠন করা এবং একজন সুপ্রীম কমাণ্ডার নিযুক্ত করা। কিন্তু কার্যতঃ তা সম্ভব হইল না। তবে, ম্যানিলার (ফিলিপিন্স) পতনের অল্প কিছু কাল পরেই মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর থেকে দুইটি সোজাসুজি আক্রমণ ঘটানো হইল—প্রথমতঃ আইও জিমা (Iwo Jima) এবং দ্বিতীয়তঃ ওকিনাওয়ার (Okinawa) দিকে। এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দখল করিতে মার্কিন বাহিনীকে প্রচুর খেসারৎ দিতে হইয়াছিল।···

ম্যাক-আর্থার বলিয়াছেন যে তিন বছর ধরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপানের ৮টি আর্মি খতম্ কিংবা অকেজো হইয়া গিয়াছিল এবং খাস জাপানী দ্বীপের বিরুদ্ধে অভিযানের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর-একটি অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ জাপানী সৈন্য বিভিন্ন দ্বীপে আটকা পড়িয়াছিল এবং তারা পশ্চাতেও হটিতে পারিতেছিল না, কিংবা অন্তর্ব্যূহের দিকে সরিয়া গিয়া খাস জাপানের প্রতিরক্ষায়ও যোগ দিতে পারিতেছিল না।

'It was a situation unique in modern war. Never had such a large number of troops been so outmaneuvered, separated from each other, and left tactically impotent to take an active part in the the final battle for their homeland.'[১]

'আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে এমন পরিস্থিতি অভুতপূর্ব সন্দেহ নাই।'—মন্তব্য করিয়াছেন ম্যাক-আর্থার।

* * *

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নিউগিনি থেকে জাপান পর্যন্ত দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের যুদ্ধে শেষ দুইটি ঘাঁটি বা দ্বীপ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—আক্রমণ বা আত্মরক্ষা উভয় প্রশ্নে। আইওজিমা এবং ওকিনাওয়া (অষ্টম পর্বের সপ্তম অধ্যায়ে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে)—এই দ্বীপ দুইটি ছিল জাপানের খুব কাছাকাছি। আইওজিমা টোকিও থেকে ৭৫০ মাইল এবং ওকিনাওয়া জাপান থেকে মাত্র ৩৬২

মাইল। সুতরাং মার্কিন বোমারু অভিযানের পক্ষে এই দ্বীপ দুইটি দখল করা ছিল অপরিহার্য—যেমন অপরিহার্য ছিল জাপানের পক্ষেও আত্মরক্ষার জন্য।

যদিও আইওজিমা ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র দ্বীপ, মাত্র ৮ বর্গমাইল আয়তন, তবু এর রণনৈতিক অবস্থান ছিল জাপানের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। আর পাহাড়, আগ্নেয়গিরি ও জঙ্গলের জন্য এর স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা যেমন অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, তেমনি জাপানীরা ম্যাজিনো লাইনের (ফ্রান্স) ধরনে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে যেন একটি দুর্ভেদ্য কেল্লায় পরিণত করিল। লেঃ জেনারেল টাডামিচি কুরিবায়াশির নেতৃত্বে ২৩ হাজার উৎকৃষ্ট জাপানী সৈন্য মার্কিন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল। মার্কিন নৌ ও বিমানবহর ক্রমাগত ৭৪ দিন ধরিয়া এই ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর বোমা ও গোলাবর্ষণ করিল। ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে আক্রমণের আয়োজন হইল এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী,



১৯৪৫, ৬টি যুদ্ধ জাহাজ (ব্যাটলশিপ) ও কয়েকটি ক্রুজার এবং ডেস্ট্রয়ার নিয়ে যে টাস্ক ফোর্স গঠিত হইল, সেগুলি যেন এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে ঘিরিয়া ধরিল। মেজর-জেনারেল হ্যারি স্মিড্‌ট্ (Schmidt) ৩০ হাজার নৌ সৈন্য নিয়া ১৯শে ফেব্রুয়ারী দ্বীপটিকে আক্রমণ করিলেন। এখানকার এক নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি জাপানী সৈন্যদের প্রতিরক্ষার প্রধান দুর্গে পরিণত হইল এবং ২৬ দিন ধরিয়া ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দ্বীপটি আমেরিকানদের দখলে গেল। মার্কিন পক্ষে হতাহত হইল ২০১৯৬ জন সৈন্য (এর মধ্যে নিহত ৪২৮৯) আর মৃত্যুপণ লড়াইতে জাপানীদের নিহত হইল ২১ হাজার, আহত অনেক, কিন্তু বন্দী হইল মাত্র দুই শতের কিছু বেশী। একজন মার্কিন সাংবাদিক এর্নি পাইল (Ernie Pyle) এই যুদ্ধে রিপোর্ট করিতে গিয়া নিহত হইয়াছিলেন। তিনি সৈন্যদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। এজন্য তাঁর মৃত্যুর স্থানে একটি স্মৃতিফলকও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[১]

আইওজিমা আমেরিকানদের দখলে যাওয়ায় জাপানের বিপর্যয় আরও ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। কারণ, এর পর ওকিনাওয়ার পালা। কিন্তু জাপানী সৈন্যেরা

১। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৫৭৮, ৫৮০।

আত্মহত্যা করিবে, তবু যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবে না কিংবা আত্মসমর্পণ করিবে না। এজন্য জঙ্গীবাদীরা মধ্যযুগের এক "দিব্য তুফান" বা "কামিকেজে'র (Kamikaze) কাহিনী প্রচার করিল। ১২৮১ খৃস্টাব্দে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল দিগ্বিজয়ী কুবলাই খান এক বিরাট নৌবহর নিয়া জাপান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু সেই সময় জাপানের সূর্য দেবতা এক "দিব্য তুফান" বা "কামিকেজের' সৃষ্টি করিলেন এবং কুবলাই খানের আগ্রাসী নৌবহরকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। কামিকেজের এই "দিব্য তুফান"-এর কাহিনী অবলম্বন করিয়া সেদিনের যুদ্ধোম্মাদ জাপানে সৃষ্টি হইল শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য একদল আত্মহত্যাকারী বিমান-যোদ্ধা—অবশ্যই দেশ ও সম্রাটের প্রতি অনুরাগ প্রকাশের জন্য। এই আত্মহননকারী সৈন্যদের রণসঙ্গীতও ছিল উল্লেখযোগ্য—যার ইংরাজী ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

'In Serving on the seas, be a corpse
Saturated with water
In Serving on land, be a corpse
Covered with weeds.
In Serving the sky, be a
Corpse that challenges the clouds,
Let us all die close by the
Side of our Sovereign.'

এই সমস্ত সৈন্য স্বগৃহেও এই মর্মে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন, 'আমাদের মৃত্যু বসন্ত-কালের চেরীফুলের ঝরে পড়ার মত সুন্দর ও নির্মল হোক!'[১]

এই প্রকার বে-পরোয়া এবং মৃত্যুভয়হীন জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন ছিল। ইতিহাসে এই প্রথম আত্মহত্যাকে একটা সরকারী সামরিক অস্ত্রে পরিণত করা হইল—

'For the first time in history a nation at war used suicide as an official military weapon and called upon its warriors to go into combat wiht the prospect of certain death.'[২]

ওকিনাওয়া যুদ্ধের পূর্বাহ্নে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কুনিয়াকি কয়সো (Kuniaki Koiso) এই মর্মে সতর্কবাণী প্রচার করিলেন,—'হে আমার দশ কোটি দেশবাসী, শত্রু ঘরের দুয়ারে এসে পেঁছেছে। আমাদের দেশের ইতিহাসে এমন বিপদের মুহূর্ত আর আসে নাই!'[৩]

কিণ্তু সেই মুহূর্তে আর-একটা বিপদ ঘটিল। সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের সঙ্গে ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে স্বাক্ষরিত নিরপেক্ষতার চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিল। ফলে, ৫ই এপ্রিল ১৯৪৫, কয়সো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন এবং প্রিভি কাউন্সিলের সভাপতি এ্যাডমিরাল সুজুকি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহন করিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইলেও সাহসী, দুর্ধর্ষ এবং সোজাসুজ ধরনের মানুষ ছিলেন। সম্রাট

১। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৫৮৫।
২। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৫৮২।
৩। ঐ পুস্তক।

তাঁকে পছন্দ করিতেন এবং যদিও স্বয়ং সম্রাটও অনুভব করিতেছিলেন যে, পরাজয় বরণ করা ছাড়া আর উপায় নাই, তথাপি অন্তত ওকিনাওয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে সম্ভবতঃ "নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ" দাবীর কিছুটা সংশোধন হইতে পারে—এমন চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরিতেছিল।[১]

এজন্যই ওকিনাওয়াতে মার্কিন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বেপরোরা পন্থা অবলম্বিত হইল। আত্মবিনাশী জাপানী পাইলট বোমাভর্তি ছোট ছোট প্লেন নিয়া মার্কিন জাহাজগুলির উপর ঝাঁপ দিয়া মরিবার এবং মারিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই রণক্রিয়াকেই "কামিকেজ" নামে সামরিক ইতিহাসে অভিহিত করা হইয়াছে।

সম্ভবতঃ একমাত্র জাপানীরা ছাড়া এমন আত্মবিনাশী যুদ্ধ আর কোন শক্তি চালাইতে পারিত না।

এই আত্মবিনাশী জাপানী সেনোরা আইও জিমার যুদ্ধে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রচুর ক্ষতিসাধন করিয়াছিল। ৩৪টি মার্কিন জাহাজ নিমজ্জিত, ২৮৮টি জখম হইয়াছিল। এর মধ্যে ৩৬টি বিমানবাহী জাহাজ, ১৫টি যুদ্ধজাহাজ, আর ৮৭টি ডেস্ট্রয়ার। সুতরাং জাপানী বেপরোয়া যুদ্ধের ফলাফল কম মারাত্মক ছিল না—যদিও জাপানীদেরও ক্ষতি হইয়াছিল প্রচুর প্লেন ও পাইলট, অনুমান ১২ শত থেকে ৪ হাজারের মধ্যে।

* * *

জাপানের প্রায় দ্বারদেশে অবস্থিত ওকিনাওয়া দ্বীপের রণনৈতিক গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কারণ, এই দ্বীপ অধিকৃত হইলে জাপানের প্রবেশের পথ খুলিয়া যাইবে এবং রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এই দ্বীপটি ছিল সর্ববৃহৎ—৬৭ মাইল লম্বা এবং ৩ থেকে ২০ মাইল চওড়া। কিন্তু এই দ্বীপের কর্কশ পাহাড়িয়া ভূমিতে জনবসতি ছিল সবচেয়ে ঘন। ম্যালেরিয়ার উৎপাত সত্ত্বেও ৫ লক্ষ লোক এখানে বাস করিত। আইও জিমা দখল হওয়ার আগেই ওকিনাওয়া অভিযানের জন্য আমেরিকা প্রস্তুত হইতেছিল এবং এই অভিযানের সাঙ্কেতিক নাম রাখা হইয়াছিল "অপারেশন আইসবার্গ"। এই দ্বীপের অবস্থান ছিল ফরমোজা ও জাপানের ঠিক মধ্যস্থলে এবং চীন উপকূল থেকেও মাত্র ৩৬০ মাইল দূরে। সুতরাং এই দ্বীপ আমেরিকানদের হাতে আসিলে কার্যতঃ তিনটি লক্ষ্য বস্তুই মার্কিন আক্রমণের পাল্লার মধ্যে আসিবে। কর্কশভূমি, জঙ্গল ও শৈলশিরার জন্য দ্বীপটি স্বাভাবিক আত্মরক্ষার পক্ষে জাপানের খুব অনুকূল ছিল। তবে, দক্ষিণ দিকেয় খানিকটা অংশ খোলা ছিল এবং সেখানে ছিল বিমান ঘাঁটি, আর সমুদ্রের ধারে ছিল দ্বীপের রাজধানী নাহা। জাপানীরা প্রাকৃতিক বিঘ্নের সঙ্গে দ্বীপটির প্রতিরক্ষার জন্য দুর্ভেদ্য কেল্লা তৈয়ার করিল। জেনারেল উসিজিমার (Ushijima) অধীন ৩২ নং আর্মির ৭৭ হাজার লড়িয়ে সৈন্যের সঙ্গে যুক্ত হইল ২০ হাজার সার্ভিসসেবক সৈন্য—মোট প্রায় এক লক্ষ। আর ৫০০ গোলন্দাজী কামান।

মার্কিন হাইকমাণ্ড পূর্বাহ্নেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, ওকিনাওয়াতে জাপানীদের পরাজিত করা আদৌ সহজ হইবে না। সুতরাং প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বৃহত্তম নৌ-যুদ্ধের তাঁরা আয়োজন করিলেন—১৩০০ যুদ্ধজাহাজ ও লক্ষাধিক সৈন্য প্রস্তুত হইল। কারণ, সংখ্যাশক্তিতে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারিলে এই দ্বীপে অবতরণ ও যুদ্ধ চালানো যাইবে না। লেঃ জেনারেল বাকনারের অধীনে ১ লক্ষ ১৬ হাজার সৈন্য

১। A History of Modern Japan—Richard Storry. P. 226.

প্রথম অবতরণের জন্য প্রস্তুত হইল এবং ক্রমে এই শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া স্থল ও নৌ-সৈন্যসহ লড়িয়ে সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াইল ১ লক্ষ ৭০হাজার আর সার্ভিস বা সেবক সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়াইল ১ লক্ষ ১৫ হাজার। এ্যাডমিরাল টার্নার সমগ্র ওকিনাওয়া বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইলেন। ১লা এপ্রিল ইস্টার দিবসে সমুদ্র ও আকাশ থেকে ক্রমাগত তিন ঘণ্টা ধরিয়া প্রচুর গোলা গুলি ও বোমা বর্ষণের পর মার্কিন বাহিনীর তীরে অবতরণ শুরু হইল এবং প্রায় বিনা বাধায় ৬০ হাজার মার্কিন সৈন্য তীরভূমির ৯ মাইল এলাকা দখল করিল।…

জাপান তার বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাট্‌লশিপ "ইয়ামাতো"কে নিয়োগ করিল এই মার্কিন অভিযানে বাধা দেওয়ার জন্য কিন্তু বিচিত্র এই যে, এই বিরাট যুদ্ধজাহাজকে পাহারা দেওয়ার জন্য কোন বিমানবহর নিয়োগ করা হইল না। সুতরাং ঘটনাটা জাপানীদের পক্ষে প্রায় আত্মহত্যার তুল্য ছিল। কেননা, ৭ই এপ্রিল দুপুর বেলা মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ থেকে ২৮০ টি বোমারু ইয়ামাতেকে আক্রমণ করিল এবং টর্পেডো ও বোমার দ্বারা দুই ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ ও আঘাত হানার পর ইয়ামাতো বহু সৈন্য ও লস্করসহ মহাসমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া গেল। এর বড় বড় কামান থেকে জাপানীরা শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য একটা গোলা নিক্ষেপেরও সুযোগ পাইল না। জাপানী যুদ্ধজাহাজের ইতিহাসে এত বড় ট্র্যাজেডি খুব কমই হইয়াছে।

তথাপি ওকিনাওয়া দ্বীপের স্থলভাগে প্রচণ্ড ও তিক্ত লড়াই চলিল সুরক্ষিত ঘাঁটি ও পাহাড়ের গুহা থেকে দুই মাস (লীডেল হার্টের মতে মোট ৩ মাস) ধরিয়া এবং শেষ পর্যন্ত এই ভয়াবহ রক্তস্রাবী যুদ্ধে জাপানীরা পরাজিত (আত্মবিনাশী জাপানী বৈমানিকদের বেপরোয়া আক্রমণ সত্ত্বেও) হইল ওকিনাওয়া দ্বীপ আমেরিকার দখলে চলিয়া গেল। কিন্তু দ্বীপ দখলীকৃত হওয়ার আগে ১১ই জুন মার্কিন সেনাপতি জেনারেল বাকনার একটি প্রবাল পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া যখন সহাস্যমুখে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ একটি গোলা আসিয়া তাঁকে মারাত্মক আঘাত করিল। কিন্তু সেই অবস্থায়ও এবং মৃত্যুমুখে পড়িয়াও তাঁর মুখের হাসি লাগিয়াই ছিল।

এদিকে ২২শে জুন, ১৯৪৫, যখন দেখা গেল যে, যুদ্ধজয়ের আর আশা নাই, তখন জাপানী সৈন্যদের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি লেঃ জেনারেল উসিজিমা এবং লেঃ জেনারেল ইসামা চো তাঁদের সৈনাপত্যের সমস্ত সাজপোশাক বা ইউনিফর্ম এবং পদক ও পদ-মর্যাদার স্মারকচিহ্নগুলি ধারণ করিয়া তাঁদের সহকর্মী ও সহচরদের সঙ্গে সদর দপ্তরের গুহায় আসিয়া হাজির হইলেন। বেলা তখন ৩-৪০ মিঃ, তাঁদের হাঁটু গাড়িয়া বসিবার স্থানে মৃত্যুর প্রতীকস্বরূপ সাদা কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হইল এবং তাঁরা সামুরাই ঐতিহ্য অনুসারে আত্মহত্যার জন্য নিজেদের উদর কাটিয়া (হারিকিরি) ফেলিলেন। তখন একজন পদস্থ সৈনিক তরোয়াল দিয়া তাঁদের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় মার্কিন সৈন্যেরা তাদের "শৃগালগর্তে" মাত্র ১০০ গজ দূরে ছিল। জাপানী যুদ্ধের এই সামরিক ঐতিহ্য ভয়াবহ সন্দেহ নাই।…

১। লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৮৪-৮৫।

সারা প্রশান্ত মহাসাগরের ওকিনাওয়ার যুদ্ধ প্রাণনাশের দিক থেকে আমেরিকানদের কাছে সবচেয়ে গুরুতর ছিল। আমেরিকার ক্ষতি হইয়াছিল ৪৯ হাজার সৈন্য (নিহত ১২ হাজার ৫ শত) এবং জাপানীদের ১ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য। শত শত আত্মবিনাশী জাপানী সৈন্য বা "কামিকাজ" আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যে বেপরোয়া আক্রমণ চালাইয়াছিল, তার ফলে ৩৪টি নৌ-তরী নিমজ্জিত এবং ৩৬৮ টি জখম হইয়াছিল। এই নিদারুণ এবং রক্তসিক্ত অভিজ্ঞতার পর মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ খাস জাপান আক্রমণের জন্য কী মূল্য দিতে হইবে, সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন।[১]

কিন্তু ওকিনাওয়া দ্বীপের যুদ্ধে প্রচুর রক্তের মূল্য দিতে হইলেও আমেরিকানদের পক্ষে খাস জাপান আক্রমণের দরজা খুলিয়া গেল এবং ১৯৪৫-এর নভেম্বর মাসে জাপান আক্রমণের পরিকল্পনাও, স্থির হইয়াছিল, যদিও তার আগেই জাপানী যুদ্ধ খতম্ হইয়াছিল।···

কিন্তু জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা বর্ষিত হওয়ার আগেই জাপানের দুর্গতি চরমে উঠিতেছিল। কারণ, ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে অধিকৃত ম্যারিয়ানা দ্বীপের ঘাঁটি হইতে জাপানের বিরুদ্ধে রণনৈতিক বোমাবর্ষণ (ষ্ট্র্যাটেজিক বম্বিং) আরম্ভ করা হইয়াছিল। এই অভিযানের প্রধান অস্ত্র ছিল বোয়িং বি-২৯ সুপার ফোর্টরেস বোমারু —দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বৃহদক্রম বোমারু যেগুলির প্রত্যেকটি বহন করিতে পারিত প্রায় ৮ টনের কাছাকাছি পরিমাণ বোমা। এগুলির গতি ছিল ঘণ্টায় ৩৫০ মাইল। ৩৫ হাজার ফুট ঊর্ধ্ব আকাশ দিয়া উড়িতে পারিত এবং একটানা ৪ হাজার মাইলের বেশী চলিতে পারিত। এগুলি বর্ম আচ্ছাদনের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং ১৩টি মেসিগানও বহন করিতে পারিত। সোজাকথায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এগুলি ছিল রাক্ষুসে ধরনের বোমারু এবং জাপানের বিভিন্ন শহরে, বন্দরে ও জনপদে এগুলি হানা দিতে লাগিল।

কিন্তু ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে মার্কিন বিমানবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কার্টিস লিমে (Curtis Le May) সাধারণ বিস্ফোরক বোমার বদলে আগুনেবোমা বর্ষণ শুরু করিলেন। ৯ই মার্চ তারিখে ২৭৯ খানা বি-২৯ বোরারু টোকিওর উপর আগুনে বোমা নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং টোকিও শহরের ১৬ বর্গমাইল এলাকা ধরিয়া যেন "লংকাদহন" পর্ব অনুষ্ঠিত হইল। শহরের প্রকাণ্ড অংশ একেবারে জ্বলিয়া গেল। ২ লক্ষ ১৭ হাজার গৃহ দগ্ধ হইল। প্রায় ১ লক্ষ ৮৫ হাজার অ-সামরিক লোক হতাহত হইল এবং অন্যান্য শহরও অনুরূপভাবে আক্রান্ত হইল। ১০ দিনে ১০ হাজার টন আগুনে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল, ফলে আগুনে বোমার স্টক ফুরাইয়া গেল।

টোকিওর এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর জনগণের নৈতিক শক্তি ভাঙ্গিয়া গেল এবং ৮৫ লক্ষ নরনারী শহর ছাড়িয়া গ্রামের অভ্যন্তরে পালাইয়া গেল। ৬০০ বৃহৎ যুদ্ধাস্ত্রের কারখানা ধ্বংস হইয়া গেল। ফলে, জাপানের শ্রমশিল্পের উৎপাদন শতকরা ৬০-৭০ থেকে ৮০ ভাগের অধিক পর্যন্ত কমিয়া গেল। এই অবস্থায় একমাত্র যুদ্ধোন্মাদ ছাড়া আর সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, আত্মসমর্পণ ছাড়া জাপানের আর রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই।[২]

১। লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৮৬।
২। ঐ পৃষ্ঠা ৬৯০-৯১।

মধ্য প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপানের বিরুদ্ধে যখন দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের এই সমস্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখনও এ্যাটম্ বোমার ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং আইও জিমা ও ওকিনাওয়া দ্বীপ দখলের অভিজ্ঞতায় (এপ্রিল-মে-জুন, ১৯৪৫) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান উপলব্ধি করিলেন যে, জাপানের যত কাছে অগ্রসর হওয়া যাইবে, জাপানীদের বাধাদানের তীব্রতাও তত বৃদ্ধি পাইবে। যদিও এই সমস্ত দ্বীপ থেকে জাপানের উপর সরাসরি আক্রমণ চালানো যাইবে, কিন্তু অত্যধিক প্রাণের মূল্য দিতে হইবে। কারণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের মতে তখনও জাপানী দ্বীপ, মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীনে জাপানীদের ৪০ লক্ষের বেশী সৈন্য ছিল। এছাড়া খাস জাপানের শেষ আত্মরক্ষার জন্য "জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী" গঠিত হইবে। সুতরাং ট্রুম্যান অনুভব করিলেন যে, মার্কিন সৈন্যরা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের পথে যতই জাপানের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ততই লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সৈন্যের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্ন জরুরী হইয়া উঠিতেছিল। মার্কিন সেনানীমণ্ডলীরও এই মত। ট্রুম্যান লিখিয়াছেন ঃ

'There was no way for us to get troops into China to drive the Japanese from the Chinese mainland. Our hope always was to get enough Russian troops into Manchuria to push the Japanese out. That was the only way it could be done at this time.'

অর্থাৎ 'চীনের অভ্যন্তরে সৈন্য পাঠাইয়া চীনের মূল ভূমি থেকে জাপানীদেরকে বিতাড়নের কোন উপায় আমাদের হাতে ছিল না। সুতরাং আমাদের সর্বদাই আশা ছিল মাঞ্চুরিয়াতে প্রচুর পরিমাণ রুশসৈন্য পাঠাইয়া জাপানীদেরকে বহিষ্কার করা হইবে। এই সময় একমাত্র এই পন্থা অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।'[১]

কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ ছাড়াও আমেরিকার পক্ষে আর-একটা উদ্বেগের প্রশ্ন ছিল কুওমিণ্টাং বা জাতীয়তাবাদী চীনের নায়ক জেনারল চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধ ও সংঘাত। ট্রুম্যান তাঁর স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র সময়টিতেই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের ঐক্য রক্ষা করা। ২০শে মে চীনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হারলি (Hurley) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে জানাইলেন যে, আমেরিকাদের চেষ্টার ফলে চিয়াং কাইসেক গবর্নমেণ্ট সশস্ত্র কমিউনিস্ট পার্টিকে একটা রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে স্বীকার করিয়া নিয়াছেন এবং একজন চীনা কমিউনিস্টকে জাতীয় গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে স্যানফ্রান্সিসকোতে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং কমিউনিস্ট পার্টিও এই নিয়োগ মানিয়া লইয়া জাতীয় গবর্নমেণ্টকে স্বীকার করিয়াছেন।

ট্রুম্যানের মতে চীনের জাতীয় গবর্নমেণ্ট ও কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধে মার্কিন সরকার দুটি নীতিকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন ঃ

১. যে গৃহযুদ্ধ একেবারে আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল সেটা এড়ানো।

২. জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কমিউনিষ্ট ও ন্যাশনাল গবর্নমেণ্টের সৈন্যবাহিনীদিগকে একজন অধিনায়কের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ট্রুম্যান উপলব্ধি করিলেন যে, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনার

১। ট্রুম্যানের স্মৃতিকথা (ইং), প্রথমখণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৯।

ফলাফলের উপরেই জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যোগদান অনেকটা নির্ভর করিতেছে। সুতরাং চীন সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ টি. ভি. সুঙ্ ৩০শে জুন, ১৯৪৫, মস্কোতে উপস্থিত হইলেন স্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য।

কিন্তু মস্কোতে চীনা প্রতিনিধি সুঙ্ এবং স্ট্যালিনের মধ্যে এই সমস্ত আলোচনা ছিল গতানুগতিক মাত্র কিংবা বাহ্যতঃ চিয়াং কাইসেকের গবর্নমেণ্টের প্রতি মর্যাদা দেখাইবার জন্য। কারণ, জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়া কর্তৃক যুদ্ধে যোগদানের শর্ত-স্বরূপ ইয়াল্টাতে রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের মধ্যে (এই বৈঠকে চার্চিল বা চিয়াং কাইসেকের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। এই সম্পর্কে এবং ইয়াল্টায় প্রস্তাবিত চুক্তি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অষ্টম পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে সমস্ত কথাবার্তা পাকা হইয়াছিল, সেগুলি চুংকিংয়ে জেনারেল চিয়াং কাইসেককে জানাইয়া দেওয়া এবং তাঁর সম্মতি "আদায়" করাই মুখ্য উদ্দেশ্যে ছিল। যদিও মস্কোতে মাঞ্চুরিয়ার উপর কুওমিণ্টাং সরকারের সার্বভৌম অধিকার, বহির্মঙ্গোলিয়ার স্বাধীনতা, ডাইরেন বন্দর ও পোর্ট আর্থার নৌঘাঁটি এবং চাইনিজ রেলপথ ইত্যাদি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল, তথাপি চিয়াং কাইসেকের পক্ষে স্ট্যালিনের এই সমস্ত প্রস্তাব না মানিয়া উপায় ছিল না। কেননা, পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আগেই এগুলি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে নূতন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানও জানাইয়াছিলেন যে, মার্কিন গবর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে তিনিও ইয়াল্টা প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিতেছেন এবং তিনি আশা করিতেছেন যে, চিয়াং কাইসেকও এগুলি গ্রহণ করিবেন। অপর পক্ষে ট্রুম্যানের এক তারের জবাবে প্রধান মন্ত্রী চার্চিলও জানাইয়া দিলেন যে, তিনিও প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছেন এবং প্রস্তাবগুলিকে স্বাগত জানাইতেছেন।[১]

সুতরাং মিত্রশক্তির তিন প্রধান যে সমস্ত প্রস্তাব ও রাশিয়ার দাবী সমর্থন করিতেছেন, চিয়াং কাইসেক সেগুলি অগ্রাহ্য করিবেন কোন্ ভরসায়? অবশ্য জুলাই মাসে মস্কোতে স্ট্যালিনের সঙ্গে টি. ভি. সুঙের আলোচনার কিছুটা "দর কষাকষির" মনোভাব দেখা গিয়াছিল। এটা অবশ্য অস্বাভাবিক ছিল না। কেন না, চিয়াং কাইসেক এবং ট্রুম্যান উভয়েই মনে মনে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধী ছিলেন এবং চিয়াং কাইসেক চাহিতেছিলেন রাশিয়া যেন চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতে কোন সাহায্য না দেন! অবশ্য স্ট্যালিনও চিয়াং কাইসেককে চীনের ঐক্যরক্ষাকারী একমাত্র শক্তিরূপে স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে, চীনের বিরুদ্ধে তাঁর কোন ভূমিগত দাবী নাই। চীনে আমেরিকার "খোলা দরজার" নীতিও ("ওপেন ডোর পলিসি") তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং কোরিয়ার জন্য চীন, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া—এই চতুঃশক্তির ট্রাষ্টিশপ (অছিগিরি) গঠনের প্রস্তাবও নীতি হিসাবে মানিয়া লইয়াছিলেন।[২]

কিন্তু পরবর্তীকালে আমেরিকা কর্তৃক আইও জিমা ও ওকিনাওয়া দখল এবং এ্যাটম্ বোমা তৈয়ারির পর অনেক মার্কিন সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ্ রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন চুক্তির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে জাপানের পরাজয়ের জন্য রাশিয়ার সাহায্যের কোন প্রয়োজন ছিল না। মার্কিন নৌ ও বিমান শক্তির প্রচণ্ড আক্রমণে জাপান আগেই কাবু হইয়া পড়িয়াছিল।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৯১।

দশম পর্ব

পঞ্চম অধ্যায়

এ্যাটম্ বোমা—হিরোশিমা ও নাগাশাকি

অবশেষে মানুষের সর্বকালের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর অস্ত্রের আবিষ্কার হইল। পৃথিবীতে এক নতুন যুগ—পারমাণবিক বা অ্যাটমিক যুগের যাত্রা শুরু হইল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমার (জাপান) বিরুদ্ধে এই নতুনতম দানবিক অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা অপরিসীম বর্বরতা ও হিংস্রতার মধ্যে এই পারমাণবিক যুগের বোধন হইল এবং সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ বিস্ময়ে ও ত্রাসে হতভম্ব হইয়া গেল। এমনকি, বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসান সংবাদও এই দানবিক শক্তির ক্রুরতার মধ্যে চাপা পড়িয়া গেল। একজন মার্কিন ঐতিহাসিকই মন্তব্য করিয়াছেন—

'The incredible blasts of atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki knocked Japan out of tne conflict. So great was the shock among all humanity the even the end of the global war became secondary news'[১]

কিন্তু পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার ও নির্মাণের পিছনে রহিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মৌলিক শক্তির গোপন রহস্যের উদ্ঘাটন—যার জন্য পৃথিবীর নানা দেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা যুগের-পর-যুগ ধরিয়া গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের অভাবনীয় কৃতিত্বের ফলে যে ব্রহ্মাস্ত্র তৈরী হইল, তার ভয়াবহ-মারমূর্তি দেখিয়া বিজ্ঞানীরা নিজেরাই হতবাক ও সন্ত্রস্ত হইলেন। এ যেন আরব্য উপন্যাসের সেই বোতল থেকে দৈত্যের আবির্ভাবের মত এক অবিশ্বাস্য গল্প। বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক শক্তির রহস্য সন্ধান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অজস্র মানুষের মৃত্যু ও হত্যার দ্বারা বিজ্ঞানের পবিত্র মন্দিরকে কলুষিত করিতে চাহেন নহে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই চাহিয়াছিলেন 'সত্যের অনুসন্ধান"। কিন্তু সেই অনুসন্ধানের ফল যে এভাবে মিলিটারি চক্রের হাতে গিয়া পড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বধ্বংসী প্রলয়ংকর অস্ত্রে পরিণত হইবে, তার জন্য অনেকেই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু মহাযুদ্ধের কুটনীতির জটিল চক্রে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইল যে, বোতলের মুখ থেকে নির্গত দৈত্যকে আর বোতলের মধ্যে ফিরাইয়া নেওয়া সম্ভব হইল না। বরং সেই থেকে আজ (১৯৭৭ সাল) পর্যন্ত সেই দৈত্যের শক্তি লক্ষগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মানুষের জগৎ জীবন-মৃত্যুর এক চরম সন্ধিক্ষণে আসিয়া পেঁীছিয়াছে।* যে পরমাণু বা atom শব্দটি ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাস থেকে সারা দুনিয়ার শিক্ষিত সমাজে এত

১। লুই স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৫৯২।

* ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতা (দি আর্মস রেস) সংক্রান্ত একটি পুস্তিকায় দেখানো হইয়াছে কিভাবে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে এই প্রতিযোগিতা আজ সমগ্র মনুষ্য জাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। একটি প্রামাণ্য রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

প্রচার লাভ করিয়াছে, তার উৎপত্তি কিন্তু গ্রীক 'atoms' শব্দ থেকে যার অর্থ অবিভাজ্য বা indivisble—এজন্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরমাণু বা এ্যাটম অবিভাজ্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ফরাসী বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম নিয়া গবেষণা করিতে গিয়া যে তেজষ্ক্রিয়তার সন্ধান পাইলেন, তার ফলেই পরমাণুর অবিভাজ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়াছিল এবং সেই সন্দেহ ক্রমে দূরীভূত হইল বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে বহু নামকরা বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবেই হোক কিংবা সমরাস্ত্রের দিক থেকেই হোক এ্যাটমিক বোমার মত এমন মারাত্মক ভয়াবহ অস্ত্র মানুষের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এতদিন পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহে বা রণক্রিয়ায় মানুষ রাসায়নিক শক্তি ('কেমিক্যাল পাওয়ার') থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য এবং জ্বালানী ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিভাজন থেকে যে এমন প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসকর কাণ্ড ঘটানো যাইতে পারে, এমন কল্পনা আগে মানুষের ছিল না। ১৯১১ সালে স্বনামখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী (নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী) লর্ড রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি এ্যাটমকে ভাঙ্গিবার পদ্ধতিও বাহির করিলেন এবং ১৯৩২ সালে অন্যতম খ্যাতনামা বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার জেমস্ চ্যাড্উইক (James Chadwick) নিউট্রন বা পরামণু পিণ্ডীভূত অংশ আবিষ্কার করিলেন।…

বিজ্ঞানের এই নতুন গবেষণা বিজ্ঞানী এবং সামরিক উভয় মহলেই প্রভুত কৌতূহলের উদ্রেক করিল। পারমাণবিক বোমা সংক্রান্ত একটি বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকের গোড়াতেই লর্ড রাদারফোর্ড সম্পর্কে নিম্নলিখিত গল্পটি উল্লেখ করা হইয়াছে :

'It is said that during the last year of the First world War Erneat Rutherford, already famous for his work on atomic research, failed to attend a meeting of the British Committee of experts appoined to advise on new systems of defence against enemy Submarines. When he was censured for his absence, the vigorous New Zealunder retorted without embarrassment : 'Talk softly, please. I have been engaged in experiments which suggest that the atom can be artificially disintegrated. It is true, it is of far greater importance than a war.'

এর ভাবার্থ…'শুনা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ বছরে শত্রুর সাবমেরিনের উৎপাত থেকে প্রতিরক্ষার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞদের

'In the United States alone, the explosive power of stackplies exceeds that of 600,000 Hiroshim bombs. These reserves are more than enough to annihilate the present world population twelve times eover,' (Weltgewerks chafts bewegung, Berlin 9/1972, P. 6).

একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যদি এই প্রকার পারমাণবিক ধ্বংসকর শক্তি থাকিয়া থাকে, তবে সোভিয়েত রাশিয়াসহ পৃথিবীর মোট পাঁচটি পারমাণবিক রাষ্ট্রশক্তির প্রলয়ংকট শক্তি কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে তা কল্পনা করাও কঠিন। —লেখক

একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটিতে উপস্থিত থাকিবার জন্য আর্নেস্ট রাদারফোর্ডকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। তিনি ইতিপূর্বেই তাঁর পারমাণবিক গবেষণার জন্য প্রভুত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সভায় তিনি সময় মত উপস্থিত না হওয়ায় যখন তাঁকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছিল, তখন সেই বলিষ্ঠমনা বিজ্ঞানী বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ না করিয়া তুড়ুক জবাব দিলেন: 'আমি এমন একটা গবেষণা নিয়া ব্যস্ত ছিলাম, যাতে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, পরমাণুকে কৃত্রিমভাবে বিদীর্ণ বা বিভাজন করা সম্ভব। যদি এটা সত্য হয়, তবে, আপনাদের দুই-একটা যুদ্ধের চেয়েও এই ব্যাপারটা অনেক, অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইবে!'—[১]

* * *

ত্রিশের দশকে এই গবেষণা নানাদেশের বিজ্ঞানীদিগকে যে প্রেরণা যোগাইল তারই ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সালে বার্লিনের কাইজার উইলহেলম ইনস্টিটিউটের একদল জার্মান বিজ্ঞানী প্রথম হাতে-কলমে পরমাণু বিভাজন (split the attom) ঘটাইলেন। এই ঘটনার ফলে আমেরিকানদের মনে ভয় ঢুকিল যে, মহাযুদ্ধের মধ্যেই জার্মানরা পরমাণু বোমা তৈরার করিয়া ফেলিবে। তখন থেকে আন্তর্জাতিক জগতে এ্যাটম্ বোমা তৈয়ারির প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গেল—যদিও গোড়ার দিকে আমেরিকানরা পারমাণবিক বোমাকে আজগুবী গল্প বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান জগতের ঋষিতুল্য সাধক বিশ্ববিখ্যাত আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯৩৯ সালের ২রা আগস্ট প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি. রুজভেল্টের নিকট যে ঐতিহাসিক চিঠি লিখিয়াছিলেন (এবং যে চিঠির জন্য তিনি পরবর্তীকালে অনুতাপ করিয়াছিলেন) তার ফলেই কিন্তু এ্যাটম্ বোমা তৈয়ারির ব্যাপারটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্ব লাভ করে। সেই ঐতিহাসিক চিঠি নিম্নরূপ:

'In the course of the last four months it has been made probable through the work of Joliot in France, as well as (Enrico) Fermi and (Leo) Szilard in America, that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium, by which vast amounts of power and large quantities of new radium-like elements would be generated. Now it appcars this could be achieved in the immediate future.

'This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceiveable, though much less certain—that extremely powerful bombs—of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type, carreid by boat and exploded in a port, might very well destrcy the whole port, together with some of the surrounding territory...'[১]

অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উচ্চ ধ্বংসকর ক্ষমতাসহ পারমাণবিক বোমা যে, অনতিদূর ভবিষ্যতেই নির্মাণ করা সম্ভব, আইনস্টাইন তাঁর চিঠিতে সে কথা স্পষ্ট করিয়া

বলিলেন। অবশ্য বৃটেনে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে, ইতালীতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বনামখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানীগণ ইতিপূর্বেই পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান শুরু করিয়াছিলেন। কার্যতঃ এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতাও শুরু হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আইনস্টাইনের চিঠি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে বোমা তৈয়ারিতে উৎসাহান্বিত করিয়া তুলিল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর জীবিতকালে এই বোমা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু উদ্যোগ তিনি নিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, 'সম্পূর্ণরূপে সামরিক কারণেই এই বোমা তৈয়ার করিতে হইয়াছিল।' কিন্তু রুজভেল্ট বোমা তৈয়ারির প্রেরণা পাইয়াছিলেন আইনস্টাইনের কাছ থেকে। ট্রুম্যানের ভাষায়—

'The idea of the atomic bomb had been suggested to President Roosevelt by the famous and brilliant Dr. Albert Einstein, and its development turned out to be a vast undertaking. It was the achievement of the combined efforts of science, industry, labour and the military, and it had no parallel in htstory. The man in charge and their staffs worked under extremely high pressure, and the whole enormous task required the services of more than one hundred thousand men and immense quantites of material. It required over two and a half years and necessitated the expenditure of two and a half billions of dollars'.[২]

এর মর্ম এই যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট পরমাণু বোমা নির্মাণের এই প্রস্তাব দিয়াছিলেন সুবিখ্যাত এবং প্রতিভাদীপ্ত বৈজ্ঞানিক ডঃ আলবার্ট আইনস্টাইন। কিন্তু এর বিকাশ সাধনে বিশাল এক সংগঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিজ্ঞান, শ্রমশিল্প (কলকারখানা), শ্রমকর্মী এবং মিলিটারি সকলের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইয়াছিলন এবং ইতিহাসে এর কোন জুড়ি ছিল না। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাদের স্টাফকে কঠোরতম উচ্চ চাপের মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছিল। এই বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া লক্ষাধিক লোকের যেমন কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছিল, তেমনি অজস্র পরিমাণ দ্রব্যাদিরও প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বোমা নির্মাণে আড়াই বছরের বেশী সময় লাগিয়াছিল এবং খরচ পড়িয়াছিল ২৫০ কোটি ডলার।

ঐতিহাসিক স্নাইডারও বলিয়াছেন যে, এই ধরনের বিরাট কাজের কোন নজির ইতিহাসে নাই। বড় বড় কলকারখানা তৈয়ার করিতে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার কর্মীর প্রয়োজন হইয়াছিল এবং সেগুলি "অপারেট" করিতে দরকার হইয়াছিল অন্ততঃ ৬৫ হাজার লোকের। অথচ অত্যন্ত সঙ্গোপনে কম্পার্টমেন্টে ভাগ ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি কর্মীকে এমন ভাবে কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, যেন অপর কোন কর্মী টের না পায় এবং তার নিজের পক্ষেও যতটুকু না জানিলে নয়, তার চেয়ে বেশী তাকে জানিতে দেওয়া হইত না। মহাযুদ্ধের এটা ছিল সবচেয়ে গোপনতম কাজ। সুতরাং

হিরোশিমায় প্রথম বোমা বর্ষণের সংবাদ যখন প্রকাশিত হইল, তখন এই সমস্ত কর্মীরা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিলেন এবং ওক রিজ অঞ্চলের একজন সংবাদপত্র বিক্রেতা একটি স্থানীয় খবরের কাগজের ১৫০০ কপির প্রত্যেকটি এক ডলার (বর্তমান বিনিময়-হার অনুসারে সাড়ে ৮ টাকা) মূল্যে ৫৫ মিনিটের মধ্যে বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কারণ, এই সমস্ত কর্মী জানিতেন না যে, তাঁরাই এতদিন ধরিয়া এই বোমা প্রস্তুত করিতেছিলেন।

এই গোপনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া ট্রুম্যানও লিখিয়াছেন যে, হাজার হাজার লোকের মধ্যে খুব মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকই জানিতেন এই সমস্ত কলকারখানায় কি কাজ চলিতেছে। এমন কড়াকড়ি গোপনীয়তা অবলম্বন করা হইয়াছিল যে, ওয়াশিংটনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরও অনেকের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না যে, কলকারখানাগুলিতে কি কাজ চলিতেছে। এমনকি, প্রেসিডেণ্ট হওয়ার আগে ট্রুম্যানও জানিতেন না। তবে, ১৯৩৯ সালের আগে সাধারণতঃ বিজ্ঞানীমহলে এই তথ্য জানা ছিল যে, তত্ত্বগতভাবে পরমাণু থেকে শক্তি নির্গত করা সম্ভব। সেই সময় বৃটেনে যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের অনুশীলন চলিতেছিল, ১৯৪০ সালে আমেরিকানরাও সেগুলির সঙ্গে একত্র হাত মিলাইলেন—যদিও আমেরিকা তখন যুদ্ধরত ছিল না।

কিন্তু জার্মানী যে একটা গোপন অস্ত্রের সন্ধানে আছে, এই গুজব তখন মিত্রপক্ষীয় মহলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৪২ সালে শুনা গেল যে, জার্মানী পারমাণবিক শক্তি যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগাইবার চেষ্টায় আছে। আমেরিকানদের তখন বিশ্বাস হইল যে, জার্মানী যে নূতনতম ভি—১ এবং ভি--২ রকেট ছুড়িতেছে, সেগুলিকে পারমাণবিক শক্তির দ্বারা সজ্জিত করা হইবে এবং এই সমস্ত অস্ত্রের দ্বারাই জার্মানী বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু সেই স্বপ্ন তাদের বৃথা গেল, তারা তেমন কোন অস্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিল না। মিত্রপক্ষের কপাল ভালো যে, হিটলার তেমন কোন ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান পাইলেন না। কিন্তু যে সমস্ত জার্মান বিজ্ঞানী পারমাণবিক গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিটলারের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাঁদের মনে মনে এমন ইচ্ছা ছিল না যে, হিটলার এই ভয়ঙ্কর শক্তির অধিকারী হোক। বিশেষতঃ নাৎসী পার্টির জাতিবিদ্বেষ ও ইহুদী বিদ্বেষের জন্য অনেক নাম-করা বিজ্ঞানী ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পলাইয়া গেলেন। স্বয়ং আইনস্টাইন আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তারপর ফ্যাসিস্ট ইতালীর সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী এনরিকো ফেরমি (Fermi) এবং অধিকৃত ডেনমার্ক থেকে স্বনামপ্রসিদ্ধ নীলস্ বোয়ের প্রভৃতি আমেরিকায় বা ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়াছিলেন। অথচ এঁরা তিন জনই ছিলেন পরমাণু বিজ্ঞান বিশারদ এবং এ্যাটম্ বোমা নির্মাণে এঁদের সাহায্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হিটলার অধিকাংশ বিজ্ঞানীর সাহায্য ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হইলেন। তথাপি মিত্রপক্ষ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। জার্মানী কর্তৃক এ্যাটম্ বোমা নির্মাণের বা গবেষণার সম্ভাব্য স্থানগুলিতে বৃটিশ ও নরওয়েজান বিমান-কমাণ্ডো একত্রে দুঃসাহসিক হানা দিতে লাগিলেন। ১৯৪২-৪৩ সালের শীতকালে অধিকৃত নরওয়েস্থিত জার্মানীর "ভারী জলের" (heavy water) কারখানায় হানা দিলেন এবং নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে সেই কারখানা ধ্বংস করিয়া

দিলেন। কেন না, এ্যাটম্ বোমা নির্মাণে 'ভারী জল' ছিল একটা মূল্যবান উপাদান। আর তা ছাড়া পরমাণু বোমা তৈয়ারির মত উপযুক্ত সম্পদ এবং আনুসঙ্গিক বিরাট ব্যবস্থাও তখন নাৎসী জার্মানীর ছিল না।…

উইলিয়াম শাইরার লিখিয়াছেন যে, জার্মানীর পারমাণবিক বোমার পরিকল্পনা সম্পর্কে লণ্ডন ও ওয়াশিংটন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে "হিটলারের তেমন কোন বিশেষ আগ্রহ না থাকায়" এই পরিকল্পনার কোন অগ্রগতি ঘটিল না। অধিকন্তু গেস্টাপো পুলিশের প্রধান হিমলার জার্মানীর পরমাণু বিজ্ঞানীদেরকে স্বদেশের প্রতি অনুরক্ত নয় বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করিলেন। ফলে ১৯৪৪ সাল শেষ হওয়ার আগেই মার্কিন ও বৃটিশ গবর্নমেণ্ট জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে, জার্মানী এবারের যুদ্ধে এ্যাটম্ বোমার সন্ধান পাইবে না। পশ্চিম ইউরোপে জেনারল আইজেনহাওয়ারের আক্রমণ ও অগ্রগতির পর অধ্যাপক সামুয়েল গাউডস্মিট (Goudsmit) এক গোয়েন্দা মিশনসহ জার্মানীর পারমাণবিক গবেষণা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।—[১]

এই অনুসন্ধানের ফলে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল যে, জার্মান বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্ষুদ্র একদল পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালে মিত্রপক্ষের ক্রমাগত বোমাবর্ষণ ও জার্মানীর ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে সেই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

* * *

অসম্ভব গোপনীয়তার মধ্যে পরমাণু বোমা তৈয়ারির চেষ্টা হইতেছিল বটে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সময় সচিব ষ্টিমসন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী বায়ারনেস্ (Byrres) তাঁদের পদাধিকার বলেই এর পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এবং ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্টপদে আসীন হওয়ার কিছুকাল পরেই তাঁরা তাঁকে জানাইলেন যে, এমন এক ব্রহ্মাস্ত্র তৈয়ার হইতেছে, যেটা সফল হইলে আমেরিকা যুদ্ধের পর এমন ক্ষমতার অধিকারী হইবে যে, সে ইচ্ছামত অপরকে ডিক্টেট করিতে পারিবে।

কিন্তু এ্যাটম্ বোমা পরীক্ষার একমাস আগেও মার্কিন রণনেতাগণ জাপানকে খুব দ্রুত ধরাশায়ী করা সম্পর্কে আশান্বিত ছিলেন না। বরং তাঁরা এই মর্মে এক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিলেন যে, জেনারেল ওয়াল্টার ক্রুপারের নেতৃত্বে মার্কিন ষষ্ঠ আর্মি ১৯৪৫ সালের শেষভাগে খাস জাপানের দক্ষিণতম অংশে কিয়ুসু (Kyushu) দ্বীপে প্রথম অবতরণ করিবে। এর চারমাস পর টোকিওর নিকটবর্তী এলাকায় ক্যাণ্টো সমতল ভূমিতে দ্বিতীয় আক্রমণ ঘটিবে এবং ১৯৪৬ সালের শেষ ভাগে জাপান নতশির হইবে—অবশ্য তার আগেও জাপান কাবু হইতে পারে তার বিমান ও নৌ-শক্তির পতনের জন্য। কিন্তু জেনারেল মার্শাল অনুমান করিলেন যে, এই সমস্ত অভিযানের ফলে ৫ লক্ষ আমেরিকানের প্রাণ যাইতে পারে।

সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও মার্কিন প্রাণহানি এড়াইবার জন্য ১৯৪২ সাল থেকেই (যখন জার্মানী উড়ন্ত বা রকেট বোমা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিল) মিত্র পক্ষ যেন পারমাণবিক শক্তির গবেষণার জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করিলেন, যার নাম দেওয়া যাইতে পারে "ল্যাবরেটারির যুদ্ধ"। এই যুদ্ধ আগেই বৃটিশ বিজ্ঞানীরা

১। দি রাইজ এ্যান্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ্—পৃষ্ঠা ১৩০৬।

শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটেন জার্মানীর আক্রমণের পাল্লার মধ্যে ছিল বলিয়া গবেষণা কেন্দ্রগুলি নিরাপদ ছিল না। সুতরাং রুজভেল্ট ও চার্চিল কিংবা মার্কিন ও বৃটিশ বিজ্ঞানীরা পরস্পরের সহিত হাত মিলাইলেন এবং দূরবর্তী আমেরিকার নিরাপদ ও নিভৃত কেন্দ্রে গবেষণাগার ও কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইতিমধ্যে জার্মানীর পতন ঘটিল বটে, কিন্তু দূরবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে অত্যন্ত তিক্ত ও তীব্র যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের প্রাণবলি হইতে লাগিল। সুতরাং সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করিয়া পারমাণবিক বোমা তৈয়ারির চেষ্টা আরম্ভ হইল। সমর বিভাগের আর্মি ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বিশেষ শাখার উপর এই বোমা তৈয়ারির দায়িত্ব দেওয়া হইল। এভাবেই সুবিখ্যাত "ম্যানহাটান প্রোজেক্ট"-এর জন্ম হইল, যার ভারপ্রাপ্ত হইলেন মেজর-জেনারেল লেসলি আর. গ্রোভ্স। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, ল্যাবরেটারিতে আসল গবেষণার কাজ করিতেছিলেন বৃটিশ ও মার্কিন বিজ্ঞানীগণ একত্রে। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হইল পৃথিবী বিখ্যাত আর-একটি নাম—কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ জে. রবার্ট ওপেন-হাইমার (Ophenheimer)—তিনিই পরবর্তীকালে এ্যাটম্ বোমার জন্মদাতা কিংবা জনকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। কারণ এই বোমা তৈয়ারিতে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী ছিল। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, প্রেমিক, সংস্কৃতজ্ঞ এবং কৃতী অধ্যাপক ও দক্ষ সংগঠক ছিলেন। আর পরিশ্রম ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। সুতরা তাঁর গুণগ্রাহী ও ভক্তের সংখ্যা ছিল অজস্র। নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে লস্ এ্যালামোস (Los Alamos) নামক স্থানে মূল সংগঠন গড়িয়া তোলা হইল। এছাড়া টেনাসি অঞ্চলের ওক্‌রিজে এবং ওয়াশিংটন থেকে ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমের একটি বিচ্ছিন্ন এলাকায় রিচল্যান্ড শহরে দুইটি প্রকাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এ্যাটম্ বোমা নির্মাণের জন্য।

হ্যারি ট্রুম্যান প্রেসিডেন্টের গদিতে আরোহণের পর এই সমস্ত তথ্য জানিতে পারিলেন এবং স্টিমসন তাঁকে বলিলেন যে, আর চার মাসের মধ্যেই বোমা তৈয়ারি সম্পূর্ণ হইতে পারে। এই বোমার ফলাফল কি হইতে পারে, সেই সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সমর সচিব স্টিমসনের সভাপতিত্বে মার্কিন সরকারের ও সমর বিভাগের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়া একটি "ইন্টেরিম কমিটি" গঠিত হইল। এই কমিটিতে আমেরিকার তিনজন প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানী (যাঁরা প্রভূত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন)—যেমন, ডঃ ভ্যানেভা বুশ, ডঃ কার্ল টি. কম্পটন এবং ডঃ জেমস বি. কোনাণ্ট সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

এই কমিটিকে সাহায্য দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানীদের আর-একটি পৃথক গ্রুপ গঠিত হইল এবং পরমাণু বিজ্ঞানে তাঁরাও ছিলেন অসাধারণ খ্যাতিসম্পন্ন। এঁরা হইলেন ডঃ ওপেনহাইমার, ডঃ আর্থার এইচ. কম্পটন, ডঃ ই. ও. লরেন্স এবং ডঃ এনরিকো ফেরমি যিনি ইতালী থেকে পলাইয়া আসিয়াছিলেন।—[১]

ট্রুম্যান লিখিয়াছেন যে, এই দুইটি বিশেষজ্ঞ কমিটিই যথাশীঘ্র সম্ভব শত্রুর বিরুদ্ধে এই বোমা ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। কোন নির্জন দ্বীপে এই বোমা ফাটাইয়া এর শক্তি প্রদর্শন করিলে শত্রু কাবু হইবে বা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবে, এমন.

১। ট্রুম্যানের আত্মস্মৃতি (ইং) পৃষ্ঠা ৪৬২।

বিশ্বাস তাঁদের ছিল না। সুতরাং এর ধ্বংসক ক্ষমতা প্রমাণের জন্য পূর্বাহ্নে কোন সতর্কতা ছাড়াই শত্রুর বিরুদ্ধে এর প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। ট্রুম্যান বলিতেছেন যে, তিনি এর অপরিমিত বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

* * *

১৬ই জুলাই, ১৯৪৫, আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে আলামগার্দোর নিকট বিশ্বের প্রথম এ্যাটম্ বোমার পরীক্ষা সফল হইল, তৃতীয় অধ্যায়ে পটসডাম সম্মেলনের দ্বিতীয় দফার আলোচনায় সে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য জাতির ইতিহাসে পারমাণবিক শক্তির এই আবির্ভাব ও বিস্ফোরণ এক অভাবনীয় যুগের সূচনা করিয়াছে। সুতরাং পরমাণু বোমার জন্মলগ্নের অতি নাটকীয় কাহিনীর বর্ণনা একজন বিশিষ্ট বাঙালী বিজ্ঞানীর রচনা থেকে এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।*

"বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমাটি ফাটানো হইয়াছিল আমেরিকাতে। ১৯৪৫ সালের জুলাইয়ের এক নিশীথে আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর এক বিজন প্রান্তরের একটি পরিত্যক্ত খামার বাড়ীর অত্যন্ত গোপন আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমাটিকে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করার জন্য জুড়ে তোলা হচ্ছিল। সোমবার ১৬ই জুলাই ১৯৪৫ সালের শেষ রাত্রিতে সেটিকে আলামগার্দোর বিজন মরুভূমির বুকে ফাটানো হয়। মরুভূমির মধ্যে বড়সড় পাথরের একটা টিলার উপর নিরেট লোহার তৈরী একটি মঞ্চ—তাতেই বসানো হয়েছে এ্যাটম্ বোমাটিকে—মঞ্চের সাংকেতিক নাম "পয়েণ্ট জিরো"। সেখান হতে মাইল দশেক দূরে মূল নিয়ন্ত্রণ শিবির—সেখানে বিশেষ পোশাকে সজ্জিত, মুখে এবং শরীরের অন্যান্য উন্মুক্ত অংশে থকথকে ক্রিম লাগানো অবস্থায়, চোখে গাঢ় রঙের বিশেষ চশমা পরে বৈজ্ঞানিকের দল উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। দূরের মঞ্চের দিকে সকলের দৃষ্টি—সকলের বুকের মধ্যে ঘা পড়ছে। অদ্ভুত এক আশা-নিরাশার দোলায় সবাই দুলছেন। সারারাত্রি ধরে প্রস্তুতি-পর্ব চলেছে চরম মুহূর্তের জন্য।

'মাইকে ঘোষকের গলা শোনা যাচ্ছে—চার-তিন-দুই—তারপর লাল কমলা সবুজ নীল বেগুনী আলোকের সে কি অবর্ণনীয় ঝলকানির সঙ্গে কানের পর্দা ফাটানো অতি দীর্ঘস্থায়ী অমানুষিক এক শব্দলহরী। আগ্নেয়গিরির লাভার মত গলিত মৃত্তিকা পাথর আর ধাতব খনিজের রুপালি গলিত স্রোত তথা উজ্জ্বল রক্তবর্ণের ধূমায়িত ভস্মরাশি ব্যাঙের ছাতার আকারে উপরের দিকে উঠে চলেছে ধীরে ধীরে। এক সময় সেই ব্যাঙের ছাতার উচ্চতা দাঁড়ালো সাত মাইলেরও বেশী। এত সব-কিছু যেন মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল—অনেকেই পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের প্রথম ঝলকানিটা দেখতেই পেল না—তবে দূরে পাহাড়ের গায়ে ঠিকরে পড়া উজ্জ্বল আলোর ছটা যা চোখে পড়ল—চিরকালের মত চোখের দ্যুতি ছিনিয়ে নিতে সে আলোই যথেষ্ট। উত্তেজনায় অনেকেই চোখের চশমা খুলে একবার খালিচোখে সেই "দিব্য" আলোক দেখতে চাইলেন—সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে রইলেন। হায় নিয়তি!

* এই লেখকের নাম ডক্টর ধ্রুব মার্জিত। ইনি পদার্থ বিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি.। স্পেকট্রোস্কোপি সম্পর্কে এঁর উচ্চতর গবেষণা দেশে ও বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত। ইনি একজন বিশেষজ্ঞ গবেষক এবং এঁর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল বাংলা ১৩৮৩ সালের বৈশাখ সংখ্যার বিখ্যাত 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রে।

এতগুলি বছর ধরে পরমাণু বোমার যে দিব্য আলোক ঝলকানি প্রত্যক্ষ করার জন্য তাঁরা সযত্নে অপেক্ষা করছেন—আজ তাঁরা এই চরম মুহূর্তের বিশেষ ক্ষণটিতে এসেও সেই দিব্য দ্যুতি দেখতে পেলেন না।

'পরমাণু বোমার পিতা—ওপেনহাইমার নিয়ন্ত্রণ-কক্ষের একটি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর নবজাতকের অস্তিত্বের ক্রন্দন এবং তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণটিকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছিলেন—অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে হঠাৎ ঝলসে উঠলো আলো—তীব্র আলোক ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর চোখমুখ—হয়ত হৃদয়ও। ওপেনহাইমারের হৃদয় আজ বিহ্বল—শান্তকণ্ঠে তিনি আবৃত্তি করছেন—শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগের একটি শ্লোক :

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥—১১।১২

—যদি কখনও আকাশে এই সঙ্গে সহস্র সূর্যের প্রভা উদিত হয়, তাহলে সেই দীপ্তি পরমাত্মার প্রভার কিঞ্চিৎ তুলনাযোগ্য হলেও হতে পারে।

'বাতাসে বারুদের গন্ধ—মৃত্যুর গন্ধ চারিদিকে। মৃত্যুর এই চরম ক্ষমতাধর ব্রহ্মাস্ত্রটি তৈরী হয়েছে তাঁর হাত দিয়েই। পরমাণু বোমার ভয়াবহতায় ওপেনহাইমারের হৃদয় অস্থির—তিনি সান্ত্বনা খুঁজছেন। কিন্তু তাঁর জন্য কি সান্ত্বনাই বা আছে! ওপেনহাইমার হয়ত শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর শেষ সান্ত্বনা চাইছেন—বিড় বিড় করে তিনি পুনরায় আবৃত্তি করলেন গীতার একাদশ অধ্যায়ের আর-একটি শ্লোক :

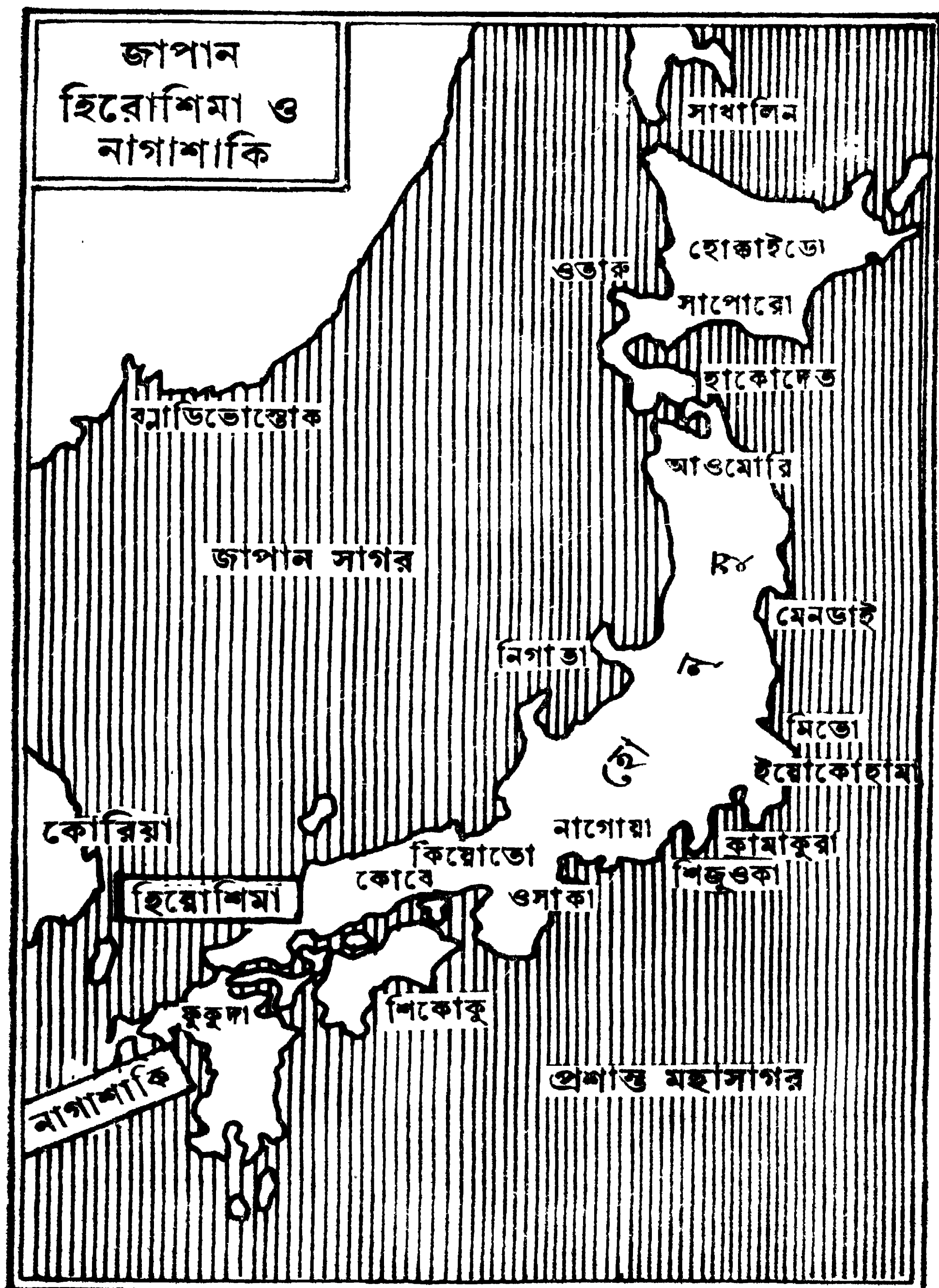
শ্রীভগবানুবাচ—
কলোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেহপি ত্বা ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যণীকেষু যোধাঃ ॥

—আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল, বর্তমানে লোকসংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যুদ্ধ না করলেও বিপক্ষ দলে যে বীরগণ আছেন, তাঁরা কেউ আর বেঁচে থাকবেন না।

ওপেনহাইমার একটু আশ্বস্ত হইলেন— তিনি তাহলে উপলক্ষ মাত্র, একাজ তিনি না করলে ভগবান অন্য কারুকে দিয়ে করাতেন!'

* * *

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ পর্যায়ে এসে পেঁৗছেছে। হিটলারের ফ্যাসীবাদী জার্মানী আত্মসমর্পণ করেছে—জাপান আত্মসমর্পণ করার মুখে। এমন সময় হঠাৎ ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট সকাল ৮-৫ মিনিটে জাপানের কয়েক লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন সমগ্র আকাশ জুড়ে তীব্র নীল-বেগুনী আলোর অতি উজ্জ্বল ঝলক, আর সেই সঙ্গে শুনলেন কান-বধির হওয়া একটানা প্রচণ্ড শব্দলহরী—বিশ্বের দ্বিতীয় পরমাণু বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানো হলো হিরোশিমায়। তার কয়েকদিন বাদে তৃতীয়টিও অনুরূপ আলোক এবং শব্দের বন্যার মধ্যে প্রকটিত হলো নাগাশাকিতে। জাপানের মাথার উপরে অতি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ঘন বাষ্পের ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে উঠলো প্রায় চার মাইল উঁচু হয়ে। এই অদ্ভুত এবং বিকটদর্শন ব্যাঙের ছাতা (Mushroom cloud


জাপান
হিরোশিমা ও
নাগাশাকি
সাখালিন
হোক্কাইডো
ওতারু
সাপোরো
হাকোদেত
ব্লাডিভোস্তোক
আওমোরি
জাপান সাগর
সেনডাই
নিগাতা
মিতো
ইয়োকোহামা
কোরিয়া
নাগোয়া
কামাকুরা
কিয়োতো
শিজুওকা
কোবে
হিরোশিমা
ওসাকা
শিকোকু
ফুকুদা
নাগাশাকি
প্রশান্ত মহাসাগর

from Atomic Explosion) পরমাণু বোমার প্রতীকরূপে আজ চিহ্নিত। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দু'লক্ষ মানুষ মারা গেলেন আর প্রায় দশ লক্ষ মানুষ হলেন বীভৎস রকমের বিকলাঙ্গ। চারিদিকে শুধু আগুন আর আগুন। হাজার হাজার মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করছে—সেই ব্যাপক অগ্নিকুণ্ড হতে বের হবার আশায়। তাদের কেউ কেউ মুহূর্তের মধ্যে সাত-আট ফুট লম্বা হয়ে যাচ্ছেন, আবার কারুর দেহ দুমড়ে-মুচড়ে একেবারে ছোট হয়ে যাচ্ছে। কারুর চোখ দুটি ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কারুর গায়ের চামড়া উঠে গিয়ে লোল হয়ে গায়েই ঝুলছে। কাছাকাছি পাহাড়গুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে—মহাসাগরের বুকে লেগেছে প্রচণ্ড ধাক্কা আর তার উত্তাল জল হয়ে পড়েছে উত্তপ্ত। ক্রন্দন আর আর্তনাদ সেদিনের সেই ভয়ংকর শারদপ্রভাত মুখরিত হয়ে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের অশ্রুতে যা চিরসিক্ত, তাদের মর্মান্তিক বেদনায় যা ভারাক্রান্ত—এমন কোন করুণ দৃশ্যের বর্ণনা করা সহজ সাধ্য নয়।

'কি ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব যে হয়েছিল, তার কিছুটা হয়তো বোঝা যাবে যাঁরা সেদিন ঐ অবস্থার মধ্যেও বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁদের ক'জনের মুখ হতে শোনা যাক সেদিনের বর্ণনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাকোশ ইতো সেদিন ছিলেন একজন স্কুলের বিদ্যার্থী। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—প্রফেসর ইতো, কি দেখেছিলেন আপনি, মনে আছে কিছু ?'

'একটুখানি ভেবে নিয়ে অধ্যাপক বললেন—'মনে না থাকার কিছু নেই—স্পষ্টই মনে আছে সব-কিছু। আগুন জ্বলছে, যেদিকে তাকানো যায় শুধু আগুন। সেই অগ্নিকুণ্ডের ভিতর হতে বেরিয়ে আসার সে কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! বোমার আঘাতে গলে গিয়ে সব-কিছু জেলি হয়ে গেছে। একটা আশ্চর্য জিনিস—বিশ্বাস করুন প্রথম দিকে কিন্তু কোন সোরগোল ছিল না। কিন্তু কয়েক মিনিট বাদে—উঠল এক তুমুল আর্তনাদ—যে চিৎকারের কোন তুলনাই হয় না।'

'একজন শ্রমিক বললেন—'রাত্রে এবং সকালে একটি কারখানায় কাজ করি। কারখানায় সকালের ভোঁ বেজে গেছে। হঠাৎ বেগুনি আলোর ঝলক দেখে সবাই চমকে উঠলাম। যেখানটিতে বোমাটি বিস্ফোরিত হলো, তার তিন মাইলের মধ্যেই ছিল আমার কারখানা। ছুটে গেলাম কারখানার গেটের দিকে—কিন্তু গেটের কাছে পেঁছুতে-না-পেঁছুতেই বাতাসের ঝটকা এসে আমার সামনের সব-কিছু ভূমিসাৎ করে দিল। কয়েক শত শ্রমিক কারখানার বাড়ীর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালো—দেয়াল ধ্বসে পড়লো, আর তা সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক ধরনের ছাই হয়ে উড়ে গেল। ঝড় বইছে তখন সাইক্লোনের মত। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে রক্তবর্ণ লেলিহান অগ্নিশিখা। ওদিকে শহরের মধ্য হতে রক্তবর্ণ বাষ্পপুঞ্জ পৃথিবী হতে সোজা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। তার দিকে তাকায় কার সাধ্য!'

'ঠিক তখন পরমাণু বোমার স্রষ্টারা কি করছিলেন, কি ভাবছিলেন ? সেদিন তাঁদের মাথার উপরের আকাশ অতি অবশ্যই নিরাপদ ছিল, কোন তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি তো তাঁদের মাথায় ঝরে পড়ছিল না। সুতরাং হয়তো ধরে নেওয়া হবে সেদিন তাঁরা ছিলেন একেবারেই নিশ্চিন্ত অথবা এই মহান সৃষ্টির উল্লাসে কিঞ্চিৎ দিশেহারা। কিন্তু—না, তাঁরা সেদিন কোন বিজয়-উল্লাসে ফেটে পড়েন নি। বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল সর্বদা ভেবেছেন—আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি তাঁরা একি বেইমানি করে ফেললেন—

তীব্র ধীক্কার তাঁদের অন্তর জর্জরিত করছিল প্রতি মুহূর্তে। পদার্থ-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মনীষী—বিজ্ঞানী সমাজের "পোপ" মহান আইনস্টাইন তখন আমেরিকার প্রিন্সটনে। "সেণ্টার অব্ এ্যাডভান্সড্ স্ট্যাডিজে" গবেষণায় রত—শোনা যায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের দিনটিতে তিনি বেদনায় নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে কপালের শিরা চেপে ধরে বসেছিলেন নির্জনে একাকী। সেদিনটিকে বলা যায় আইনস্টাইনের "কৃষ্ণ দিবস"—পরমাণু গবেষণার প্রথম দিকেই তিনি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন —'পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভাঙ্গন ঘটিয়ে মানুষের কতটা মঙ্গল করা সম্ভব, তা আগে হতে চিন্তা করা গেলেও—এর দ্বারা যে মানুষের কত অকল্যাণ হতে পারে, তা চিন্তাও করা যায় না।'

'আলবার্ট' আইনষ্টাইনের "কৃষ্ণ দিবসের" কথা সত্য হোক আর নাই হোক—তবু একটা কথা আমরা কল্পনা করে নিতে পারি, সেদিন তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল তাঁরই আবিষ্কৃত পদার্থ বিদ্যার সেই বিশেষ সূত্রটির কথা—তাঁরা সেই সুবিদিত "শক্তিধর—সমীকরণের" কথা, যাতে বলা হয়েছে পদার্থের মধ্যে যে বিপুল শক্তি সঞ্চিত আছে, তার পরিমাণ পদার্থের ভরের সঙ্গে আলোকের গতির বর্গগুণ করলে যত হয় তার সমান। এ সূত্রের এমন ভয়ংকর সমর্থন গবেষণাগারে অথবা বিমূর্ত শূন্যে না ঘটিয়ে ঘটানো হলো হিরোশিমা এবং নাগাশাকির নিতান্ত করুণ এক মানবিক পরিবেশের মধ্যে—হয়তো এই বিষাদটাই তাঁকে ধিক্কার জানাচ্ছিল বেশী করে এবং সেটাই আমাদের কাছে তাঁর "কৃষ্ণ দিবস"। তাঁর দুঃখ ও হতাশার হয়তো আর-একটি কারণও ছিল—তা হল তাঁর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে লেখা সেই ঐতিহাসিক চিঠি; যাতে তিনি প্রেসিডেণ্টকে পরমাণু বোমা তৈরি করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।*

'নিউক্লিয়ার তথা পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞান কোন একক মহান বৈজ্ঞানিকের মানসপুত্র নয়। অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম করা যেতে পারে, যাঁরা এই বিজ্ঞানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। বিশ্বের প্রায় সকল জাতির লোক এর উন্নতির জন্য কাজ করেছেন। সবার নাম করতে গেলে একটা "Who's Who" ধরনের বই হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তবু—মহান আইনস্টাইন এবং পরমাণু বোমার পিতা রবার্ট ওপেনহাইমার ছাড়াও নিজেদের কীর্তিতে যাঁরা দুঃখবোধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ না-করে পারা যায় না—এরা পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলেই প্রায় সমান বিখ্যাত ঃ

বৃটেনের পল অ্যাড্রিয়ন, মরিস ডিরাক, লর্ড ব্র্যাকেট, স্যার জেমস্ চ্যাডউইক. ডেনমার্কের নেলস্ হেনরিক বোর, তাঁর ছেলে এ্যাগে বোর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্ল অ্যাণ্ডারসন, হানসবেথে, গ্লীন সীবর্গ, ইভা নোডাক, অ্যালিসন, রিচার্ড ফাইনম্যান, জন নিউম্যান, রোসেনবার্গ, আর্থার হোলি কম্পটন, আর্নেস্ট অরল্যাণ্ডো লরেন্স, হুইলার, হ্যারল্ড উরে; জার্মানীর আটো হান, ফ্রাইট্জ ট্রাস্সম্যান, অটো ফ্রিশ, ওয়ারনার হাইসেনবার্গ; ইতালীর এনরিকো ফেরমি, এ্যামিলেও সেগ্রে; হাঙ্গেরীর লিও সেলার্দ, ইউগেনী ভিগনার, এডওয়ার্ড টেলর, রাশিয়ার পিটার কাপিৎজা, লেভ লেণ্ডাউ কুর্চাতভ, সাখারভ, তামম্, চেরেনকভ, স্পেনের আলভারেজ, অস্ট্রিয়ার এরউইন শ্রদিনজার, উলফগাঙ পাউলি, কুমারী লিজা মাইটনার; ভারতবর্ষের সত্যেন্দ্রনাথ

* এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে সেই ঐতিহাসিক চিঠির উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

বসু ; ফ্রান্সের দ্য ব্রয়েগলী, জুলিয়েট কুরী দম্পতি ; জাপানের হিদকী ইউকোওয়া, জোলিওনিশানা, হল্যাণ্ডের ভন্-দ্য-গ্রাআফ ; মেক্সিকোর ভল্লার্তা প্রভৃতি কীর্তিমান বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর দল। এই সব শান্তিকামী বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা সযত্নে আমেরিকার সমর দপ্তরে পেণ্টাগণের সমর বিশারদদের হাতে এই ব্রহ্মাস্ত্রটি তুলে দিয়েছিলেন, তাঁরা সেদিন যা-কিছু করেছিলেন, তা দেশের স্বার্থে, আবিষ্কারের উদগ্র নেশায় এবং সর্বোপরি পরমাণু বোমার ব্যাপারটি সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে। পরমাণু বোমার মর্মান্তিক তাৎপর্য কিছুটা উপলব্ধি করে তাঁরা প্রায় সবাই নিজেদের কীর্তির ভয়াবহতায় আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। আর সেই পরমাণু বোমার পিতা, বিচক্ষণ প্রশাসক, স্বচ্ছন্দ কবি, দার্শনিক, বহু ভাষাবিদ, গীতা বিশারদ এবং সর্বোপরি প্রখর বুদ্ধিমান পদার্থ-বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার, যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পাওয়া গেল সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মারণাস্ত্রটি, সেই ওপেনহাইমারও সেদিন ক্ষুন্নমনে ভাবছিলেন লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে নিহত আর পঙ্গু করে নগরকে-নগর উড়িয়ে দিয়ে মাইলের-পর-মাইল শস্য-শ্যামল উর্বর কৃষিক্ষেত্রকে বন্ধ্যা করে কি লাভ হলো? এর কি সত্যই কোন প্রয়োজন ছিল? বিজ্ঞান কি শুধুই অশুভ আর মৃত্যুর হাহাকারের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলবে এখন হতে? দুঃখ হয়েছিল হয়তো ওপেনহাইমারেরই সবচেয়ে বেশী। কারণ, নাৎসী তথা হিটলার বিরোধীরা তাঁকে দিয়েই এই চরম বিয়োগ ভারাক্রান্ত অধ্যায়টি রচনা করিয়েছিল।'*

* * *

পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার এই নবযুগ-পর্বকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্মরণ করা হইয়াছিল ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৭০ সালের ১৬ই জুলাই তারিখ। সেদিন ওয়াশিংটন থেকে নিম্নলিখিত ইংরাজী রিপোর্টটি কলকাতার সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল ঃ

Washington, July 16—The atomic age began at exaetly 5-30 in Alamogordo, New Mexico, 25 years ago.

To-day the USA recalls the event in sombre term. Dr. J. Robert Oppenheimer, one of the authors of the nuclear bomb project conceived the events in the words of the Bhagvat Gita :

'If the radiance of a thousand suns
Were to burst at once into the sky
That would be like the splendour of the one···
I am become death,
That Shatterer of worlds.'

The New York Times reported the bursting of the first bomb in these unforgettable words written by William L. Laurence who witnessed the burst of the atomic age.

* দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো। সুপণ্ডিত লেখক পারমানবিক বোমা-সংক্রান্ত প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের (যেমন Brighter than Thousand Suns by Jungk, R.) রেফারেন্স দিয়ে রচনাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই বোমার জটিল টেকনিক্যাল দিক সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা "উদ্বোধন" মাসিকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৩৮৩ সাল) প্রকাশিত হয়েছিল।

'Just at that instant there rose from the bowels of earth a light not of this world, the light of many suns in one. It was a sunrise such as the world had never seen, a great, green super sun climbing in a fraction of a second to a height of more than 8000 feet, rising even higher until it touched the clouds, lighting up the earth and the sky all around with a dazzling luminosity.'

'It went, a great ball of fire about a mile in diametre changing colours as it kept shooting upwards, from deep purple to orange, expanding growing bigger, rising as it was expanding, as an elemental force freed from its bonds after being chained for billions of years.

'For a fleeting instant the colour was unearthly green, such as one sees only in the corona of the sun during a total eclipse. It was as though the earth had opened and the sky had split.

'One felt as though he had privileged to witness the birth of the world—to be present at the moment to creation when the Lord said : Let there be light.'

(স্টেটসম্যান, কলিকাতা,
১৭ই জুলাই, ১৯৭০)

পারমাণবিক যুগারম্ভের "রজত জয়ন্তী" (!) উপলক্ষে বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা "নিউইয়র্ক টাইম"-এর এই রিপোর্টটির বিশদ বাংলা অনুবাদ দেওয়া সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। কেন না, বোমা বিস্ফোরণের আসল প্রতিক্রিয়াগুলির বর্ণনা আগেই দেওয়া হইয়াছে। তবে, প্রত্যক্ষদর্শী একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলিয়াছেন—তাঁরা যেন পৃথিবীর প্রথম জন্ম এবং আলোকের প্রথম আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন !

* * *

কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত ছিল ? ট্রুম্যান তাঁর স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন যে, সেই দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিল।

'কখন এবং কোথায় পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করিতে হইবে, সেই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আমার উপরেই ছিল। এ বিষয়ে কাহারও যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে—"Let there be no mistake about it"—আমি এই বোমাকে সামরিক অস্ত্র বলিয়াই মনে করিতাম এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। প্রেসিডেন্টের শীর্ষস্থানীয় সামরিক উপদেষ্টাগণ এর ব্যবহার সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং যখন আমি এই বিষয়ে চার্চিলের সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম, তখন তিনি নিঃসংশয়চিত্তে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি এই বোমার দ্বারা যুদ্ধ শেষ করা যায়, তবে নিশ্চয়ই এর ব্যবহার করিতে হইবে।'[১]

চার্চিল যে এই বিষয়ে ট্রুম্যানের সঙ্গে একাত্ম এবং একমত হইবেন, সেকথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। তিনিও তাঁর মহাযুদ্ধের গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের

১। ট্রুম্যানের আত্মস্মৃতি (ইং)—পৃষ্ঠা ৪৬২।

ওকিনাওয়া দ্বীপে আত্মবিনাশী জাপানী সৈন্যদের ভয়াবহ বেপরোয়া লড়াই দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। কেননা, এভাবে জাপানকে জয় করিতে গেলে ১০ লক্ষ মার্কিন সৈন্য এবং ৫ লক্ষ বৃটিশ সৈন্যের প্রাণ যাইতে পারে। এই অবস্থায় এ্যাটম্ বোমা আবিষ্কারের সংবাদে চার্চিল যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কারণ, এই অতি-প্রাকৃত (super natural) অস্ত্র যুদ্ধও তাড়াতাড়ি শেষ করিবে এবং "বীর জাপানী সৈন্যেরাও" অজস্র প্রাণক্ষয় থেকে রেহাই পাইবে। আর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার কোন সহযোগিতা বা সাহায্যেরও প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং পরীক্ষার আগেই ৪ঠা জুলাই তারিখ এই বোমা জাপানীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বৃটিশ পক্ষ নীতিগতভাবে মত দিয়াছিলেন।

চার্চিল তাঁর বলিষ্ঠ ভাষায় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, 'এ্যাটোমিক বোমা জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের দ্বারা তাকে আত্মসমর্পণ বাধ্য করা হইবে কিনা, এটা আমাদের মধ্যে কখনও বিতর্কের বিষয় পর্যন্ত ছিল না। সকলেই এই প্রশ্নে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ও স্বাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণ একমত ছিলেন এবং আমাদের অন্য কিছু করা উচিত, এমন কোন সামান্যতম প্রস্তাবও 'আমি কারুর মুখে শুনি নাই।'[২]

ইতিমধ্যে জাপানের পক্ষ থেকে মস্কোতে শান্তি স্থাপনের জন্য জাপানী রাজদূতের মারফত একটি বার্তা স্ট্যালিনের হাতে পৌঁছিয়াছিল বটে, কিন্তু তার মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল না বলিয়া সেটা গ্রাহ্য হইল না। তবে, সেই বার্তায় একথা বলা হইয়াছিল যে, জাপান "নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের" দাবী মানিয়া লইতে পারে না। তবে, অন্যান্য প্রশ্নে আপোস-মীমাংসা করিতে রাজী আছে। পটসডাম সম্মেলনের পূর্বাহ্ণে জাপানের সম্রাটের পক্ষ থেকে মস্কোতে এই বার্তাটি পৌঁছিয়াছিল এবং স্ট্যালিন সেকথা চার্চিলকে জানাইয়াছিলেন। চার্চিল এই বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে যখন আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি জাপান সম্পর্কে 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে'র দাবী নিয়া জেদ প্রকাশ করিতে রাজী ছিলেন না। তখন মার্কিন নেতারা পুনরায় বিষয়টি বিবেচনা করিলেন এবং জাপানকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে "জাপানী সৈন্যবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ" দাবী করিয়া ২৬শে জুলাই পটসডাম থেকে একটি চরমপত্র প্রচার করা হইল।—(তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলেন এবং ২৮শে জুলাই রেডিও টোকিও মিত্র শক্তিবর্গের চরমপত্রের কোন জবাব না দিয়া ঘোষণা করিলেন যে, জাপানী গবর্নমেণ্ট যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেন। তখন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান স্থির করিলেন যে, ৩রা আগস্টের পর জাপানের বিরুদ্ধে এ্যাটম্ বোমা প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। "সামরিক প্রয়োজনে" এবং "সৈন্যক্ষয় হ্রাস করার জন্যই" এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। মার্কিন সমর কর্তারা জাপানী সামরিক উৎপাদন কেন্দ্রের যত কাছাকাছি সম্ভব এই বোমা নিক্ষেপের সংকল্প করিলেন এবং এজন্য পর পর চারটি শহরের নাম স্থির করা হইল, যথা—হিরোশিমা, কোকুরা, নাইগাটা এবং নাগাশাকি। রণনৈতিক বিমানবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল স্পাৎস (Spaatz) নিযুক্ত হইলেন লক্ষ্য বস্তুর উপর বোম নিক্ষেপের ব্যবস্থা করার জন্য। আবহাওয়ার অবস্থা অনুসারে তারিখ নির্দেশের স্বাধীনতা তাঁকে দেওয়া হইল—তবে ৩রা আগস্টের পর যত

২। চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৩।

তাড়াতাড়ি সম্ভব। বোমাবাহী বিমান ছাড়া আর-একটি পৃথক বিমানে সামরিক ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের দল কয়েক মাইল তফাতে থাকিয়া বোমাবর্ষণের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিবেন—এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইল। কিন্তু সময় সচিব ও রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া এই বোমা ব্যবহারের কোন সংবাদ প্রকাশ করা চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের টিনিয়ান দ্বীপে জাহাজ ও প্লেনযোগে বোমার উপযুক্ত মালমশলা, পাইলট, লস্কর ও বিশেষজ্ঞদের দ্রুত সমাবেশ ঘটানো হইল। বি-২৯ সুপার ফোর্টরেস শ্রেণীর একটি বিশেষ ইউনিট এই উদ্দেশ্যে গঠিত হইল এবং তারা টিনিয়ান দ্বীপ থেকে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হইল। কর্নেল পল ডাব্লিউ. টিবেটস্ (Tibbets) নামক একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক এই দুঃসাহসিক কার্য সম্পন্ন করার ভার পাইলেন এবং হিরোশিমার আকাশে বি-২৯ শ্রেণীর যে বিমানটি তিনি পাইলট হিসাবে পরিচালনা করিলেন, তার নামকরণ করা হইল "এনোলা গে" (Enola Gay)। "এনোলা গে"র মাত্র তিনজন আরোহী—কর্নেল টিবেটস, নেভী ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পারসন এবং মেজর টমাস ফেরেবী (Ferebee) আসল ব্যাপারটা জানিতেন, আর বাকী লস্করেরা এই বোমা বিষয়ে কিছুই জানিতেন না, শুধু এইটুকু জানিতেন যে, তাঁরা একটি গুরুতর "গোপনীয়" সামরিক অভিযানে যাইতেছেন।…

৫ই আগস্ট (ইংরাজী মতে ৬ই) রাত্রি ২-৪৫ মিনিটের সময় "এনোলা গে" সেই কালান্তক বোমাটি নিয়া টিনিয়ান দ্বীপ থেকে দীর্ঘ যাত্রায় বাহির হইল জাপানের দিকে। দুইটি পর্যবেক্ষক বিমান তাকে অনুসরণ করিল। এই বিমান দুইটিতে ছিল ক্যামেরা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক দল। কিন্তু এই বিমানের উড্ডয়ন এবং ঊর্ধ্ব আকাশে আরোহণ বেশ বিপজ্জনক ছিল। কারণ, বোমাটি খুব ভারী ছিল এবং এর আগে তিনটি বি-২৯ বিমান এখান থেকে উড়িতে গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আমেরিকার সৌভাগ্যক্রমে "এনোলা গে" বিমান নিরাপদেই জাপানের দিকে উড়িয়া গেল এবং ভোর ৭ টার সময় (হিরোশিমা সময়) দক্ষিণ জাপানের দিকে মুখ করিল। জাপানী রাডার যন্ত্রে তা' ধরা পড়িল এবং সমগ্র হিরোশিমা অঞ্চলে বিমান আক্রমণের সতর্কতাস্বরূপ সাইরেন বাজিয়া উঠিল। এর কিছুক্ষণ পরেই আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী একটি মার্কিন বিমান হিরোশিমার আকাশের উপর উড়িয়া চলিয়া গেল। কোন বোমা বর্ষিত হইল না। সুতরাং যথারীতি সাইরেন "মোক্ষধ্বনি" (অলক্লিয়ার) বাজিয়া উঠিল এবং লোকেরা মনে করিল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। অতএব হিরোশিমা শহরের লোকেরা (বাসিন্দার সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার) যথারীতি কলকারখানায় ও অফিসের কাজকর্মে যোগ দিতে শুরু করিল এবং অনেক স্কুলের শিশুরাও রাস্তায় বাহির হইল।

৬ই আগস্ট, সোমবার, সকাল ৮টা—হিরোশিমার ঊর্ধ্ব আকাশে দুইটি প্লেন দেখা গেল। কিন্তু শহরের লোকেরা মনে করিল ওই দুইটি পর্যবেক্ষণকারী বিমান, বোমারু নয়। সুতরাং তারা কেউ নিরাপত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিল না। ওদিকে "এনোলা গে" বিমানের মধ্যে বোমাটি শহরের উপর নিক্ষেপ করার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি ঘটানো হইল—মার্কিন আবহাওয়া বিমান থেকে আবহাওয়া অনুকূল বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া গেল। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ তখনই হিরোশিমার ভাগ্য চূড়ান্তরূপে নির্ণীত হইয়া গেল।

সুতরাং পাইলট কর্নেল টিবেট্, বোমা নিক্ষেপকারী এবং নেভিগেটর ও রাডার অপারেটর ৩১,৬০০ ফুট উপর থেকে বোমাটি নিক্ষেপের দায়িত্ব নিলেন। সকাল ৮টা ১১ মিনিটের সময় "এনোলা গে" হিরোশিমার উপরে আসিয়া হাজির হইল এবং বোমাটি নীচে নিক্ষিপ্ত হইল।[১]

এই কালান্তক বোমা হিরোশিমাতে কী নিদারুণ এবং অবর্ণনীয় বিপর্যয় ঘটালো, তার কিছু বর্ণনা আগেই দেওয়া হইয়াছে। এবার "এনোলা গে"র পাইলট কর্নেল টিবেটের এবং অন্যান্য বৈমানিকের অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে কিছুটা পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে। বোমাটি মাটি স্পর্শ করার আগেই বিস্ফোরিত হইয়াছিল এবং "এনোলা গে" সেই আঘাতের তরঙ্গ এড়াইবার জন্য দূরে সরিয়া গেল—পর্যবেক্ষণকারী বিমান দুটিও নিরাপদ দূরত্বে ছিল। এই বোমা বর্ষণের ফলাফল সম্পর্কে বিমান থেকে ফটো গ্রহণ করা হইয়াছিল।

বোমাটি নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর হঠাৎ হিরোশিমা শহর যেন অতি তীক্ষ্ণ, তীব্র এবং চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল :

'Suddenly a piercing, bliding light, has bright as the Sun, burst over the city. There was an instant of deadly silence. Then an earth shaking shock thundered violently down over the centre of the city, crumbling everythihg in its range to rubble and dust.'

অর্থাৎ শহরটি আকস্মিক তীব্র আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর নিস্তব্ধতা সেখানে নামিয়া আসিল। তারপর শহরের কেন্দ্রস্থলে ভূমিকম্পের আলোড়নের মত প্রচণ্ড আঘাত অনুভূত হইল এবং তার পাল্লার মধ্যে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই একেবারে ধ্বংস হইয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া ধুলোয় ও আবর্জনায় পরিণত হইল।[২]

বিস্ফোরণের দ্যুতি থেকে নানা রকমের আলো—নীল, কমলা, বেগুনী ও ধূসর রং বিচ্ছুরিত হইতেছিল। নীচের সেই ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনার অতীত ছিল। "এনোলা গে'র একজন বৈমানিক সেই দৃশ্য দেখিয়া "মাই গড্" বা "হা ঈশ্বর" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিলেন।

ব্যাঙের ছাতার মত অদ্ভুত আকৃতি নিয়া নিবিড় ধূম্রজাল ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে উঠিতেছিল। মাটি থেকে হাজার ফুট পর্যন্ত ধুলো ও বালির ঘূর্ণিঝড় যেন বহিতেছিল এবং তারপর শহরের দিকে দিকে আগুন জ্বলিতে আরম্ভ করিল। ২।৩ মিনিটের মধ্যেই সেই ভয়াবহ ধূম্রজাল ৪০ হাজার ফুট ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেল।

হিরোশিমার উপর নিক্ষিপ্ত এই বোমা ২০ হাজার টন টি-এন-টি বা বিস্ফোরকের সমান ছিল এবং এই দানবিক বোমা প্যারাসুট যোগে পাঁচ মাইল পর্যন্ত নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করিবার আগেই ফাটিয়া গিয়াছিল।

বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ঝাপ্টায় বড় বড় গাছ ও টেলিফোনের থাম বা পোলগুলি দাঁতন কাঠির মত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। বিভিন্ন অট্টালিকার লোহ ধাতু নির্মিত চাদর বা শীট্গুলি ও রাস্তার মোটরগাড়ীগুলি যেন ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উড়িয়া

১। Japan Subdued—Hurbert Feis, P. 109-10
২। স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৫৯৯।

গেল। ধূলায় ও ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং দাউ দাউ করিয়া সর্বত্র আগুন জ্বলিতে লাগিল। হিরোশিমা শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল, অন্ততঃ শহরের ৬০ ভাগ অদৃশ্য হইয়া গেল। পাঁচটি বড় বড় রাক্ষুসে কারখানা নিশ্চিহ্ন হইল এবং হাজার হাজার লোক জানিতেই পারিল না তারা কিভাবে মারা পড়িল। অন্ততঃ ঘটনাস্থলেই ৭৮ হাজার লোক সোজাসুজি নিহত হইল। ১০ হাজার লোক চিরকালের জন্য নিখোঁজ হইয়া গেল এবং প্রায় ৮০ হাজার আহত হইল। আরও হাজার হাজার কিংবা অসংখ্য লোক মারাত্মক গামা রশ্মির প্রতিক্রিয়ায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল। শহরের চারদিকে ব্যাপক "অগ্নিঝড়ের" জন্য বিভ্রান্ত বিমূঢ় ও ত্রাসগ্রস্ত নরনারী চারদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কাহারও কাহারও দেহের চামড়া খসিয়া ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। কাহারও বা চোখ ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণায় লোকে পাগলের মত চীৎকার করিতে লাগিল। একপ্রকার তীব্র গন্ধে বাতাস আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং বহু লোক টলিতে টলিতে বমি করিয়া ফেলিল। ৬০ হাজার অট্টালিকা ধ্বংস হইল। আর বাকী অজস্র অট্টালিকা জখম হইল।

সোজা কথায় হিরোশিমার সেই নারকীয় বীভৎস ও বিপর্যয়কর দৃশ্যের কোন বিশদ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু হিরোশিমার পরও জাপানী সামরিক হাইকমান্ড আত্মসমর্পণ না করায় তিন দিন পর বা ৯ই আগস্ট নাগাশাকিতে দ্বিতীয় পরমাণু বোমা বর্ষিত হইল। হিরোশিমার চেয়েও নাগাশাকির এই বোমা আরও উন্নত ধরনের ছিল এবং এর ধ্বংসকর ক্ষমতা আরও বেশী ছিল। শহরের অধিকাংশ কলকারখানা ও সামরিক দ্রব্য সরবরাহের কেন্দ্রসহ ৩ মাইল লম্বা ও ২ মাইল চওড়া এলাকায় একমাত্র ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু রহিল না। নাগাশাকিও হিরোশিমার মতই শ্মশানে পরিণত হইল।…

কিন্তু শিল্প-প্রধান নাগাশাকি শহরে সকাল বেলা ১১টার পর (৯ই আগস্ট ১৯৪৫) যে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল, তাতে ওই শহরের ২ লক্ষ ৬০ হাজার বাসিন্দার মধ্যে ১ লক্ষের কম লোক বিস্ফোরণের ঝাপটার মধ্যে পড়িয়াছিল। কারণ, শহরের অন্যান্য অংশ পাহাড়ের দ্বারা "সুরক্ষিত" ছিল। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে আমেরিকান মেডিক্যাল মিশন তদন্তের পর ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নাগাশাকিতে ৪০ হাজার মৃত ও ২৫ হাজার আহত হইয়াছিল।

হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে এই বর্বর এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপের ফলে অন্ততঃ ২ লক্ষ মানুষ নিহত হইয়াছিল, যদিও আমেরিকানরা হিরোশিমায় মাত্র ৬৬ হাজার লোকের মৃত্যুর কথা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু ২৫ বছর পর হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে ১০৭০ সালে জাপানীরা বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র হিরোশিমাতেই দুই লক্ষ মানুষ মারা পড়িয়াছিল।

কিন্তু পারমাণবিক বোমা এমন অমানুষিক ব্যাপার যে, সেই বোমা বর্ষণের ত্রিশ বছর পরেও জাপানের বহু লোক তেজস্ক্রিয়াজনিত কঠিন ব্যাধিতে দুঃসহ যন্ত্রণায় ভুগিতেছিল।

[এই দানবিক কান্ডের ফলে হতাহত ও মৃত (তেজস্ক্রিয়াজনিত রোগে) এবং ক্ষতিগ্রস্থ বাসগৃহ ও সম্পত্তি ইত্যাদি ধ্বংসের চূড়ান্ত হিসাব নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন।

কেননা, এই সম্পর্কে নানা সময় অনুসন্ধানের ফলে যে সমস্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে সংখ্যাগত গরমিল আছে। যেমন, ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে "অমৃত" সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত জাপানী বিজ্ঞানীদের নূতনতম তদন্তের যে ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে তাতে দেখা যায় যে হিরোশিমায় বিস্ফোরিত প্রথম পরমাণু বোমাটি ছিল ১,২৫,০০০ টন টি-এন-টির সমতুল্য। সেই সময় হিরোশিমার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৬০ হাজার এবং বোমা বিস্ফোরণের জন্য প্রাণ হারাইয়াছিল ১ লক্ষ ৪১ হাজার লোক, আহতদের মধ্যে ১০ হাজার মারা গিয়াছিল।

আর নাগাশাকিতে নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমাটি ছিল ২২,০০০ টন টি-এন-টি'র সমতুল্য। ৯ই আগস্ট তারিখ এই বোমাটি মাটি থেকে ৫০০ মিটার উচ্চতায় ফাটানো হইয়াছিল। এর ফলে নাগাশাকিতে প্রাণ হারাইয়াছিল ৭৯ হাজার লোক। জাপানী বিজ্ঞানীদের নূতনতম রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, হিরোশিমা ও নাগাশাকি দুই নগরের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৭০ হাজার—১৯৪৫ সালের পরমাণু বোমায় মারা গিয়াছিল এই দুই শহরের মোট ২,২০,০০০ মানুষ। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে যারা অকালে মারা গিয়াছিল, তাদের সংখ্যা যোগ দিলে দুইটি পারমাণবিক বোমায় নিহতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশী দাঁড়াইবে।]

* * *

কিন্তু ৬ই আগস্ট, ১৯৪৫, এ্যাটম্ বোমা বর্ষণে হিরোশিমায় যখন নরকের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং বৃটেনের স্বনামধন্য উইনস্টোন চার্চিল যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

ট্রুম্যান তখন পটসডাম সম্মেলন থেকে "আগস্টা" যুদ্ধজাহাজ যোগে ওয়াশিংটনে ফিরিবার পথে। চতুর্থ দিনে তিনি জাহাজে বসিয়া মার্কিন সময়সচিবের কাছ থেকে পৃথিবী কম্পনকারী এ্যাটম্ বর্ষণের সংবাদ পাইলেন।

এই সংবাদে ট্রুম্যান অভিভূত হইলেন এবং জাহাজের অভ্যন্তরেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বায়ারনেসকে (Byrnes) টেলিফোন যোগে খবর দিলেন। যে সমস্ত লস্কর তাঁর চারদিকে ছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে ট্রুম্যান বলিলেন ঃ

'This is the greatest thing in history. It's time for us to get home.'

'ইতিহাসের এটা সর্ববৃহৎ ব্যাপার। এখন আমাদের ঘরে ফেরার সময় এলো'।

তারপর জাহাজের রেডিও যোগে এই বোমাবর্ষণের আরও বিস্তৃত খবর পাওয়া গেল এবং ট্রুম্যান ভোজনকক্ষে সমবেত লস্কর ও অফিসারদের নিকট (তখন তাঁরা মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেছিলেন) এবং পরে জাহাজের রিপোর্টারদের এক বৈঠকে সদ্য-নিক্ষিপ্ত এ্যাটম্ বোমার ফলাফল ও গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়া এক বক্তৃতায় মন্তব্য করিলেন যে, ইতিহাসের বিজ্ঞানের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় এত বড় কাজ আর কখনও হয় নাই। যদি জাপান এর পরেও আত্মসমর্পণ না করে, তবে জাপান ধ্বংস হইয়া যাইবে।[১]

চার্চিল লিখিয়াছেন যে, পটসডাম থেকে প্রচারিত চরমপত্র জাপান অগ্রাহ্য করিতেই হিরোশিমা ও নাগাশাকির উপর পরমাণু বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত

১। ট্রুম্যানের স্মৃতিকথা (ইং)—পৃষ্ঠা ৪৬৫-৪৬৬।

হইয়াছিল। এই বোমা বর্ষণের আগে সুপার ফোর্টরেস শ্রেণীর মার্কিন বোমারুগুলি জাপানের শহরগুলির উপর নিদারুণ বোমাবর্ষণ চালাইতেছিল। কিন্তু প্রাণহানি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষ ১১টি জাপানী শহরকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য প্রতিদিন বিমান থেকে ১৫ লক্ষ ইস্তাহার এবং চরমপত্রের ৩০ লক্ষ কপি বিতরণ করিয়াছিলেন।

চার্চিলের দয়া আছে, সন্দেহ নাই! যিনি এ্যাটম্ বোমা পরীক্ষার আগেই জাপানের বিরুদ্ধে উহা ব্যবহারের জন্য ট্রুম্যানের নিকট সম্মতি দিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যে নৃশংসতার জন্য তাঁর বিবেকে বিন্দুমাত্র ব্যথা লাগে নাই, সেই ব্যক্তিই আবার জাপানীদের সতর্ক করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার বিলি করার জন্য যেন মানবিক করুণা বোধ করিতেছেন!

অথচ এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের খবর পাওয়ার পর উইনস্টোন চার্চিল এই মর্মে এক বিবৃতি দিলেন যে, "ঈশ্বরের অপরিসীম অনুগ্রহ" যে, জার্মানদের পরিবর্তে বৃটিশ ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক শক্তির গোপন রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন।

আর স্তম্ভিত জাপানী সংবাদপত্রসমূহ এই আক্রমণকে "দানবিক, বর্বর ও পাশবিক" বলিয়া তীব্র ধিক্কার দিলেন এবং আমেরিকাকে মনুষ্যজাতি ও ন্যায়বিচারের হত্যাকারী বলিয়া নিন্দা করিলেন। আর টোকিও রেডিও ঘোষণা করিল:

'The impact of the bomb is so terrific that practically all living things, human and animals, literally were seared to death by the tremendous heat and pressure engendered by the blast. All the dead and injured were burned beyond recognition···The effect of the bomb is widespread. Those outdoors burned to death, while those indoors were killed by the indescribable pressure and heat.'

অর্থাৎ সোজা কথায় হিরোশিমায় এই এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের ফল এমন সাংঘাতিক হইয়াছিল যে, কার্যতঃ সমস্ত জীবন্ত বস্তু—পশু ও মানুষ সকলেই অভূতপূর্ব উত্তাপ ও চাপের জন্য মারা পড়িয়াছিল। নিহত এবং আহত সকলেই এমনভাবে পুড়িয়া গিয়াছিল যে, তাদেরকে আর চেনা যাইত না। এই বোমার ফল বহু দূর বিস্তৃত হইয়াছিল। যারা ঘরের বাইরে ছিল, তারা দগ্ধ হইয়া মারা গেল, আর যারা ঘরের ভিতরে ছিল, তারা অবর্ণনীয় চাপ ও উত্তাপের জন্য মারা পড়িল।···

হিরোশিমা ও নাগাশাকি উভয় শহরেই পারমাণবিক বোমার আঘাতে জনজীবন ও কলকারখানা স্তব্ধ হইয়া গেল। মৃতদেহের অপসারণ একটি কঠিন সমস্যার মত দেখা দিল। কেননা, সমস্ত কিছুর মধ্যেই যেন একটা বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া গিয়াছিল। একমাত্র কংক্রিট এবং লৌহ ও ইস্পাতের তৈরী বাড়ীগুলির কাঠামো দাঁড়াইয়াছিল, আর সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। অনেক মৃতদেহ রাস্তায় পড়িয়াছিল এবং কোন কোন এলাকা যেন ভুতুড়ে ছায়ার আকার ধারণ করিয়াছিল। এ্যাটম্ বোমা রশ্মির প্রতিক্রিয়ায় এবং তেজস্ক্রিয়তার ফলে অজস্র লোক নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। রক্ত-পাইখানা, বমি, জ্বর, চুল উঠিয়া যাওয়া এবং দেহের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণের জন্য বহু

১। স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৬০২-৬০৩।

লোক ১ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছিল। আর-একটা ভয়াবহ প্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য। বিস্ফোরণের ফলে বহু নারীর গর্ভপাত হইয়াছিল এবং অকালে সন্তান প্রসূত হইয়াছিল। স্ত্রী-পুরুষের প্রজননক্ষমতাও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।[১]

*   *   *

কিন্তু ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপানকে পরাজিত করার জন্য সত্যই কি পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল? হিরোশিমার পর এই প্রশ্ন বিশেষভাবে বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাঁরা ট্রুম্যান ও চার্চিলের মত এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের মতে এই বোমা নিক্ষেপের দ্বারা কেবল কয়েক লক্ষ আমেরিকান জীবনই রক্ষা পায় নি, জাপানীদের জীবনও রক্ষা পাইয়াছে। কারণ, যুদ্ধ অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শেষ হইয়াছিল। কিন্তু সুবিখ্যাত মার্কিন গ্রন্থকার মিঃ ডি. ফ্লেমিং লিখিয়াছেন যে, 'পটসডাম সম্মেলন সম্পর্কে ৯ই আগস্ট প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, জাপানী সামরিক ঘাঁটি হিসাবে হিরোশিমার উপর পৃথিবীর প্রথম এ্যাটম্ বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জাপানকে সতর্ক ও সমঝাইয়া দেওয়ার জন্যই এই বোমা বর্ষিত হইয়াছিল। 'এর পরেও যদি জাপান আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে তার সামরিক কল-কারখানাগুলির উপর আরও বোমা বর্ষিত হইবে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তার ফলে হাজার হাজার অসামরিক লোক মারা যাইবে।'

প্রকৃতপক্ষে হিরোশিমা দক্ষিণ জাপানের সামরিক ঘাঁটি হইয়া থাকিলেও এবং পারমাণবিক আক্রমণের সময় সেখানে কয়েক হাজার সৈন্য থাকিয়া থাকিলেও সৈন্যদের উপর লক্ষ্য করিয়া কিন্তু বোমা বর্ষিত হয় নাই, নিহত হইয়াছিল অজস্র অ-সামরিক লোক এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখাইয়া জাপানকে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে বাধ্য করা। 'যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়া এবং হাজার হাজার মার্কিন যুবকের প্রাণ রক্ষা করাই' ট্রুম্যানের উদ্দেশ্য ছিল এই বোমা নিক্ষেপের পিছনে।

অবশ্য সেই সময়ে মার্কিন জনমতও এই বোমাবর্ষণ সমর্থন করিতেছিল। কারণ, জাপানীরা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক যেভাবে পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়াছিল এবং মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের উপর যে বর্বর ব্যবহার করিয়াছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যও মার্কিন জনমত উৎসুক ছিল।[২]

সোজা কথা আমেরিকার জনগণের একটা বিপুল অংশ তাড়াতাড়ি যুদ্ধের অবসান দাবি করিতেছিল। বিশেষতঃ ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন সৈন্য ও অফিসারবৃন্দ আবার "সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া" দূরবর্তী জাপানী রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য আদৌ উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন না। সুতরাং পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করিয়া যদি তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করা যায় তাতে জনমতের কোন আপত্তি ছিল না।

আর-একটা প্রশ্নও চিন্তা করার ছিল। এত অজস্র কোটি টাকা (মোট ২৫০ কোটি

১। স্যার জন হ্যামারটন সম্পাদিত দি সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ার, ৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯১৩।
২। দি কোল্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা, ২৯৬।

ডলার) ব্যয় করিয়া মানুষের ইতিহাসে যে ভয়ংকরতম অস্ত্র তৈয়ার করা হইল, রণক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা কতটুকু, সেটাও যাচাই করিয়া দেখার ইচ্ছা ছিল। কেননা, এত ব্যয়বহুল অস্ত্র নির্মাণের সার্থকতা সম্পর্কে জনমতের নিকট কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায়িত্বও ছিল সরকার পক্ষের। এখানে স্মরণীয় যে, বিজ্ঞানাচার্য আইনস্টাইনের কাছ থেকে সেই ঐতিহাসিক চিঠি (১৯৩৯ সালের ২রা আগস্ট) পাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে পরামর্শ না-করিয়াই এ্যাটম বোমা নির্মাণের ব্যয়বহুল বিরাট পরিকল্পনায় হাত দিয়াছিলেন। সুতরাং এত বছর পর এত মানুষের চেষ্টা, গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে যে বোমা প্রস্তুত হইল শত্রুর বিরুদ্ধে বাস্তবক্ষেত্রে তা কতখানি কাজে লাগিতে পারে, সেই পরীক্ষারও প্রয়োজন ছিল। এ্যাটম বোমা বর্ষণের এটাও ছিল অন্যতম কারণ।

তথাপি হিরোশিয়ার পর আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে পরমাণু বোমাবর্ষণ অপরিহার্য ছিল না। বিমান-বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক জেনারেল হেনরি আর্নল্ড বলিয়াছেন—'জাপানীরা বিমানপথের উপর কর্তৃক হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং তারা আর বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারিত না।' অনুরূপভাবে নৌবিভাগের বড় কর্তা ফ্লিট এ্যাডমিরাল উইলিয়াম হ্যালসি (Halsey) মন্তব্য করিয়াছেন—'এভাবে প্রথম পরমাণু বোমার পরীক্ষা অনাবশ্যক ছিল। এই বোমা নিক্ষেপ অত্যন্ত ভুল ছিল। যে অস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না, সেই অস্ত্র দুনিয়ার সামনে এভাবে জাহির করার কি দরকার ছিল?' কারণ, মার্কিন নৌ-সেনাপতির মতে জাপানী নৌবহর ইতিপূর্বেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই বোমা নির্মাণের জন্য তিনি বিজ্ঞানিকদের উপর দোষারোপ করেন। আর মার্কিন বিমান বিভাগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ "স্ট্রাটিজিক বম্বিং সার্ভে" এর রিপোর্টের উপসংহারে মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত তদন্ত এবং যে সমস্ত জাপানী নেতা এই সমস্ত ব্যাপারে জড়িত ছিলেন, তাঁদের মতামত গ্রহণের পর রিপোর্ট রচয়িতাগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে, ১৯৪৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বরের আগেই জাপান এ্যাটম বোমা ছাড়াই আত্মসমর্পণে বাধ্য হইত। এমন কি, এজন্য রাশিয়ারও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানে দরকার ছিল না। এবং আমেরিকার পক্ষ থেকে খাস জাপানী দ্বীপ আক্রমণের পরিকল্পনারও দরকার ছিল না।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ বায়ারনেস্ (Byrnes) বলিয়াছেন যে, এ্যাটম বোমার জন্য যুদ্ধ শেষ হয় নাই। আসলে এই বোমা যখন নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, জাপান সেই সময়ই পরাজিত হইয়াছিল এবং সন্ধি প্রার্থনা করিতেছিল।[১]

স্বয়ং চার্চিল যিনি এ্যাটম্ বোমার এত ভক্ত ছিলেন, তিনি পর্যন্ত তাঁর মহাযুদ্ধের স্মৃতিগ্রন্থে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, একমাত্র পারমাণবিক বোমার জন্যই জাপান পরাজয় স্বীকার করে নাই। আসলে জাপানের ভাগ্য আগেই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। বৃটেনের মত জাপান ছিল "দ্বীপবাসী শক্তি" (Island Power) সুতরাং নৌবহরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জাপানের সেই নৌশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।[২]

১। দি কোল্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা ২৯৭।
২। চার্চিল—৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৯।

আমেরিকার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সামরিক নেতা ও প্রেসিডেণ্টের প্রধান উপদেষ্টা এ্যাডমিরাল লেহাই (Leahy) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় পরমাণু বোমা বর্ষণের ঘটনাকে নিন্দা করিয়াছেন—'হিরোশিমা ও নাগাশাকির উপর এই বর্বর অস্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের প্রকৃত কোন সহায়তা হয় নাই। কারণ, জাপানের বিরুদ্ধে সমুদ্রপথের অবরোধ সৃষ্টি এবং গতানুগতিক বোমাবর্ষণের প্রচণ্ডতার দ্বারাই জাপান পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল এবং আত্মসমর্পণে উদ্যোগী হইয়াছিল।'

শীর্ষস্থানীয় মার্কিন সামরিক নেতৃবৃন্দ এবং স্বয়ং চার্চিলের যখন এই অভিমত, তখন এ্যাটম্ বোমা আদৌ বর্ষিত হইল কেন? ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট-এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়াছেন যে, বোমাবর্ষণের পিছনে দুইটি কারণের সন্ধান পাওয়া যায়—প্রথমতঃ ১৮ই জুলাই পটসডামে (যখন এ্যাটম্ বোমার সাফল্যজনক পরীক্ষার রিপোর্ট পেঁছিল) চার্চিল ট্রুম্যানকে বুঝাইয়াছিলেন যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের আর প্রয়োজন নাই। রুশ সাফল্যের উপর জাপানী যুদ্ধের অবসান আর নির্ভরশীল নয়। বিশেষতঃ পটসডাম সম্মেলনে স্ট্যালিন যেভাবে জাপানের দখলদারির অংশ চাহিতেছিলেন, তাতে আমেরিকা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিলেন। সুতরা এই বিব্রত অবস্থা ও রুশ সাহায্য এড়াইবার জন্য সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক মাঞ্চুরিয়াতে আক্রমণের আগেই এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের দ্বারা জাপানকে ধরাশায়ী করার সংকল্প হইয়াছিল।

আর দ্বিতীয় কারণ ছিল—এ্যাটম্ বোমা তৈয়ারির বিপুল অর্থব্যয়ের সার্থকতা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করা এবং সেই ইচ্ছা পারমাণবিক বিজ্ঞানীদেরও ছিল। অন্যথা জনমতের নিকট তাঁরা কি কৈফিয়ৎ দিতেন? এ জন্যই হিরোশিমা ও নাগাশাকির উপর এ্যাটম্ বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।[১]

মার্কিন ঐতিহাসিক ডি. এফ. ফ্লেমিং লিখিয়াছেন যে হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের পিছনে চারি প্রকারের কারণ ছিল:

ক. মার্কিন সৈন্যদের জীবন বাঁচাইবার স্বাভাবিক তাগিদ।

খ. মহাযুদ্ধের স্থায়িত্বকাল হ্রাস।

গ. রণক্ষেত্রে বোমার কার্যকারিতা প্রমাণ করা এবং

ঘ. সোভিয়েত রাশিয়াকে দূরপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ না দেওয়া।

এমন কি, বৃটেনের ও সামরিক মহলের কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকার বর্বর অস্ত্র কিংবা গণহত্যাকারী অস্ত্র প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। যেমন—বৃটিশ নৌবহরের এ্যাডমিরাল ভাইকাউন্ট ক্যানিংহাম ১৯৪৭ সালের ১৪ই মে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণের জন্য তিনি সর্বদাই দুঃখ বোধ করিয়াছেন। কারণ, ওই বোমা ছাড়াই জাপান আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু যে পারমাণবিক শক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা যাইত, তা' এভাবে অস্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহার করায় সেই কল্যাণের দিকটা চাপা পড়িয়া গেল।[২]

১। ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৯৭।

২। দি কোল্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা ৩০৬।

জাপানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের সংবাদে সোভিয়েত রাশিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল—যদিও এই সংবাদ প্রথমে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। সোভিয়েত থেকে প্রকাশিত (১৯৭০) একটি নূতনতম পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ফলে মোট ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার অসামরিক ব্যক্তি নিহত বা পঙ্গু হইয়াছিল এবং "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মহল এমন-এক অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা নাই। এটা কেবল নিরর্থক নিষ্ঠুরতাই ছিল না, ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন গবর্নমেন্টের রণনৈতিক সুবিধালাভের চেষ্টা। জাপানী লেখকেরা যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এ্যাটমিক বোমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অস্ত্র ছিল না, বরং ওটা ছিল পরবর্তীকালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম অস্ত্র।"[১]

১। Great Patriotic War of the Soviet Union, P. 415-16.

দশম পর্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাপানের বিরুদ্ধে রুশ আক্রমণ : রণনীতি ও কূটনীতির প্যাঁচ

১৯৩১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ আক্রমণ এবং তারপর দখল করিয়া নিল। সেই থেকে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িল, কার্যতঃ সেই যুদ্ধই কিন্তু জাপানের কাল হইয়া দাঁড়াইল। কারণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের উৎপত্তি সেই থেকে এবং ১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্ট রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে সেই ১৪ বছরের দখলীকৃত মাঞ্চুরিয়া জাপানের হাতছাড়া হইয়া গেল—জাপান চূড়ান্তরূপে পযুর্দস্ত ও পরাজিত হইল। অবশ্য তার আগেই জাপান আমেরিকার প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতে এবং হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমার বজ্রাঘাতে প্রায় ধরাশায়ী অবস্থায় পেঁাছিয়াছিল। কিন্তু জঙ্গীবাদ ও ফ্যাসিজমের পাল্লায় পড়িয়া জাপান যে "পাপ" করিয়াছিল, জার্মানীর মত অনুরূপভাবেই তাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া জাপানী সামরিক নেতারা চীন ও সোভিয়েত সীমান্তে দীর্ঘকাল যাবত হামলা করিতেছিলেন এবং পার্ল হারবারের (ডিসেম্বর ১৯৪১) পর যে বিশাল সাম্রাজ্য তাঁরা গ্রাস করিয়াছিলেন, সেই সাম্রাজ্য হজম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, সেই শক্তি ও সম্পদ তাঁদের ছিল না। অথচ নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট ইতালীর মিত্ররূপে জাপান যেমন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল, তেমিন সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর (এপ্রিল ১৯৪১) সত্ত্বেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীকে সহায়তা করিয়া আসিতেছিল (যদিও হিটলার কর্তৃক রাশিয়াকে আক্রমণের পর জাপান সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হাতে-কলমে কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই, তবু সেটা তার কোন "সুবিবেচনা" বা তথাকথিত নিরপেক্ষতার কারণ সঞ্জাত ছিল না। আসলে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোর যুদ্ধে এবং ১৯৪২ সালের স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জাপান হিটলারের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সেটা যখন ঘটিল না, বরং হিটলারী বাহিনীর পরাজয় ঘটিতে লাগিল, তখন সোভিয়েত রাশিয়ার মত বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে জাপান ঝাঁপাইয়া পড়িতে সাহস পাইল না—যদিও এই প্রসঙ্গ নিয়া জাপানী নেতাদের মধ্যে অনেক বার শলাপরার্শ হইয়াছিল।

তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রুশ-জার্মান যুদ্ধে জাপান হিটলারকে অন্ততঃ পরোক্ষভাবে যে সাহায্য দিয়া আসিয়াছে, তার গুরুত্ব কম নয়। কারণ, মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের ১০ লক্ষ সৈন্য নিয়া গঠিত শক্তিশালী কোয়াণ্টাং বাহিনীর (মাঞ্চুরিয়ার কোয়াণ্টাং উপদ্বীপের নামানুসারে) জন্য রাশিয়াকে সর্বদাই সশঙ্ক থাকিতে এবং ৪০ ডিভিসন সৈন্য সতর্ক পাহারায় রাখিতে হইয়াছিল। যদিও মস্কো

এবং স্ট্যালিনগ্রাদের নিদারুণ সংকটময় যুদ্ধে দূর-প্রাচ্যের এই সমস্ত বাহিনী থেকে রাশিয়াকে কয়েক ডিভিসন দুর্দান্ত সাইবেরিয়ান সৈন্য আমদানি করিতে হইয়াছিল, তথাপি সেটা ছিল জরুরী অবস্থায় বিপদের ঝুঁকি গ্রহণের মত। কিন্তু জাপান সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বদাই একটা অস্বস্তিকর কিংবা ভয়ের মনোভাব ছিল। কেননা, সোভিয়েত নেতারা জাপানকে বিশ্বাস করিতেন না এবং জাপানের জঙ্গীবাদী নেতারাও সোভিয়েত কমিউনিস্ট নেতাদের বিদ্বেষ ও সন্দেহের চোখেই দেখিতেন। সুতরাং দুইপক্ষ থেকেই একটা সংঘাতের মনোভাব ছিল এবং সমগ্র পরিস্থিতির উপর বাধ্য হইয়াই সোভিয়েত নেতাদের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আর্মি জেনারেল এস. এস. স্তেমেংকো (Shtemenko) লিখিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের সংকটের দিনগুলিতে দূর-প্রাচ্যের জেনারেল স্টাফদের জন্য ডেপুটি চীফের পদ সৃষ্টি করিতে হইল এবং সমর বিভাগের রণক্রিয়া দপ্তরে একটি ফার্ ইস্টার্ন সেক্টর খুলিতে হইল এবং মেজর-জেনারেল এফ. আই. শেভচেংকোর মত একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ সেনাপতিকে তার ভার দিতে হইল।

কিন্তু মহাযুদ্ধের আগেই ১৯৩৮ সালে দূর-প্রাচ্যের এবং ১৯৪১ সালে ট্রান্স বৈকাল মিলিটারি ডিস্ট্রীক্ট দুইটির পুনর্গঠন করিতে হইয়াছিল। ১৯৪৩ সালের দ্বিতীয় অর্ধের পর যখন সোভিয়েত জার্মান রণাঙ্গন সোভিয়েতের অনুকূলে যাইতে লাগিল, তখন মিত্রপক্ষের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, জার্মানীর পতনের পর জাপানেরও পতন অনিবার্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং পশ্চিমী মিত্রেরা রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে দলে টানিতে চাহিলেন। কিন্তু তেহরান সম্মেলনে (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৪৩) তিন বিশ্বনেতার বৈঠকে যখন ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল, একমাত্র তখনই স্ট্যালিন নীতিগতভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে জঙ্গীবাদী জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন। অবশ্য এই অস্ত্র ধারণ করা হইবে হিটলারী জার্মানীর পরাজয়ের পর।

* * *

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে যখন সত্য সত্যই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইল, তখন জাপান নিয়া রাশিয়ার উপর আর-একবার চাপ দেওয়া হইল। কিন্তু স্ট্যালিন জবাব দিলেন যে, জার্মান পরাজয়ের আগে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত সুপ্রীম কমান্ডের পক্ষে থেকে দূর-প্রাচ্যের সৈন্যদের সমাবেশ এবং সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য খোদ সদর দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হইল। কারণ, স্ট্যালিন ইঙ্গিত দিলেন যে, শীঘ্রই এটার দরকার হইতে পারে।

এই সময় অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একদিন চার্চিল ও ইডেন মস্কোতে আসিয়া হাজির হইলেন।

জেনারেল স্তেমেংকো লিখিয়াছেন যে, সদর দপ্তরে তিনি ও জেনারেল আন্তোনোভ (জেনারেল স্টাফের বড়কর্তা) যথারীতি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করিতে গিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি প্রথম বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়াছিলেন। অবশ্য সদর দপ্তরে তাঁদের পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদেরকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে, পাশের ঘরে

চার্চিল স্ট্যালিনের সঙ্গে কথা বলিতেছেন এবং সুপ্রীম কমাণ্ডার নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁরা যেন আসিবামাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

এই নির্দেশ অনুসারে স্তেমেংকো এবং আস্তোনোভ পাশের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, চার্চিল ও স্ট্যালিন পরস্পরের মুখোমুখি আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন এবং 'ভয়ানকভাবে ধোঁয়া ছাড়িতেছেন।' অর্থাৎ চার্চিল একটা মোটা চুরুট এবং স্ট্যালিন যথারীতি তাঁর পাইপ টানিতেছিলেন। আর দোভাষী প্যাভলোভ তাঁর ডেস্কে বসিয়া আছেন।

স্তেমোংক এবং আস্তোনোভকে স্ট্যালিন চার্চিলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। চার্চিল তখন রণাঙ্গনের অবস্থা জানিতে চাহিলেন এবং জেনারেল আস্তানোভ সংক্ষেপে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত রণক্ষেত্রের অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। চার্চিল তখন টেবিলের উপর পাতা মানচিত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া খুব মন দিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলেন এবং একটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—'আইজেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে জার্মানরা কত সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে ?'

আস্তোনোভ সেই সংখ্যা বলিলেন। এরপর তাঁদের দুজনকে সেই কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁরা দুইজনেই পাশেই কক্ষে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন চার্চিলের বিদায় নেওয়ার আশায়। কেননা, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলে সুপ্রীম কমাণ্ডারের স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল।

মিনিট কুড়ি পর চার্চিল চলিয়া গেলেন। স্ট্যালিন তখন একজন অফিসারকে ডাকিয়া বলিলেন—

'চার্চিল যে সমস্ত হুইস্কি ও সিগার আমাকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন, সেগুলি সামরিক লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দাও।'

তারপর আস্তোনোভ ও স্তেমেংকোর দিকে তাকাইয়া স্ট্যালিন মন্তব্য করিলেন— 'আপনারা খেয়ে দেখবেন কিন্তু, আমার বিশ্বাস জিনিসগুলি খুব ভালো'।

বলা বাহুল্য যে, স্ট্যালিনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে চার্চিল তাঁর সঙ্গে জাপানী যুদ্ধের বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন।

* * *

জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার আক্রমণ যে অনিবার্য তার প্রথম আভাস পাওয়া গেল ৫ই এপ্রিল ১৯৪৫, যখন সোভিয়েত গবর্নমেণ্ট রুশ-জার্মান নিরপেক্ষতার চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটোভ জাপানী গবর্নমেণ্টকে জানাইয়া দিলেন যে, ১৯৪১, সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরিস্থিতির 'আমূল পরিবর্তন' ঘটিয়া গিয়াছে, জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে এবং জাপান জার্মানীকে সহায়তা করিয়াছে। অধিকন্তু জাপান যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে সেই বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র। 'সুতরাং স্বাক্ষরিত চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চুক্তির মেয়াদ ফুরাইবার এক বছর আগে চুক্তি বাতিল করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার যে নিয়ম আছে, সেই অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৫ তারিখ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দিতেছে।'

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কার্য আইনের দিক থেকে সঠিক ছিল না। কারণ আইন অনুযায়ী ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৬ পর্যন্ত এই চুক্তির মেয়াদ ছিল। সুতরাং

আগস্ট মাসে (১৯৪৫) রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ কার্যত চুক্তিভঙ্গের তুলা ছিল।[১]

কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ারও অনেক নালিশ জমিয়া উঠিয়াছিল। হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর মস্কোস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূত জার্মানীকে অনেক মূল্যবান সংবাদ সরবরাহ করিয়াছেন। দূর-প্রাচ্যে অনেক রুশ সৈন্য তো সতর্কতাস্বরূপ রাখিতেই হইয়াছিল, অধিকন্তু "১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে ১৯৪৪ সালের শেষ পর্যন্ত জাপানী সশস্ত্র বাহিনী বে-আইনীভাবে ১৭৮টি সোভিয়েত পণ্যবাহী জাহাজ আটক করিয়াছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের দূর-প্রাচ্যের সীমায় জাপানীরা ক্রমাগত উস্কানি দিয়াছে এবং ৩৯ বার সোভিয়েত ভূমির উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছে।"[২]

স্ট্যালিনগ্রাদ পর্যন্ত রাশিয়ার প্রতি জাপানের আসল মনোভাব কি ছিল তা জানা রাশিয়ার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত টোকিওতে সোভিয়েত রাশিয়ার একজন অত্যন্ত দক্ষ গোয়েন্দা ছিল—নাম রিচার্ড সোর্জ। ইনি নিজেই ছিলেন একজন জার্মান সাংবাদিক এবং টোকিওস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব (প্রথম খণ্ডে এঁর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে)। এই গোয়েন্দার মৃত্যুদণ্ডের পর ১৯৪৩, ও ১৯৪৪ সালে রুশ-জাপান সম্পর্ক মোটামুটি "ঠাণ্ডা" ছিল। কিন্তু জার্মানীর পরাজয়ের পর ইয়াল্টা চুক্তি অনুসারে রাশিয়া আগস্ট মাসে (১৯৪৫) মাঞ্চুরিয়াতে জাপানকে আআক্রমণে উদ্যত হইল।...

এদিকে জাপান কিন্তু রাশিয়ার মারফৎ মিত্রশক্তির সঙ্গে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য বিষম চেষ্টা করিতে লাগিল—সে কথা আগেই (পটসডাম সম্মেলন উপলক্ষে) উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, জাপানের অবস্থা কাহিল হইয়া উঠিতেছিল। আমেরিকান ঐতিহাসিক হার্বার্ট ফীজ লিখিয়াছেন যে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো মস্কোস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূত স্যাটোকে বারবার তাগিদ দিতেছিলেন মলোটোভের সঙ্গে দেখা করিয়া আলোচনা আরম্ভ করার জন্য। কারণ, 'যুদ্ধের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন এবং আর কয়েক দিনের মধ্যেই এই যুদ্ধ শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে, হাতে আর সময় নাই।'

'Since the loss of one day relative to this present matter may result in a thousand years of regret, it is requested that you immediately have a talk with Molotov.'

অর্থাৎ 'বর্তমান বিষয়টি এমন জরুরী যে, এই সম্পর্কে মাত্র একটি দিন নষ্ট হইলেও হাজার বছর ধরিয়া দুঃখ করিতে হইতে পারে। সুতরাং অবিলম্বে মলোটোভের সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে।'

মিঃ ফিজ এই ঘটনার উপর মন্তব্য করিতেছেন:

'Poor Sato ! Stalin and Molotov were just starting back from Potsdam, and they traveled by train and did reach Moscow until the plane carring the bomb had left Titian.'[৩]

অর্থাৎ মন্দভাগ্য স্যাটো! টগোর বার্তা নিয়া তাঁর আর আলোচনার সুযোগ হইল না। কারণ,পটসডাম থেকে স্ট্যালিন ও মলোটোভ যখন ট্রেনে করিয়া মস্কোর দিকে রওনা হইলেন, তখন মস্কোতে তাঁদের পৌঁছিবার আগেই মার্কিন প্লেন টিনিয়ান দ্বীপ (গুয়ামের অদূরবর্তী) থেকে এ্যাটম বোমা হিরোশিমার দিকে রওনা হইয়া গেল!…

৬ই আগস্ট, ১৯৪৫, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করিলেন যে, হিরোশিমার উপর এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

এই ঘোষণার দুই দিন পর ৭-৮ই আগস্ট অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে মলোটোভ জাপানী রাষ্ট্রদূতে স্যাটোকে ডাকিয়া আনিয়া সোভিয়েত সরকার কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা জানাইয়া দিলেন।

৯ই আগস্ট থেকে সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলিয়া ঘোষিত হইল এবং ৮ই আগস্ট রাত্রে মলোটোভ এক প্রেস কনফারেন্সে অত্যন্ত গম্ভীর ও শুষ্ক-মুখে সে কথা জানাইয়া দিলেন। কিন্তু হিরোশিমায় এ্যাটম বোমা বর্ষণের কথা একবারও উল্লেখও করিলেন না এবং রুশ সংবাদপত্রেও সেই বোমার কথা প্রাধান্য পাইল না। কিন্তু যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়া এবং অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হইতে লাগিল মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ।

জেনারেল ইয়ামাদার অধীন মাঞ্চুরিয়ায় কোয়াণ্টং আর্মি ১০ লক্ষ সৈন্য নিয়া গঠিত ছিল এবং এরা জাপানের উৎকৃষ্টতম স্থলসৈন্যরূপে পরিচিত ছিল। মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১ ডিভিসন এবং এদের অস্ত্রসজ্জা ছিল ১,১৫৫টি ট্যাংক, ৫,৬৩০ কামান এবং ১৮০০ বিমান। মাঞ্চুকোও এবং অন্তর্মঙ্গোলিয়ার সৈন্যের সংখ্যা ৩ লক্ষ হইলেও এদের অস্ত্রসজ্জা অত্যন্ত খারাপ ছিল। রুশ জেনারেল স্তেমেংকোর মতে এদের কোন রণ দক্ষতাও ছিল না।

অপর পক্ষে দূর-প্রাচ্যে আগে থেকেই যে সোভিয়েত বাহিনী ছিল, তাদের সঙ্গে মে-জুলাই মাসে, ১৯৪৫, আরও নূতন নূতন সৈন্যদল যুক্ত হইল এবং পরিকল্পনা করা হইল পশ্চিমে মঙ্গোলিয়া ও পূর্বদিকে ভ্লাডিভোস্টোকের সমুদ্র উপকুলের এলাকা থেকে একযোগে সাঁড়াশির চাপের আকারে প্রচণ্ড দুইটি আঘাত হানা হইবে মাঞ্চুরিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কোয়াণ্টাং বাহিনীর বিরুদ্ধে।

বলা বাহুল্য যে, সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রসজ্জায় সোভিয়েত বাহিনী জাপানের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল এবং যে তিনটি প্রধান রণক্ষেত্র বা ফ্রণ্টের সৃষ্টি হইল, তাতে ২টি ট্যাংক ডিভিসনসহ মোট ৮০ ডিভিসন সোভিয়েত সৈন্যের সমাবেশ ঘটিল। অর্থাৎ সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াইল ১৫ লক্ষেরও বেশী, আর ফিল্ডগান ও মর্টার শ্রেণীর কামান ২৬ হাজারেরও বেশী, ট্যাঙ্কের সংখ্যা ৫ হাজার ৫ শতের বেশী এবং ৩,৮০০ রণবিমান। ফলে, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী মাঞ্চুরিয়ায় জাপবাহিনীর তুলনায় সৈন্য অস্ত্র সর্বদিক দিয়াই অনেক বেশী শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ ছিল।[১]

মার্শাল ম্যালিনোভস্কি, মার্শাল মেরেৎসকোভ, মার্শাল ভ্যাসিলাইভস্কি (প্রধান সেনাপতি) এবং জেনারেল পুরকায়েভ—এই কয়জন রণদক্ষ সোভিয়েত সেনাপতি মাঞ্চুরিয়াতে জাপবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার দায়িত্ব পাইলেন।

১। গ্রেট প্যাট্রিওটিক্ ওয়ার অব দি সোভিয়েত ইউনিয়ন, মস্কো, পৃষ্ঠা ৪১৮।

তিনটি প্রধান আক্রমণ একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হইল গোড়াতে সবই মাঞ্চুরিয়ার হারবিন অভিমুখে এই তিনটি রণক্ষেত্র ছিল :

ক. মার্শাল মেরেৎসকোভের অধীন প্রথম ফার্ ইস্টার্ন আর্মি—ভ্লাডিভোস্টক বন্দরের উত্তর অঞ্চল থেকে।

খ দ্বিতীয় ফার্ ইস্টার্ন আর্মি জেনারেল পুরকায়েভের অধীন আমুর নদী পার হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম সুঙ্গারি উপত্যকায়।

গ. ট্রান্স-বৈকাল আর্মি ম্যালিনোভস্কির অধীন—মাঞ্চুরিয়া থেকে পূর্বদিকে চীনা ইস্টার্ন রেলপথ বরাবর।

এই সমস্ত প্রধান আক্রমণ ছাড়া অন্যান্য উপ-রণক্ষেত্রও ছিল। আর এই সমস্ত রুশ সেনাপতির ছিল 'সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে যুদ্ধের প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা ও অপূর্ব দক্ষতা। কিন্তু কোয়াণ্টাং আর্মিও শক্তিশালী ছিল এবং কয়েক বছর ধরিয়া তারা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা পাকা করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছিল। এছাড়া প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাও জাপানী বাহিনীর সহায়ক ছিল।

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও সোভিয়েত বাহিনীর অভিযানের মুখে কোয়াণ্টাং বাহিনী বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারিল না। ইংরাজ সামরিক সম্পাদক মেজর জেনারেল স্যার চার্লস গাইন (Charles Gwyun) মন্তব্য করিয়াছেন যে, জাপানী সৈন্যদিগকে পরাজিত করা একেবারে জলভাতের মত সহজ ছিল না এবং জাপানীদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা উত্তম ছিল। তথাপি—

'Nevertheless the conduct of the campaign afforded another striking demonastration of Russian military efficiency. The transfer of troops from west to east and the completion of preparation for an offensive on a great scale in the time available after the collapse of Germany were in themselves remarkable feats. The strategic plan of campaign was admirably suited to the circumstances and its tactical execution showed how thoroughly the lessons of the German war had been absorded'.

অর্থাৎ 'এই সমস্ত বিঘ্ন সত্ত্বেও এই অভিযান আর-একবার রুশ সামরিক ক্ষমতার চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে এত সৈন্যের স্থানান্তরিতকরণ এবং জার্মানীর পতনের মাত্র এত কম সময়ের মধ্যে এমন প্রকাণ্ড আকারে আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পূর্ণকরণ, একমাত্র এই ঘটনাগুলিই খুব চমকপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইবে। অবস্থা অনুযায়ী এই অভিযানের রণনৈতিক পরিকল্পনা খুব চমৎকাররূপে উপযোগী ছিল এবং কার্যক্ষেত্রে এর রণকৌশলগত প্রয়োগ প্রমাণ করিতেছে যে, সোভিয়েত বাহিনী কিরূপ পরিপূর্ণতার সঙ্গে জার্মান যুদ্ধের শিক্ষা করায়ত্ত করিয়াছেন।'

মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আক্রমণের দক্ষতা সম্পর্কে বৃটিশ সমর ঐতিহাসিকের এই মন্তব্য নিশ্চয়ই স্মরণযোগ্য।

সুতরাং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জাপানের কোয়াণ্টাং বাহিনী চূর্ণ হইয়া গেল।

রুশ সৈন্যেরা উত্তর কোরিয়াতেও ঢুকিয়া পড়িল। দক্ষিণ শাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপ দখলের জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় রুশ নৌবহর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষিতু হওয়ার পরেও জাপানী বাহিনীর মধ্যে এমন কতকগুলি উগ্র দেশপ্রেমিক ইউনিট ছিল যারা অনেকদিন পর্যন্ত রুশ-সৈন্যদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল।

মাঞ্চুরিয়াতে এবং বিশেষভাবে পোর্ট ডাইরেন ও পোর্ট আর্থার—এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দখলের জন্য সোভিয়েত কমাণ্ড বিমানবাহিত সৈন্যদল নামাইয়া দিয়াছিল। কারণ, তাঁদের আশংকা ছিল যে, মার্কিন সৈন্যেরা রুশদের আগেই সেখানে অবতরণ এবং বন্দর দুইটি দখল করিয়া নিতে পারে। অবশ্য ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের পালাও শুরু হইয়াছিল এবং যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়ার জন্য জাপ সম্রাটের আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার জাপানী সৈন্য বন্দী হইল (২০ হাজার আহত সহ)। ধৃত বন্দীদের মধ্যে ছিলেন ১৪৮ জন সেনাপতি। ৮০ হাজার জাপানী নিহত হইয়াছিল। সেই তুলনায় রাশিয়ার ক্ষতি হইয়াছিল নিতান্তই সামান্য—মাত্র ৮ হাজার নিহত ও ২২ হাজার আহত হইয়াছিল।

জাপানের সঙ্গে এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে ১৪ই আগস্ট চিয়াং কাই-সেকের চীনের সঙ্গে ৩০ বছরের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই চুক্তির স্বাক্ষরে চীনের পক্ষ থেকে (মার্কিন প্ররোচনায়) স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা হইয়াছিল। আর ২২শে আগস্ট স্ট্যালিন কোয়াণ্টাং আর্মির আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করিলেন।

* * *

কিন্তু মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার শেষ মুহূর্তের এই আক্রমণ পশ্চিমী সামরিক ইতিহাসে ও মিত্রপক্ষীয় সোভিয়েত-বিরোধী মহলে গভীর বিতর্ক, বিদ্রূপ ও সমালোচনার উদ্রেক করিয়াছে। কারণ, এই যুদ্ধের পটভূমিকায় উভয়পক্ষের অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনৈতিক চাল ও চক্রান্ত ছিল। ১৬ই জুলাই পারমাণবিক বোমার সাফল্যজনক পরীক্ষার পর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্শদাতারা এবং বৃটেনে চার্চিলের সমর্থকগণ পটসডাম সম্মেলন থেকেই সোভিয়েত বিরোধিতা শুরু করিয়াছিলেন। পোল্যাণ্ড, পূর্ব ইউরোপে ও বলকানে তাঁরা সোভিয়েত নীতিকে সম্প্রসারণবাদরূপে চিহ্নিত করিয়া ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করিতেছিলেন। সুতরাং জাপানে, সুদূর-প্রাচ্যে বা চীনে কিংবা মাঞ্চুরিয়ায় যাতে সোভিয়েত রাশিয়া আর কোন সম্প্রসারণ ঘটাতে না পারে, সেজন্য তাঁরা সতর্ক হইলেন এবং রাশিয়াকে আর "আসকরা" না-দিতে সংকল্পবদ্ধ হইলেন। এজন্যই দেখা যায় যে, ২৬শে জুলাই পটসডাম সম্মেলন থেকে যখন বৃটিশ-মার্কিন-চীনা চরমপত্রে জাপানকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানানো হইল, তখন রুশপক্ষ অনুরোধ জানাইলেন ওই চরমপত্রের প্রকাশ আরও দুই দিনের জন্য স্থগিত রাখিতে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ জবাব দিলেন যে, সেই পত্র ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে!

আসলে পারমাণবিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার ফলেই ট্রুম্যান স্ট্যালিনকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই জাপানের বিরুদ্ধে চরমপত্র ছাড়িয়াছিলেন। অনুরূপভাবে ২৯শে জুলাই

মলোটোভ যখন ট্রুম্যানকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য "নিয়মমাফিক অনুরোধ" জানানো হোক, তখন ট্রুম্যান নানা ছুতায় সেটা এড়াইয়া গেলেন। এই সম্পর্কে মস্কোস্থিত মার্কিন মিলিটারি মিশনের বড়কর্তা জেনারেল ডীন্ (Deane) মন্তব্য করিয়াছেন—

'জাপানী যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যোগদান আর অত্যাবশ্যক ছিল না। সুতরাং রাশিয়ার প্রতি কর্কশ ও উদাসীন হওয়ার মত অবস্থায় আমরা পেঁছিয়াছিলাম।'

এই সময় মার্কিন রাষ্ট্রনেতা ও সামরিক নেতারা রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সম্ভাবনার কথা নিয়াই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন না, পাছে জাপানের আত্মসমর্পণের আগেই লালফৌজ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া বসে, এই দুর্ভাবনায়ও ব্যাকুল ছিলেন। ২৮শে জুলাই নৌ-সচিব ফরেস্টাল (Forrestal) পররাষ্ট্র-সচিব বার্নসের (Byrnes) সঙ্গে এই সমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বার্নস বলিয়াছিলেন যে, মাঞ্চুরিয়াতে, বিশেষভাবে ডাইরেন ও পোর্ট আর্থার বন্দরে রুশদের ঢুকিয়া পড়ার আগেই জাপানের যুদ্ধটা মিটাইয়া ফেলিতে হইবে। কারণ, 'একেবার রাশিয়ানরা সেখানে ঢুকিলে আর তাদেরকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে না।' বার্নসের পরবর্তীকালের বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে, ট্রুম্যান এই আশংকাতেই স্ট্যালিনকে এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের কথা জানান নাই। কারণ, সে কথা জানিলে স্ট্যালিন হয়তো আগেই মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া বসিতেন।

এমন কি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টি. ভি. সুং (পরে প্রধানমন্ত্রী) এবং স্ট্যালিনের মধ্যে যাতে পটসডাম সম্মেলনের আগে ও পরে দ্রুত কোন সাক্ষাৎ এবং বহিঃ-মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ও ডাইরেন বন্দর ইত্যাদি নিয়া কোন চুক্তি দ্রুত নিষ্পন্ন না হয়, কার্যতঃ ট্রুম্যান কালহরণের তেমন কৌশলও অবলম্বন করিয়াছিলেন।[৩]

এই কৌশলের কথা পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বার্নসও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, স্ট্যালিন ও চিয়াং কাইসেকের মধ্যে আলোচনা যত দীর্ঘ ও বিলম্বিত হয়, ততই মঙ্গল। কেননা, সেই অবস্থায় মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানে আরও বিলম্ব ঘটিবে এবং তার আগেই হয়তো জাপান আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিতে পারে। সুতরাং দেখা গেল রাশিয়া ও চীনের মধ্যে আলোচনা পটসডাম সম্মেলনের আগে ১৪ দিন (৩০শে জুন থেকে ১৪ই জুলাই) এবং পরে আর এক সপ্তাহ—৭ই আগস্ট থেকে ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এর পিছনে ওয়াশিংটনের ইঙ্গিত ছিল চিয়াং কাইসেকের প্রতি।[৪]

একথা সত্য যে, ইয়াল্টা চুক্তি অনুসারের বহিঃমঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ার বন্দর ও রেলপথ ইত্যাদি সম্পর্কে স্ট্যালিনের দাবিগুলি রুজভেল্ট মানিয়া লইলেও এইগুলি সম্পর্কে চিয়াং কাইসেকের সম্মতির দরকার হইবে এবং রুজভেল্ট সেই সম্মতি আদায় করিয়া দিবেন এমন কথাও চুক্তিতে ছিল। স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছিল ঃ

'The Heads of three Great Powers have agreed that these claims

১। এ্যাটোমিক ডিপ্লোমাসি ঃ হিরোসীমা এ্যাণ্ড পটসডাম, পৃষ্ঠা ১৮২
২। ঐ পৃষ্ঠা ১৮৩।
৩। ঐ পৃষ্ঠা ১৮৪।
৪। আলেকজাণ্ডার ভার্থ, পৃষ্ঠা ৯২৩।

of the Soviet Union shall be unquestionably fulfilled after Japan has been defeated.

অর্থাৎ জাপানের পরাজয়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সমস্ত দাবি নিঃসন্দেহেই পূর্ণ করা হইবে। এই সম্পর্কে তিনটি বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রপধানগণ একমত হইয়াছিলেন।[১]

তিন প্রধানের মধ্যে এই স্বাক্ষরিত চুক্তি সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বন্ধুতা ও মৈত্রীর চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব হইতে লাগিল এবং হিরোশিমায় বোমাবর্ষণের পর রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আগে সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাশিয়াকে এড়াইবার জন্য মার্কিন কূটনীতি দস্তুরমত প্যাঁচ কষিতেছিল এবং রাশিয়াও তেমন সন্দেহ করিতেছিল বলিয়াই এ্যাটম্ বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই দিন পরেই মাঞ্চুরিয়াতে আক্রমণ করিল। চিয়াং কাই-সেকও কিন্তু মার্কিন কূটনীতির এই প্যাঁচ ধরিয়া রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি নস্যাৎ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিলেন। কিন্তু রুজভেল্ট ও চার্চিলের মত দুই বিশ্বনেতা যখন ইয়াল্টাতে স্ট্যালিনের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছেন, তখন চিয়াং কাইসেক আর চুক্তি-ভঙ্গ করিতে সাহস পাইলেন না। বিশেষতঃ ততক্ষণে বিশাল সোভিয়েত বাহিনী মাঞ্চুরিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল।···

ট্রুম্যানের কূটনীতি সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে পটসডাম সম্মেলনের শেষের দিকে জাপানের সম্রাট যখন প্রিন্স কোনেয়েকে মস্কোতে শান্তি আলোচনার জন্য পাঠাইবার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করিলেন, তখন ট্রুম্যান স্ট্যালিনকে সোজাসুজি পরামর্শ দিলেন সেই শান্তি প্রস্তাব উপেক্ষা করার জন্য।

কিন্তু পটসডাম থেকে প্রচারিত চরমপত্র জাপান "অগ্রাহ্য করিয়াছে"—জাপানী বার্তায় এই অনুবাদও স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি কিংবা বিভ্রান্তিকর বলিয়া মনে হইকে পারে। অথচ জাপানী কর্তৃপক্ষ এই অগ্রাহ্য করার কথা অস্বীকার করেন না। কেননা, জাপানী শব্দ 'makusatsu'-এর অর্থ "অগ্রাহ্য করা" নয়, জাপানী ভাষায় এর আসল অর্থ হইল—বর্তমানে এই বিষয়ে "কোনো মন্তব্য না করা"। কিন্তু চরমপত্র অগ্রাহ্য করা হইয়াছে—মার্কিন পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কিংবা দৈবাৎ এই ছুতা দেখাইয়া হিরোশিমার উপর তাড়াতাড়ি বোমাবর্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হইল।[২]

একদিকে দূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার উপর একহাত লওয়ার জন্য ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্শদাতারা যেমন জাপানের শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য এবং হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়াও তেমনি মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের আগেই জাপান যাতে আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া না বসে তার জন্যও কম ব্যস্ত ছিলেন না। কেবল তাই নয়, এই কূটনীতি এমন বিশ্রী ধরনের ছিল যে, সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভাষার মধ্যে "মিথ্যা"র অবতারণা ছিল। একথা লিখিয়াছেন "দি কোল্ড ওয়ার" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা উদারতাবাদী ঐতিহাসিক মিঃ ডি. এফ. ফ্লেমিং।

১। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৯২০।
২। এ্যাটোমিক ডিপ্লোমাসি, পৃষ্ঠা ১৮৫ এবং আলেকজান্ডার ভার্থের পুস্তকে জার্মান লেখকের উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠে ৯২৪।

'দুই দিন পর (বোমাবর্ষণের) সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন যে, যেহেতু জাপান আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে এবং মিত্রপক্ষ সোভিয়েত সরকারের নিকট এক প্রস্তাব দাখিল করিয়া জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং যেহেতু এর দ্বারা যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল হ্রাস পাইবে, প্রাণহানির সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং বিশ্বব্যাপী দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা করা হইবে, সেজন্য সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মিত্রপক্ষের প্রতি মিত্রজনোচিত দায়িত্ব পালনের জন্যই সোভিয়েত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং ২৬শে জুলাইয়ের ঘোষণায় যোগ দিয়াছেন।'[১]

জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার এই ভাষার মধ্যে কারচুপি ও গোঁজামিল ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু মূলতঃ একথা সত্য যে ইয়াল্টা চুক্তি অনুসারে স্ট্যালিন রুজভেল্ট-চার্চিলের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, জার্মানীর পরাজয়ের তিন মাসের মধ্যেই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। সোভিয়েত পক্ষের দাবি এই যে, ৮ই আগস্ট যুদ্ধে যোগদান করিয়া সোভিয়েত রাশিয়া মিত্রশক্তির প্রতি তাঁদের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিয়াছেন।

কিন্তু মহাযুদ্ধের উপসংহারের শেষের দিকের এই সমস্ত ঘটনাবলী অত্যন্ত জটিল। কেননা, ইয়াল্টা চুক্তি, এ্যাটম বোমা ও জাপানের আত্মসমর্পণ—এই সমস্ত ব্যাপারগুলি যেন প্রত্যেকের জাতীয় স্বার্থের ও পরিস্থিতির সঙ্গে জট পাকাইয়া গিয়াছিল। আমেরিকা কর্তৃক এ্যাটম বোমা নির্মাণের আগে পর্যন্ত ইয়াল্টা চুক্তির যে মূল্য বা প্রয়োজন ছিল, সেই মূল্য পরে আর রহিল না। বিশেষতঃ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং চার্চিলের অন্তরঙ্গমহল অত্যন্ত সোভিয়েত-বিরোধী ছিলেন। সুতরাং পারমাণবিক শক্তি করায়ত্ত করার পর তাঁরা স্ট্যালিনের রাশিয়াকে এড়াইয়া জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতে চাহিলেন। তাঁরা অনুভব করিলেন যে পারমাণবিক বোমার ব্রহ্মাস্ত্র করায়ত্ত করার পর পৃথিবীর সামরিক ভারশক্তির পাল্লা তাঁদের দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁরা আর সোভিয়েতের কোন দাবি মানিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক নহেন। জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানও আর তাঁরা চাহিলেন না। অপর পক্ষে স্ট্যালিন ইয়াল্টা চুক্তির সুযোগ নিয়া ১৯০৪-৫ সালের রুশ জাপান যুদ্ধে জারের বা ইম্পিরীয়েল রাশিয়ার পরাজয়ের "প্রতিশোধ" নিতে ও হৃতরাজ্য ও দ্বীপগুলি (কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ শাখালিন) পুনরুদ্ধার করিতে চাহিলেন। এছাড়া মুকডেন ও ডাইরেন বন্দর, মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ইত্যাদির প্রশ্ন তো ছিলই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চিয়াং কাইসেক যদিও উত্তর চীন ও মাঞ্চুরিয়া সংক্রান্ত ইয়াল্টা চুক্তিতে আপত্তি জানান নাই, কারণ গত ৪০ বছর ধরিয়া এই অঞ্চলে তাঁর কোন পাত্তাই ছিল না, তথাপি মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ইয়াল্টা চুক্তির এই অংশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। কেননা, এখানে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সৈন্যেরা জাপানের বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। মাও সে-তুংয়ের আরও আপত্তির কারণ এই ছিল যে, মার্কিন জেনারেল প্যাট্রিক হার্লি কর্তৃক চীনা জাতীয়তাবাদীদের (কুওমিন্টাং) সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মিলনের

১। দি কোল্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা ৩০৪-৩০৫।

যে সমস্ত শর্ত স্থির করা হইয়াছিল স্ট্যালিন সেগুলি গ্রহণ করিয়া মাও সে-তুংকে চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠনের জন্য চাপ দিয়াছিলেন। কিন্তু মাওসে-তুং সেই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।[১]

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও স্ট্যালিন মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন এবং জাপানে যাতে একমাত্র আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে না পারে, সেদিক অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হিরোশিমায় মার্কিন এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের জন্য রাশিয়া প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং ৮ই আগস্ট তারিখে তাড়াহুড়া করিয়া রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, অনেকের মতে সামরিকভাবে তার আর প্রয়োজন ছিল না। কেন না, জাপান পতনের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ফলে, এই অবস্থায় জাপানকে আক্রমণ করায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমী মহলে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য উদ্রেক করিল এবং শেষ মুহূর্তে রাশিয়া "লুঠের মাল কুড়াইবার জন্য" যুদ্ধে নামিয়াছে, এমন তীব্র শ্লেষও ধ্বনিত হইল। কার্যতঃ হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ৬ই ও ৯ই আগস্ট পরপর দুইটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার পরেই জাপানী যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছিল। মিত্রপক্ষ তখন যুদ্ধজয়ের উৎসব করিতেছিলেন। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া সম্পূর্ণ দখল-না হওয়া পর্যন্ত রাশিয়া সে কথা তাদের স্বদেশবাসীকে জানাইতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং ১৪ই আগস্ট জাপানী সম্রাটের আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত ঘোষণা সত্ত্বেও জাপানী সৈন্যেরা রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয় নাই। এই "যুক্তি" দেখাইয়া সোভিয়েত সেনানীমণ্ডলীর প্রধান জেনারেল আন্তোনোভ ২০শে আগস্ট পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া গেলেন।

এদিকে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম্ বোনা বর্ষণের সংবাদ রুশ সংবাদপত্র-গুলিতে চাপিয়া যাওয়া হইল কিংবা দেরী করিয়া অত্যন্ত লঘুভাবে "বিদেশী সংবাদের পৃষ্ঠায়" এক কোণে ছাপা হইল।

মিত্রপক্ষের তুলনায় রাশিয়াই যে জাপানকে যুদ্ধে হারাইবার বেশী কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে, এটা জাহির করিবার জন্য 'রুশরা জাপানের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের জাল চলচ্চিত্র তৈরী করিল এবং এমনভাবে সেই চিত্র দেখাইল যে, একমাত্র রাশিয়াই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে!'[২]

* * *

কিন্তু সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম্ বোমা বর্ষণ সংবাদ কোন প্রাধান্য না পাইলেও সোভিয়েত জনগণের মধ্যে সেই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। ফলে, দুই রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। প্রথমতঃ আমেরিকা কর্তৃক এই প্রলয়ংকর বোমা নির্মিত হওয়ায় কোন কোন রুশমহল বিমর্ষচিত্তে মনে করিলেন যে, এত রক্তপাত ও ত্যাগ স্বীকারের পর জার্মানীকে যে পরাজিত করা হইল সেই সমস্তই বৃথা গেল।

দ্বিতীয়তঃ এ্যাটম্ বোমার বর্বরতার দ্বারা জাপান এভাবে ঘায়েল হওয়ায় রুশ জনগণের মধ্যে জাপানী জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করিল এবং রাশিয়া

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৯৯।
২। ঐ পৃষ্ঠা ৩০৫।

যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়াছে, তার জন্য রুশ জনগণ মোটেই উৎসাহ বোধ করিল না। অর্থাৎ জাপানের বিরুদ্ধে মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ার এই যুদ্ধ আদৌ জনপ্রিয় ছিল না। বরং জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে এত প্রাণহানির পর আবার জাপানের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে তাদের যেন যথেষ্ট অনীহা বা অনাগ্রহ ছিল। অবশ্য রাশিয়ার জনগণ তখনও ইয়াল্টা চুক্তির কথা জানিত না। তবু রুশ জনগণ অনুমান করিল যে, হিরোশিমার বোমা ও রুশ যুদ্ধঘোষণার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন একটা সম্পর্ক আছে।...

সোভিয়েত পত্রিকাগুলি এ্যাটম্ বোমা সম্পর্কে নীরব রহিল বটে, কিন্তু রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার পর জারের আমল থেকে আজ পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের সমস্ত দুষ্কার্য ও আক্রমণের দীর্ঘ ফিরিস্তি প্রকাশিত হইল এবং ঘোষণা করা হইল "পোর্ট আর্থারের" কলঙ্ক মুছিয়া ফেলা হইবে!

সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে ইম্পিরীয়েল রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির যে তীব্র সমালোচনা আগে সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলিতে করা হইয়াছিল, তার সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে আলোচ্য প্রতিশোধাত্মক নীতির মিল কোথায়? কিংবা এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি কি মার্কসবাদসম্মত?[১]

কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্ট্যালিন জাপানী যুদ্ধজয় সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিলেন, তাও কম হতবুদ্ধিকর নয়। স্ট্যালিন বলিলেন যে, ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের প্রতিশোধ এতদিনে গ্রহণ করা হইল। জার সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়া জাপান বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক পোর্ট আর্থার আক্রমণ এবং কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ শাখালিন গ্রাস করিয়াছিল। 'আমরা বয়স্ক ব্যক্তিরা ৪০ বছর ধরিয়া এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আজ সেই দিন সমাগত।'[২]

স্ট্যালিনের মত একজন বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী মার্কসবাদীর মুখে এমন মন্তব্য অভিনব বটে!

১-২। রাশিয়া এ্যাট্ ওয়ার, পৃষ্ঠা ১১৮-১০ এবং ১১৮।

দশম পর্ব

সপ্তম অধ্যায়

জাপানের আত্মসমর্পণ : বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র

জাপানকে পরাজিত করার জন্য আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যেন একটা দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছিল এবং এই প্রতিযোগিতায় এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপের দ্বারা যদিও আমেরিকা রাশিয়াকে পিছনে ফেলিয়া দিল এবং প্রতিযোগিতায় জয়ী হইল, তবু কিন্তু পরদিন জাপানের আত্মসমর্পণের আগেই রাশিয়া মাঞ্চুরিয়াতে আক্রমণ করিয়া বসিল এবং কার্যতঃ বাজিমাত করিল। কেন না, রাশিয়াকে বাদ দিয়া একমাত্র আমেরিকার নিকট জাপানের আর আত্মসমর্পণ ঘটিয়া উঠিল না। যদিও পশ্চিমী মহলে একথা প্রচারিত যে, হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমার আঘাতের জন্যই জাপান মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিল, তথাপি সমস্ত সামরিক লেখকই এই বিষয়ে একমত নন। এমন কি, কোন কোন বিশিষ্ট মার্কিন গ্রন্থকার পর্যন্ত একথা অস্বীকার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন :

'Though the fate of Heroshima has stuck in the world's memory and though it has been regarded as the final cause of Japan's capitulation, it seems, in point of fact, that it was the Russian invasion that tilted the Japanese over to put an end to the war.'

'যদিও হিরোশিমার ভাগ্য পৃথিবীব্যাপী মানুষের স্মৃতিতে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে এবং যদিও জাপানের আত্মসমর্পণের এটাই চূড়ান্ত কারণ বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে, তথাপি ঘটনাবলী দৃষ্টে মনে হয় যে, রাশিয়ার আক্রমণের জন্যই জাপান যুদ্ধ শেষ করার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

কারণ, উপরোক্ত মার্কিন গ্রন্থকারদ্বয়ের মতে হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বর্ষণের ভয়াবহতা ও বীভৎসতা তখনও হিরোশিমার বাইরে, এমন কি টোকিওতে পর্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও ভালো করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ জাপানী জনগণ তখনকার বি-২৯ রাক্ষুসে মার্কিন বোমারুর ক্রমাগত ভয়ংকর বোমাবর্ষণে ও ধ্বংস বিস্তারে যেন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মাঞ্চুরিয়াতে 'রুশ বর্বরদের' আক্রমণ জাপানের কাছে অনেক বেশী ভীতিপ্রদ ছিল। জাপানের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গেও রাশিয়ার প্রশ্ন একান্তরূপে জড়িত ছিল। কেন না, সাম্যবাদ প্রসারের আতঙ্ক এর পিছনে ছিল। অধিকন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার মত আর-একটি বৃহৎ শক্তির আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার কোন সাধ্য তখন জাপানের ছিল না।

মার্কিন ছাড়া একজন বৃটিশ গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন যে টোকিওতে যখন আত্মসমর্পণের প্রশ্ন নিয়া উচ্চতর মহলে প্রচণ্ড বিতণ্ডা চলিতেছিল এবং আত্মসমর্পণের

বিরোধীগণ মার্কিন আক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষে ওকালতি করিতেছিলেন তখন টোকিওর পদস্থ মহলে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, মার্কিন ও বৃটিশরা প্রস্তুত হওয়ার আগেই রুশ আক্রমণ নিশ্চিতরূপে ঘটিবে। এমন কি, যদি যুদ্ধ চলিতে থাকে, তবে, জাপানী জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে। আবার এ্যাটম্ বোমা পড়িতে পারে (১২ই আগস্ট টোকিওতে এ্যাটম্ বোমা পড়িবে বলিয়া জোর গুজব রটিয়া ছিল) এবং যদি আর পারমাণবিক আক্রমণ নাও ঘটে, তবু রুশ আক্রমণ ঘটিতে পারে এবং রুশ আক্রমণের অর্থ-ই হইতেছে জাপানী রাজবংশের বিনাশ—'a Russian invasion would mean an end of the imperial house.'[১]

রুশ আক্রমণের এই ভীতি জাপ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন ও সম্মানভাজন উপদেষ্টা-গণের মধ্যে ছিল।

উইলিয়াম ক্রেইগ নামক আর-একজন বিশিষ্ট ইংরাজ গ্রন্থকার জাপানের পতন সম্পর্কে তাঁর রচিত এক চাঞ্চল্যকর পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, নাগানাকিতে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের দিন সকালে—৯ই আগস্ট, যখন সংবাদ আসিল যে, সোভিয়েত সৈন্যেরা মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে, তখন প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী সুজুকি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—'খেইল্ খতম্'—'The game is up.'[২]

সুতরাং তিনি ও তাঁর মতাবলম্বীগণ যুদ্ধ শেষ করার দিকে ঝুঁকিলেন। অতএব জাপানের আত্মসমর্পণে রাশিয়ার ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বরং 'আধুনিক জাপানে ইতিহাস' লেখক রিচার্ড স্টোরি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, ৮ই আগস্ট জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত আক্রমণ এ্যাটোমিক বোমার মতই চূড়ান্ত পর্যায়ের ছিল এবং যুদ্ধ শেষ করিতে জাপানকে বাধ্য করিয়াছিল।

* * *

জাপানে আত্মসমর্পণ বহু নাটকীয় এবং জটিল ঘটনায় পরিপূর্ণ, যেগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, সংক্ষেপে একথা উল্লেখ করা যায় যে, ঘটনার এই জটিলতার জন্য শেষ পর্যন্ত স্বয়ং জাপানের সম্রাট হিরোহিতোকে আসরে নামিতে হইয়াছিল, যা ছিল জাপানের ও রাজবংশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কেন না, 'দেবতুল্য' মহামান্য সম্রাট কখনও ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া জনগণকে নির্দেশ দেন না কিংবা তাঁর মন্ত্রিবর্গও তাঁর ব্যক্তিগত উপদেশ ও নির্দেশ লাভের জন্য কখনও তাঁকে বিব্রত করেন না—এটা ছিল জাপানের প্রচলিত প্রথা বা কনভেনশন। কিন্তু এবার জাপান যে অভাবনীয় সংকটের সম্মুখীন হইল, তাতে সম্রাটকে ভাবিতে হইল, এমন কি ব্যক্তিগতভাবে শেষ পর্যন্ত অংশ নিতে হইল। সম্রাট হিরোহিতো চীনের কনফুসিয়াসের দার্শনিক মতবাদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ওক্ গাছের মত সোজাসুজি দাঁড়াইতে নাই। কারণ, তাহলে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া চূর্ণ হইতে হইবে। বরং উইলো গাছের মত নমনীয় হইতে হইবে, যাতে ঝড়ের তাণ্ডব থামিয়া গেলে আবার সে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে।[৩]

অর্থাৎ সম্রাট হিরোহিতো যুদ্ধ শেষ ও শান্তির পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু জাপানে জঙ্গীবাদের প্রাবল্য ছিল, আর্মি ও নেভির এবং বিশেষভাবে আর্মি'র দাপট বেশী ছিল। কিন্তু ১৯44 সালের জুলাই মাসে সাইপান দ্বীপের পরাজয়ের ফলে জেনারেল তোজোর সরকার পতন হওয়ায় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ক্রমশঃ সিভিলিয়ান বা অ-সামরিক নেতৃত্বের দিকে সরিয়া আসিতেছিল এবং 'জুসিন' বা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের গঠিত কাউন্সিলের চাপ বৃদ্ধি পাইতেছিল। যদিও 'জেনরো' (Genro) বা বয়োজ্যেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতাদের সংগঠনের মত এই কাউন্সিলের কোন সংবিধানগত ক্ষমতা ছিল না, তবু যুদ্ধের এই সংকটে এর প্রভাব ক্রমশ বাড়িতেছিল। কিন্তু সৈন্য ও নৌবাহিনী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে চাহিতেছিল—যদিও সিনিয়র অফিসারেরা উপলব্ধি করিতেছিলেন যে যুদ্ধ জয়ের আর কোন আশা নাই, তবু মুখ ফুটিয়া প্রকাশ্যে কেউ সেকথা কবুল করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। কেন না, উগ্র মস্তিষ্ক তরুণ সৈন্যদের পক্ষ থেকে টেরোরিজম ও হত্যাকাণ্ডের ভয় ছিল। কারণ, 'জাপানের ইতিহাসে কেউ কখনও শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই এবং এটা একটা ধর্মীয় বিশ্বাস বা "cult"-এর মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।'[১]

তথাপি গোপনে এবং পর্দার আড়ালে 'সম্মানজনক শান্তি' স্থাপনের জন্য মিত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চলিতেছিল এবং তখন বিপন্ন জাপানের সম্মুখে মিত্রপক্ষের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবির পটভূমিকায় জাপানের একটি মাত্র প্রস্তাব স্পষ্ট ও জোরদার হইয়া উঠিল—সম্রাটের মর্যাদা ও অধিকারের নিশ্চতা বা গ্যারাণ্টি আদায় করিতে হইবে।

কিন্তু সম্রাট সম্পর্কে জাপানের জনগণের যত ভক্তিই থাকুক না কেন, পশ্চিমীমহলে এটা নিতান্তই একটা 'সেণ্টিমেণ্ট' বলিয়া বিবেচিত ছিল। এমন কি, খোদ আমেরিকাতে পর্যন্ত সম্রাট ও রাজবংশের বিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল। বিশেষতঃ পার্ল হারবার আক্রমণের বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া বহু আমেরিকান সম্রাট হিরোহিতোকে 'যুদ্ধাপরাধী' বলিয়া পর্যন্ত মনে করিতেন। কারণ, এই আক্রমণের সিদ্ধান্ত সেনানীমণ্ডলীর হইয়া থাকিলেও এর পিছনে জাপ সম্রাটের অনুমোদন ছিল। সোভিয়েট উচ্চতম নেতৃত্বও সম্রাট হিরোহিতোকে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও মার্কিন সমরসচিব স্টিমসন জাপানের সম্রাট সম্পর্কে জাপানীদের মনোভাবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কারণ, সম্রাটকে বজায় রাখিলে তাঁর মাধ্যমে জাপানে দখলদারির কার্য পরিচালনা এবং বহুদূর বিস্তৃত জাপ সাম্রাজ্যে সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণকরা সহজতর হইবে—এই বাস্তব বুদ্ধির দ্বারা ট্রুম্যান ও স্টিমসন পরিচালিত হইলেন। সুতরাং মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর উপদেষ্টাগণ পটসডাম সম্মেলন থেকে ঘোষিত নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবির জবাবে জাপানীদের বক্তব্য সোজাসুজি গ্রহণ না করিয়া এমনভাবে একটি বার্তা রচনা করিলেন যাতে জাপ সম্রাটের মর্যাদাও রক্ষা পায়, অথচ বাহ্যতঃ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবিও বজায় থাকে কথায় 'সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙ্গে'—এমন কুটনৈতিক কৌশলই অবলম্বিত হইল।

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৪২।

এদিকে টোকিওতে তখন রাজপ্রাসাদ ও পটসডাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করিয়া কি নাটক জমিয়া উঠিতেছিল ? ৮ই আগস্ট মাঞ্চুরিয়াতে রুশ আক্রমণের সংবাদ যেন পারমাণবিক বোমা বর্ষণের মতই বজ্রাঘাত তুল্য ছিল। 'এই তারিখটিই সম্ভবত জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে সংকটজনক ছিল।'[১]

জাপানের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অল্প কয়েক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়া যে সুপ্রীম কাউন্সিল গঠিত ছিল, ৯ই আগস্ট সকালে সেই কাউন্সিলের বৈঠক বসিল নতুন পরিস্থিতি ও শান্তির শর্ত আলোচনার জন্য। এই কাউন্সিলের বৈঠক ৬ জন সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যথা—প্রধানমন্ত্রী সুজুকি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো, নৌমন্ত্রী ইয়োনাই, সমর মন্ত্রী আনামি এবং নৌ ও স্থল সেনানীমণ্ডলীর দুই প্রধান জেনারেল উমেজু এবং এ্যাডমিরাল তয়োদা। অন্যান্য সহকারীদের এই বৈঠক থেকে বাদ দেওয়া হইল, পাছে তারা প্রভাব বিস্তার করে, এই আশংকায়।

এই সভার আলোচনায় দেখা গেল যে, সুজুকি, টোগো এবং ইয়োনাই একমাত্র সম্রাটের মর্যাদার প্রশ্ন বাদ দিয়া পটসডাম ঘোষণার বাকী শর্তগুলি গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সমরমন্ত্রী আনামি প্রভৃতি বাকী তিনজন তাতে রাজী ছিলেন না। তাঁদের মতে পটসডাম ঘোষণা গ্রহণের জন্য জাপানের পক্ষ থেকে মোট ৪টি শর্ত জুড়িয়া দিতে হইবে, যথা—

ক. সম্রাটের অধিকার ও মর্যাদা এবং রাজতন্ত্র রক্ষা করিতে হইবে।

খ. শত্রু সৈন্যদল কর্তৃক জাপান দখল করা চলিবে না।

গ. জাপানীরা নিজেরাই তাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে নিরস্ত্র করিবে এবং

ঘ. জাপানী যুদ্ধাপরাধীদেরকে জাপানেই বিচার করিবে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও নৌমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন যে, একমাত্র সম্রাটের প্রশ্ন ছাড়া বাকী সমস্ত শর্ত আরোপ করা বৃথা। মিত্রপক্ষ এগুলির কিছুই গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন না। সুতরাং সুপ্রীম কাউন্সিলের ৬ জনের বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না। তখন সমগ্র বিষয়টি বিবেচনার জন্য ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার পেশ করা হইল। সেদিন অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় দীর্ঘ ৭ ঘণ্টা ধরিয়া বিশদ আলোচনা ও বিতর্ক হইল। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারিল না। অথচ সে দিনই (৯ই আগস্ট) সকালে খবর আসিল যে, নাগাসাকিতে দ্বিতীয় এ্যাটোমিক বোমা বর্ষিত হইয়াছে। সুতরাং অনেক বিতর্কের পর রাত দশটায় মন্ত্রিসভার মিটিং খতম হইয়া গেল এবং প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সোজা সম্রাটের কাছে গেলেন রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। তাঁরা অনুরোধ জানাইলেন সেদিনই অবিলম্বে এই জরুরী অবস্থা বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সম্রাটের সমক্ষে সুপ্রীম কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকার জন্য।[২]

বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সম্রাটের প্রাসাদ-সংলগ্ন ভূগর্ভে যে আশ্রয় তৈরী হইয়াছিল, এই অসাধারণ সভা সেখানে অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু ভূগর্ভের এই আশ্রয়টি ছিল নিতান্তই স্বল্পায়তন—লম্বায় ৩০ ফুট, চওড়ায় ১৮ ফুট। ১১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বর্ণখচিত কিংখাবে (ব্রকেড) মোড়া (যুদ্ধের এই অবস্থায়ও কিছুটা

১। রিচার্ড স্টোরি, পৃষ্ঠা ২৩০

২। রিচার্ড স্টোরি, পৃষ্ঠা ২৩১।

রাজকীয় আদবকায়দা ছিল) একটি দীর্ঘ টেবিলের চারদিকে মিলিত হইয়াছিলেন। কক্ষটি সুরক্ষিত ছিল বটে, কিন্তু হাওয়া-বাতাসের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং আগস্ট মাসে সেই ভ্যাপসা গরমের দিনে সাজসজ্জা পরিহিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেন ধর্মাক্ত কলেবর হইতেছিলেন। ১১ জনের মধ্যে ৬ জন ছিলেন পূর্বোক্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য—'বিগ সিক্স' নামে পরিচিত এবং এঁদের হাতেই ছিল জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে নীতি নির্ধারণের অধিকার। বাকী চারজন ছিলেন সেক্রেটারি এবং একজন ছিলেন নিমন্ত্রিত "অতিথি"।

৮১ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ কান্টারো সুজুকি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও 'বিগ সিক্সের' তথাকথিত নেতা। কিন্তু তিনি জাপানের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। কারণ ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে তিনি একজন হীরো ছিলেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে শান্তি ও যুদ্ধের মধ্যে তিনি কোন মতি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না এবং ব্যক্তিগতভাবে যদিও তাঁর কোন শত্রু ছিল না, তবু আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গহণে টেরোরিস্টদের হাতে তাঁর প্রাণনাশের ভয় ছিল।

৬৩ বছর বয়স্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। আর ৬৫ বছরের নৌমন্ত্রী ইয়োনাই (যিনি হুইস্কির ভক্ত ছিলেন) ছিলেন প্রো-আমেরিকান। সুতরাং জঙ্গীবাদীদের দাপটে তিনি অবসর নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিন বছর পর ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে তোজোর পতনের পর আবার নৌমন্ত্রীর ক্ষমতায় ফিরে আসেন। টোগো, ইয়োনাই ও সুজুকির বিরুদ্ধে ছিলেন ৫৭ বছর বয়স্ক যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল আনামি এবং অপর দুইজন স্থল ও নৌ সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল উমেজু ও এ্যাডমিরাল তয়োদা—এঁরাই ছিলেন ১৯৩১-৪০ সাল পর্যন্ত মাঞ্চুরিয়া ও চীনে আক্রমণ ও যুদ্ধ চালাইবার জন্য দায়ী। (আর এই সমগ্র ব্যাপারটার পরিকল্পনাকারী ও উস্কানিদাতা ছিলেন জেনারেল তোজো)।

এই ইম্পিরীয়েল সম্মেলনে যিনি অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ছিলেন জাপানের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ৮০ বছর বয়স্ক ব্যারন কিচিয়ো হিরানুমা, প্রীভি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট—এই কাউন্সিলে ছিল খোদ সম্রাটের পরামর্শদাতা। অভিজাত হিরানুমা রাজভক্ত, দেশভক্ত এবং জাতীয়তাবাদী ছিলেন। গত কয়েক দশক ধরে তিনি জাপানের বহু রক্তারক্তি কাণ্ড এবং সামরিক উঠানামার সাক্ষী ছিলেন। তিনি কৌশলী, তেজস্বী এবং আলোচনা চালাইতে দক্ষ ছিলেন। ১৯৪১ সালে সন্ত্রাসবাদীরা তাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল এবং তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের বিরোধী ছিলেন। তোজো ক্ষমতায় আসার পর তিনি পর্দার আড়ালে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আজ যুদ্ধের উপসংহারের দিনে তিনি সিংহাসনকে রক্ষা এবং সরকারী গ্রুপবাজির তীব্র বিরোধ থেকে দেশকে উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন···।

ভূগর্ভের সেই আশ্রয়শালায় সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ২৫ মিনিট ধরিয়া অপেক্ষা করার পর জাপানের 'দিব্য শাসক' একজন সহকারীসহ তাঁর আবাস কক্ষের দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি টেবিলের মাথায় একটি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং তাঁর প্রজাবৃন্দ অভিবাদনপূর্বক আসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু

উপস্থিত ব্যক্তিরা যখন দেখিলেন যে, তাঁদের মহামান্য সম্রাট মাথার চুল আচড়ান নাই এবং দাড়িও কামান নাই, তখন তাঁরা বিমর্ষ হইলেন।

সম্রাট হিরোহিতোর জন্ম ১৯০১ সালে। যুবরাজ হিসাবে জাপানের বাইরে ইউরোপ পরিদর্শন করিয়া তিনি রক্ষণশীলদেরকে হতভম্ব করিয়া দিয়াছিলেন এবং রাজবংশের যে মহিলাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি পাঁচ বছর বাগদত্তা ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র ৯ বার তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং এই সমস্ত ব্যাপার নিয়া তখন প্রাসাদের রাজকীয় মহলে যথেষ্ট নিন্দা ও সমালোচনা হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে হিরোহিতো সৎ ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ১৯২৪ সালে তাঁর বিবাহ এবং ১৯২৬ সালে তিনি জাপানের ১২৪তম সম্রাটরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পরলোকগত পিতা বিকৃত-মস্তিষ্ক ছিলেন।...

সভার নিয়মমাফিক প্রধান মন্ত্রী সুজুকি পটসডাম ঘোষণার বয়ান পড়িয়া শুনাইবার জন্য ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন এবং ঘোষণাটি যদিও সকলের জানা ছিল, তবু আবার পড়া হইল। তখন সুজুকি সম্রাটকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সারাদিন আলোচনার পরেও তাঁরা ৬জন এই ঘোষণা গ্রহণ সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই এবং কার্যতঃ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং পুনরায় সম্রাটের উপস্থিতিতে এই আলোচনা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী সুজুকি প্রথমেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী টোগোকে তাঁর মতামত জানাইতে অনুরোধ করিলেন এবং টোগো বলিলেন—'যদিও পটসডাম ঘোষণা গ্রহণ করা নিতান্তই অসম্মানজনক, তবু এটা গ্রহণ না করেও উপায় নেই। তবে, সম্রাটের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হবে।'

নৌ-মন্ত্রীও অনুরূপ মতামত প্রকাশ করা মাত্র যুদ্ধমন্ত্রী আনামি তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং উত্তেজিতস্বরে বলিলেন—কিছুতেই না। আমাদের সৈন্যেরা স্বদেশ রক্ষার জন্য এখনও যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রদত্ত চারটি শর্ত গৃহীত না হয় (এই মতগুলি উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে) ততক্ষণ যুদ্ধ না চালাইয়া উপায় নাই।'...

এখানে উত্তেজিত আলোচনায় সময় কৌশলী ব্যারন হিরানুমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাশিয়া যুদ্ধের ঘোষণা করিল কেন?'

টোগো জবাব দিলেন—'রাশিয়া মধ্যস্থের ভূমিকা নিতে ইচ্ছুক ছিল না, যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিল।'

'কিন্তু রাশিয়া বলিয়াছে যে, জাপানী গবর্নমেণ্ট ২৮শে জুলাই তারিখ পটসডাম ঘোষণা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

টোগো উত্তর দিলেন—'না, আমরা অগ্রাহ্য করি নাই।

টোগোর এই জবাব সত্য ছিল। কিন্তু আসলে গোল বাধিয়াছিল জাপানী জবাবে মধ্যে 'mokusatsu' শব্দটির মার্কিন পক্ষীয় অনুবাদ নিয়া।...

এভাবে কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পর ব্যারন হিরানুমা জঙ্গীবাদীদের উদ্দেশ্যে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা এ্যাটম্ বোমার আঘাত ঠেকাইতে পারিবেন এবং যুদ্ধের এই অবস্থায় কিভাবেই বা আত্মরক্ষা করা সম্ভব?'

এই সমস্ত স্পষ্ট প্রশ্নের জবাবে জঙ্গীবাদী আনামি, উমেজু, তায়োদা বোবার মত বসিয়া রহিলেন।···

তখন প্রধান মন্ত্রী সুজুকী তাঁর তুরুপের তাস নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হইলেন, ৯ই তারিখ সকালে মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার পর তিনি টোগো ও মার্কুইস কিডোর সঙ্গে সম্রাটের সহিত একটি গোপন বুঝাপড়ায় উপনীত হইলেন এবং স্থির করিলেন যে, পটসডাম ঘোষণা গ্রহণ করা হইবে। সুতরাং সেদিনের মিটিংয়ে তাঁরা নিজেরা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভোট দিবেন না—চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার দেওয়া হইবে স্বয়ং সম্রাটের উপর।

পর্দার আড়ালে এই গোপন বুঝাপড়ার পর রাত্রি ২টার সময় দুই ঘণ্টার অধিক কাল ধরিয়া আলোচনা পর যখন কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারিল না, তখন হঠাৎ প্রধান মন্ত্রী সুজুকি দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, মহামান্য সম্রাট এই অবস্থায় তাঁর রাজকীয় সিদ্ধান্ত দিয়া জাতিকে সংকট থেকে রক্ষা করুন।

বিরোধী জঙ্গীবাদী নেতারা কখনও এমন একটা অবস্থায় জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং তাঁরা কখনও প্রত্যাশা করেন নাই যে, সম্রাটকে তাঁর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করা হইবে।

তখন সেই নিঃশব্দ সভাকক্ষে হিরোহিতো উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন :

'I have given serious thought to the situation prevailing at home and abroad and have concluded that continuing the war can only mean destruction for the nation and a prolongation of bloodshed and cruelty in the world.'···

অর্থাৎ 'স্বদেশ ও বিদেশের পরিস্থিতি আমি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি এবং এই সিদ্ধাণ্ডে পেঁাছিয়াছি যে, যুদ্ধ আরও চালাইবার অর্থ হইতেছে জাতির আরও ধ্বংস এবং পৃথিবীতে রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতা দীর্ঘায়িত করা।'[১]

সম্রাট হিরোহিতো তাঁর এই বক্তৃতায় প্রজাবৃন্দের অশেষ দুঃখের কথা এবং যুদ্ধ চালাইবার অক্ষমতার কথাও বর্ণনা করিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে, পটসডাম ঘোষণা গ্রহণ ও যুদ্ধ শেষ করিতে হইবে—'এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন অসহনীয়কেও সহ্য করিতে হইবে।'···

সমগ্র সভাকক্ষ নিস্তব্ধ হইল। কাহারও একটি পা'ও নড়িল না এবং কেহ সমর্থন বা বিরোধীতাও করিলেন।

তখন প্রধান মন্ত্রী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—'সম্রাটের সিদ্ধান্ত সম্মেলনেরও সিদ্ধান্ত।' সুজুকির তুরুপের তাপ নিক্ষেপ সার্থক হইল।···

এরপর রাত্রি ৩টার সময় প্রধান মন্ত্রীর গৃহে মন্ত্রিসভার পূর্ণ অধিবেশন বসিল এবং সম্রাটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ করিতে হইবে। তবে, একমাত্র শর্ত সম্রাটের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সেনানীমণ্ডলীর প্রধান উমেজুর সহকারী জেনারেল যোশীজুমি ঘটনার এই পরিণতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান মন্ত্রী সুজুকির প্রতি আক্রমণোদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিরস্ত্র করা হইল।

১। দি ফল অব জাপান—উইলিয়াম ক্রেইগ, প্যানবুক, লণ্ডন, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১০৬-০৮।

ভোর রাত্রি চারটায় মন্ত্রিসভার বৈঠক ভাঙ্গিল এবং সারাদিন ও সারারাত্রির ক্লান্তির পর মন্ত্রিরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।...

এদিকে সকাল ৭-৩৩ মিনিটের সময় টোকিও শহরের মধ্যস্থলে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তর থেকে বেতার যন্ত্রীরা এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সাংকেতিক বার্তা সুইজারল্যান্ড সুইডেনের মারফৎ মিত্রপক্ষের বিভিন্ন রাজধানীতে পাঠাইতে লাগিলেন।

ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, মস্কোস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারিম্যান তাকে জানাইয়াছে যে, হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বর্ষণের পর ৯ই আগস্ট সোভিয়েত সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত আক্রমণ করিলেন। স্ট্যালিন বলিয়াছেন যে, সোভিয়েতের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জার্মানীর পরাজয়ের ঠিক তিন মাস পরেই রাশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে যোগদান করিল এবং স্ট্যালিন স্বয়ং এ্যাটম বোমা সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহল দেখাইলেন। তিনি বলিলেন যে, এর ফলে জাপানী যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইতে পারে। তবে এ্যাটম বোমার রহস্য গোপন রাখিতে হইবে। অধিকৃত বার্লিনের ল্যাবরোটারিগুলিতে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাতে বুঝা যায় যে, জার্মানীও এ্যাটম ভাঙ্গার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল লাভ করিতে পারে নাই। স্ট্যালিন আরও বলিলেন যে, সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরাও এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তারা সফল হন নাই।'—[১]

৯ই আগস্ট তারিখে নাগাসাকিতে দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে ট্রুম্যান লিখিয়াছেন যে, দ্বিতীয় এ্যাটম বোমা নিক্ষেপের কথা ছিল কোকুরাতে এবং সেখানে সম্ভব না হইলে নাগাসাকিতে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা কোকুরাতে পৌঁছিবার পরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং বিমানটি তিনবার ঘুরিয়াও লক্ষ্যস্থানের হদিশ পাইল না। এদিকে বিমানে গ্যাস ফুরাইয়া আসিতেছিল এবং সেটা বিপদের কথা ছিল। সুতরাং বিকল্প লক্ষ্য হিসাবে নাগাসাকির দিকে ধাওয়া করা হইল। কিন্তু নাগাসাকির আকাশেও মেঘ ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ মেঘের ফাঁক দিয়া নাগাসাকি শহর বোমারু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় এ্যাটমবোমা নাগাসাকির উপর নিক্ষিপ্ত হইল!

ট্রুম্যানের মতে নাগাসাকির উপর দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে টোকিওতে বাহ্যতঃ ত্রাসের সৃষ্টি হইল। কারণ, পরদিন এমন আভাষ পাওয়া গেল যে, জাপান আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে।

১০ই এপ্রিল সকাল সাড়ে ৭ টায় টোকিও রেডিও থেকে এবং পরে দুপুরবেলা ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে সুইডিস ও সুইস দূতাবাতাসের মারফৎ জাপানের আত্ম-সমর্পণের জন্য 'মহিমান্বিত সম্রাটের অনুজ্ঞার' খবর পাওয়া গেল। ২৬শে জুলাই, ১৯৪৫, পটসডাম থেকে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পরে সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কের অনুমোদিত যে চরমপত্র ঘোষিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, জাপান তা' গ্রহণ করিতে

১। ট্রুম্যান—প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭০।

প্রস্তুত আছে। কিন্তু শর্ত এই যে, সার্বভৌম শাসক হিসাবে সম্রাটের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না। জাপানী গবর্নমেন্ট আশা করেন যে, তাঁদের এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্পর্কে মিত্রপক্ষের কাছ থেকে অতি দ্রুত স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যাইবে।

এই বার্তা পাওয়ায় পর ট্রুম্যান তাঁর সমর, নৌ পররাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপতির প্রধান রণ অধিকর্তা—এই চারজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল জাপানের সম্রাট জাপানী প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং তাঁকে বজায় রাখিয়া জাপানের জঙ্গীবাদ উচ্ছেদ করা কি সম্ভব?

তখন মন্ত্রীরা তাঁকে যে পরামর্শ দিলেন সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে, জাপানী সাম্রাজ্যের আত্মসমর্পণ কার্যকর করার পক্ষে সম্রাটকে বজায় রাখা সুবিধাজনক হইবে। কেননা, সম্রাটের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেউ সাহস পাইবে না। অপর দিকে পটসডাম ঘোষণার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবির মর্যাদাও বজায় রাখিতে হইবে। সুতরাং অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এই মর্মে এক জবাবের খসড়া রচিত হইল যে, জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পনের পর থেকে সম্রাটের ও জাপান সরকারের কর্তৃত্ব মিত্রপক্ষীয় সুপ্রীম কমাণ্ডারের আজ্ঞাধীন হইবে। অধিকন্তু সম্রাট ও জাপানী হাইকম্যান্ডকে আত্মসমর্পণের শর্ত স্বাক্ষর করিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ, চীনা ও রুশ সরকারকে এই খসড়া জবাবের প্রতিলিপি পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই খসড়া গৃহীত হইল বটে, কিন্তু বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান-মন্ত্রী এ্যাটলি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেভিন সম্রাট সম্পর্কে এই মর্মে এক সংশোধনী প্রস্তাব জুড়িয়া দিলেন যে, জাপ গবর্নমেন্ট ও জাপানী হাইকমাণ্ডের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরদান সম্রাট কর্তৃক সুনিশ্চিত করিতে এবং তাঁদেরকে উপযুক্ত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অর্পণ করিতে হইবে।

চীন ট্রুম্যানের প্রস্তাব গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু সোভিয়েত সরকার জানাইলেন যে, জাপানের প্রস্তাব নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ নয়। সুতরাং সোভিয়েত সৈন্যেরা মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ না করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। তবে, মার্কিন প্রস্তাব সম্পর্কে সোভিয়েত সরকার কিছুটা ইতস্ততঃ ও দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের পর জানাইলেন যে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের খসড়া প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বটে, কিন্তু জাপানী আত্মসমর্পণ কার্যকর করায় জন্য মার্কিন ও সোভিয়েত (মার্শাল ভেসিলেভস্কি) দুইজন সুপ্রীম কমাণ্ডার নিয়োগ করা উচিত। মার্কিন পক্ষ সরাসরি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য মলোটোভ ও স্ট্যালিন পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শের পর সেই রাত্রেই মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে টেলিফোনে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁরা ট্রুম্যানের খসড়া প্রস্তাবেই সম্মত।

ট্রুম্যান লিখিয়াছেন যে, মিত্রশক্তি কর্তৃক দখলীকৃত জার্মানীতে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁদের হইয়াছে তাতে জাপান সম্পর্কে তার পুনরাবৃত্তি না করিতে ট্রুম্যান স্বয়ং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অধিকৃত জার্মানীতে ও অস্ট্রিয়াতে সোভিয়েতের আচরণ থেকে আমেরিকার যে যে শিক্ষালাভ হইয়াছে, তাতে মিত্রশক্তিবর্গকে কিছুতেই জাপানে দখলকারির অংশ দেওয়া হইবে না।[১]

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪৭৬।

* * *

মিত্রপক্ষের তিন শক্তির কাছ থেকে অনুমোদন লাভের পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাপানের উদ্দেশে রচিত তাঁর বার্তায় বৃটিশ সংশোধনী প্রস্তাবের সঙ্গে নিজেদের সংযোজন যুক্ত করিয়া সম্রাট সম্পর্কে নিম্নলিখিত চূড়ান্ত বাক্যটি রচনা করিলেন :

"The Emperor will be required to authorize and ensure the signature the Government of Japan..."

এই বার্তা স্বাক্ষরের তারিখ ছিল ১১ আগস্ট, ১৯৪৫ এবং কুটনৈতিক নিয়মমাফিক সুইস্ দূতাবাসের মারফৎ টোকিওতে এই বার্তা পাঠানো হইল।

জেনারেল ম্যাক্-আর্থার মিত্রপক্ষের তরফ থেকে জাপানের সুপ্রীম কমান্ডার নিযুক্ত হইলেন এবং জাপানের আত্মসমর্পণ গ্রহণের অধিকার তাঁকে দেওয়া হইল। অধিকন্তু নির্দেশ দেওয়া হইল যে, জাপানী সৈন্যবাহিনীকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের কাছে, দূর-প্রাচ্যে সোভিয়েত হাইকমান্ডের কাছে এবং চীনে চিয়াং কাইসেকের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

কিন্তু চীনে জেনারেল চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র বিরোধের জন্য জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের প্রশ্নেও তিক্ত মতভেদ দেখা দিল। কারণ, চীনা কমিউনিস্ট বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল চুতে কমিউনিস্ট দখলীকৃত এলাকাগুলিতে জাপানী সৈন্যদেরকে তাঁদের (কমিউনিস্টদের) নিকট আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন।

এই সংবাদ পাওয়ার পর ট্রুম্যান কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, কোন রাজনৈতিক দলের কাছে জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করা চলিবে না। কারণ, এটা পটসডাম ঘোষণারও বিরোধী এবং চীনে গৃহযুদ্ধ বাধিতে পারে, এমন কোন কার্যের উস্কানি দেওয়াও চলিবে না। জাপানী বাহিনীকে একমাত্র মিত্রপক্ষীয় গবর্নমেন্ট সমূহের প্রতিনিধিদের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

কিন্তু আত্মসমর্পণের দাবি থেকে সম্রাটকে রেহাই দেওয়া সত্ত্বেও ১৩ই আগস্ট জাপানের কাছ থেকে যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ওয়াশিংটনে উৎকণ্ঠা দেখা দিল। কারণ, উগ্র জঙ্গীবাদীদের শান্ত করার জন্যই সম্রাট সম্পর্কে এই বিবেচনা দেখানো হইয়াছিল। এই উৎকণ্ঠার বর্ণনায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বার্নস (Byernes) যে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন, সেটা কম উল্লেখযোগ্য নয় :

'Never have I known time to pass so slowly...'

'সময় যে এত মন্দগতিতে চলে, একথা আগে কখনও জানতুম না।'—

অবশেষে ১৫ই আগস্ট অপরাহ্নে ৪টা ৫ মিনিটের সময় সেই বহুপ্রার্থিত খবর পাওয়া গেল :

"জাপান আত্মসমর্পণ করেছে!"

সন্ধ্যা ৬টার সময় ওয়াশিংটনের সুইস্ দূতাবাস মারফৎ সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের বার্তা মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর হাত দিয়া হোয়াইট হাউজে পৌঁছিল, যে বার্তার ফলে জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান

১। Japan Subdued, Herbert Feis, P. 127.

২। ট্রুম্যান, প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৮০।

ঘটিল। চতুঃশক্তির নিকট প্রেরিত ঐতিহাসিক বার্তাটি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

1. His majesty the Emperor has issued an Imperial rescript regarding Japauese acceptance of the provisions of the Potsdam declaration.

2. His majesty the Emperor is prepared to authorise and ensure the singature by his Government and the Imperial General Head-quarters of the necessary terms for carrying out the provision of the Potsdam declaition. His majesty, is also prepared to issue his commands to all the military, naval, and air authorities of Japan and all the forces under their control whereever located to cease active operation to surrender arms and to issue such other orders as may be required by the Supreme Commader of the Allied Forces for the execution of the above-mentioned terms.—১

এর সহজ মর্ম এই—

১। মহামান্য সম্রাট জাপান সরকার কর্তৃক পটসডাম ঘোষণার শর্তাবলী গ্রহণ সম্পর্কে একটি রাজকীয় অনুজ্ঞা জারি করিয়াছেন।

২। পটসডাম ঘোষণার অনুচ্ছেদগুলি কার্যক্ষেত্রে পালনের উদ্দেশ্যে জাপানের সরকার ও সামরিক সদর দপ্তর কর্তৃক যে সমস্ত শর্ত স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে, মহিমান্বিত সম্রাট সেগুলির সম্পর্কে নিশ্চয়তা বিধান ও কর্তৃত্বদানের জন্য প্রস্তুত আছেন। জাপানের সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর কর্তৃপক্ষের অধীন যে সমস্ত সৈন্য আছে, তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তাদের সকলকে রণক্রিয়া বন্ধ করিতে এবং অস্ত্রসমর্পণ করিতে আদেশ দেওয়ার জন্য মহামান্য সম্রাট প্রস্তুত আছেন। উপরোক্ত শর্তগুলি কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার জন্য মিত্রপক্ষীয় বাহিনীগুলির সর্বোচ্চ অধিনায়ক যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন, মহামান্য সম্রাট সেগুলি পালনের জন্য হুকুম জারি করিতে ইচ্ছুক আছেন।

বলা বাহুল্য যে সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের এই বার্তা পাওয়ার পর সন্ধ্যা ৭টা সময় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হোয়াইট হাউজে সমবেত সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট এই ঐতিহাসিক খবর ঘোষণা করিলেন এবং সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও পৃথিবীর সর্বত্র মিত্রপক্ষীয় মহলে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল।

সম্রাটকে গ্রেপ্তারির চক্রান্ত

কিন্তু সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের আগে খোদ রাজধানী টোকিওতে এমন সব লোমহর্ষক এবং চক্রান্তমূলক ঘটনাবলীর সমাবেশ হইয়াছিল, যে ঘটনাবলী রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে কিংবা বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডে পরিণত হইতে পারিত। কারণ, জাপানে আসল ক্ষমতা পরিচালনা করিত সামরিক নায়কেরা এবং তাদের মাধ্য এমন একটি

১। Truman—Vol-I, P. 48.

গোষ্ঠী ছিল, যারা মিত্রপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার বা আত্মসমর্পণ করিতে আদৌ রাজী ছিল না। অবশ্য সম্রাটের প্রতি এদের অনুরাগও কম ছিল না। তথাপি পটসডাম ঘোষণার প্রশ্নে গভীর বিতন্ডা দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বয়ং সম্রাট এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িলেন কিংবা হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। পার্ল হারবারের ব্যাপারে সম্রাটের সম্মতি ছিল বটে, কিন্তু সেই আক্রমণের সিদ্ধান্ত ছিল সামরিক নেতাদের। কিন্তু পটসডাম ঘোষণা গ্রহণের দায়িত্ব স্বয়ং সম্রাট স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। সুতরাং জাপানের প্রভাবশালী মহলে সংশয় দেখা দিল যে মিলিটারি কি সম্রাটের সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে ইচ্ছুক হইবে? কারণ, শান্তি আলোচনার সূত্রপাত থেকেই মিলিটারির একটা অংশে এর বিরুদ্ধে কানাঘুষা শুনা যাইতেছিল এবং আর্মির নিকট গোপনসূত্রে যতই পটসডাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করিয়া পর্দার অন্তরালবর্তী আলোচনা ও মিত্রপক্ষের নিকট বার্তা আদান-প্রদানের সংবাদ পৌঁছিতেছিল, ততই সামরিক মহলের একটা চক্র উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। ১১ই আগস্ট থেকে চক্রান্ত শুরু হইয়াছিল। কোন কোন পদস্থ সেনাপতিও এই চক্রান্তের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন বটে, তবে তাঁরা হাতে কলমে সম্রাটের বিরুদ্ধে কিছু করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু ১৪ই আগস্ট রাত্রে এই চক্রান্ত এক চরম নাটকীয় কাণ্ডের রূপ ধারণ করিল। জাপানের কয়েকটি সম্পন্ন পরিবারের তরুণ অফিসাররা ছিলেন অত্যন্ত উগ্র মস্তিষ্ক। তাঁরা জাপানের আত্মসমর্পণে বাধা দেওয়ার জন্য এক আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটাইবার এবং সম্রাটকে বন্দী করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করিলেন।

এই চক্রান্তকারী দলের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিলেন মেজর হাতানাকা। তাঁকে সমর্থন জানাইলেন মন্ত্রী দপ্তরের সহকর্মী জিরো শিজাকি এবং এঁদের হস্ত শক্তিশালী করিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর জামাতা মেজর কোগা ও যুদ্ধমন্ত্রী দপ্তরের কর্নেল ইডা। রাজপ্রাসাদের প্রহরী বাহিনীর (ইম্পিরিয়েল গার্ডস ডিভিসন) কিছু কিছু সদস্যের সঙ্গে এই সমস্ত চক্রান্তকারী যোগাযোগ স্থাপন করিলেন এবং তাঁরা নানাভাবে চেষ্টা করিলেন প্রহরীবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মোরিকে হাত করার জন্য। খোদ যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল আনামির শ্যালক কর্নেল তাকেসিতাকেও এই চক্রান্তকারীরা দলে টানিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু কিছুটা সহানুভূতি থাকিলেও কর্নেল তাকেসিতা এমন মারাত্মক ষড়যন্ত্রে মনেপ্রাণে সায় দিতে পারিতেছিলেন না। তথাপি মেজর হাতানাকার উৎসাহে কোন ভাঁটা পড়িল না। তিনি তাঁর বিদ্রোহী দলবল লইয়া মধ্যরাত্রে রাজপ্রাসাদে হানা দিলেন এবং প্রাসাদের চত্বরে প্রাচীরের অভ্যন্তরে যেখানে রাজকীয় প্রহরীবাহিনীর সদর দপ্তর ছিল এবং বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মোরির কক্ষ ছিল, হাতনাকা তাঁর সঙ্গীদের নিয়া সেই কক্ষে ঢুকিয়া পড়িলেন। ওদিকে প্রহরী বাহিনীর সৈন্যেরা চঞ্চল হইয়া অট্টালিকার ও দরদালানে ছুটাছুটি ও হৈ চৈ শুরু করিয়া দিয়াছিল। হাতানাকা মোরিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। কেন না, মোরির অধিনায়কত্ব ছাড়া এই প্রাসাদ-বিদ্রোহ সফল করার সম্ভাবনা ছিল না। জেনারেল মোরি তরুণ-বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভয়ানক বিব্রত ও বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মোরি হাঁ বা না কিছুই বলিলেন না। হাতানাকা তখন তাড়াতাড়ি যুদ্ধমন্ত্রীর-

১। টোট্যাল ওয়ার—(দ্বিতীয় খণ্ড) পৃষ্ঠা ৩৪৪।

দপ্তরে গিয়া কর্নেল তাকেসিতাকে দিয়া কার্যোদ্ধার করিতে চাহিলেন এবং বলিলেন যে, রাত্রি ২টার সময় দ্বিতীয় রেজিমেণ্ট রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া পড়িবে। তাঁদের অফিসারেরা রাজী আছেন। তখন যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল আনামি যদি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তা হলে জাপান আত্মসমর্পণ থেকে রক্ষা পাইয়া যাইবে। সুতরাং যুদ্ধমন্ত্রীকে রাজী করাইবার জন্য কর্নেল তাকেসিতার সাহায্য দরকার।

কিন্তু তাকেসিকা তখন সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে, তাঁর ভগ্নিপতি জেনারেল আনামি এমন বিদ্রোহে রাজী হইবেন না। সুতরাং তাকেসিতা মদের গ্লাস হাতে নিয়া সুরা পান করিতে করিতে হাতানাকাকে নিরস্ত করিতে চাহিলেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন—'অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেছে। এই বিদ্রোহ সফল করার জন্য চারজন উচ্চতম পর্যায়ের সেনাপতি বা জেনারেল আনামি, জেনারেল টানাকা, জেনারেল মোরি এবং জেনারেল উমেজুর একমত হওয়া দরকার। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়।' অর্থাৎ তাকেসিতা হাতানাকাকে কার্যতঃ বলিয়াই দিলেন যে, এই প্রকার অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইতে বাধ্য।[১]

কিন্তু মেজর হাতানাকা তাতেও নিরস্ত হইলেন না। তিনি সেই গভীর রাত্রে যুদ্ধমন্ত্রীর দপ্তর থেকে হন্তদন্ত হইয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন এবং এই অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে ছুটাছুটির জন্য ঘর্মাক্ত কলেবর হইতে লাগিলেন। তিনি এবং তাঁর একজন সঙ্গী সোজা প্রহরীবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মোরির কক্ষে ঢুকিয়া পড়িলেন। মোরির সঙ্গে তখন বিদ্রোহীরা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরিয়া আলোচনা চালাইতেছিলেন। মোরির ঘরে তখন কর্নেল শিরাইসি (মোরির শ্যালক) ছাড়া আর কেহ ছিলেন না। রাত তখন ২টা, গভীর নিশীথে হাতানাকা যেন তাঁর ধৈর্যের শেষ সীমায় পেঁৗছিয়াছিলেন। তিনি মোরিকে শেষবারের জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বিদ্রোহে তিনি যোগ দিতে রাজী আছেন কিনা। কিন্তু মোরি নিঃশব্দ রহিলেন। তখন হাতানাকা ক্ষিপ্ত হইয়া হঠাৎ তাঁর রিভলভার বাহির করিলেন এবং সোজাসুজি গুলি করিয়া জেনারেল মোরিকে হত্যা করিলেন। আর তাঁর সঙ্গী তরোয়াল দিয়া মোরির বাম কণ্ঠে এক কোপ বসাইয়া দিলেন। কর্নেল শিরাইসি এই আকস্মিক ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত আতঙ্কিত হইয়া যখন হত্যাকারীদ্বয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইলেন, তখন হাতানাকার সঙ্গী তাঁর সেই রক্তসিক্ত তরোয়াল দিয়া কর্নেল শিরাইসির ঘাড়ের উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন যে, তাঁর মাথা দেহ থেকে প্রায় আলগা হইয়া পড়িল।...

এই খুনখারাপির পর মেজর হাতানাকা জেনারেল মোরির শীলমোহর জাল করিয়া এবং জাল হুকুমনামা জারি করিয়া রাজপ্রাসাদের প্রহরীবাহিনীকে বিদ্রোহীদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেন।

রাত্রি তখন ২-১৫, ১৪ই আগস্ট (ইংরাজী মতে ১৫ই আগস্ট) হাতানাকা মনে করিলেন রাজপ্রাসাদ তাঁর দখলে আসিয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সম্রাটও। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, সম্রাট হিরোহিতো ১৫ই আগস্ট দুপুরে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার যোগে ভাষণ দিবেন, পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে আত্মসমর্পণের জন্য হুকুম দিবেন। সুতরাং এই ভাষণ দান বন্ধ করিতে হইবে এবং তার জন্য

১। দি ফল অব জাপান, পৃষ্ঠা ১৬৮-৬৯।

প্রয়োজন বেতারের রেকর্ড হস্তগত করা। যদিও সেই বেতার ভাষণ তৈরী হওয়ার পর ১২টা ৫ মিনিটের সময় সম্রাট শয্যা গ্রহণ কি করিয়াছিলেন এবং ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যদিও সেই রেকর্ড রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে প্রশাসনিক বিল্ডিংয়ের দেওয়ালে একটি নিরাপদ সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তথাপি হাতানাকা ও তাঁর সঙ্গীরা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোথাও তার সন্ধান পাইলেন না।

এদিকে ঘুমন্ত সম্রাটকেও কেউ জাগাইতে সাহস পাইতেছিলেন না। লর্ড প্রীভিশীল মার্কুইস কিডো বিদ্রোহের আঁচ পাইয়া প্রাসাদের নীচের কুঠারিতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে আরও প্রায় ১৭ জন বেতার বিভাগীয় অফিসারের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কার্যত তাঁরাও বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী ও জামিনস্বরূপ আটক ছিলেন।[১]

অন্যদিকে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মদের ফোয়ারা বহিতে লাগিল। কিন্তু বিদ্রোহীদের চূড়ান্ত ভাগ্যনিয়ামক সেই বেতার রেকর্ডের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল এবং চক্রীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়িল—শেষ পর্যন্ত তারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

কিন্তু 'আধুনিক জাপানের ইতিহাস' (ইংরাজী) প্রণেতা এই বিদ্রোহের ব্যর্থ সমাপ্তির একটি ভিন্ন চিত্র দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, কিছু বিদ্রোহী তরুণ সৈন্য কর্তৃক রাজপ্রাসাদ দখল ও অভ্যুত্থান ঘটাইবার চেষ্টার খবর টোকিওর সৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তরে পেঁাছিয়াছিল এবং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদের গিয়া হাজির হইলেন। তিনি তাঁর একমাত্র ব্যক্তিত্বের জোরে ও আবেগপূর্ণ বাগ্মিতার গুণে বিদ্রোহী নায়কদের অভিভূত করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁদেরকে বুঝাইলেন যে, এভাবে মাথা গরম করিয়া বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা অত্যন্ত অন্যায়। তখন বিদ্রোহীরা তাঁদের ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলেই চারজন বিদ্রোহী আত্মহত্যা করিলেন।···

সকালবেলা সম্রাটের প্রাসাদের বাইরে পাইন অরণ্য থেকে দুই ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন। এঁরা ছিলেন বিদ্রোহীদের নেতা হাতানাকা এবং তাঁর সঙ্গী মিজাকি। বিদ্রোহের ব্যর্থতা এবং তাঁদের কার্যের জন্য তাঁরা অনুতপ্ত হইলেন। মিজাকি সম্রাটের প্রাসাদের দিকে মুখ করিয়া নতজানু হইলেন এবং তারপর "উৎসবের ছুরিকা।" দিয়া নিজ হাতে নিজের পেট কাটিয়া হারাকিরি করিলেন আর মেজর হাতানাকা, যিনি কয়েক ঘণ্টা আগে প্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ককে পিস্তলের গুলি দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি নিজেই সেই পিস্তল নিয়া নিজের দুই চোখের মধ্যে গুলি করিলেন। তাঁর রক্তলিপ্ত কৃশতনু মাটিতে ঢলিয়া পড়িল। সেই রক্তের উপর প্রভাতসূর্যের আলো পড়িয়া জ্বল জ্বল করিতে লাগিল।—(ফল্ অব জাপান পৃষ্ঠা ১৮৮)।

ওদিকে তখন সমর মন্ত্রী জেনারেল আনামি তাঁর আবাসকক্ষের বারন্দায় বসিয়া পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং তিনি একটা বিদায়-ব্যঞ্জক কবিতাও লিখিতেছিলেন। যদিও তিনি যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারে প্রস্তুত

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৭৩।
২। টোট্যাল ওয়ার—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৫।

ছিলেন না, তথাপি তিনি অনুরক্ত প্রজা হিসাবে সম্রাটের সিদ্ধান্ত মানিয়াছিলেন এবং মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের দ্বারা কোন জটিলতাও সৃষ্টি করেন নাই। তিনি স্টাফ অফিসারদের একাংশের বিদ্রোহের আঁচ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাদেরকে বাধাও দেন নাই। কিংবা তাঁদের কার্যের অনুমোদনও করেন নাই। কারণ, "তাঁর হৃদয় ছিল বিদ্রোহের পক্ষে, কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক ছিল বিদ্রোহের বিপক্ষে।" বিদায় গ্রহণের বার্তা রচনা শেষ হওয়ার পর জেনারেল আনামি ভোর রাত্রি চারটার সময় সম্রাটের প্রাসাদের দিকে মুখ করিয়া বসিলেন এবং তারপর নিজ হাতে একটি তীক্ষ্ণ ছোরা দিয়া তাঁর নিজের উদর কাটিয়া ফেলিলেন এবং তাতেও ক্ষান্ত না হইয়া সেই ছোরা নিজের ঘাড়ে বিদ্ধ করিলেন।[1]

সমর মন্ত্রী হিসাবে জেনারেল আনামি যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য নিজেকে দায়ী ও অপরাধী মনে করিলেন। সুতরাং জাতির প্রতি তিনি যে অন্যায় করিয়াছিলেন এবং সৈন্যেরা মহামান্য সম্রাটের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া যে "অপবিত্র" কাজ করিয়াছিলেন, এই হারাকিরির দ্বারা তিনি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন!

* * *

টোকিওতে গভীররাত্রে নিদ্রামগ্ন নাগরিকদের অজ্ঞাতসারে যখন নিঃশ্বাসরোধকারী গোয়েন্দাকাহিনীর মত এই সমস্ত নিদারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী ঘটিতেছিল, তখন সম্রাট তাঁর প্রাসাদকক্ষে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছিলেন এবং পরদিন ১৫ই আগস্ট দ্বিপ্রহরে যেন এই নাটকের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য হিসাবে সম্রাটের বেতার বক্তৃতা জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইল। যদিও তাতে মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের কথা ঘোষিত হইল, তথাপি সম্রাটের "রাজকীয় ঐতিহ্য" অনুযায়ী সালঙ্কার ও সাড়ম্বর ভাষার ঐশ্বর্যে অনেক প্রজাই সহসা সেই ভাষণ অনুধাবন করিতে পারিলেন না। বরং অধিকাংশ সাধারণ প্রজাই বিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু এই রাজকীয় ভাষণ সত্ত্বেও জাপানের সর্বত্র কর্নেল ও মেজররা সভা সমিতিতে আত্মসমর্পণের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। এমন কি বিমানবাহিনীর "আত্মবিনাশী" যে সমস্ত পাইলট (সুইসাইড স্কোয়াড) জাতির পক্ষ থেকে চূড়ান্ত চেষ্টার জন্যে প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাঁরা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, টোকিও উপসাগরে আমেরিকার যে যুদ্ধজাহাজ "মিশৌরি"তে জাপানের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হইবে, এই আত্মবিনাশী পাইলটের দল সেই জাহাজটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিস্ফোরণ ঘটাইবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই চক্রান্ত একেবারে শেষ মুহূর্তে বানচাল হইয়াছিল।...

কিন্তু সম্রাট হিরোহিতো জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর বেতার বক্তৃতায় বৃটেন ও আমেরিকাকে লক্ষ্য করিয়া এমন কয়েকটি কথা বলিলেন, (সম্ভবতঃ এগুলি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত মত) যেগুলি মিত্রপক্ষের নিকট আদৌ প্রীতিপদ ছিল না ঃ

'We declared war on America and Britain out of our sincere desire to ensure Japan's self preservation and the stabilization of South East Asia, it being far from our thought either to infringe

১। রিচার্ড স্টোরি—পৃঃ ২৩৬।

upon the sovereignty of other nations or to embark upon territorial aggrandizement.[১]

জাপানের আত্মসংরক্ষণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থায়িত্ব বিধানকে সুনিশ্চিত করার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়াই আমরা আমেরিকা ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলাম। অন্যান্য জাতির সার্বভৌম স্বাধীনতা লঙ্ঘন করা কিংবা পররাজ্য দখলের লিপ্সা পূরণ করার কোন ইচ্ছা আমাদের ছিল না।

কিন্তু সম্রাটের তরফ থেকে আত্মপক্ষ সমর্থনের এই নির্লজ্জ চেষ্টা সত্ত্বেও পরাজয়ের গ্লানিতে ও দুঃখে জাপানের বহু লোক কাঁদিয়া ফেলিল। তবে, জনসাধারণের অনেকেই আবার যুদ্ধের ভয়াবহ সর্বনাশ এবং অবর্ণনীয় দুর্গতি ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তথাপি জাপানী জনতার বিরাট অংশই যেন ছিল এই শান্তিপর্বের নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত![২]

১। Total War—2nd Vol. P. 346-347.

২। পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৪৮।

দশম পর্ব

অষ্টম অধ্যায়

দলিল স্বাক্ষর : আত্মহত্যা : যুদ্ধশেষ

সম্রাটের বেতার ঘোষণনার পর এবার দেশপ্রেমগবী এবং সাম্রাজ্যবিলাসী জাপানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরের পালা। সুতরাং হিটলারী জার্মানীর মত জঙ্গীবাদী জাপানের পক্ষেও ব্যাপারটা ভয়াবহ রকমের মর্মান্তিক ও নাটকীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল। আগের অধ্যায়ে সেগুলির কিছু কিছু চাঞ্চল্যকর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারগুলি সেখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। দলিল স্বাক্ষর থেকে শুরু করিয়া মার্কিন সৈন্যবাহিনী কর্তৃক জাপানী দ্বীপে দখলকারী প্রতিষ্ঠা, এমন কি তার পরেও অনেক রোমহর্ষক ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল।···

১৫ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করিলেন এবং জেনারেল ম্যাক-আর্থার তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধাবসান ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এত অভিনন্দন বার্তা ও এত সম্মানের অধিকারী হইলেন যে, এত সম্মান তিনি জীবনে আগে কখনও পান নাই। সুতরাং 'আনন্দে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। অথচ এর আগে ছোটবেলা থেকে তিনি কখনও চোখের জল ফেলেন নাই।'[১]

জাপানী যুদ্ধের এই উপসংহার পর্বে জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থারের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল—

ক. মিত্রপক্ষের সর্বোচ্চ সেনাপতি বা সুপ্রীম কমাণ্ডার হিসাবে সর্বত্র সমস্ত জাপানী সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ কার্যকর করা এবং

খ. প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিরূপে নির্দিষ্ট এলাকায় জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করা। অবশ্য এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করিবেন এ্যাডমিরাল নিমিৎস এবং জেনারেল ওয়েড মেয়ার।

স্থির হইল জাপানের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলি আমেরিকার খাস নিয়ন্ত্রণে রাখা হইবে কিংবা কয়েকটি দ্বীপ অস্ট্রেলিয়াকে দেওয়া যাইবে। 'আর ইউরোপীয় মিত্রপুঞ্জ সম্পর্কে ব্যবস্থা হইল বৃটেন, কমনওয়েলথ, নেদারল্যান্ডস ও ফ্রান্স প্রশান্ত মহাসাগরে এবং এশিয়ার খাস ভূমিতে তাদের কলোনী ও পূর্বেকার অধিকৃত দেশগুলি তাদের নিজেদের চেষ্টায় ও নিজেদের লোক দিয়া পুনরায় উদ্ধার করিয়া নিতে পারিবে।'[২]

অর্থাৎ মহাযুদ্ধের শেষেও এশিয়াতে পশ্চিমে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখার ইচ্ছা ট্রুম্যান ও ম্যাক-আর্থারের ছিল—এই মনোবৃত্তি লক্ষ্য করার মত।

তবে, সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে এই নির্দেশ দেওয়া হইল যে, ইয়াল্টা ও

১। Reminiscences—Douglas MaeArther, P. 379.

২। Japan Subdued—Feis, P. 139.

পটসডাম চুক্তি অনুসারে রাশিয়া দূর প্রাচ্যে তাদের ভূমিগত দাবির অধিকার পাইবে। এই প্রসঙ্গে স্ট্যালিন ট্রুম্যানের নিকট একটি অতিরিক্ত প্রস্তাব পেশ করিলেন। এই প্রস্তাবে বলা হইল যে, ১৯১৯-২১ সালে জাপান সমগ্র সোভিয়েত দূর-প্রাচ্য দখল করিয়া নিয়াছিল। সুতরাং "জনমতকে শান্ত করিবার খাতিরে" রাশিয়াকে হোকাইডো দ্বীপের উত্তর অংশ (মূল জাপানী দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত) দখল করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর প্রধানগণ এই প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারণ, জাপানে আর কোন শক্তিকে দখলদারির কোন অংশ দেওয়া হইবে না। তবে, কিউরাইল ও দক্ষিণ শাখালিন দ্বীপ সম্পর্কে ইয়াল্টা-পটসডাম চুক্তি মানিয়া লওয়া হইবে এবং সেখানে জাপ সৈন্যদের আত্মসমর্পণ রাশিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে।

আর কোরিয়া সম্পর্কে এই ব্যবস্থা হইল যে, ৩৮নং সমান্তরাল রেখার উত্তরে রাশিয়া এবং দক্ষিণে আমেরিকা জাপ সৈন্যদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিবে।

যদিও ইন্দোচীনে জাপানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য ফ্রান্স তার দাবি জানাইয়াছিল, তথাপি দেখা গেল যে, জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ নিষ্পন্ন করার মত শক্তি ও সংগঠন ফ্রান্সের নাই। তখন স্থির হইল যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম কমাণ্ডার লর্ড লুই ম্যাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে ফরাসী সরকারের একজন প্রতিনিধিও থাকিবেন। আর হংকংয়ের "ক্রাউন কলোনী"র (বৃটিশ) জাপ সেন্যেরা চীনের বদলে বৃটিশ পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন।

জাপানের এই আত্মসমর্পণকে যথাসম্ভব নাটকীয় এবং আকর্ষণীয় করিবার উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান টোকিওর যতটা কাছাকাছি সম্ভব নিষ্পন্ন করার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু জাপানের চরমবাদীদের পক্ষ থেকে হানা দেওয়ার আশংকা থাকায় এই অনুষ্ঠান উপকূল ভাগ থেকে টোকিও উপসাগরে ১৮ মাইল দূরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বৃহত্তম (৪৫ হাজার টনের) যুদ্ধজাহাজ "মিশৌরির" গ্যালারি ডকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইল কিন্তু এই যুদ্ধজাহাজ বাছাই করা নিয়া আমেরিকার আর্মি ও নেভীর মধ্যে ভিতরে ভিতরে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। কারণ, নৌ-সচিব ফরেস্টাল চাহিয়াছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-সেনাপতি এ্যাডমিরাল নিমিৎসকে দিয়া আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে। কিন্তু ম্যাক-আর্থার ছিলেন সমগ্র মিত্রপক্ষীয় তরফের সুপ্রীম কমাণ্ডার। সুতরাং এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাঁর উপরেই অর্পণ করা হইল। কিন্তু এই বিশাল যুদ্ধজাহাজের নাম "মিশৌরি" (Missouri) রাখা হইল কেন? কারণ, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মিশৌরি রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁর কন্যা আনুষ্ঠানিকভাবে নামকরণ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।[১]

জাপানে আমেরিকানদের সদর সামরিক কার্যালয় সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইয়োকোহামায়। ম্যাক-আর্থার কিঞ্চিৎ গর্বের সঙ্গে লিখিয়াছেন যে, জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য তিনি ইয়োকোহামার আটসুগি (Atsugi) বিমান বন্দরে অবতরণ করার পর যখন শহরের দিকে তাঁর দলবল লইয়া মোটর শোভাযাত্রা যোগে যাইতেছিলেন, তখখ সেই ১৫ মাইল পথের দুই ধারে দুই ডিভিসন বা ৩০ হাজার জাপানী সৈন্য লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁকে জাপ সম্রাটের

১। Japan Subdued—P. 155.

অনুরূপ মর্যাদায় পাহারা দিয়াছিলেন। তথাপি মার্কিন মহলে জাপানীদের প্রতি পুরাপুরি বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং ম্যাক-আর্থারের মনের কিছুটা সংশয় দেখা দিয়াছিল এবং তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এত সৈন্য দিয়া পাহারা দেওয়ার পিছনে জাপানীদের কোন গূঢ় মতলব নাই তো ?

হার্বাট ফিজ লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং স্ট্যালিনের চিত্তেও এই বিষয়ে গভীর সন্দেহ ছিল। ২৭শে আগস্ট তারিখ তিনি মস্কোস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারিম্যানের নিকট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, জাপানীদের বিশ্বাস নাই, তাদের মধ্যে অনেক মাথা পাগলা গুপ্তঘাতক ও বিশ্বাসঘাতক রহিয়াছে। সুতরাং মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাপানের বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতা ও রণনেতাদেরকে গ্রেপ্তার করিয়া জামিনস্বরূপ আটক রাখা উচিত।[১]

এই সন্দেহের আর-একটি দৃষ্টান্ত স্বয়ং ম্যাক-আর্থারের বই থেকেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুপ্রীম-কমাণ্ডার সদলে ইয়োকোহামার বিরাট হোটেল—নিউ গ্রাণ্ড হোটেলে যখন প্রথম রাত্রে ডিনার খাইতে বসিলেন, তখন তাঁর টেবিলে পরিবেশিত প্রথম প্লেটটি তাঁহার এক সহকর্মী হঠাৎ কাড়িয়া লইয়া গেলেন এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁর খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা !

অবশ্য ম্যাক-আর্থার তখন সহাস্যে মন্তব্য করিয়াছিলেন—'কেউ কি চিরকাল বেঁচে থাকে ?'...[২]

২রা সেপ্টেম্বর, সকাল ৯টায় (টোকিও সময়) "মিশৌরি" যুদ্ধজাহাজে আনুষ্ঠানিক-ভাবে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের প্রস্তুতি করা হইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া এই দলিল স্বাক্ষরে উপস্থিত ছিলেন বৃটিশ, সোভিয়েত, চীনা, অস্ট্রেলিয়ান, কানাডীয়ান, নিউজিল্যাণ্ড, ডাচ ও ফরাসী—এই মিত্রপুঞ্জের প্রতিনিধিবর্গ। সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে যিনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলন, তিনি ছিলেন প্রায় একজন অজ্ঞাত পরিচয় সেনাপতি জেনারেল ডেরেভিয়াংকো। এর দ্বারা অনুমান করা যাইতেছে যে, রাশিয়া নিজের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের উপর তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন নাই। কারণ, জাপানী সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং জাপানে দখলদারির অংশ প্রাপ্তির দাবি নিয়া ট্রুম্যানের সঙ্গে স্ট্যালিনের বিরোধ ও মন কষাকষি চলিতেছিল।

আর এদিকে জাপানের পক্ষ থেকেও সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন দেখা দিল কোন্ জাপানী নেতা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিবেন ? যদিও জাপানের সম্রাটের পক্ষে পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী এই দলিলকে কার্যতঃ নিঃশর্ত বলা চলে না, তথাপি উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী সৈন্যদের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রেও ভয় ছিল। সুতরাং সম্রাট কর্তৃক পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী আত্মসমর্পণের দাবি গৃহীত হওয়ার পর সুজুকি-মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন এবং যেহেতু আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা স্বয়ং সম্রাটের নির্দেশের অধীন ছিল, সেজন্য স্থির হইল নূতন মন্ত্রিসভাও রাজপরিবারের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হইবে। সম্রাটের আত্মীয় (যিনি সৈন্যবাহিনীর একজন জেনারেল) প্রিন্স হিগাশি কুনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং জাপানের

১। জাপান সার্বাইভড—পৃষ্ঠা ১৫৫ পাদটীকা।

২। ম্যাক-আর্থার—পৃষ্ঠা ৩৮৬।

অন্যতম সম্মানভাজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর পদ-গ্রহণে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী কেউ আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিতে রাজী হইলেন না, কিংবা সাহস পাইলেন না। প্রিন্স কোনোয়ে জাপানের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও জাপানের এই পরাজয়ে ও আত্মসমর্পণের ব্যাপারে মর্মাহত হইলেন। এমন কি পাছে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তিনি আদালতে অভিযুক্ত হন, এই দুশ্চিন্তায় তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিলেন। অথচ ব্যক্তিগত-ভাবে প্রিন্স কোনোয়ে কিন্তু জঙ্গীবাদী ছিলেন না। তিনি আমেরিকা ও রাশিয়া সঙ্গে শান্তিরক্ষা ও আপোষ মীমাংসারই পক্ষপাতী ছিলেন। তথাপি সেদিনের জাপানের সামরিক ঘূর্ণাবর্তের প্রচণ্ড ঝাপ্টা থেকে তিনিও রেহাই পাইলেন না। তাঁর মত আরও অনেককেই মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল…

আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দানের এই সমস্যার মীমাংসা হইল বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিগেমিৎসুর দ্বারা। রাজকীয় নির্দেশে তিনিই জাপানের পক্ষ থেকে প্রধান প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাঁর উপর সম্রাটের এত আস্থা আছে জানিয়া সিগেমিৎসু বরং নিজেকে সম্মানিত বোধ করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি আরও দুইবার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন এবং তিনি যুদ্ধ শেষ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধি জেনারেল উমেজু যদিও দ্বিতীয় ডেলিগেটরূপে মনোনীত হইলেন, তথাপি তিনি দলিল স্বাক্ষরে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। এমন কি, যখন এই প্রস্তাব প্রথম তাঁর নিকট করা হইয়াছিল, তখন তিনি রাগিয়া আগুন হইয়াছিলেন এবং হারাকিরির ভয় দেখাইয়াছিলেন।[১]

অবশেষে সম্রাটের বিশেষ অনুরোধে জেনারেল উমেজুর মত কট্টরপন্থী সেনা-নায়ককেও দলিল স্বাক্ষরে রাজী হইতে হইল। এঁদের সঙ্গে জাপানের আরও ৯ জন প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু পূর্বাহ্নে এঁদের কারুর নামই প্রকাশ করা হয় নাই। এমন কি, জেনারেল ম্যাক-আর্থারের "মিশৌরি" জাহাজের দিকে যাত্রার সময় পর্যন্ত গোপন রাখা হইয়াছিল। কারণ, তখন জাপানে আত্মসমর্পণের বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদী যুবকদেরও অভাব ছিল না। এজন্য আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান স্থলভাগে না হইয়া জলপথে সমুদ্রের উপর যুদ্ধজাহাজে অনুষ্ঠিত হইল।

জেনারেল ম্যাক-আর্থার ও অন্যান্য সকলে একটি মোটর লঞ্চে করিয়া "মিশৌরি" জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়োবৃদ্ধ সিগেমিৎসু সকলের আগে আগে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া এবং একটি লাঠির উপর ভর দিয়া চলিতেছিলেন; তাঁর একটি পা ছিল কাঠের তৈরী। প্রায় বছর পনের আগে সাংহাইতে টেরোরিস্টদের নিক্ষিপ্ত বোমায় সিগেমিৎসুর একখানি পা উড়িয়া গিয়াছিল। তখন থেকে তিনি এই খোঁড়া পায়ের যন্ত্রণা বহন করিয়া রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরাজ গ্রন্থকার মিঃ উইলিয়াম ক্রেইগ মন্তব্য করিয়াছেন যে, যাঁরা সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মনে হইতেছিল সিগেমিৎসু যেন গোটা পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ জাপানী জাতিরই প্রতিনিধি ছিলেন—ভালো করিয়া দাঁড়াইতেও অক্ষম ছিলেন![২]

১। ম্যাক-আর্থার— পৃষ্ঠা ৩৮৮-৮৯।
২। দি ফল অব জাপান—পৃষ্ঠা ২৭২।

টেবিলের উপর সবুজ রঙের কাপড়ের ঢাকনা ছিল, কিন্তু আত্মসমর্পণের দলিলের রঙ ছিল সাদা। আর জাপানের সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে বহু বিচিত্র বর্ণের পোশাক ইউনিফর্ম ও সাজসজ্জা পরিহিত সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তির ভিড় ছিল। আর সামরিক সংবাদদাতারা ও ক্যামেরাম্যানরা সেখানে এত প্রচুর সংখ্যায় সমবেত হইয়াছিলেন যে, ভিড়ের চাপে যেন শ্বাসরোধ হওয়ার অবস্থা হইয়াছিল। সেই উৎসুক জনতার ভিড় সুবৃহৎ জাহাজের সর্বত্র পতাকাদণ্ড থেকে শুরু করিয়া কামানের নলের উপর পর্যন্ত এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করিল। ম্যাক-আর্থার মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'সহস্র চোখের তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টি যেন তীরের মত আমাদের শরীর বিদ্ধ করিতেছিল।'

ম্যাক-আর্থার স্থির পদক্ষেপে মাইকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির প্রতিনিধিরূপে তাঁরা এখানে সমবেত এবং তাঁরা বিজিত ও বিজেতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া যেন এই অনুষ্ঠানের পবিত্র উদ্দেশ্যে রক্ষা করিতে পারেন এবং অতীতের রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের ভিতর থেকে যেন একটি শ্রেষ্ঠতর পৃথিবী জন্মলাভ করিতে পারে—যে পৃথিবীতে স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচারের মর্যাদা রক্ষা পাইবে ঃ

'It is my earnest hope and indeed the hope of all mankind that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past—a world founded upon faith and understanding—a world dedicated to the dignity of man and the fulfillmeut of his most cherished wish—for freedom, tolerance and justice.'

সুপ্রীম কমাণ্ডার অতঃপর জাপানী প্রতিনিধিদিগকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরের জন্য আহ্বান জানাইলেন। সমগ্র জাহাজব্যাপী তখন গভীর নিস্তব্ধতা। গুরুভারজনিত পা ধীরে ধীরে টানিয়া আনিয়া সিগেমিৎসু টেবিলের ধারে একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। হাওয়ায় তখন তাঁর কপালের চুল উড়িতেছিল। তিনি তাঁর সিল্কের টুপি এবং হাতের হলদে দস্তানা খুলিয়া রাখিলেন। তারপর একটি কলম বাহির করিয়া দলিলের উপর চোখ বুলাইলেন, তাঁকে যেন হতবুদ্ধির মত দেখাইল। তখন ম্যাক-আর্থারের নির্দেশে তাঁর চীফ অব স্টাফ টেবিলের ধারে গিয়া দেখাইয়া দিলেন দলিলের ঠিক কোন্ স্থানে সই করিতে হইবে।

বিব্রত পররাষ্ট্র মন্ত্রী যেন একটু লজ্জিত হইলেন এবং তারপর মাথা নীচু করিয়া দলিলে স্বাক্ষর দিলেন। বেলা তখন সকাল ৯টা বাজিয়া ৪ মিনিট।

জাপানের দ্বিতীয় প্রতিনিধি জেনারেল উমেজু দলিলের কিছু না-পড়িয়াই সিগেমিৎসুর স্বাক্ষরের নীচে সই করিলেন।

অতঃপর জেনারেল ম্যাক-আর্থার এবং মিত্রপক্ষের অন্যান্য প্রতিনিধিরা একে একে দলিলে স্বাক্ষর করিলেন।

মাথার উপর তখন বি-২৯ মার্কিন বোমারুগুলি দল বাঁধিয়া উড়িতেছিল এবং আকাশ থেকে সূর্যের আলো যেন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন জ্বলন্ত অক্ষরে ঘোষণা করিতেছিল…

১। Reminiscences—MacArthur, P. 392-93.

৪ঠা সেপ্টেম্বর জাপানী ডায়েট বা পার্লামেন্টের এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হইল এবং সেই অধিবেশনে স্বয়ং সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া এক বক্তৃতা দিলেন এবং সমস্ত প্রজাকে আত্মসমর্পণের শর্তগুলি পালন করিয়া শান্তি ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আহ্বান জানাইলেন।

জাপানের ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল অভূতপূর্ব। কেন না, এর আগে কোন সম্রাট কোনদিন তাঁর প্রজাবর্গের সামনে উপস্থিত হইয়া অনুরূপ বক্তৃতা দেন নাই।

* * *

কিন্তু গোড়ার দিকে সুপ্রীম কমান্ডার ম্যাক-আর্থারের কার্য খুব নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না। কারণ, মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক মত-বৈষম্য ছিল। আর তা'ছাড়া জাপানের মোট ৬৯ লক্ষ ৮৩ হাজার সৈন্যের নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা ছিল। অধিকন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে স্টালিন ও মলোটোভ দাবি জানাইলেন যে, জাপানে মার্কিন দখলদারি নরম (soft) হইতে পারে, এতএব ম্যাক-আর্থারের বদলে জাপানের জন্য একটি চতুঃশক্তির কমিশন নিয়োগ করা হোক।

অন্যদিকে আমেরিকাতেও একশ্রেণীর রাজনীতিক, সংবাদপত্র ও রেডিও ভাষ্যকার এবং কমিউনিস্ট পত্রিকা 'ডেইলি ওয়ার্কার' জার্মানীর বিরুদ্ধে যেমন কঠোর পন্থা অবলম্বনের জন্য দাবি জানাইলেন, তেমনি জাপানের বেলায়ও সম্রাট ও রাজপরিবারকে উচ্ছেদের জন্য দাবি জানাইলেন। তারপর শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ ও রুশ উভয় পক্ষ জাপানে দখলদারিরর অংশ গ্রহণের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু জার্মানীর দখলদারির অভিজ্ঞতা থেকে মার্কিন সরকার এই সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। অবশেষে মস্কো বৈঠকে ১১টি জাতির (যারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল) প্রতিনিধি নিয়া একটি দূর-প্রাচ্য কমিশন এবং একটি Allied Council গঠিত হইল—যে কাউন্সিলের সদস্য হইল আমেরিকা, বৃটিশ কমনওয়েলথ, চীন ও রাশিয়া। কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল। ফলে, এই কাউন্সিল ও কমিশন শেষ পর্যন্ত কোন কাজে আসিল না।

* * *

কিন্তু জাপানী সাম্রাজ্যের পতন ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় সত্ত্বেও এশিয়াতে সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিল না। ব্রহ্মদেশে, সিঙ্গাপুরে, ইন্দোচীনে, মালয়ে এবং ইন্দোনেশিয়ায় (বলা বাহুল্য যে, ভারতে তখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন বজায় ছিল) আগেকার দখলদার শক্তিবর্গ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বৃটিশ শক্তির সহায়তায় স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফলে, স্থানীয় স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে (যাঁরা এতদিন বিদেশীদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন) সংঘর্ষ দেখা দিল—যেমন ইন্দোচীনে হো চি মিনের দলের সঙ্গে এবং ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে। জাপান কর্তৃক পটসডাম ঘোষণা গৃহীত হওয়ার পর ১৭ই আগস্ট ১৯৪৫, ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশানাল পার্টি সুকর্ণের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু বৃটিশ সৈন্যেরা তড়িৎগতিতে আসিয়া হাজির

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪০১।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪১৯।

হইল এবং জাপানীদের সহযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামীদের দমন করিতে লাগিল···

অপরপক্ষে মাঞ্চুরিয়ায় বিজয়ী রুশবাহিনী যখন মাঞ্চুকোতে প্রবেশ করিল, তখন জাপানীদের পৃষ্ঠপোষিত এবং আশ্রিত মাঞ্চুকোর পুতুল 'সম্রাট" পিউ-ঈ (Pu Yi) জাপান অভিমুখে পলায়নের মুখে মুকডেনে ধরা পড়িলেন এবং রুশদের হাতে পাঁচ বছর বন্দী ছিলেন। পরে তাঁকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির হাতে সমর্পণ করা হইয়াছিল। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রাক্তন 'মাঞ্চুকো সম্রাট' পিকিংয়ের পুরাতন রাজপ্রাসাদের বাগানে মালীর কাজ করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন ···[১]

আত্মহত্যা

জাপ সাম্রাজ্যবাদের পতন ও সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের আগে থেকেই জাপানী সেনাবাহিনী এবং জঙ্গীবাদী নেতাদের মধ্যে ঘোরতর মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ, পরাজয়ের গ্লানিটা বজ্রের মত তাদের বুক বিন্ধ করিতেছিল। তবে "দেবতার বংশোদ্ভূত" সম্রাটের নির্দেশনামা মানিয়া লইয়া অনেকে শান্ত হইলেও কট্টরপন্থীরা সান্ত্বনা পাইতেছিল না। তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একদল অভ্যুত্থান ঘটাইবার চেষ্টা এবং সম্রাটকে গ্রেপ্তারপূর্বক ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত পর্যন্ত করিয়াছিল—যে ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনী আগের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। গর্বিত ইম্পিরীয়েল জাপ বাহিনী এখন নিরস্ত্র ও বেকার। সুতরাং নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ বেপরোয়া হইয়া উঠিলেন। জেনারেল আনামি, এ্যাডমিরাল ওনিসি, জেনারেল টানাকা প্রমুখ প্রসিদ্ধ রণনেতারা আগেই আত্মহত্যা বা মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। প্রিন্স কোনোয়ের মত সম্ভ্রান্ত রাষ্ট্রনীতিবিদও একই পন্থা অনুসরণ করিলেন।

এবার "পালের গোদা" জেনারেল হেদিকি তোজোর পালা। দুর্দান্ত তোজো ছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের সবচেয়ে উর্বর মস্তিষ্ক চক্রান্তবাজ। কিন্তু ৬৩ বছর বয়স্ক এই জাপানী বীরপুরুষের গৌরবের দিন অস্তমিত। তাঁর সাধের সৈন্যবাহিনী পরাজিত ও বিপর্যস্ত। সুতরাং জনসাধারণের চক্ষেও তিনি নামিয়া গেলেন এবং অনেকেই প্রত্যাশা করিলেন যে, তিনি এবার আত্মহত্যা করিবেন। এমন কি, তাঁকে হারাকিরি করার জন্য জনগণের মধ্য থেকে তাঁর পরিবারের নিকট টেলিফোনযোগে তাগিদ আসিতে লাগিল।

জেনারেল তোজোর বিশাল বাসগৃহ ছিল টোকিওর বড়লোকদের পাড়ায়, ভূমির আয়তনও ছিল জমিদারির মতো প্রকান্ড এবং সেখান থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে "পবিত্র ফুজিয়ামা" পর্বত দেখা যাইত। কিন্তু এই সম্পদ ও খ্যাতি আজ তোজোর জীবনে যেন বিড়ম্বনা মাত্র। পরাজয়ের গ্লানি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তোজো তাঁর শেষ পন্থা হিসাবে মৃত্যুবরণই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। সুতরাং তিনি

১। টোট্যাল ওয়ার—(দ্বিতীয় খন্ড) পৃষ্ঠা ৩৫০।

সেই চরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছ থেকে জানিয়া নিলেন তাঁর দেহে হার্টের যথাযথ অবস্থান কোথায়। সেই জায়গাটা তিনি চিকিৎসকের কাছ থেকে চিহ্নিত করিয়া আনিলেন। আগে তাঁর কর্তব্য আছে সম্রাট ও সম্রাট পরিবারের প্রতি। একটি পত্র লিখিয়া তিনি যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিলেন এবং রাজ-পরিবারকে সমস্ত দায়িত্ব থেকেই রেহাই দিলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তোজো তাঁর সুসজ্জিত বাগানে বসিয়া খোস মেজাজে গল্প করিলেন। মিত্রপক্ষীয় বোমারুগুলি তাঁর সম্পত্তির, বিশেষভাবে তাঁর সুদৃশ্য পাইন গাছগুলির যে ক্ষতি সাধন করিয়াছে, রিপোর্টারদের কাছে তা' নিয়া তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গণ্য করা হইবে না। 'কেন না, কোন জাতি যদি কোন যুদ্ধকে যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে, তবে সেই যুদ্ধ পরিচালনা করার অর্থই যুদ্ধাপরাধ নয়—এই দুয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই তফাত আছে।'[১]

কিন্তু পরদিনই তোজোর ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। ইয়োকোহামাতে মার্কিন অষ্টম বাহিনীর সদর দপ্তরে যুদ্ধাপরাধীদের যে তালিকা তৈরী হইতেছিল, তাতে তোজোর নাম ছিল প্রথম সারিতে। অপরাহ্ণ চারটার সময় ৬ জন সৈন্যসহ একজন মার্কিন মেজর তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য তাঁর বাসভবনে আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁর গ্রেপ্তারির এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখার জন্য সংবাদপত্রের রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফাররাও ভিড় করিলেন। তোজো তাঁর গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁর আগে তাঁর স্ত্রীকে গৃহত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিলেন, মিসেস্ তোজো তখন পিছনের দরজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এদিকে তাঁর গ্রেপ্তারকারী মার্কিন সৈন্যেরা যখন তাঁর বন্ধ দরজার উপর আঘাত করিতেছিলেন, তখন তোজো হঠাৎ তাঁর পাঠকক্ষের জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—'আমি জেনারেল তোজো'। কিন্তু তিনি জানিতে চাহিলেন যে, তাঁকে গ্রেপ্তার করার উপযুক্ত কর্তৃত্ব আগন্তুকদের আছে কিনা। তাঁরা দোভাষী মারফৎ জানাইলেন যে- হাঁ, আছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া ইয়োকোহামাতে লইয়া যাওয়ার জন্যই তাঁরা আসিয়াছেন।

ব্যস! আর কিছু বলিতে হইল না। তোজো তাঁর কক্ষের একটি চেয়ারের উপর হাঁটুগাড়িয়া বসিলেন এবং তাঁর বুকের চিহ্নিত স্থান লক্ষ্য করিয়া রিভালভারের গুলি চালাইলেন (তাঁর জামাতা কোগা এই রিভালভার দিয়াই যুদ্ধাবসানের দিন আত্মহত্যা করিয়াছিলেন)। বেলা তখন অপরাহ্ণ ৪-১৭ মিনিট। গুলির শব্দে বাইরে অপেক্ষমাণ মার্কিন মেজর ও তাঁর সৈন্যেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন তোজোর মাথা চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়াছে, আর রিভালভারটা মেঝেতে পড়িয়া আছে।

তোজো কিন্তু মরিলেন না। সেই ঘরে ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলিয়া উঠিল—'দ্যাখো পাঁত বেজম্মাটার কাণ্ড। ছুরি চালাবার সাহস পর্যন্ত হলো না।'[২]

১। উইলিয়াম ক্রেইগ, পৃষ্ঠা ২৮৫।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৮৭।

তোজোর কপাল মন্দ। মার্কিনীদের হাতে বন্দী হইয়া তিনি ইয়োকোহামায় সামরিক হাসপাতালে নীত হইলেন এবং সেখানে আমেরিকান সার্জেনদের চিকিৎসায় সারিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁর দেশের লোকের অনেকে এজন্য তাঁকে বিদ্রূপ করিলেন। (পরে যুদ্ধপরাধী হিসাবে তাঁর বিচার ও ফাঁসি হইয়াছিল।)

তোজো যখন মার্কিন সামরিক হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়িতেছিলেন, তখন টোকিওর অন্য এক শহরতলীতে আর-একজন বিখ্যাত সামরিক পুরুষ অনুরূপ সমস্যায় পড়িলেন। তবে, তাঁর সমস্যাটা একটু ভিন্ন ধরনের ছিল। কেন না, তাঁর পত্নীই তাঁকে প্রাণ বিসর্জনের জন্য তাগাদা দিতেছিলেন। ফিল্ড মার্শাল জেনারেল সুগিয়ামা এবং তাঁর ত্রিশ বছর বর্ষীয়া স্ত্রী সুখী দম্পতীরূপেই জীবন যাপন করিতেছিলেন। পার্ল হারবার আক্রমণের সময় সুগিয়ামা ছিলেন সেনানীমণ্ডলীর কর্মাধ্যক্ষ। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের সঙ্গে একান্তরূপে জড়িত। কিন্তু আজ পরাজয়ের জাতীয় বিপর্যয়ের পর সুগিয়ামার মত জাঁদরেল সামরিক পুরুষের নিশ্চয়ই দায়িত্ব অস্বীকার করা উচিত নয়। তাঁর স্ত্রী এই যুক্তিতে তাঁর নিজের এবং জাতির আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সুগিয়ামাকে মৃত্যুবরণের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং সুগিয়ামাও পরদিন আত্মহত্যা করার জন্য সংকল্প করিলেন। তাঁর স্ত্রী খুশী হইলেন এবং স্বামী-স্ত্রী সেদিন রাত্রে মনের আনন্দে মদ্য—সাকি (Sake) পান করিলেন এবং স্ফূর্তিচিত্তে গল্প করিতে করিতে 'শেষ ডিনার' সম্পন্ন করিলেন।

আত্মহত্যার জন্য স্ত্রী স্বামীকে প্ররোচিতা করে, এমন দৃশ্য পৃথিবীতে কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু সেদিনের জাপানে বোধ হয় সবই সম্ভব ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আত্মহত্যায় দেরী হইল। কারণ, সম্রাট সুগিয়ামাকে ডাকিয়া নির্দেশ দিলেন যে, সেনাপতিদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ভুলিয়া গিয়া টোকিও এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পন্ন করা উচিত (আত্মসমর্পণের অনুযায়ী)। সুতরাং সুগিয়ামাকে আগে সম্রাটের আদেশ পালন করিতে হইবে, তারপর নিজের মৃত্যুর কথা।

কিন্তু এদিকে তাঁর স্ত্রী অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁকে ক্রমাগত তাগাদা দিতে লাগিলেন তাঁর প্রাণ বিসর্জনের জন্য, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য। স্ত্রীর তাগাদায় সুগিয়ামার জীবন যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল এবং রাত্রে উভয়ের শয্যা গ্রহণও যেন দুঃসহ বলিয়া মনে হইল। অবশেষে ১১ই সেপ্টেম্বর টোকিও এলাকা থেকে শেষ জাপানী বাহিনী অপসারিত হইল এবং সুগিয়ামা ঘোষণা করিলেন তাঁর কর্তব্য শেষ, এবার তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। একথা শুনিয়া তাঁর স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু সুগিয়ামা বৃদ্ধ এবং তাঁর স্ত্রী তরুণী এবং শেষবারের জন্য তিনি পুনরায় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কবে তুমি হারাকিরি করিবে ?'…

১২ই সেপ্টেম্বর সকালে ফিল্ড মার্শাল সুগিয়ামা বেলা ১০টার সময় তাঁর অফিসে গেলেন এবং তাঁর প্রিয় সেক্রেটারি কোবাইয়াসিকে তাঁর শেষ সংকল্পের কথা জানাইলেন এবং তাঁকে এই বিশেষ অনুরোধসহ তাঁর স্ত্রীর নিকট পাঠাইলেন যেন তাঁর স্ত্রী তাঁর মৃত্যুর পর আত্মহত্যা না করেন।

এরপর ফিল্ড মার্শালের কক্ষ থেকে একটা গুলির আওয়াজ শুনা গেল। সুগিয়ামা তাঁর নিজের বুক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলি করিলেন। অফিসাররা তাঁর কক্ষে ছুটিয়া আসিলেন এবং বিহ্বলচিত্তে লক্ষ্য করিলেন সুগিয়ামা অনিবার্য মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছেন।

ইতিমধ্যে একজন অফিসার টেলিফোনে মিসেস সুগিয়ামাকে তাঁর স্বামীর এই মর্মান্তিক ট্রাজিডির কথা জানাইলেন। তিনি একটিমাত্র প্রশ্ন করিলেন—'সত্যি কি, আমার স্বামী মারা গিয়াছেন ?'

যখন তিনি জবাব পাইলেন—'হাঁ', তখন টেলিফোনের রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং তারপর একটি ছোট্ট ছুরিকা হাতে নিয়া নিজের বুকে বিদ্ধ করিলেন। সেই ক্ষতস্থান থেকে অল্প একটু তাজা রক্ত বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হইল না। মিসেস সুগিয়ামা তখন একটি বিষের পাত্র (সায়েনাইড) মুখে তুলিয়া নিলেন এবং নিঃশেষে পান করিলেন।

মিসেস্ সুগিয়ামার বিগত-প্রাণ দেহ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।…

অবশ্য সম্রাটের জন্য এবং দেশের জন্য হারাকিরির দ্বারা আত্মবিসর্জন করা জাপানে বীরের ধর্মরূপে গণ্য এবং এই ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রথা পালন করিতে না পারাই বরং ভীরুতারূপে পরিচিত।

সৈন্যদের অত্যাচার

প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধের ফলে বিজয়ী সৈন্যদের দ্বারা নানাপ্রকা বর্বরতা, অত্যাচার, অনাচার ঘটিয়া আসিতেছে এবং সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছে পুরুষ বন্দীদের উপর নির্যাতন এবং নারীধর্ষণ। এবারের মহাযুদ্ধেও এই সমস্ত বর্বরতা বহু দেশেই চরমে উঠিয়াছিল। যদিও ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারের সঙ্গে কোন তুলনা দেওয়াই চলে না, তবু মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা নানা স্থানে বহু অনাচার করিয়াছে। যেমন জাপানের আত্মসমর্পণের পর গোড়ার দিকে দখলদার মার্কিন সৈন্যেরা ইয়োকোহামা, ইয়োকোসুকা এবং টোকিওতে লুঠতরাজ, মাতলামি ও নারীধর্ষণের বহু ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ত ও আগুনের ভিতর দিয়া যাদের দিনরাত্রি কাটে এবং মাসের-পর-মাস যারা স্ত্রী পুত্র পরিবারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অস্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়, তাদের যৌন-মনস্তত্ত্ব সাধারণতঃ উগ্ররূপ ধারণ করে। এই সমস্ত "ক্ষুধার্ত সৈন্যের" জন্য সময় সময় কিছু "সুযোগের" ব্যবস্থাও করিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং আত্মসমর্পণের দলিলে জাপানের স্বাক্ষর দানের পর যখন মার্কিন সৈন্যদের টোকিওতে প্রবেশ আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন একজন সামরিক অফিসার আসিয়া টোকিওর পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'টোকিওর রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট, অর্থাৎ গণিকাপল্লী কোথায় ?'

কিন্তু মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের ব্যাপক আক্রমণে টোকিওতে যে ধ্বংসকাণ্ড ও অগ্নিলীলার বিস্তার হইয়াছিল, তার ফলে টোকিওর জগদ্বিখ্যাত গণেকাপল্লী "যোশিওয়ারি এলাকা" পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জাপানী গবর্নমেণ্ট অতি দ্রুত শহরের

অন্য একটি অংশে একটি নতুন গণিকাপাড়া গড়িয়া তুলিলেন। আমেরিকান অফিসারটি সেই নতুন ঠিকানা এবং "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ" সংবাদটি জানিয়া নিলেন।...

দখলদারি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সৈন্যদের উচ্ছৃংখলতা, ডাকাতিও লুঠের খবর এবং বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদের উপর বলাৎকারের খবর আসিতে লাগিল। ইংরাজ গ্রন্থকার উইলিয়াম ক্রেইগ লিখিয়াছেন যে, বিজয়ী মার্কিন সৈন্যদের লাঞ্ছনা থেকে নারীর ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে জাপানী মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে বিষপানে আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন। তবু প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলি বলাৎকার অনুষ্ঠিত হইল। ইয়োকোসুকা শহরের তিনজন মার্কিন সৈনা একজন জাপানীর গৃহে হানা দিয়া তার স্ত্রী ও কন্যার উপর ধর্ষণ করিল।

অবশ্য এই সমস্ত অত্যাচারের ঘটনার পর সুপ্রীম কমাণ্ডার ম্যাক-আর্থার এই মর্মে কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, কাহারও বলাৎকারের অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে।

এই সমস্ত কড়াকড়ি ও কঠোরতা অবলম্বিত হওয়ার পর জাপানে নারীর উপর চরম লাঞ্ছনার মাত্রা অবশ্য কমিয়া গিয়াছিল।...

কিন্তু বিজিত জাপানে যখন এই অবস্থা চলিতেছিল তখন বিজয়ী আমেরিকাতে "শান্তির ললিত বাণী" কি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল? অর্থাৎ জাপানের পরাজয় স্বীকারের বার্তা প্রচারিত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামে, শহরে ও বড় বড় নগরীতে কি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল?

বিভিন্ন মার্কিন পত্রিকার রিপোর্ট অনুসন্ধান করিয়া মিঃ ক্রেইগ লিখিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরে শহরে, জনপদে জনপদে হল্লা, আমোদ ও উচ্ছৃংখলতার যেন প্রবল বান ডাকিল। অনেক বছর পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসানে ও শান্তি ঘোষিত হওয়ার পর দলে দলে নরনারী যেন বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারে গা ভাসাইয়া দিল। ফুর্তিবাজ ও হল্লামত্ত সৈন্যরা শহরের কেন্দ্রস্থলগুলিতে চলমান মোটরে লাফাইয়া উঠিতে এবং মহিলাদের চুম্বন করিতে লাগিল। মহিলারা কোন প্রতিবাদ করিলেন না। টাইমস্ স্কোয়ারে উৎসবমত্ত নরনারীর যেন ভিড় জমিয়া গেল। তীব্র বৈদ্যুতিক আলোর উজ্জ্বল আভায় পুরুষ ও নারী পরস্পরকে চুম্বন আলিঙ্গন এবং প্রেমের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপে ও মদ্যপানে মাতিয়া উঠিল। বিখ্যাত "ওয়াশিংটন পোস্ট" সংবাদপত্রের অট্টালিকার সম্মুখে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ দেখা গেল একটি ট্যাক্সি থেকে একটি সৈন্য ও একটি যুবতী নামিয়া আসিতেছে এবং নামিয়াই তারা রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে তাদের পরিহিত জামা কাপড় সব ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। রাস্তার উপর দণ্ডায়মান "সহানুভূতিসম্পন্ন দর্শকেরা" তাদের উদ্দেশ্যে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—'খুলে ফেলো, খুলে ফেলো, সব খুলে ফেলো!'

সত্যি সত্যি সেই নরনারী সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া রাস্তায় উপর সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল ...

কিন্তু ভয়াবহ উচ্ছৃংখলতা এবং হিংস্র তাণ্ডব ঘটিল স্যানফ্রান্সিস্কোতে। অপরাহ্ণ সময় জাপানের আত্মসমর্পণের খবর আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল নৌসৈন্য ও নাগরিকদের মদ্যপানের বেপরোয়া মাতলামি ও উন্মত্ততা। চীৎকারে, হল্লায় ও মোটরগাড়ী চাপা পড়ায় যেন এক ধরনের সন্ত্রাসের দৃশ্যের অবতারণা হইল। বলাই-

বাহুল্য যে, এমন প্রমত্ত প্রমোদের পরিস্থিতি যুবতী নারীদের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল এবং বিপদ ঘটিলও বটে, অন্ততঃ ৬টি যুবতী পথচারিণীর :

'People stood horrified as at least six girls were forcibly thrown on the pavements, held down and repeatedly raped. No one moved to their aid. Policemen watching the assaults looked the other way, afraid to confront the liquor-rodden serviceman.'

প্রকাশ্য রাস্তার উপর ফেলিয়া অন্ততঃ ৬টি যুবতীর উপর সুরামত্ত সৈন্যদের বারবার বলাৎকার অনুষ্ঠানের কি ভয়াবহ বর্ণনা। দর্শকেরা ত্রাসগ্রস্ত, স্তম্ভিত, আর পুলিশেরা অসহায়ের মত অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল !'

এভাবেই যুদ্ধ শেষ হইল এবং সম্ভবতঃ যুগে যুগে এমন বর্বরতার মধ্য দিয়াই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়া থাকে, আর অগণিত মানবের আর্তনাদ ধ্বংস, মৃত্যু ও অত্যাচারের আড়ালে চাপা পড়িয়া যায়। ইতিহাসের পরিহাস এই যে, শেষ পর্যন্ত দেশের লোকও সেই সমস্ত পাশবিকতার কথা ভুলিয়া যায়। এমন কি, আবার নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

যুদ্ধাবসানের ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হোয়াইট হাউজ থেকে ঘোষণা করিলেন যে, জাপান নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবি মানিয়া লইয়াছে। সমস্ত রণাঙ্গনে কামান গর্জন স্তব্ধ হইয়াছে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। জাপানের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর—২রা সেপ্টেম্বর তারিখটি জাপানের উপর বিজয় দিবসরূপে (V. J. Day) উদ্‌যাপনের জন্য ঘোষণা করা হইল। এই বিজয়দিবসের বক্তৃতায় ট্রুম্যান তাঁদের কথা স্মরণ করিলেন, যাঁরা এই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন এবং অসহ্য দুঃখভোগ করিয়াছেন। তাঁদের এই আত্ম-বিসর্জন ও যন্ত্রণা ভোগের জন্যই এই যুদ্ধ জয় সম্ভব হইয়াছে। তিনি তাঁর এই বক্তৃতায় মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে কোন মত বিরোধের কথা উল্লেখ করিলেন না কিংবা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পর্কেও কোন মন্তব্য করিলেন না। বরং আগামী দিনের পৃথিবীর শান্তি, নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার এক নতুন যুগ সম্ভাবনার উপরেই জোর দিলেন। তিনি এই বক্তৃতায় ভগবানের কথাও ভুলিলেন না এবং স্মরণ করিলেন তাঁর সাহায্যেই এই জয় সম্ভব হইয়াছে এবং তাঁর সাহায্যেই আগামী দিনের পৃথিবীর শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জিত হইবে :

'From this day we move forward. We move toward a new era of security at home. With the other United Nations we move toward a new and better world of peace and international good will and and co-opperation.

God's help has brought us to this day of victory. With his help we will attain that peace and prosperity for ourselves and all

১। The Fall of Japan, William Craig p. 185.

the world in the years achead.'[১]

চার্চিল যেমন এ্যাটম্ বোমার সাফল্যের জন্য একটি বিবৃতিতে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং "ঈশ্বরের দয়াতেই" (by God's marcy) একমাত্র বৃটেন ও আমেরিকা পারমাণবিক রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানও তেমনি এত বড় যুদ্ধ জয়ের জন্য ভগবানের প্রতি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১৯শে আগস্ট, রবিবার, তারিখটিকে নির্দিষ্ট করিলেন। কারণ, একমাত্র তাঁর দয়াতেই থমস্ত দুঃখকষ্ট ও বিপদ পার হইয়া এত বড় গৌরবান্বিত বিজয় অর্জন সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং আসুন আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দেই।'

অবশ্য ঈশ্বরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের আগে ১৫ই আগস্ট জাপানের আত্ম-সমর্পণের সংবাদ পাওয়া মাত্র ট্রুম্যান রাত্রি ৮টার সময় হোয়াইট হাউজের সম্মুখে সমবেত জনতার নিকট জয়ের উল্লাস প্রকাশ করিলেন এবং তাঁর আত্মস্মৃতিতে গর্বের সঙ্গে মন্তব্য করিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এত বড় যুদ্ধজয়ের পরেও মানুষের সুখ-শান্তি ছাড়া কোন দেশের কোম ভূমিখণ্ড কিংবা কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করে নাই। 'পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোন জাতির পক্ষে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ।'[৩]

এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, হিটলারও অনেক যুদ্ধজয়ের পর ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নেতাদের মতই "ঈশ্বরের অনুগ্রহে"'র দোহাই দিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে আত্মহত্যাও করিতে হইয়াছিল?

এদিকে মস্কোতেও জাপানের আত্মসমর্পণ উপলক্ষে ৩রা সেপ্টেম্বর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান হইল এবং স্ট্যালিন তাঁর বক্তৃতায় ১৯০৪ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ (ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে) ও জাপানের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের কথা উল্লেখ করিলেন। তবে, এবার জাপানের পরাজয়ের জন্য রাশিয়া যে পুনরায় দক্ষিণ শাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ পুনরায় ফেরত পাইবেন এবং এখন থেকে প্রশান্ত মহাসাগর প্রবেশের পথে আর বাধা রহিল না, সে কথা স্মরণ করিলেন। আর দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন যে, এখন থেকে সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিম দিকে জার্মানী এবং পূর্ব দিকে জাপানী আগ্রাসনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হইল।

রেড স্কোয়ারে জয়োৎসব অনুষ্ঠিত হইল এবং বহু আতসবাজী পোড়ানো হইল বটে, কিন্তু কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে জাপানের বিরুদ্ধে এই জয়লাভে রুশ জন-গণের মধ্যে তেমন উৎসাহ ছিল না এবং নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়োৎসবের সময় যে বিশাল জনতার সমাবেশ হইয়াছিল, এবার তার এক-দশমাংশও উপস্থিত ছিল না।

তথাপি রাশিয়ার দাবি এই যে, মাঞ্চুরিয়ায় তাদের আক্রমণের জন্যই জাপানের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিয়াছে। অপরপক্ষে আমেরিকার দাবি এই যে, এ্যাটম্ বোমার চূড়ান্ত আঘাতেই জাপান এতদ্রুত ধরাশায়ী হইয়াছে। কিন্তু অনেকের ধারণা এই যে, পটসডাম ঘোষণার সময়েই জাপান আত্মসমর্পণের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিল। কিন্তু তারা জাপ সম্রাটের মর্যাদা সম্পর্কে আশ্বাসের দাবি করিয়াছিল। হিরোশিমায় বোমা

১। Japan Subbued—Fais, p. 156

২। ট্রুম্যান (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৪৯৮

৩। (ঐ খণ্ড), পৃষ্ঠা ৪৮২

বর্ষণের চারদিন আগে এবং মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আক্রমণের ৬ দিন আগে ২রা আগস্ট তারিখ মস্কোতে জাপানী রাষ্ট্রদূত মলোটেভের নিকট পটসডাম ঘোষণার এই প্রশ্নটি নিয়াই আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁর সেই অনুরোধ ব্যর্থ হইয়াছিল।

*

রাশিয়া কর্তৃক মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণের আগে স্ট্যালিন একমাত্র চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে চীনের ঐক্য রক্ষা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন মার্কিন গ্রন্থে (যেমন, হপকিন্সের রিপোর্ট অনুযায়ী শেরউডের বিখ্যাত ইতিহাসে) উল্লেখ করা হইয়াছে, ইদানীংকালের মস্কো থেকে প্রকাশিত সামরিক ইতিহাসগুলিতে সেই সমস্ত কথা অস্বীকার করা হইয়াছে। বরং দাবি করা হইয়াছে যে জাপানীদের বিরুদ্ধে মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত বাহিনীর যুদ্ধের সময় চীন ও সোভিয়েত জনগণের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এই বন্ধুত্ব উভয় পক্ষের রক্তের মূল্যে গাঢ়তর হইয়াছিল। সেই সময় মাও সে-তুং লিখিয়াছিলেন ঃ

'The Red Army went to the assistance of the Chinese people. This is unprecented in the history of China. Its impact is incalculable.'

অর্থাৎ 'লালফৌজ চীনা জনগণের সহায়তার জন্য আগাইয়া আসিয়াছিলেন। চীনের ইতিহাসে এই ঘটনা অভূতপূর্ব এবং এর প্রভাব অপরিমেয়।'

এই প্রসঙ্গে আরও দাবি করা হইয়াছে যে, সোভিয়েত বাহিনীর হাতে পরাজিত জাপানী কোয়াণ্টাং বাহিনীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ চীনের গণফৌজের (পিপলস লিবারেশন আর্মি) হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং এভাবে চীনের বৈপ্লবিক শক্তিকে সহায়তা করা হইয়াছিল।

যদিও জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ এবং চীনেরপ্রশ্ন নিয়া কিছু-কিছু বিতর্কের অবসর আছে, তথাপি ইতিহাসের দিক থেকে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইউরোপে ও সুদূর প্রাচ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার জয়লাভের জন্যই চীনে ও এশিয়া মহাদেশে বৈপ্লবিক শক্তিগুলির জয়যাত্রা ত্বরান্বিত হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়

ন্যুরেমবার্গের বিচার : যুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, 'মিশৌরি' যুদ্ধজাহাজে জাপান কর্তৃক সরকারীভাবে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের পর বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইল। কিন্তু ইতিহাসের অভূতপূর্ব এই মহাযুদ্ধ শেষ হইলেও যারা এই পৃথিবীব্যাপ্ত হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসের জন্য দায়ী ছিল, তারা তাদের এই কৃতকর্মের জন্য রেহাই পাইল না। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেমন মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এক নতুন যুগের সিংহদ্বার (কিংবা মৃত্যুদ্বার ?) খুলিয়া দিল, তেমনি নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের সামরিক ও অসামরিক অফিসার ও নেতাদেরকে যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী করিয়া বিচার ও দণ্ডদানপূর্বক মহাযুদ্ধের ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা হইল। ৩০শে মে, ১৯৪৫, লণ্ডনের "রাজকীয়-ন্যায়-আদালতে" ইউনাইটেড্ নেশন্সের ওয়ার ক্রাইমস্ কমিশনের চেয়ারম্যান লর্ড রাইট-এর (Lord Wright) অধিনায়কত্বে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল, তারই ফলে যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পর্কে চতুঃশক্তির মধ্যে এক নতুন চুক্তি ও চার্টার বা সনদ সাক্ষরিত হইল। ৮ই আগস্ট, ১৯৪৫, লণ্ডনে এই সনদের স্বাক্ষরকারীরা ছিল বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া। এই সনদের দ্বারা ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হইল যে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অনুষ্ঠান, যুদ্ধের আইনভঙ্গ এবং অসামরিক জনগণের—এমন কি নিজ দেশের নাগরিকদের প্রতিও বর্বরতার অনুষ্ঠান আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে। জার্মানীর সামরিক, রাজনৈতিক ও শ্রমশিল্পের নেতাদেরকে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে (ট্রাইব্যুনাল) বিচারের ব্যবস্থা করা হইবে।

কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কিংবা বিচারের প্রস্তাব এই প্রথম নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরও এই ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল বটে, তবে সেগুলি ছিল ভিন্ন প্রকৃতি এবং তখনও অত্যাচার ও ত্রাসের কাহিনী শুনা গিয়েছিল। যেমন—বেলজিয়মের অসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে, 'নার্স এডিথ ক্যাভেল'-এর ও ক্যাপ্টেন ফ্রাইটের (Fryatt) হত্যাকাণ্ডে এবং হাসপাতাল জাহাজ ও বাণিজ্য তথা যাত্রীবাহী জাহাজগুলির (যেমন, 'লুসিটানিয়া') স্বেচ্ছাকৃত নিমজ্জনে। প্রথম মহাযুদ্ধের এটি একটি অন্যতম ভয়াবহ ঘটনা। ৩১,৫০০ টনের এই বৃটিশ জাহাজটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজের অন্যতম। ১৯১৫ সালের ৭ই মে এই জাহাজটি জার্মান সাবমেরিন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত দুইটি টর্পেডোর আঘাতে ২০ মিনিটের মধ্যে সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিল। এই জাহাজে ১,২৫৫ জন যাত্রী ৬৫১ জন লস্কর ছিল। এদের মধ্যে ১২৪ জন আমেরিকান সহ মোট ১,১৯৮ জন নিমজ্জিত কিংবা নিহত হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের অন্যতম কারণ ছিল এই যাত্রী জাহাজের ধ্বংস সাধন। 'লুসিটানিয়া' জাহাজে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ ছিল না।

কিন্তু যারা এই সমস্ত অপরাধের জন্য দায়ী ছিল, তাদের বিচারের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে নাই। কয়েকটি তদন্ত কমিশনও নিযুক্ত হইয়াছিল বটে, সাক্ষ্য প্রমাণও কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু আসামীদেরকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে অভিযুক্ত করা সম্ভব ছিল না। এর প্রধান কারণ এই যে, সেবার মিত্রশক্তিবর্গের দ্বারা জার্মানী দখলীকৃত ছিল না। কিন্তু সেবারেও তদন্তে দেখা গিয়াছিল যে, অপরাধগুলি পূর্ব-পরিকল্পিত ও পূর্ব-সংকল্পিত ছিল—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের অপরাধের এটাই ছিল নিয়মিত বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য ভার্সাই সন্ধির ২২৮-২৩০ অনুচ্ছেদ অনুসারে জার্মানী যুদ্ধসংক্রান্ত অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে মিত্রশক্তিবর্গের হাতে অর্পণ করিতে বাধ্য ছিল এবং মিত্রশক্তিবর্গের সামরিক আদালতে তাদের বিচারেরও কথা ছিল, তথাপি কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২০ সালের প্রথম ভাগে জার্মানীর সবচেয়ে খ্যাতিমান, সম্মাননার্হ ব্যক্তিদের নামের তালিকাসহ মোট ৯০০ ব্যক্তির বিচারের দাবি করিয়া মিত্রপক্ষ যে দলিল পেশ করিলেন, তাতে স্বয়ং জার্মানীর সম্রাট বা কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম, ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গ, ফিল্ড মার্শাল লুডেনডর্ফ, এ্যাডমিরাল ফন্ তিরাপিৎস্ (Tripitz) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নৌ-সেনাপতি, সেনানায়ক এবং অধিকাংশ প্রিন্স বা রাজপুত্রদের নাম ছিল। কাইজারের বিরুদ্ধে "আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ও সন্ধিচুক্তির পবিত্রতা ভঙ্গের চরম অপরাধের" অভিযোগ আনা হইয়াছিল। কাইজার অবশ্য হল্যাণ্ড বা নেদারল্যান্ডসে পলাইয়া গেলেন এবং সেখানে আশ্রয় নিলেন। ডাচ গভর্নমেণ্ট এই যুক্তিতে কাইজারকে মিত্রশক্তির হাতে অর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন যে, ওলন্দাজদের (ডাচ্) আইনে এই ধরনের কোন অপরাধের উল্লেখ নাই এবং এই অপরাধ একমাত্র ভার্সাই সন্ধির বলে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং যে অপরাধের আগে কোন আইনগত অস্তিত্ব ছিল না, তার বিচারের দাবি ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

অন্যান্য আসামীদের সম্পর্কে জার্মানীর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হইল যে, রাইখস্ট্যাগে (পার্লামেণ্টে) বিশেষ আইন প্রণয়ন ছাড়া এঁদেরকে মিত্রশক্তিবর্গের হাতে অর্পণ করা যাইবে না। কারণ, এঁদের অধিকাংশ জার্মানীতে জাতীয় বীরপুরুষরূপে সম্মানার্হ। সুতরাং কোন গবর্নমেণ্ট এঁদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করতে গেলে সেই সরকারের তৎক্ষণাৎ পতন অনিবার্য। তবে, বিকল্প প্রস্তাব অনুসারে কয়েকজন নিম্নপদস্থ অফিসারকে লাইপজিগের সুপ্রীমকোর্টে অভিযুক্ত করা হইল। কিন্তু সেখানে বিচারের নামে বিচারের প্রহসন হইল।"[১]

প্রথম মহাযুদ্ধের এই অভিজ্ঞতা থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিত্রপক্ষীয় নেতার আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৯৪১ সালের ২৫শে অক্টোবর চ্যার্চিল এবং রুজভেল্ট, ১৯৪১ সালের জানুয়ারী ও ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে মলোটোভ জার্মান অধিকৃত দেশগুলিতে নৃশংসতা অনুষ্ঠান সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলেন এবং হিটলারী গবর্নমেণ্ট, জার্মান হাইকমাণ্ড ও তাদের কুকার্যের অংশীদারগণকে এই সমস্ত অপরাধের জন্য দায়িত্ব

১। The Second Great War—Si John Hammerton, vol.9, P. 3971

বহন করিতে ও শাস্তি পাইতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে লর্ড রাইটকে চেয়ারম্যান করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে নিযুক্ত একটি যুদ্ধাপরাধ কমিশনের তরফ হইতে সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা হইল।…

১৯৪৩, নভেম্বর মাসে মস্কোতে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হইল যে, যে-যে নাগরিকদের বিরুদ্ধে জার্মান অফিসার ও নাৎসী পার্টির সদস্য ও লোকেরা নৃশংসতা, নির্বিচার হত্যা ও প্রাণ হননের জন্য দায়ী, তাদেরকে সেই-সেই দেশে ফেরত পাঠানো হইবে এবং সেই সমস্ত দেশের আইন অনুযায়ী তাদের বিচার ও দণ্ড হইবে। কিন্তু প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের এবং যাদের অপরাধ কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, তাদেরকে মিত্রপক্ষের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে। ১৯৪৫ সালের বিখ্যাত পটসডাম সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটিশ গবর্নমেণ্টের প্রধানগণ কর্তৃক এই ঘোষণা অনুমোদিত হইল।

জার্মানীর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দণ্ডদান সম্পর্কে এই পটভূমিকা স্মরণীয় এবং বিশেষভাবে স্মরণীয় এজন্য যে, একমাত্র ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে প্রধান প্রধান জার্মান নেতাদের বিচার হইয়া থাকিলেও মিত্রপক্ষীয় বিভিন্ন দেশে ও অধিকৃত জার্মান এলাকায় বহু নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট সামরিক বা প্রশাসনিক ব্যক্তির বিচার ও ফাঁসি হইয়াছিল। যেমন, মস্কো ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৩, ডিসেম্বর মাসে চারজন জার্মানের বিরুদ্ধে গ্যাস সহযোগে অসামরিক সোভিয়েত নাগরিকদেরকে দলবদ্ধভাবে হত্যার অভিযোগ আনা হইল এবং বিচারের পর প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

যুদ্ধ যতই শেষ হইয়া আসিতেছিল, ততই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য নানাস্থানে সামরিক আদালত প্রতিষ্ঠিত ও অভিযুক্তদের বিচার ও দণ্ড হইতেছিল। ১৯৪৬, ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত জার্মানীর বৃটিশ অধিকৃত এলাকায় ৪৪২ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৩২০ জন আসামী দণ্ডিত হইয়াছিল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতদের মধ্যে একটি জার্মান সাবমেরিনের (১৯৪৪ সালে অতলান্তিক মহাসমুদ্রে) একজন ক্যাপ্টেন ও দুইজন অফিসারও ছিলেন।

১৯৪৫ সালের ১৭ ই সেপ্টেম্বর জার্মানীর লুনবার্গে কুখ্যাত বেলসেন বন্দীনিবাসের স্টাফ্ বা কর্মচারীদের মধ্য থেকে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হইল। ১৮ই নভেম্বর তারিখ এদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক সহ মোট ১১ জন আসামীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। এই সমস্ত অপরাধীর মধ্যে ক্যাম্প কমাণ্ড্যাণ্ট জোসেফ ক্রমার (Kramer), ক্যাম্প ডাক্তার ফ্রিৎস ক্লিন (Fritz klein) এবং প্রধান নারী ওয়ার্ডার ইরমা গ্রেসি (Irma Gress) অত্যন্ত জঘন্য ও বর্বর অত্যাচারের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া ছিল এবং তাদের সকলেরই ফাঁসি হইয়াছিল। এই দলের মক্ষীরানী ইরমা গ্রেসি এবং ক্রমার 'বিস্ট অব্ বেলসেন্' কিংবা বেলসেনের পশুরূপে কুখ্যাত হইয়াছিল। এটাই ছিল জার্মানীতে বন্দীশিবিরের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের প্রথম বিচার।

ইতালীতে ডুস্টলার (Dostler) নামে একজন জার্মান জেনারেলকে একটি মার্কিন সামরিক আদালতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল ১৫ জন মার্কিন কমাণ্ডো সৈন্যকে হত্যা

করার জন্য। এই সৈন্যেরা তখন যুদ্ধবন্দী ছিলেন। জার্মান সেনাপতি এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন যে, কমাণ্ডো অভিযানে ধৃত সমস্ত শত্রুসৈন্যকে সংহার করার জন্য হিটলারের কড়া হুকুম ছিল। সুতরাং তিনি উপরওয়ালার হুকুম কার্যকর করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু আদালতে তাঁর এই যুক্তি গ্রাহ্য হয় নাই। কেন না, জেনেভা কনভেনশন অনুসারে যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করা যুদ্ধাপরাধ হিসাবে গণ্য।

* * *

যুদ্ধের শেষে বিজয়ী পক্ষের মধ্যে বহু মতভেদ ছিল, একথা সত্য। কিন্তু একটি বিষয়ে তাদের সকলে একমত ছিলেন এবং তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ছিল যারা যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী, যারা হিংস্রতা ও নির্মমতার দ্বারা অগণিত মানুষের সর্বনাশ করিয়াছে, তাদের দণ্ড দিতেই হইবে এবং কোন মতেই তাদের রেহাই দেওয়া হইবে না। মিত্রপক্ষীয় প্রধান চতুঃশক্তির স্বাক্ষরিত (৮ আগস্ট, ১৯৪৫) এই চার্টারে রাষ্ট্রপুঞ্জের আরও ১৯টি সদস্যরাষ্ট্র যে স্বাক্ষর দিল, তার ফলেই আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত গঠিত এবং প্রধান প্রধান নাৎসী নেতাদের বিচার অনুষ্ঠিত হইল। ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যে পুরাতন ন্যুরেমবার্গ শহর ছিল হিটলারের প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল সোসিয়েলিস্ট পার্টির বিরাট বিরাট সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের লীলাভূমি এবং যেখানে লক্ষ লক্ষ জার্মান নর-নারী-যুবক হিট্‌লারী মেঠো বক্তৃতার উন্মাদিনী মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পর-রাজ্য দখলে লোভাতুর হইয়াছিল, সেই ন্যুরেমবার্গের বিচার কক্ষেই বড় বড় নাৎসী নেতাদের জীবনের উপর যবনিকা নামিয়া আসিল।

২০শে নভেম্বর, ১৯৪৫, বেলা ১০টার সময় ৮ই আগস্টের স্বাক্ষরিত চার্টার অনুযায়ী ন্যুরেমবার্গে আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের অধিবেশন শুরু হইল। বিচারকমণ্ডলী গঠিত হইল চার জন জজ ও চার জন বিকল্প জজ নিয়া। যেমন—

১. সভাপতি লর্ড জাস্টিস জিওফ্রে লরেন্স (বৃটিশ (
২. বিকল্প—স্যার উইলিয়াম নরম্যান বারকেট্
৩ মিঃ ফ্রান্সিস বিড্‌ল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন এটর্নি-জেনারেল)
৪. বিকল্প—জজ জন জে. পার্কার
৫ ফ্রান্সের পক্ষ থেকে—Henri Donnedvieu de Vabres.
৬ বিকল্প—Le Conseiller Falco.
৭. সোভিয়েত ইউনিয়ন—মেজর জেনারেল আই টি নিকিৎচেংকো
৮ বিকল্প—লেঃ কর্নেল এ এফ ভলচকোভ

বৃটিশ, মার্কিন, ফরাসী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রধান অভিযোক্তা কৌঁসুলি ছিলেন যথাক্রমে—স্যার হার্টলি শ'ক্রস্ (Shawcross) কে-সি, এম-পি, জাস্টিস রবার্ট এইচ. জ্যাকসন, Francosi De Menthon এবং জেনারেল আর. এ রুদেংকো।

এঁরা ছাড়া এঁদের সঙ্গে আরও ছিলেন স্যার ডেভিড ম্যাকসওয়েল-ফাইফ্ (Maxwell Fyfe), চার্লস দুবোস্ট (ফ্রান্স) এবং কর্নেল ইউরি পোক্রোভস্কি (রাশিয়া)।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৪৫, চারটি অভিযোগকারী সদস্যরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ২৪ হাজার শব্দ সম্বলিত অভিযোগপত্র পেশ করা হইল ৬টি জার্মান সংগঠন এবং হিটলারী

জার্মানীর ২৪ জন সামরিক ও নাৎসী নেতার বিরুদ্ধে।

নিম্নলিখিত সংগঠনগুলিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।

১. জার্মান সেনানীমন্ডলী এবং জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর হাইকমাণ্ড।

২. জার্মানীর গুপ্ত মন্ত্রিসভাসহ রাইখ ক্যাবিনেট, ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্যবর্গ, অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ এবং সরকারী দপ্তরের প্রধানগণ।

৩. মূল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রীয় আড্ডা—নাৎসী পার্টির নেতৃত্ব—সমস্ত পার্টি-অফিসার এবং প্রশাসকবর্গ (Gaulerter) প্রভৃতি।

৪. এস. এস. বাহিনী—গোড়াতে এই বাহিনী গঠিত হইয়াছিল হিটলারের ও অন্যান্য নাৎসী নেতাদের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসাবে। কিন্তু পরে এরা একটা উৎপীড়ক পুলিশ বাহিনীতে ও ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হইল।

৫ এস. এ. হিটলারের গোড়াকার দিকের অনুচরদের নিয়া গঠিত ঝটিকাবাহিনী বা স্টর্ম-ট্রুপার।

৬. গেস্টাপো বা গুপ্ত পুলিশ—সর্বপ্রকার নৃশংস অত্যাচারের জন্য অতি কুখ্যাত সংগঠন।

যে ২৪ জন প্রধান আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছিল, তাদের নাম ঃ

১. হেরমন উইলহেলম গোয়েরিং—দুই নম্বর নাৎসী নেতা, জার্মান বিমান-বহরের অধিনায়ক, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দীশিবির প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্ভাবক এবং একজন সেরা নাৎসী নেতা

২. জোয়াচিম ফন রিবেণ্টপ—নাৎসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির প্রধান উদ্যোক্তা এবং ইহুদী-বিদ্বেষ অভিযানের মুখ্য পাণ্ডা।

৩. আলফ্রেড রোজেনবার্গ—হিটলারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ন্যাশনাল সোসিয়েলিস্ট তত্ত্বের প্রধান দার্শনিক উদ্গাতা এবং 'নাৎসী পার্টির আত্মিক ট্রেনিয়ের' পরিচালক।

৪. উইলহেলম ফ্রিক—রাইখস্ট্যাগের গোড়াকার দিকের নাৎসী নেতা এবং বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সংরক্ষক বা প্রোটেক্টর।

৫. জুলিয়াস স্ট্রেইচার—যৌনবিষয়ক অতি অশ্লীল সাময়িকীর সম্পাদক ও ভয়াবহ রকমের গোঁড়া ইহুদীবিদ্বেষী—'মানুষের দেহে ইহুদীরা হইতেছে মূর্তিমান শয়তান'—এই তত্ত্বের প্রচারক।

৬. ভাল্টার ফাঙ্ক—প্রাক্তন অর্থনৈতিক মন্ত্রী। রাইখ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট এবং বৃহৎ ব্যবসায় ও নাৎসীদের মধ্যে সক্রিয় সংযোগ রক্ষাকারী।

৭. রুডলফ্ হেস—ফুয়ারের ডেপুটি, ৩নং নাৎসীনেতা, পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ মীমাংসার ভারপ্রাপ্ত নায়ক। একজন শীর্ষনেতা।

৮. হ্যান্স ফ্রাঙ্ক—ব্যাভেরিয়ার আইনজীবী, ন্যাশনাল সোসিয়েলিজমও আইনকে একীকরণের জন্য দায়ী। তাঁর ঘোষণা—"ইতিহাসে হিটলারই সবচেয়ে বড় আইনস্রষ্টা" এবং "ফুয়েরারের ইচ্ছাই আইন"। পোলাণ্ডের নাৎসী গবর্নর-জেনারেল।

৯. কনস্টানটিন ফন্ নিউরাথ—প্রাক্তন নাৎসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পরে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সংরক্ষক বা প্রোটেক্টর।

১০. ফ্রানজ ফন্ প্যাপেন—দুইটি বিশ্বযুদ্ধেই রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী। পর্দার আড়ালে রাজনৈতিক ঘোঁট পাকানোতে সিদ্ধহস্ত, নাৎসী কূটনীতিক এবং যুদ্ধের সময়

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত।

১১. আর্নেষ্ট ক্যালটেনব্রুনার—নাৎসী সিকিউরিটি পুলিশের বড়কর্তা, ইহুদীদেরকে সংহার করার জন্য হিটলার ও হিমলারের আজ্ঞাবাহী। এস. এস. জেনারেল, অষ্ট্রিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং ভিয়েনার পুলিশের অধিকর্তা।

১২. এইচ. এইচ. গ্রীলে শ্যাক্ট—নাৎসীদের অর্থনীতির যাদুকর বলে পরিচিত ও প্রাক্তন নাৎসী অর্থমন্ত্রী, রাইখ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট, বিপুল নাৎসী পুনরস্ত্রসজ্জার কর্মসূচী-সংক্রান্ত টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ।

১৩ ফ্রীৎস সাউকেল—(Fritz Sauckel) এস-এস এবং এস-এ জেনারেল।

১৪. ব্যালদুর ফন শাইরাস (Schirach)—নাৎসী যুব আন্দোলনের নেতা ও ইহুদী-বিদ্বেষী।

১৫. আর্তুর ফন্ সেইস্ ইনকোয়ার্ট (Seyss Inquart)—অষ্ট্রিয়ার নাৎসী চ্যান্সেলার এবং পরে নেদারল্যাণ্ডসের কমিশনার।

১৬. আলবার্ট স্পীয়ার (Speer)—অসাধারণ টেকনিক্যাল বিশেজ্ঞ, নাৎসী যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের আসল মস্তিষ্ক এবং স্থপতি শিল্পী ও রাইখের দায়িত্বশীল মন্ত্রী।

১৭. হ্যান্স ফ্রিৎসশে (Fritzsce)—নাৎসী প্রচারকার্যের ও সংবাদপত্রের একজন প্রধান সম্পাদক।

১৮. ফিল্ড মার্শাল উইলহেলম কাইটেল—সমগ্র সশস্ত্রবাহিনী বা জার্মান হাইকমাণ্ডের (ও. কে ডব্লিউ) প্রধান।

১৯ জেনারেল আলফ্রেড জড্‌ল—জার্মান সৈন্যবাহিনীর সেনানীমণ্ডলীর (ও কে. ডব্লিউ.) প্রধান।

২০. এ্যাডমিরাল এরিখ রেইডার—গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল এবং জার্মান নৌবহরের প্রাক্তন প্রধান।

২১. এ্যাডমিরাল কার্ল ডোয়েনিৎস—গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল এবং জার্মান নেভির প্রধান সেনাপতি।

২২. রবার্ট লে—নাৎসী শ্রমিক বা লেবর ফ্রণ্টের বড় কর্তা।

২৩. গুস্তভ ক্রুপ্ ফন্ বোলেন আণ্ড হলব্যাচ—জার্মানীর শ্রমশিল্প 'সম্রাট' এবং সুবিখ্যাত ইস্পাত ও অস্ত্রকারখানার প্রধান কর্তা।

২৪. মার্টিন বোরম্যান—হিটলারের সেক্রেটারি। এস-এর প্রধান এবং পিপলস আর্মির বড় কর্তা (অনুপস্থিতিতে বিচার)।

এই ২৪ জন আসামীর মধ্যে ২১ জনকে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রস্তুতির জন্য ৩০ দিন সময় দেওয়া হইয়াছিল। নাৎসী পার্টির প্রতিপত্তিশালী অন্যতম নেতা মার্টিন বোরম্যান বার্লিন যুদ্ধের পর থেকেই নিখোঁজ হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি জার্মানী থেকে কোনক্রমে দক্ষিণ আমেরিকায় পলাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে বার্লিনের ধ্বংসস্তূপে তিনি নিহত হইয়াছেন। কিন্তু ন্যুরেমবার্গের মামলার সময় সেটা নিশ্চিতরূপে জানা ছিল না। এজন্য তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিচার ও দণ্ড হইয়াছিল। নাৎসী শ্রমিক ফ্রণ্টের কর্তা কুখ্যাত রবার্ট লে নিজের পাপের বোঝায় অভিভূত হইয়া বিচার আরম্ভের আগেই আত্মহত্যা করেন। জার্মান শ্রমশিল্পের বিশ্ববিখ্যাত অধিনায়ক গুস্তভ ক্রুপ্ নাৎসী পার্টির দলভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু দৈহিক

ও মানসিকভাবে তিনি এতই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁর বিচার স্থগিত ছিল। কাইটেল, জড্‌ল, ডোয়েনিৎস এবং রেইডার—এই চারজন রণনায়কও নাৎসী পার্টির সদস্য ছিলেন না বটে, কিন্তু যুদ্ধাপরাধের দিক থেকে তাদের দায়িত্ব আদৌ কম ছিল না। বরং সেরা অপরাধী হিসাবে তাঁদের বিচার হইয়াছিল।

আসামীদের বিরুদ্ধে চার দফা অভিযোগ পেশ করা হইয়াছিল :

১। শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য ষড়যন্ত্র।
২। শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ।
৩। যুদ্ধাপরাধ এবং
৪। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ

এই সমস্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের সপক্ষে অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ, দলিল, কাগজপত্র এবং বহু বন্দীশিবিরের নৃশংসতা ও হত্যাকাণ্ডের ফোটো ও চলচ্চিত্র এবং খাতা ও হিসাবপত্র ইত্যাদি সংগৃহীত ও আদালতে পেশ করা হইয়াছিল। জার্মানীর খাস সরকারী দপ্তর থেকে এবং অধিকাংশ দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভেরিয়া অঞ্চলের সুরক্ষিত স্থান থেকে আমেরিকানদের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষের কেউ কেউ বিস্ময়ের সঙ্গে এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে, অপরাধের প্রমাণস্বরূপ এই সমস্ত দলিল জার্মানী আত্মসমর্পণের আগে নষ্ট করে নাই কেন? ২০টি গাড়ী বোঝাই এই দলিল-পত্রের সঙ্গে বৃটিশ, ফরাসী ও রুশদের ধৃত কাগজপত্রও সরবরাহ করা হইয়াছিল। এই পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্র থেকে বিশেষজ্ঞরা ৩,০০০ দলিল বাছাই করিয়াছিলেন—যেগুলির সমস্তই প্রামাণিক ছিল। এগুলির মধ্যে আসামীদের অনেকের স্বীকারোক্তিও ছিল। ২০শে নভেম্বর, ১৯৪৫ থেকে শুরু করিয়া ১লা অক্টোবর, ১৯৪৬ পর্যন্ত একাদিক্রমে ৯ মাস ধরিয়া এই বিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এত ব্যাপক পটভূমিকায় (ক্যানভাসে)—২৫ বছর ব্যাপ্ত ঘটনাবলীর এবং যে ঘটনাবলীর সঙ্গে সারা পৃথিবীর দুর্ভোগ জড়িয়ে ছিল—এমন বিরাট মামলার আর কখনও বিচার হয় নাই—এই কথাগুলি বলিয়াছেন যুদ্ধাপরাধ-বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফ্। তিনি নাৎসীদের অপরাধের ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রত্যেক যুদ্ধেই সংঘর্ষের সময় কিংবা নিদারুণ কোন লড়াইয়ের পর পাশবিক প্রবৃত্তি জাগে ও জঘন্য অপরাধ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু নাৎসীরা ঠাণ্ডা মাথায় এবং হিসাব-নিকাশ করিয়া যেভাবে নৃশংসতাকে রাজ্যজয়ের একটা যান্ত্রিক উপায়ে পরিণত করিয়াছিল, তেমন পরিকল্পনা আগে কখনও পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। স্যার ডেভিড তাঁর ফরাসী সহযোগীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন :

'The National Socialist dictate which raises inhumanity to the level of a principle constitutes in fact the doctrine of disintegration of modern society···All the former conceptions of which attempted to humanise war are outdated.'

সোজা কথায়—'ন্যাশনাল সোসিয়ালিস্ট পার্টি তাদের হুকুমনামায় অমানুষিকতাকে এমন একটা নীতিগত পর্যায়ে তুলিয়াছিল যে, কার্যতঃ এই মতবাদ আধুনিক সমাজের ছিন্নভিন্ন করণের মত ছিল। আগেকার দিনে যুদ্ধকে মানবিকতার মধ্যে রাখার জন্য

যে সমস্ত চিন্তাভাবনা করা হইয়াছিল, সেগুলি সমস্তই সম্পূর্ণরূপে সেকেলে হইয়া গেল।'

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকায় 'গণহত্যা' শব্দটির উল্লেখ এবং বিচারের সময় সেই অপরাধের সবিস্তার বর্ণনার দ্বারাই এই নতুন নাৎসী মতবাদের ভয়াবহতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।[১]

স্যার ডেভিড আরও বলিয়াছেন যে, সুবৃহৎ জার্মান সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলার জন্য এই ধরনের গণহত্যা কিংবা এক-একটা জাতিকে—যেমন ইহুদী, পোল, চেক, রাশিয়ানদের সমূলে সংহার করার পরিকল্পনা অনুসরণ করার প্রয়োজন তারা বোধ করিয়াছিল। কিন্তু জার্মানীর ঘরে ও বাইরে এভাবে অসংখ্য ইহুদী ও রাজনৈতিক বিরোধীদেরকে খুন করা যে একটা অপরাধ এটা যে কোন সভ্য রাষ্ট্রে স্বীকৃত। সুতরাং একমাত্র ন্যুরেমবার্গের আদালতের বিচারের জন্যই এমন বিধান তৈরী হয় নাই।

যে চার্টার বা সনদ অনুসারে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছিল, ন্যুরেমবার্গের বিচারকমণ্ডলী তার উপর চরম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। কারণ, এই সনদের ধারা অনুযায়ী আসামীদিগকে যে দণ্ড দেওয়া হইবে, একমাত্র সেজন্যই এই আদালতের গুরুত্ব ছিল না, বিশেষভাবে গুরুত্ব ছিল এই কারণে যে আদালতের বিচার থেকে ভবিষ্যৎ আগ্রাসকগণ এই শিক্ষা পাইবে যে, এরপর থেকে পরের দেশ আক্রমণ করিতে গেলে সেটা এমন একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে যে, "গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়া আগ্রাসকের ভূমিকা নিতে হইবে"—বৃটিশ এটর্নী-জেনারেল স্যার হার্টলি শ' ক্রসের মন্তব্য অনুযায়ী।

ন্যুরেমবার্গের বিচারমণ্ডলী আর-একটি বিষয়েও সতর্ক ছিলেন। আসামীদের যথোপযুক্ত শাস্তিবিধাত করা হইবে, একমাত্র সেটাই যথেষ্ট ছিল না, কিংবা এরা যে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত ছিল, কেবল সে কথাটা পৃথিবীর সর্বজন সমক্ষে প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ছিল এই যে, সমসাময়িক কালের এবং ভবিষ্যতের বিশ্বব্যাপী জনমত যেন স্বীকার করিয়া নেয় যে, আসামীদের বিচার ও দণ্ড যথাযথভাবে আইন অনুসারেই হইয়াছিল। অন্যথা ন্যুরেমবার্গকে ন্যায়বিচার বলিয়া গণ্য করা হইবে না, হইবে বিজয়ীদের প্রতিহিংসারূপে।

যে আইন অনুসারে আসামীদের কার্যাবলী অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত ছিল, সেই সমস্ত আইন বিজয়ী দেশের বলিয়া গণ্য করা যায় না। কারণ, আসামীদের কেউ সেই সমস্ত আইনের আওতাভুক্ত ছিল না। অর্থাৎ ন্যুরেমবার্গের আদালত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই কাজ করিতেছিল এবং আদালত এই সমস্ত আইন গঠন করে নাই, কেননা আদালতের সেই ক্ষমতাও ছিল না। অভিযোগ-পত্রের দাবি অনুসারে আসামীরা অপরাধজনক কার্যগুলি সম্পাদন করিয়াছিল কিনা, কেবল মাত্র সেইটুকু নির্ধারণ করাই আদালতের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আদালত চার্টারের শর্ত অনুযায়ী চার্টারকে আইনের দিক থেকে সঠিক বা সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে এবং আসামীদের কার্যাবলীকে অপরাধজনক বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে—তা হলে চার্টারই কি এই নতুন অপরাধের আইন প্রণয়ন করিয়াছে ?—না, এর জবাবেও বলা যাইতে পারে—না। চার্টার সম্পাদনকারীদের তেমন কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল না। কারণ, তারা কোন বিশ্ব সংসদের বা 'World Parliament'-এর মর্যাদাসম্পন্ন ছিল না এবং তেমন কোন ক্ষমতারও দাবিদার তাঁরা ছিলেন না। যদি তেমন কোন ক্ষমতাও তাঁদের থাকিত, তবে, তাঁদের সেই কার্যের দ্বারা "Natural Justice" বা "স্বাভাবিক ন্যায়পরায়ণতার" উপর হিংস্র আঘাত আনা হইত। কেন না, একমাত্র ১৯৪৫ সালেই যদি তাঁরা সর্বপ্রথম সেই আইন অনুসারে অপরাধজনক বলিয়া গণ্য করা যাইত না। কারণ, 'স্বাভাবিক ন্যায়-বিচারের মূল নীতির উহা বিরোধী হইত'।

সুতরাং চার্টার সম্পাদনকারীদের এইমাত্র ক্ষমতা ছিল আগে থেকেই যে আইনের অস্তিত্ব ছিল, একমাত্র সেই আইনকে ঘোষণা করা। সুতরাং মৌখিক প্রশ্ন দাঁড়াইল—

'Were the acts declared in the Charter to be crimes by internatianal law truly crimes by that law before the Charter was drawn up ?"[১]

অর্থাৎ চার্টারে যে সমস্ত কার্য অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইল অন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সেগুলি কি চার্টার রচিত হওয়ার আগেই আইনগতভাবে সত্যকার অপরাধ বলিয়া গণ্য ছিল ?

গ্রেট বৃটেনে আন্তর্জাতিক আইন বিশারদগণের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ ছিল এবং বিচারের আইনগত বৈধতা সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে সর্বসম্মত কোন মতৈক্য ছিল না।*

তবে, একথা সত্য যে, অনেক বিশ্ববিখ্যাত আইনবিশেষজ্ঞ ন্যুরেমবার্গের এই বিচারকে যেমন বিধিসম্মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তেমনি কোন কোন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এই সমস্ত বিচারকে "রাজনৈতিক দেশদ্রোহিতার বিচারের" সঙ্গে তুলনা দিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এর দ্বারা বিশ্বের ন্যায়বিচার সংক্রান্ত ধারণার অপহ্নব ঘটানো হইয়াছে।"

আসামীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বা যুদ্ধের পরিকল্পনা শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য ছিল। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি এবং জাতিসমূহের আচরণ থেকে বিভিন্ন জাতি সমবায়ের মধ্যে এই "সাধারণ আইন" ("কমন্‌ল") উদ্ভূত হইয়াছিল যে, আগ্রাসন অপরাধের তুল্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চার্টারের অন্যতম স্বাক্ষরকারী অধ্যাপক এ. এন ট্রেইনিন "ফৌজদারি আইন অনুসারে হিটলারী দায়িত্ব" শীর্ষক তত্ত্বে মন্তব্য করিলেন যে, "পৃথিবীতে সেই যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে যখন বিভিন্ন জাতি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিত। বর্তমানে স্থায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আদান-প্রদান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবসমাজের এই মহা গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্কের উপর হননকারী আঘাত নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক অপরাধ।

১। The Second Great War—Vol-9, P. 3974.

* এই বিষয়ে টোকিও আন্তর্জাতিক আদালতের সুবিখ্যাত ভারতীয় বিচারপতি মিঃ রাধাবিনোদ পালের ভিন্ন মত পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কারণ, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ভিত্তির উপর আঘাত হানা আন্তর্জাতিক অপরাধরূপে গণ্য হওয়া যোগ্য।”

আর-একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ লর্ড রাইট যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সংক্ষেপে তা উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যখন রাষ্ট্রসমূহ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সভ্য জাতিসমূহ এই মূলনীতি গ্রহণ করিতেছে যে, যুদ্ধ অন্যায় এবং অপরাধজনক। সুতরাং এই নীতি আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী।[১]

অবশ্য পৃথিবীতে এমন একদিন ছিল যখন কোন রাষ্ট্র তার নিজের সুবিধা বা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বিধিসঙ্গত বলিয়া মনে করিত। জার্মান রণপণ্ডিত-দের গুরু ক্লাউসেভিৎস (Clausewitz) যুদ্ধের অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন :

‘War is the continuation of politics by other means’,

অর্থাৎ অপর কোন পন্থায় রাজনীতি পরিচালনার নামই যুদ্ধ।

কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতকে পৃথিবীর মানুষ ক্রমেই সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তারা যুদ্ধকে অন্যায় ও অপরাধ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই মনোভাব থেকেই যুদ্ধ নিবারণের জন্য এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সদ্ভাব রক্ষা করার জন্য অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তির উদ্ভব হইল। ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সালের হেগচুক্তি (কনভেনশন) থেকে শুরু করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে প্রতিষ্ঠিত লীগ অব নেশন্সের যে সমস্ত চুক্তপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ নিবারণ কিংবা শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিধিবিধানের মধ্যেও যুদ্ধ নিষিদ্ধ ঘোষিত হইল এবং অস্ত্র সীমাবদ্ধ করণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১৯২৫ সালের লোকার্নো প্যাক্ট যুদ্ধ নিষিদ্ধ করার পক্ষে ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও ঘোষণা ছিল মার্কিন ও ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয়ের পক্ষ থেকে ১৯২৮ সালের কেলগ্-ব্রিয়াঁ প্যাক্ট কিংবা ‘যুদ্ধ বর্জনের সাধারণ সন্ধিপত্র’। এই সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরকারীগণ পবিত্র গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘোষণা করিলেন যে, জাতীয় নীতি হিসাবে তাঁরা যুদ্ধের পন্থা গ্রহণকে পরিত্যাগ করিলেন। পরবর্তীকালে এই সন্ধি পৃথিবীর সমস্ত বৃহৎ শক্তি কর্তৃক গৃহীত হইল এবং ১৯৩৯ সালের মধ্যে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণ) জার্মানীসহ পৃথিবীর ৬০টিরও অধিক জাতি এই সন্ধির বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়া নিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১১ বার এই সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছিল। তার মধ্যে একমাত্র জার্মানী কর্তৃকই তিনবার—১৯৩৭ সালে অস্ট্রিয়া, ১৯৩৯ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ড।

স্যার হার্টলি শ’ক্রশ ন্যুরেমবার্গের আদালতে যুদ্ধবিরোধী আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানগুলির ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯২৮ সালের কেলগ্-ব্রিয়াঁ প্যাক্টের মত ব্যাপক সন্ধিচুক্তি ছাড়াও আরও এমন অজস্র চুক্তি, শর্ত ও বিধিবিধান ছিল

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩১৮০

এবং যেগুলির দ্বারা যুদ্ধ নিষিদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিরোধ সালিশী বা শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা মীমাংসার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল, সেগুলির সংখ্যা প্রায় হাজার খানেক হইবে। সংখ্যাটি অবিশ্বাস্য বটে, কিন্তু সত্য এবং এই সত্য কার্যতঃ পৃথিবীর সকল জাতির পক্ষেই প্রযোজ্য ছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৯৩৯ সালের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিই এই নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন যে, যুদ্ধ বে-আইনী। অতএব এই নীতি-'this principle became part of the common law of the community of nations.'

সোজা কথায়, এই নীতি পৃথিবীর জাতি গোষ্ঠীর "সাধারণ আইনে" পরিণত হইয়াছিল।

লর্ড রাইট তাঁর ব্যাখ্যায় যুদ্ধকে কেবল অন্যায় বলেন নাই কিংবা ১৯৩৯ সালের যুদ্ধকে মানুষ্যজাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা সর্বনাশকর ঘটনাগুলির অন্যতম বলিয়াই বর্ণনা করেন নাই, আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে যুদ্ধাপরাধগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সেরা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১]

চার্টারে বর্ণিত অপরাধগুলির মধ্যে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের সম্পর্কে তেমন কোন অভিনবত্ব ছিল না। কেন না, এই অভিযোগে—অর্থাৎ যুদ্ধের নিয়মকানুন ও বিধিবিধান ভঙ্গের অভিযোগ অতীতেও সামরিক আদালতে শত্রুপক্ষের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দণ্ড হইয়াছে। প্রধানতঃ নৃশংসতা ও যুদ্ধের আইন ভঙ্গ করার জন্যই এই সমস্ত শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধের এই সমস্ত নিয়মকানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৮৬৮ সালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ঘোষণার দ্বারা যখন যুদ্ধে বিস্ফোরক বুলেট নিষিদ্ধ করা হইল তারপর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত ৮টি নতুন কনভেনশন বা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল স্থলযুদ্ধের আইন ও আচরণ সম্পর্কে। এই সমস্ত চুক্তির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯০৬ এবং ১৯২৯ সালের জেনেভা কনভেনশন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্য ও যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে—.৯০৭ সালের হেগ কনভেনশনও অনুরূপ গুরুত্বসম্পন্ন ছিল।

এগুলি ছাড়া হেগ সম্মেলনে নৌযুদ্ধ সম্পর্কেও অনেক নিয়মকানুন গৃহীত হইয়াছিল।

যুদ্ধ সংক্রান্ত এই সমস্ত চুক্তিভঙ্গের জন্যই যে, যুদ্ধাপরাধগুলি দণ্ডনীয় ছিল তা নয়, সমস্ত সভ্যদেশের গৃহীত সাধারণ ফৌজদারী আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ-গুলির মূলনীতিও এই সমস্ত অপরাধের দ্বারা ভঙ্গ করা হইয়াছিল বলিয়াই এগুলি দণ্ডনীয় ছিল।

চার্টারে গৃহীত ও বর্ণিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের মধ্যে অবশ্যই নূতনত্ব ছিল। কারণ, এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, "যুদ্ধের আগে বা পরে যে কোন অসামরিক নাগরিকের বিরুদ্ধে অমানুষিক কার্যের অনুষ্ঠানই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।" জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও রাজনৈতিক মতবাদের জন্য

১। দি সেকেণ্ড গ্রেট ওয়্যার। ৯ম খণ্ড। পৃষ্ঠা ৩৯৮৩

নৃশংসতার অনুষ্ঠান এই সমস্ত অপরাধের অন্তর্গত ছিল। তবে, মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধের এই আইনগত সংজ্ঞা নিয়া কোন কোন আইনবিশেষজ্ঞ কিছুটা আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কেন না, সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন নাগরিক বা প্রজার প্রতি সেই রাষ্ট্রের আচরণ আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় পড়ে না।

কিন্তু এর বিরুদ্ধেও এই মর্মে যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে অতীতে অন্য কোন স্বাধীন দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে নৃশংস অত্যাচারের শাস্তি বিধানের জন্য বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছিল—যেমন, তুরস্কে নির্যাতিত খ্রীষ্টানদের পক্ষে। এটাও মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধের অন্তর্গত।

১৯১৫ সালের ২৮শে মে ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে তুরস্কে আর্মেনিয়ান জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল, তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া এক ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধানের জন্য দাবি করিয়াছিলেন। তুরস্ক সরকার এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদিগকে মিত্রশক্তিবর্গের হাতে সমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ন্যুরেমবার্গ ও টোকিওর আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে যে সমস্ত বিচার হইয়াছিল, সেগুলির পক্ষে তুরস্কের এই ঘটনা একটা নজীরের মত উদ্ধৃত হইয়াছিল।

চার্টার অনুযায়ী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের এই সংজ্ঞার মধ্যে আর-একটি নতুনত্ব এই ছিল যে, কোন আসামী যদি কোন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি বা কোন দায়িত্বশীল সরকারী অফিসারও হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁকে অপরাধ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া যাইবে না। এমন কি সরকারী হুকুম পালন করিতে গিয়াই অপরাধগুলি সম্পাদনা করা হইয়াছে, এই যুক্তিতেও আসামীকে রেহাই দেওয়া যাইতে পারে না। তবে, তার অপরাধের মাত্রা লঘু করিয়া দেখা যাইতে পারে।

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের উপরওয়ালার বা সরকারী হুকুমে অপরাধে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এমন যুক্তি দেখাইয়া অভিযুক্ত সৈন্যেরা রেহাই পাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এবারের সনদ অনুযায়ী সেই পথ রুদ্ধ হইয়া গেল।

তথাপি এই সনদের বিরুদ্ধে এই মর্মে সমালোচনা উত্থিত হইল যে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যদিও কার্যগুলি অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত, তথাপি কোন রাষ্ট্রের কোন নাগরিক বিশেষকে এই আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত করা যাইতে পারে না। কেন না, রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের সঙ্গেই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া থাকে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে নয় এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ এই রাষ্ট্রগুলিই আন্তর্জাতিক জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং আন্তর্জাতিক আইনের অনুবর্তী।

কিন্তু এই যুক্তিও ধোপে টিকে নাই। কেন না, বহু অতীতকাল থেকেই স্বীকার করা হইয়া আসিতেছে যে, যুদ্ধের নিয়মকানুন ও আইন ভঙ্গের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী ও শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে এবং এটাই আন্তর্জাতিক আইনের বিধান।[২]

ন্যুরেমবার্গ আদালতের এই বিচার সম্পর্কে সাধারণ জার্মানরা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, এটা বিজয়ী পক্ষের প্রতিহিংসা গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছু নয় তবে, তাঁরা যে সরাসরি বন্দীদের গুলি করিয়া মারেন নাই এইটুকুই তাঁদের কৃপা। তবে, লণ্ডন টাইমসের বিশেষ সংবাদদাতা আর. ডব্লিউ. কুপার মন্তব্য করিয়াছেন যে, অধিকাংশ জার্মানদের সম্ভবতঃ এই ধারণা ছিল যে, 'যুদ্ধ আরম্ভ করার দ্বারা নাৎসীরা সবচেয়ে বড় অপরাধ করে নাই। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল যুদ্ধে পরাজয়।'

কিন্তু জার্মানদের যে ধারনাই থাকুক, অভিযুক্ত আসামীদের প্রতি সুবিচার করার জন্য ন্যুরেমবার্গের আদালতের সভাপতি ও প্রধান বিচারপতি লর্ড জাস্টিস লরেন্স তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের যথোচিত সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং কোর্ট কর্তৃক মনোনীত কৌঁসুলিদের তালিকা থেকে আসামীরা তাঁদের কৌঁসুলি বাছাই করার অধিকারী ছিলেন। জার্মান আইনবিদরাও মামলা পরিচালনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁদের বৃত্তির মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও তাঁদের অনেকে আদালতের এক্তিয়ার চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন, তথাপি চার্টার অনুসারে তা চ্যালেঞ্জের বহির্ভূত ছিল।

কোন কোন আইন বিশারদ অবশ্য পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, একমাত্র বিজয়ী পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়া আদালত গঠন না করিয়া নিরপেক্ষ দেশের কিংবা জার্মানীর বিচারকদের নিয়াও আদালত গঠন করা হোক। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই এই কারণে যে, সেদিনের রক্তস্নাত ও যুদ্ধক্ষত পৃথিবীর অবস্থা এমন ছিল যে, কোন দেশ থেকেই "নিরপেক্ষ জজ" পাওয়া সম্ভব ছিল না! (স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফ-এর মন্তব্য)।[১]

অভিযুক্ত নাৎসী ও জার্মান নেতাদের বিরুদ্ধে অজস্র প্রকার বর্বরতা ও অত্যাচারের অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল। যুদ্ধের আগে এবং পরে জার্মানীতে ও অধিকৃত দেশগুলিতে হত্যা, সমূলে সংহার, নির্বাসন, দাসত্ব গ্রহণে বাধ্যকরণ এবং অন্যান্য অমানুষিক কার্যাবলী কেবল যুদ্ধবন্দী, বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রভৃতির বিরুদ্ধেই নয়, সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধেও ব্যাপকহারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত ছিল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পর্যায়ভুক্ত।

মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক জার্মানীর পরাজয় ও ইউরোপের উদ্ধারের পর বিভিন্ন বন্দী-শিবিরের অমানুষিক কার্যাবলীর বিবরণ, যেগুলি আগে নাৎসী খুব সতর্কতার সঙ্গে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। মিত্র সৈন্যদের দ্বারা বন্দীশালার দ্বার উন্মুক্ত করার কিংবা নাৎসী-কবলিত গ্রাম, জনপদ ও শহরগুলির মুক্তির পর প্রত্যক্ষদর্শীদের এবং ভুক্তভোগীদের (যারা কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া গিয়াছিল) অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার কাহিনী প্রকাশিত হইতে থাকে। জাতি-বিদ্বেষ বর্বরতার এমন চরমে পৌঁছিয়াছিল যে. নাৎসী কবলিত ইউরোপে ৯৬ লক্ষ ইহুদীর মধ্যে অন্ততঃ ৫৭ লক্ষ (মতান্তরে ৬১ লক্ষ) একেবারে 'অদৃশ্য' হইয়া গিয়াছিল। অধিকাংশকেই স্বেচ্ছায় খুন করা হইয়াছিল। জার্মানীর উচ্চতম সামরিক কর্তৃপক্ষও এই স্বেচ্ছাকৃত বর্বরতার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। কারণ ফিল্ড মার্শাল

১। The Nuremberg Trial, P. 11

কাইটেল (জার্মান সশস্ত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তা) রাজনৈতিক বিরোধীদের সম্পর্কে পর্যন্ত 'Night & Fog' (রাত্রি ও কুয়াশা) নামে এক কুখ্যাত সাংকেতিক হুকুমনামা প্রচার করিয়াছিলেন, যার ফলে ধৃত রাজনৈতিক বন্দিরা কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছিল। আউসোভিৎস, বুকানভিল্ড, ডাচাউ, বেলসেন, মাজডেনেক, র‍্যাভেনসব্রুক ইত্যাদি বহু বন্দীনিবাস ইতিহাসে চিরদিন কুখ্যাত হইয়া থাকিবে স্ত্রীলোক ও শিশু নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যার জন্য। একমাত্র আউসোভিৎস বন্দী শিবিরেই ৪০ লক্ষের অধিক এবং মাজডেনেক শিবিরে ১৫ লক্ষের বেশী লোককে সংহার করা হইয়াছিল।[১]

ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে এজন্য 'genocide' বা গণহত্যা শব্দটি আইনের নূতন মর্যাদা পাইয়াছিল।

পশ্চিম, পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ অর্থাৎ ইউরোপের নাৎসী অধিকৃত ও কবলিত সমস্ত স্থানেই অসংখ্য এবং অবর্ণনীয় নৃশংসতার কাণ্ড ঘটিয়াছিল, যেগুলি সবিস্তারে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। "১৯৪৩ সালের জুন মাস থেকে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকৃত স্থানগুলিতে এই সমস্ত পৈশাচিক অপরাধের প্রমাণ গোপন করার জন্য তারা গোরস্থান খুঁড়িয়া ফেলিয়া মৃতদেহগুলি বাহির করিয়া আনিল ও পুড়াইয়া ফেলিল এবং হাড়গুলি গুঁড়া করিয়া সার হিসাবে ব্যবহার করিল। বাল্টিক রাজ্যসমূহ, স্মোলেনস্ক, লোনিনগ্রাদ, স্ট্যালিনগ্রাদ, ওরেল, নভোগোরোদ ইত্যাদি শহরগুলিতে অসংখ্য অসামরিক নর-নারীকে সোজা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল এবং সোজা গুলি করিয়া মারাই ছিল তাদের পক্ষে সবচেয়ে দয়ার কার্য! এমন কি শিশুরা পর্যন্ত রেহাই পাইল না। তাদেরকে হাসপাতাল থেকে বা শিশুনিবাস থেকে ধরিয়া আনিয়া জীবন্ত অবস্থায় কবর চাপা দেওয়া হইল, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল, বেয়নেট দিয়া তাদেরকে বিদ্ধ করা হইল, বিষ দিয়া মারিয়া ফেলা হইল, না খাইতে দিয়া মারা হইল কিংবা তাদের রক্ত নিষ্কাশন করিয়া সেই রক্ত জার্মান আর্মির ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল"—লণ্ডন টাইমসের সংবাদদতার রিপোর্ট।[২]

মার্কিন ঐতিহাসিক স্লাইডার মন্তব্য করিয়াছেন যে, ষড়যন্ত্র, আগ্রাসন ও পাশবিক অত্যাচারের এই সমস্ত কাহিনী এমন আজগুবি যে, ইতিহাসে তার তুলনা নাই। ১,০০০০০০০ বা এক কোটিরও অধিক ইউরোপীয় নাগরিক ও যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং অসংখ্য প্রকার নৃশংসতা হইয়াছিল। আর বিজিত রাজ্যগুলি থেকে কোটী কোটী টন কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ও শ্রমশিল্পের যন্ত্রসজ্জা লুণ্ঠন করা হইয়াছিল।[৩]

বন্দীনিবাসগুলির নৃশংসতার নিদর্শনরূপ যখন মাথার খুলি, মানুষের চামড়ার তৈরী ল্যাম্পশেড (আলোর আচ্ছাদন) ইত্যাদি আদালতে দেখানো হইল তখন কাঠগড়ার উপর অনেক নাৎসী আসামীরই মাথা হেলিয়া পড়ল এবং যখন প্রমাণ-স্বরূপ অত্যাচারের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইল, তখন অন্যতম আসামী নাৎসী 'অর্থনীতির

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪২
২। ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল, পৃষ্ঠা ৮২
৩। দ্য ওয়ার—১৯৩৯, ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ২৬৭০।

যাদুকর' শ্যাক্টকে যেন 'ঠাণ্ডায় জমিয়া যাওয়া মৃতবৎ মনে হইল' এবং তিনি স্বেচ্ছায় ছবির পিছনের দিকে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। অর্থাৎ এই সমস্ত চিত্র তাঁর কাছে অসহ্য মনে হইতেছিল।

আদালতে এভাবে 'মৃত্যুপুরীর' ত্রাসের এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ উত্থাপন করা হইল আসামীরা নিজেরাই যেগুলিকে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেন। 'বীরপুরুষ' গোয়েরিং এই সমস্ত চলচ্চিত্র দেখিয়া স্বীকার করিলেন—

'হাঁ' একথা সত্য যে, আমিই বন্দীনিবাসগুলির প্রবর্তন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি এইটুকু মাত্র চাহিয়াছিলাম যে, রাজনৈতিক বন্দীদেরকে পুনরায় শিক্ষা দেওয়া হোক। কিন্তু ১৯৩৪ সালের পর থেকে এই ক্যাম্পগুলিকে চালাইতেছিলেন হিমলার। আমার কোন ধারণাই ছিল না যে, এমন সমস্ত বীভৎস কাণ্ড সেখানে ঘটিয়াছে—'I had no idea that such terrible things took place.'[১]

ন্যুরেমবার্গের আদালতে অভিযুক্ত নাৎসী নায়কদের মধ্যে মার্শাল গোয়েরিংই সবচেয়ে কূটবুদ্ধি সাহসী এবং কথাবার্তায় ও প্রভাবে অগ্রগণ্য বলিয়া প্রমাণ দিয়াছিলেন। কার্যতঃ গোয়েরিংকে কেন্দ্র করিয়াই কোন কোন বিষয়ে আদালতের প্রায় সমস্ত শুনানী আবর্তিত হইয়াছিল। এমন কি, তিনি নির্বিকারচিত্তে আত্মপক্ষ সমর্থনে এমন-একটা উদ্ধৃতি দিলেন, যার দ্বারা তিনি মনে করিলেন যে, তিনি বাজিমাত করিয়াছেন। উক্তিটি এই:

'In the struggle of life and death there is no legality.'

'জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বৈধতার কোন প্রশ্ন নাই।'

গোয়েরিংয়ের মতে তাঁদের 'সর্বাপেক্ষা বড় ও জবরদস্ত শত্রু' স্বয়ং উইনস্টোন চার্চিল এই মন্তব্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিযুক্ত গোয়েরিং ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আইনকে অস্বীকার করিয়া নিজের কার্যের বৈধতা প্রমাণ করা যায় না!

আর ফিল্ড মার্শাল কাইটেল আত্মপক্ষ সমর্থনে এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি নামেমাত্র জার্মান সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান ছিলেন। আসলে একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার ক্ষমতার প্রকৃত মালিক ছিলেন হিটলার, তিনি তাঁর আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র ছিলেন।[২]

কিন্তু ন্যুরেমবার্গের আদালতে যে সমস্ত সোভিয়েত আইনজ্ঞ ও পরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ, যেমন মিঃ এ. পোলটোরাক মন্তব্য করিয়াছেন যে, কাইটেল নিজেকে যতটা গুরুত্বহীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আসলে তিনি ততটা "বাজে লোক" ছিলেন না। "বরং জার্মান সেনাপতিগণ, যাঁরা মনে করিতেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকলে মিলিয়া যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছিলেন।" তাঁরা কিন্তু আসলে হিটলার ও কাইটেলকেই জার্মান সমরযন্ত্রের আসল নিয়ামক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং জার্মানীর পতনের জন্য সমস্ত দোষ হিটলার ও কাইটেলের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কাইটেল তা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি নামে-মাত্র সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান ছিলেন। আসলে হিটলার ছিলেন এক অসাধারণ সামরিক প্রতিভা (হিটলার সম্পর্কে এই উচ্চ ধারণা কিন্তু আরও অনেক জার্মান নায়কের ছিল) এবং তাঁকে কোন উপদেশ দিতে যাওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক ছিল। কাইটেল বলিলেন:

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১২৯।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২২৭।

'Hitler had studied general staff publications, military literature and that he had a knowledge in the military fields which can only be called amazing.'

সহজ কথায়, হিটলার সমস্ত প্রকার সামরিক সাহিত্য এমন গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন যে, এই বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল বিস্ময়কর।

কাইটেল আরও বলিয়াছেন যে. সামরিক অস্ত্রসজ্জা, সংগঠন, সামরিক, নেতৃত্ব. সৈন্যবাহিনীর সাজসজ্জা ও যন্ত্রাদি এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কথা সারা পৃথিবীর নৌভি সম্পর্কে হিটলার অত্যন্ত ওয়াকিবহাল ছিলেন।

'যুদ্ধের সময় আমি যখন তাঁর সদর দপ্তরে ছিলাম. তখন দেখিয়াছি হিটলার সারা রাত জাগিয়া মল্টকে, শ্লিয়েফেন এবং ক্লাউসেভিৎস প্রমুখ রণপণ্ডিতদের সামরিক গ্রন্থগুলি (জেনারেল স্টাফ বুকস্) পড়িতেছেন এবং এভাবে তিনি নিজেই সামরিক বিষয়ে অগাধ বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, একমাত্র কোন অসাধারণ প্রতিভার পক্ষেই এটা সম্ভব—'

'Therefore, we had the impression only a genius can do that'.

কিন্তু আদালতে হাজির অন্যান্য আসামীরা কিন্তু বারবার 'কাইটেলের আদেশের' কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

অর্থাৎ কাইটেলের নির্দোষিতার ভণ্ডামি তাঁর সহ-আসামীরাও বিশ্বাস করেন নাই।

বলা বাহুল্য যে, হিটলারই যে নাটের গুরু ছিলেন. তাতে কোন সংশয়ের কারণ নাই এবং এই যুদ্ধের মূল দায়িত্বও তাঁর—যদিও অন্যান্যরাও তাঁর সমান অংশীদার ছিলেন। হিটলারী জার্মানীর অন্যতম সেরা মন্ত্রী এ্যাডমিরাল স্পীয়ার ন্যুরেমবার্গের আদালতের শুনানীর পর মন্তব্য করিয়াছেন যে, জার্মানীর মৃতেরা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলিই হিটলারের ও তাঁর সহযোগীদের অপরাধরূপে চিরকাল সাক্ষ্য দিবে।

ন্যুরেমবার্গ অনেক দিক দিয়াই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। আদালতে এই মামলার শুনানীতে ৬০ লক্ষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনার মত। আর সারা পৃথিবী থেকে ৩০০ সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এই মামলা রিপোর্ট করার জন্য এবং আদালতে ভাষান্তরিতকরণের জন্য যেমন দক্ষ ভাষাবিশেষজ্ঞ ছিলেন, তেমনি বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাও নিখুঁত ছিল। প্রধান তিনটি ভাষায় অনুবাদের কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল এবং প্রত্যেক টিমে তিনজন করিয়া বিশেষজ্ঞ ছিলেন।[২]

কারাগারে আসামীদের প্রতি যথাসম্ভব ভালো ব্যবহারই করা হইয়াছিল এবং ন্যুরেমবার্গ আন্তর্জাতিক আদালতের চতুঃশক্তির বিজ্ঞ বিচারপতিগণ সনদ অনুসারে ঘোষিত আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচারের কোন ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই হিটলারকে হত্যা চেষ্টার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নাৎসীগণ-আদালতে ধৃত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি বিচারের নামে যে বীভৎসতার তাণ্ডব করা হইয়াছিল, আদালতে সেই চলচ্চিত্রও দেখানো হইয়াছিল এবং সেই সময় অধিবেশন কক্ষে এক অদ্ভূত নাটকীয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য 'ফাঁসির দড়িওয়ালা'

সেই হিটলারপন্থী জজ ফ্রিজলিং (Freisling) শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

* * *

এক মাস স্থগিত থাকার পর ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালত ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর, ১৯৪৬, তাঁদের ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। এই রায়ে যুদ্ধকে "চরম আন্তর্জাতিক অপরাধ" বা "সুপ্রীম ইণ্টারন্যাশনাল ক্রাইম্" বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং মন্তব্য করা হয় যে, আসামীদের কয়েকজন ১২টি জাতির বিরুদ্ধে কেবল যুদ্ধের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে নাই, কার্যতঃ আক্রমণাত্মক যুদ্ধও চালাইয়াছিল। ৫০ হাজার শব্দের এই রায়ে অস্ট্রিয়া থেকে পার্লহারবার পর্যন্ত আক্রমণাত্মক যুদ্ধের একটি রেখাচিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে—জার্মান সরকারী ও সামরিক দলিলপত্র থেকেই এই রেখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ধৃত দলিলপত্রের প্রামাণিক সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আদালত বিশেষভাবে হিটলারের চারটি গুপ্তসভার উল্লেখ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, এই সভাগুলিতেই আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পরিকল্পনা ও চক্রান্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত গুপ্তসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ৫ই নভেম্বর ১৯৩৭, ২৩শে মে ১৯৩৯, ২২শে আগস্ট ১৯৩৯ এবং ২৩শে নভেম্বর ১৯৩৯। এই সমস্ত গুপ্তসভাতেই হিটলারের মতলব একেবারে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছিল।...

রায় অনুসারে জার্মানীর বিরুদ্ধে চার দফা অভিযোগ—যেমন, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের ষড়যন্ত্র, দ্বিতীয়তঃ শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের অনুষ্ঠান, তৃতীয়তঃ যুদ্ধাপরাধ এবং চতুর্থতঃ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ—এগুলি সবই প্রমাণিত হইয়াছিল।

ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালত জার্মানীর যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তার ভূমিকা থেকে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিলে অনুষ্ঠিত অপরাধের মাত্রা উপলব্ধি করা যাইবে। আদালত এই সম্পর্কে তাঁদের রায়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে, যে বিপুল পরিমাণ দলিল ও সাক্ষ্যপ্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করা অসম্ভব। তথাপি এই সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের নির্গলিত সত্য এই যে, মানুষের যুদ্ধের ইতিহাসে এমন বিশাল পটভূমিকায় এত বড় যুদ্ধের অপরাধ আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই :

'...The truth remains that war crimes were committed on a vast scale, never before seen in the history of war They were purerated in all the countries occupied by Germany, and on the high Seas, and were attended by every conceiveable circumstance of cruelty and horror. There can be no doubt that the majority of them arose from the Nazi conception of "total war", with which the aggressive wars were waged. For in this conception of "total war" the moral ideas underlying the conventions which seek to make war more human are no longer regarded as having force or validity. Every thing is made subordinate to the overmastering dictates of war. Rules, regulations, assurances and treaties all alike are of no moment, and, so, freed from the restraining influence of international law, the aggressive war is conducted by the Nazi leaders in

the most barbaric way. Accordingly, war crimes were committed when and wherever the Fuhrer and his close associates thought them to be advantageous. They were for the most part the result of cold and criminal calulation."[১]

মূল ইংরাজী থেকে উদ্ধৃত এই বাক্যাংশের মধ্যেই ন্যুরেমবার্গ আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের রায়ের আসল মর্ম এবং ফ্যাসিস্ট যুদ্ধের ভয়াবহতা বুঝা যাইবে।...

১লা অক্টোবর, ১৯৪৬, ট্রাইব্যুনালের শেষ অধিবেশন বসিল এবং বিচারকমণ্ডলীর রায়ে আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হইল, অবশ্য দণ্ড ঘোষণার আগে ক্যামেরা-ম্যানদের আদালত কক্ষ ত্যাগ করিতে হইল। কোন ফটো তুলিতে দেওয়া হইল না এবং ফটো তোলার ফ্লাড-লাইট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। একমাত্র নীলাভ নিওন লাইট জ্বলিতেছিল, আসামীদের কাঠগড়াও (ডক্) শূন্য ছিল। সমগ্র আদালত কক্ষ তখন অস্ত্রোপচার কক্ষের মত গম্ভীর ও নিস্তব্ধ ছিল।

ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট লর্ড জাস্টিস লরেন্স স্বয়ং আদালতের রায়ের দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিলেন। দুইজন সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় পার্শ্ববর্তী কক্ষের দরজা দিয়া একেকবারে একজন করিয়া আসামী প্রবেশ করিলেন, কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রধান বিচারপতি লরেন্স অবিচলিতকণ্ঠে তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে পর পর দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করিলেন। নিম্নলিখিত ১২ জনের প্রতি ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেওয়া হইল। কারণ, তাঁরা সকলেই চার রকম অপরাধের মধ্যে হয় সমস্ত কিংবা অধিকাংশ অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলেন।

১. হেরমন উইলহেলম গোয়েরিং ২ জেয়োচিম রিবেণ্ট্রপ ৩ উইলহেলম কাইটেল ৪ আর্নেস্ট কালটেনব্রুনার ৫ আলফ্রেড রোজেনবার্গ ৬ হান্স ফ্রাঙ্ক ৭ উইলহেলম ফ্রিক ৮. জুলিয়াস স্ট্রেইচার ৯ ফ্রিৎস সাওকেল (Fritz Sauckel) ১০ আলফ্রেড জডল ১১ আর্থার সেইস ইনকোয়ার্ট এবং ১২ মার্টিন বোরম্যান —এই শেষোক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত ছিলেন।

উপরের এই ১২ জন প্রধান আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইল এবং বাকী সকলকে যাবজ্জীবন দণ্ড থেকে বিভিন্ন প্রকারের কারাদণ্ড দেওয়া হইল। মাত্র তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হইল :

রুডল্ফ হেস যাবজ্জীবন দণ্ড ভাল্টার ফ্রাঙ্ক যাবজ্জীবন, এরিক রেইডার যাবজ্জীবন, ব্যালডুর শাইরাচ ২০ বছর, আলবার্ট স্পীয়ার ২০ বছর, কনস্টানটিন নিউর্যাথ ১৫ বছর, কার্ল ডোয়েনিৎস ১০ বছর, হ্যালমুার শাক্ট নির্দোষ—মুক্ত, ফ্রাঞ্জ ফন প্যাপেন নির্দোষ—মুক্ত এবং হ্যান্স ফ্রিৎশ (Hans Fritzche) নির্দোষ—অতএব মুক্ত।

রবার্ট লে অভিযুক্ত। কিন্তু ২৫ অক্টোবর, ১৯৪৫, জেলখানায় আত্মহত্যা করিয়াছিলেন এবং জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত শিল্পপতি গুস্তভ ক্রুপ দৈহিক ও মানসিকভাবে এমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁর বিচার স্থগিত রাখা হইয়াছিল।[২]

* * *

মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডঃ জি. এম. গিলাবর্ট ন্যুরেমবার্গের আদালতে অভিযুক্ত

আসামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎপূর্বক তাঁদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে যে সমস্ত রিপোর্ট রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি যথেষ্ট মূল্যবান বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে সেগুলির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে সেই ডায়েরির উপসংহারের সামান্য কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ

আন্তর্জাতিক আদালত থেকে যে তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাঁরাও স্বস্তি পাইলেন না এবং তাঁদের স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিলেন না। যে মুহূর্তে তাঁদের মুক্তির কথা ঘোষিত হইল, তার পরমুহূর্তেই 'জার্মান জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার' অভিযোগে জার্মানীর অসামরিক প্রশাসন তাঁদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়া হানা দিল এবং "প্যালেস্ অব্ জাস্টিস" এর দরজা ঘিরিয়া ফেলিল।

স্বদেশবাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে তাঁরা তিনদিন তিনরাত্রি নিজেদের ইচ্ছাতেই জেলের মধ্যে রহিলেন। ফন্ প্যাপেন তিক্তস্বরে বলিলেন—'আমাকে যেন জানোয়ারের মত তাড়না করা হইতেছে এবং আমাকে কখনো শান্তিতে থাকিতে দেওয়া হইবে না।'

দ্বিতীয় মুক্ত আসামী ফ্রিৎশ (Fritzsche) ডঃ গিলবার্টের কাছে একটি পিস্তল চাহিলেন এবং বলিলেন তিনি আর এই নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে পারিতেছেন না। অবশেষে ফিৎশ ও শাক্ট জেলখানা থেকে গভীর রাত্রে বাহির হইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁদেরকে একবার করিয়া গ্রেপ্তার এবং একবার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল। ফন্ প্যাপেনও অনুরূপভাবে জেল থেকে বহির্গমনের আশায় রহিলেন।

হ্যান্স ফ্রাংক তাঁর মৃত্যুদণ্ডের সেল থেকে এইসব দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—'হাঃ হাঃ এরা মুক্তি চায়। হিট্‌লারিজম থেকে কোন মুক্তি নাই। একমাত্র আমাদের মত মৃত্যু-দণ্ডিতরাই মুক্ত! হাঃ হাঃ!'

কিন্তু বীরপুরুষ গোয়েরিংয়ের মুখে আর হাসি ছিল না। মৃত্যুদণ্ড শোনার পর তিনি সোজা জেলখানায় তাঁর সেলে ঢুকিয়া পড়িয়া খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িলেন। তাঁর আগেকার সমস্ত বীরত্ব উবিয়া গেল এবং চোখ-মুখ সম্পূর্ণরূপে চুপসাইয়া গেল।...

কিন্তু গোয়েরিং ফাঁসিতে গেলেন না। ১৪/১৫ই অক্টোবর রাত্রে বিষপান (পটেসিয়াম সায়েনাইড্) করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন এবং হিটলার, হিমলার ও গোয়েবেলসের দলে গিয়া মিশিলেন!...[১]

ডঃ গিলবার্ট লিখিয়াছেন যে, আসামীদের বিরুদ্ধে যখন প্রথম অভিযোগপত্র রচিত এবং আদালতে সেগুলি পঠিত হইয়াছিল, তখন বিভিন্ন আসামীর বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। গোয়েরিং বলিয়াছিলেন 'বিজয়ীরা সব সময়েই বিচারক হইবে এবং পরাজিতরা হইবে আসামী।'

রিবেন্ট্রপ বলিয়াছেন—'ভুল লোকদের অভিযুক্ত করা হইয়াছে। আমরা সকলেই হিটলারের আজ্ঞাবাহী ছিলাম।'

কিন্তু নাৎসী জার্মানীর অস্ত্র ও গোলা-বারুদ উৎপাদনের মন্ত্রী (যাঁর অধীনে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে জার্মানীতে ও অধিকৃত ইউরোপে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছিল) এ্যাডমিরাল স্পীয়ার স্বীকার করিয়াছিলেন—'বিচারের দরকার আছে। প্রভুত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনেও এই ধরনের ভয়ংকর অপরাধ (Horrible crimes) অনুষ্ঠানের জন্য সকলেরই দায়িত্ব আছে।'

১। Nuremberg Diary—Dr. G. M. Gilbert. Signet. Newyork. 1961. P. 396-97.

অর্থাৎ একা হিটলারের নয়। অবশ্য নাৎসী আসামীদের অধিকাংশই সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব হিটলারের ঘাড়ে চাপাইতে চাহিয়াছিলেন…

৯-১০ই অক্টোবর, ১৯৪৬, দখলীকৃত জার্মানীর চতুঃশক্তির কন্ট্রোল কাউন্সিলের (নিয়ন্ত্রণ পরিষদ) নিকট মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তদের কাছ থেকে ক্ষমাপ্রদর্শনের যে আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি অগ্রাহ্য হইল। তখন একমাত্র কাজ বাকী রহিল ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করা। মার্কিন সার্জেণ্ট উডের উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হইল। এই দায়িত্ব পাইয়া সার্জেণ্ট উড় তাঁর প্রাণের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁর একমাত্র দুঃখ ছিল গোয়েরিংয়ের জন্য। কারণ, ডেপুটি ফুয়েরার আগেই ফাঁসির মঞ্চকে ফাঁকি দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাকী সকলকে ১৬ই অক্টোবর মধ্যরাত্রের পর ন্যুরেমবার্গের জেলখানায় একে একে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিলেন। চতুঃশক্তির প্রতিনিধিগণ এই প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করার সময় ফাঁসির স্থানে উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,বৃটেন ও ফ্রান্সের ২ জন করিয়া সংবাদপত্র প্রতিনিধি—মোট ৮ জন। তিনটি ফাঁসি কাষ্ঠ সাজানো হইয়াছিল। এই তিনটির মধ্যে একটি ছিল রিজার্ভ। ১২টি সিঁড়ি বাহিয়া ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করিতে হইত এবং ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে মোটা দড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রথম যে ব্যক্তিকে ফাঁসিমঞ্চে আনা হইল, তিনি হইলেন হিটলারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেণ্ট্রপ। কিন্তু ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে আগাইতে গিয়া সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিলেন এবং নিজের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারিতেছিলেন না।

কিন্তু সার্জেণ্ট জন উড অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। মাত্র ৯০ মিনিটের মধ্যে তিনি পৃথিবীর কুখ্যাত নাৎসী অপরাধীদের একে একে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিলেন। তাঁদের মৃতদেহ মিউনিকের অন্তর্গত একটি বৈদ্যুতিক চুল্লিতে (ক্রিমেটোরিয়াম) পোড়াইয়া ফেলা হইল।…

কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে পশ্চিম বার্লিনের স্পানডাউ কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হইল। চতুঃশক্তির প্রহরীগণ পালা করিয়া সর্বক্ষণ এঁদেরকে পাহারার মধ্যে রাখিয়াছিলেন। ১৯৬৬ সালে দীর্ঘমেয়াদী বন্দিরা মুক্তি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাযুদ্ধের অবসানের ৩২ বছর পর এঁদের সকলেই বর্তমানে (১৯৭৭ সালে) মৃত। একমাত্র এখনও বাঁচিয়া আছেন স্পানডাউয়ের নির্জন কারাকক্ষে নিঃসঙ্গ বন্দীরূপে রুডলফ হেস—হিটলারী শীর্ষ নেতাদের অন্যতম। ১৯৪১ সালে হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের মাত্র ১০ দিন আগে বিমানযোগে বৃটেনে উড়িয়া গিয়া বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যে শান্তির আপোস চুক্তি সম্পাদনের আশায় হেস দুনিয়াব্যাপী নিদারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিতু তখন থেকেই হেস বন্দী—ইংলণ্ডের পর পশ্চিম বার্লিনের স্পানডাউ কারাগারে ১৯৭৭ সালে হেসের বন্দীজীবনের ৩৬ বছর এবং বয়সও ৮২ বছর অতিক্রান্ত হইতে চলিল। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধিতার জন্যই হেসের পক্ষে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় নাই।…

যাদের ক্ষমতার দম্ভে, অবর্ণনীয় অত্যাচারে ও নৃশংসতায় পৃথিবীর অগণিত মানুষ দলিত, মথিত ও রক্তসিক্ত হইয়াছিল, ইতিহাসের অমোঘদণ্ডে শেষ পর্যন্ত তারা সাধারণ খুনী আসামীর মত ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ হারাইল।

দশম পর্ব

দশম অধ্যায়

টোকিওর সামরিক আদালতে বিচার : জাস্টিস্ পালের ভিন্ন রায়

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে পটসডামের ঘোষণা অনুযায়ী জাপান যখন ১৫ই আগস্ট আত্মসমর্পণে রাজী হইল এবং ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করিল, তখন মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল ডগলাস ম্যাক্-আর্থার সেই আত্মসমর্পণের শর্তানুযায়ী জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্দেশ্যে ১৬ জানুয়ারী, ১৯৪৬ এক ঘোষণাবাণী জারী করেন এবং এই ঘোষণা অনুযায়ী ধৃত জাপানী নেতাদের বিচারের জন্য টোকিওতে একটি আন্তর্জাতিক মিলিটারি ট্রাইবুন্যাল (দূর প্রাচ্যের জন্য) গঠিত হইল।

যে চার্টার বা সনদ অনুযায়ী ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত এবং জার্মান নেতাদের বিচার ও দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, অনুরূপ চার্টার (২৬শে এপ্রিল ঘোষিত) অনুসারেই জাপানী সামরিক এবং অ-সামরিক নেতাদেরও বিচার ও দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপিয় চার্টার এবং জাপান বা দূর-প্রাচ্যের চার্টারের মধ্যে মাত্র একটি প্রশ্নে বৈষম্য ছিল—ইউরোপীয় সনদে রাষ্ট্রপ্রধানকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়ার কোন বিধান ছিল না। কিন্তু জাপান সংক্রান্ত সনদে রাষ্ট্রপ্রধান বা সম্রাটকে সেই বিধান থেকে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল। (এ জন্যই সমালোচকদের মতে আইন অনুসারে জাপানের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণরূপে নিঃশর্ত ছিল না—যদিও কাগজে-কলমে বাহ্যতঃ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের রূপ বজার রাখা হইয়াছিল।)

টোকিওর এই আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত নিম্নলিখিত দেশের বিচারকমণ্ডলী নিয়া গঠিত হইয়াছিল :

স্যার উইলিয়াম এফ. ওয়েব—সভাপতি, (অস্ট্রেলিয়া), জাস্টিস্ ম্যাকডুগাল (কানাডা), বিচারপতি জু আও মেই (Ju-Ao Mei—চীন), হেনরি রেইমবার্জার (Henri Reimburger—ফ্রান্স), অধ্যাপক বার্নার্ড ভি. এ রোলিং (নেদারল্যাণ্ডস), এরিমা হার্ভে নর্থক্রফট্ (নিউজিল্যাণ্ড), বিচারপতি আই. এম. জেরিয়ানোভ (সোভিয়েত ইউনিয়ন), লর্ড প্যাট্রিক (বৃটেন), মেজর-জেনারেল এম. সি. ক্রেমার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), জজ জারানিলা (ফিলিপিন্স) এবং ভারতের পক্ষ থেকে বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পাল।

জাপান যে সমস্ত দেশ আক্রমণ করিয়াছিল এবং পরে জাপান যাদের হাতে বা মিত্রপক্ষের হাতে পরাজিত হইয়াছিল, তাদের দেশেরই আইনজ্ঞ প্রতিনিধি নিয়া বিচারকমণ্ডলী, তাদের সহকারীবর্গ এবং অভিযোক্তামণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল।

ন্যুরেমবার্গের অভিযুক্ত জার্মানদের মতই জাপানীদের বিরুদ্ধেও শান্তিভঙ্গ ও যুদ্ধের চক্রান্ত, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠানের গুরুতর অভিযোগ আনা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই তিনশ্রেণীর অভিযোগের মধ্যে বহুপ্রকার অপরাধজনক কার্যের উল্লেখ করা হইয়াছিল।

৪ঠা জুন, ১৯৪৬, টোকিওতে আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচার শুরু হইল। অভিযুক্ত হইলেন জাপানের প্রধান প্রধান সামরিক ও রাষ্ট্রনীতিক নেতাগণ। যেমন—মাঞ্চুরিয়ার জেনারেল কেনজি দৈহারা (Doihara), সর্বোচ্চ সমর পরিষদের জেনারেল হাতা, ১৯৩৬ সালের প্রধানমন্ত্রী কোকী হিরোতা, প্রীভি কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য জিরো মিনামি, প্রধানমন্ত্রী ও উপ যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজো, নৌদপ্তরের (১৯৪০-৪৪) প্রধান তাকাসুমি ওকা, উপ যুদ্ধমন্ত্রী উমেজু, সমর-পরিষদের সদস্য জেনারেল আরাকি, সামরিক বিষয়ক প্রধান (১৯৩৯-৪২) আকিয়া মুতো, চীফ সেক্রেটারি হোসিনো, অর্থমন্ত্রী কোকোনোরি কায়া, সম্রাটের প্রধান বিশ্বস্ত উপদেষ্টা মার্কুইস্ কেচি কিদো, উপযুদ্ধমন্ত্রী কিমুরা, 'Rape of Nanking'-এর (নানকিংয়ের বলাৎকার) কুখ্যাত গোলন্দাজি রেজিমেণ্টের কর্নেল হাসিমোতো, (দুটি বৃটিশ গানবোট্ 'লেডিবাড'' এবং 'বী'-এর উপর গোলাবর্ষণের জন্য দায়ী), প্রধানমন্ত্রী কুনিয়্যাকি কয়সো, এ্যাডমিরাল ওসুমি নাগানো, বার্লিনের রাষ্ট্রদূত (১৯৩৮-৪৫) হিরোসি ওসিমা, প্রধানমন্ত্রী (১৯২৯) ব্যারন কাইচিরো হিরানুমা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিগেনরি টোগো, পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিগেমিৎসু, নৌমন্ত্রী ভাইস-এ্যাডমিরাল শিগেতারো শিমাদা, ইতালীর রাষ্ট্রদূত (১৯৩৯) তোশিও শিরাতোরি, দপ্তরহীন মন্ত্রী লেঃ জেনারেল সুজুকি, কোয়াংটাং বাহিনীর সেনানীমণ্ডলের প্রধান জেনারেল শেইসিরো ইতাগাকি প্রভৃতি।

উপরোক্ত প্রধান যুদ্ধাপরাধীগণ ছাড়া বৃটিশ সামরিক আদালতগুলি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী থেকে জুলাই মাসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ ১২৯ জন জাপানীকে অভিযুক্ত করিয়াছিল। এদের মধ্যে ৯৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। ১০৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড এবং ৩৬ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। মার্কিন এবং অস্ট্রেলিয়ান আদালতগুলিতেও যুদ্ধাপরাধে ধৃত জাপানীদের দণ্ড হইয়াছিল।[১]

কেবল পার্ল হারবার আক্রমণের (১৯৪১ ডিসেম্বর) তারিখ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধকালীন অপরাধগুলির জন্যই নহে, তারও বহু পূর্ব থেকে চীনে "মুকদেনের ঘটনাবলী" ও "নানকিংয়ের বলাৎকার" এবং মার্কিন গানবোট প্যানের উপর গোলাবর্ষণের জন্যও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিচার ও দণ্ড হইয়াছিল।

কিন্তু কেন দণ্ড হইয়াছিল ? সেই ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনী অতীতের ইতিহাস থেকে কিছুটা উল্লেখ করা দরকার—চীনে অনুষ্ঠিত জাপানীদের অনাচারের গুরুত্ব বুঝিবার জন্য।

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে জাপানী বাহিনী চীনের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাইয়া নানকিং শহরে প্রবেশ করার পর হত্যা, লুঠ, অগ্নিকাণ্ড এবং আরণ্যক হিংস্রতার যে তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হইল এবং যেভাবে অসংখ্য চীনা স্ত্রীলোক ও শিশুদের উপর পাশবিক অত্যাচার সংঘটিত হইল, তখনকার দিনের ইতিহাসে তার কোন তুলনা ছিল না। নানকিংয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ২০ জনেরও বেশী বিদেশীদের সাক্ষ্য থেকে একথা লিখিয়াছেন ফ্রাঙ্ক ওলিভার (যে বইয়ের ভূমিকা লিখিয়াছেন বিখ্যাত পিটার ফ্লেমিং) তাঁর গ্রন্থে। নানকিংয়ের দিকে জাপানী সৈন্যদের অগ্রগতি ঠেকাইবার জন্য পশ্চাদপসরণকারী দুর্বল চীনা বাহিনী যথাসম্ভব পোড়ামাটির নীতি অবলম্বন

১। Second Great War—Vol-9, P. 3985.

করিল এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকের গ্রামে, শহরে, জনপদে আগুন ধরাইয়া দিল। সেই আগুনের লোলিহান শিখায় নানকিংয়ের রাত্রির আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু জাপানীদের অগ্রগতি ঠেকানো গেল না। কোথায় গেল তাদের বহুঘোষিত ঐতিহ্য-মণ্ডিত "বুশিদো"র সামরিক সদাচার ?—তার বদলে দেখা দিল নির্ভেজাল বর্বরতা :

'Instead they treated China and the world to an exhibition of ruthless barbarity. Bushido, the conduct supposed to be set up by the Japanese army, was thrown completely overboard In a month 24,000 defenceless civilians has been brutally murdered ; 10,000 women, ages ranging from children of ten to grandmothers of seventy-two, had been raped ; vast sections of the city deliberately burned to the ground ; shops and houses, consulates and foreign embassies, looted and thousands of terror striken people brought to the verge of starvation by refusal to allow food supplies to enter the city.[১]

সংক্ষেপে—জাপানী সৈন্যবাহিনী তাদের বুশিদোর বদলে নানকিংয়ে হিংস্র ও বর্বর আচরণের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইল। এক মাসের মধ্যে অসহায় চীনা নাগরিকদের মধ্যে অন্ততঃ ২৪ হাজারকে নৃশংসভাবে হত্যা করিল এবং ১০ হাজার স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার চালাইল—এই সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে ১০ বছরের শিশু থেকে শুরু করিয়া ৭২ বছরের ঠাকুরমা পর্যন্ত ছিল। দোকান-পাট, ঘরবাড়ী এবং বিদেশী দূতাবাসে পর্যন্ত লুঠতরাজ চলিল। স্বেচ্ছায় আগুন দিয়া শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা পোড়াইয়া দেওয়া হইল এবং ত্রাসগ্রস্ত শহরবাসীদেরকে উপবাসে রাখার উদ্দেশ্যে শহরে খাদ্য শস্যের আমদানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল !

১৯৩৭ ৩৮ সাল থেকে চীনে জাপানীদের এই অত্যাচার—যে চীনকে তারা "বিদেশী-দের হাত থেকে রক্ষা" এবং যেখানে তারা "সুশৃঙ্খল গবর্নমেণ্ট" স্থাপন করিতে চাহিয়াছিল !···

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধাভিযানের সময় ফিলিপিন্সেও অনুরূপ অত্যাচার হইয়াছিল। ফলে, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৫, ফিলিপিন্স বিজয়ী জাপানের "টাইগার"—সেনাপতি জেনারেল ইয়ামাসিতার বিচার আরম্ভ হইল নির্বিচারে ফিলিপিনোদেরকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা, যুদ্ধবন্দীদের উপর অত্যাচার ও প্রাণনাশ, লুণ্ঠন ও অগ্নিপ্রদান এবং দলে দলে মেয়েদের উপর বলাৎকার অনুষ্ঠানের জন্য। ইয়ামাসিতা অবশ্য এই সমস্ত অপরাধের কথা অত্যন্ত তীব্রতার সঙ্গে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তিনি ও তাঁর উপরওয়ালা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সুপ্রীম জাপানী কমাণ্ডার ফিল্ড মর্শাল কাউণ্ট জুইচি তেরাউচির (Juichi Terauchi) আজ্ঞাধীন ছিলেন। তিনি কোন নৃশংসতার কথা জানেন না এবং তেমন কোন আদেশও দেন নাই। যদি নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা এই ধরনের কার্য করিয়া থাকে, তবে তাঁর অজ্ঞাতসারে। কিন্তু আদালতে ইয়ামাসিতার যুক্তি গ্রাহ্য হইল

১। Special Undeclared War—by Frank Oliver, Jonathan Cape, London, 1939, P. 168.

না। ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫, পার্ল হারবার আক্রমণের বার্ষিকী দিবসে জেনারেল ইয়ামাসিতার প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ (ফাঁসি) দেওয়া হইল। অপর দিকে টোকিওর আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে ধৃত জাপানী নেতাদের যে বিচার অনুষ্ঠিত হইল, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন জেনারেল তোজো—যিনি জাপানী সামরিক অভিযানের পিছনে আসল মস্তিষ্ক ছিলেন। তাঁর আত্মহত্যার চেষ্টার কথা আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ধৃত ও অভিযুক্তদের বিচার সারা প্রাচ্যখণ্ডে প্রভূত কৌতূহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক মাস ধরিয়া মামলার শুনানীর পর জেনারেল তোজো এবং তাঁর সঙ্গী ৬ জন আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল। ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ টোকিওর নির্জন সুগামো কারাগারে জাপানের যুদ্ধকালীন ডিক্টেটর তোজো এবং অন্যান্য দণ্ডিতদেরকে ফাঁসি দেওয়া হইল। ফাঁসি কাষ্ঠে আরোহণের আগে তেজো কিন্তু একটি বিদায়কালীন ছোট্ট কবিতা লিখিয়াছিলেন, ইংরাজীতে তার মর্ম এই :

> 'It is good-by
> Over the mountains I go to-day
> To the bos m of Buddha
> So happy am I.'[১]

বুদ্ধের শরণ নিয়া তোজোর এই ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণকে অন্ততঃ ভীরুতার অপবাদ দেওয়া চলে না।…

ডাঃ পালের ভিন্নমত

টোকিও আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং ভারত-বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও বিচারপতি ডাঃ রাধাবিনোদ পাল টোকিওর এই চাঞ্চল্যকর মামলায় যে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছিলেন এবং বিচারকমণ্ডলীর অধিকাংশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে ভিন্ন রায় দিয়াছিলেন, আইনের ইতিহাসে তা' স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আইন শাস্ত্রে ডঃ পাল তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এবং আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তিনি বিচারকমণ্ডলীর মেজরিটি রায়ের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তিনি আন্তর্জাতিক আইন ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের বিধিবিধান ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণপূর্বক এবং আসামীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী পক্ষের উত্থাপিত অভিযোগসমূহের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিচার ও সন্ধানপূর্বক যে সুদীর্ঘ রায় দিয়াছিলেন, তা একটি সুবৃহৎ গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে তার সবিস্তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভবও নয় এবং প্রয়োজনও নাই।

ডঃ পাল তাঁর রায়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁর বিজ্ঞ সহযোগী বিচারকমণ্ডলীর রায় ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হইতে না পারিয়া দুঃখিত।

তাঁর রায়তে প্রকাশ যে, ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৬, ১১টি অভিযোগকারী দেশের পক্ষ থেকে জাপানের ২৮ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোট ৫৫ দফার অভিযোগ আনা হইয়াছিল এবং অভিযুক্তদের মধ্যে ২ জন মামলার শুনানীর আগেই মারা যান এবং তৃতীয় ব্যক্তি তার মানসিক অবস্থার জন্য বিচারের অনুপযুক্ত ছিলেন। বাকী ২৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে

১। লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৬০৭-০৮।

গুরুতর যুদ্ধাপরাধের বিভিন্ন অভিযোগে মামলার শুনানী চলিয়াছিল। ন্যুরেমবার্গে নাৎসী জার্মানীর নেতাদের মতই জাপানের নেতাদের বিরুদ্ধেও তিন বা চার শ্রেণীর যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বিচারপতি মিঃ পাল এই সমস্ত অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণপূর্বক যে সুদীর্ঘ রায় দিয়াছিলেন, তার মূল ভিত্তি ছিল এই যে, আসামীদের অনুষ্ঠিত কাজগুলি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় কার্য এবং সরকারী যন্ত্রের কার্য হিসাবেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ঃ

'The acts alleged are in my opinion all acts of state and whatever these accused are alleged to have done, they did that in working the machinery of the Government, the duty and responsibility of working the same having fallen on them in due course of events'[১]

বিচারপতি মিঃ পাল বিশুদ্ধ আইনের দিক থেকে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির উপর সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব আন্তর্জাতিক জগতে অপরাধ বলিয়া বিবেচিত ছিল কিনা?

দ্বিতীয়তঃ অভিযোগে বর্ণিত যে সময়ে এই সমস্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সময়ে আন্তর্জাতিক আইনে এগুলি অপরাধজনক ছিল কিনা? যদি না হইয়া থাকে, তবে, পরবর্তীকালে আইন প্রণয়ন করিয়া ওই সমস্ত যুদ্ধকে অপরাধজনক বলিয়া অভিযুক্ত করা যায় কিনা?

কিংবা আগ্রাসী বলিয়া বর্ণিত কোন রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তিকে সরকারী ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের জন্য অপরাধী করা যায় কিনা?

ডঃ পাল তাঁর রায়ে ভাবাবেগ বা রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হন নাই। বিশুদ্ধ আইনের এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে নানা বিধি ও আইনের নজীর ও ঘটনার দৃষ্টান্ত তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, অতীতে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যে সমস্ত কার্য করিয়াছে, জাপান তার অতিরিক্ত কিছু করে নাই। চুক্তি ও সন্ধিশর্ত ভঙ্গের অভিযোগ, অন্য দেশকে রক্ষণাবেক্ষণের নামে নিজেদের তাঁবে আনা, অন্য দেশের উপর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন, যুদ্ধবন্দীদের কিংবা নারী ও শিশুর উপর যুদ্ধের সময় স্থাপন, অত্যাচার এবং আনুষঙ্গিক বর্বরতা ইত্যাদি সমস্তই অতীতে বিভিন্ন শক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এমন কি গোপন সন্ধিচুক্তি পর্যন্ত কূটনীতি ও "পাওয়ার পলিটিক্স"-এর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত। যেমন, জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির যুদ্ধে রাশিয়া কর্তৃক যোগদান সম্পর্কে স্ট্যালিনের সঙ্গে মিত্রশক্তিবর্গের আগেই গোপন চুক্তি হইয়াছিল এবং সেই চুক্তি এমন এক সময় সম্পাদিত হইয়াছিল যখন সোভিয়েত রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বাহ্যতঃ বন্ধুতার সম্পর্কই ছিল।[২]

পার্ল হারবার আক্রমণের আগে জাপান এবং আমেরিকা উভয়েই চীনে জাপানী আক্রমণকে আইনতঃ যুদ্ধ বলিয়া মনে করে নাই। জাপান তেমন কোন ঘোষণা দেয় নাই এবং আমেরিকাও চীন সম্পর্কে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রয়োজন মনে করে নাই। এমন কি আক্রান্ত চীনও এটাকে যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে নাই। ডঃ পাল উল্লেখ করিয়াছেন

১। International Military Tribunal for the Far East—Justice Radha Binode Pal. Sanyal & Co. Calcutta, 1953, P. 5.

২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪২৮।

যে, এর আসল কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি এর দ্বারা কেলগ ব্রিঁয়া চুক্তির যুদ্ধনিবারণী ধারা এবং আন্তর্জাতিক আইনের দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং আমেরিকা যুদ্ধরত চীনকে (নিরপেক্ষতা আইন সত্ত্বেও) যথারীতি গোলাবারুদ ও অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করিয়া চলিতেছিল।[১]

ডঃ পাল প্রথম মহাযুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই সময়েও জার্মানদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা, বর্বরতা ইত্যাদি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ উঠিয়াছিল। কিন্তু ভার্সাই শান্তি সম্মেলন কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন সেই সমস্ত অপরাধের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী ও অভিযুক্ত করিয়া আদালতে বিচার করার জন্য সুপারিশ করিতে পারেন নাই···

ডঃ পাল তাঁর রায়ে আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে, পার্ল হারবার আক্রমণের পিছনে জাপানের কোন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তমূলক মতলব ছিল না। বরং জাপানী রাষ্ট্রদূত নমুরা চীন ও অন্যান্য প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ আলোচনার পরিণতিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। আলোচনার সময় একমাত্র জাপানের পক্ষ থেকেই নয়, আমেরিকার পক্ষ থেকেও যুদ্ধায়োজন চলিয়াছিল।

বিচারপতি ডঃ পাল তাঁর সুদীর্ঘ রায়ের শেষে টোকিওর আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে অভিযুক্ত সমস্ত জাপানী নেতাকে নির্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং মুক্তি দানের জন্য সুপারিশ করেন।

বলা বাহুল্য যে, এটা ছিল ডঃ রাধাবিনোদ পালের একক বা মাইনোরিটি রায়। কিন্তু বিচারকমণ্ডলীর মেজরিটি আসামীদিগকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্থ করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

* * *

ডাঃ পাল তাঁর ঐতিহাসিক রায়ের উপসংহারে এ্যাটম্ বা পারমাণবিক বোমা বর্ষণকেই বরং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও বর্বরতা বলিয়া তীব্র নিন্দাত্মক মন্তব্য ধ্বনিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের জার্মান সম্রাট বা কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলমের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির উল্লেখ করিয়াছেন। এই চিঠিতে কাইজার মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে অস্ট্রিয়ায় সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেফকে লিখিয়াছিলেন :

"My soul is torn, but everything must be put to fire and sword ; men, women and children and oldmen must be slaughtered and not a tree or house be left standing, With these methods of terrorism ···the war will be over in two months, whereas if I admit considerations of humanity it will be prolonged for years."

সোজা কথায়, কাইজারের বক্তব্য ছিল যে, যদিও তাঁর বুক ব্যাথায় বিদীর্ণ হইতেছে, তথাপি সমস্তই আগুন ও তরবারির মুখে দিতে হইবে। নর-নারী-শিশু এবং বৃদ্ধ নির্বিশেষে অবশ্যই সকলকে সংহার করিতে হইবে—একটি গাছ কিংবা একটি বাড়ীও যেন দণ্ডায়মান না থাকে। একমাত্র এই প্রকার টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদের দ্বারাই যুদ্ধ দুই মাসের মধ্যে শেষ হইতে পারে। অপর পক্ষে যদি মানবতার কথা বিবেচনা

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫৮১।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫১২-১৩।

করা হয়, তবে এই যুদ্ধে বছরের-পর-বছর ধরিয়া চলিতে থাকিবে। 'সুতরাং আমি আগের (টেরোরিজমের) পন্থাই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি।'

ডঃ পাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর কাইজারের মত প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে মিত্রপক্ষও যুদ্ধ দ্রুত হ্রাস করার নাম করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ এবং নর নারী শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নির্দোষ নাগরিকদিগকে পাইকারি-হারে হত্যা করিয়া মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী নেতারাও অবশ্য ইম্পীরিয়েল জার্মানীর কাইজারের নীতিই অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু ডঃ পালের মতে জাপানের অভিযুক্ত আসামীগণকে এই ধরনের অপরাধের জন্য দায়ী করা যায় না।[১]

অবশেষে ডঃ পাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিজয়ী পক্ষ কার্যতঃ নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সমস্ত আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করিয়াছেন এবং সেই সমস্ত আদালতকে আইন ও বিচারের ছদ্মবেশ পরাইয়াছেন। কিন্তু বিজয়ী পক্ষ কখনও বিজিতকে ন্যায়বিচার দিতে পারেন না। কারণ, আদালত যদি রাজনীতির মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসে, তবে ন্যায়বিচারের যতই মুখোস পরানো হোক না কেন, "তখন ন্যায়বিচার শুধু বলশালী পক্ষের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে পরিণত হয় মাত্র।"[২]

ডঃ রাধাবিনোদ পালের এই রায়ের মধ্যে অনেক তীব্র, তিক্ত ও অপ্রিয় মন্তব্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রকাশ পাইয়াছে, কয়েকজন স্বনামধন্য আইনজ্ঞ, যেমন—ইংলণ্ডের প্রীভি কাউন্সিলের সদস্য লর্ড হ্যাংকি, আন্তর্জাতিক আইন-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডব্লিউ ফ্রিডম্যান এবং টোকিওর সামরিক আদালতের মার্কিন কৌঁসিলি তাঁর উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

এই রায়ের ফলে ভারতের প্রতি জাপানের মনোভাবও খুব অনুকূল হইয়াছিল। পরলোকগত ডঃ পাল তাঁর জীবিতকালে বর্তমান গ্রন্থকারের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তবে, ডঃ পালের এই রায় সম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণীয় এই যে, এই রায় রাজনীতি বিবর্জিত এবং একান্তরূপেই আইনঘটিত। বিচারক হিসাবে তিনি শুধু আইন ও বিধিবিধান এবং বিধিবিধানের পটভূমিকায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিচার করিয়াছেন। অবশ্য সেই সমস্ত ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন শক্তিবর্গের মধ্যে সম্পর্কের কথাও বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং অভিযোগগুলির প্রামাণিকতা যেমন—'নানকিংয়ের বলাৎকার' গভীরভাবে তলাইয়া দেখার চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই রায়ের মূল্য কম নয়।[৩]

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬২০।
২। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৭০০।
৩। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক পৃষ্ঠা ৬০৬-০৭।

দশম পর্ব

একাদশ অধ্যায়

মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

সরকারী বিবৃতি : ১৯৩৯-১৯৪৫

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস বা ভারত সচিবের দপ্তরের বার্তা বিভাগ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল তাতে ১৯৩৯ ১৯৪৫ সালের তথ্য ও ঘটনাবলীর যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, এখানে সেগুলির উল্লেখ করা গেল। কেন না, মহাযুদ্ধের ইতিহাসের পক্ষে এই সরকারী তথ্যগুলি মূল্যবান ও প্রামাণিক।...

"...১৯৩৯ সালের তুলনায় আজ ভারতের নাম বিশ্বের অনেক উপরে স্থান পাইয়াছে। অন্ততঃ আমার এই মনে হয়। তবে এজন্য সমস্ত কৃতিত্বই সরল সাধারণ মানুষ, সৈনিক, নাবিক, বৈমানিক, ভূমি ও কলকারখানার শ্রমিকদেরই প্রাপ্য। এইসব মানুষগুলি যেভাবে বিপজ্জনক বছরগুলিতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া কাজ করিয়াছে, তার তুলনা হয় না। সর্বোপরি রণাঙ্গনের যুদ্ধরত সৈনিকরা, যাঁরা সবকটি যুদ্ধ অভিযানে সাহস ও শৌর্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং মিত্রশক্তির অন্তর্গত অন্যান্য যেসব জাতির সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করিয়াছেন তাঁদের সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন।..."

—লর্ড ওয়েভেল, ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া, ১০ অক্টোবর, ১৯৪৫।

সরকারী বিবৃতি

১৯৩৯-১৯৪৫

ভারতের ৪০ কোটি অধিবাসী ছড়াইয়া রহিয়াছে ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৪১০ বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া। আঙ্গিকগত দিক দিয়া ভারতের আয়তন বৃটেনের ১৭ গুণ, একত্রিতভাবে ফ্রান্স ও স্পেনের ৪ গুণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট এলাকার দুই পঞ্চমাংশ।

ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ, যদিও তার পক্ষে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে অন্ন যোগানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তবে যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন ভারতের বিভিন্ন এলাকা ও শহরগুলি শান্তিপূর্ণ অবস্থায় উৎপাদনের জন্য ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছিল। আধুনিক কোন যুদ্ধের জন্য ভারত সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তুত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভারতে সেই সময় একটি নতুন বিমানক্ষেত্র তৈরী করিতে পশ্চিমী দুনিয়ার মত চলতি অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিলেই চলে নাই; বরং এ জন্য সব কিছুর গোড়াপত্তন করিতে হইয়াছিল।

যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই আগে যেখানে ছিল গ্রাম, ধানক্ষেত ও রৌদ্রদগ্ধ মরুভূমি সেখানেই গড়িয়া তোলা হয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা, রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাড়ীঘর, বিদ্যুৎ ও শক্তি কেন্দ্র পয়ঃপ্রণালী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সবকিছু।

যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত কিভাবে তার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিল তা নীচের তথ্যাদি হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

পশ্চিমের শত্রু

১৯৩৯-৪১ সালে ভারতের শত্রুরা ছিল পশ্চিমে। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবারে জাপানী হানার দিন ভারত প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্যকে জাহাজযোগে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠাইয়াছিল। সৈন্য সংখ্যার দিক দিয়া ঐ অবস্থায় গ্রেট বৃটেন বা অন্য কোন কমনওয়েলথ দেশ এত বেশী সৈন্য পাঠায় নাই।

আর উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধ-অভিযান শুরুর প্রথম দিকে পাইপ লাইন, রেলিংস্টকও লোকোমোটিভ সরবরাহের পুরাপুরিই দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল ভারত। সেই সময় ভারত তার নিজস্ব ১২০০ মাইল রেল লাইনকে তুলিয়া ফেলিয়া সেই সমস্ত সরঞ্জাম বাইরে পাঠাইয়াছিল।

এমনকি ভারতের গ্রামীণ শিল্পকেও সেই সময় পুরাপুরিভাবে কম্বল, ক্যামোফ্লেজ জাল ও পীট হেলমেট তৈরীর কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছিল।

প্রাচ্যের শত্রু

পার্ল হারবারে জাপানী হানার ফলে ভারত দুই দিক দিয়া আক্রমনের মুখোমুখি হইয়া পড়ে। এক কথায় নতুন আর এক শত্রুর মুখোমুখি হয় ভারত এবং পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ করিবার জন্য আরও অধিক সংখ্যায় সৈন্য যোগানোর নতুন কর্তব্যের মুখোমুখি হয়।

ভারত সেই কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় সৈন্য যোগান দিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য নিয়োগ না করিয়াই ভারত প্রশিক্ষণ দিয়া এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সজ্জিত করিয়া ২৫ লক্ষ সেনার এক বিরাট বাহিনী তৈরী করিয়াছিল।

আর এই সেনাবাহিনীর সহায়ক কাজের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল ৮০ লক্ষ ভারতীয়কে।

তাছাড়া যুদ্ধ শিল্পে নেওয়া হয়েছিল ৫০ লক্ষ ভারতীয়কে। আর রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সেই সময় ক্রমাগত যে চাপ আসিয়া ছিল তাহা ১ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মী মিলিয়া সম্পন্ন করিয়া ছিল।

আক্রমণ ঘাঁটি

আক্রমণ ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভারতকে সেই সময় প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। আর এজন্যই কমনওয়েলথ ছাড়াও চীন এবং আমেরিকার বিরাট সৈন্য বাহিনীকে ভারতে রাখার প্রয়োজন হইয়াছিল।

এই জন্য :

১৩ লক্ষ ২০ হাজার মানুষের থাকার জায়গা তৈরী করা হইয়াছিল।

৪ কোটি ২০ লক্ষ বর্গফুট আবরণ দেওয়া মজুতাগার তৈরী করা হইয়াছিল।

৪ লক্ষ ৭০ হাজার ব্যক্তিকে একসঙ্গে প্রশিক্ষণ দিবার জন্য ৭০টি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করা হইয়াছিল।

বিমানক্ষেত্র

দুইশ'টিরও বেশী সম্পূর্ণ সজ্জিত হানাদারী বিমানক্ষেত্র তৈরী করা হইয়াছিল।

এছাড়া, তৈরী করা হইয়াছিল ৭টি বিরাট বিরাট বিমানঘাঁটি। এই বিমানঘাঁটিগুলির প্রত্যেকটি রানওয়ে ছিল এক মাইলেরও বেশী লম্বা। চীনে সরবরাহ কাজ চালাইবার জন্য মূলতঃ এইগুলি তৈরী হইয়াছিল।

রেলওয়ে

বাংলা-আসাম রেলওয়ের ৮০০ মাইলের ক্ষমতাকে চতুর্গুণ করা হইয়াছিল।

ভারতীয় রেলওয়ে সেই সময় এক মাসে ১১ লক্ষ ৬২ হাজার টন সামরিক সামগ্রী, ৫ লক্ষ ৫০ হাজার সামরিক যাত্রী বহন করিয়াছিল। বন্দরগুলি হইতে মাল খালাস করিবার জন্য একদিনে ৩০টি বিশেষ ট্রেনের প্রয়োজন হইয়াছিল। আর এইসব বিশেষ ট্রেনের একটি নিয়মিত দক্ষিণে করাচী হইতে ভারত অতিক্রম করিয়া আসামের লেদো পর্যন্ত ২ হাজার ৭৩০ মাইল পথ পাড়ি দিত।

১৯৪৪ সালে ভারতীয় রেলওয়েতে মোট ৯৬ কোটি যাত্রী ৩৬০০ কোটি মাইল ভ্রমণ করিয়াছিল।

বন্দর ও জাহাজচলাচল

ভারতের বন্দরগুলির কর্মক্ষমতা অনেকগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে ছোট ছোট বৃটিশ অভিযানকারী বাহিনীর অবতরণের উপযোগী উপকূলবর্তী বড় ঘাঁটি ছিল ভারতের সাতটি। আর সেখানে ফ্রান্সের ছিল ১৩টি বন্দর।

যুদ্ধের পূর্বে ভারতের অল্প কয়েকটি জাহাজ কারখানায় ছোট ছোট জাহাজ তৈরী হইত এবং ছোটখাটো সারাইয়ের কাজ হইত। কিন্তু যুদ্ধের সময় বেশ কয়েক শত জাহাজ তৈরী হইয়াছিল এইসব কারখানায়; এইসব জাহাজের মধ্যে মাইন ক্ষেপণাস্ত্রী জাহাজ যেমন ছিল, তেমনি ছিল যুদ্ধজাহাজও। সেই সময়ে দেশের ৫৬টি কারখানায় মোট ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ৪০ হাজার টনের ৬৫০০টি জাহাজ মেরামত করা হইয়াছিল।

তাছাড়া বার্মার নদীসঙ্কুল এলাকায় যুদ্ধরত বাহিনীর সরবরাহ ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজনে সমস্ত ধরনের নৌ-যান সহ একটি সম্পূর্ণ বাহিনী তৈরী করা হইয়াছিল। এইসব নৌ-যানের অধিকাংশই ছিল আবার বিশেষ উন্নত ধরনের। যুদ্ধের সময়ে সারা দেশে প্রধানতঃ সামরিক কর্মীদের দিয়া সব সময়ের জন্য বেশ কয়েক শত মাইল সড়ক নির্মাণ করা হইয়াছিল।

সড়ক

দুইটি সড়ক তৈরী হইয়াছিল জরীপহীন জঙ্গল ও পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিয়া। এই সড়ক দুটির প্রতিটি লম্বায় ছিল ৩০০ মাইলের বেশী। এই সড়ক দুটি রেল ও অগ্রবর্তী ঘাঁটি, যেমন, লেদোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। তাছাড়া এই সড়ক দুটি বার্মার সড়কব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল এবং চীনের সঙ্গে স্থলপথে সড়ক যোগাযোগের পথ খুলিয়া দিয়াছিল।

তেলের লাইন

বাংলা ও আরাকান হইতে আসাম ও উত্তর বার্মার মধ্যে হাজার মাইল লম্বা দুইটি প্রধান তেলের লাইন সহ বহু শত মাইল তেলের পাইপ লাইন বসানো হইয়াছিল।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

সারা দেশে ১৩০টি নতুন হাসপাতাল তৈরী করা হইয়াছিল। তাছাড়া ভারত চিকিৎসা সামগ্রী তৈরীর পরিমাণ নিজের প্রয়োজনের ২৫ শতাংশ ১৯৪০ সাল হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬০ শতাংশ করিয়াছিল। এমন কি ভারত হাসপাতাল ও অপারেশনের কাজের সামগ্রী এবং অনেক স্ট্যাণ্ডার্ড মানের যন্ত্রপাতিও সেই সময় তেরী করিয়াছিল।

ভারতে মিত্রশক্তির জন্য

ভারতকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারকারী মার্কিন সেনাবাহিনীকে ভারত ১৯৪৪ সালে ৪৪ হাজার মাইল সুতিকাপড় এবং আবার ১৯৪৫ সালে ২৮ হাজার মাইল সুতি কাপড় সরবরাহ করিয়াছিল। তাছাড়া চীনা বাহিনীকেও ভারত ১১ হাজার মাইল সুতি কাপড় সরবরাহ করিয়াছিল।

সুতি ছাড়া অন্যান্য কাপড়ও (মোট প্রায় ২০ হাজার মাইল লম্বা) সরবরাহ করা হইয়াছিল।

এই সময়ে ভারতস্থিত মার্কিন সেনাবাহিনীকে ভারত মোট ১২ কোটি ৯১ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ডে (৫১ কোটি ৬৮ লক্ষ ২০ হাজর ডলার) মূল্যের বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়াছিল।

শিল্প

দেশের শিল্পসম্পদের উন্নতি সাধন সেই সময় ভারত ও তার মিত্রদেশগুলির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উপস্থিত হইয়াছিল। আর এই উন্নতির জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল নতুন কারখানা স্থাপন, নতুন প্ল্যাণ্ট বসানো নতুন উৎপাদনযন্ত্র চালু করা ও পুরাতনগুলিকে কাজে লাগানো এবং হাজার হাজার নতুন শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার।

ইস্পাত

দেশের সম্পদ হইতেই ভারতের ইস্পাত কারখানাগুলিতে সেই সময় নিম্নে উল্লিখিত জিনিসের জন্য দ্রব্যাদি উৎপাদিত (বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ টন হারে) হইয়াছিল : রেললাইন সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ব্রীজ, ভাসমান ডক, আরমার পিয়েরসিং স্টীল, জাহাজ, বুলেট অফ স্টীল, ক্রেন, মেসিন টুল।

অস্ত্র কারখানা

সরকারী অস্ত্রকারখানাগুলি সেই সময় নতুন নির্মিত কারখানাগুলিতে ৮৫ হাজার নতুন কর্মীকে চাকুরি দিয়াছিল।

এইসব কারখানায় তেরী হইয়াছিল :

মেশিনগান, ডেপথ চার্জ (জল বিস্ফোরক), ফিল্ড গান, কামানের গোলা, বোমা, পাইরোটেকনিকস্, গ্রেনেড প্রোপেল্যাণ্ট, মাইন, ছোট অস্ত্রাদির গোলাবারুদ।

তাছাড়া বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্রের আবরণ নির্মাণে, গোলাবারুদ ভর্তি করিবার কাজে, এইসব অস্ত্রশস্ত্র রঙ করার কাজে এবং এইগুলি পাঠাইবার জন্য পাত্র নির্মাণের কাজও অন্যান্য শিল্পকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এক কথায় সেই সময় অস্ত্রকারখানাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া কাজ করিবার ক্ষেত্রে মোট দেড়হাজার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কশপকে কাজে লাগানো হইয়াছিল।

বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ ও সমাবেশ

ভারতের ৯ টি কেন্দ্রে যুদ্ধের সময় বিমান জড়ো হইত এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হইত। শুধু তাই নয় এইসব কেন্দ্রে বিমানের যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক অংশ তৈরী হইত।

আকাশপথে সরবরাহ

ভারতের কারখানাগুলিতে মিত্রশক্তির জন্য সমস্ত ধরনের মোট ৪৫ লক্ষ প্যারাসুট তৈরী হইয়াছিল।

আর ভারতে তৈরী প্যারাসুটের মাধ্যমে এক বছরে বার্মার মোট প্রায় ৬ লক্ষ ৯ হাজার ৭১৭ টন বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ

ভারতের পোশাক নির্মাণকারী কারখানাগুলিতে যুদ্ধের সময় ৪০ কোটি তৈরী-পোশাক নির্মিত হইয়াছিল। তাছাড়া ভারতীয় চামড়া দিয়া ভারতীয় কর্মীরা মোট ৫ কোটি জোড়া জুতা তৈরী করিয়াছিল।

১৯৩৯ সালে এবং ১৯৪৩ সালে সম্পূর্ণভাবে দেশীয় দ্রব্যাদি দিয়া ভারতে মোট ২০ লক্ষ এবং ১ কোটি ৩০ লক্ষ পোশাক তৈরী হইয়াছিল।

বার্মার যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রতিটি জংলী সবুজ রংয়ের পোশাকও নির্মিত হইয়াছিল ভারতেই।

সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ

১৯৩৯ সালে যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার, ১৯৪৫ সালে সেই সংখ্যা গিয়া দাঁড়াইয়াছিল ২৫ লক্ষে।

এছাড়া সেনাবাহিনীর অন্যান্য শাখায় যে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল তাহা নিম্নরূপ ঃ

	১৯৩৯	১৯৪৫
রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনী	২,৩০০	৩০,০০০
রাজকীয় ভারতীয় বিমানবাহিনী	১,৬০০	৩০,০০০

আর ১৯৪৫ সালে মহিলা অক্সিলিয়ারি কোর (ভারত এর সদস্য-সংখ্যা গিয়া দাঁড়াইয়াছিল দশ হাজারে।

রাজকীয়-ভারতীয় নৌবহর

পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে জয়লাভ সুনিশ্চিত করিতেই যুদ্ধকালে রাজকীয়-ভারতীয় নৌবহর সবসময় রাজকীয় নৌবহরকে সাহায্য করিয়াছে। তাছাড়া ১৯৪২ সালে বার্মা থেকে সৈন্য অপসারণ ও আরাকানের মধ্য দিয়া সৈন্যদের ফিরিয়া আসিবার প্রথম দিকেও ভারতীয় নৌবাহিনী একাই সহায়তা করিয়াছে। আর মিত্রবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির কালে আরাকানের সমুদ্র এলাকা ও বার্মা রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল ভারতীয় নৌবহরের উপর।

এইসব সহযোগিতা ছাড়া, যুদ্ধ চলাকালীন পুরা সময়েই ভারতীয় বন্দরের স্থানীয় নৌ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং পারস্য উপসাগরে টহলদারি কাজেরও দায়িত্ব ছিল ভারতীয় নৌবহরের উপর।

রাজকীয় ভারতীয় বিমানবহর

১৯৪২ সালের শুরুতে রাজকীয় ভারতীয় বিমানবহরে কেবলমাত্র দুইটি স্কোয়াড্রন ছিল। আর এই দুইটি স্কোয়াড্রনে আর এ. এফ অংশ ছিল শক্তিশালী। কিন্তু যুদ্ধের শেষে ভারতীয় বিমানবহরে স্কোয়াড্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইরা দশ হইয়াছিল; অন্যদিকে আর এ. অফ অংশ মারাত্মকভাবে কমিয়া গিয়াছিল।

যুদ্ধকালে এইসব স্কোয়াড্রনের অনেক কটি স্কোয়াড্রন বার্মা রণাঙ্গণে আক্রমণ কাজে নিযুক্ত ছিল। আর বাকী স্কোয়াড্রনগুলির উপর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আকাশসীমা রক্ষা করিবার দায়িত্ব ছিল।

যুদ্ধকালে ভারতীয় বিমানবহরের যে সম্প্রসারণ সম্ভব হইয়াছিল, তা মূলতঃ ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে। এই সময়ে বিমানবহরের বিভিন্ন কাজে তো বটেই, এমনকি সাহায্যকারী আর এ এফ কর্মী হিসেবেও ভারতীয়রা কাজ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনী

ভারতীর সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবেই একটি স্বেচ্ছামূলক সেনাবাহিনী। কারণ, ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়ান (বৃটিশ)-দের ছাড়া আর কাহাকেও বাধ্যতামূলক ভাবে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয় নাই।

১৯৪৫ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী ছিল নিম্নরূপ ঃ	সংখ্যা
ভারতীয় আরমর্ড কোর্	৩১,০০০
রাজকীয়-ভারতীয় গোলন্দাজবাহিনী	৮৩,০০০
ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার	২৬৩,০০০
ভারতীয় সিগনাল কোর্	৬৮,০০০
ভারতীয় আর্মি মেডিক্যাল কোর্	১৬৭,০০০
রাজকীয়-ভারতীয় আর্মি সার্ভিস কোর্	৩৬০,০০০
ভারতীয় আর্মি অর্ডন্যান্স কোর্	৬৪,০০০
ভারতীয় আর্মি ইলেকট্রিক্যাল ও মেডিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার	৯৯,০০০

অফিসারদের সংখ্যা

১৯৩৯ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারের সংখ্যা ছিল ১,১১৫ জন। আর ১৯৪৫ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছিল ১৫,৭৪০ জনে।

হতাহত

যুদ্ধকালে (১৯৪৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত) ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু সেনা হতাহত হইয়াছিল—

নিহত	২৪,৩৩৮ জন
আহত	৬৪,৩৫৪ জন
নিখোঁজ	১১,৭৫৪ জন
যুদ্ধবন্দী	৭৯,৪৮৯ জন
মোট	১৭৯,৯৩৫ জন

যুদ্ধ অভিযান

ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে উল্লিখিত যুদ্ধ অভিযানে অংশ নিয়াছিল—মালয়, তিউনিসিয়া, বার্মা, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা, সিসিলি, উত্তর আফ্রিকা, ইতালী, গ্রীস।

পাইফোর্স

মধ্যপ্রাচ্যে (ইরান ও ইরাক) ভারতীয় ডিভিসনকে পাঠানো হইয়াছিল ককেসাস হইয়া ভারত অভিমুখে জার্মানদের সম্ভাব্য অগ্রগতি রুখিবার জন্য। সেই সময় মধ্য-প্রাচ্যে ভারতীর ডিভিসন পরিচিত হইয়াছিল "পাইফোর্স" নামে। এক কথায়, রাশিয়ার সৈন্যদের পশ্চাদ্‌পসারণ এবং ইরান ও ইরাক হইয়া জার্মান বাহিনীর অগ্রগতির আসন্ন মুহূর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাধা দান ছিল সেই সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাশিয়া অভিমুখে

জার্মান বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়াকেও ভারত সাহায্য করিয়াছিল। ভারতীয় সৈন্যরা সেই সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে রাশিয়া পর্যন্ত ইরান-জাহিদান থেকে মেশেদা হইয়া দীর্ঘ ৩০০০ মাইল সরবরাহ পথ তৈরী করিয়া দিয়াছিল।

আর এই সড়কপথে ১৫ লক্ষ টন দ্রব্যাদি রাশিয়ায় সরবরাহ করা হইয়াছিল। অথচ সেই সময় জাহাজযোগে এত বৃহৎ পরিমাণ দ্রব্যাদি সরবরাহ করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল।

সরবরাহ ছাড়াও, তপ্ত মরুভূমি ও বরফে ঢাকা পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা এই সড়কপথে ২৪ ঘণ্টা সামরিক টহলব্যবস্থাও বজায় রাখিয়াছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী।

একটি বৃহৎ অগ্রগতি

পূর্ব আফ্রিকায় যুদ্ধে নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্যরা শুধমাত্র ঐ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বরং তারা যুদ্ধ করিতে করিতে উত্তর আফ্রিকা, তিউনিসিয়া ও ইতালী পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৫০০ মাইল অগ্রসর হইয়াছিল।

পুরস্কার

যুদ্ধকালে ভারতীয় সেনা-বাহিনী ৩১টি ভিক্টোরিয়া ক্রশ জয় করিয়াছিল। এগুলি ২৭টি দেওয়া হইয়াছিল বার্মার যুদ্ধে অসম সাহসিকতার জন্য। এছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা আরও ২০টি পুরস্কার জয় করিয়াছিল।

এক কথায় যুদ্ধে অসম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী মোট ৪২০৮টি পুরস্কার জয় করিয়াছিল।

ভারতীয় কম্যাণ্ড

জাপানের পরাজয়কালে জঙ্গলে যুদ্ধ করিবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী ৫০০০০০ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছিল। এছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্যাণ্ডে ৭০০০০০ জন, বিদেশে (পাইফোর্স হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য ও ইতালীতে) ২২০০০০ জন এবং ভারতীয় কম্যাণ্ডে ৩০০০০০ জন ভারতীয় সৈন্য নানাভাবে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল।

এক কথায় ভারতীয় কম্যাণ্ড ছিল সমস্ত রণাঙ্গনে নানাভাবে সহায়তা করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি অবলম্বন।

বার্মা

বার্মায় নিযুক্ত চতুর্দশ বাহিনী ছিল বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম একক বাহিনী। এর যুদ্ধক্ষেত্র ছিল ৭০০ মাইল বিস্তৃত, যা জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার ফ্রণ্টের সমান।

বার্মায় যুদ্ধরত সেই ১০ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ৭ লক্ষই ছিলেন ভারতীয়।

আর বিভিন্ন রণাঙ্গনে জাপানীরা যত হতাহত হইয়াছিল, তার অর্ধেকই হইয়াছিল বার্মায়, বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনীর হাতে।

দুইভাবে সাহায্য

মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারত দুইভাবে সাহায্য করিয়াছিল। একদিকে যেমন ভারত নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্মিত যুদ্ধসামগ্রীর একটা বিরাট অংশ সরবরাহ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি মিত্র শক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ-সামগ্রীর সরবরাহও ভারত যুদ্ধ চলাকালে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

এই সময় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিল এবং শান্তির সময়ে যে সব দ্রব্য রপ্তানি করা হইত তার দেশীয় বিকল্পের সন্ধান করিয়াছিল। এছাড়া পর্ষদ নিম্নোক্ত দ্রব্যের উন্নত ব্যবহার-পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন :

কেমিক্যাল	ওষুধ
প্লাসটিক	ডাই
ভেজিটেবল অয়েল লুব্রিক্যাণ্ট	শোলাক

কাষ্ঠ

অন্যান্য অনেক কিছুর উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে ভারতে কাঠের উৎপাদনও আশানুরূপহারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে যেখানে ভারতে কাঠ উৎপাদিত হইয়াছিল ২ লক্ষ ৪২ হাজার টন, সেখানে ১৯৪৩—৪৪ সালে তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার টনে।

তাছাড়া এই সময়ে ভারতের কারখানাগুলিতে ৬ কোটি বর্গফুটেরও বেশী পরিমাণ প্লাইউড উৎপাদিত হইয়াছিল।

মিত্রশক্তিকে সরবরাহ

নিজস্ব প্রয়োজন মিটানো ছাড়াও ভারতের নতুন কারখানাগুলি মিত্রশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসামগ্রীও নিয়মিত সরবরাহ করিয়াছিল।

ভারতে তৈরী বস্ত্রাদি ১৫টি দেশে পাঠানো হইয়াছিল। তাছাড়া মিত্রশক্তির প্রয়োজনীয় ৫০ হাজার বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রাদির মধ্যে ৩৭ হাজারই ভারত সরবরাহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

প্রশান্তমহাসাগরীয় যুদ্ধে অস্ট্রেলিয়াকে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারত ছিল তৃতীয় স্থানে। সেই সময় অস্ট্রেলিয়া ছাড়া,চীন ও রাশিয়াতেও প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধ-সামগ্রী পাঠানো হইয়াছিল। এই সব ছাড়া ভারত নিম্নোক্ত দেশগুলিতে সরবরাহ করিয়াছিল :

মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায়—

ইলেকট্রিক তার	তাঁবু
পাখা	ইস্পাত
বস্ত্র	কাঠ

ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য

বৃটেনে --

তুলা	জুতা
পাট	খাদ্যসামগ্রী

ক্যানভাস

সমস্ত মিত্র দেশগুলিতে—

অভ্র	চামড়া (ক
পাট	পশু চর্ম
ম্যাঙ্গানীজ আকরিক	রবার

'ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করিতে আপনারা জাপান যাইতেছেন শুনিয়া আমি খুবই খুশী হইয়াছি। জাপানীদের পরাজয়ে বাধ্য করিবার ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কৃতিত্ব অনেকখানি। আর সারা বিশ্বই জানে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী আসাম ও বার্মায় কি সুন্দরভাবে যুদ্ধ করিয়াছে। তাছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনী সাহসিকতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে আফ্রিকা, জার্মানী, ইতালী ও সিরিয়ায় জার্মানীর পরাজয় ঘটাইবার কঠিনযুদ্ধে প্রভুত সাহায্য করিয়াছে। আপনাদের মধ্যে এমন অনেক ইউনিট এবং অফিসার ও সৈনিক আছেন যাঁরা এই সব কয়টি দেশেই যুদ্ধ করিয়াছেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে খ্যাতি আনিয়া দিয়াছেন।"*

—জেনারেল স্যার ক্লড অকিনলেক, কমান্ডার-ইন-চীফ, ভারতবর্ষ (জাপানে দখলদারি ফৌজে যে ভারতীয় সৈন্যদল প্রেরিত হয় তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ) ১৫ জানুয়ারী, ১৯৪৬।

সাংবাদিক শ্রীপরিতোষ পাল কর্তৃক মূল ইংরাজী থেকে অনুদিত।

দশম পর্ব

দ্বাদশ অধ্যায়

উপসংহার

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করিয়া মানুষের ইতিহাসের যে বর্বরতম যুদ্ধ দীর্ঘ ৬ বছর ধরিয়া চলিয়াছিল, তার সমাপ্তি ঘটিয়াছিল ১৯৪৫ সালের ১৪ই আগস্ট। হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণের দ্বারা যে রক্তস্রাবী মহাযুদ্ধের সূচনা, জাপান কর্তৃক নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে সেই নরমেধযজ্ঞের অবসান। অবশ্য তার আগেই ৮-৯ই মে নাৎসী জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের দ্বারা ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছিল এবং তার পরেই আগস্ট মাসে জাপানেরও ঘটিল।

এ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসে এমন ভয়ংকর, এমন বীভৎস এবং এমন নির্বিচার ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডপূর্ণ মহাযুদ্ধ আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং প্রথমেই এই মহাযুদ্ধের নরঘাতন লীলার একটা রেখাচিত্র দেওয়া যাক। ১৯৭০ সালে বর্তমান গ্রন্থকার যখন দ্বিতীয়বার পূর্ব-জার্মানী পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সামরিক ইতিহাসের ছাত্ররূপে স্বভাবতঃই তিনি পটসডামের সেই বিখ্যাত সম্মেলন-কক্ষ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, যে প্রাসাদকক্ষে ১৯৪৫ সালের ১৭ই জুলাই থেকে ২রা আগস্ট পর্যন্ত মিলিত হইয়াছিলেন স্ট্যালিন, চার্চিল (পরে এ্যাটলি) ও ট্রুম্যান এবং স্বাক্ষর করিয়াছিলেন পটসডাম চুক্তি। কিন্তু সেই সম্মেলন কক্ষের দেওয়ালে মহাযুদ্ধের যে ভয়াবহ তথ্যগুলি একটি চার্টের আকারে টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেগুলি এই উপসংহার-পর্বে নিশ্চয়ই পাঠকদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য। যেমন—

প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত হইয়াছিল ১ কোটি লোক।

আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল ৫ কোটি ৫০ লক্ষ লোক।

প্রথম মহাযুদ্ধে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ লোক সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিয়াছিল।

আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিয়াছিল ১১ কোটি লোক।

প্রথম মহাযুদ্ধে ৩৩টি দেশ সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল।

আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ৭২টি দেশ।

"মানুষের ইতিহাসের বীভৎসতম অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছিল ফ্যাসিস্ট বর্বরেরা।" ১১ মিলিয়ান বা ১ কোটি ১০ লক্ষ লোককে বন্দীনিবাসগুলিতে হত্যা করা হইয়াছে নানা হিংস্র ও কল্পনাতীত নিষ্ঠুর উপায়ে—বিষাক্ত গ্যাসের সাহায্যে, পিটিয়ে ও শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে, সোজা গুলি করে, ফাঁসিতে লটকিয়ে, স্রেফ উপবাসে রেখে এবং অন্যান্য নানা উপায়ে—যেমন পরীক্ষামূলক ঔষধ প্রয়োগে।

এই নিহত নর-নারী-শিশু-বালক-বালিকা ও বৃদ্ধ প্রভৃতির মধ্যে ছিল ৬০ লক্ষ ইহুদী। এই সঙ্গে ইউরোপ থেকে হিটলারী ফ্যাসিজম ও যুদ্ধে বিরোধী মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোককে বন্দীশালায় আটক করা হইয়াছিল।

পটসডাম কনফারেন্স হলে জার্মান ফ্যাসিজম কর্তৃক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি ছিল ঃ

সোভিয়েত ইউনিয়ন—	২,০০০০০০০
পোল্যাণ্ড—	৬০,০০০০০
জার্মানী—	৮০,০০০০০
যুগোশ্লাভিয়া—	১৭,০০০০০
রুমানিয়া—	৭,৭০,০০০
গ্রেট বৃটেন ও কমনওয়েলথ—	৬,৬৫,০০০
ফ্রান্স—	৬,২০,০০০
ইতালী—	৬,৭০,০০০
গ্রীস—	৫,৭০,০০০
চেকোশ্লোভাকিয়া—	৮,৫০,০০০
অস্ট্রিয়া—	৩,৪৬,০০০
হাঙ্গেরী—	৭,৯০,০০০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—	৩,৬৭,০০০
হল্যাণ্ড—	২,৫৫,০০০
বেলজিয়াম—	১,৬০,০০০
ফিনল্যাণ্ড—	৯৭,০০০
বুলগেরিয়া—	৩২,০০০
আলবেনিয়া—	২৬,০০০
নরওয়ে—	৯,০০০
ডেনমার্ক—	৪,০০০
আহত ও পঙ্গু—	৮,০০০০০০০

উপরে উদ্ধৃত এই সংখ্যার সঙ্গে এশিয়া মহাদেশের চীন ও জাপানের কথাও মনে রাখিতে হইবে। একটি মার্কিন পুস্তকে প্রকাশ যে, চীনে কত লোক হতাহত হইয়াছিল, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে, জেনারেলিজিমো চিয়াং কাইসেক তাঁর আত্মকথায় লিখিয়াছেন যে, চীনা সৈন্যের হতাহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও বেশী। এই সংখ্যার মধ্যে অবশ্যই চীনের অসামরিক নর-নারীর মৃত্যু ও সম্পত্তি-হানির কথা ধরা হয় নাই।

আর বিমান আক্রমণে ও যুদ্ধে জাপানের প্রাণহানির সংখ্যা ২০ লক্ষ।[১]

এই প্রসঙ্গে বাংলায় ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ লোকের দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর কথাও নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৩ সাল সঙ্গে পরতে আট প্রায় সাড়ে বার কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়াছিল।

১৯৭৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে মস্কো থেকে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি স্মরণযোগ্য ঃ

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯—নাৎসীদের পোল্যাণ্ড আক্রমণে যুদ্ধের সূচনা। ৮ই মে, ১৯৪৫—নাৎসী জার্মানীর আত্মসমর্পণ।

"যুদ্ধের স্থিতিকাল ছিল ৬ বছর এবং ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা—এই তিনটি মহাদেশের ৪০টি দেশ রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ইউরোপীয় মহাদেশই ছিল মহাযুদ্ধের মূল নাটক এবং তার চুড়ান্ত অংক ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে।"[১]

যুদ্ধে জড়িত মানুষের সংখ্যা ছিল ১৭০ কোটি। অর্থাৎ সমগ্র মনুষ্যজাতির তিন-চতুর্থাংশ (প্রথম মহাযুদ্ধে ১০ কোটি)।

যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলির মোট ব্যয় আনুমানিক ১,৫০,০০০ কোটি ডলার।

আমেরিকার সামরিক ব্যয় ৩১,৮০০ কোটি ডলার।

বৃটেনের সামরিক ব্যয় ৩১,০০০ কোটি ডলার।

অক্ষশক্তির মোট সামরিক ব্যয় ৪২,০০০ কোটি ডলার।

যুদ্ধে লিপ্ত মোট সৈন্যসংখ্যা ১১ কোটি। প্রধানতঃ সমরাস্ত্র নির্মাণেই শ্রমশক্তি নিযুক্ত হইয়াছিল এবং মাত্র চারিটি দেশ—আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মিত হইয়াছিল ঃ

বিমান ৬,৫৩,০০০
ট্যাঙ্ক—২,৮৭,০০০
কামান—১০,৪২,০০০

যুদ্ধে নিহত হয় সাড়ে-পাঁচ কোটি মানুষ। এর মধ্যে সৈন্য ২ কোটি ৭০ লক্ষ এবং অ-সামরিক নর-নারী ২ কোটি ৮০ লক্ষ।

অ-সামরিক জনগণের উপর নৃশংস আক্রমণ এবং শহর-গ্রাম-জনপদ ধূলায় মিশাইয়া দেওয়াই ছিল তাদের বর্বর রণনীতির প্রধান লক্ষ্য। আর বন্দীশিবিরগুলিতে গণহত্যা। এ জন্যই সৈন্য সংখ্যার চেয়ে অ-সামরিক নর-নারী-শিশু হত্যার সংখ্যা এত বেশী।

সোভিয়েত দেশে নাৎসীরা নিশ্চিহ্ন করিয়াছিল ঃ

১,৭০১ টি ছোট-বড় শহর
৭০,০০০ টি গ্রাম
৩২,০০০ শিল্পসংস্থা
৯৮,০০০ যৌথ খামার
১,৮৭৬ রাষ্ট্রীয় খামার
৬৫,০০০ কিলোমিটার রেল লাইন

ধ্বংস করে বা জার্মানীতে লইয়া যাওয়া হয় ঃ

১৬,০০০ রেল ইঞ্জিন
৪,২৮,০০০ রেলওয়ে ওয়াগন

সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট বৈষয়িক ক্ষতি ঃ

২,৬০,০০০ কোটি রুবল

নাৎসীদের বিমান আক্রমণে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়—

বৃটেনে ২০ লক্ষ ঘরবাড়ী।

১। Great Patriotic War of the Soviet Union, P. 433.

ফ্রান্স, হল্যান্ড, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস ও অন্যান্য দেশেও নিশ্চিহ্ন হয় অসংখ্য ঘরবাড়ী ও অ-সামরিক সংস্থা।

অপরদিকে মিত্রশক্তির পালটা আক্রমণে জার্মানীর ধ্বংস হয়ঃ

১৫ লক্ষ ঘরবাড়ী।

নিরাশ্রয় হয় ৭৫ লক্ষ জার্মান।

* * *

দানবিক ফ্যাসিজমকে পরাজিত করার জন্য কি পরিমাণ মূল্য দিতে হইয়াছে, তা উপরে উদ্ধৃত তথ্যগুলি থেকে কিছুটা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার এই অংকও সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নয়। মানুষের জীবনের ও বিষয়-সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি ইউরোপে, আফ্রিকায় ও এশিয়ায় সুনির্দিষ্টরূপে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অধিকন্তু মিত্রপক্ষের মধ্যেও ইঙ্গ-মার্কিন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার প্রদত্ত হিসাবগুলির মধ্যে সর্বত্র মিল নাই। কারণ, প্রত্যেকেই যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের বীরত্ব ও কৃতিত্বকে প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছেন, তেমনি অপরের তুলনায় নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-স্বীকারকেও বড় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় গৌরবের দিক থেকে এই দুর্বলতা স্বাভাবিক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গকে প্রতিরোধ ও পরাজিত করিতে গিয়া ৬ বছরের মহাযুদ্ধে যে অভাবনীয় ক্ষতি ও ধ্বংস হইয়াছে, তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ জীবনের দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা পরিমাপ করার যন্ত্র কোথায়? এই দুর্ভোগ ও যন্ত্রণার খেসারৎ দিতে হইয়াছে বিভিন্ন দেশকে মহাযুদ্ধ অবসানের ৩০ বছর পরেও—দারিদ্র্য, বেকারি, মুদ্রাস্ফীতি, বাস্তুহারা এবং অন্যান্য বহুভাবে।

উপরে প্রধানত সোভিয়েত পক্ষের প্রদত্ত হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে মার্কিন পক্ষের প্রকাশিত হিসাবও উল্লেখ করা যাইতেছে "দুই শিবিরের" (রাজনৈতিক মতবিরোধের দিক থেকে) বক্তব্য অনুধাবনের জন্য।

মার্কিন ঐতিহাসিক লুই স্নাইডার লিখিয়াছেন যে, জার্মানী সমগ্র ইউরোপকে নিজেদের তাঁবেদারিতে আনিতে গিয়া প্রভুত মূল্য দিয়াছিলঃ

হিটলারী যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল ২ কোটি জার্মান।

এর মধ্যে ৩২ লক্ষ ৫0 হাজার যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত।

অন্যান্য ভাবে মৃত ৩৩ লক্ষ ৫0 হাজার।

৭২ লক্ষ ৫0 হাজার আহত এবং ১৩ লক্ষ নিখোঁজ।

অর্থাৎ জার্মানীর হতাহত ও নিখোঁজের (বন্দীসহ?) মোট সংখ্যা ১ কোটি ২১ লক্ষ ৫0 হাজার।

জনসংখ্যার এই ক্ষতি ছাড়া মিত্রবাহিনীর হাতে হিটলারের তৃতীয় রাইখ এমনভাবে ধ্বংস হইয়াছিল যে, আগের জার্মানীকে আর যেন চেনাই যাইত না। জার্মানীর ২ কোটি অট্টালিকার মধ্যে ৭0 লক্ষ হয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ২০০০ সেতু ধ্বংস হইয়াছিল, আর ৩000 মাইল রেলপথ ও সড়ক চূর্ণ হইয়াছিল। কার্যত প্রায় সমস্ত বড় বড় শহরের রাস্তাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং জার্মানীর বিখ্যাত রাজধানী বার্লিনের সরকারী ও বে-সরকারী অট্টালিকা, পরিবহণ, জল, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইত্যাদি সমস্ত পাব্লিক সার্ভিস ও সরবরাহ-ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল

এবং সর্বত্র মৃত্যুর বিভীষিকায় বার্লিন যেন প্রেতনগরীর রূপ ধারণ করিয়াছিল। আর এই প্রেতপুরীতে কত হতভাগ্যকে দেখা গিয়াছে স্ত্রীপুত্র পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ করিতে! হিটলারী নাৎসী ডিক্টেটরির চরম মূল্য দিতে হইয়াছে জার্মানীকে। একমাত্র প্রাচীন কার্থেজ নগরীর (রোমানদের হাতে) ধ্বংসের সঙ্গে এর তুলনা করা যাইতে পারে। আর্থিক হিসাবে জার্মানীর ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ছিল ২৭ হাজার ২০০ কোটি ডলার!

অক্ষশক্তিবর্গের অন্যতম প্রধান অংশীদার জাপানকেও অনুরূপ খেসারৎ দিতে হইয়াছিল।

৯৭ লক্ষ জাপানী অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এর মধ্যে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল ১২ লক্ষ ৭০ হাজার। অন্যান্যভাবে মারা পড়িয়াছিল ৬ লক্ষ ২০ হাজার। আহত হইয়াছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার, নিখোঁজ হইয়াছিল ৮৫ হাজার। অর্থাৎ জাপানের মোট ২১ লক্ষ ১৫ হাজার হতাহত ও বন্দী।

জাপানের সমগ্র নৌবহর ধ্বংস হইয়াছিল এবং বাণিজ্যবহরও ধ্বংস হইয়াছিল শতকরা ৯৫ ভাগ।

জাপানী দ্বীপের এক অংশ থেকে অন্য অংশ পর্যন্ত শহরগুলি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

পার্লহারবার আক্রমণের চূড়ান্ত পরিণতি এই:

অক্ষশক্তিবর্গের তৃতীয় বড় অংশীদার ইতালীর অবস্থাও মর্মান্তিক হইয়াছিল।

৩১ লক্ষ ইতালীয়ান অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪৯৬ জন।

আহত হইয়াছিল ৬৬,৭১৬ জন এবং নিখোঁজ হইয়াছিল ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭০ জন।

ইতালীর ২০৮ টি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস হইয়াছিল এবং ৪৯টি আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আর বাণিজ্যে নৌ-বহরের ৯০ ভাগ নষ্ট হইয়াছিল।

আর্থিক দিক দিয়া ইতালী প্রায় দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল।

২২ বছরের ফ্যাসিস্ট মহিমার এবং মুসোলিনীর রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের এই পরিণতি!

উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সারা ইতালী বোমায় ও গোলায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং সর্বত্র খাদ্যাভাব ও ক্ষুধার্ত মানুষের করুণ দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।

মিত্রপুঞ্জের মধ্যে বিজয়ী বৃটেন পর্যন্ত মারাত্মকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়াছিল।

বৃটেন যুদ্ধের জন্য সমাবেশ করিয়াছিল ৫৮ লক্ষ ৯৬ হাজার জন। এর মধ্যে মারা পড়িয়াছিল ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ১১৬ জন।

আহত হইয়াছিল ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ২৬৭ জন এবং নিখোঁজ হইয়াছিল ৪৬ হাজার ৭৯ জন। বৃটেনের বিশাল বাণিজ্য নৌবহর যুদ্ধের সময় প্রভূত পরিমাণে পরিস্ফীত হইলেও ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন থেকে হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৬০ টনে দাঁড়াইয়াছিল।

আর খাস বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ৫ লক্ষ বাড়ী ধ্বংস হইয়াছিল, আর ৪০ লক্ষ বাড়ী জখম হইয়াছিল।

বৃটেনের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল ভয়াবহ। জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৪ হাজার কোটি ডলার থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ১০ হাজার কোটি ডলার ছাড়াইয়া গিয়াছিল। আর বিদেশী

ঋণের পরিমাণ ৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলারের দাঁড়াইয়াছিল। আর সমুদ্রপার্শ্ববর্তী বৃটিশ সাম্রাজের বিশাল মূলধনী কারবার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

বৃটেনের মিত্র ও দোসর আমেরিকার শক্তি বৃদ্ধির তুলনায় ইংলণ্ড যেন রাহুগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিল।

এখানে সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষতির পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মার্কিন গ্রন্থকার তার বিশদ বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, একমাত্র স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে রাশিয়ার যত লোক হারাইয়াছিল আমেরিকা সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমস্ত যুদ্ধেও তত লোক হারায় নাই! মার্শাল স্ট্যালিন নাকি একবার মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, মিত্রশক্তির জয়লাভে রাশিয়া দিয়াছে রক্ত, বৃটেন দিয়াছে সময় এবং আমেরিকা দিয়াছে মাল।[1]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবশ্য ফ্রান্সের ক্ষতি প্রথম মহাযুদ্ধের মত বিপর্যয়কর ছিল না— যদিও প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল।

ফ্রান্সের সশস্ত্র বাহিনীর ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৮ জন নিহত এবং অন্যান্য মৃত ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৫৭৭ জন।

আহত ৪ লক্ষ এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার নিখোঁজ।

৩০ হাজার ফরাসী ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখে প্রাণ দিয়াছিলেন।

১ লক্ষ ৮৮ হাজার অন্যান্য অ-সামরিক ব্যক্তি মারা পড়িয়াছিল।

১ লক্ষ ৫০ হাজার নির্বাসিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ৩৮ হাজার বন্দী-শালায় মারা গিয়াছিল।

কলকারখানা, সেতু, রেলওয়ে ইঞ্জিন ও নৌবহর এবং বন্দর ইত্যাদির ক্ষতি হইয়াছিল অপরিমেয়।

পাঁচ বছর নাৎসী জার্মানীর বুটের তলায় থাকার ফলে ফ্রান্সের নৈতিক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। চোর, জুয়াচোর, কালোবাজারের কারবারী ও বিশ্বাস-ঘাতকে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল।

বহু স্ত্রীলোকের চরিত্র নষ্ট হইয়াছিল এবং যারা জার্মানদের শয্যাসঙ্গিনী হইয়াছিল, তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ মাথা নেড়া করিয়া প্রকাশ্য রাস্তায় প্লাকার্ডসহ (আত্মদোষ স্বীকৃতির প্রমাণ হিসাবে) মার্চ করানো হইয়াছিল এবং জনসাধারণ তাদের মুখে থুতু দিয়াছিল। শত্রুর সহযোগী প্রায় ১ লক্ষ লোককে আদালত থেকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ৫০০ বিশ্বাসঘাতককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

ফ্রান্সের প্রথম মহাযুদ্ধের ভাদুন হীরো মার্শাল পেঁতা, যিনি ভিসি সরকারের নায়ক এবং জার্মানীর সহযোগী ও আত্মসমর্পণকারী ছিলেন, তাঁরও মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। কিন্তু ৯০ বছরের বৃদ্ধকে প্রাণে বধ না করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কুখ্যাত পিয়ের লাভালকে রেহাই দেওয়া হইল না, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাকে গুলি করিয়া মারা হইল।

এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতির কথা। আমেরিকার নৌ, বিমান ও স্থল সর্বপ্রকার সশস্ত্রবাহিনীতে মোট ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৬৬ জন যোগ দিয়াছিল।

১। দি ওয়ার, লুই স্নাইডার, পৃঃ ৬১২—১৫।

এর মধ্যে হতাহত হইয়াছিল ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৭৪ জন।

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৮৬ জন। অন্যান্যভাবে মৃত ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৪২ জন। এবং আহত ৬ লক্ষ ৭০ হাজার ৮৪৬ জন।

ইউরোপ থেকে সুদূর প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত সর্বত্র আমেরিকানরা মৃত্যু বরণ করিয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বে সামরিক সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ ছিল ন্যূনপক্ষে ৩৫ হাজার কোটি ডলার।

কিন্তু জর্জ মার্শাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, একজন সৈন্য রণক্ষেত্রে যে সার্ভিস দেয় গোটা জাতির পক্ষেও তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়![1]

* * *

উপরের উদ্ধৃত সংখ্যাগুলি থেকে অন্ততঃ এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, মানুষের ইতিহাসে এমন ভয়ংকর নরঘাতন এবং অভাবনীয় পাশবিকতার উন্মত্ততা আর কখনও দেখা যায় নাই এবং এত বড় বিরামহীন যুদ্ধও আর কখনও ঘটে নাই। এই মহাযুদ্ধ চলিয়াছিল ২১৯১ দিন ধরিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল জুকোভ তাঁর স্মৃতি-কথায় মন্তব্য করিয়াছেন—'যুদ্ধের গোটা কালপর্ব জুড়ে শীত,গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতেই বিরামহীন লড়াই চলেছিল।' এমন কি রাত্রিবেলা পর্যন্ত লালফৌজ লড়াই চালাইয়াছিল। কিন্তু আগে 'বিশেষ অবস্থায় ছাড়া' রাত্রিবেলা সাধারণতঃ রণক্রিয়া চালানো হইত না। ১৯৪৩-৪৫ কালপর্বে লালফৌজ যে বিরাট আক্রমণ অভিযান চালাইয়াচিল, তাতেই নৈশ-রণক্রিয়ার পরিধি এত ব্যাপক হইয়াছিল। কিন্তু জার্মানবাহিনী নৈশ লড়াই এড়াইয়া যাইতে চাহিত।[2]

কিন্তু জার্মানীর মত জ্ঞান বিজ্ঞানে সমুন্নত একটা সভ্যজাতির পক্ষে এমন বর্বর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং হিটলারের পক্ষে সেই যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া কিভাবে সম্ভব হইল? আর হিটলারের মত এমন নিরঙ্কুশ এবং অপরিসীম ক্ষমতার ডিক্টেটার (যা পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায় নাই) অর্জন এবং তার সর্বাত্মক প্রয়োগ কিভাবে সম্ভব হইয়াছিল?—যে কোন চিন্তাশীল পাঠকের মনে এমন প্রশ্ন নিশ্চয়ই দেখা দিতে পারে। কারণ, যুদ্ধ মাত্রই বর্বর। কিন্তু সেই বর্বরতা এত চরম মাত্রায় উঠিয়াছিল কিভাবে?

এই জটিল প্রশ্নটির উত্তর দিয়াছেন হিটলারেরই একজন দক্ষ এবং বিখ্যাত পার্শ্বচর ও সমরাস্ত্রের মন্ত্রী আলবার্ট স্পীয়ার (Albert Speer)—ন্যুরেমবার্গের বিচারালয়ে একমাত্র যিনি জার্মানীর এই যুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে হিটলারসহ তাঁর সমস্ত সহ-কর্মীদেরকেই দায়ী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পশ্চিম বার্লিনের স্পাডাউ কারাগারে বসিয়া তিনি যে স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন, তাতে নাৎসী জার্মানীর বহু চাঞ্চল্যকর চিত্র তিনি উদ্ঘাটন করিয়াছেন। আধুনিক যুদ্ধ ও হিটলারের ডিক্টেটার সম্পর্কে তিনি একজন অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী ও যন্ত্রবিশারদরূপে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, এরজন্য

১। পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা, ৬১৬।

২। মার্শাল জুকোভ প্রণীত 'স্মৃতিচারণ ও গভীর চিন্তন' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত—সোভিয়েত সমীক্ষা, ১৯৭৫, সংখ্যা ২২।

মূলতঃ দায়ী যন্ত্রবিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ও উন্নতি। তিনি লিখিয়াছেন যে, একমাত্র তিনি নন, এমন ধারণা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন স্বয়ং মার্কিন সমরসচিব মিঃ হ্যারি এল স্টিমসন। ১৯৪৭ সালে স্টিমসন আমেরিকার বিখ্যাত সাময়িকপত্র "ফরেন এ্যাফায়ার্স" পত্রে লিখিয়াছিলেন :

'We must never forget, that under modern conditions of life, science and technology, all war has become greatly brutalized and that no one who joins in it, even in self-defence, can escape becoming also in a measure brutalized. Modern war cannot be limited in its destructive method and the inevitable debasement of all participants…"

অর্থাৎ সহজ কথায় 'আধুনিক জীবনযাত্রার অবস্থায় বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার জন্য সমস্ত যুদ্ধই বর্বরতায় পরিণত হইতে বাধ্য। এমন কি আত্মরক্ষার জন্য যাঁরা যোগ দিয়া থাকেন, তাঁদের পক্ষেও বর্বর না হইয়া উপায় নাই। আধুনিক যুদ্ধে ধ্বংসের উপায়-গুলিকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয় এবং এমন যুদ্ধে সমস্ত অংশগ্রহণকারীর চারিত্রিক পতন অনিবার্য।'

মার্কিন সমরসচিবের এই মন্তব্য যে সত্য, তার প্রমাণ কেবল হিটলারী যুদ্ধ ও বন্দীশালার নৃশংসতা নয়, হিরোশিমা ও নাগাশাকির উপর স্বয়ং আমেরিকানদের পারমাণবিক বোমাবর্ষণ।…

হিটলারী ডিক্টেটরির সর্বগ্রাসিতা সম্পর্কে আলবার্ট স্পীয়ার যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন, সেগুলি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :

Hitler's dictatorship was the first dictatorship of an industrial state in this age of modern technology, a dictatorship which employed to perfection the instruments of technology to dominate its own pepole……By means of such instruments of technology as the radio and public address systems, eighty million persons could be made subject to the will of one individual.

সহজ কথায়—'আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে হিটলার এমন একটি শ্রমশিল্পে উন্নত রাষ্ট্রের ডিক্টেটরি পাইয়াছিলেন, যে রাষ্ট্রের কারিগরি বিদ্যার সমস্ত যন্ত্রগুলি এই ডিক্টেটরিকে নিখুঁত নৈপুণ্যের মধ্যে প্রয়োগের সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং তাঁর নিজের জনগণের উপর এই যন্ত্রবিদ্যা নিরবচ্ছিন্ন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। ৮০ মিলিয়ন লোককে একটি মাত্র ব্যক্তির ইচ্ছাধীন রাখার জন্য আধুনিক কারিগরি বিদ্যার যন্ত্রগুলি, যেমন রেডিও এবং জনগণের নিকট ভাষণ দেওয়ার পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছিল।'

মিঃ স্পীয়ার আরও লিখিয়াছেন—'টেলিফোন, টেলিটাইপ ও রেডিও ব্যবস্থার মাধ্যমে একেবারে সর্বস্তরের—উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যন্ত কর্মচারীদের নিকট সমস্ত হুকুম সোজাসুজি পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইত এবং তারা বশংবদের মত সেগুলি কার্যক্ষেত্রে পালন করিয়া যাইত। অন্যায় হুকুমগুলিও এমন প্রত্যক্ষভাবেই অফিসার ও সৈন্য-পত্যের নিকট পৌঁছিত।'

'The instrument of technology made it possible to maintain a close watch over all citizens and to keep criminal operations shrowded in a high degree of secrecy···Dictatorships of the post needed assistants of high quality in the lower ranks of the leadership also—men who could think and act independently. The authoritarain system in the age of technology can do without such men.···

The criminal events of those years were not only an outgrowth of Hitler's personality The extent of the crimes was also due to the fact that Hitler was the first to be able to employ the implements of technology to multiply crime'[১]

অর্থাৎ প্রযুক্তিবিদ্যার যন্ত্রগুলির মাধ্যমে সমস্ত নাগরিকদের উপর তীক্ষ্ন নজর রাখা এবং সমস্ত অপরাধজনক কার্যাবলী অত্যন্ত উঁচু স্তরের গোপনীয়তার মধ্যে কুয়াশাচ্ছন্ন করিয়া রাখা সম্ভব হইত। অতীতকালের একনায়কত্ব সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের নিম্নস্তরেও উচ্চগুণসম্পন্ন সহকারীর দরকার হইত—যে সহকারীরা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করিতে সক্ষম। কিন্তু যন্ত্রবিদ্যার যুগে প্রভুত্বপরায়ণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পক্ষে এই ধরনের লোক ছাড়াও চলিতে পারে।···

'ওই বছরগুলির অপরাধজনক কার্যাবলী একমাত্র হিটলারের ব্যক্তিত্বের অতিস্ফীতির জন্য ঘটে নাই। এই সমস্ত অপরাধের এই ব্যাপকতা ঘটিয়াছিল এই জন্য যে, হিটলারই প্রথম কারিগরি বিদ্যার যন্ত্রপাতিগুলিকে অজস্র অপরাধের মাত্রা বাড়াইবার জন্য সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।'

এইভাবে হিটলার আধুনিক যন্ত্রবিপ্লবকে বর্বরতা ও হত্যাকাণ্ডের বাহন করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত পৈশাচিকতা অধিকাংশ জার্মান নর-নারীর কাছে গোপন রাখিতেও পারিয়াছিলেন। কিন্তু জার্মান সমরনায়কদের অধিকাংশই এই বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, একথা সত্য নয়। বরং তাঁদের অনেকেরই জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছানুসারে এই সমস্ত পাশবিকতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যদিও অনেক জার্মান সেনাপতি যুদ্ধের পর তাঁদের আত্মস্মৃতিতে হিটলারের অপরাধকে লঘু করিয়া দেখাইতে কিংবা তাঁর দোষ স্খালন করিতে চাহিয়াছেন, অথবা হিটলারের হাতে অপমানিত বা অপসৃত সেনাপতিরা তাঁর প্রচুর নিন্দাও করিয়াছেন, তবু শীর্ষ সেনানায়কদের অনেকেই, যেমন মার্শাল গোয়েরিং, ফিল্ড মার্শাল কাইটেল, ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টাইন, জেনারেল গুডেরিয়ান প্রভৃতি হিটলারকে অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী এবং অদ্বিতীয় জার্মান নেতা বলিয়া মনে করিতেন এবং জার্মানীর পতন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর প্রতি অন্ধভক্তি ও বিশ্বাস পোষণ করিতেন। হিটলারের আশ্চর্য স্মরণশক্তি, তাঁর অভূতপূর্ব বক্তৃতার মোহিনী মায়া, অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিখুঁত জ্ঞান. সামরিক শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁরা ফুয়ারকে অনন্যসাধারণ মনে করিতেন। আর মনে করিতেন তাঁর চোখের ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনতিক্রম্য।[২]

এছাড়া হিটলার কর্তৃক জার্মানীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর সমস্ত প্রকার প্রচারযন্ত্র—সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি থেকে শুরু করিয়া স্কুলের পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত সর্বত্র একদিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ (হিটলার-বিরোধী সমস্ত দল ও সংবাদ নিষিদ্ধকরণ) ও অন্যদিকে হিটলারের সহস্র স্তুতির বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। গোয়েবলসের দপ্তর এ বিষয়ে ছিল অসাধারণ দক্ষ। ফলে, জার্মান জাতির কাছে হিটলার ইতিহাসের একজন সর্বোত্তম পুরুষ, জার্মান জাতির ভাগ্যনিয়ামক ও অভ্রান্ত ত্রাণকর্তা বলিয়া প্রতিভাত হইলেন এবং হিটলার নিজেও বিশ্বাস করতেন যে, তিনিই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ধারকর্তা। এমন কি, তিনি কোমলহৃদয় নিরামিষাশী (কারণ জীবহত্যা সহ্য করিতে পারিতেন না!) ও ব্রহ্মচারী বলিয়া প্রচারিত হইলেন!

এভাবে একটা গোটা জাতিকে একটি মাত্র ব্যক্তির কুক্ষিগত ও বশম্বদ করিয়া ইতিহাসের এক অভাবনীয় বিপর্যয় ডাকিয়া আনা হইল।[১]

সুতরাং নাৎসী জার্মানীর এই সর্বগ্রাসী ডিক্টেটরির ইতিহাস থেকে সমস্ত দেশেরই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ, একা হিটলার নয়, ফুয়ারের অধিকাংশ ভক্ত ও সহকর্মীই ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্ষমতালোভী, নিষ্ঠুর ও পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত। আলবার্ট স্পীয়ার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যখন জার্মান জাতিকে এক জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে সর্বস্ব পণ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে গোয়েবলসের দপ্তর নিপুণ প্রচারকার্য চালাইতেছিল, তখন হিটলার, হিমলার, গোয়েরিং প্রভৃতি জার্মানীর ভাগ্য বিধাতাগণ অসম্ভব আড়ম্বর বিলাসিতাপূর্ণ প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈয়ার করাইতেছিলেন—যদিও যুদ্ধ চালাইবার উপযুক্ত মালমশলার অভাব ঘটিতেছিল। কেউ কেউ বা রক্ষিতার জন্যও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

স্পীয়ার এই সমস্ত ঘটনার উপর মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

'After only nine years of rule the leadership was so corrupt that even in the critical phase of the war it could not cut back on its luxurious style of living. For 'representational reasons' the leaders all needed big houses, hunting lodges, estates and palaces, many servants, a rich table, and a select wine celler." [২]

যুদ্ধের দুর্দিনে এই সমস্ত অদ্ভুত বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ রাজসিক ব্যবস্থা ছাড়াও স্পীয়ার লিখিয়াছেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ নাৎসী নেতারা যখন যেখানে ভ্রমণে যাইতেন সেখানেই নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নাম করিয়া সাড়ে-যোলফুট পুরু কংক্রীটের ছাদ ও দেওয়ালের অসংখ্য শেলটার বা ভূগর্ভের আশ্রয় নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এজন্য অজস্র অর্থব্যয় ও অজস্র শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইয়াছিল।···

* * *

বাহ্যত ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গ যতই শক্তিশালী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকুক না কেন,

---

গুডেরিয়ান প্রণীত 'Panzer Leader' (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ) এবং ন্যুরেমবার্গের আদালতের মামলায় গোয়েরিং ও কাইটেলের সাক্ষ্য স্মরণীয় বা দ্রষ্টব্য।

ভিতরে ভিতরে তাদের নৈতিক শক্তি (সামরিক ও বৈষয়িক শক্তি ছাড়াও) পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাদের নেতৃবর্গ দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অপরদিকে মিত্রপুঞ্জের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ থাকিলেও তাদের মধ্যে এই ধরনের দুর্নীতি ও চারিত্রিক পতন ছিল না। বিশেষতঃ সোভিয়েত রাষ্ট্র তো মহান দেশপ্রেমের যুদ্ধে যেন অগ্নিশুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এবং সেটা আরও সম্ভব হইয়াছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্য। যে ব্যবস্থার জন্য একটা গোটা জাতির "নিহিত আত্মিক শক্তির" জাগরণ ঘটিয়াছিল —এই মন্তব্য করিয়াছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি মার্শাল জুকোভ, তাঁর "স্মৃতিচারণ" গ্রন্থে। তিনি লিখিয়াছেন:

'আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের জয়কে সোভিয়েত জনগণের জীবনে নক্ষত্রোজ্জ্বল মুহূর্ত বলে বর্ণনা করিতে পারি। ঐ বছরগুলিতে আমরা ইস্পাতদৃঢ় হয়ে উঠেছিলাম এবং বিরাট নৈতিক পুঁজি সঞ্চয় করেছিলাম।'

অবশ্য এজন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে অপরিমিত ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আমেরিকার ভূখণ্ডে যখন একটিও বোমা পড়ে নাই কিংবা কোন কামানের গোলায় যখন একটি মাত্র শহরেরও ক্ষতি হয় নাই, তখন রাশিয়াকে দুকোটি জীবন আহুতি দিতে এবং অসংখ্য শহর, জনপদ ও গ্রাম হারাইতে হইয়াছিল। আর জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার মাত্র ১ লক্ষ ৫০ হাজার এবং গ্রেট বৃটেনের ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হইয়াছিল।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও মার্শাল জুকোভ হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সোভিয়েত জনগণ এই কোয়ালিশনের অন্যান্য সদস্যদের অবদানের কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই।[১]

ইতিহাসের দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং যুগান্তকারী ঘটনা সম্ভবতঃ দুইটি। প্রথমতঃ পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ও পারমাণবিক যুগের উদ্বোধন এবং দ্বিতীয়তঃ হিটলার ও ফ্যাসিজম-বিরোধী-মহাজোট বা কোয়ালিশন, যার ফলে ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির চূড়ান্ত পরাজয় কিংবা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

যদিও পশ্চিমের মিত্রশক্তি মহলে সোভিয়েত বিরোধী এবং ফ্যাসিস্ট পক্ষপাতি, রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অভাব ছিল না, তথাপি জনসাধারণের ও বুদ্ধিজীবী মহলের অধিকাংশই ছিল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধবাদী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষপাতী। তাঁরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ফ্যাসিস্ট আগ্রাসিন জয়লাভ করিলে কেবল সার্বভৌম স্বাধীনতাই বিপন্ন হইবে না, জাতীয় অস্তিত্বতও বিপন্ন হইবে এবং জনগণ চির-দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য হইবে। সুতরাং ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার কিংবা চার্চিল-রুজভেল্ট-স্টালিনের যে মহাজোট গড়িয়া উঠিল, তার মূলে ছিল জনসাধারণ, শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রবল নৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ। তা ছাড়া ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের পৃথিবীব্যাপী প্রভুত্ব স্থাপনের সামরিক দম্ভ তো ছিলই। অদৃষ্টের আরও পরিহাস এই যে, পশ্চিমের যে সমস্ত ধনিক ও রাজনৈতিক মহল সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলার ও ফ্যাসিজমকে তোষণ ও পোষণ

করিতেছিলেন, তাঁদেরই দেশ হিটলার কর্তৃক সর্বাগ্রে আক্রান্ত হইল। জার্মানী চাহিয়াছিল আগে পশ্চিমী শক্তিবর্গকে খতম করিতে এবং তারপর সোভিয়েত রাশিয়াকে সংহারপূর্বক জাপানের সঙ্গে একত্রে সারা পৃথিবী করায়ত্ত করিতে। যখন জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করিল, তার আগেই প্রায় সারা ইউরোপ হিটলারের কবলে আসিয়া গেল এবং তারপর জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে ও এশিয়া খণ্ডে মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভৃতি সাম্রাজ্য ও জাতীয় স্বার্থকে গ্রাস করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আফ্রিকায় সুয়েজ খাল পর্যন্ত ইতালীয়-জার্মান বাহিনীর অগ্রগতিতে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইল। অপরপক্ষে লাতিন আমেরিকায় জার্মান ফ্যাসিজমের অনুপ্রবেশ ও প্রভাব মার্কিন একচেটিয়া ধনিক-গোষ্ঠীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। সোজা কথায় একদিকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের জাতীয় স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে তাদের ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিষম অগ্নিপরীক্ষার পড়িল। সুতরাং এই অবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত হাত মিলাইয়া সাধারণ শত্রু বা 'common enemy'কে প্রতিরোধ ও পরাজিত না করিয়া উপায় ছিল না। অতএব হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের অন্তর্গত দেশগুলিতে জনসাধরণ থেকে উপরের মহল পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র ফ্যাসিস্ট শত্রুকে পরাজিত করার অদম্য সংকল্প দেখা দিল এবং বৃটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যেমন সামরিক ও রাজনৈতিক মৈত্রী ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইল, তেমনি বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক চুক্তিও ও সম্পাদিত হইল। ফ্যাসীবিরোধী মহাজোটের অংশীদাররূপে স্ট্যালিনচার্চিল-রুজভেল্ট কার্যতঃ বিশ্বনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বারা ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের পতন ঘটাইলেন। নাৎসী শক্তিবর্গের এই পরাজয় কেবল মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনীরই নয়, পার্টিজান বা গেরিলা যোদ্ধাদের অকুতোভয় সংগ্রাম, অপূর্ব ত্যাগস্বীকার এবং জনগণের নির্যাতন-বরণও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করা উচিত যে, জার্মান সৈন্য বাহিনীও যুদ্ধের দিক থেকে অপূর্ব দক্ষতা, বীরত্ব, ত্যাগস্বীকার এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। বিশেষতঃ যুদ্ধের গোড়ার দিকে এই সমস্ত গুণ এবং জার্মান-সামরিক সংগঠনের উৎকর্ষ ও যুদ্ধক্ষেত্রের বেষ্টননীতি দুনিয়াব্যাপী যেমন নাটকীয় চমক সৃষ্টি করিয়াছিল—যদিও শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত বাহিনী যুদ্ধ-বিদ্যার-দক্ষতায়, রণকৌশলের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগে এবং রণনীতির বিস্ময়কর নৈপুণ্যে আর সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদনে নাৎসী জার্মানীকে বহুদূর পিছনে ফেলিয়া গিয়াছিল। স্ট্যালিনগ্রাদ থেকে বার্লিন পর্যন্ত বহু ঐতিহাসিক যুদ্ধজয়ে সোভিয়েত বাহিনী ও সেনানীমণ্ডলী মার্শাল স্ট্যালিন ও মার্শাল জুকোভ ও অন্যান্য মার্শালদের নেতৃত্বে অবর্ণনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অপরপক্ষে বৃটিশ সামরিক শক্তি উত্তর আফ্রিকায় এল আলামিয়েনের যুদ্ধে এবং তার আগে বৃটেনের স্বদেশরক্ষার সংগ্রামে, আর মার্কিন বাহিনীর প্রশান্ত মহাসাগরে ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ ইঙ্গ-মার্কিন মহল সমুদ্র তীরবর্তী অভিযানগুলিতে অসাধারণ সংগঠনশক্তির ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। আর মার্কিন সরবরাহ-ব্যবস্থা সমুদ্র-পারের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া মিত্রপক্ষকে প্রভূত সহায়তা দিয়াছিল—যদিও বৃটিশ নৌশক্তি ফ্যাসিস্ট্য আক্রমণে প্রচণ্ডভাবে ঘায়েল হইয়াছিল।

যদিও ফ্যাসিবিরোধী মহাজোটের সমবেত চেষ্টার ফলেই ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের চরম পরাজয় ঘটিয়াছে, তবু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, এই মহাযুদ্ধে হিটলারী জার্মানী যেমন ছিল প্রধান শত্রু, তেমনি স্ট্যালিনের রাশিয়াই সেই শত্রুকে হনন করার মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এই মহাযুদ্ধে রাশিয়ার দেশপ্রেমের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির প্রাধান্যও প্রমাণিত হইয়াছে এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সোভিয়েত রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় শক্তির আসন দখল করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। মিত্রশক্তির অন্যতম মুখ্য অংশীদাররূপে চীনও বৃহৎ শক্তির মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং মহাযুদ্ধের কল্যাণে কিংবা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে মহাচীনেও কমিউনিস্ট বিপ্লব সহজতর হইয়াছে। প্রভূত মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও চীনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল চিয়াং কাইসেকের দুর্নীতি-দুষ্ট গবর্নমেণ্টের পরাজয় ও পতন ত্বরান্বিত হইয়াছিল।

কেবল চীনেই বিপ্লব ঘটে নাই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিপুঞ্জের পরাজয়ের ফলে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকবাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি সহ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের পরাধীন দেশগুলির শৃংখল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং ভিয়েৎনাম তথা ইন্দোচীনে বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু রক্তপাত ও সংঘর্ষও প্রচুর হইয়াছে। যেমন, ১৯৪৭ সালে বৃটেনের সহিত আপোষে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে এবং ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে স্বাধীন পাকিস্তানের উদ্ভব হইয়াছে।

* * *

একথা নিঃসন্দেহ যে, হিটলার-মুসোলিনী-তোজোর বিরুদ্ধে স্ট্যালিন-চার্চিল-রুজভেল্টের মহামৈত্রী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তথাপি একথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, এই মহামৈত্রী সত্ত্বেও কোন পক্ষই তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ বিসর্জন দেন নাই এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গ কমিউনিজমকেও প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। এই সমস্ত রাজনৈতিক মতবিরোধের জন্যই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে অনেক বিলম্ব (১৯৪৪ সালের মধ্যভাগ) হইয়াছিল এবং তার জন্য মহাযুদ্ধও অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। (অবশ্য কোন কোন সমালোচকের মতে রুজভেল্ট কর্তৃক ক্যাসাব্লাংকা সম্মেলন থেকে অক্ষশক্তিবর্গের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করার জন্যই জার্মানী ও জাপান শেষ পর্যন্ত লড়িয়াছিল। অন্যথা আরও আগে আত্মসমর্পণ ঘটিত। কিন্তু বিষয়টি বিতর্কমূলক এবং চার্চিলও এর সারবত্তা স্বীকার করিতেন না।)

মহাযুদ্ধ যতই উপসংহারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধও ততই তীব্র হইতেছিল এবং এপ্রিল মাসে রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যুর পর এই বিরোধ কোয়ালিশনকে প্রায় ভাঙ্গনের সীমানায় আনিয়া ফেলিয়াছিল। বিশেষভাবে পোল্যাণ্ড, বলকান রাজ্যগুলি, অস্ট্রিয়া এবং জার্মানী নিয়া বিরোধের অন্ত ছিল না। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পূর্বদিকে জাপানকে নিয়াও রাশিয়ার সঙ্গে যথেষ্ট মন কষাকষি ও

কূটনৈতিক চালবাজি দেখা দিয়াছিল। তথাপি জার্মানী ও জাপানের সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের আগে মিত্রপক্ষের এই মহামৈত্রী অন্ততঃ বাহ্যতঃ কাগজ-পত্রে অব্যাহত ছিল—যদিও মনে মনে তিন পক্ষের মধ্যে—এমন কি বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যেও কোন কোন সামরিক বিষয়ে (যেমন, ভূমধ্যসাগর, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের বিরুদ্ধে অভিযানে) অত্যন্ত মতান্তর ছিল।

বলা বাহুল্য যে, তিন বিশ্বনেতার মধ্যে কিংবা কোয়ালিশনের তিন প্রধান অংশীদারদের মধ্যে উইনস্টোন চার্চিল ছিলেন সাম্রাজ্যপ্রেমিক, তাঁর সমস্ত চেষ্টা ও লক্ষ্য ছিল ভারতসহ সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বৃটিশ প্রভুত্বের অধীনে রাখা। এইজন্য সমস্ত রণনীতি ও রণকৌশল তিনি সেদিকে পরিচালনা করার জন্য তাঁর সর্বপ্রকার কূটনৈতিক ধূর্ততা, অপূর্ব বাগ্মিতা এবং সামরিক বিদ্যার জ্ঞান সেদিকে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর পালটা দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বজ্রকঠোর সংকল্পের অধিকারী ছিলেন স্ট্যালিন—সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা এতটুকু ক্ষুন্ন হইতে দিতে কিংবা ফ্যাসিজমকে কোন করুণা দেখাইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এজন্যই বলকান অঞ্চল ও পূর্ব ইউরোপ নিয়া রাশিয়ার সঙ্গে এত বিরোধ গিয়াছে। কিন্তু যদি কোন প্রস্তাব স্ট্যালিনের বিবেচনায় ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত মনে হইত, তবে মার্কসবাদে তাঁর অটল বিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি চার্চিল-রুজভেল্ট বা পশ্চিমী মিত্রদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না এবং মিত্রপক্ষের বিপদের দিনে (১৯৪৪-৪৫ সালের শীতকালে) নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও আগাইয়া যাইতে পিছ-পা হইতেন না।

এই তিন বিশ্বনেতার মধ্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ছিলেন সর্বাপেক্ষা মার্জিত, শিষ্টাচারসম্পন্ন এবং সুবিবেচক। সেদিনের বুর্জোয়া আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ "জাতক" ছিলেন রুজভেল্ট। মহাযুদ্ধের ব্যাপকতা ও সংকটের জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিলের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ও অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু মার্শাল স্ট্যালিনের প্রতি তাঁর মনে মনে গভীর অনুরাগ ছিল। এমন কি, তিনি মনে করিতেন যে, চার্চিলের চেয়ে তিনি যদি একা স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন (যেমন, তেহরান সম্মেলনে) তবে সমস্যার মীমাংসাগুলি অনেক বেশী সহজ ও ফলপ্রসূ হইতে পারে। এজন্য স্ট্যালিনের সঙ্গে একা সাক্ষাৎ করিতে তিনি খুব উদ্‌গ্রীব ছিলেন এবং স্ট্যালিনও চার্চিলের চেয়ে রুজভেল্টকে বেশী পছন্দ করিতেন। এর মূল কারণ ছিল এই যে, রুজভেল্ট উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না, অধিকন্তু যুদ্ধের বিরোধী এবং বিশ্বশান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, স্ট্যালিন তথা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যদি সদ্ভাব ও সখ্যতা বজায় রাখা যায়, তবে মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা সহজতর ও অধিকতর বাস্তবতাসম্মত হইবে। এজন্য মিত্রশক্তিবর্গকে নিয়া যেমন তিনি ইউনাইটেড নেশন্স গঠনে উদ্যোগী ছিলেন, তেমনি, স্ট্যালিনের সঙ্গে বন্ধুতা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ব ইউরোপ বা বলকান সম্পর্কে রাশিয়াকে কিছু "কনশেসন" দিতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। ইয়াল্টা সম্মেলনে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কে স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর "গোপনচুক্তি" পরবর্তীকালে আমেরিকায় তীব্র সমালোচনার কারণ হইয়াছিল—যেমন সমালোচনা হইয়াছিল পূর্ব ইউরোপীয় ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়া। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে যে, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি রক্ষা বিষয়ে

কল্যাণের দ্যোতক ছিল। কিন্তু রুজভেল্টের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর আমেরিকায় ট্রুম্যান এবং বৃটেনে চার্চিলের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ইয়াল্টা ও পটসডামের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ করিতে লাগিলেন। সুতরাং মহাযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকেই ঠাণ্ডা লড়াই বা 'Cold War'-এর ঝাপ্টা শুরু হইয়াছিল।

তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে চার্চিল-রুজভেল্ট-স্ট্যালিনের মহামিলন ও মহাজোট যে অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, আগামী শতাব্দী কাল পর্যন্ত তা পাঠকদের চিত্তে গভীর রেখাপাত করিবে।

কিন্তু তবু প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই কোয়ালিশন টিকিল না কেন? এর জবাবও একজন মার্কিন গ্রন্থকারের রচনা থেকে দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এই লেখক সোভিয়েত পক্ষপাতী নন। তিনি (ডব্লিউ. এল নিউম্যান) লিখিয়াছিলেন যে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আদৌ নতুন নয়, যখন বিপদের দিনে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে কোয়ালিশন গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বিপদ কাটিয়া যাওয়ার পর সেই কোয়ালিশনের অংশীদাররাই পরস্পরের মাথা কাটিতে প্রায় উদ্যত হইয়াছিল ঃ

'The problems of coalitions are not new. Produced by fear of a common enemy, wartime unity has frequently turned to hostility and even warfare when that enemy is no longer dangerous. "A drowning man graps at a serpent" said a nineteenth century Ottoman Sultan defending his allience with his ancient Russian enemy in the face of an Egyptian invader. But when the drowning man succeeds in being rescued, he chooses his associates with care and may even join a crusade against serpents.'[১]

অতএব মিত্রশক্তির বা সোভিয়েত-বৃটিশ-মার্কিন মহামৈত্রী ভাঙ্গিয়া যাওয়া ইতিহাসে কোন অঘটন ব্যাপার নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ, মহাযুদ্ধ অবসানের গত ৩০।৩২ বছরের মধ্যে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে পারমাণবিক ও অন্যান্য প্রলয়ংকর অস্ত্র নির্মাণ ও গুদামজাত করার যে ভয়ংকর প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত চিন্তাশীল ও শান্তিকামী ব্যক্তি সে জন্য নিদারুণ উৎকণ্ঠিত। সমরাস্ত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা এমন স্তরে পৌঁছিয়াছে এবং কল্পনাতীত বিস্ফোরণ শক্তিসম্পন্ন এত বিভিন্ন মারণাস্ত্র তৈয়ার হইতেছে যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইলে সমগ্র মনুষ্যজাতি, এমন কি সমগ্র জীবজগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। তবে, সম্ভবতঃ একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, সেই মহাশ্মশানে কাঁদিবার কিংবা "বংশে প্রদীপ জ্বালিবার" মত কেউ আর বাঁচিয়া থাকিবে না! সুতরাং সেই ভয়ংকর পরিণাম থেকে সমগ্র সভ্যতা ও সমগ্র মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত দেশের জনগণের উচিত যুদ্ধ ও আগ্রাসন নিবারণ এবং বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষা করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করা।

মহাযুদ্ধের দিনপঞ্জী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েকটি ঐতিহাসিক তারিখ

১৯১৪ ৩ আগস্ট—প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ।
—জার্মানী কর্তৃক বেলজিয়ম আক্রমণ।

১৯১৮ ১১ নভেম্বর—জার্মানীর পরাজয় ও যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষর।

১৯১৯ ২৮ জুন—জার্মানীর সহিত ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর।

১৯২১ ২৮ জুলাই—হিটলার ন্যাশনাল সোসিয়েলিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত।

১৯২২ ২৬ অক্টোবর—ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর রোম 'অভিযান'।

১৯২৩ ১১ জানুয়ারী—ফ্রান্স ও বেলজিয়ম কর্তৃক জার্মানীর রুঢ় অঞ্চল দখল।

১৯২৪ ১ ফেব্রুয়ারী—বৃটেন কর্তৃক সোভিয়েত গবর্নমেণ্টকে স্বীকৃতি দান।

১৯২৭ ২৩ অক্টোবর—স্ট্যালিন কর্তৃক ট্রট্স্কি ও জিনোভিয়েফের বহিষ্কার।

১৯২৯ ২৩ অক্টোবর—ওয়াল স্ট্রীট স্টক মার্কেটের পতন। পৃথিবীব্যাপী বাজার মন্দার শুরু।

১৯৩০ ২২ এপ্রিল—জাপান, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নৌ-চুক্তি।
৩০ জুন—রাইনল্যাণ্ড পরিত্যাগ।

১৯৩১ ১৯ সেপ্টেম্বর—জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ।
২১ সেপ্টেম্বর—বৃটেনের স্বর্ণমান পরিত্যাগ।

১৯৩২ ২৫ ফেব্রুয়ারী—হিটলার কর্তৃক জার্মানীর নাগরিকত্ব লাভ।
৮ নভেম্বর—রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত।

১৯৩৩ ৩০ জানুয়ারী—হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত।
২৭ ফেব্রুয়ারি—রাইখস্ট্যাগে অগ্নিকাণ্ড। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টি। বিরোধীদের দমন আরম্ভ।
২৮ ফেব্রুয়ারী—ভেইমার সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি জরুরী অবস্থার অজুহাতে স্থগিত।
১৬ মার্চ—গোয়েবেলস্ প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী নিযুক্ত।
২৭ মার্চ—জাপান কর্তৃক লীগ অব্ নেশন্স পরিত্যাগ ঘোষণা।
১ এপ্রিল—ইহুদীদের বিরুদ্ধে জাতিগতভাবে বর্জন আন্দোলন আরম্ভ।
১৪ অক্টোবর—হিটলার কর্তৃক জার্মানীর বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ পরিত্যাগ ঘোষণা।
২৪ নভেম্বর—সমস্ত বিরোধীদলকে টেরোরিজমের দ্বারা দমনের অবাধ অধিকার অর্পণ পুলিশের বড়কর্তা হিমালয়ের উপর।

১৯৩৪ ২৬ জানুয়ারী—জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে ১০ বছরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।
৩০ জুন—হিটলারের 'রক্তস্নান'—ক্যাপ্টেন রোয়েম প্রমুখ ঝটিকাবাহিনীর প্রধানগণকে ও অন্যান্য পদস্থ জার্মানদের হত্যা।

১৯৩৪ ২৫ জুলাই অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ডলফাসকে হত্যা।

২ আগস্ট—প্রেসিডেণ্ট ফন্ মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু।
হিটলার কর্তৃক নিজেকে জার্মানীর রাষ্ট্রপতিরূপে ঘোষণা।

১৮ সেপ্টেম্বর—সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে যোগদান।

১৯৩৫ ১৬ মার্চ—জার্মানী কর্তৃক ভার্সাই সন্ধিভঙ্গপূর্বক বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্তন।

১৮ জুন—বৃটেনের সহিত জার্মানীর নৌ-চুক্তি।

৩ অক্টোবর—মুসোলিনী কর্তৃক আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) আক্রমণ।

১৯৩৬ ৭ মার্চ—হিটলার কর্তৃক লোকার্নো চুক্তি বাতিল এবং জার্মান সৈন্যের রাইনল্যাণ্ড দখল।

১১ জুলাই—জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকার এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করার প্রতিশ্রুতি।

১৭ জুলাই—স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্তৃক গৃহযুদ্ধ আরম্ভ।

২৫-২৭ অক্টোবর—ইতালীর জার্মান অক্ষশক্তি চুক্তি ঘোষণা।

১৮ নভেম্বর—জার্মানী ও ইটালী কর্তৃক ফ্রাঙ্কোর সামরিক জুণ্টাকে স্পেনের গবর্নমেণ্ট হিসাবে স্বীকৃতি।

২৫ নভেম্বর—জাপানের সঙ্গে জার্মানীর এ্যাণ্টি-কোমিণ্টার্ন চুক্তি স্বাক্ষর।

[১৯৩৬-১৯৩৭ স্ট্যালিন কর্তৃক রাশিয়ার টেরর সৃষ্টি এবং অসংখ্য কমিউনিস্ট কর্মী, নেতা ও সমর নেতাদের 'বিচার' ও প্রাণদণ্ড।]

১৯৩৭ ১৭ ফেব্রুয়ারী—বৃটিশ অস্ত্রসজ্জার পরিকল্পনা।

৭ জুলাই—পিপিংয়ের মার্কো পলো ব্রীজে চীন-জাপানের সংঘর্ষের ছুতায় ২৭ জুলাই থেকে যুদ্ধারম্ভ।

৭ সেপ্টেম্বর—ভার্সাই সন্ধি মৃত বলিয়া হিটলারের ঘোষণা।

১৩ অক্টোবর—বেলজিয়মের ভৌমিক অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখার জন্য জার্মানীর প্রতিশ্রুতি।

৫ নভেম্বর—হিটলার কর্তৃক উচ্চতম নেতাদের গোপন বৈঠক ইউরোপে জোরপূর্বক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা।

৬ নভেম্বর—কমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তিতে ইতালীর যোগদান।

১১ ডিসেম্বর—ইতালী কর্তৃক বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ পরিত্যাগ

১৯৩৮ ৪ ফেব্রুয়ারী—হিটলার কর্তৃক জার্মান হাইকমাণ্ডের রদবদল।

১২ ফেব্রুয়ারী—অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর সুশনিগকে বার্সেটসগ্যাডেনে আনয়ন ও চরমপত্র দান।

১৫ ফেব্রুয়ারী—অস্ট্রিয়ার বশ্যতা স্বীকার।

১২ মার্চ—অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং হিটলারী বাহিনী কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল।

১৭ মার্চ—নাৎসী আগ্রাসনে বাধা দেওয়ার জন্য সোভিয়েত কর্তৃক সম্মেলনের প্রস্তাব।

২৪ এপ্রিল—চেকোশ্লভাকিয়ার সুদেতেন জার্মানদের নেতা হেনলেইন কর্তৃক সুদেতেন জার্মানদের স্বায়ত্তশাসন দাবি।

১৫ সেপ্টেম্বর—চেম্বারলেনের বিমানযোগে বার্সেটসগ্যাডেন গমন, হেনলেইন-কর্তৃক সুদেতেন ল্যাণ্ড জার্মানী সঙ্গে মিলনের দাবি।

২২ সেপ্টেম্ব—চেম্বারলেন দ্বিতীয়বার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গডেসবার্গে উড়িয়া গেলেন।

২৫ সেপ্টম্বর—সমগ্র যন্ত্রপাতি ও কারখানাসহ সুদেতেন প্রদেশ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার দাবি চেকোশ্লভাকিয়া কর্তৃক অগ্রাহ্য।

২৬ সেপ্টেম্বর—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য হিটলার ও প্রেসিডেণ্ট বেনেসের নিকট আবেদন।

২৯-৩০ সেপ্টেম্বর—মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর। হিটলার, মুসোলিনী, চেম্বারলেন, দালাদিয়ের একত্রে মিলে চেকোশ্লভাকিয়াকে চাপ দিলেন জার্মানীকে সুদেতেনল্যাণ্ড অর্পণের জন্য। মিউনিক চুক্তির নিকট চেকোশ্লভাকিয়ার নতি স্বীকার।

১ অক্টোবর—জার্মান সৈন্যদের সুদেতেনল্যাণ্ড প্রবেশ ও চেকোশ্লভাকিয়া খণ্ডীকরণ।

১২ নভেম্বর—জার্মানীতে ইহুদীবিরোধী ভয়ানক কড়া আইন ও নিষেধবিধি প্রবর্তন এবং ইহুদীদের উপর নির্যাতন।

১৯৩৯ ১০ মার্চ—মিউনিকের পর স্ট্যালিন কর্তৃক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা।

১৫ মার্চ—চেকোশ্লভাকিয়া আক্রান্ত ও জার্মান সৈন্যদের প্রাগে প্রবেশ।

১৬ মার্চ—বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া হিটলার কর্তৃক জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত।

শ্লোভাকিয়াও জার্মানীর অধীনে গেল।

২০ মার্চ—নাৎসী আগ্রাসন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের নিকট সম্মেলন আহবানের প্রস্তাব।

২৭ মার্চ—জেনারেল ফ্রাংকো স্পেন কমিণ্টার্ন-বিরোধী-প্যাক্টে যোগ দিল।

২৮ মার্চ—স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাংকো কর্তৃক রাজধানী মাদ্রিদ দখল।

৩১ মার্চ—বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক পোল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারেণ্টি দান।

৭ এপ্রিল—ইতালী কর্তৃক আলবানিয়া দখল।

১৪ এপ্রিল—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক হিটলার ও মুসোলিনীর নিকট একটি ব্যক্তিগত আবেদন প্রেরণ অপরের দেশ আক্রমণ না-করার জন্য।

১৭ এপ্রিল—লিটভিনোফের শান্তিপরিকল্পনা চেম্বারলেন কর্তৃক অগ্রাহ্য।

২৮ এপ্রিল হিটলার কর্তৃক পোলিশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল।

৪ মে—লিটভিনোফের স্থলে মলোটোভ সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত।

২২ মে—জার্মানী ও ইতালীর মধ্যে সামরিক মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর।

১২ জুন—রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার জন্য লণ্ডন থেকে মিঃ স্ট্যাংয়ের মস্কো যাত্রা।

৯ জুলাই—রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেনের সামরিক মৈত্রী স্থাপনের জন্য চার্চিল পুনরায় জোর দিলেন।

৫ আগস্ট—সোভিয়েতের অনুরোধে ইউরোপে শান্তিরক্ষা ও আগ্রাসনে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য একটি ইঙ্গ-ফরাসী মিলিটারি মিশনের মস্কো যাত্রা।
ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ আলোচনার অতি মন্থর গতি।

১০ আগস্ট—হিটলার কর্তৃক জার্মানীকে ডানজিগ ফেরৎ দেওয়ার জন্য পোল্যাণ্ডের নিকট দাবি।

২০ আগস্ট—স্ট্যালিনের নিকট হিটলারের টেলিগ্রাম।

২২ আগস্ট—ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃক পোল্যাণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দানের পুনরাবৃত্তি।
—চেম্বারলেন কর্তৃক পোলিশ বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার জন্য হিটলারের নিকট আবেদন।

২৩ আগস্ট—সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণচুক্তি মস্কোতে স্বাক্ষরিত।
(জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে রাশিয়াও একটা অংশ দখল করিবে, এই মর্মে এক গোপন চুক্তি।)

২৪ আগস্ট—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক হিটলারের নিকট পুনরায় শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আবেদন।

৩০ আগস্ট—রিবেণ্টপ কর্তৃক পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীর দাবীর পুনরাবৃত্তিকরণ—বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের নিকট।

৩১ আগস্ট—পোলিশ সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য হিটলারের নিকট পোলিশ রাষ্ট্রদূতের সম্মতি জ্ঞাপন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১৯৩৯ ১ সেপ্টেম্বর—জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ।

৩ সেপ্টেম্বর—বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

১-৯ সেপ্টেম্বর—জার্মান সৈন্যদের কবলে পশ্চিম পোল্যাণ্ড।

১৭ সেপ্টেম্বর—জার্মানদের ব্রেস্ট-লিটোভস্কে প্রবেশ এবং রাশিয়ান সৈন্যদের—পূর্ব পোল্যাণ্ড আক্রমণ।

সেপ্টেম্বর—ওয়রশ'র আত্মসমর্পণ।
রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে পোল্যাণ্ডের পার্টিশন।

১৪ অক্টোবর—স্কাপাফ্লোতে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ রয়েল ওক্ নিমজ্জিত।

৩০ নভেম্বর—রাশিয়া কর্তৃক ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ।

১৩ ডিসেম্বর—জার্মান পকেট ব্যাটলশিপ্ গ্রাফ স্পীর রোমাঞ্চকর নৌযুদ্ধ (দক্ষিণ আমেরিকা)। এবং

১৭ ডিসেম্বর—মণ্টেভিডো বন্দরে আত্মনিমজ্জন ও ক্যাপ্টেন ল্যাংসডর্ফের আত্মহত্যা।

১৯৪০ ১২ মার্চ—রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।

৯ এপ্রিল—নাৎসী জার্মানীর ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ।

২ মে—মিত্রপক্ষের ন্যামসস পরিত্যাগ।

১০ মে—জার্মানী কর্তৃক হল্যান্ড, বেলজিয়ম ও ল্যাক্সেমবুর্গ আক্রমণ।
—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের পদত্যাগ।
—বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে উইনস্টোন চার্চিল।
১২ মে—জার্মান বাহিনীর ফ্রান্সের সীমা অতিক্রম।
১৫ মে—ওলন্দাজ (ডাচ) বাহিনীর আত্মসমর্পণ।
১৬ মে—সেডানে ফরাসী ব্যূহভঙ্গ এবং জার্মানদের দ্রুত অগ্রগতি।
২৮ মে—বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ডের আত্মসমর্পণ।
২৬ মে-৪ জুন—ডানকার্ক থেকে বৃটিশ বাহিনীর পরিত্রাণ ও পলায়ন।
১০ জুন—মুসোলিনী কর্তৃক বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।
১৪ জুন—জার্মান বাহিনীর অরক্ষিত প্যারিসে প্রবেশ।
১৭ জুন—পেঁতা কর্তৃক ফ্রাংকো-জার্মান যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা এবং ২২ জুন স্বাক্ষর।
২২ জুন—কম্পেইন অরণ্যে ফ্রান্স ও জার্মানী কর্তৃক যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর।
২৭-২৩ জুন—রাশিয়া কর্তৃক বাল্টিক রাজ্যগুলি দখল।
২৭-৩০ জুন রাশিয়া কর্তৃক বেসারাবিয়া এবং উত্তর বাকুভিনা দখল।
৩ জুলাই—ওয়ান বন্দরে বৃটিশ কর্তৃক ফরাসী বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজসমূহ আক্রমণ।
১০ জুলাই—বৃটেনের বিরুদ্ধে জার্মান বিমান অভিযান বা 'ব্যাটল অব বৃটেন' আরম্ভ।
৩ সেপ্টেম্বর—রাজা ক্যারল কর্তৃক রুমানিয়ার সিংহাসন ত্যাগ।
৭ সেপ্টেম্বর—লণ্ডনের বিরুদ্ধে জার্মানীর প্রথম ব্যাপক বিমান অভিযান। জার্মানী কর্তৃক রুমানিয়ার তৈলখনি দখল।
১৩-১৬ সেপ্টেম্বর—ইতালীয় বাহিনীর মিশর সীমান্ত অতিক্রম এবং সিদিবারানী দখল।
২৭ সেপ্টেম্বর—জার্মানী-ইতালী-জাপানের মধ্যে দশ বছরের জন্য ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর।
২৮ অক্টোবর—ইতালীর গ্রীস আক্রমণ।
১১ নভেম্বর—টরেন্টো বন্দরে বৃটিশ আক্রমণে ইতালীয় নৌবহর প্রচণ্ডরকমে পঙ্গু।
১২-১৪ নভেম্বর—মলোটোভ কর্তৃক বার্লিন পরিদর্শন।
১৪-১৬ নভেম্বর—কভেণ্ট্রিতে জার্মান বিমান আক্রমণ।
৯ ডিসেম্বর—উত্তর আফ্রিকায় অষ্টম বাহিনীর আক্রমণ শুরু।
১৮ ডিসেম্বর—হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের জন্য বার্বারোসা পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদন।

১৯৪১ ৩ জানুয়ারী—উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয়দের বার্দিয়া পরিত্যাগ।
৬ জানুয়ারী—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক 'চতুর্বিধ স্বাধীনতা' ঘোষণা।

১৮ জানুয়ারী—গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র বসুর কলিকাতা ত্যাগ এবং কাবুল ও মস্কো হইয়া মার্চ মাসে বার্লিনে উপস্থিতি।
৩০ জানুয়ারী—অষ্টম আর্মির বেঙ্গাজী অভিযান ও তব্রুক বন্দর দখল।
৫ ফেব্রুয়ারী—বেঙ্গাজী বন্দর দখল।
১১ মার্চ—রুজভেল্ট কর্তৃক লেণ্ড লীজ (কর্জ-ইজারা) বিল স্বাক্ষর।
২৭ মার্চ—যুগোশ্লাভিয়ায় বিপ্লব।
২৮ মার্চ—মাতাপান অন্তরীপের যুদ্ধ।
৩১ মার্চ—উত্তর আফ্রিকায় জার্মানীর পালটা আক্রমণ আরম্ভ।
৫ এপ্রিল—সোভিয়েত-যুগোশ্লাভ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর।
৬ এপ্রিল—জার্মান কর্তৃক গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ। গ্রীসে বৃটিশ কর্তৃক ৬০ হাজার সৈন্য প্রেরণ।
৭ এপ্রিল—বৃটিশ পক্ষের বেঙ্গাজী পরিত্যাগ।
১৩ এপ্রিল—সোভিয়েত-জাপান আক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।
—জার্মানদের হাতে তোব্রুক বেষ্টিত এবং বার্দিয়া পুনর্দখল।
২২ এপ্রিল—বৃটিশ কর্তৃক গ্রীস পরিত্যাগ আরম্ভ।
৬ মে—সোভিয়েত সরকারের প্রধানের পদে স্ট্যালিন, মলোটোভ পররাষ্ট্র মন্ত্রী।
১০ মে—রুডলফ হেস কর্তৃক স্কটল্যাণ্ডে অবতরণ।
২০ মে—জার্মানী কর্তৃক ক্রীট দ্বীপ আক্রমণ।
২৮ মে—২ জুন বৃটেনের ক্রীট দ্বীপ পরিত্যাগ।
৩১ মে—বৃটিশ কর্তৃক ইরাকে বিদ্রোহ দমন ২রা থেকে আরম্ভ)
৮ জুন—মিত্রবাহিনীর সিরিয়া প্রবেশ।
১৪ জুন—জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ আসন্ন—তাস কর্তৃক বিশেষ ইস্তাহারে অস্বীকার।
২২ জুন—জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ।
২৮ জুন—মিনস্ক, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটাভিয়া ও পশ্চিম উক্রাইন জার্মানীর দখলে।
৩ জুলাই—স্ট্যালিন কর্তৃক সোভিয়েত জনগণের নিকট বেতার বক্তৃতা।
১২ জুলাই—বৃটিশ-সোভিয়েত পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি স্বাক্ষর।
১৬ জুলাই—মস্কোর অভিমুখে জার্মানদের স্মলেনস্ক শহর দখল।
৩০ জুলাই—রুজভেল্টের প্রতিনিধি হ্যারি হপকিন্সের মস্কো উপস্থিতি।
১৪ আগস্ট—অতলান্তিক সনদে স্বাক্ষর।
—রুজভেল্ট-চার্চিল সমুদ্রবক্ষে মিলন ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ঘোষণা।
১৭ আগস্ট—জার্মানদের উক্রাইনে অগ্রগতি ও নিপ্রোপেট্রোভস্ক দখল।
২৫ আগস্ট—বৃটিশ ও রুশ বাহিনীর ইরান দখল।
৩০ আগস্ট—লেনিনগ্রাদের শেষ রেলপথের সংযোগ জার্মানীর দখলে।
৮ সেপ্টেম্বর—ভূমিপথে লেনিনগ্রাদ সম্পূর্ণ বেষ্টিত
১৭ সেপ্টেম্বর—কিয়েভ জার্মানীর দখলে।

—বিশাল রুশবাহিনী বেষ্টিত।

২৯ সেপ্টেম্বর—মস্কোতে বীভারব্রুক ও হ্যারিম্যান-এর উপস্থিতি।

৩০ সেপ্টেম্বর—জার্মানীর মস্কো আক্রমণ আরম্ভ

৬-১২ অক্টোবর—মস্কোর পশ্চিমে লালফৌজের বৃহৎ অংশ বেষ্টিত।

১১ অক্টোবর—জেনারেল হিডেকি তোজো জাপানের প্রধানমন্ত্রীর পদে।

১৪-১৬ অক্টোবর—মস্কোর দিকে জার্মানদের আরও অগ্রগতি।

১৬ অক্টোবর—মস্কোতে নাগরিকদের মধ্যে ত্রাস।

—জার্মান-রুমেনীয় বাহিনী কর্তৃক ওডেসা বন্দর দখল।

২০ অক্টোবর—মস্কোতে অবরোধ ঘোষণা।

২৪ অক্টোবর—জার্মানদের দখলে খারকোভ।

২৫ অক্টোবর—মস্কোতে জার্মানীর প্রথম অভিযান ব্যর্থ।

৩০ অক্টোবর—সেবাস্তোপোল দুর্গের ৯ মাস ব্যাপী অবরোধ আরম্ভ।

৬-৭ নভেম্বর—জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনামূলক স্ট্যালিনের 'পবিত্র রাশিয়া' সংক্রান্ত ২টি বক্তৃতা।

৯ নভেম্বর—লেনিনগ্রাদ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

১২ নভেম্বর—বৃটেনের সুবৃহৎ যুদ্ধজাহাজ আর্ক অয়েল নিমজ্জিত।

১৬ নভেম্বর—মস্কোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় জার্মান অভিযান আরম্ভ।

১৮ নভেম্বর—লিবিয়াতে (পশ্চিম মরুভূমি) অষ্টম বাহিনীর অভিযান আরম্ভ।

১৯ নভেম্বর—জার্মানীর দখলে রস্টোভ বন্দর।

২৯ নভেম্বর—রুশ কর্তৃক রস্টোভ পুনর্দখল।

৬ ডিসেম্বর—মস্কোতে রুশ বাহিনীর পালটা আক্রমণ আরম্ভ।

৭ ডিসেম্বর—জাপান কর্তৃক পার্লহারবার আক্রমণ।

—প্রশান্ত মহাসাগরীর যুদ্ধের আরম্ভ।

৮ ডিসেম্বর—জাপানের বিরুদ্ধে বৃটেন ও আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা।

—গুয়াম, মিডওয়ে, ফিলিপিন্স, হংকং ও মালয়ে জাপানী বোমারু আক্রমণ।

৯ ডিসেম্বর—লুজনে জাপানীদের অবতরণ

—রুশদের টিকভিন দখল এবং লেনিনগ্রাদের আত্মরক্ষা।

১০ ডিসেম্বর—বৃটেনের বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ জাপানীদের আক্রমণে নিমজ্জিত।

১০-১১ ডিসেম্বর—জার্মানী ও ইটালী কর্তৃক আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং মার্কিন কর্তৃক পালটা ঘোষণা।

২৪ ডিসেম্বর—বৃটিশ কর্তৃক বেঙ্গাজী পুনর্দখল।

২৫ ডিসেম্বর—হংকংয়ের আত্মসমর্পণ।

১৯২৪ ১ জানুয়ারী—২১ টি জাতি কর্তৃক ইউনাইটেড নেশন্স-এর ঘোষণা স্বাক্ষর।

১০ জানুয়ারী—জাপান কর্তৃক ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ?

২১ জানুয়ারী—উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম মরুভূমিতে জার্মানীর পালটা অভিযান।
২৮ জানুয়ারী—জার্মান কর্তৃক বেঙ্গাজী পুনর্দখল।
১৫ ফেব্রুয়ারী—জাপানীদের নিকট সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ।
১০ মার্চ—রেঙ্গুনের পতন।
৯ এপ্রিল—বাতানের আত্মসমর্পণ।
১ মে—মান্দালয়ের পতন।
৬ মে—কোরিজিডরের আত্মসমর্পণ।
১৭ মে—খারকোভ অঞ্চলে রুশ পালটা আক্রমণের জবাবে জার্মানীর পালটা-আক্রমণ ও রুশদের পরাজয়।
২৬ মে—মলোটোভ কর্তৃক লণ্ডনে ইঙ্গ-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর এবং ওয়াশিংটনে গমন।
—পশ্চিম মরুভূমিতে রোমেলের পুনরায় অভিযান শুরু।
৩০ মে—কলোনে হাজার বৃটিশ বোমারুর হানা।
৩ জুন—মিডওয়ে দ্বীপের যুদ্ধারম্ভ।
১১ জুন—দ্বিতীয় রণাঙ্গন সংক্রান্ত ইস্তাহার প্রকাশ।
১৯ জুন—বৃটিশের মিশর সীমানা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ।
২১ জুন—রোমেল কর্তৃক তোব্রুক দখল।
২৫-২৭ জুন—চার্চিল রুজভেল্টের মধ্যে দ্বিতীয় ওয়াশিংটন সম্মেলন।
২৮ জুন—অষ্টম বাহিনীর এল. আলামিনে পশ্চাদপসরণ।
—দক্ষিণ রাশিয়ায় জার্মানীর প্রচণ্ড অভিযান আরম্ভ।
৩ জুলাই—সেবাস্তোপোলের পতন।
২৮ জুলাই—জার্মানদের রস্টোভ পুনর্দখল।
৩০ জুলাই—'আর এক পা পিছু-হটা চলবে না'—লালফৌজের প্রতি স্ট্যালিনের কড়া নির্দেশ।
৭ই আগস্ট—গুয়াদাল ক্যানেলে মার্কিনীদের অবতরণ।
১২-২৫ আগস্ট—মস্কোতে চার্চিল হ্যারিম্যান ও স্ট্যালিনের বৈঠক।
১৯ আগস্ট—ডিয়েপ'য়ে হানা।
২৩ আগস্ট—ব্যূহ ভেদপূর্বক জার্মানদের স্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে প্রবেশ।
—স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান বিমান আক্রমণে ৪০ হাজার নিহত।
২৫ আগস্ট—গ্রোজনী ও বাকু তৈলখনির পথে জার্মান অগ্রগতি রুদ্ধ।
৩ সেপ্টেম্বর—ভলগার তীরে দক্ষিণ স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানদের প্রবেশ।
২৪ সেপ্টেম্বর—মধ্য স্ট্যালিনগ্রাদের অধিকাংশ জার্মানদের দখলে।
২৩ অক্টোবর—এল আলামিনের যুদ্ধ আরম্ভ—মণ্টগোমারীর আক্রমণ রোমেলের বিরুদ্ধে।
৪ নভেম্বর—রোমেল কর্তৃক পূর্ণ পশ্চাদপসরণ।
৮ নভেম্বর—ইঙ্গ মার্কিন মিত্র বাহিনীর ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ।
১৯ নভেম্বর—স্ট্যালিনগ্রাদে লালফৌজের পালটা আক্রমণ আরম্ভ।

২২ নভেম্বর—তিন লক্ষাধিক জার্মান সৈন্য স্ট্যালিনগ্রাদে বেষ্টিত।
১২-১৩ ডিসেম্বর—স্ট্যালিনগ্রাদের অবরুদ্ধ জার্মানবাহিনীর ত্রাণের জন্য জেনারেল ম্যানস্টাইনের ব্যর্থ আক্রমণ !!
২১ ডিসেম্বর—অষ্টম বাহিনীর বেঙ্গাজী দখল।
২৪ ডিসেম্বর—উত্তর আফ্রিকার ফরাসী প্রধান রাষ্ট্রনায়ক এ্যাডমিরাল দারলাঁ আততায়ীর হস্তে নিহত।

১৯৪৩ ২ জানুয়ারী—জার্মান বাহিনীর ককেশাস পরিত্যাগ শুরু।
১৪ জানুয়ারী—ক্যাসাব্লাংকা সম্মেলন (চার্চিল-রুজভেল্ট) আরম্ভ।
—২৩ জানুয়ারি শেষ।
—জেনারেল দ্যগলের শক্তি সঞ্চয়।
২৩ জানুয়ারী—অষ্টম বাহিনীর ত্রিপোলি প্রবেশ।
৩১ জানুয়ারী—স্ট্যালিনগ্রাদে ফন্ পাউলাসের আত্মসমর্পণ।
২ ফেব্রুয়ারী—স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানবাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ—যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন।
৮-১৬ ফেব্রুয়ারী—কুরস্ক, রস্টোভ ও খারকোভ পুনরায় রুশ দখল।
৯ ফেব্রুয়ারী—জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর সাবমেরিন যোগে জাপান যাত্রা এবং তিন মাস পরে সুদূর-প্রাচ্যে উপস্থিতি।
২ মার্চ—বিসমার্ক সাগরের যুদ্ধ।
১৫ মার্চ—জার্মানদের খারকোভ পুনর্দখল।
২০ এপ্রিল—ওয়ারশ ঘেটোর হত্যাকাণ্ড।
২৬ এপ্রিল—কাটিয়ান অরণ্যের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে রুশদের বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্য লণ্ডন পোলদের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন।
৭ মে—মিত্র বাহিনী কর্তৃক তিউনিস ও বিজার্টা দখল।
১১ মে—চার্চিল-রুজভেল্টের তৃতীয় ওয়াশিংটন সম্মেলন।
১২ মে—তিউনিসিয়ায় জার্মানবাহিনীর আত্মসমর্পণ।
২২ মে—স্ট্যালিন কর্তৃক কমিণ্টার্ন (তৃতীয় আন্তর্জাতিক) ভেঙ্গে দেওয়ার ঘোষণা।
৪ জুলাই—বিপ্লবী রাসবিহারী বসু কর্তৃক সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে আই-এন-এর ভার অর্পণ।
৫ জুলাই—কুরস্কের যুদ্ধারম্ভ।
১০ জুলাই—মিত্রবাহিনীর সিসিলি দ্বীপ আক্রমণ।
১২-১৫ জুলাই—ওরেল স্ফীতিমুখে রুশদের পালটা আক্রমণ।
২৫ জুলাই—মুসোলিনীর পদচ্যুতি ও গ্রেপ্তার।
৫ আগস্ট—রাশিয়ানদের ওরেল এবং বেলগোরোদ দখল।
১৭-২৪ আগস্ট—প্রথম কোয়েবেক সম্মেলন।
২৩ আগস্ট—রুশদের খারকোভ পুনর্দখল।
৩ সেপ্টেম্বর—মিত্রবাহিনীর দক্ষিণ ইতালী আক্রমণ।

৮ সেপ্টেম্বর—ইতালীর আত্মসমর্পণ।
৯ সেপ্টেম্বর—স্যালারনোতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ।
১০ সেপ্টেম্বর—জার্মানীর রোম দখল।
২৫ সেপ্টেম্বর—রুশদের স্মলেনস্ক দখল।
৩০ সেপ্টেম্বর—মিত্রবাহিনীর নেপলস দখল।
১৩ অক্টোবর—ইতালী কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।
১৮ অক্টোবর—মস্কোতে ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ।
১৯ অক্টোবর—ইতালীর ভলটার্নো নদী থেকে জার্মানদের পশ্চাদপসরণ।
২১ অক্টোবর—সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষ কর্তৃক অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা।
১ নভেম্বর—সলোমোন দ্বীপের বুগেনভিলে মার্কিনদের অবতরণ।
৬ নভেম্বর—রাশিয়ানদের কিয়েভ পুনর্দখল।
২২-২৬ নভেম্বর—প্রথম কায়রো সম্মেলন—চার্চিল-রুজভেল্ট-চিয়াং কাইসেকের মিলন
২৮ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর—তেহরান সম্মেলন—রাজভেল্ট-স্ট্যালিন-চার্চিল শীর্ষবৈঠক।
৪-৬ ডিসেম্বর—দ্বিতীয় কায়রো সম্মেলন—রজভেল্ট-চার্চিল-ইনোনু।
২৬ ডিসেম্বর—নাৎসী যুদ্ধজাহাজ শার্নহোর্স্ট নরওয়ের সমুদ্রে নিমজ্জিত।

১৯৪৪ ৪ জানুয়ারী—ইতালীতে ক্যাসিনোর পূর্বে পঞ্চম আর্মির আক্রমণ।
২২ জানুয়ারী—আঞ্জিওতে জার্মান সৈন্যদের পিছনে মিত্রসৈন্যদের অবতরণ।
২৭ জানুয়ারী—লেনিনগ্রাদের অবরোধ সম্পূর্ণ মুক্ত।
৪ ফেব্রুয়ারী—আজাদ হিন্দ ফৌজের আরাকান দখল।
৪ মার্চ—উক্রাইনে রুশ অভিযান আরম্ভ।
২ এপ্রিল—রুশদের রুমানিয়া প্রবেশ।
৮-১৪ এপ্রিল—কোহিমা ও ময়রাং আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক দখল।
২০ এপ্রিল—আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে ইম্ফলের পতন শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ।
৯ মে—সেবাস্তোপোল পুনর্দখল।
১৮ মে—ক্যাসিনো দখল।
২৩ মে—আঞ্জিও থেকে মিত্রবাহিনীর আক্রমণ আরম্ভ।
৪ জুন—ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর দখলে রোম।
৬ জুন—নরম্যাণ্ডিতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ—পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ।
১০ জুন—ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রুশদের অভিযান।
১৩ জুন—লণ্ডনে প্রথম উড়ন্ত বোমার (ভি-১) আক্রমণ।
১৫ জুন—জাপানের উপর প্রথম মার্কিন অতিকায় বোমারুর আক্রমণ।
১৯ জুন—মার্কিন দখলে সাইপ্রাস দ্বীপ।
২০ জুন—ভীবোর্গ রুশদের দখলে।
২৩ জুন—বেলোরুশিয়ায় রুশদের অভিযান আরম্ভ।
২৭ জুন—শেরবুর্গ বন্দর মিত্রপক্ষের দখলে।

৩ জুলাই—মিনস্ক পুনর্দখল—১ লক্ষ জার্মান সৈন্য বন্দী।
১৮ জুলাই—রোকোসোভস্কির পোল্যাণ্ডে প্রবেশ—পিসকোভ দখল।
২০ জুলাই—হিটলারকে হত্যার চেষ্টা—বোমা বিস্ফোরণে হিটলার আহত।
২৩ জুলাই—লুবলিন দখল।
২৮ জুলাই—ব্রেস্ট-লিটোভস্ক পুনর্দখল।
৩১ জুলাই—ওয়ারশ'র প্রবেশ মুখে রুশসৈন্য।
১ আগস্ট—ওয়ারশ' অভ্যুত্থানের আরম্ভ।
১৫ আগস্ট—দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্রবাহিনীর অবতরণ।
২৩ আগস্ট—রুমানিয়া কর্তৃক রুশ যুদ্ধবিরতির চুক্তি গ্রহণ।
২৫ আগস্ট—প্যারিসের মুক্তি।
৩ সেপ্টেম্বর—বৃটিশ কর্তৃক ব্রুসেলস দখল।
৪ সেপ্টেম্বর—রুশ-ফিনিশ যুদ্ধবিরতি—এণ্টোয়ার্পের মুক্তি।
৫ সেপ্টেম্বর—বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা।
৬ সেপ্টেম্বর—প্রথম 'ভি-২' (উড়ন্ত বোমা) লণ্ডনে বর্ষণ।
৯ সেপ্টেম্বর—বুলগেরিয়ার যুদ্ধ বিরতি।
১৩ সেপ্টেম্বর—রুশ-ফিনিশ যুদ্ধবিরতি—দ্বিতীয় কোয়েবেক সম্মেলন—
১২ সেপ্টেম্বর—রুমানিয়ার যুদ্ধবিরতি।
১৭ সেপ্টেম্বর—আর্নহেমের যুদ্ধ—মিত্র বিমানসৈন্যের হল্যাণ্ডে অবতরণ।
২৯ সেপ্টেম্বর—রুশদের যুগোশ্লাভিয়া প্রবেশ।
২ অক্টোবর—ওয়ারশ'-এর আণ্ডার গ্রাউণ্ড সৈন্যদের আত্মসমর্পণ।
৯ অক্টোবর—মস্কোতে ইডেন-চার্চিল-স্ট্যালিন বৈঠক।
১৪ অক্টোবর—মিত্রবাহিনীর এথেন্স দখল।
১৯ অক্টোবর—আমেরিকানদের ফিলিপিন্সে অবতরণ।
২০ অক্টোবর—রুশ ও যুগোশ্লাভদের বেলগ্রেডে প্রবেশ।
২১ অক্টোবর—লেতি উপসাগরের যুদ্ধ।
১২ নভেম্বর—জার্মান যুদ্ধজাহাজ তিরপিৎস নিমজ্জিত।
২৪ নভেম্বর—স্ট্রাসবুর্গ দখল।
২ ডিসেম্বর—মস্কোতে দ্য গল।
১৬ ডিসেম্বর—আর্দেনেসে হিটলারী পালটা আক্রমণ—স্ফীতিমুখের যুদ্ধ।
১৮ ডিসেম্বর—উত্তর বার্মা জাপানীদের কবলমুক্ত।
২৭—ডিসেম্বর—লালফৌজের বুদাপেস্ট বেষ্টন।

১৯৪৫ ৩ জানুয়ারী—আর্দেনেস অঞ্চলে আমেরিকানদের পালটা আক্রমণ।
১৭ জনেুয়ারী—রুশদের ওয়ারশ' দখল।
২০ জানুয়ারী—হাঙ্গেরীর অস্থায়ী সরকার কর্তৃক যুদ্ধবিরতি।
২৩ জানুয়ারী—লালফৌজের ওডের নদীতীরে উপস্থিতি।
৩১ জানুয়ারী—মাল্টাতে চার্চিল-রুজভেল্ট শীর্ষ বৈঠক শুরু।
৪ ফেব্রুয়ারী—ইয়াল্টাতে স্ট্যালিন-চার্চিল-রুজভেল্ট শীর্ষ বৈঠক শুরু।
৫ ফেব্রুয়ারী—আমেরিকানদের ম্যানিলা দখল—রাইনের দিকে অগ্রগতি।

১৩ ফেব্রুয়ারী—বুদাপেস্টের পতন।
১৯ ফেব্রুয়ারী—আমেরিকানদের আইওজিমায় অবতরণ।
২৩ ফেব্রুয়ারী—পোজনান দখল।
৪ মার্চ—ফিনল্যাণ্ড কর্তৃক পালটা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।
৭ মার্চ—প্রথম মার্কিন বাহিনীর রেমাজন ব্রীজ দিয়া রাইন নদী অতিক্রম।
২৩ মার্চ—মিত্রপক্ষের রাইন নদী অতিক্রম।
২৯ মার্চ—রুশদের অস্ট্রিয়ান সীমান্ত প্রবেশ।
১ এপ্রিল—আমেরিকানদের ওকিনাওয়া আক্রমণ।
১২ এপ্রিল—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যু।
১৬—লালফৌজ কর্তৃক বার্লিনের দিকে চূড়ান্ত অভিযান।
১৯ এপ্রিল—আমেরিকানদের হাতে লাইপজিস।
২৩ এপ্রিল—লালফৌজের বার্লিনে প্রবেশ।
২৭ এপ্রিল—জেনোয়া ও ভেরোনার পতন—টরগাউতে মার্কিন-রুশবাহিনীর-মিলন।
২৮ এপ্রিল—পার্টিজান কর্তৃক মুসোলিনী প্রণয়িনীসহ ধৃত ও গুলিতে নিহত।
৩০ এপ্রিল—বার্লিনের ভূগর্ভের আশ্রয়ে হিটলার ও ইভা ব্রাউনের আত্মহত্যা——রাইখস্ট্যাগে (বার্লিন) লালফৌজের জয়পতাকা উত্তোলন।
১ মে—গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস কর্তৃক জার্মানীর দায়িত্ব গ্রহণ।
২ মে—রুশদের হাতে বার্লিনের পতন—ইতালীর বাহিনীর আত্মসমর্পণ।
৩ মে—মিত্রবাহিনীর রেঙ্গুন দখল।
৭ মে—রেইমসে আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তরে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ।
৮ মে—বার্লিনে মার্শাল জুকোভের দপ্তরে মার্শাল কাইটেলের আত্মসমর্পণ।
৯ মে—সোভিয়েত বিজয় দিবস উদ্‌যাপন।
২১—মে ওকিনাওয়ার পতন।
২৬ জুন—স্যান্সফ্রান্সিস্কোতে বিশ্ব-নিরাপত্তা সনদে স্বাক্ষর।
২৭ জুলাই-২ আগস্ট—পটসডাম সম্মেলনে (ট্রুম্যান-স্ট্যালিন-চার্চিল-এ্যাটলি)
৬ আগস্ট—হিরোশিমাতে প্রথম এ্যাটোমিক বা পারমাণবিক বোমা বর্ষণ।
৮ আগস্ট—সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।
৯ আগস্ট—নাগাসাকিতে এ্যাটমবোম বিস্ফোরণ—মাঞ্চুরিয়াতে রুশ আক্রমণ।
১৪ আগস্ট—জাপান কর্তৃক বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে সম্মতি।
১৮ আগস্ট—তাইহাকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ প্রচার।
২ সেপ্টেম্বর—টোকিও উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মিশৌরিতে জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান।

নির্দেশিকা

স্থানাভাবের জন্য বিস্তৃত নির্দেশিকা দেওয়া হয় নাই কেবল প্রধান প্রধান বিষয় ও নামের ব্যবহার হইয়াছে। বর্তমান 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস' দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা (১-৭৫১) ও দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা (১-৬৪২) সমাপ্ত। সূচিতে প্রথমে যে পৃষ্ঠাংক আছে, সেগুলি প্রথম খণ্ডের। পরে / (স্ট্রোক) চিহ্নের পর যে পৃষ্ঠাংক আছে সেগুলি দ্বিতীয় খণ্ডের।

অক্ষশক্তির হতাশা/১
আফ্রিকা পুনরুদ্ধার ৫৬৮
আর্দেনেশ অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ/৩০১
আলামিনের পরাজয় ৫৮৮
আমেরিকা : গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার ৪৩১
ইউরোপে জনযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী/২৭৩
ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন/১৬৬
ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কে আবর্ত ৫৮৯
ইঙ্গ-মার্কিন অভিযান : উত্তর আফ্রিকা ৬০২
ইঙ্গ-মার্কিন আবেদনে স্ট্যালিন/৩১৩
ইঙ্গ-মার্কিন বিতর্ক : বার্লিন/৩৫১
ইঙ্গ-মার্কিন রণনীতি-কূটনীতি ৫১৯
ইঙ্গ সোভিয়েত মৈত্রী ৫৩৩
ইতালীর যুদ্ধ ঘোষণা ১৯২
ইতালীয় যুদ্ধের মন্থরতা/১৬০
ইতালী-জার্মান-বৃটেন সংঘাত ২৭৩
ইতালীর বৈধ বিপ্লব/২৯
ইতালীর আত্মসমর্পণ/৪৭
ইয়াল্টা সম্মেলন/৩২৪
ইরাকের বিদ্রোহ ২৫৯
উক্রাইন : মৃত্যু ফাঁদে ৩৬৬
এ্যাটম্ বোমা ৪৮৮
ঐ হিরোসিমা / নাগাশাকিতে পতন / ৫১০
ওয়ারশর অভ্যুত্থান/১৯১
ওয়াশিংটন-কোয়েবেক-মস্কো বৈঠক/৮৭
ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ৪৮৭
আন্তর্জাতিক সংকট ৪৫
ককেশাসের যুদ্ধ/৬৬৫, ৬৭২
কমিনটার্ন বাতিল/৬৩

কাটিন অরণ্যের রহস্য/৬৬
কায়রো : চিয়াং কাইসেক/৯৮
কিয়েভ—সেবাস্তপোলের মুক্তি/১৪৮
কুরস্ক : জার্মানীর অভিযান ব্যর্থতা/৭৩
কুটনৈতিক নাটকের অভিনয় ৮৯
কোয়ালিশন : রাজনীতি-রণনীতি/৮৭, ৯৮
কোয়েবেক সম্মেলনের গুরুত্ব/২১৯
ক্যাসারাঙ্কা : আত্মসমর্পণ দাবী ৬১৬
ক্রীট দখল ২৮৬
গ্রীস ২৭৪,/১১৯
চার্চিলের চাতুর্য ৫৩৭
চার্চিল-রুজভেল্ট বৈঠক ৪৩২
চীনের যুদ্ধ/২৩২
জাপ-মার্কিন সংঘর্ষ ৪৫৪
জাপ-মার্কিন বিরোধ ৪৪৮, ৪৫৮
জাপান-জার্মানী-রাশিয়া সম্পর্ক ৪৮১
জাপান : পতনের মুখে /৫০০
জাপান : শান্তির সন্ধানে /৩৪৫
জাপান : সঙ্কট অবস্থা /২৩২
জাপানী অভিযান : প্রশান্ত মহাসাগর ৪৪৭
জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ /২৪৩, ৫৩৪
জার্মান তাঁবেদার : রণেভঙ্গ/২২২
জার্মান বাহিনী : মৃত্যুর ফাঁদে/আত্মসমর্পণ ৭১৯, ৭৪৩
জার্মান সৈনাপত্যে ওলট-পালট ৪৫৪
জার্মানীতে বোমাবর্ষণ/৩১৬, ৪৩৯
টিটো/১১৯
টোকিওর সামরিক আদালত/৫৯৬
ঐ : রাধাবিনোদ পাল/৫৯৬
ডানকার্ক ১৮৫
ডিক্টেটরির যুগ ১৩
ডেনমার্ক-নরওয়ে দখল ১৫১
তেহরান শীর্ষ সম্মেলন/৯৮
দ্বিতীয় রণাঙ্গন ৫৩৭, ৫৪৬
দ্য গলের অভ্যুদয় / প্রতিষ্ঠা ৫৮৯, ৬১৬
নরম্যাণ্ডিতে অবতরণ/১৬৬
নাৎসী আগ্রাসন ৫৫৮
নাৎসী গ্রাসে বলকান ২৭০
নাৎসী : সংগ্রাম চেষ্টা ১০৫

ন্যুরেমবার্গের বিচার/৫৬৭
পটসডাম সম্মেলন/৪৭৮
পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ ১৮২, ১৯৯, ২০৮
পার্টিজান যুদ্ধ/২৭০
পার্ল হারবার ৪৬৮
পোলিস সমস্যা/৬৬, ২১৩
পোল্যাণ্ড : বাঁটোয়ারা ১২৯
প্যারিসের মুক্তি/২০৮
প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি ২১৮
ফন ম্যানস্টাইন ৭৩৪
ফরাসী সংকটের মূলসূত্র:২১৮
ফরাসী সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার ৬০২
ফিনল্যাণ্ড-বুলগেরিয়া-রুমানিয়া/২২২
ফিলিপিন্স-ব্রহ্মদেশ পতন ৫০৪
ফ্যাসিজিমের জয়যাত্রা ১৬, ১৯, ৫১৫, ৫১৯
ঐ প্রতিবাদ : রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি/১৪৫
ফ্যাসিস্ট তোষণ পরিণাম ৪৫
ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ ১৮২, ১৯৫
ফ্রাংকো-মুসোলিনী-হিটলার ২৬৪
বন্দীশালার বর্বরতা/২৮৫
বর্মা পুনর্দখল/২৫৫
বলকান দখল ২৮৪
বার্লিন আক্রমণে বিতর্ক/১৬৪, ৩৭৫
বার্লিনে মলোটভ-মাৎসুয়োকার ২৮৮
বুলগেরিয়া-যুগোশ্লাভিয়া ২৭৬
বৃটিশ-ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদ ২৪৯
বৃটেন ১৬৪, ২৩০
বৃটেনে হেস ৩৩২
বেলোরুশিয়ার মুক্তি / ১৯৯
ব্রহ্মযুদ্ধ ও রেঙ্গুন / ৫১২
ভারত অভিমুখে জাপান ৫১৬
ভুমধ্যসাগরীয় রণনীতি ২৪৯, ২৬৪
মস্কো অভিযান ৩৮২, ৩৮৫
ঐ : চার্চিলের গোপন বুঝাপড়া/২১৩
ঐ : পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ৯৪
ঐ : প্রতিরোধে নাৎসী পরাজয় ৩৯৪
ঐ : ইঙ্গ-মার্কিন মিশন ৪২৯
মহাযুদ্ধ : পূর্ব অবস্থা / উপসংহার১,/৬১২

ঐ ঃ দিনপঞ্জী/৬২৭
ঐ ঃ পৃথিবী ব্যাপী ৪৪৮
ঐ ঃ ভারত/১২৫, ৬০৩
মাল্টা বৈঠকের বৈশিষ্ট্য/৩১৭
মিউনিক চুক্তির কলঙ্ক ৫৯, ৭১
মিত্রপক্ষ ২৪৩, ৫৫৮,/৩০১, ৩৫১
ঐ বিরোধে হপকিন্স/৪৬৫
মুসোলিনীর চরম দণ্ড/৪০৪
ম্যান স্টাইন প্লান ১৯৯
যুগোশ্লাভিয়া/১১৯
রণক্রিয়ার পরিবর্তন ২০৮
রুজভেল্টের মৃত্যু/৩৬৭
রুমানিয়া ২৭৫
রুশ জার্মান চুক্তি ৭৯
রুশ-ফিনিশ যুদ্ধ ১৪
রুশ সীমান্ত পুনরুদ্ধার/৮১
রাশিয়া আক্রমণ ৩৩৩, ৩৪৯
রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা/৪৫৮
রোমের মুক্তি/১৬০
রোমেলের মরুযুদ্ধ ৫৬৮
লালফৌজ যুদ্ধ ৭১৯,/৪২৭
লিডিসের ভয়াবহ কাহিনী/২৯৩
লেনিনগ্রাড যুদ্ধ ৩৬৬,/১৪৮
সানফ্রানসিস্কো/৪৫৮
শ্লোভাকিয়ার অভ্যুত্থান/২৮১
সামরিক চক্রান্তের গুপ্ত কাহিনী ১০৫
সাম্রাজ্যবাদের নেশা ৬২০
সুভাষচন্দ্রের মুক্তি সংগ্রাম/২৫৯
সোভিয়েটে পার্টি জনযুদ্ধ/২৭৬
সোভিয়েট রাশিয়ায় নাৎসী অত্যাচার ৪৫,/২৯৪
সোভিয়েট লেখনী-অস্ত্র/২৮২
স্টালিনগ্রাড ৫৯৮, ৬৮৩,/১, ৬৮, ৪৪২
স্বাতীমুখের যুদ্ধ/৩০৭
হপকিন্সের দৌত্য/৪১৫
হল্যাণ্ড-বেলজিয়াম ১৭০
হিটলার ২৬, ৩১৮, ৩৬৬, ৩৯৪, ৬৩৪, ৬৪৫/৩৪, ১৭৬,
৩৭৬, ৩৮৬, ৪১৬, ৪৮১